Boighar.net

এথেন্সের 'সক্রেটিস কমিউনিটি' কর্তৃক শ্রেষ্ঠ গল্পের পুরস্কার প্রাপ্ত

হেমলকের নিমন্ত্রণ

বইঘর নিবেদন

সুজন দেবনাথ

সক্রেটিস, প্লেটো, হেরাডটাস, সফোক্লিস-এর সময়ে
গণতন্ত্র, থিয়েটার, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্ম নিয়ে উপন্যাস

বইঘর

হেমলকের নিমন্ত্রণ

সুজন দেবনাথ

বইঘর.নেট ও ব্ল্যাক পার্ল এলিট নিবেদন

একটি শুভম ও ব্রহ্মচারী প্রয়াস

অন্বেষা প্রকাশন

ব্যাক কভার থেকে

‘Undoubtedly, this is a unique and wonderful addition to the world literature on Socrates. This crispy and vivid story connects all the great men of the Greek Classical Time in a brilliant way.’

- Dr. Promachos Soubassakis,
Socrates Community Athens, Greece

‘গ্রিকরা বিয়ের প্রস্তাব দেয় আপেল দিয়ে। আপেল হলো ভালোবাসার প্রতীক। একটি আপেলকে মাঝখানে কাটলে হৃদয়ের মতো দুটি খণ্ড হয়। তার মানে একটি আপেলে দুটি হৃদয় মিশে আছে। প্রেমের জন্য এর চেয়ে ভালো প্রতীক আর হয় না। কোনো মেয়েকে পছন্দ হলে গ্রিকরা তার দিকে ছুড়ে দেয় একটি আপেল। মেয়েটি যদি আপেলটি ধরে মিষ্টি হাসি দেয়, তার মানে মেয়েটি রাজি। আর আপেল না ধরলে মেয়েটি রাজি না।

সক্রেটিস আপেল হাতে তাকিয়ে আছে জেনথিপির দিকে । জেনথিপি শব্দটির মানে হলুদ ঘোড়া। মেয়েটি ঘোড়ার মতোই, ঘাড়টা অনেক লম্বা। সক্রেটিস ভাবছে আপেলটি ছুড়বে, নাকি ছুড়বে না? জেনথিপি সক্রেটিসকে চিনে। শুনেছে এই লোক খুব জ্ঞানী, তবে কোনো কাজ করে না। খালি পকেটে জ্ঞান নিয়ে ঘোরে। জেনথিপির বুক কাঁপছে। এই লোক তো জ্ঞানী, প্রেমিক না। তো তার হাতে আপেল কেন! জ্ঞানী লোক কি ভালোবাসতে পারে? জ্ঞান আর প্রেম কি এক ঘরে থাকতে পারে? জেনথিপির বুকের কাঁপন বেড়ে যাচ্ছে। সে কী করবে? পালিয়ে যাবে? কিন্তু পা তো নড়ছে না। এখন তার সারা শরীর কাঁপছে। তবু কেন যেন কাঁপতে তার খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে মহাসাগরের অতল থেকে একটি সুর ভেসে আসছে। খুব মিষ্টি সে সুর। মন বলছে-এই সুর যেন কোনোদিন বন্ধ না হয়। সে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ভাবছে, চোখ খুলে দেখবে সামনে সক্রেটিস।’

-‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’

ব্ল্যাকপার্ল – ব্রহ্মচারী নিবেদন

ফ্ল্যাপ থেকে

কয়েকজন মহাপ্রতিভাবান মানুষ অদ্ভুত এক পাগলামি শুরু করেছিলেন।

তাদের মধুর সেই পাগলামিতে জন্ম হয়েছিল সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণতন্ত্র, থিয়েটার, চিকিৎসা, দর্শনসহ মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সবকিছু। সেই পাগলামিকে একটি মাত্র মিষ্টি গল্পে নিয়ে এসেছেন কথা সাহিত্যিক সুজন দেবনাথ।

সক্রেটিস একজন তুমুল প্রেমিক। তিনি স্ত্রীর সাথে খুনসুটিমাখা ঝগড়া করছেন, চুপিচুপি যাচ্ছেন শহরের সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়ে আসপাশিয়ার কাছে, আবার বয়স্ক এক নারীর কাছে শিখছেন প্রেম। সেই প্রেম থেকে প্লেটো খুঁজছেন শরীরের আকর্ষণ ছাড়া সাধু-সন্ন্যাসী ধরনের নতুন এক প্রেম। তার নাম প্লেটোনিক প্রেম। ইতিহাসের জনক হেরোডটাস লিখতে শুরু করছেন পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। থেলিস নামে এক লোকের ভাবনা থেকে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন জিনিস, নাম বিজ্ঞান। শুরু হচ্ছে অলিম্পিক গেমস, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সভ্য উপায়ে মানে মারামারি কাটাকাটি না করে বীর হওয়ার লড়াই। এথেন্সের মানুষ আবিষ্কার করছে গণতন্ত্র । পাহাড়ের উপরে বসছে পৃথিবীর প্রথম সংসদ। পিথাগোরাস বের করেছেন জ্যামিতির সূত্র, গোল্ডেন রেশিও। সেই রেশিও দিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ভবন পার্থেনন ডিজাইন করছেন শিল্পী ফিডিয়াস । চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিপোক্রাটিস ডাক্তারদের জন্য লিখতে বসলেন ‘হিপোক্রাটিক শপথ’। সক্রেটিস খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে দুষ্টুমি মিশিয়ে ‘সুন্দর জীবন’-এর গল্প বলছেন। তার দুষ্টুমিভরা প্রশ্ন থেকে প্লেটো শিখছেন জীবনের অর্থ । জন্ম হচ্ছে দর্শন ও নৈতিকতা। ম্যারাথন ময়দান থেকে এক দৌড়ে যুদ্ধের খবর আনতে গিয়ে মারা যাচ্ছেন ফিডিপিডিস। সেই থেকে শুরু হচ্ছে ম্যারাথন দৌড়। লাখো সৈন্যের মোকাবেলায় মাত্র তিনশ জনকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন স্পার্টার রাজা লিওনিদাস। এথেন্সের থিয়েটারে এসেছেন প্রথম অভিনয় শিল্পী থেসপিস। মঞ্চে উঠেছেন ট্রাজেডি নাটকের জনক ইস্কিলাস, অভিনয় করছেন ‘প্রমিথিউস বাউন্ড’। সফোক্লিস লিখতে বসেছেন সর্বকালের সেরা ট্রাজেডি ‘রাজা ইদিপাস’। হোমারের কবিতা আবৃত্তি করছেন ইউরিপিডিস। তিনি পাহাড়ের গুহায় বসে লিখছেন ‘ট্রয়ের মেয়েরা’। কমেডি নাটকের জনক

এরিস্টোফানিস ভয়ংকর মিথ্যা কথায় সক্রেটিসকে আক্রমণ করে লিখছেন প্রহসন নাটক ‘মেঘ’। সেই ক্ষোভে প্লেটো তার সব নাটক কবিতা পুড়িয়ে দিয়ে কবি থেকে হয়ে যাচ্ছেন কঠিন দার্শনিক। তার আদর্শরাষ্ট্র থেকে নির্বাসন দিচ্ছেন কবি-সাহিত্যিকদের। কিছু মানুষের গোঁড়ামির জন্য হত্যা করা হচ্ছে সক্রেটিসকে। তিনি আসামী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন আদালতে, পালানোর সবরকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পালাচ্ছেন না, শান্তভাবে চুমুক দিচ্ছেন হেমলক পেয়ালায়।

পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়ে মানুষের জ্ঞানের জন্মের রোমাঞ্চকর বিষয়গুলো জীবন্ত করে একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গল্প বাংলাভাষীদের জন্য নিয়ে এসেছেন সুজন দেবনাথ। সেই মিষ্টি গল্পটির নাম-‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’।

হেমলকের নিমন্ত্রণ

সুজন দেবনাথ

অন্বেষা প্রকাশন

হেমলকের নিমন্ত্রণ
সুজন দেবনাথ
স্বত্ব © লেখক
সপ্তম মুদ্রণ: মে ২০২৪
ষষ্ঠ মুদ্রণ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
পঞ্চম মুদ্রণ: জুন ২০২৩
চতুর্থ মুদ্রণ: অমর একুশে বইমেলা ২০২২
তৃতীয় মুদ্রণ: জুন ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ: অমর একুশে বইমেলা ২০২১
প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে বইমেলা ২০২০
অন্বেষা ৭৬৬

প্রকাশক
মো. শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭১১০১৭২, +৮৮ ০১৯১১ ৩৯৪৯১৭
প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অক্ষর বিন্যাস : ইমন খান
মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স, ২নং শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
আন্তর্জাতিক পরিবেশক
মুক্তধারা : জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক, আমেরিকা
সঙ্গীতা লিমিটেড : ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, ইউকে
প্রশান্তিকা বইঘর : ২০৩ লেকেম্বা স্ট্রিট, অস্ট্রেলিয়া
বুকস অব বেঙ্গল : ১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন
কলেজ স্কয়ার, কলকাতা, ভারত
মূল্য : ৮০০.০০ টাকা মাত্র

Hemlocker Nimontron By Sujon Debnath

First Published Ekushey Book Fair 2020

Md. Shahadat Hossain

Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka, Bangladesh

Web : www.anneshabook.com, www.facebook.com/aannesha

Price : Tk. 800.00 only | US $ 25.00

ISBN : 978 984 9496908 | Code : 766

উৎসর্গ

আমার মা শ্রীমতি মিরা দেবনাথ
বাবা জনাব সুধাংশু দেবনাথ
যাদের আশীর্বাদ আর স্নেহস্পর্শ
এই সুদূর এথেন্সে আমার দুঃখ রাতের ধ্রুবতারা

পূর্বকথা

আমি মনে করি মানুষ গল্পজীবী প্রাণী। মানুষের জীবন একটি গল্প। মানুষ প্রতি মুহূর্তে গল্প বানায়। প্রয়োজনে বানায়, এমনি এমনি ও বানায়। মানুষ গল্প শুনতেও ভালোবাসে। মানুষ গল্পভুক। মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি যে মানুষ কোনো বিষয়ের শুধু গল্পটুকু মনে রাখে। বাকি সবকিছু ভুলে যায়। আমাদের জীবনের প্রথম দিন থেকে যা কিছু ঘটেছে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলোকে আমরা কোনো না কোনোভাবে গল্প বানিয়ে ফেলতে পেরেছি, শুধু সেগুলোই আমাদের মনে আছে।

সেজন্য আমি যা কিছু বলি, গল্পের মতো বলি। যা কিছু লিখি, গল্পের মতো লিখি। আমি নিজে একটি গল্পজীবী প্রাণী— এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেজন্য গল্পেই নিয়ে এসেছি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল একটি সময়কে। সেই সময় যখন ইউরোপের সভ্যতা ছিল আঁতুড়ঘরে। আঁতুড়ঘরের নাম এথেন্স। এথেন্স শহরে মাত্র দুটি প্রজন্মে জন্ম নিয়েছিল বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণতন্ত্র, সাহিত্যের ট্র্যাজেডি ও কমেডি, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্য, নৈতিকতাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখা। সেই জন্মের গল্পই 'হেমলকের নিমন্ত্রণ'।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। যে বই হাতে নিই, একটি জিনিস কমন। বইটিতে যদি জ্ঞানের কোনো কথা থাকে, তবে সেই জ্ঞানের জন্ম হয়েছে গ্রিসে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেকোনো শাখার ব্যাপারে একটি কথা নিশ্চিত, সেই শাখার জনক গ্রিসের কোনো এক মানুষ। ভাবতাম— গ্রিসের মানুষের কি অন্য কোনো কাজ নেই, শুধু একটির পর একটি বিদ্যার জন্ম দিয়েছে?

ঘটনা আসলেই তাই। সেই সময় সত্যিই গ্রিসের কিছু মানুষের কোনো কাজ ছিল না। সব কাজ করত দাসেরা। ধনীদের ছিল অফুরন্ত সময়। মানুষের স্বভাব হলো— কাজ না থাকলে, মানুষ আমোদ-ফূর্তি করে, বিলাসে গা ভাসায়। কিন্তু গ্রিকরা তাদের অফুরন্ত সময় ভোগ-বিলাসে নষ্ট করেননি। অনেকেই শুধু জ্ঞানচর্চা করেছেন। সেই চর্চার ফলে জন্ম নিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। সময়টি ছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতক। ঐ সময় এথেন্স এবং আশেপাশের কয়টি শহরে জন্ম নেয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা। একটি সময়ে একটি শহরে বুদ্ধিবৃত্তির ঐ রকম সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে আর হয়নি।

সেই সময়ের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আমি চাকরি করতে এলাম এথেন্সে। মাত্র এয়ারপোর্টে নেমেছি। আমার স্ত্রী নিবেদিতা বলল, 'আচ্ছা, এখানে হেমলক কোথায় খায়?' প্রশ্ন শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হেমলকের মতো মারাত্মক বিষ খেতে হবে নাকি! ভয়ে ভয়ে নানান প্রশ্ন করে বুঝলাম, 'হেমলক কোথায় খায়' মানে হলো— সক্রেটিস কোন জায়গায় হেমলক পান করেছিলেন? তো খুঁজতে শুরু করলাম- সক্রেটিসের হেমলক পানের জায়গাটি। সেই খোঁজ থেকেই এই বইয়ের শুরু।

আমার অনুসন্ধান ছিল মোটামুটি তিনভাবে। সেই সময়টিকে পড়ে ফেলা, তারপর নিজের চোখে ঘটনার জায়গাগুলো দেখা, এরপর জটিলতা থাকলে কোনো গ্রিক বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলা। এই অনুসন্ধান থেকেই 'হেমলকের নিমন্ত্রণ'। গল্পের পটভূমি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক। বছর হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ থেকে ৩৯৯ অব্দ পর্যন্ত। গণতন্ত্রের জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫০৮ অব্দে আর সক্রেটিসের মৃত্যু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতককে পণ্ডিতগণ বলেন গ্রিসের ক্লাসিক্যাল সময়। আমি ঐ সময়টাকে ধরতে চেয়েছি।

অনুভব করতে চেয়েছি— সক্রেটিস কীভাবে এথেন্সের আগোরার পথে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কঠিন দর্শনের কথা সহজ করে বলতেন। কারা কোন আদালতে ঠিক কীভাবে বিচারের নামে হত্যা করল সক্রেটিসকে। হেরোডোটাস কোথায় বসে কোন অবস্থায় লিখতে শুরু করলেন পৃথিবীর প্রথম 'ইতিহাস'। গণতন্ত্রের মতো একটি অভিনব ব্যবস্থা কোন মানুষগুলো কীভাবে আবিষ্কার করল। চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রাটিস ঠিক কোন সময় ডাক্তারদের জন্য লিখলেন তাঁর চমৎকার 'হিপোক্রাটিক শপথ'।

পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যের কাঠামো গ্রিক ট্র্যাজেডি আর কমেডি। এই গল্পে আমি দেখতে চেয়েছি সেই থিয়েটার, যেখানে গ্রিক ট্র্যাজেডি জন্ম নিয়েছিল। কথা বলতে চেয়েছি পৃথিবীর প্রথম অভিনয়শিল্পীদের সাথে। ঢুকতে চেয়েছি হোমারের অন্ধ কুঠুরিতে, সফোক্লিসের নাটক লেখার মনে, ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডির গুহায়। আমি তাদের লেখাকে তাদের মতো করে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭২ অব্দে ইউরোপের প্রথম ট্র্যাজেডি লেখেন এস্কিলাস। ট্র্যাজেডির নাম 'Persia বা পারস্য'। মানুষ যত সুখেই থাকুক না কেন, মানুষের অন্তরে চিরকালের একটি দুঃখ-কোঠা আছে, মানুষ নিজের অজান্তেই নিজের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়। তাই বেদনার সাহিত্যই মানুষের মনে গভীরভাবে থেকে যায়। সেজন্য আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কালজয়ী সাহিত্যের প্রায় সবই আসলে ট্র্যাজেডি। সেই ট্র্যাজেডি কীভাবে লেখা শুরু করলেন এস্কিলাস, কী ছিল তার প্রেক্ষাপট, সেগুলোই গল্পের মধ্যে নিয়ে এসেছি।

এরিস্টটলের মতে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি সফোক্লিসের 'রাজা ইদিপাস'। রাজা ইদিপাসের কাহিনি পড়েছে আর ধাক্কা লাগেনি, এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। আমি মানতেই পারতাম না— নিজের মাকে বিয়ে করে ফেলার মতো নির্মম আর ভয়াবহ কাহিনি সফোক্লিসের মতো একজন বিশাল লেখক কেন লিখলেন! সেই প্রশ্নটি আমার একেবারে ছোট্টকালের। এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেউ দিতে পারেনি এই গল্পে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। আমি দেখতে চেয়েছি, ঠিক কখন সফোক্লিস উচ্চারণ করলেন, 'আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধুই ভালোবাসার জন্য, কখনই ঘৃণা করার জন্য নয়।'

প্লেটো ছিলেন একজন কবি। সক্রেটিসের ছোঁয়ায় সেই কবি প্লেটো কবিতা ছুড়ে ফেলে হয়ে গেলেন কঠিন নির্দয় দার্শনিক। তার কল্পনার 'আদর্শ রাষ্ট্র' থেকে কবি-সাহিত্যিকদের

দিলেন নির্বাসন। প্লেটোর কবি থেকে দার্শনিকে বিবর্তন পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছে। প্লেটো দর্শন না লিখলে পৃথিবীই হতো অন্যরকম। প্লেটোর এই পরিবর্তনকে আমি খুঁজতে চেয়েছি।

ইউরোপে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বদলে যাওয়া দেখতে চেয়েছি। কীভাবে মিশরের অনুভূতিহীন ভাস্কর্য বদলে গিয়ে মানুষের মতো হলো, ঠিক কখন পাথরগুলো হাত-পা বাঁকা করে আড়চোখে তাকাতে শুরু করল, সেটি খুঁজতে চেয়েছি।

ঐ সময় এক ঝাঁক মনীষী মেতে উঠেছিলেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। আমি সেই উল্লাসটাকে একটি গল্পে ধরতে চেয়েছি। সৃষ্টিশীল মানুষের জীবন এবং সৃষ্টিকে একটি মাত্র কাহিনিতে আনতে চেয়েছি। তাতে আমি আশ্রয় করেছি সক্রেটিসের ওপর। সক্রেটিসই এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

এই উপন্যাসের কোনো চরিত্রই কাল্পনিক নয়। অন্যান্য চরিত্র হচ্ছে : দার্শনিক প্লেটো; ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস; ট্র্যাজেডি নাটকের তিন পিতা— সফোক্লিস, ইউরিপিডিস ও এস্কিলাস; কমেডি নাটকের জনক এরিস্টোফানিস; চিকিৎশাস্ত্রের জনক হিপোক্রাটিস; এথেন্সের গণতন্ত্র ও জ্ঞানচর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক পেরিক্লিস; নারী দার্শনিক আসপাশিয়া; স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রধান শিল্পী ফিডিয়াস; সক্রেটিসের স্ত্রী জেনথিপি এবং তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু দার্শনিক ক্রিতো, চেরোফোন এবং সিমন। এছাড়া গল্পের ছায়ায় আছেন দার্শনিক পিথাগোরাস, বিজ্ঞানের জনক থেলিস এবং নগর পরিকল্পনা শাস্ত্রের জনক হিপোডেমাস।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যেহেতু সক্রেটিস, তাকে নিয়ে লেখার উৎস বলা প্রয়োজন। সক্রেটিস নিজে তার জীবনে একটি অক্ষরও লিখেননি। সক্রেটিস বিষয়ে প্রধান রেফারেন্স অবশ্যই প্লেটোর রচনাবলি। প্লেটো ছাড়া সক্রেটিসকে দেখেছেন এবং তাকে নিয়ে লিখেছেন এমন মানুষ আছেন দুজন। তারা হলেন— সক্রেটিসের ছাত্র জেনোফোন এবং নাট্যকার এরিস্টোফানিস। এই তিনজনের লেখায় সক্রেটিস তিন রকম। প্লেটোর সক্রেটিস অসাধারণ এক বিপ্লবী। তিনি যুগের চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে থাকা একজন মানুষ। আর জেনোফোনের সক্রেটিস খুবই সাধারণ, তিনি কারও সাতে-পাঁচে নেই। উল্টোদিকে এরিস্টোফানিসের সক্রেটিস ভয়াবহ জঘন্য একজন মানুষ, তিনি দোকান দিয়ে চিন্তা বিক্রি করেন, তরুণদের ভয়ংকর রকম কুপথে নিয়ে যান। তাই এদের লেখা থেকে কে যে প্রকৃত সক্রেটিস, তা কেউ জানে না। প্লেটোর অসাধারণ গদ্য আর তীক্ষ্ণ যুক্তির কারণে আমরা তার রচনার সক্রেটিসকেই প্রকৃত সক্রেটিস হিসেবে ধরে নিই। কিন্তু সমস্যা হলো — প্লেটো পৃথিবীর সর্বকালের সেরা সাহিত্যিকদের একজন। তিনি দর্শন লিখেছেন সাহিত্যের মতো সংলাপ দিয়ে। সেই সংলাপের মূল বক্তা সক্রেটিস। পণ্ডিতেরা মনে করেন, প্লেটো তার কিছু বইয়ে সক্রেটিসের প্রকৃত জীবনকথা লিখেছেন আর বেশিরভাগ বইয়ে প্লেটোর নিজের ধারণা সক্রেটিসের মুখে সংলাপ হিসেবে বসিয়ে দিয়েছেন। তাই

প্লেটোর লেখার কোনটি সক্রেটিসের কথা আর কোনটি প্লেটোর নিজের কথা, সেটি প্লেটো ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারেন না। সেজন্য প্রকৃত সক্রেটিসকে কোনোভাবেই নিশ্চিত করে জানা সম্ভব নয়। সক্রেটিস সব সময়ই একটি ধোঁয়াশা। সক্রেটিসকে নিয়ে এই ধোঁয়াশাকে পণ্ডিতগণ বলেন 'সক্রেটিস সমস্যা'। এই সমস্যাকে মেনে নিয়েই আমি মানুষ সক্রেটিসকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

প্লেটোর রচনা ছাড়া হেরোডোটাসের ইতিহাস, হোমারের ইলিয়াদ ও অডিসি, এরিস্টটলের রচনা এবং তখনকার নাট্যকারদের লেখা নাটকগুলোই সেই সময়কে বোঝার একমাত্র উপায়। এরপরে আড়াই হাজার বছর ধরে সেই সময়কে নিয়ে যারাই লিখেছেন, লেখকের নিজের কল্পনা মিশে গেছে তাদের লেখায়। সেখান থেকে শুদ্ধ কাহিনি বের করা অসম্ভব। তাই আমার কাহিনি একশভাগ শুদ্ধ বলে দাবি করব না। তবে আমি জেনে বুঝে কোনো ভুল তথ্য দেইনি। আমি কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনকে বদলে দেইনি। একটিও কাল্পনিক চরিত্র নেইনি। এরপরেও যে ভুল রয়ে গেল, তার জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সক্রেটিসের মুখের কথাটিই বলি— 'আমি শুধু একটি জিনিসই জানি, সেটি হলো— আমি আসলে কিছুই জানি না।'

এই গল্পে সক্রেটিস একইসাথে একজন দার্শনিক এবং প্রেমিক। অনেক পণ্ডিত সক্রেটিসকে সমকামী বলেন। এটি নিয়ে পড়াশুনা করে আমার মনে হয়েছে, সেই সময়ে সমাজে সমকামিতা ছিল। কিন্তু সক্রেটিস বিষয়টির বিরোধী ছিলেন। প্রেম নিয়ে প্লেটোর লেখায় ছেলে চরিত্র আছে, কিন্তু সক্রেটিসের প্রেমের গুরু হলেন ডিওটিমা নামের একজন নারী এবং তার প্রেম নারী-পুরুষের প্রেম। শরীরের আকর্ষণ ছাড়া সাধু- সন্ন্যাসী ধরনের এক প্রেমের কথা প্লেটো বলেছেন, যেটিকে 'প্লেটোনিক প্রেম' বলা হয়। আমার মনে হয়েছে সেটি প্লেটোর নিজের ধারণা। সক্রেটিস একজন তুমুল প্রেমিক এবং তিনি নারী-পুরুষের প্রেমকেই গুরুত্ব দিতেন। তিনি প্রেমের সুযোগকে অবহেলা করেননি। প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম' ডায়ালগে সক্রেটিস বলেছেন, 'আমি শুধু একটি জিনিসেই বিশ্বাস করি, সেটি হলো ভালোবাসা'।

আমাকে যেটি কষ্ট দিয়েছে, সেটি হলো— এথেন্সের এমন সৃষ্টিশীল সময়ে কোথাও মেয়েরা নেই। মেয়েদের প্রতি এমন অবিচার অন্য কোনো যুগের মানুষ করেননি। আমার ধারণা— মেয়েদের অংশ নিতে দেওয়া হয়নি বলেই, এথেন্সের অবিশ্বাস্য সুন্দর যাত্রাটি মাত্র দুটি প্রজন্মেই শেষ হয়ে গেছে। এই বই লিখতে গিয়ে নারী চরিত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু নারী ছাড়া কি সাহিত্য হয়? অবশেষে অনেক খুঁজে দুজন নারীকে নিয়েছি। একজন সেই সময়ের সবচেয়ে বিদুষী নারী দার্শনিক আসপাশিয়া, আরেকজন সক্রেটিসের স্ত্রী জেনথিপি। আসপাশিয়া এই বইয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সেই নারীবিবর্জিত জ্ঞানীদের ভিড়ে শুধু নিজের বুদ্ধি দিয়ে সময়টিকে বাজিয়েছিলেন আসপাশিয়া। আর সক্রেটিসের স্ত্রী জেনথিপির বিষয়ে আমার মনে হয়— প্লেটো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত

সব লেখক তার ওপর অন্যায় করেছেন। প্লেটো সারা জীবনে এক লাখের বেশি শব্দ লিখেছেন, সবগুলোই সক্রেটিসকে নিয়ে, কিন্তু জেনথিপির কথা বলেছেন মাত্র দুইটি জায়গায়। সব লেখক জেনথিপিকে শুধুই একজন মুখরা নারী বলেছেন। কিন্তু আমার গল্পে তিনি শুধু মুখরা নারী নন; অভিমান ও প্রেমমাখা রক্ত-মাংসের একজন নারী যিনি স্বামীকে তীব্রভাবে ভালোবাসেন, কিন্তু স্বামীর অবহেলা সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতে সারাদিন বকাঝকা করেন।

আর একটি বিষয় : দর্শন বোঝাতে প্লেটো তার লেখায় সক্রেটিসের সাথে অনেক পার্শ্ব-চরিত্র এনেছেন। আমি এসব চরিত্রকে এই বইয়ে আনিনি। সক্রেটিসের বন্ধু ক্রিতো, চেরোফোন, সিমন, এলসিবিয়াডিস এবং প্রধান শিষ্য প্লেটো এই পাঁচজনের সংলাপ দিয়েই তার দর্শনকে আনার চেষ্টা করেছি। এছাড়া গ্রিক শব্দগুলোর আমরা ইংরেজি থেকে যে উচ্চারণ পেয়েছি, গ্রিক উচ্চারণ তার থেকে আলাদা। যেমন গ্রিকরা সক্রেটিস বলে না, বলে সক্রাতুস। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজিতে যেভাবে উচ্চারণ হয় সেভাবেই রেখে দিলে বাংলাভাষীদের জন্য উপযোগী হবে। আমার ইচ্ছা ছিল এই বইতে মিথোলজির কিছুই থাকবে না। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে যে মিথগুলো জড়িয়ে গেছে, যেমন— অলিম্পিক গেমস কীভাবে শুরু হলো, এথেন্স নগর কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, কিংবা সক্রেটিসের বিচারের রায় হওয়ার পরেও যে মিথের কারণে তিনি ঊনত্রিশ দিন বেঁচে রইলেন— এমন কিছু মিথ বলতেই হয়েছে। গল্পের প্রয়োজনে হোমারের ইলিয়াদ ও অডিসির ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে হয়েছে।

ভাষার ব্যাপারে আমি এই বইয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে একুশ শতকের তরুণদের মুখের ভাষাটিকে প্রমিতভাবে আনতে চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি সব যুগেই একটি প্রমিত মানদণ্ড রেখে সেই যুগের মুখের ভাষাটিই সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। এছাড়া আমার মনে হয়েছে সক্রেটিস সব সময় wit আর রসিকতা মিশিয়ে তরুণদের সাথে কথা বলতেন। সেজন্য এই বইয়ে আমি ইচ্ছে করেই এই সময়ের তরুণদের মুখের প্রাঞ্জল ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করেছি।

এই বইয়ের গবেষণার কাজে গ্রিসের অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে সাহায্য করেছে। যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের নাম না বললে অন্যায় হবে, সেগুলো হলো— এথেন্স একাডেমি, আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম অব এথেন্স, হিপোক্রাটিস ফাউন্ডেশন এবং এক্রোপলিস মিউজিয়াম। সক্রেটিস মানুষটিকে বুঝতে 'সক্রেটিস কমিউনিটি' নামক এথেন্সের একটি সংগঠনের ড. ইফস্ট্রাটিওস সুব্বাসাকিস, এভমিখানোস মোসকোনাস এবং এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ডিমিত্রি ভাসিলিয়াদিস আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। মোসকোনাস সাহেব হলেন একমাত্র জীবিত মানুষ যিনি সক্রেটিসের সময়ের ডায়ালেক্টে কথা বলতে পারেন।

বইটি শুরু করার পেছনে নিবেদিতার জ্বালাতন অনেকখানি দায়ী। প্রথম পাঠক এবং পরামর্শকও সে। বইয়ের সার্বিক বিষয়ে অসংখ্য গঠনমূলক পরামর্শ ও প্রেরণা দিয়েছেন গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন। প্রকাশক জনাব মো. শাহাদাত হোসেন অতি স্বল্প সময়ে বইটি প্রকাশে যে আগ্রহ ও মমত্ব দেখিয়েছেন, তাতে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশের জন্য আমি যার কাছে সর্বান্তঃকরণে ঋণী, তিনি হলেন কবি অনিকেত রাজেশ। তার কবিত্বমাখা ভালোবাসা ছাড়া এই বই আলোর মুখ দেখত না।

'হেমলকের নিমন্ত্রণ' শেষ হয়েছে সক্রেটিসের মৃত্যু দিয়ে। প্লেটোর একাডেমি প্রতিষ্ঠা, এরিস্টটলের দর্শন-বিজ্ঞান এবং আলেকজান্ডারের বিশ্ববিজয় এখানে আসেনি। সেই সময়টি নিয়ে ভবিষ্যতে লিখব আশা করি।

সুজন দেবনাথ
ফেব্রুয়ারি ২০২০, এথেন্স, গ্রিস

পরিমার্জিত সংস্করণের কিছু কথা

‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’ বাংলাভাষী মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছে। সেই সাথে সক্রেটিসের নগর এথেন্সের সক্রেটিস অনুরাগীরাও গল্পটি অনেক পছন্দ করেছেন। ‘সক্রেটিস কমিউনিটি’ নামে এথেন্সের একটি সংগঠন ‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’ এর গল্পকে সক্রেটিস বিষয়ে এই বছরের সেরা বই হিসেবে নির্বাচিত করে এবং গল্পটি নিয়ে এই বছর সক্রেটিসের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

দেশ-বিদেশের মানুষ গল্পটি এত বেশি পছন্দ করায় অন্য রকম ঝামেলা হয়েছে। সৃষ্টিশীল মানুষদের কাহিনি নিয়ে অনেক পরামর্শ এবং প্রশ্ন এসেছে। আমি বাধ্যগত ছাত্রের মতো সেগুলো রিভিউ করতে চেষ্টা করেছি এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। তাতে দ্বিতীয় সংস্করণে বেশকিছু পরিমার্জন এসেছে, নতুন করে যুক্তও হয়েছে কিছু বিষয়। এর ফলে প্রথম সংস্করণ থেকে বই বড় হয়ে গেছে। তবে একটি পরামর্শ সঠিক মনে হলেও আমি নেইনি। সেটি হলো, এথেন্সের সক্রেটিস বিশেষজ্ঞ জনাব মোসকোনাস সাহেবের মতে, ‘সক্রেটিস পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ কিনা সেটি জানতে ডেলফির ওরাকলের কাছে তার বন্ধু চেরোফোন একা গিয়েছিলেন, সক্রেটিস সাথে যাননি। ডেলফিতে একজন নাকি দুজন গিয়েছিলেন, সেটি স্পষ্ট করে আমি কোনো ইংরেজি বইয়ে কিছুই পাইনি। তবুও জনাব মোসকোনাস সাহেবের কথাই সঠিক ধরে নিয়েছি। কিন্তু এই গল্পে ডেলফিতে চেরোফোন আর সক্রেটিসের যে হিউমারটুকু আছে, সেটি পাল্টাতে মন চাইল না। থাকুক না, চেরোফোনের কিছু মজা।

বইটি দ্বিতীয় সংস্করণে পরিমার্জনের সময় গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব আসুদ আহমেদ-এর স্নেহপূর্ণ পরামর্শ ও উৎসাহ আমি কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বইটি সাহিত্যানুরাগীদের সাথে সাথে গবেষকদের কাছেও সমাদৃত হয়েছে। তাতেও একটি সমস্যা হয়েছে। পণ্ডিত বন্ধুদের স্বভাব হলো সব সময় কঠিন কঠিন কাজ ধরিয়ে দেওয়া। তাদের কথা বেশি শুনলে জীবন কয়লা হয়ে যেতে পারে। কয়েকজন পণ্ডিত বন্ধুর কথায় এই সংস্করণে অনেকগুলো ফুটনোট (টিকা) দিয়েছি। ফুটনোটে ইংরেজি নামও সংযুক্ত করলাম।

সুজন দেবনাথ
নভেম্বর ২০২০, এথেন্স, গ্রিস

১

‘আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধুই ভালোবাসার জন্য,
কখনই ঘৃণা করার জন্য নয়।’
— সফোক্লিস

এই বয়সের ছেলেরা খুব সহজেই যুবতিঘটিত সমস্যায় পড়ে।

কিন্তু এই ছেলেটি কোনো যুবতিঘটিত সমস্যায় পড়েনি। তার সমস্যা যুবকঘটিত। সে এক দুষ্ট যুবকের খপ্পরে পড়েছে। শুধু খপ্পরে পড়েনি, একেবারে দুষ্ট যুবকটির চ্যালা হয়ে গেছে। তার সাথে দিনরাত টো টো করে। তার কথাতেই ওঠে, তার কথাতেই বসে। মা-বাবাকে মানে না। দুষ্ট যুবকের সাথে মিশে সে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাকে সুপথে আনতে বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেছেন। ঝাড়ফুঁক করেছেন, তুকতাক করেছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি।

ছেলেটির নাম ক্রিতো[১]। আর যে দুষ্ট যুবক তাকে নষ্ট করছে, তার নাম সক্রেটিস[২]। সক্রেটিসের বয়স বাইশ। আর ক্রিতো এবার বিশ বছরে পড়েছে।

তারা এথেন্স শহরের বাসিন্দা। ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এজিয়ান সাগরের তীরে তাদের শহর এথেন্স। পাহাড় ঘেরা এই শহরটি খুবই মনোরম। একেবারে চোখ-জুড়ানো। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, নীল সাগরে পা ভিজিয়ে পাহাড়কে ফাঁকি দিয়ে আকাশের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে শহরটি। সেই কথায় কান রাখলে বোঝা যায়— এটি আনন্দের শহর, জ্ঞানের শহর, শান্তির শহর।

এই শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইমিতোস নামক একটি পাহাড়ের কোলে সক্রেটিস ও ক্রিতোর বাড়ি। পাড়াটির নাম এলোপেকি। এই পাড়ায় ঘন সবুজ জলপাই গাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো লাল-সাদা বাড়ি। সেগুলোর মধ্যে যে বাড়িটি সবচেয়ে ছোট, সেটি সক্রেটিসের বাবার; আর যে বাড়িটি সবচেয়ে বড়, সেটি ক্রিতোর বাবার।[৩]

ক্রিতোর বাবা বিরাট ধনী মানুষ। এমন ধনী যে, হাত ঝাড়া দিলেই ঝরঝর করে টাকা-পয়সা পড়ে। মারাত্মক রকমের ধনীরা বড় বড় সমস্যা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু ছোটখাটো আলতু-ফালতু সমস্যায় খুবই কাহিল হয়ে যায়। ক্রিতোর পিতাও সেরকম একটি ফালতু সমস্যায় কাহিল হয়ে গেছেন। তার সমস্যার নাম ‘সক্রেটিস’।

সক্রেটিস তার পাশের বাড়ির ছেলে। ছেলেটি কোনো কাজের নয়। দিনরাত খালি পায়ে ঘোরে। কাজ-কর্ম কিছুই করে না। সে নাকি জ্যোৎস্নাভুক— চাঁদের আলো খেয়ে বাঁচে। সংসারের কোনোকিছুতেই তার বিন্দুমাত্র নজর নেই। বাবা- মা অনেক বোঝায়। কিন্তু বুঝ মানার মতো ছেলে সক্রেটিস নয়।

ইদানীং সক্রেটিসের একটি রোগ হয়েছে— প্রশ্নরোগ। সে সবকিছুতে প্রশ্ন করে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। বিনা প্রশ্নে সে কিচ্ছু মেনে নেয় না। মুরুব্বিরা কিছু বললে অন্য সব ছেলে একবাক্যে মেনে নেয়, কিন্তু সক্রেটিস মানে না। পাল্টা প্রশ্ন করতে থাকে। তার প্রশ্নের যন্ত্রণায় মুরুব্বিরা অস্থির হয়ে যায়।

সক্রেটিসের এই প্রশ্নরোগ ভীষণ ছোঁয়াচে। কোনো এক রহস্যময় কারণে তার সাথে যে মিশে, সেও প্রশ্নরোগে আক্রান্ত হয়। সেও সবকিছুতে প্রশ্ন করতে শুরু করে। সক্রেটিসের কাছে একবার এলে তরুণরা অন্ধের মতো তাকে অনুকরণ করতে থাকে। ইলেকট্রিসিটির ছোঁয়ায় ধাতু যেমন ইলেকট্রিফাইড হয়, তেমনই সক্রেটিসের কাছে এলেই তরুণরা হয়ে যায় সক্রেট্রিফাইড।

ক্রিতোও সম্প্রতি সক্রেট্রিফাইড হয়ে পড়েছে। সেও এখন সবকিছুতে প্রশ্ন করে। মুরুব্বিদের মানে না। কিন্তু ক্রিতোর পিতা কিছুতেই ছেলেকে নষ্ট হতে দেবেন না। যে করেই হোক, তিনি সক্রেটিসের হাত থেকে পুত্রকে বাঁচাবেনই। সেজন্য তিনি মাঝে মাঝেই ছেলেকে মারধর করেন। যখন তখন উদ্ভট উদ্ভট উপায়ে শুরু করেন কঠিন পুত্রশাসন।

এই মুহূর্তে পুত্রশাসন চলছে।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। পাহাড় চুঁইয়ে আঁধার নামছে। আলো-আঁধারির রহস্যময় পরিবেশে এই মুহূর্তে ক্রিতোর পিতা পুত্রশাসন করছেন। কঠিন শাসন। বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে ছেলেকে লাঠি দিয়ে মারছেন।

পুত্রশাসন দেখতে উঠানে অনেক মানুষের ভিড়। কিন্তু ভিড়ের মানুষ হাসছে। কারণ পিতার কাণ্ড-কারখানা দেখে কারওই মনে হচ্ছে না যে, এখানে পুত্রশাসন হচ্ছে। মনে হচ্ছে থিয়েটার চলছে। পিতার হাবভাব থিয়েটারের নায়কের মতো। হাতে একটি নকশি লাঠি। লাঠিতে লাল-সাদা ডোরাকাটা নকশা। লাঠিটি মাথার উপর ঘুরাচ্ছেন আর উচ্চ স্বরে আবৃত্তি করছেন মহাকবি হোমারের[৪] কবিতা। কোনো এক অদ্ভুত কারণে তিনি ছেলেকে শাসন করছেন কবিতার ছন্দে। কিন্তু কবিতা ভালো মুখস্ত নেই। একটু পর পর ভুলে যাচ্ছেন। কবিতা ভুলে গেলেই আঘাত করছেন ছেলেকে। যেন সব দোষ কবিতার। সব দোষ কবি হোমারের।

ছেলেকে শাসন করতে তিনি অনেক কষ্টে হোমারের একটি কবিতার চার লাইন মুখস্ত করেছেন। পুত্রশাসনের কড়া কবিতা। কিন্তু দরকারের সময় ভুলে গেছেন। শুধু দুই লাইন মনে আছে—

কুপিতার সুপুত্র নাহি হয় ভবে
পিতা যদি ভালো হয়, পুত্র ভালো হবে।

পরের দুই লাইন ভুলে গেছেন। কিন্তু পরের দুই লাইনই আসল। সেখানেই আছে পুত্রের প্রতি উপদেশ। সেটি কিছুতেই মনে আসছে না। তিনি কবিতা বলছেন, আর ভিড়ের লোক হো হো করে হাসছে। ভীষণ রাগে ছেলেকে শপাং শপাং বাড়ি মেরে আবার প্রথম থেকে শুরু করছেন। কিন্তু দুলাইন শেষে তিন নম্বর লাইনে এসেই আবার ভুলে যাচ্ছেন। কিছুতেই মনে আসছে না। তবু চেষ্টা করেই চলছেন, আর প্রতিবার একই জায়গায় ভুলে যাচ্ছেন।

ভিড়ের মানুষ ভীষণ মজা পাচ্ছে। এত বড় ছেলেকে ভুলভাল কবিতা বলে মারছে, তাও নকশি লাঠি দিয়ে— এমন মজা বিনা পয়সায় মিলে না। সবাই হো হো করে হাসছে। সময় যত যাচ্ছে, মানুষের হাসি তত বাড়ছে। সারা উঠান হাসিতে গমগম করছে।

এখন ক্রিতোও হাসছে। চোখ ডলতে ডলতে হাসছে। শুধু ক্রিতোর মা ভেতরের ঘরে বসে কাঁদছেন। তিনি ঘরের বাইরে আসতে পারছেন না। এথেন্সে মেয়েদের পরপুরুষের সামনে আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই তিনি ঘরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

বাবা অনেক চেষ্টা করেও কবিতার পরের লাইন মনে করতে পারলেন না। তেত্রিশ বার চেষ্টা করে তিনি কবিতায় ক্ষান্ত দিলেন। ঠিক করলেন এই জীবনে আর কোনোদিন কবিতা পড়বেন না। আজ থেকে কবিতা হলো তার সবচেয়ে বড় দুশমন। ছেলেকে সুপথে আনতে কবিতা ব্যর্থ। এখন দরকার ঝাড়ি। কঠিন ঝাড়ি।

তিনি বিশাল এক ঝাড়ি মেরে ক্রিতোকে বললেন, তোমাকে সক্রেটিসের ভূতে ধরেছে? প্রশ্নের ভূত! আজকেই ভূত ছাড়াব। নকশি লাঠি দিয়ে ছাড়াব। লাঠিতে কাজ না হলে ঝাড়ু নেব। আমার যেমন নকশি লাঠি আছে, তেমনই নকশি ঝাড়ুও আছে।

ভিড়ের থেকে একজন বলল, জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, কিন্তু নকশি ঝাড়ু কোনোদিন দেখি নাই। জিনিসটা দেখার বড়ই শখ। আলো থাকতে যদি ঝাড়ুখান বের করতেন, জীবনের একটি সাধ পূর্ণ হতো।

ক্রিতোর পিতা উত্তর দিলেন না। তিনি মজা করছেন না। ছেলে শাসনের মতো সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন।

তিনি আবার শক্ত গলায় ক্রিতোকে বললেন, আজ তোকে ধোলাই দেব। আগে লাঠি ধোলাই, তারপরে ঝাড়ু ধোলাই। জন্মের মতো সক্রেটিসকে ভুলে যাবি। বাপ-দাদার নাম ভুলে যাবি। নিজেকেও ভুলে যাবি।

ক্রিতো আস্তে আস্তে বলল, নিজেকে ভুলে যাব কী করে? আমি তো নিজেকে জানিই না।

পিতা বললেন, নিজেকে জানিস না? নিজের নাম জানিস না? বাপের নাম জানিস না?

ক্রিতো বলল, বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের নাম আমার ঠোঁটস্থ। গড়গড় করে বলতে পারি। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সক্রেটিস হঠাৎ বলল, 'নিজেকে জানো'। তারপর থেকে আমি

কেবল ঐ কথাটাই শুনতে পাচ্ছি। মাথার ভেতর কে যেন বারবার ফিসফিস করছে, 'নিজেকে জানো', 'নিজেকে জানো'।

বাবা কিছুই বুঝতে পারছেন না। 'নিজেকে জানো'– এমন একটি সাধারণ কথা নিয়ে তার ছেলে কেন এমন করছে! ছেলের মুখের দিকে ফ্যাল- ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। তাকে হতভম্বের মতো লাগছে।

ক্রিতো আবার বলল, বাবা, আপনি কি নিজেকে জানেন?

পিতা বলতে গেলেন, জানি না মানে? অবশ্যই জানি।

কিন্তু বলতে পারলেন না। ভাবছেন, আমি কি সত্যি নিজেকে জানি? নাকি জানি না! এ কেমন প্রশ্ন! এর উত্তর তার জানা নেই। উত্তর দিতে না পেরে তার রাগ আরও বেড়ে গেল। বাড়িভরা লোকের সামনে তিনি অপমানিত হচ্ছেন। এজন্য দায়ী সক্রেটিস।

পিতা চেঁচিয়ে উঠলেন, নিজেকে জানো! এমন প্যাঁচমারা কথা সক্রেটিস ছাড়া আর কে বলবে? তোর মুখে যদি আর একবারও সক্রেটিসের নাম শুনি!

বলেই আবার লাঠি উপরে তুললেন। কিন্তু এবার আর লাঠি নিচে নামাতে পারলেন না। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক লাঠিটি ধরে ফেলেছেন। লোকটি সুর করে বললেন,

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় আগুন দিলাম নিজের ঘরে
অঙ্গার হলো সোনার অঙ্গ, সেই দুঃখ বলিব কারে?

এই ভদ্রলোক একজন কবি। ক্রিতোর বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। কবি অনেক দিন বিদেশ ঘুরে এথেন্সে ফিরেছেন। তিনি সক্রেটিসকে চেনেন না।

কবি ক্রিতোর বাবাকে বললেন, কোথাকার কোন সক্রেটিসের জন্য নিজের ছেলেকে এমন করে মারছো?

ক্রিতোর বাবা বললেন, শুনলে তো— ছেলে কেমন বেআদব হয়েছে। মুরুব্বি মানে না। একটি কথা বললে বত্রিশটা কথা শুনায়। সব ঐ সক্রেটিসের কুবুদ্ধি। সে পোলাপানের মাথায় পোকা ঢুকাচ্ছে। গুঁড়া গুঁড়া পোকা। প্রশ্নের পোকা। সব বাচ্চা-কাচ্চাকে নষ্ট করে ফেলছে ঐ মহাদুষ্ট সক্রেটিস।

কবি বললেন, এথেন্সের সব বাচ্চাকে নষ্ট করে ফেলছে একটি মাত্র ছেলে? তার নাম সক্রেটিস? তাহলে তো সক্রেটিস একটি মারাত্মক জিনিস। এমন জিনিস একবার নিজের চোখে দেখতে চাই। কোথায় আছে তোমার সক্রেটিস?

উত্তর দিল ক্রিতো। বলল, চাচা চলেন, আমি আপনাকে সক্রেটিসের কাছে নিয়ে যাই। বাবাকে অনেকদিন বলেছি। বাবা সক্রেটিসের কাছে যাবেন না। বাবা সক্রেটিসকে ভয় পান।

'ভয় পান?'

ক্রিতো বলল, হ্যাঁ, এথেন্সের সব বুড়ো সক্রেটিসকে ভয় পান। যমের মতো ভয়। ওনারা সক্রেটিস-ফোবিয়ায় আক্রান্ত। সক্রেটিসকে দেখলেই দৌড়ে পালান।

কবি ক্রিতোর পিতাকে বললেন, সক্রেটিস-ফোবিয়া! মানে সক্রেটিসভীতি? ধুর্, যতসব আজগুবি কথা! চলো, আমার সাথে চলো। তোমার সক্রেটিসভীতি আজই দূর করে দেব।

ক্রিতোর বাবা কিছুই বলছেন না।

কবি আবার বললেন, একটু সাহস করো। সাহস খুবই কাজের জিনিস। সাহস বিষয়ে কবি হোমার তার 'অডিসি'[৫] বইয়ের শুরুতেই একটি চমৎকার কথা বলেছেন। 'অডিসি'র শুরুতেই অডিসিয়াসের ছেলেকে সাহস দিতে দেবী এথিনা বললেন,

যুবক, বাঁধ ভেঙে এসো, পথে নামো- সাহসী হও,
সময়ের গহ্বর থেকে নিজের নামটা জিতে লও,
যে নাম বেঁচে রবে একাল থেকে সেকাল
সব কাল পার হয়ে ঐ সুদূরের মহাকাল।

কবিতা শুনে ক্রিতোর বাবা ক্ষেপে গেলেন। তিনি একটু আগে অনেক চেষ্টা করেও কবিতার দুইটি লাইন মনে করতে পারেননি। আর তার কাছে এসে ফটর ফটর করে কবিতা বলছে। হোমারের কবিতা! রাগে তিনি হাতের নকশি লাঠি আবার মাথার উপর ঘোরালেন। বললেন, তুমি যেটি বললে, সেটি হলো বাচ্চা ছেলেকে সাহস দেওয়ার কবিতা। তুমি এই কবিতা আমাকে বলছো! আমাকে কি তোমার বাচ্চা ছেলে মনে হচ্ছে?

কবি বললেন, ভুল হয়েছে। ক্ষমা দাও। কাজের কথায় আসো। সাহস করে চলো সক্রেটিসকে একটি শিক্ষা দিয়ে আসি।

ভিড়ের মানুষ হইহই করে বলল, চলেন, চলেন, আমরাও যাই। সক্রেটিসকে শিক্ষা দিয়ে আসি।

ভিড়ের মানুষ বুঝেছে, ক্রিতোর বাবার হম্বি-তম্বি শেষ। তাই এখানের মজাও শেষ। নতুন মজা পেতে এখন সক্রেটিসকে দরকার। তাকে সামনে পেলেই নতুন কিছু ঘটবে।

একজন বলল, তাড়াতাড়ি চলেন। গোধূলি লগ্নের বেশি বাকি নাই। শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোধূলি লগ্নই সবচেয়ে উত্তম।

ক্রিতোর পিতা বললেন, আমি যাব না। আমি সত্যিই সক্রেটিসকে ভয় পাই। সত্যিই আমার সক্রেটিস-ফোবিয়া আছে।

ভিড়ের থেকে একজন বলল, ভয় তো পাবেনই। সক্রেটিস নাকি ইদানীং আসপাশিয়ার[৬] বাড়ি যায়।

কবি বললেন, কার বাড়ি যায়?

'আসপাশিয়ার বাড়ি।'

‘কে এই আসপাশিয়া?’

ক্রিতোর বাবা ইশারা করে কবিকে থামালেন। ফিসফিস করে বললেন, চুপ যাও। কুট্টি পোলাপানের সামনে মান-সম্মান যাবে। আসপাশিয়া অসাধারণ রূপসী একটি মেয়ে। কিন্তু অভদ্র পল্লিতে থাকে। তাকে নিয়ে কথা বলো না। এগুলো গুজব। সক্রেটিসের নানান দোষ আছে, কিন্তু মেয়েঘটিত দোষ নাই। আসপাশিয়ার ব্যাপারে পরে আলাপ হবে। এত মানুষের সামনে বলা যাবে না।

কবি ইশারা বুঝলেন। ক্রিতোও ইশারাটা খেয়াল করল। ভিড়ের মানুষ ফিসফিস করছে, আসপাশিয়াকে চেনো? সক্রেটিস নাকি আসপাশিয়ার বাড়ি যায়!

কবি কথা ঘুরিয়ে বললেন, চলো, চলো। সক্রেটিসকে শিক্ষা দিতে চলো।

ক্রিতোর বাবা বললেন, অন্ধকার নামছে। মশালচি সাথে নিয়ে যাও।

মশাল হাতে দুইজন লোক বেরিয়ে এলো। এরা ক্রিতোদের দাস। এখানে সন্ধ্যার পরে সবাই মশাল নিয়ে চলাফেরা করে। ধনীরা নিজ হাতে মশাল নেয় না। তাদের সব কাজের জন্য আলাদা আলাদা দাস আছে। মশাল বহনের জন্যও আছে মশালচি। ক্রিতোদের অনেকগুলো দাস। তাদের শুধু মশালচিই আছে আট জন।

দেবী এথিনার[৭] নাম নিয়ে কবি যাত্রা শুরু করলেন। এথেন্স শহরের প্রধান দেবীর নাম এথিনা। গ্রিক ভাষায় শহরের নামও এথিনা। এখানে যেকোনো শুভকাজ এথিনার নামেই শুরু হয়।

ক্রিতো পথ দেখিয়ে সবার আগে হাঁটছে। তার সাথে চলছেন কবি। পেছনে এক ঝাঁক মানুষ। তাদের হাতে জলপাই তেলের মশাল। এখানে সবার জলপাই গাছ আছে। জলপাই থেকে তেল হয়। সব কাজে সেই তেল ব্যবহার করা হয়। মশাল মিছিল এগিয়ে চলছে সক্রেটিসকে খুঁজতে। তারা আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে। আজ সক্রেটিসের খবর আছে।

মশাল মিছিল এথেন্সের আগোরার পাশ দিয়ে চলছে। আগোরা মানে বাজার। নাম বাজার হলেও এথেন্সের সব অফিস, আদালত, জেলখানা সব এই আগোরার ভেতরেই। আগোরাই এথেন্সের মূলকেন্দ্র। আগোরার শেষ মাথায় গিয়ে ক্রিতো আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে পাহাড় থেকে নেমে আসছে একটি ছেলে। ওরই নাম সক্রেটিস।

সকলে পাহাড়ের ঢালে তাকাল।

সক্রেটিস আধো অন্ধকারে হাঁটছে। ঠিক হাঁটছে না, মনে হচ্ছে নাচছে। নাচতে নাচতে পাহাড় থেকে নামছে। তার নাচ দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বাইশ বছরের একটি ছেলে রাস্তার মধ্যখানে একা একা তিড়িং-বিড়িং নাচছে। মজার ওপর মজা। ক্রিতো বলল, সক্রেটিস এরকমই, যখন-তখন নাচে। সুযোগ পেলেই নাচে। ও বলে, নৃত্যকলা শরীরকে সুন্দর রাখে।

কবি বললেন, তার মানে সক্রেটিস একজন নর্তক। ঘাটে-পথে নৃত্য করে। এজন্যই বুঝি সক্রেটিস দেখতে এত সুন্দর! একেবারে দেবতার মতো। তার রূপের রহস্য হলো পথে-ঘাটে নৃত্য করা!

সবাই আবার হো হো করে হেসে উঠল। কবি পিন দিয়েছেন। সক্রেটিসের চেহারা মোটেই সুন্দর নয়। সক্রেটিসের চেহারা অদ্ভুত। বিশাল বড় বড় চোখ। থ্যাবড়ানো বোঁচা নাক, চ্যাপ্টা ঠোঁট। এই অঞ্চলের মানুষের চেহারা খুবই সুন্দর। একেবারে দেবতার মতো। চোখ, নাক, মাথা সবকিছু জ্যামিতির স্কেল মেপে বানানো। সেই তুলনায় সক্রেটিসের চেহারা একেবারে বদখত। নাক, চোখ, মাথা কোনোকিছুরই জ্যামিতির হিসাব মিলে না। তাকে বানানোর সময় বিধাতা মনে হয় জ্যামিতি ভুলে গিয়েছিলেন। চেহারার দিক থেকে সক্রেটিস এক কথায় কদাকার। এথেন্সের সবাই ময়ূর হলে, সক্রেটিস ময়ূর সভায় কাক পক্ষী।

সক্রেটিস খালি পায়ে পাহাড় থেকে নামছে। এই ঠাণ্ডার মধ্যেও তার পা খালি। জুতা, খড়ম কিছুই নেই। গায়েও তেমন কিছু নেই। শরীরের দুই দিকে কোনোরকমে ঝুলছে ছোট্ট দু'টুকরো কাপড়। তবু মুখটা সুখী সুখী। আধা- ন্যাংটা, খালি পা, সুখী-সুখী মুখ। এত অল্প কিছু নিয়ে যে কোন মানুষ সুখী হতে পারে, সেটি কেউ বিশ্বাস করে না। লোকে বোঝে না, সক্রেটিস কি সত্যিই সুখী, নাকি সবটাই সুখের অভিনয়? যদি সুখের অভিনয় হয়, তাহলে সক্রেটিসের চেয়ে বড় অভিনেতা আর নেই

সুখী হোক আর না হোক— সক্রেটিস সবার থেকে আলাদা। সে রহস্যময়। তাকে বোঝা যায় না। তাই তার প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণ। তার মতো আর কেউ নেই। তাকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। ভিড়ের মধ্যেও তাকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে। তার হাঁটার ভঙ্গিও উদ্ভট। এমন হাঁটার ভঙ্গি অন্য কারও নেই। সে সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে। কীভাবে যেন দুই পা দুদিকে বাঁকিয়ে দেয়। তাকে হাঁটতে দেখলে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। কিন্তু তার হাঁটা আর চেহারা মিলে একটি ছবি তৈরি হয়। ছবিটি মনে গেঁথে যায় চিরদিনের জন্য। দূর থেকে এক নজরেই বলে দেওয়া যায় সক্রেটিস আসছে।

তরুণরা তাকে ভীষণ পছন্দ করে। তার মধ্যে কী যেন একটি আছে। সে তরুণদের চমক দেয়। নিত্য নতুন চমক। সে কখনো একঘেয়ে নয়। তরুণরা চমক ভালোবাসে। তারা সক্রেটিসকেও ভালোবাসে। তারা সক্রেটিসের মতো হতে চায়। অনেক তরুণের কাছেই সে এক পরশ-পাথর। তাকে ছুঁলেই নাকি সোনা হওয়া যায়। কিন্তু বুড়োরা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তারা বলেন, ওর কোনো যোগ্যতা নেই। সব ভড়ং-ভাড়ং। ও ছোটদের উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করতে শেখায়। ওর সাথে মিশলে ছেলেপেলেরা আর মুরুব্বি মানে না। বুড়োরা বড় গলায় বলেন, সক্রেটিস বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর।

আলো একেবারেই কমে গেছে। প্রায় অন্ধকার। সক্রেটিস পিটপিট করে মশাল মিছিলের দিকে তাকাল। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এতজন বয়স্ক লোক তার কাছে এসেছে! নিশ্চয়ই ঘাপলা হয়েছে। বড় কোনো ঘাপলা।

সক্রেটিস বলল, কালিসপেরা।

এর মানে শুভসন্ধ্যা। জবাবে কেউ শুভসন্ধ্যা বলল না। তারা সক্রেটিসের সন্ধ্যাটি শুভ করতে আসেনি। অশুভ করতে এসেছে। অশুভ করার কাজটি শুরু করলেন কবি।

কবি সক্রেটিসের কানের কাছে মুখ নিয়ে গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম মোটা করে জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম?

সক্রেটিস কবিকে চেনে না। কিন্তু গলার স্বরে বুঝল ঘটনা খারাপ। এরা ঝগড়া করতে এসেছে। সে বুঝল ওরা চায় আমি ঝগড়া করি। গলা ফাটিয়ে জবাব দিই। কিন্তু সেটি করা যাবে না। ওরা যা চায়, সেটির উল্টোটা করতে হবে। মখমলের মতো ব্যবহার করতে হবে। মুখ থাকবে হাসি হাসি। গলার স্বরে থাকবে মধু। ওদের ফন্দিফিকির নষ্ট করে দিতে হবে।

সক্রেটিস মিষ্টি করে বলল, হ্যাঁ, আমার নাম সক্রেটিস সক্রোনিকাস। বাবার নাম সফ্রোনিকাস। দক্ষিণ পাড়ার এলোপেকি মহল্লায় বাড়ি। আপনারা এত মানুষ একসাথে কোথায় যাচ্ছেন? আমি কি কিছু ভুল করেছি? আমার কিন্তু ভয় লাগছে।

এমন মধুর ব্যবহার কবি আশা করেননি। তিনি ভেবেছিলেন— সক্রেটিস ভীষণ রকম ত্যাড়া। মুরুব্বিদের সাথে তর্ক করে। কিন্তু ছেলেটি তো অত্যন্ত ভদ্র। ব্যবহার অমায়িক! যুক্তি মিলিয়ে কথার পিঠে কথা বলছে। কোনো সন্দেহ নেই যে ছেলেটি জ্ঞানী। অথচ বিনয়ের একেবারে পরাকাষ্ঠা। গলার স্বরে মধু ঝরে ঝরে পড়ছে! কবির হিসাবে গণ্ডগোল লাগছে। কিন্তু তিনি সক্রেটিসকে শিক্ষা দিতে এসেছেন। নরম হওয়া যাবে না।

কবি বললেন, তুমি নাকি সবাইকে আলতু-ফালতু বুদ্ধি দিয়ে বেড়াচ্ছ?

সক্রেটিস আরও মিষ্টি করে বলল, ছি ছি, কী যে বলছেন! বুদ্ধি দিচ্ছি আমি? বুদ্ধি দিতে জ্ঞান লাগে। অনেক কিছু জানতে হয়। আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি শুধু একটি জিনিসই জানি, সেটি হলো— আমি আসলে কিছুই জানি না। আমি বুদ্ধি দেব কী করে?

কবি বললেন, তুমি নাকি এথেন্সের ছেলেদের নষ্ট করে ফেলছো?

সক্রেটিস বলল, জনাব, কাউকে নষ্ট করতে ক্ষমতা লাগে। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি এখনও শিখছি। সবার কাছে শিখছি। এই মুহূর্তে আপনার কাছেও শিখছি।

কবি ভালো ঝামেলায় পড়েছেন। এই ছেলে ঝগড়া করছে না। কেউ ঝগড়া না করলে, পায়ে পা দিয়ে কতক্ষণ চালানো যায়। কবি চারপাশের মানুষের চোখে তাকালেন। জনতার চোখ বলছে— সক্রেটিস মিষ্টি ভাষায় সম্মান দিয়ে কথা বলছে। সক্রেটিস বড় মনের মানুষ। আর কবি অযথা ত্যাদড়ামি করছেন। কবি ছোট মনের মানুষ। কবি বুঝলেন— সক্রেটিসের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে দলবল নিয়ে এসে তিনি ভুল করেছেন। তার সাথের

লোকজনও এই ছেলেটির সম্বন্ধে কিছুই জানে না। মানুষের মুখে উল্টা-পাল্টা শুনেই সবাই ছেলেটিকে গালাগালি করে।

কিন্তু এখন কী করবেন কবি? তিনি এত লোকের নেতা হয়ে এসেছেন। সক্রেটিসকে শিক্ষা দিতেই হবে। কিন্তু কী বলবেন! মাথায় কিছুই আসছে না। সক্রেটিস তার মাথা আউলা করে দিয়েছে। তিনি কথা খুঁজছেন— ক্রিতো যেন কী একটি কথা বলে তার বাবার সাথে তর্ক করছিল! মনে পড়ছে না। তিনি ক্রিতোর দিকে তাকালেন। ক্রিতো হাসি দিল। এই হাসির নাম মিচকা হাসি। এই হাসির মানে হলো— এখন বোঝো কেমন লাগে! সেই হাসি দেখে কবির ভীষণ রাগ হলো। রাগ হলেও ক্রিতোর মিচকা হাসিতে কাজ হলো। কবির মনে পড়ে গেল— সক্রেটিস সবাইকে বলে বেড়ায়— 'নিজেকে জানো'। তিনি ঠিক করলেন, এই ছেলেকে আর সুযোগ দেওয়া যাবে না। এখন ধমক দেওয়া শুরু করবেন। ধমকের উপর ধমক দিতে হবে।

তিনি বললেন, শোনো, এখন তো খুব ভালোমানুষির ভান ধরছো! ঐদিকে সবাইকে তো বাণী দিয়ে বেড়াচ্ছ— 'নিজেকে জানো'। পিচ্চি পিচ্চি পোলাপানকে সামনে পেলেই বলো— নিজেকে জানো। ঠিক কিনা?

'হ্যাঁ, ঠিক। আমি বলি, নিজেকে জানো।'

'কেন বলো? জ্ঞান বেশি হয়ে গেছে? ঘাটে পথে জ্ঞান বিলাতে হচ্ছে? জ্ঞান রাখার ভাণ্ড পাচ্ছ না? লাগলে বলো— এথেন্সের সবচেয়ে বড় মটকি 'এমফোরা' কিনে দিই। এমফোরার উপরে বড় করে লিখে রাখবে সক্রেটিসের জ্ঞান-মটকি।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কবি ছাই দিয়ে ধরেছেন। আজ সক্রেটিসের খবর আছে।

সক্রেটিস মিষ্টি হেসে বলল, 'জ্ঞান রাখার ভাণ্ড লাগবে না। আমার কোনো জ্ঞান নেই।'

'জ্ঞান নাই, তো ষাঁড়ের মতো 'নিজেকে জানো', 'নিজেকে জানো' বলে চেঁচাও কেন? সোজা কথার সোজা উত্তর দাও। ধানাই-পানাই করবে না। 'নিজেকে জানো' কেন বলো?'

'নিজেকে জানো— কথাটা আমি বলি। কিন্তু এই কথা আমার নয়। এই কথা আমরা সবাই জানি। আপনারা সবাই কথাটা দেখেছেন।

'দেখেছি?'

'হ্যাঁ, দেখেছেন।'

'কথা দেখেছি?'

'হ্যাঁ, এই কথাটা দেখেছেন।'

'বেকুবে কয় কী! কথা নাকি দেখেছি? আরে, কথা কি দেখার জিনিস? নাকি খাওয়ার জিনিস?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কবিও হাসছেন। সক্রেটিসকে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে। ভিড়ের জনতা তুমুল মজা পাচ্ছে।

সক্রেটিস বলল, কথা দেখার জিনিস নয়। কিন্তু এই কথাটা আপনারা দেখেছেন। দেখেছেন ডেলফি[৮] নগরে দেবতা এপোলোর মন্দিরে। সেই মন্দিরের সামনের দেয়ালে খুব বড় করে লেখা আছে— নিজেকে জানো।

সবাই চমকে উঠল— 'তাই তো, এটি তো সবাই দেখেছি। ডেলফিতেই তো আছে।'

ডেলফি এখানের প্রধান তীর্থস্থান। এথেন্সের সবাই অবশ্যই বছরে একবার হলেও ডেলফি শহরে যায়। সেখানে এপোলোর মন্দিরের পুরোহিত একজন ওরাকল। সে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। তার নাম পিথিয়া। পিথিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনেই এখানকার বড় বড় সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এথেন্সে একজনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষ নেই যে ডেলফিতে যায়নি। ডেলফির বিখ্যাত মন্দিরের একেবারে সামনে বিশাল বড় করে লেখা আছে— নিজেকে জানো।'[৯]

কবি ধরা খেয়ে গেছেন। তার চোখ-মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। তিনিও এপোলো মন্দিরে কথাটা অনেকবার দেখেছেন। তার মনেই ছিল না। কিন্তু এখন আর স্বীকার করার উপায় নেই। ভিড়ের লোকজন ফিসফিস করছে। তারা সবাই কথাটা দেখেছে। সক্রেটিস এই সুযোগের আশায়ই ছিল। সে জনতার উদ্দেশ্যে বলল, ভাইয়েরা, কে কে কথাটা দেখেছেন, একটু হাত তোলেন।

ভিড়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কে কার আগে হাত তুলবে। তারা হৈ হৈ করে বলছে— 'আমি দেখেছি'। 'আমিও দেখেছি'। 'আমি দশবার দেখেছি'। 'আমি দেখেছি পঞ্চাশবার'।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, বোঝা গেল— আপনারা সবাই কথাটা দেখেছেন। কিন্তু কথাটা দেখেনি, এমন মূর্খ কি এখানে কেউ আছে?

কেউ হাত তুলছে না। পেছন থেকে আর একজন বলল, কবি সাহেব মনে হয় কথাটা দেখেন নি!

কবি চোখে মুখে অন্ধকার দেখছেন। এখন সবাই সক্রেটিসের পক্ষে। কবি ফেঁসে গেছেন। এখন আর বলতে পারছেন না যে তিনিও কথাটি দেখেছেন। জনতার চোখে কবিই এখানে একমাত্র মূর্খ। 'নিজেকে জানো' – কথাটি একমাত্র কবিই দেখেননি।

কবি অবাক হয়ে দেখছেন, সক্রেটিসকে শিক্ষা দিতে যে জনতা তার সাথে এসেছে, তারা এখন কবিকে শিক্ষা দিচ্ছে। জনতার পক্ষ পাল্টাতে এক মুহূর্তও লাগে না। জনতা হৈ হৈ করছে। তুমুল হাসাহাসি। অপমান কাকে বলে কবি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

ক্রিতোও হাসছে। তার আশা পূরণ হয়েছে।

কবি ভাবছেন, একটু আগে সক্রেটিসকে যত ভোলা-ভালা মনে হয়েছিল, সে আসলে তা নয়। সে অনেক কিছু জানে। বুদ্ধির খেলায় ভীষণ পাকা।

সক্রেটিস জনতার উদ্দেশ্যে হাত তুলল। সে এখন কবিকে অগ্রাহ্য করছে। কবি এখন তুচ্ছ মানুষ। কবি এখন আর নেতা নন। সক্রেটিস বলল, 'নিজেকে জানো' কথাটি

আপনারা সবাই দেখেছেন। এই কথাটি মন্দিরের গায়ে লিখে সেখানের ওরাকল পিথিয়া সবাইকে ডাক দিয়ে বলছেন, 'শোন, আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি। এসো, আমার কাছে এসে তোমার ভবিষ্যৎ জানো।' আর আমি ওই কথাটিকেই একটু ঘুরিয়ে বলি, তুমি নিজেই নিজেকে জানো। নিজের ভেতরের মানুষটাকে জানো। আত্মজ্ঞানী হও।

সবাই একদৃষ্টে সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে আছে। এই কদাকার ছেলেটা কেমন নতুন কথা বলছে! এখানের সবাই জানে, ওরাকল সবকিছু জানেন। এখন মনে হচ্ছে ওরাকলের চেয়েও সক্রেটিস বেশি জানে। সক্রেটিস এমনভাবে কথা বলছে, মনে হচ্ছে, এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই। ওর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে। এই ছেলেটি সত্যিই আলাদা। ওর সামনে অন্য সবাই তুচ্ছ।

ভিড়ের মানুষ নিজেদের অজান্তেই ফিসফিস করতে শুরু করেছে- 'নিজেকে জানো। নিজের ভেতরের মানুষকে জানো।'

কবির হাঁসফাঁস লাগছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রিতোর বাবাই সঠিক সক্রেটিস আসলেই ভয়ংকর। কবিকেও সক্রেটিস-আতঙ্ক পেয়ে গেল।

কবি বললেন, আমাকে একটি সভায় জরুরি কবিতা পড়তে হবে। এখন যাই।

জরুরি কবিতা পড়তে কবি প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। সবাই হই হই করে উঠল। এই কবি আর সক্রেটিসের সামনে আসবেন না। তাকেও ঘিরে ধরল সক্রেটিস-ফোবিয়া। এখন থেকে তিনিও সবাইকে বলবেন, 'সক্রেটিস খুব খারাপ ছেলে, ও মুরুব্বি মানে না, ওর কাছে ভুলেও ছেলেদের যেতে দিও না।'

ক্রিতো আনন্দে সক্রেটিসকে জড়িয়ে ধরল। এই মুহূর্তে ক্রিতোর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। সন্ধ্যায় সে বাবার হাতে মার খেয়েছে। আর সেই ঘটনা থেকেই কবির সাথে জ্ঞানযুদ্ধে সক্রেটিস কবিকে পরাজিত করল। ক্রিতোর খুব ভালো লাগছে। অনেক কষ্টের পর অনেক আনন্দের মতো মধুর জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। ক্রিতোর আকাশ ছুঁতে ইচ্ছে করছে। সে বিশাল বিশাল লাফ দিচ্ছে। লাফ দিয়েই সে আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। সক্রেটিসকে সে অনেক ভালোবাসে। তার জন্য সে সবকিছু করতে পারে। ক্রিতোর এমন গভীর ভালোবাসার কথা সক্রেটিস জানে। সেও ক্রিতোকে অনেক ভালোবাসে। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। সে নৈঃশব্দ্যে বন্ধুর আকাশ ছোঁয়া লাফালাফি দেখছে।

সক্রেটিসের বন্ধুভাগ্য খুবই ভালো। এথেন্সের সবচেয়ে ভালো তরুণরাই তার বন্ধু। তরুণদের নানা রকম নেশা থাকে। সক্রেটিস আর তার বন্ধুদের নেশা হলো জ্ঞানের নেশা। তারা এক-একজন জ্ঞানখোর। এই বন্ধুরা কিছুদিন ধরে একটি খেলা শুরু করেছে। তারা মনে করে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হচ্ছে সক্রেটিস। কিন্তু শুধু মনে করলে তো হবে না। প্রমাণ চাই। প্রমাণ করার জন্য তারা যেকোনো ছুতায় একজন মুরুব্বিকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে সক্রেটিসের সামনে। আলাপ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সক্রেটিস প্রমাণ করে দেয় যে, ঐ মুরুব্বি তেমন কিছুই জানেন না। মুরুব্বি পালাতে

পালাতে বলেন, 'সক্রেটিস একটি শয়তান, সে মুরুব্বি মানে না।' আর বন্ধুরা হৈ হৈ করে ওঠে, আরও একবার প্রমাণিত হলো যে সক্রেটিসই পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। বাকি সবাই ফাটাবাশ।

সক্রেটিস নিজে বিশ্বাস করে না যে, সে খুব জ্ঞানী মানুষ। সে মনে করে এটি একটি খেলা। জ্ঞান নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। বন্ধুরা খেলছে। সময় ভালো কাটছে। মন্দ কী! এই খেলা সক্রেটিসের জন্য মন্দ কিছু নয়, কিন্তু মুরুব্বিদের জন্য খুবই ভয়ংকর। তাদের মান-ইজ্জতের বারোটা বাজাচ্ছে ইঁচড়ে পাকা সক্রেটিস। তাই সক্রেটিস তাদের শত্রু হয়ে যাচ্ছে। এই জ্ঞান-জ্ঞান খেলার ফলাফল হলো— এথেন্সের এক দল মানুষ এখন সক্রেটিসের চরম শত্রু, আরেক দল পরম বন্ধু।

ক্রিতোর লাফালাফি শেষ হয়েছে। সক্রেটিস আর ক্রিতো পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসেছে।

সামনে এজিয়ান সাগর। এই সাগর ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। দুপুরের পর হয়ে যায় টলটলে নীল। তখন মনে হয় চেনা সাগরের অচেনা পানিতে ভাসছে একগুচ্ছ নীলকণ্ঠ ফুল। কাকে যেন ভালোবেসে সাগরটি নীল হয়ে গেছে। কাকে ভালোবেসেছে ও? কার ভালোবাসার রং অমন ভয়ংকর নীল! আবার শেষ বিকেলে এই নীল সাগর রাঙা হতে থাকে। সন্ধ্যার মিষ্টি আলোয় কেমন লাজুক হয়ে ওঠে I

লাজুক সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে সক্রেটিস। তার মনে হচ্ছে— সাগরের লজ্জারাঙা পানিতে সে ভাসছে। স্বপ্ন ধুয়ে ভাসছে। আবার মনে হচ্ছে— সে উড়ছে। জীবন ভিজিয়ে উড়ছে। সাথে উড়ছে সাগরের সাদা পাখি সিগাল। এজিয়ান সাগরের শঙ্খবুক-কমলাচঞ্চু সিগাল। পাখিগুলো দেখলেই ধরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ধরা দেয় না। সুখের মতো বদমাশ। সাগর তীরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়ি দ্বীপ। দুঃখের মতো বেহায়া। সরাতে চাইলেও নড়ে না।

সক্রেটিস তন্ময় হয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রিতো ভাবছে, আজ সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে যা হলো সেটি সক্রেটিসকে বলবে কিনা! এই মুহূর্তে সক্রেটিস আনন্দে আছে। তার সাথে বন্ধুত্বের অপরাধে ক্রিতোর বাবা ক্রিতোকে মেরেছে, এটি শুনলে সে দুঃখ পাবে। মানুষকে দুঃখ দিয়ে কারও কোনো লাভ হয় না। কিন্তু বন্ধুকে পিন মেরে ব্যাপক আনন্দ লাভ হয়। ক্রিতো সক্রেটিসকে পিন মারবে। নারীঘটিত পিন। আসপাশিয়াকে নিয়ে পিন। মেয়েদের নিয়ে পিন মারতে হয় ফিসফিস করে। ক্রিতো ফিসফিস করে বলল, ঘটনা তো মানুষ জেনে গেছে।

সক্রেটিস বলল, কোন ঘটনা?

'তার ঘটনা।'

'তার ঘটনা মানে কার ঘটনা?

ক্রিতো আরও ফিসফিস করে বলল, আসপাশিয়ার ঘটনা। মানুষ জেনে গেছে, তুমি আসপাশিয়ার কাছে যাও।

সক্রেটিস বলল, হু, আমি যাই। সবার সামনেই তো যাই। গোপনে যাই না তো!

ক্রিতো এবার সক্রেটিসের একেবারে কানের কাছে মুখ এনে গভীর রহস্য নিয়ে বলল, মানুষ কিন্তু নানান কথা শুরু করেছে। আজেবাজে কথা। কুকথা। সুড়সুড়ি লাগা কথা।

সক্রেটিস বলল, তুমি ফিসফাস বন্ধ করো। মানুষ বাজে কথা বললেই আমি বাজে লোক হয়ে যাব না, আসপাশিয়াও বাজে মেয়ে হয়ে যাবে না। সে ভীষণ বুদ্ধিমতী, অসাধারণ জ্ঞানী, অনেক উঁচু স্তরের একজন মানুষ।

'তাহলে তার নামে এত বাজে কথা কেন?'

সক্রেটিস বলল, 'বাজে কথার অনেকগুলো কারণ। এক নম্বর কারণ হলো আসপাশিয়া এথেন্সের নিয়ম-কানুন মানে না। সে নিয়ম-ভাঙা মেয়ে। এথেন্সের নিয়ম হলো মেয়েদের থাকতে হবে অন্তঃপুরে; মেয়েরা এমনভাবে চলবে যেন সূর্যের আলোও শরীর স্পর্শ করতে না পারে। কিন্তু আসপাশিয়া ঘরে থাকে না, যেখানে খুশি যায়, যার তার সাথে মেশে। এথেন্সের লোকেরা এমন নিয়ম- ভাঙা মেয়ে সহ্য করতে পারে না। তারা তাকে বলে খারাপ মেয়ে।

দ্বিতীয় কারণ হলো এই মেয়ে অনেক জ্ঞানী। সে অনেক কিছু জানে। পুরুষরা কোনোদিন চায় না যে একটি মেয়ে তার চেয়ে বেশি জানুক। পুরুষের কাছে মেয়েরা হলো দুর্বল, অবলা। সেখানে এই মেয়ে অনেক বেশি সুবলা। সে চমৎকার কথা বলে। বক্তৃতা করতেও জানে। গান জানে। কিথারা যন্ত্রও বাজাতে পারে। যেকোনো বিষয়ে সুন্দর করে দু'চার কথা লিখে ফেলতেও পারে। এত গুণ থাকলে সেই মেয়েকে এমনিতেই পুরুষরা ভয় পায়। ভয় পেয়ে পথ আটকাতে চায়। আটকাতে না পারলে, তাকে নিয়ে নোংরামি শুরু করে। চরিত্রে কলঙ্ক দেয়।

এবার শোন তৃতীয় কারণ। আসপাশিয়া অসম্ভব রূপবতী। তার মতো সুন্দরী মেয়ে সারা গ্রিসে কোথাও নেই। কিন্তু তার রূপ ঠাণ্ডা আলোর মতো নয়, একেবারে আগুনের মতো জ্বলজ্বলে। এমন মেয়ে যেখানেই থাকুক, তাকে নিয়ে গুজব হবেই। তাকে নিয়ে আলাপ করতে মানুষের ভালো লাগে। তাকে জানুক আর নাই জানুক, সবাই তার কথা বলে বাহাদুরি নিতে চায়। এভাবে তৈরি হয় গুজব। মেয়েদের নিয়ে গুজব মানেই আজেবাজে কথা। মশল্লামাখা কথা।'

ক্রিতো বলল, শেষের কারণটাই আমার পছন্দ হয়েছে। সেই মেয়ে অত্যধিক সুন্দরী, তাই তাকে নিয়ে কানাঘুষা হয়। লোকে বলে, আসপাশিয়া হলো এই যুগের হেলেন। চারশো বছর আগে স্পার্টায় ছিল হেলেন, আর এখন এথেন্সে এসেছে আসপাশিয়া। হেলেনের রূপে তখন যেমন পুড়ে গিয়েছিল ট্রয় নগরী, তেমনই আসপাশিয়ার রূপে এখন পুড়বে এথেন্স নগরী।

সক্রেটিস বলল, মজা তো! আসপাশিয়া এথেন্সের হেলেন?

ক্রিতো বলল, হ্যাঁ, মানুষ ফিসফাস করে বলে, হেলেনকে চুরি করেছিল ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস। এখন আসপাশিয়াকে কে চুরি করবে? আজ বিকেলে লোকজন যা বলছিল, তাতে মনে হয় আসপাশিয়াকে তুমিই চুরি করবে?

অট্টহাসি দিয়ে সক্রেটিস বলল, ক্রিতো, তুমি এতদিনে আমাকে এই চিনেছ? আমি জ্ঞানচোর, কখনই মেয়েচোর নয়।

ক্রিতো বলল, বিশ্বাস নেই। আসপাশিয়াকে নিয়ে যেমন সুন্দর ব্যাখ্যা দিলে, তাতে বোঝা যায় তুমি তাকে নিয়ে সারাদিন ভাবো। তাই জ্ঞানচোর যে কবে মনচোর হয়ে যাবে, কিচ্ছু বলা যায় না।

সক্রেটিস বলল, একথা ঠিক। আমি আসপাশিয়াকে যেভাবে বুঝেছি, এথেন্সে অন্য কেউ সেভাবে বোঝেনি। সবাই তাকে শুধুই মেয়েমানুষ ভাবে, একমাত্র আমিই তাকে মানুষ ভেবেছি। যারা তার নামে বাজে কথা ছড়ায়, তারা কেউ তাকে চিনেই না। ক্রিতো, তুমি একদিন চলো, নিজেই দেখবে, এমন মিষ্টি মনের মেয়ে এথেন্সে আর নেই। ও কথা বললেই মনে হয় চারদিকে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে, একটি নরম ভেজা ভেজা হাসি।

ক্রিতো বলল, থাক, আমার আর ভেজা ভেজা হাসির দরকার নেই। আমি তোমার সাথে ঘুরি শুনেই আমার বাবা মার-ধর শুরু করেছে। যদি শোনেন আমি আসপাশিয়ার কাছে গিয়েছি, আমার বাবা আত্মহত্যা করবে। আসপাশিয়ার ভেজা হাসি তোমারই থাকুক। আমার একটি শুকনা হাসির মেয়ে হলেই চলবে।

রাত বাড়ছে। আঁধারের সাথে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা নামছে। তারা বাড়ির দিকে রওয়ানা করল। পথে ক্রিতো বলল, কালকে নাকি থিয়েটারে যাচ্ছ?

সক্রেটিস বলল, ধুর, আমি নাটক-ফাটক দেখি না।

'আমাদের সাথে দেখো না। কিন্তু ইউরিপিডিসের[১০] সাথে ঠিকই দেখো।'

'হুঁম, আমি শুধু ইউরিপিডিসের সাথেই থিয়েটারে যাই। সে নাটক পাগল মানুষ। আমাকে বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। মানা করলে শোনে না। তবে তার সাথে থিয়েটারে গেলে লাভ আছে।'

'লাভ?'

'হ্যাঁ, সে সাথে থাকলে এক টিকেটে দুটি নাটক দেখা যায়।'

'এক টিকেটে দুই নাটক? ঘটনা কী?'

'ঘটনা হলো ইউরিপিডিস নাটক বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। আর আমি বিশেষভাবে অজ্ঞ। সে জানে যে, আমি নাটকের 'ন'ও জানি না। সেজন্য তার সাথে থিয়েটারে গেলে নাটক শুরু হওয়ামাত্র সে ধারাভাষ্য শুরু করে। অভিনেতারা অভিনয় করে মঞ্চে, আর ইউরিপিডিস অভিনয় করতে থাকে আমার কানের কাছে। আমি একবার মঞ্চে তাকাই, একবার তার দিকে তাকাই। এভাবে একটির পয়সায় দুটি নাটক দেখি।'

ক্রিতো হো হো করে হেসে বলল, তাহলে কাল যাচ্ছ থিয়েটারে?

'হ্যাঁ, কালকে নাকি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি নাটক হবে।'

'কী নাটক? নাট্যকার কে?'

'নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড'[১১] মানে প্রমিথিউস বন্দি। লিখেছেন আমাদের বুড়ো নাট্যকার এস্কিলাস[১২]।'

***

১. ক্রিতো: Crito, এথেন্সের দার্শনিক। সক্রেটিসের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। সক্রেটিসের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার সাথে ছিলেন। তার নামে প্লেটো একটি ডায়ালগ লিখেছেন।

২. সক্রেটিস: Socrates, (খ্রি. পূ. ৪৬৯-৩৯৯), দর্শনের জনক।

৩. এথেন্সের কেন্দ্র (এক্রোপলিস) থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এলোপেকি (Alopece) নামক মহল্লায় সক্রেটিস জন্মগ্রহণ করেন। জায়গাটি ইমিতোস (Hymettus) নামক একটি পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। এখন এই নামে কোনো পাড়া বা মহল্লা নেই, সেখানে কোনো বসতিও নেই।

৪. গ্রিক মহাকবি হোমার (Homer) সক্রেটিসের দুই/তিন শতাব্দী আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সাত বা আট শতকের মানুষ ছিলেন। ট্রয়ের যুদ্ধের বীরদের নিয়ে তার রচিত 'ইলিয়াদ' ও 'অডিসি' মহাকাব্য দুটি সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের ভিত্তি।

৫. ট্রয় যুদ্ধে জয়ের পর গ্রিক যোদ্ধা অডিসিয়াসের গ্রিসে ফেরার কাহিনি নিয়ে হোমারের মহাকাব্য অডিসি (The Odyssey)। এই কবিতাটিসহ এই বইয়ে যেখানেই অডিসি মহাকাব্যের অনুবাদ দরকার হয়েছে, আমি Emily Wilson এর ইংরেজি (The Odyssey) অনুবাদ থেকে বাংলা করেছি।

৬. আসপাশিয়া (Aspasia): এথেন্সের সবচেয়ে বিখ্যাত নারী দার্শনিক। গণতন্ত্রের প্রধান নেতা পেরিক্লিসের সহচরী। গণতন্ত্রের ইতিহাসের সুবিখ্যাত Pericles Funeral Oration তিনি লিখেছিলেন বলে প্লেটো উল্লেখ করেন।

৭. এথিনা (Athena): গ্রিকরা বিশ্বাস করত যে অলিম্পাস পাহাড়ে বারো জন দেবতা থাকেন, এথিনা তাদের একজন। তিনি জ্ঞানের দেবী।

৮. ডেলফি: Delphi, এথেন্স থেকে ১৮০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে বিখ্যাত পবিত্র নগরী।

৯. মন্দিরে গ্রিক ভাষায় লেখা ছিল 'Gnothi Seauton', মানে 'Know Yourself'.

১০. ইউরিপিডিস (Euripides): খ্রি.পূ. ৪৮০-৪০৬, তিন সেরা গ্রিক ট্র্যাজেডিয়ানের একজন।

১১. প্রমিথিউস বাউন্ড (Prometheus Bound) : ট্রাজেডির জনক এস্কিলাস রচিত ট্র্যাজেডি।

১২. এস্কিলাস: Aeschylus, (খ্রি.পূ. ৫২৪-৪৫৫), গ্রিক নাট্যকার, ট্রাজেডির জনক।

২

'সত্য আর সুন্দর সবার জন্য একই;
শুধু সন্তুষ্টি একেক জনের কাছে একেক রকম।'
—ডিমোক্রিটাস

খুব সকালে সক্রেটিস আর ইউরিপিডিস নাটক দেখতে যাচ্ছে।

এথেন্সে বসন্ত উৎসব[১৩] চলছে। এই উৎসবে নাটক প্রতিযোগিতা হয়। নাটক দেখতে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। শহরের সব অলি, গলি, তস্যগলি দিয়ে মানুষ চলছে; যুবক-যুবতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, দাস সবাই লাইন ধরে যাচ্ছে। অন্য অনুষ্ঠানে মেয়েরা যেতে পারে না, কিন্তু থিয়েটারে যেতে পারে। তাই আজ রাস্তায় অনেক মেয়ে। মেয়েদের আপাদমস্তক ঢাকা, শুধু মুখটা কোনোরকমে অনাবৃত রেখে তারাও হাঁটছে। বড় রাস্তায় লাইন ধরে গাধায় টানা গাড়িতে করেও চলছে অগুনতি মানুষ। সবার গন্তব্য একটিই, ডিওনিসাস থিয়েটার।

এটি পৃথিবীর প্রথম থিয়েটার। এখানেই জন্ম হয়েছে গ্রিক ট্র্যাজেডি আর কমেডি। এথেন্সের প্রাণকেন্দ্র আগোরার গা ঘেঁষে ঠিক দক্ষিণে একটি পাহাড়, নাম এক্রোপোলিস। এই পাহাড়টির ঢালে খোলা আকাশের নিচে এই থিয়েটার।

দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে। বিশ-পঁচিশ মাইল দূর থেকে কাক-ডাকা ভোরে মানুষ রওনা করে। সক্রেটিসের অত ভোরে বের হওয়ার দরকার নেই। তার বাড়ি থিয়েটারের কাছেই। সে ভেবেছিল খেয়েদেয়ে ধীরে-সুস্থে বের হবে। কিন্তু সূর্য ওঠার আগেই ইউরিপিডিস এসে এমন হাঁক-ডাক শুরু করেছে যে পাড়ার সবাই জেগে গেছে। মঞ্চের সামনের আসন দখল নিতে আগে যেতে হবে। নাটক ভালো করে বুঝতে সামনে বসা জরুরি।

এথেন্সের মানুষের এক নম্বর বিনোদন হলো নাটক। এখানের ধনী মানেই নাটক-পাগল। ধনীদের ফাঁকে দুই-একজন গরিব লোকও নাটক পাগল। সেরকম একজনের নাম ইউরিপিডিস। সে কোনোরকমে মধ্যবিত্ত। তার বাবার ফলের দোকান ছিল। এখন বাবা নেই। দোকান চালান তার মা। কোনোমতে দিন আনে দিন খায়। এরকম গরিব ঘরের ছেলে হয়েও ইউরিপিডিস নাটক- পাগল। যেমন তেমন পাগল নয়, একেবারে নাটকখোর। কাজ-কর্ম করে না। সারাদিন নাটক দেখে আর সুযোগ পেলে নাটক লেখার চেষ্টা করে। নাটক না হলে তার ঘুম আসে না। গরিবের যেমন ঘোড়া রোগ হয়, তেমনই তার হয়েছে নাটক রোগ।

এই নাটকখোর ইউরিপিডিস সক্রেটিসের বন্ধু। তাদের বন্ধু হওয়ার কথা নয়। দুজনের স্বভাব পুরোপুরি উল্টা। দুজন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা। সক্রেটিস মহাআড্ডাবাজ। নিজে বকবক করে, মানুষকে দ্বিগুণ বকবক করায়। ইউরিপিডিস মিতভাষী, সে আড্ডা পছন্দ করে না। প্রতিদিন নাটক দেখে, আর ফাঁক পেলেই লিখতে বসে। সক্রেটিস লেখালেখির ধারে-কাছেও নেই। পেপিরাস কাগজের উপর কলম ছোঁয়াতে তার কষ্ট লাগে। দুজনের সবচেয়ে বড় অমিল হলো বয়সের। সক্রেটিসের সব বন্ধু তার থেকে বয়সে ছোট। ইউরিপিডিস তার একমাত্র বেশি বয়সের বন্ধু। সে সক্রেটিসের চেয়ে পনেরো বছরের বড়। ইউরিপিডিস আসলে সক্রেটিসের ভক্ত। সক্রেটিস নতুন নতুন কথা বলে। এমন কথা অন্য কেউ বলে না। কবি-সাহিত্যিকরা সব সময় নতুন কথা খোঁজেন। সে অনেক নতুন কথা পায় সক্রেটিসের কাছে।

সক্রেটিস নাটক পছন্দ করে না। নাট্যকাররা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলে। এসব তার ভালো লাগে না। সে সত্যের পূজারি। মিথ্যা শুনলে তার কান গরম হয়ে ওঠে। সে থিয়েটারে যায় শুধু ইউরিপিডিসের পাল্লায় পড়ে।

নাটক শুরুর অনেক আগেই তারা থিয়েটারে পৌঁছে গেল। তারা তৃতীয় সারিতেই আসন পেয়েছে। গ্যালারির প্রথম সারি এথেন্সের জন্য যুদ্ধে শহিদদের সন্তানদের জন্য, দ্বিতীয় সারি নেতাদের জন্য, তৃতীয় সারি থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত। তৃতীয় সারিতে বসতে পেরে তারা খুশি। থিয়েটারটি বিশাল। সতের হাজার মানুষ বসতে পারে। পাহাড়ের অনেক উঁচু পর্যন্ত চলে গেছে গ্যালারি।

নাটক শুরু হতে এখনও অনেক দেরি। কিছু সময় পাওয়া গেল খেজুরে আলাপ করার জন্য। সক্রেটিস খুশি। নাটক দেখার চেয়ে গপসপ করতেই তার ভালো লাগে। গপসপ শুরু করার আগেই তাকে ইশারায় ডাকছে একটি মেয়ে। দূর থেকে হাত নাড়ছে। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। চাঁপা-কলির মতো আঙুল নেড়ে ডাকছে। এমন মেয়ে ডাক দিলে পাথরও বসে থাকতে পারে না।

সক্রেটিসও পারল না। সে উঠে দাঁড়াল। একদিকে বন্ধু ইউরিপিডিস, অন্যদিকে অপ্সরার মতো মেয়ে। কার কাছে যাবে? সে চিন্তা করছে ইউরিপিডিসের সাথে বেইমানি

করা সম্ভব, নাকি সম্ভব নয়? বেশি চিন্তা করতে হলো না। মেয়েটি নিজেই চলে এলো তার কাছে। মেয়েটির অনেক সাহস। সক্রেটিসের বাম পাশের আসনে বসে পড়ল। আপাতত মুশকিল আসান। সক্রেটিস মাঝখানে। ডানে ইউরিপিডিস আর বামে মেয়েটি।

সক্রেটিস ইউরিপিডিসকে বলল, বন্ধু, ইনি হলেন আসপাশিয়া। আমার শিক্ষিকা।

শিক্ষিকা! রাগে ইউরিপিডিসের ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। এই মেয়ে তার শিক্ষিকা? সে তাকে পড়ায়! সক্রেটিস তলে তলে এত খারাপ?

ইউরিপিডিস ছোট্ট করে পিন দিয়ে বলল, আমি ওনাকে চিনি! তোমার শিক্ষিকা তো বাড়াবাড়ি রকম বিখ্যাত মেয়ে। তাকে চেনে না, এমন মানুষ এথেন্সে নেই।

কথা শুনে আসপাশিয়া এমনভাবে ইউরিপিডিসের দিকে তাকাল যেন তাকে এই মুহূর্তে ভস্ম করে দেবে। সক্রেটিস ভয়ে ভয়ে দুজনকে দেখছে। ইউরিপিডিস আসপাশিয়াকে চেনে মানে ঘটনা খারাপ। এথেন্সে আসপাশিয়ার পরিচিতি হলো, সে ভীষণ বাজে মেয়ে। ঘর-সংসার করে না। স্বভাব-চরিত্র একেবারেই সুবিধার নয়। ইউরিপিডিস চিনলে তাকে এভাবেই চেনে। কিন্তু সক্রেটিস চেনে অন্যভাবে। এই মেয়েটি ভীষণ বুদ্ধিমতী, অনেক কিছু জানে। এরকম জ্ঞানী মেয়ে এথেন্সে আর নেই। সে মাঝে মাঝে আসপাশিয়ার কাছে যায়। তার কাছে অনেক কিছু শেখে। সক্রেটিস মানুষকে বিচার করে জ্ঞানের মাপাকাঠি দিয়ে, অন্য কিছু বিবেচনার বিষয় নয়। সে উঁচু গলায় আসপাশিয়াকে তার শিক্ষিকা বলে পরিচয় দেয়।

সক্রেটিস ভয়ে ভয়ে আসপাশিয়াকে বলল, এই হলো আমার বন্ধু ইউরিপিডিস। বয়সে বড়, কিন্তু প্রাণের বন্ধু। উনি একজন নাট্যকার।

আসপাশিয়া ছোট্ট করে পিন দিয়ে বলল, ওনাকে চিনি! তোমার প্রাণের বন্ধু তো মারাত্মক রকমের বিখ্যাত নাট্যকার। তিনি নাটকে মেয়েদেরকে গালাগালি করেন।

এবার ইউরিপিডিস এমন করে তাকাল যেন আসপাশিয়াকে ভস্ম না করে থামবে না। সক্রেটিসের মহাবিপদ। দুই দিক থেকেই ভস্ম করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। মাঝখানে বসে সে কি বাঁচতে পারবে? মঞ্চে নাটক শুরু হওয়ার আগেই তার দুই পাশে নাটক শুরু হয়ে গেছে।

ইউরিপিডিস সক্রেটিসের ওপর মহাবিরক্ত। ছেলেটা যে এত বেহায়া, তা সে ভাবেনি। আসপাশিয়ার মতো একটি মেয়েকে পাশে বসিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। কোনো হেলদোল নেই। মানুষ কী ভাবছে তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। সে জানত যে তার লজ্জা-শরম কম। কিন্তু এতটা কম, সেটি ভাবেনি।

সবাই চুপচাপ। কেউ কোনো কথা বলছে না। সক্রেটিস একটু সময় নিচ্ছে। দেখা যাক, কে আগে কথা বলে! কিন্তু দুইজনই সমান ত্যাড়া। সক্রেটিসকেই কথা বলতে হবে। সে ভাবছে এমন কিছু বলতে হবে যাতে দুজনই ক্ষেপে যায়।

সে বলল, ইউরিপিডিস নাটকে মেয়েদের গালাগালি করে, এটি কিঞ্চিৎ সত্য, তার চেয়েও বড় সত্য হলো সে নাটকে মেয়েদের মনের আসল কথা বলে।

দুজনেই রে রে করে উঠল। ইউরিপিডিস তার জামা টেনে ধরে বলল, বলো, আমি কোন নাটকে মেয়েদের গালি দিয়েছি? আসপাশিয়া বলল, উনি কোন নাটকে মেয়েদের মনের কথা বলেছেন?

সক্রেটিস কিছুই বলছে না। একেবারে চুপ। তাকে চুপ দেখে দুজন সরাসরি কথা বলতে শুরু করল। ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। তুমুল ঝগড়া। সক্রেটিস শুধু একবার ডানে তাকাচ্ছে, একবার বামে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একটি ঝগড়ার অনুষ্ঠান চলছে। সক্রেটিস সেই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। উপস্থাপকের কোনো কাজ নেই। সে মিষ্টি হাসি দিয়ে ডানে-বামে তাকাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কাটল। নাটক শুরু হতে এখনও অনেক বাকি। গ্যালারিতে লোক ঢুকছে মাত্র। ঝগড়াকারী দুজন এখন চুপ। ক্লান্ত হয়ে গেছে। সক্রেটিস ভাবল, যতটুকু ঝগড়া দরকার ছিল, সেটি হয়ে গেছে। এবার বিষয় পরিবর্তন করা দরকার। সে বলল, সারাদিন এখানে থাকতে হবে। আমার তো এখনই ক্ষুধা লেগে গেল। তোমাদের কাছে খাবার-দাবার কিছু আছে?

আসপাশিয়া ভুট্টা দানা বের করল। ভুট্টা ভেজে মধু মেখে শুকানো হয়েছে। থিয়েটারে বসে চিবানোর জন্য এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হয় না। মধুমাখা ভুট্টার গুণে তাদের মন মধুর মতো হয়ে গেল। ঝগড়াঝাঁটি শেষ।

আসপাশিয়া বলল, সক্রেটিস, আমি যদি না আসতাম, তোমরা দুই বন্ধু এখন কী করতে?

সক্রেটিস বলল, আমি চুপচাপ বসে থাকতাম। আর ইউরিপিডিস আমাকে জ্ঞান দিত। নাটক নিয়ে তার অশেষ জ্ঞান। এই বিষয়ে সে দিনরাত জ্ঞান দিতে পারে। নাটক বিষয়ে তার কোনো ক্লান্তি নেই। সে একটি বিরাট প্রতিভা।

আসপাশিয়া বলল, তোমার বিরাট প্রতিভা জ্ঞান দিতে পারে। মনে করো আমি এখানে নেই, আমার কানে তুলা দেওয়া। ইউরিপিডিস হেসে ফেলল। ভুট্টা খেতে খেতে তারা নাটক নিয়ে আলাপ শুরু করল। লম্বা আলাপ।

গ্রিক ট্র্যাজেডি নাটক শুরু হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। শুরুর ঘটনাটি মোটামুটি এরকম: এথেন্সে নাটকের জন্ম হয়েছে বসন্ত উৎসবে। প্রতি বছর বসন্তের শুরুতে এথেন্সে বিশাল আনন্দ-ফূর্তি হয়। গ্রিকদের সবকিছুর দেবতা আছে। আনন্দ- ফূর্তির দেবতাও আছে। তার নাম ডিওনিসাস। বসন্তের শুরুতে ডিওনিসাসের নামে বসন্ত উৎসব হয়। সেই উৎসবেই জন্ম হয়েছে নাটক।

আনন্দের দেবতাকে খুশি রাখতে আনন্দ-ফূর্তি করতে হয়। ফূর্তি করার জন্য অনেকের দরকার হয় সুরা। তারা সুরা খায়, মাতাল হয় আর ফূর্তি করে। এর ফলে ডিওনিসাস যে

আনন্দের দেবতা সেটি লোকে ভুলে গেছে, লোকে বলে তিনি সুরার দেবতা। বসন্ত উৎসবকে অনেকে ডিওনিসাস উৎসব বলে। এই উৎসবে তারা হৈ-হুল্লোড়, নাচ-গান যা ইচ্ছা তাই করে।

এই ফূর্তিবাজিকে কাজে লাগাল এথেন্সের এক ধূর্ত শাসক। তার নাম পেসিসট্রাটাস[১৪]। সে ভাবলো ফূর্তি-ফার্তি দিয়ে যদি মানুষকে মাতিয়ে রাখা যায়, তাহলে তারা রাজনীতি নিয়ে ভাবার সময় পাবে না। আমার গদি পোক্ত হবে। বেশি করে ফূর্তি করার জন্য সে বসন্ত উৎসবকে এথেন্সের জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা করে দিল। বলল, যাও বাবা, মনের সাধ মিটিয়ে আনন্দ করো। সব খরচ সরকারের। তোমার কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি শুধু আনন্দ করো। যতদিন খুশি আনন্দ করতে থাকো। চূড়ান্ত উৎসব হবে পাঁচ দিন। এই পাঁচদিন যাতে ঝামেলা ছাড়া মাস্তি করা যায়, সেজন্য এক সপ্তাহ সরকারি ছুটি। তারপর বলল, আনন্দ করার জন্য একটি ভালো জায়গা দরকার। সরকারি ফূর্তি মানে উন্নত রকমের ফূর্তি। সেটি হতে হবে সবচেয়ে ভালো জায়গায়। সে এক্রোপোলিস পাহাড়ের উপরে তৈরি করে দিল থিয়েটার। পাহাড়ের ঢাল কেটে কেটে অর্ধচাদের মতো করে কাঠ বিছিয়ে বানানো হলো গ্যালারি। বলল, নাও, এখানে যত পার ফূর্তি করো। নাচ, গান যা খুশি করো। সবাই বলল, আমরা আনন্দ করব, আর আপনি কী করবেন? সে বলল, আমি তোমাদের পুরস্কার দেব। যে যত বেশি আনন্দ দিতে পারবে, তাকে তত বেশি পুরস্কার দেব। এই থিয়েটারে হবে নাচ-গানের প্রতিযোগিতা। অলিম্পিকে যেমন দৌড়-ঝাঁপের খেলা হয়, তেমনই বসন্ত উৎসবে হবে আনন্দের খেলা। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

এই কৌশল দারুণ সাড়া ফেলল। এথেন্সবাসী আনন্দে ধেই ধেই করে উঠল। হোমারের সময় থেকে পথে পথে ঘুরে যেসব চারণকবি গান লিখতেন, তারা প্রতিযোগিতার জন্য গান লিখতে বসলেন। অল্প দিনেই বসন্ত উৎসব হয়ে উঠল এথেন্সের এক নম্বর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের জন্য মানুষ সারা বছর ধরে কাজ করে। কবিরা পালাগান বানায়। কয়েকজন একসাথে কোরাস করে সেই পালাগান গায়। এভাবে দলে দলে প্রতিযোগিতা চলে। সেরা কোরাস দল পায় পুরস্কার।

তো এক বছর বসন্ত উৎসবে থেসপিস[১৫] নামক এক অখ্যাত কোরাস গায়ক অদ্ভুত একটি কাণ্ড করে বসল। সে মঞ্চে উঠল মুখোশ পরে। তার গায়ের পোশাকটাও উদ্ভট। দলের কোরাসের সময় সে মাঝে মাঝে গান থামিয়ে নিজে হাত-পা ছড়িয়ে অঙ্গ-ভঙ্গি করে কাহিনি বলতে শুরু করল। মানুষ তো হেসে লুটোপুটি। এ কোন ভাড়ামি! কী সব শুরু হলো কোরাস গানের মাঝে! কিছুক্ষণ পর থেসপিস অন্য একটি মুখোশ পরে অন্য রকম সংলাপ বলতে শুরু করল।

প্রথমে ভাঁড়ামি মনে হলেও মানুষ বুঝতে পারল— গানের মাঝে কথা আর অঙ্গভঙ্গির কারণে তারা পালাগানের কাহিনি আরও ভালো করে বুঝতে পারছে। বিচারকরাও একই

মত দিল। সেই বছর থেসপিস হয়ে গেল চ্যাম্পিয়ন।

থেসপিসের এই অভিনয় এথেন্সে নতুন একটা কিছু জন্ম দিল। পরের বছর আর কোনো দলই শুধু কোরাস গাইল না। সব দলেই এক এক জন লোক এলো অভিনেতা হিসেবে। এভাবে এথেন্সে সৃষ্টি হলো ইউরোপের প্রথম নাট্যকলা। এথেন্সের পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হলো থিয়েটার। কবি হোমার ও হেসিওডের যেসব কাহিনি এতদিন লোকে শুধু সুর করে বলত, এখন শুরু হলো সেগুলোর অভিনয়। তবে অভিনেতা শুধু একজন। সে মুখোশ বদল করে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। তার সাথে অনেকে কোরাস গায়। থেসপিস চালু করেছে বলে এই নাটককে অনেকে বলতেন থেসপিয়ান নাটক। আবার থেসপিস যখন প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হলো, তাকে পুরস্কার দেওয়া হলো একটি ছাগল, যেটি দেবতা ডিওনিসাসের কাছে উৎসর্গ করা হলো। ছাগলকে গ্রিকরা বলে ট্রাগোস, আর গানকে বলে অডি। ট্রাগোস আর অডি মিলে হয় ট্র্যাজেডি। tragos & ode : tragedy. থেসপিসকে ছাগল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল বলে এই সংগীতমাখা নাটককে অনেকে বলল ট্র্যাজেডি।

এরপর এথেন্সে গণতন্ত্র এলো। গণতন্ত্র মানে বাকস্বাধীনতা। গণতন্ত্রে সব কিছু বলা যায়। যে কারও সমালোচনা করা যায়। আগে যেসব কথা বলা যেত না, লেখা যেত না, গণতন্ত্র আসায় মানুষ সেসব লেখার সাহস পেল। সৃষ্টিশীল মানুষরা পেলেন স্বাধীনতা। লেখকরা মনের সুখে লিখতে শুরু করল। পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হলো থিয়েটার। গ্রিকরা যে কাজই শুরু করে, তাতেই চালু করে প্রতিযোগিতা। এখানে সবাই সবকিছুতে এক নম্বর হতে চায়। হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যে বীর একিলিসকে তার বাবা বলেছিলেন,

‘সময়ের সেরা হও
প্রতিদিন নিজেকে ছাড়িয়ে যাও
বিপদের ভয়ভরা রাতে সাহস বিছিয়ে দাও
পথ কঠিন? নিজের পথ তৈরি করে লও।’

এটি এথেন্সের মানুষের মূলমন্ত্র। নাটক চালু হতেই শুরু হলো লেখকদের এক নম্বর হওয়ার প্রতিযোগিতা। যখনই সুস্থ প্রতিযোগিতা হয়, তখনই প্রতিভাবান মানুষদের সুযোগ আসে। এরকম একজন মহাপ্রতিভাবান মানুষ হলেন এস্কিলাস। তিনি এসে বললেন, আমি নাটক নিয়ে নতুন কিছু করব। আর শুধু গানের অভিনয় নয়, টুকরো টুকরো গল্প নয়, আমি পূর্ণ কাহিনি বানাবো। পূর্ণ কাহিনিকে বলা হলো প্লট। তিনি প্লট বানানো শুরু করলেন। কাহিনি নিলেন হোমারের ট্রয় যুদ্ধ থেকে। ট্রয় যুদ্ধ শেষে গ্রিক রাজা আগামেমননের পরিবার আর অডিসিয়াসের পরিবারের ঘটনা নিয়ে তিনি কয়েকটি প্লট বানালেন। প্রতিটি কাহিনির সমাপ্তি খুব করুণ। ভাগ্যের হাতে নায়ক বা নায়িকার ভীষণ করুণ পরিণতি। দিনে দিনে নায়কের করুণ পরিণতিকেই বলা হলো ট্র্যাজেডি।

এস্কিলাস আর একটি নতুন কাজ করলেন। থেসপিস চালু করেছিলেন একজন অভিনেতা। এস্কিলাস নিলেন দুজন। গান কমে গেল, অভিনয় বেড়ে গেল। কোরাস কমে অভিনয়ই হয়ে উঠল প্রধান।

মানুষ অভিনয় দেখে আর মনে করে, এটি তো আমি। সবাই ভাবে এই নাটকের কাহিনিতে আমি নিজেই আছি। নায়কের করুণ পরিণতি আমারই পরিণতি। এই পরিণতির নামই ট্র্যাজেডি। এথেন্সে ট্র্যাজেডি নাটক তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠল। থেসপিস যেটি চালু করেছিলেন পালাগানের মতো করে, এস্কিলাস সেটিকে শিল্পে নিয়ে গেলেন। জীবনের অংশ করে তুললেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, গরিব সব মানুষের কাছে এক নম্বর বিনোদন হয়ে উঠল ট্র্যাজেডি নাটক। সব লেখকই ট্র্যাজেডি লিখতে শুরু করলেন।

কয়েক বছর পর এস্কিলাসের মনে হলো বড় বড় কাহিনি একটি নাটকে শেষ করা যায় না। একটি ঘটনার উপর মোটামুটি তিনটি নাটক হলে কাহিনি পূর্ণ হতে পারে। তিনি শুরু করলেন একই ঘটনার ওপর তিনটি নাটকের 'ট্রিলজি' বা ত্রয়ী। এখন বসন্ত উৎসবে একজন নাট্যকার ট্রিলজি অভিনয় করেন।

অভিনেতারা নিজেদের চেহারায় মঞ্চে ওঠে না। তারা মুখোশ পড়ে। চরিত্রের প্রয়োজনে মুখোশ বদলে নেয়। তাই থিয়েটার মানেই হরেক রকম মুখোশ। একই মানুষ মুখোশ বদলে হয়ে যায় দেব-দেবী, দৈত্য-দানব, রাজা- রানি, ডাইনি, যোদ্ধা, নারী-শিশু সবকিছু।

অভিনেতা মানেই পুরুষ। এথেন্সে নারীদের এখনও রাস্তায়ই নামতে দেওয়া হয় না, মঞ্চে ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। নারী-পুরুষ সব চরিত্রে ছেলেরাই অভিনয় করে। এথেন্সের বয়স্ক বিখ্যাত নাট্যকাররাই মঞ্চে উঠে তরুণী মেয়ের মতো কোমর দোলায়, নাকি সুরে কান্না করে।

আজ থিয়েটারে ট্র্যাজেডির জনক এস্কিলাস অভিনয় করবেন প্রমিথিউসকে নিয়ে তার লেখা তিনটি নাটকের ট্রিলজি।

***

১৩. বসন্ত উৎসব: মার্চের শুরুতে এথেন্সে দেবতা ডিওনিসাস এর উদ্দেশ্যে একটি উৎসব হতো, একে ডিওনিসাস উৎসবও (Festival of Dionysus) বলে। এই উৎসবেই ট্র্যাজেডির প্রতিযোগিতা হতো।

১৪. পেসিট্রাটাস: Peisistratos, এথেন্সে গণতন্ত্র চালুর পূর্বের একনায়ক। তিনি এক্রোপলিসের পাদদেশে পৃথিবীর প্রথম থিয়েটার ডিওনিসাস থিয়েটার তৈরি করেন।

১৫. থেসপিস: Thespis, এরিস্টটলের মতে তিনিই প্রথম মঞ্চে অভিনয় চালু করেন। তার নাম থেকেই থিয়েটারের অভিনেতাদের বলা হয় থেসপিয়ান (Thespian)

৩

‘যা ঘটছে সেটি ঘটনা নয়;
বরং সেটিকে তুমি কীভাবে নিচ্ছ সেটিই ঘটনা।’
—ইপিকটেটাস

***

মধুমাখা ভুট্টা ভাজা শেষ।

অনেকক্ষণ ধরে নাটকের আলাপ শুনতে শুনতে সক্রেটিসের কান ঝালাপালা। ইউরিপিডিস জ্ঞান দিয়েই যাচ্ছে। এতক্ষণে থিয়েটারের গ্যালারি কানায় কানায় ভরে গেছে। তিল ধারণের জায়গাও নেই। দুই কোনায় অনেক লোক দাঁড়িয়েও আছে। সতের হাজার আসনেও জায়গা হয় না। এখনই শুরু হবে অনুষ্ঠান।

বসন্ত উৎসব শুরু হয়েছে গতকাল। গতকাল সকালে সারা এথেন্সে শোভাযাত্রা, নাচ-গান হয়েছে। দুপুরে মন্দিরে পশু বলি, আর সন্ধ্যায় হয়েছে বিশাল খানাদানা। প্রথম দিনে কোনো নাটক নেই, নাটক শুরু দ্বিতীয় দিন থেকে। কয়েক মাস আগে নাট্যকারগণ নগরপালের কাছে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছেন। নগরপাল সেরা তিনজনকে বাছাই করেছেন। সেই তিনজন তিন দিন তিনটি ট্র্যাজেডি অভিনয় করবেন। আজ সারাদিন তিনটি নাটক অভিনয় করবেন নাট্যকার এস্কিলাস।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। নাটকের আগে কয়েকটি ছোট ছোট পর্ব আছে। এই বছর এথেন্সের যারা অলিম্পিকে পদক জিতেছেন, সেই সব বীর নাগরিক মঞ্চে এলেন। তারা সবাইকে তাদের পদক দেখালেন। এরপর এই বছর যেসব নাগরিক যুদ্ধে মারা গেছেন, তাদের সন্তানরা মঞ্চে এলো। গানের তালে তালে তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হলো। ঘোষণা করা হলো, আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সব ভার সরকারের। এরপর শুরু হবে নাটক। ঘোষণা হলো, মঞ্চে আসছেন নাট্যকার এস্কিলাস এবং প্রযোজক পেরিক্লিস[১৬]।

নাটকের খরচপাতি দেন প্রযোজক। প্রযোজক হন একজন ধনী নেতা। সম্মান ও পুরস্কারের জন্য তিনি খরচ করেন। এস্কিলাসের নাটক প্রযোজনা করছেন এথেন্সের গণতন্ত্রের এক নম্বর নেতা পেরিক্লিস।

এস্কিলাস দর্শকদের সালাম জানিয়ে মঞ্চের পেছনে চলে গেলেন। তিনি দলবল নিয়ে অভিনয় শুরু করবেন। আর পেরিক্লিস বসলেন গ্যালারিতে। তিনি বাম দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল এক পরমা সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি আসপাশিয়া। পেরিক্লিস চোখ ফেরাতে পারছেন না। নজর আটকে গেছে। সেই নজর লক্ষ করল আসপাশিয়া। তার বুক কেঁপে উঠল। এত বড় নেতা তাকে এমন করে দেখছে! আসপাশিয়া ভয় পেল। আবার ভালোও

লাগল। সে বারবার পেরিক্লিসকে দেখছে। সক্রেটিস বোকাসোকা মানুষ। পাশে বসেও এসবের কিছুই লক্ষ করল না।

নাটক শুরু হলো। প্রমিথিউসের কাহিনি নিয়ে এস্কিলাসের তিনটি নাটক— প্রমিথিউস বন্দি, প্রমিথিউস মুক্ত আর অগ্নিদাতা প্রমিথিউস। প্রথমে হবে 'প্রমিথিউস বাউন্ড'[১৭]। মানে প্রমিথিউস বন্দি। নাটকের কাহিনি এমন—

দেবতা জিউস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। পৃথিবীতে কোনো মানুষ থাকবে না। জিউসের হুকুম মেনে নিল সব দেবতা। কিন্তু একজন মানল না। তার নাম প্রমিথিউস। সে মানুষকে নিশ্চিহ্ন হতে দেবে না। এত বড় অন্যায় সহ্য করবে না। সে রাতের আঁধারে আগুন চুরি করল, নিয়ে গেল মানুষের কাছে। মানুষকে শেখাল আগুনের ব্যবহার। শুধু আগুন নয়, সে মানুষকে আরও অনেক কিছু শেখাল। কৃষিকাজ, লেখা, গণনা সবকিছু মানুষকে শিখিয়ে দিল। মানুষ হয়ে গেল ক্ষমতাবান। দেবতাদের মাতব্বরি শেষ। এই খবর শুনে জিউস বন্দি করল প্রমিথিউসকে। তার শাস্তি — তাকে ককেশাস পাহাড়ে শিকল দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

এই কাহিনি নিয়ে মঞ্চে এলেন বুড়ো এস্কিলাস। তিনি নিজেই প্রমিথিউস 1 এস্কিলাস মঞ্চে আসতেই সারা থিয়েটার করতালিতে ফেটে পড়ল। সতের হাজার মানুষ একসাথে হাততালি দিচ্ছে। চিৎকার করে স্বাগত জানাচ্ছে। মঞ্চে তিনি বৃদ্ধ প্রমিথিউস। হাত-পা শিকলে বাঁধা। তাকে পাহাড়ের দেয়ালে বাঁধা হচ্ছে। তবু দৃঢ় তার বিশ্বাস। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদী। মানুষের উপকারী 1

জিউসের হুকুমে তাকে বন্দি করছে তিনজন। একজনের নাম 'ক্ষমতা', একজন হলো 'শক্তি' আর তৃতীয়জন কর্মকার দেবতা 'হেফাস্টাস'। হেফাস্টাস আগুন দিয়ে লোহা পুড়িয়ে নানা জিনিস বানায়, শিকলও বানায়। সেজন্য জিউস তাকেই পাঠিয়েছে প্রমিথিউসকে বন্দি করতে। এই তিনজনের মধ্যে 'ক্ষমতা' আর 'শক্তি' খুবই নিষ্ঠুর। জিউসের আদেশ পালন করতে যত খারাপ হওয়া দরকার, তারা হবে। কিন্তু শিল্পী হেফাস্টাস নিষ্ঠুর না। প্রমিথিউসকে বন্দি করে সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে।

প্রমিথিউসকে বন্দি করতে এসে হেফাস্টাস বললেন, জিউস নিষ্ঠুর। ভীষণ নিষ্ঠুর। সে নতুন ক্ষমতা পেয়েছে। ক্ষমতার ধর্ম হলো— নতুন নতুন ক্ষমতা পেলে সবাই নিষ্ঠুর হয়ে যায়। এখন জিউসের মতো নিষ্ঠুর অন্য কেউ নেই।

দর্শকরা চমকে উঠল। মঞ্চে দেবতাদের গালি দিচ্ছে। জিউসকে অপমান করছে। ভয়াবহ ব্যাপার। কেউ কেউ বলছে, এটি তো নাটকের সংলাপ। এই কথা নাট্যকার বলছেন না, বলছেন আরেক দেবতা হেফাস্টাস। কাহিনির খাতিরে বলাই যায়।

সক্রেটিস ভাবছে, এথেন্সে এমন সাহসী উচ্চারণ সে জীবনে শোনেনি। এস্কিলাস যে এত সাহসী মানুষ, সেটি আগে জানা যায়নি। ইউরিপিডিস চারদিকে তাকাচ্ছে। মানুষ

চিৎকার করছে, কেউ নাট্যকারের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। বিপক্ষেই বেশি। বিশাল বিতর্ক। সারা থিয়েটারে চিৎকার হচ্ছে, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। নাটক প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

তখন মঞ্চে উঠলেন পেরিক্লিস। হাত তুলে বললেন, ভাইয়েরা আমার

তার এক কথাতেই সারা থিয়েটার চুপ। একেবারে পিনপতন নীরবতা। তার কণ্ঠস্বরে একটি শক্তি আছে। মানুষ সম্মোহিত হয়। তিনি এই নাটকের প্রযোজক। তার চেয়েও বড় কথা সে এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রধান নেতা। মানুষ তাকে বিশ্বাস করে, তাকে ভোট দেয়। সবাই আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পেরিক্লিস বললেন, আমরা সবাই প্রমিথিউসের কাহিনি জানি। আমাকে বলুন, এই কাহিনিতে দেবতা জিউস কিসের মতো? দর্শকরা বলল, অত্যাচারী একনায়কের মতো। পেরিক্লিস বললেন, আর প্রমিথিউস কিসের মতো? দর্শকরা বলল, সে প্রতিবাদী। পেরিক্লিস বললেন, ঠিক তাই, প্রমিথিউস মানুষের পক্ষে, সে একনায়কের বিরুদ্ধে, সে গণতন্ত্রের পক্ষে, সে আমাদের পক্ষে। আমরাই এক- একজন প্রমিথিউস। দর্শকরা চিৎকার করে বলল, হ্যাঁ, আমরাই প্রমিথিউস। পেরিক্লিস বললেন, আসুন, আমরা নাটকটি দেখি। আমাদের প্রিয় নাট্যকার এস্কিলাসকে তো আমরা চিনি। তিনি খারাপ কিছু করবেন না।

জাদুর মতো কাজ করল তার কথা। সকল দর্শক হাসিমুখে শান্ত হয়ে বসে পড়ল। পেরিক্লিস যতক্ষণ কথা বলছিল, আসপাশিয়া মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল। মানুষের ব্যক্তিত্ব এমন পর্বতের মতো হতে পারে! সে নিশ্চিত, একই কথা অন্য কেউ বললে দর্শকরা মানত না।

আবার নাটক শুরু হলো। এস্কিলাস মঞ্চে এলেন। তিনি ভয় পাননি। আগের চেয়ে বেশি সাহস নিয়ে ফিরে এসেছেন। প্রমিথিউস পাহাড়ের দেয়ালে বন্দি। তার কাছে এলো সাগর কন্যারা। এই কন্যারা শুধু কোরাস গায়। তারা সুরে সুরে তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তাকে বন্দি করেছে?

প্রমিথিউস বলল, বন্দি করেছে এক একনায়ক। তার নাম জিউস। একনায়করা সব সময় অবিশ্বাসের রোগে ভোগে, তারা না পারে বন্ধুকে বিশ্বাস করতে, না পারে পরিবারকে বিশ্বাস করতে।

এটি আগের চেয়ে খারাপ কথা। কিন্তু এবার আর দর্শকরা চিৎকার করল না, বরং হাততালি দিল। পেরিক্লিসের এক কথায় সব বদলে গেছে।

সাগর কন্যারা জিজ্ঞেস করল— কেন বন্দি করেছে?

প্রমিথিউস ধীরে ধীরে বলল, জিউস যেদিন দেবলোকের রাজা হলো, সেদিন সে সকল দেবতাকে একটি করে উপহার দিল, সবাইকে খুশি করে নিজের গদি পোক্ত করল। কিন্তু সে মানুষকে মনে করল অতি তুচ্ছ। জিউস ভাবল, মহাবিশ্বে মানুষের কোনো দরকার নেই। এদের ধ্বংস করে দিতে হবে। দেবতারা কেউ প্রতিবাদ করল না। তারা জিউসের

ঘুষ পেয়ে তার কথায় হ্যাঁ হ্যাঁ করছে। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। শুধু প্রতিবাদ করলাম— আমি। এই প্রমিথিউস। আমিই সাহস করলাম, মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমি তাদের দিলাম আগুন। এই আগুন থেকেই তারা সবকিছু করতে পারবে।

আমি তাদের অন্তরে একটি নতুন জিনিস ঢুকিয়ে দিলাম— জিনিসটার নাম আশা। এখন তারা শত বিপদেও আশা রাখবে। তারা বাঁচতে চাইবে।

আগে মানুষের চোখ ছিল, তারা তাকাত, কিন্তু যেটি দেখার দরকার সেটি দেখতে পেত না। তাদের কান ছিল, কিন্তু যেটি শোনার দরকার সেটি শুনতে পেত না। তাদের দিন কাটত উদ্দেশ্যহীন। তারা পিঁপড়ার মতো অন্ধকার গুহায় থাকত। বাড়ি-ঘর বানানো জানত না। আমি তাদের হাতে তুলে দিলাম আগুন। শিখিয়ে দিলাম কৃষিকাজ, ঋতুর জ্ঞান। সংখ্যার জ্ঞান দিলাম তাদেরকে, তারা হিসাব করতে শিখে গেল। পড়া আর লেখার কৌশল দিয়ে দিলাম, তারা জ্ঞানী হয়ে গেল।

এজন্য আমার ওপর ক্ষেপে গেল জিউস।

দর্শকরা চিৎকার করে বলল, প্রমিথিউস, তুমিই আমাদের সবকিছু শিখিয়েছ। তোমাকে সালাম। এবার দর্শকরা খুব খুশি। সবার জীবনের সাথে মিলে গেছে। সবাই ভাবছে— হ্যাঁ, প্রমিথিউসই এসব আমাকে দিয়েছে, তাই আমি এখন এত কিছু পারি।

নাটক চলছে: সাগর কন্যারা প্রমিথিউসকে উপদেশ দিল। মুক্তির উপায় ভাবতে বলল। প্রমিথিউস হেসে বলল, যতক্ষণ সমস্যা নিজের ওপর না আসে, ততক্ষণ সমস্যাগ্রস্ত লোককে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ।

দর্শকরা বলল, 'ঠিক ঠিক'। এখন অভিনেতা যা বলছে, তাই দর্শকদের ভালো লাগছে। প্রমিথিউস দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। সে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব জানে। এটি জিউসও জানে না। অনেক জিনিস জানার জন্য জিউসের তাকে দরকার।

এরপর মঞ্চে প্রমিথিউসের কাছে এলো তার বন্ধু মহাসাগরের দেবতা, নাম ওশান (Ocean)। ওশান জিউসের কাছে যাবে প্রমিথিউসের জন্য ওকালতি করতে। প্রমিথিউস বলল, 'গিয়ে লাভ হবে না, যেও না। সময় হলে জিউস নিজেই আমাকে মুক্ত করতে বাধ্য হবে।'

নাটকের ভিলেন হলেন জিউস। জিউসের শয়তানি ভালো করে বোঝাতে এবার কাহিনিতে নিয়ে এলেন আরেকটি মেয়েকে। এই মেয়েটিও জিউসের দুষ্টকাজের শিকার, নাম আইও। সুন্দর মেয়ে দেখলেই জিউসের দুষ্ট বুদ্ধি আসত। আইওকে দেখেই সে ধরতে গেল। কিন্তু জিউস যদি দুষ্ট হয়, তার বউ হেরা মহাদুষ্ট। স্বামীকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে সেখানে হাজির হলো হেরা। তখন বউয়ের কাছে ইজ্জত বাঁচাতে জিউস ফুঁ দিয়ে মেয়েটিকে একটি ষাঁড় বানিয়ে ফেলল। তার বউ হেরা সেই ষাঁড়ের পিছনে লেলিয়ে দিল একটি লম্বা হুলযুক্ত মাছি। মাছিটি ষাঁড়রূপী মেয়েটিকে সারাক্ষণ তাড়াচ্ছে। আর মেয়েটি জীবন বাঁচাতে ছুটছে, প্রাণপণ ছুটছে।

সেই মেয়ে আইও ছুটতে ছুটতে চলে এলো প্রমিথিউসের কাছে। দুজনই জিউসের অন্যায়ের শিকার। দুইজনই নিরপরাধ। তারা অনেক কথা বলল। নিজেদের কাহিনি বলল। প্রমিথিউস বিরাট জ্ঞানী। সে অতীত, ভবিষ্যৎ সব দেখতে পায়। সে বলল, আইও, তুমি ছুটতে ছুটতে যে সাগর পার হয়ে এসেছ, একদিন সেই সাগরের নাম হবে আইওনিয়ান সাগর।

থিয়েটারের দর্শকরা বলল, ঠিক ঠিক। আমরা সবাই জানি— এখন সেই সাগরের নাম আইওনিয়ান সাগর। ঐ যে এথেন্সের পূর্ব দিকে সেই সাগর।

প্রমিথিউস বলল, আইও, তুমি ষাঁড়ের রূপেই সাগর প্রণালি পার হয়ে ইউরোপ থেকে মিশরে চলে যাবে। ষাঁড়ের রূপে তুমি প্রণালিটি পার হবে বলে এর নাম হবে বসফোরাস।

গ্রিক শব্দ 'বস্' মানে ষাঁড়, 'পোরাস' মানে পথ। বপোরাস বা বসফোরাস মানে ষাঁড়ের চলার পথ।

দর্শকরা বলল, ঠিক ঠিক, এশিয়া আর ইউরোপের মাঝের সাগর প্রণালির নাম এখন বসফোরাস

আইও জানতে চাইল, কে প্রমিথিউসকে মুক্ত করবে?

প্রমিথিউস বলল, তোমার বংশের ত্রয়োদশ প্রজন্মের এক ছেলে আমাকে মুক্ত করবে।

দর্শকরা চিৎকার করে বলল, হ্যাঁ জানি, সেই ছেলের নাম হারকিউলিস। এরপর মঞ্চে এলো জিউসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছেলে হার্মিস। সে বাবার কথায় সবকিছু করে। সে আবার দেবতাদের দূত।

জিউস সমস্যায় পড়েছে। সে জানে যে তার নিজের এক ছেলে ভবিষ্যতে তাকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু জানে না কে হবে সেই ছেলে, কে হবে তার মা। এটি শুধু জানে প্রমিথিউস। সেজন্য জিউস হার্মিসকে পাঠিয়েছে প্রমিথিউসের কাছে

হার্মিস মঞ্চে এসেই হম্বিতম্বি শুরু করল। সে তার বাপের মতোই গোঁয়ার। সে বলল, কী হে প্রমিথিউস, জনাব আগুন চোর। বলো, কাকে বিয়ে করলে জিউস তার রাজ্য হারাবে? কে সেই নারী? কে তার ছেলে? এক্ষুনি বলে দাও। তুমি যদি বলো, তাহলে জিউস তোমার কথা বিবেচনা করবে। সে তোমাকে মাফ করলেও করতে পারে।

প্রমিথিউস হাসতে হাসতে হার্মিসকে বলল, ভালো করে শুনে নাও—

যতই কষ্ট আমি পাই, কোনো আফসোস নাই
তবু কষ্টের বদলে কোনোদিন দাসত্ব না চাই

প্রমিথিউস কিছুতেই বলবে না। যদি জিউস তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়, শুধু তাহলেই সে বলবে। তার আগে কিছুতেই নয়।

হার্মিস অনেক ভয় দেখাল। কিছুতেই প্রমিথিউস টললো না। হার্মিস বলল, তোমার এই জেদের অর্থ কী?

প্রমিথিউস বলল, সময় হলেই বুঝবে—

চলতে চলতে বুড়ো হয়— নিষ্ঠুর সময়
জীবনকে ভুল-শুদ্ধের হিসাব বলে দেয়

হার্মিস বলল, তুমি যদি না বলো, তুমি ভাবতেও পারবে না, জিউস তোমাকে কী শাস্তি দিবে। তোমার দিকে ছুটে আসবে জিউসের ঈগল। তারা সারাদিন তোমার কলিজা খাবে। বছরের পর বছর খাবে।

প্রমিথিউস বলল, পৃথিবীর যত সাজা আছে, সব দিলেও আমি নত হবো না। তুমি জিউসকে জানিয়ে দিও।

হার্মিস চলে গেল। সাথে সাথে শুরু হলো শাস্তি। আকাশ পাতাল কেঁপে উঠল, একের পর এক বজ্র আসছে প্রমিথিউসের দিকে। তার মাথা ঘুরছে, চারদিক অন্ধকার। সেই অন্ধকারে প্রমিথিউস অপেক্ষা করছে কখন ঈগল আসবে তার বুক ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য।

এস্কিলাসের প্রথম নাটক শেষ হলো। নাটক শেষ হতেই ইউরিপিডিস নাটকের সংলাপ বলতে লাগল। সে ঝড়ের মতো একের পর সংলাপ বলছে। এই মাত্র শুনেই সে সব মনে রেখে দিয়েছে। তার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। সক্রেটিসের স্মৃতিশক্তি তার চেয়েও ভালো। কিন্তু সেটি নাটকের জন্য নয়। নাটকের ছন্দবাঁধা সংলাপ সক্রেটিসের আসে না। মনেও থাকে না।

থিয়েটারে এখন দুপুরের খাবারের বিরতি। সক্রেটিস, ইউরিপিডিস আর আসপাশিয়া বাইরে বের হলো। খাবারের দোকানে যাবে। এখনই ভরপেট খেয়ে বসতে হবে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় নাটকের মধ্যে বিরতি নেই।

আসপাশিয়া দেখল— পেরিক্লিস গম্ভীর মুখে কী সব বলছেন। তার চারপাশে অনেক মানুষ। আসপাশিয়ার সারা শরীর কাঁপছে। পেরিক্লিসের চোখগুলো ভালো করে দেখতে তার খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেও সবকিছু দেখা ঠিক নয়। সে সক্রেটিসের সাথে খাবারের দোকানে ঢুকে গেল।

এস্কিলাস দ্বিতীয় নাটক শুরু করলেন। নাটকের নাম 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড' মানে প্রমিথিউস মুক্ত। ভয়াবহ যন্ত্রণায় চিৎকার করছে প্রমিথিউস। সারা দিন দুটি ক্ষুধার্ত ঈগল প্রমিথিউসের কলিজা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে কলিজা শেষ করে ফেলে। রাতে আবার কলিজা জন্মায়। পরদিন সকালে ঈগলগুলো এসে আবার ঠুকরে ঠুকরে খায়। এভাবে দিনের পর দিন অসহ্য কষ্ট সহ্য করছে প্রমিথিউস। মাঝে মাঝে জিউস খবর পাঠায়। যদি সে বলে যে কোন্ ছেলে তাকে ভবিষ্যতে হারাবে, তাহলে তাকে মাফ করে দেবে। কিন্তু প্রমিথিউস অনড়। সে জিউসের মতো শয়তানকে কিছুই বলবে না। তাতে যত যন্ত্রণাই আসুক। অবশেষে এক সময় জন্ম নিলো হারকিউলিস। মহান বীর। সে জিউসেরই পুত্র। সে হারিয়ে দিল জিউসকে। ঈগলগুলোকে মেরে মুক্ত করল প্রমিথিউসকে।

তৃতীয় নাটক 'প্রমিথিউস আগুনদাতা'। মানুষকে আগুন দান করে প্রমিথিউস কী কী উপকার করেছে, সেটি নিয়ে মজা করে লিখেছেন এস্কিলাস। এই নাটকে প্রমিথিউস খুবই ভোলাভালা প্রেমিক ধরনের, কিন্তু বিচক্ষণ। সে মানুষকে নানান বিদ্যা শেখায়। সে সবার কথা শোনে, মানুষের মতামত নিয়ে কাজ করে। সে গণতান্ত্রিক দেবতা। সে ভালো ভালো কাজ করে আর মজা করতে করতে অত্যাচারী একনায়ক জিউসকে গালি দেয়।

নাটক শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সক্রেটিস খুব খুশি। নাটক যে এমন হতে পারে, তার ধারণাই ছিল না। সে ছোটবেলা থেকে নাটক দেখছে। নাটক মানে লেখকরা ভূরি ভূরি ডাহা মিথ্যা কথা লেখে। বানিয়ে বানিয়ে অভিনয় করে। খালি মিথ্যার কারবার। সক্রেটিস সত্যের পূজারি। সে নাটক পছন্দ করে না। কিন্তু এই তিনটি নাটক দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল। এখানে দেবতাদের জন্য কোনো তেলবাজি নেই। এখানে মানুষের কথা। প্রমিথিউস মানুষকে বাঁচিয়েছে সেই কথা। সক্রেটিস খুবই পছন্দ করল এই নাটক।

সক্রেটিস আর ইউরিপিডিস আসপাশিয়াকে এগিয়ে দিল। একটি গাধার গাড়ি করে বিদায় নিল আসপাশিয়া। সে চারদিকে তাকাচ্ছে যদি পেরিক্লিসকে একবার হলেও দেখা যায়।

ইউরিপিডিস ছুটছে বাড়ির দিকে। কাল সকালে আবার আসতে হবে। কাল তিনটি নাটক। তাতে অভিনয় করবেন সফোক্লিস।

সক্রেটিস আগোরার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

পেছন থেকে ডাক দিল ক্রিতো। সক্রেটিস পেছন ফিরে দেখে ক্রিতো আর তার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

ক্রিতোর বাবা বললেন, এই যে জ্ঞানের বটবৃক্ষ, তোমার বাবা তোমাকে খুঁজছেন। এখুনি বাড়ি যেতে বলেছেন। তোমার নতুন খালা তোমাদের বাড়ি গেছেন।

'কে, ডিওটিমা[১৮] খালা?'

'হ্যাঁ, তিনিই।'

সক্রেটিস আনন্দে নেচে উঠল। তাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে। ডিওটিমা খালাকে সে ভীষণ পছন্দ করে। এই নতুন খালা একজন জ্ঞানপ্রেমী মানুষ।

ডিওটিমা সক্রেটিসের সত্যিকার খালা নন। তিনি একজন পুরোহিত। নারী পুরোহিত। এথেন্স থেকে একশ মাইল পশ্চিমে স্পার্টার কাছে মানটিনিয়া নামক এক শহরে দেবতা জিউসের একটি মন্দির আছে। ডিওটিমা সেই মন্দিরের পুরোহিত।

এথেন্সে নারীদের বাইরে বের হওয়া নিষেধ। কিন্তু পুরোহিত নারীদের জন্য নিষেধ নেই। পুরোহিত নারীরা দেবতার পূজা করে, ধর্ম-কর্ম করে। তারা পুরুষদের বিপথে নেয় না, বরং ধর্মের পথে রাখে। তাই মন্দিরের নারীরা বাইরে আসতে পারে, সবার সামনে বেপর্দা হয়ে কথা বলতেও পারে। তাদের মধ্যে যারা স্টার পুরোহিত, তারা নগরে নগরে

ঘোরে। আখড়া বানিয়ে থাকে, আসর বসিয়ে ধর্মকথা বলে। ডিওটিমা সেরকম একজন নামকরা পুরোহিত। কিছুদিন হলো তিনি এথেন্সে এসেছেন। এথেন্সে তার আখড়ায় দেবতাদের গুণগান হয়। সেসব শুনতে অনেক মানুষ ভিড় করে।

এথেন্সে এসে ডিওটিমা কোনো এক আজানা কারণে খুব পছন্দ করেছেন সক্রেটিসের মাকে। সক্রেটিসের মায়ের সাথে ডিওটিমার দোস্তি' হয়ে গেছে। তারা বোন পাতিয়েছেন।

সক্রেটিস এক্ষুনি বাড়ি যাবে। ডিওটিমার কথা শোনার জন্য সে অনেকবার তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে গভীর রাত পর্যন্ত আখড়ায় বসে ছিল। এই নারীর কথায় কেমন একটি সম্মোহন আছে। প্রতিটি বিষয়ে তিনি একটি না একটি গল্প তৈরি করে ফেলেন। রহস্য গল্প। গল্পে এমন টান থাকে, সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। সক্রেটিস তার বিরাট ভক্ত। বিশেষ করে প্রেম বিষয়ে এই নারীর বিশ্লেষণ একেবারে আলাদা। সক্রেটিস সময় পেলে তার সাথে ভালোবাসা নিয়ে কথা বলে।

ক্রিতো বিষয়টা জানে। সে সক্রেটিসকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, সক্রেটিস, তাড়াতাড়ি যাও। খালা বসে আছেন প্রেমের ক্লাস শুরু করতে।

সক্রেটিস বলল, উল্টা-পাল্টা কিচ্ছু বলবা না। তিনি খুব জ্ঞানী মানুষ। আমার গুরু।

'শুধু গুরু? নাকি প্রেমের গুরু?'

সক্রেটিস চোখ পাকিয়ে বললেন, উনি যদি আমাকে প্রেম শিখান, তোমার কোনো অসুবিধা আছে?

ক্রিতো বলল, অসুবিধা নয়, সুবিধা। তুমি তার কাছে প্রেম শিখে আমাদের শেখাবে। আমরা পাব একটি নতুন জিনিস, সক্রেটিসের প্রেমতত্ত্ব।

সক্রেটিস বলল, যতই পিন মারো, সত্য হলো— প্রেমের বিষয়ে ডিওটিমা খালা একজন বিশারদ। আমি কোনো পুরুষকে এমন করে প্রেমের কথা বলতে শুনিনি। তুমি এথেন্সের পুরুষদের জিজ্ঞেস করো, প্রেম কী। তারা বলবে, প্রেম হলো নারী-পুরুষ, বিয়ে-শাদি, শরীর-টরির মিলিয়ে বিতিকিচ্ছিরি এক ব্যাপার।

'আর ডিওটিমা কী বলেন?'

'তিনি বলেন, প্রেম হলো একটি অনুভূতি। অনুভূতিটি ঈশ্বরের দেওয়া। প্রেমের অনেক শক্তি। প্রেম ভাঙতেও পারে, আবার গড়তেও পারে। তুমি কেমন করে সেই প্রেমকে কাজে লাগাবে সেটি তোমার ব্যাপার।'

ক্রিতোর মনে হচ্ছে ডিওটিমার খপ্পরে পড়ে তার বন্ধুটা জ্ঞানী সক্রেটিস থেকে প্রেমিক সক্রেটিস হয়ে যাচ্ছে। সক্রেটিস আগে কোনোদিন প্রেম নিয়ে কথা বলেনি। এথেন্সে প্রেম-ট্রেমের কোনো কারবার নেই। বাড়ির বাইরের মেয়েদের মুখ দেখাই নিষেধ। প্রেম আসবে কোত্থেকে? তবে সক্রেটিসের মুখে প্রেমের কথা শুনতে ক্রিতোর ভালো লাগছিল। প্রেমের কথা শুনতে ভালো লাগে না, এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই।

ক্রিতো বলল, থামলে কেন? আর একটু চলুক তোমার প্রেমের ক্লাস

সক্রেটিস বলল, ক্লাস নেওয়ার জন্য খাতাপত্র নিয়ে বসে আছেন প্রেম বিশারদ ডিওটিমা খালা। আগে সেই ক্লাস করে আসি।

সক্রেটিস বাড়ির দিকে দৌড় দিল

***

১৬. পেরিক্লিস: Pericles, (খ্রি.পূ. ৪৯৫-৪২৯), এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রধান নেতা। ক্লাসিক্যাল এথেন্সের সব রকম জ্ঞানচর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি যে সময় এথেন্সের নেতা ছিলেন, সেটিই ছিল এথেন্সের স্বর্ণযুগ, এটিকে Age of Pericles বলা হয়।

১৭. Prometheus Bound এর কাহিনি অংশ D. H. Robert কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ থেকে নিয়েছি।

১৮. ডিওটিমা: নারী দার্শনিক এবং মন্দিরের পুরোহিত। খ্রি.পূ. ৪৪০ অব্দের দিকে তিনি এথেন্সে এসেছিলেন।

৪

‘আমি শুধু একটি জিনিসই জানি,
সেটি হলো–আমি কিছুই জানি না।’
—সক্রেটিস

ডিওটিমার কাছে প্রেমের ক্লাস করার জন্য সক্রেটিস তাড়াহুড়া করে বাড়ি এসেছে। কিন্তু তার কপালে প্রেমের ক্লাস নেই। এখন যা চলছে সেটিকে বলা যায় মায়ের ঘ্যান

ঘ্যান ক্লাস।

পৃথিবীর সব মা সন্তানকে একই ভাষায় বকা দেন। একই স্বরে ঘ্যান ঘ্যান করেন। বিধাতা মায়েদের ঘ্যান ঘ্যান করার এক অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে সক্রেটিস তার মায়ের ঘ্যান ঘ্যান সহ্য করছে। ভর সন্ধ্যায় তার বাড়ি থাকার কথা নয়। সন্ধ্যাবেলা সক্রেটিস বাড়ির বারান্দায় বসে আছে— এমন ঘটনা কত বছর আগে হয়েছিল, মা মনে করতে পারছেন না। আজ শুধু ডিওটিমা খালার টানে ভর সন্ধ্যায় সক্রেটিস বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু খালার সাথে কথা শুরু করতে পারেনি।

বাড়ি আসতেই মা বকা শুরু করেছেন। ধর্মের বোন ডিওটিমাকে সামনে রেখে ছেলেকে শাসন করছেন। মায়ের বিস্তর অভিযোগ। একের পর এক বলে যাচ্ছেন। সক্রেটিসের মনে হচ্ছে, মা বুঝি একটি অনুষ্ঠান করছেন, অনুষ্ঠানের নাম 'বিরতিহীন অভিযোগমালা' কিংবা 'আপনার নালিশ আপনার মুখে।

সক্রেটিস সব অভিযোগ নীরবে হজম করছে। হজম যাতে ভালো হয় সেজন্য সে মায়ের একেবারে পায়ের কাছে বসেছে। অবশ্য হজম না করে কোনো উপায় নেই। একটি অভিযোগও মিথ্যা নয়। একের পর এক অভিযোগ চলছে।

প্রথম অভিযোগ— সক্রেটিস সময়মতো বাড়ি ফেরে না। দিন নেই রাত নেই শুধু টো টো। পোশাক-আশাকের ঠিক-ঠিকানা নেই। খালি পায়ে সারা এথেন্স ঘোরে। বাড়ি ফেরে শেষ রাত্রে। কোনো কোনো রাতে বাড়ি ফিরেও না।

দ্বিতীয় অভিযোগ— সক্রেটিস বাবার সাথে মূর্তি বানাতে যায় না। বাবা বুড়ো হচ্ছেন। জোয়ান ছেলে পিতার কোনো কাজে আসছে না। সংসারে কোনো নজর নেই।

তৃতীয় অভিযোগ— সক্রেটিসের নামে তার বাবার কাছে প্রতিদিন নালিশ আসে। সক্রেটিস নাকি এথেন্সের বাচ্চাদের কুবুদ্ধি দেয়। উল্টাপাল্টা কথা শেখায়। তর্ক করতে শেখায়। এই নালিশ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। প্রথম প্রথম মাসে দুই একটি নালিশ আসত। তারপর সেটি সাপ্তাহিক হয়ে গেল। এখন দৈনিক। দিনে চার-পাঁচ জন ব্যক্তি তার বাবার কাছে নালিশ করে। সক্রেটিসের বাবা ছেলের নাম দিয়েছেন নালিশ কুমার।

নালিশ কুমারের নামে এই মুহূর্তে তার মা একের পর এক নালিশ করে যাচ্ছেন। থামাথামির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সক্রেটিস নীরব। মা বলছেন বলুক। মায়েরও তো দায়িত্ব আছে। মাতৃদায়িত্ব পালন করুক। সে মাঝে মাঝে আহ্লাদি মুখে মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। ভাবটা এমন যেন মাকে বলার সুযোগ দিয়ে ধন্য করছে। মা ভালোই ধন্য হচ্ছেন। মনের ঝাল মিটিয়ে বকা দিচ্ছেন।

কিন্তু সক্রেটিসকে বকা দিয়ে কোনো মজা নেই। কথার পিঠে কথা না হলে বকা দিয়ে সাধ মেটে? একলা একলা কতক্ষণ ঝগড়া করা যায়!

তবে মায়ের শান্তি এটুকু যে, ছেলে মা-বাবাকে অসম্মান করে না। এই বয়সেও চুপ করে মায়ের বকা শোনে। মুখে মুখে তর্ক করে না।

সক্রেটিসের মা একজন ধাত্রী। সন্তান জন্ম দিতে নারীদের সাহায্য করেন। তাঁর নাম ফেনারিটি। সক্রেটিসের বাবা একজন রাজমিস্ত্রি। মাঝে মাঝে মূর্তি ও বানান। বাবার নাম সফ্রোনিকাস। তাদের সুন্দর পাড়াটির নাম এলোপেকি। এথেন্সে নামের সাথে এলাকার নাম যোগ করে পুরো নাম হয়। সেই হিসেবে সক্রেটিসের পুরো নাম সক্রেটিস এলোপেকিথেন (Socrates Alopekethen)।

এই পাড়ায় একটু কম আয়ের মানুষ বাস করে। তাদের বেশিরভাগই রাজমিস্ত্রি। সক্রেটিসের বাবাও রাজমিস্ত্রি। তার অল্প কিছু জমি-জমা আছে। তাতে জলপাই হয়। এছাড়া ঘর বানানো, মূর্তি বানানো— যখন যেটি পান, সেটিই করেন। সংসার মোটামুটি চলে যায়। এই মধ্যবিত্ত পাড়ায় একমাত্র ধনী ক্রিতোর পরিবার। যেমন তেমন ধনী নয়, একেবারে মহাধনী। এথেন্সের সেরা পাঁচজন ধনীর মধ্যে ক্রিতোর বাবা একজন।

সক্রেটিসের বাবাও আজ বাড়ি আছেন। তিনি ঘরে বসে স্ত্রীর গালি শুনছেন। বাবার মজাই লাগছে। শুধু ডিওটিমার সামনে ছেলেটাকে উল্টা-পাল্টা বলছে, সেটি একটু খারাপ লাগছে। কী আর করা! স্ত্রী-বুদ্ধি সব সময়ই প্রলয়ংকরী।

বাবার সাথে সক্রেটিসের কথাবার্তা তেমন হয় না। তার কারণ এই বয়সে পিতা-পুত্র আলাপ করলে অবশ্যই টাকা-পয়সার কথা উঠবে, সংসারের কথা উঠবে। কিন্তু সক্রেটিসের জীবনে টাকা-পয়সার কোনো প্রয়োজন নেই। সংসার তার কাছে ঝামেলা। তাই পিতা এখন আর সক্রেটিসকে ঘাঁটান না। পিতা জানেন সক্রেটিস বৈরাগী স্বভাবের। তার বৈরাগী মন বাবার জন্য বড় কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো ইদানীং লোকজন প্রতিদিন ছেলের নামে নালিশ করছে। সক্রেটিস নাকি এথেন্সের ছোট ছোট বাচ্চাদের মাথা নষ্ট করছে। এই নালিশ নিয়ে পিতা মাঝে মাঝে সক্রেটিসকে তলব করেন।

বাবা বললেন, কী রে, তুই নাকি ক্রিতোকে নষ্ট করে ফেলছিস?

'কী করে ফেলছি?'

'কান কি ঠসা হইছে? নষ্ট করে ফেলছিস।'

'নষ্ট করা মানে কী?'

'নষ্ট করা মানে কুপথে নিয়ে যাচ্ছিস।'

'কুপথ কী?'

আর সহ্য হলো না। বাপের সাথেও প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলা! ঠাস করে একটি চড় দিলেন সক্রেটিসকে। তার বাম গাল লাল হয়ে গেল।

গালে হাত বুলিয়ে হাসি মুখে সক্রেটিস বলল, বাবা, এই গালে আরেকটা চড় দেন। আপনি আমার বাবা। শাসন তো করবেনই। তবু বলেন, কুপথ মানে কী? আমি ক্রিতোকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছি?

এই প্রশ্নের উত্তর পিতার কাছে নেই। তিনি জানেন তার ছেলে জ্ঞানপ্রেমী। ছেলের বন্ধুরাও তাই। এরা কেউ কুপথে যায়নি। এরা সারাদিন জ্ঞান নিয়ে থাকে। পারলে জ্ঞান খায়, জ্ঞানকে বালিশ বানিয়ে ঘুমায়, আবার ঘুমের মধ্যে জ্ঞান নিয়েই স্বপ্ন দেখে। এদের কোনো কুঅভ্যাস নেই। এদের চেয়ে ভালো ছেলে এথেন্সে আর একটিও নেই।

ছেলেকে থাপ্পড় দিয়ে বাবার খারাপ লাগছে। তিনি ডিওটিমার সামনে ছেলেকে চড় দিলেন! ছিঃ ছিঃ, একটু আগে ভাবছিলেন স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ংকরী। আর এখন তিনি নিজেই অবুদ্ধিমানের কাজ করলেন! তার মানে শুধু স্ত্রী-বুদ্ধিই না, স্বামী-বুদ্ধিও প্রলয়ংকরী হতে পারে।

মনে মনে তিনি ছেলেকে সমীহ করেন। সক্রেটিস তার ছেলে— এটি ভেবে তার গর্বও হয়। কোত্থেকে যে ছেলে এত কিছু জানে! ঐ ছোট্ট মাথায় এত চিন্তা কী করে আসে! শহরের সবাই তার ছেলেকে নিয়ে আলাপ করে। দূর থেকে তাকে দেখলে বলে, 'ঐ যে, উনি সক্রেটিসের বাবা।' ছেলের বয়স বিশ বছর না হতেই, মানুষ তাকে ছেলের পরিচয়ে চিনছে। তার নিজের নাম লোকে ভুলে যাচ্ছে। সফ্রোনিকাস নামে এখন আর তেমন কেউ তাকে ডাকে না। সবাই বলে, সক্রেটিসের বাবা।

বাবা সক্রেটিসকে বললেন, শোনো, আমি আর তোমার নামে নালিশ শুনতে চাই না। ত্যক্ত হয়ে গেছি। সারাদিন নালিশ আর নালিশ। তুমি তো আর সক্রেটিস নেই, তুমি হয়ে গেছো নালিশ কুমার। আমি এখন আর সক্রেটিসের বাপ না, নালিশ কুমারের বাপ

সক্রেটিস বলল, বাবা, নালিশ মানে কী?

এবার পিতার মনে হলো— এই শয়তানকে দুই গালেই থাপ্পড় দেওয়া দরকার। একে সারাদিন থাপ্পড়ের ওপর রাখলে ঠিক হবে।

পিতা অন্য কাজে মন দিলেন। এর সাথে আলাপ করে কোনো লাভ নেই। মানুষ অধিক শোকে পাথর হয়ে যায়। সক্রেটিসের পিতা অল্প শোকেই পাথর হয়ে গেছেন। শুধু মাঝে মাঝে পাথর স্বভাব ত্যাগ করে সক্রেটিসকে বলেন, জনাব নালিশ কুমার, আজ আপনার নামে পাঁচখানা নালিশ এসেছে, গতকাল ছিল সাতখানা।

তবে পিতা জানেন তার ছেলে আলাদা রকমের। এই ছেলে সময়ের চেয়ে আগানো এক মানুষ। এ রকম মানুষের পিতা হওয়া খুব সৌভাগ্যের, আবার একই সাথে খুবই দুর্ভাগ্যের। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক পিতা মেনে নিয়েছেন। তিনি আর সক্রেটিসকে বকাঝকা করেন না। বকাঝকা যা করার, মা-ই করেন।

ছেলের জন্মের পর মা নাম রেখেছিলেন সক্রেটিস (Socrates)। গ্রিক শব্দ Sos আর Kratos মিলিয়ে হয় Socrates, Sos মানে নিরাপদ আর Kratos মানে শক্তিশালী। মা-বাবা চেয়েছিলেন ছেলে সুস্থ, সবল আর নিরাপদ হোক।

ছেলে অবশ্যই সুস্থ-সবল হয়েছে কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয়েছে আলাভোলা। তার বৈরাগী স্বভাব। কোনোকিছুতেই মন নেই। নিজের খেয়ালে থাকে। পড়াশুনায় ভালো। বই

পড়তে অনেক ভালোবাসে। কিন্তু সংসারে মন নেই। প্রথম প্রথম বাবা মারতেন। অনেক দিন পিটিয়েছেন। কোনো লাভ হয়নি। বাবা বুঝে গেছেন যে তার ছেলের ধরনই ঐরকম, মার-ধর করে লাভ হবে না।

ছেলের ভবিষ্যৎ জানতে বাবা একবার ডেলফিতে গিয়েছিলেন। ডেলফির মন্দিরে জানতে চেয়েছিলেন— সক্রেটিসকে নিয়ে কী করা উচিত!

ডেলফির ওরাকল বলেছেন, এই ছেলে যা করতে চায়, করতে দাও। বাধা দিও না। ওকে ওর মতো থাকতে দাও। এই ছেলের নাম পৃথিবীতে রয়ে যাবে। ওকে বদলানোর চেষ্টা বৃথা।

এখানে সবাই জানে ডেলফির ওরাকল যা বলেন, তা কখনো মিথ্যা হয় না। তাই বাবা-মা মেনে নিয়েছেন। সক্রেটিস এমনই। সে বৈরাগী স্বভাবের। তার মন সব সময় উচাটন। সে ঘরে থাকে। কিন্তু আসলে সে একজন বাউল এথেন্সের নগর-বাউল।

মা এখনও বকে যাচ্ছেন। ডিওটিমাকে সাক্ষী রেখে বকছেন। পাতানো বোনকে পেয়ে মায়ের জোর বেড়ে গেছে। এই কয়দিনেই ডিওটিমা তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছেন।

মা ডিওটিমাকে বললেন, তুমি ওরে কিছু বলো। নালিশ কুমার তোমারে খুব মানে।

ডিওটিমা ভাবছেন। কোন্ পক্ষ নিলে সুবিধা হবে সেটি বুঝতে পারছেন না। সক্রেটিসকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। সক্রেটিসের কোনো দোষ তার চোখে ধরা পড়ে না। এত ভালো ছেলে কদাচিৎ জন্মে। কিন্তু ছেলেটা কাজ-কর্ম করছে না। এটি ঠিক হচ্ছে না।

ডিওটিমা বললেন, নালিশ কুমার নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। নামটার মধ্যে একটি মায়া আছে।

সক্রেটিস বলল, এই নামে আমারও কোনো আপত্তি নেই।

ডিওটিমা বলল, নামে আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু কাজে? জনাব, তোমার জন্য কাজ ঠিক করা হয়েছে। নালিশ কুমারকে এখন থেকে কাজ করতে হবে।

সক্রেটিস বলল, কাজ?

'হুম, তুমি যেটি পার— সেই কাজ। মূর্তি বানানো। তোমার বাবা একটি সরকারি কাজ পেয়েছেন। এক্রোপলিসের সামনে মূর্তি বানাতে হবে। কারিগর হিসেবে তোমার নাম দিয়েছেন।'

'আমার নাম দিয়েছেন? তাহলে নিশ্চিত থাক, বাবা কাজটা পাবেন না। আমাকে কাজ দেবে এমন লোক এথেন্সে নেই। এখানে সক্রেটিসের নামে সবাই ভয়ে অস্থির।'

'জি না, ভয় পায়নি। তোমরা কাজটা পেয়ে গেছো। কারিগর হিসেবে তুমি পাস করেছো। কাজের আদেশ আছে তোমার বাবার কাছে। আগামী সোমবার থেকে শুরু।'

সক্রেটিসের বিশ্বাস হচ্ছে না। এথেন্সে তাকে কাজ দেওয়ার লোক এখনও আছে? সে বাবার হাত থেকে পেপিরাস কাগজ নিল। সরকারি সিল দেওয়া পেপিরাস, তাতে লেখা—

কাজ : তিন অপ্সরার মূর্তি।

স্থান : এক্রোপলিসের সদর দরজার ডানে।

ঠিকাদার : সফ্রোনিকাস[১৯], ঠিকানা : এলোপেকি

কারিগর : সক্রেটিস সফ্রোনিকাস, ঠিকানা : এলোপেকি

শেষ করার সম্ভাব্য সময় : তিন চন্দ্রমাস

—স্বাক্ষর

ফিডিয়াস[২০]

এথেন্স নগর সরকারের প্রধান ভাস্কর।

তার মানে এথেন্সের এক নম্বর ভাস্কর ফিডিয়াসের থেকে কাজ পেয়েছেন তার বাবা। বাবার সাথে ফিডিয়াসের পরিচয় আছে। ফিডিয়াস সাহেবই কাজটা দিয়েছেন। অন্য কেউ সক্রেটিসকে কাজ দিত না।

এতক্ষণে সক্রেটিস ঘটনা বুঝতে পারল। তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। কাজের ফাঁদ। বাবা তার জন্য কাজ ঠিক করেছেন। সে যদি রাজি না হয়, সেজন্য ডিওটিমা খালাকে বাড়িতে ডেকেছেন। ডিওটিমা খালার কথা সক্রেটিস ফেলতে পারবে না। সেজন্যই এত আয়োজন। এখন আর রাজি না হয়ে উপায় নেই।

সক্রেটিস রাজি হলো। একবার যখন রাজি হয়েছে, সে কাজটা করবে। যে কাজ সে ভালোবাসে, সেটি নিয়ে সে দিন-রাত পড়ে থাকে।

সক্রেটিসের মা-বাবা খুব খুশি। ছেলের কাজে মতি হয়েছে। নতুন কাজও পেয়েছে। আগামীকাল তারা দেবী এথিনার মন্দিরে যাবেন। দেবীকে ভক্তি করতে হবে। দেবীর ইচ্ছাতেই ছেলের সুমতি হয়েছে।

মা বললেন, সক্রেটিস, তুইও মন্দিরে চল্।

সক্রেটিস বলল, মা, মন্দির-ফন্দিরে আমি যাব না। 'কেন?'

'ঐ যে আমাদের বাড়ির পাশে আফ্রোদিতির মন্দির। সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি। আমাদের পাড়ার দেবী। আমি জন্মানোর আগে তুমি নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরে গিয়েছ!'

'হ্যাঁ, অনেকবার গিয়েছি।'

'সৌন্দর্যের দেবীর কাছে নিশ্চয়ই একটি সুশ্রী শিশু চেয়েছো।'

'হ্যাঁ, চেয়েছি।'

এথিনার মন্দির 'পার্থেনন' নকশা করেছিলেন।

'কিন্তু সৌন্দর্যের দেবী তোমাকে একটি সুশ্রী শিশু দেননি। আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো— দেবী তোমাকে কী রকম একটি বখত ছেলে দিয়েছেন।'

'মানে? কী বলতে চাচ্ছিস?'

‘বলতে চাই— সেদিন দেবী তোমার কথা রাখেননি। দেবীরা কারও আবদার রাখেন না। দেবী-টেবীকে ভক্তি করে কোনো লাভ নেই।’

সক্রেটিসের মা কানে হাত দিয়ে বললেন, চুপ কর! এমন কথা বলতে নেই। তোকে মন্দিরে যেতে হবে না। কিন্তু এসব কথা কোনোদিন বলবি না। দেবী রাগ করবেন।

দেবী যাতে রাগ না করেন সেজন্য মা বারবার হাতজোড় করে দেবীর কাছে মাফ চাইতে লাগলেন।

বাবা বললেন, দেবী রাগ করুক আর না করুক, এসব কথা শুনলে এথেন্সের মানুষ রাগ করবে। সাবধান, আর কোনোদিন দেব-দেবীর নিন্দা করবে না। কেউ শুনলে কিন্তু মামলা করে দেবে। ভয়ংকর বিপদ হবে।

সক্রেটিস কিছুই বলছে না। মুচকি মুচকি হাসছে।

বাবা আবার বললেন, তুমি সারাদিন জ্ঞান জ্ঞান করো। নানান বিলকি – ছিলকি বলো। আমি কিছুই বলি না। কিন্তু কোনোকিছুতে যেন দেবতাদের নিন্দা না হয়। এথেন্স খুব ভয়ংকর জায়গা। বুঝেছো?

‘বুঝেছি।’

‘কী বুঝেছ?’

‘বুঝেছি, এথেন্স খুব ভয়ংকর জায়গা। দেবতার নিন্দা সহ্য করবে না। মামলা করে দিবে।’

বাবার আর কিছুই বলার নেই। তিনি কাজে বেরিয়ে গেলেন। মা ঘরের কাজ করতে অন্য দিকে গেলেন।

সক্রেটিস এতক্ষণে ডিওটিমা খালাকে একটু একা পেল। সে অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল। খালাকে একা পেলেই প্রেমের ক্লাস শুরু করবে। সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলবে, ‘খালা, ভালোবাসা কারে কয়?’

কিন্তু সেটি আর হলো না। ডিওটিমার সাঙ্গাপাঙ্গরা এসে হাজির। আজ সন্ধ্যায় উত্তর পাড়ায় ডিওটিমার ধর্মসভা আছে। অনেক ভক্ত অপেক্ষা করছে তার মুখের কথা শোনার জন্য।

ডিওটিমা বলল, সক্রেটিস তুমি একদিন বিকেলে আমার আখড়ায় এসো। নিরিবিলি কথা বলব।

ডিওটিমা চলে গেলেন।

একটু পরই ক্রিতো এসে হাজির।

ক্রিতো বলল, কই, ডিওটিমা খালা কই? প্রেমের ক্লাস শেষ?

ক্রিতোর জন্য মায়া হলো সক্রেটিসের। বেচারা বড় আশা করে এই রাতেই চলে এসেছে প্রেমের কথা শুনতে। সক্রেটিস তাকে নিয়ে বের হলো। বাড়ির পাশের পাহাড়ের তলায় বসল।

তার মন কিঞ্চিৎ খারাপ। মা-বাবার বকা তার গায়ে লাগে না। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয় আমাকে বোঝে না, কেউ বোঝে না। মন হু হু করে ওঠে।

আকাশে অনেক তারা। পাহাড় থেকে সাগর দেখা যায়। মনে হচ্ছে আকাশ ভরা তারা নিয়ে রাতের পৃথিবী সাগরকে ছুঁতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। অনেক দিনের বিরহী সাগর কাঁদছে। নিরালা বাতাসে ভেসে আসছে সাগরের কান্নার শব্দ। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে।

সক্রেটিস একটি বাঁশি বের করল। সে বাঁশি বাজাতে জানে না। বাঁশি বাজায় ক্রিতো। ক্রিতো বাঁশিতে সুর তুলল। একাকী নিশুতির বিরহের সুর। কেন বিরহের সুর তুলল কেউ জানে না। যে কেউ বলবে, এটি সক্রেটিস ও ক্রিতোর দুঃখ-বিলাস। এদের কোনো দুঃখ নেই। তবু মানুষ দুঃখজীবী প্রাণী মানুষের অন্তরে একটি দুঃখ-কোঠা আছে। সেই কোঠায় সব সময়ই কিছু না কিছু দুঃখ থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষেরও একটি দুঃখ-কোঠা আছে। সেখানে কারণে অকারণে বাঁশি বাজে। বিরহের বাঁশি।

ক্রিতো অনেকক্ষণ বাঁশি বাজালো। বাঁশি বন্ধ হলে সক্রেটিস বলল, সুর আত্মাকে শুদ্ধ করে, একটি আবছা অলস উদাসীনতা নিয়ে আসে।

ক্রিতো বলল, এই কথাটা নাকি পিথাগোরাস[২১] বলতেন। ছোটবেলায় প্রথম যখন বাঁশি শিখি, তখন ওস্তাদজি আমাকে পিথাগোরাসের একটি বই দিয়েছিলেন। ছোট্ট বই। মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। পিথাগোরাস বীণা বাজাতেন। সেই বীণা তিনি নিজ হাতে তৈরি করতেন। গণিতের হিসাব দিয়ে তিনি বীণা বানাতেন। তিনি বলতেন, সংগীত হলো পুরোপুরি গণিতের মতো। তিনিই প্রথম বের করেছিলেন, যন্ত্রের তারগুলো মাপ মতো বসাতে পারলে ভিন্ন ভিন্ন সুর হয়, হারমোনি তৈরি হয়। এই তত্ত্ব দিয়ে তিনি নিজেই বীণা বানিয়েছিলেন। আজ আমরা যেসব বীণা দেখি, সেগুলো আসলে পিথাগোরাসের সেই তত্ত্ব অনুযায়ী বানানো। সংগীতের যন্ত্র বানানোর আধুনিক উপায় তিনিই শিখিয়েছেন।

সক্রেটিস বলল, হ্যাঁ, তার বই পড়ে আমার খুব গান শিখতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভীষণ ইচ্ছা। কিন্তু হলো না। আমি না পারি গাইতে, না পারি কিছু বাজাতে। সুর আমার আসে না। সুরের দেবী সবার প্রেমে পড়ে না।

ক্রিতো বলল, তোমার অন্তরে যে সুর আছে, সেটি পৃথিবীর যেকোনো সংগীতের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সেই সুর তরুণদের নতুন স্বপ্ন দেখায়। নতুন পথের দিশা দেখায়।

রাত গভীর হচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক থেমে গেছে।

ঘরে ফেরার সময় ক্রিতো বলল, কাল সকালে দাস বাজারে যাব। কয়েকজন দাস কিনতে হবে। যাবে নাকি আমার সাথে?

দাস বাজারে সক্রেটিসের কোনো কাজ নেই। সে ধনী নয়। দাস কেনার টাকা নেই। অন্য সময় হলে সে একবাক্যে নিষেধ করে দিত। কিন্তু এখন তার মন তরল। সে যাবে ক্রিতোর সাথে দাস বাজারে।

***

১৯. সফ্রোনিকাস: সক্রেটিসের বাবার নাম সফ্রোনিকাস। মায়ের নাম ফেনারিটি।

২০. ফিডিয়াস: এথেন্সের প্রধান ভাস্কর ও স্থপতি। তিনি এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপনা দেবী।

২১. পিথাগোরাস: Pythagoras, সক্রেটিস-পূর্ব যুগের দার্শনিক। জ্যামিতি, সংগীত ইত্যাদি নিয়ে তিনি মৌলিক কাজ করেছেন।

৫

‘ঐশ্বর্য বা দাসত্ব কারও গৃহে থাকে না,
থাকে আত্মার ভেতরে।’
—জেনোফোন

শিকল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে দলে দলে মানুষ।

জন্তুর মতো। সকলেই নেংটি পরা। তাদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অনেকে। শুধু দেখছে না, একেবারে গরু-ছাগলের মতো পরীক্ষা করছে। দরদামও করছে।

এটি এথেন্সের দাস বাজার। আগোরার পশ্চিম কোনায় প্রতি সোমবার ও বুধবার এই বাজার বসে। দেশ-বিদেশের দাস বেপারীরা হাজার হাজার দাস নিয়ে আসে এখানে। মানুষ বেচা কেনার জন্য এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার হলো এথেন্সের এই দাস বাজার।

সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে দাসেরা। সবার মাথা ন্যাড়া। সবার গলায় লকেটের মতো ঝুলছে এক টুকরা কাঠ। কাঠের উপর বড় বড় করে লেখা দাসের দেশের নাম, বয়স, দাম। কী কাজ করতে পারে, সেই বিবরণ কাঠের উল্টা পিঠে। কিন্তু কোথাও নাম লেখা নেই।

কিছু বুদ্ধিমান বেপারী দাসদের পিঠে বড় করে নম্বর দিয়ে রেখেছে। সাদা কালির নম্বর পিঠে চকচক করছে। এই বেপারীরা ভালো ম্যানেজার। নাম্বারিং করলে হিসাব রাখতে সুবিধা হয়।

সক্রেটিস দাস বাজারে আসে না। সে ধনী নয়। তাকে কোনোরকমে মধ্যবিত্ত বলা যায়। দাস কেনার টাকা-পয়সা নেই। এই বাজারে ধনীরা আসে দাস কিনতে, আর গরিবরা আসে দাস হিসেবে বিক্রি হতে। এখানে মধ্যবিত্তের কোনো কারবার নেই। সেজন্য সক্রেটিস আসে না। সে এই বাজারের বিষয়-আশয় জানে না। আজ ক্রিতো তাকে জোর করে ধরে এনেছে। এখানে সক্রেটিস শুধু দেখনেওয়ালা। সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মারাত্মক মনোযোগ দিয়ে দেখছে। বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে — তাকে সবাই চেনে, দাস বেপারীরাও চেনে। বেপারীরা জানে দাস কেনার যোগ্যতা সক্রেটিসের নেই। সে বিনা কাজে বাজারে ঘুরছে। তাই এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না। লজ্জা লাগছে। দাস বাজারের অলি-গলি ঘুরছে।

হঠাৎ পেছনে শোরগোল শোনা গেল। ধাক্কাধাক্কি, হুড়াহুড়ি শুরু হলো। সব মানুষ এক দিকে ছুটছে। তারা বলাবলি করছে, ‘এই সর্ সর্। আসছে, আসছে।’

ক্রিতো ভিড়ের দিকে জিজ্ঞেস করল, ঘটনা কী?

একজন বলল, ধুর্ মিয়া, খবর তো কিছুই রাখো না! ঘটনা হলো পেরিক্লিস। দাস বাজারে পেরিক্লিস আসছেন।

সক্রেটিস বলল, পেরিক্লিস আসছেন, সেটি ভালো খবর। কিন্তু লোকজন ধাক্কাধাক্কি করছে কেন?

ক্রিতো ব্যবসায়ীর ছেলে। সে বলল, পেরিক্লিস বিরাট ধনী লোক, তিনি অনেক দাস কিনবেন। সেজন্য দালালরা ছুটছে। কে কার আগে তাকে পটাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে।

কথা শেষ হওয়ার আগেই তারা দেখল, ভিড়ের ঠেলায় তারা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর পেছানোর উপায় নেই। তারা দাঁড়িয়ে রইল।

এথেন্সের গণতন্ত্রের এক নম্বর নেতা পেরিক্লিস আসছেন। তিনি সুপুরুষ, দীর্ঘদেহী। নাক, চোখ সব গ্রিক দেবতার মতো। বিরাট চওড়া কাঁধ। তবে শরীরের তুলনায় মাথাটা বেখাপ্পা রকমের বড়। তিনি বয়সে সক্রেটিসের অনেক বড়।

পেরিক্লিসের ঘোড়া থামল। এখানে খুব বেশি লোকের ঘোড়া নেই। লোকজন হেঁটেই চলাচল করে। দুই-একজন অতি সম্ভ্রান্ত মানুষ ঘোড়ায় চড়ে। পেরিক্লিস এথেন্সের সবচেয়ে অভিজাত বংশের সন্তান। সবচেয়ে ধনীও। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। ঝরনার মতো বক্তৃতা করেন। কুলকুল শব্দ হয় তার ভাষণে এমন ভাষণ এথেন্সে অন্য কেউ দিতে পারে না। যুদ্ধেও তিনি এক নম্বর।

পেরিক্লিসের চারপাশে অনেক মানুষ। তারা কথায় কথায় হ্যাঁ হ্যাঁ করছে। এরা জি-হুজুর পার্টি। পেরিক্লিস জি-হুজুরদের পাত্তা দিচ্ছেন না। তিনি কাজের লোক। কাজ শুরু করতে হবে। এই মুহূর্তের কাজ হলো দাস খরিদ করা।

ঠিক সামনের গলির মুখে কতগুলো সিরিয়ার দাস। যুদ্ধে হারিয়ে এদের পায়ে শিকল দিয়ে নিয়ে এসেছে। কদিন আগেও এরা ছিল মুক্ত মানুষ। তাদের একমাত্র অপরাধ হলো এজিয়ান সাগরের তীরে এশিয়া মাইনরের (তুরস্ক) কাছে একটি জায়গায় এরা যুদ্ধে হেরে গেছে। বিজয়ীরা বন্দি করে বিক্রি করে দিয়েছে দাস বেপারীদের কাছে। বেপারীরা বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছে সাগরের এপাড়ে এথেন্সে। সারা পৃথিবীতে এখন এথেন্সেই সবচেয়ে ধনী ক্রেতা আছে।

পেরিক্লিস তাকালেন সারি সারি দাসদের দিকে। তার সামনে একজন বিদেশি লোক কয়েকটি বাচ্চা নিয়ে এসেছে। একেবারেই কম বয়স। পেরিক্লিস বাচ্চাদের গলায় ঝুলানো কাঠের টুকরা দেখতে লাগলেন। দেশ— সিরিয়া, বয়স— ৯, দাম— ০৫ মিনা।

দাস বেপারী বলল, হুজুর, একেবারে কচি জিনিস। যে কাজ দেবেন, সেই কাজই পারবে। এই ওঠ, বলে সে একটি বাচ্চার পেছনে লাথি মারলেন।

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। বেপারী আবার বলল, হুজুর, বাচ্চাগুলো জাহাজে করে ক্রিত দ্বীপে যাচ্ছিল। আমার লোকেরা সময়মতো ধরে ফেলেছে। এগুলো সব বড় ঘরের ছেলেমেয়ে। কোনো হেঁজিপেঁজি নয়। আপনার জন্য এগুলোই সবচেয়ে উপযুক্ত।

পেরিক্লিস বললেন, গান গাইতে জানে?

আকাশ থেকে পড়লো দাস বেপারী। এ আবার কেমন প্রশ্ন? দাসেরা গান গাইবে নাকি! গান গাওয়ানোর জন্য পেরিক্লিস দাস কিনতে এসেছেন?

বেপারী একটু ভেবে বলল, গলা তো মন্দ না। শিখাইলে গান-বাজনা সবই করতে পারব।

একথা বলেই বেপারী তার হাতের চাবুকটা মারলো বাচ্চাটির পিঠে। ছেলেটি তীব্র চিৎকার করে উঠল। চিৎকারে কী বলছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবু বেপারী বলল, দেখেন, হুজুর, দেখেন। কী মধুর গলা! কেমন সুরে সুরে চিৎকার করছে

মধুর গলা আরও ভালো করে বোঝানোর জন্য সে আবার চাবুক চালাল। এবার আর একটু জোরে। সুর আরও উঁচু হলো। এরপর পাশের ছেলেটিকে চাবুক মারলো। সেও চিৎকার করে গলার স্বরের পরীক্ষা দিল। পাশের মেয়েটি চাবুক দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তার জন্য চাবুক দরকার নেই। কিন্তু বেপারী চাবুক তুলে ফেলেছে। মেয়েটিকে আস্তে করে মারলো। পরের বাচ্চাদের আর চাবুক মারতে হলো না। তারা বুঝে গেছে কী করতে হবে। বাচ্চারা নিজে থেকেই চিৎকার করে মধুর গলার পরীক্ষা দিল।

চারপাশে শোরগোল পড়ে গেছে। দাস বাজারে এমন করে গলার স্বরের পরীক্ষা আগে কখনো হয়নি।

ভিড়ের সবাই পেরিক্লিসকে দেখছে। এই আনন্দ দেওয়ার কারণ তিনি। নতুন নতুন রকমের আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা আছে লোকটির। নিত্য নতুন চমক দিচ্ছেন। এথেন্সবাসী তার গুণে একেবারে মোহিত।

ভিড়ের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ বলল, আপনি ধন্য, বাবা পেরিক্লিস। এই হাতের উপর হাজার হাজার দাস বেচলাম-কিনলাম। কিন্তু বাপের জন্মে দাস বাজারে গানের এমন পরীক্ষা দেখিনি।

পেরিক্লিস একটু মুচকি হাসলেন।

তার বন্ধু বলল, সে কী গো! পেরিক্লিসের মতো সংগীতের এমন সমঝদার মানুষ এথেন্সে কোনোকালে জন্মেছে নাকি! শিল্পকলার নাম শুনলেই উনি একেবারে তন্ময় হয়ে যান। এথেন্সের সব বড় বড় চিত্রকর, সংগীত শিল্পী, ভাস্কর সবাই ওনার বন্ধু। আমাদের কত ভাগ্য যে, এমন শিল্পমনা একজন নেতা পেয়েছি।

পেরিক্লিস বেপারীকে বললেন, এই চারটা বাচ্চা আমি নেব।

বণিকের চোখ চকচক করে উঠল। সে বলল, হুজুর, শুধু এই চারটা নেবেন? ওই মেয়েটি এই ছেলেটির বোন। ভাইটার সাথে বোনকে না নিলে বোনটা কাঁদবে।

পেরিক্লিস বন্ধুর দিকে তাকালেন। বন্ধু বলল, কী যে বলো বেপারী, দাসের আবার ভাই-বোন কী? একসাথে থাকলে ফন্দি-ফিকির করবে। ঘোঁট পাকাবে। কাজে ফাঁকি

দেবে। সকাল সকাল একসাথে চারটা দাস বেচতে পারছো। এতেই খুশি থাকো। বেশি লোভ ভালো না।

পেরিক্লিস ভিড়ের মানুষদের দিকে তাকালেন। তাদের চোখ দেখলেন। তারপর বললেন, দাসও তো মানুষ। দাও, ওর বোনকেও সাথে দাও। ভাই- বোন একসাথেই থাকবে।

সমবেত জনতা হৈ হৈ করে উঠল। পেরিক্লিস দয়ার সাগর। তিনি শুধু ধনী নন, শুধু শিল্পরসিক নন। তার মনে রহমও আছে। মানুষের চোখভরা প্রশংসা। পেরিক্লিস উপভোগ করছেন। কারও দিকে না তাকিয়ে তিনি বললেন, রুপার খনির কাজে গাফিলতি হচ্ছে। খনির জন্য আর কয়টা লোক হলে মন্দ হয় না।

এক বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল। সে দাস বাজারের দালাল। সুযোগ পেয়ে সে বলল, বাবা। আপনি ধনী আর সরল বলে ওরা ঠকাচ্ছে। আপনি, এদিকে আসেন। ওই পাহাড়ের কোনায় জনা ত্রিশেক তাগড়া জোয়ান আসছে সিরিয়া থেকে। খনির কাজে খুবই ভালো হবে।

পাশ থেকে আরেক দালাল বলল, ধুর মিয়া, তুমি বেশি জানো! ইথিওপিয়া থেকে জোয়ান কালো মর্দ বসছে ওই পুব কোনায়। খনির জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছুই নাই। হুজুর, আপনি তাড়াতাড়ি চলেন। কালা আদমির বহুত চাহিদা।

সবার কথা রাখার চেষ্টা করেন বলেই পেরিক্লিস জনপ্রিয় নেতা। চট করে একে পক্ষ নেওয়া যাবে না।

তিনি বললেন, আচ্ছা, আমরা ইথিওপিয়ার দাস আগে দেখে আসি। তারপর সিরিয়ারগুলো দেখব। চাচা, আপনি নিজে আমার জন্য দশটা সিরিয়ার দাস বাছাই করে রাখেন। ফেরার সময় নিয়ে নেব।

ভিড়ের অনেকেই পেরিক্লিসের সাথে সাথে চলল। ইথিওপিয়ার কালো আদমি কিনতে দেখা ভাগ্যের ব্যাপার।

সক্রেটিসের জন্য পুরো বিষয়টাই একেবারে নতুন। তারও দেখতে ইচ্ছে করছে। সক্রেটিস আর ক্রিতোও ভিড়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলল।

যে বেপারী ইথিওপিয়ার দাস এনেছে, তার কাছে খবর চলে গেছে। পেরিক্লিস এসেছেন খনির জন্য দাস কিনতে। বেপারী কালো দাসদের পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করে রেখেছে। শক্তি পরীক্ষার চমৎকার বন্দোবস্ত। বিশাল বিশাল পাথর মাটিতে রাখা আছে। বেপারী সবচেয়ে তাগড়া জোয়ান এক দাসকে ইশারা করল। পেশিবহুল কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি পাথরটি তুলতে গেল। কিন্তু এক পা এগিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

পেরিক্লিসের বন্ধু বলল, তোমার মাল তো মাকাল ফল। হুদাই কালো তেলতেলা শরীর। কোনো কাজেরই না। শরীর কি বাতাস দিয়া ফুলাইছো নাকি?

জনতা হেসে উঠল। দাস বণিকের চোখ থমথমে। সে বলল, হুজুর, এইটা পাক্কা খেলোয়াড়। অভিনয় করছে। বুঝে গেছে, ওরে খনির কাজে দেবেন। তাই ইচ্ছা করে ফেলে দিয়েছে। এইবার দেখেন কী করি।

দাস বেপারী হঠাৎ একটি জ্বলন্ত লোহার গরম চিমনি ঠেসে ধরল কালো লোকটার পিঠে। আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো লোকটা। কিন্তু পরের বার সে অতি সহজে মোটা পাথরটি নিয়ে হেঁটে গেল। মনে হলো এই কাজ তার জন্য তেমন কিছুই নয়।

লোকজন বুঝল, বুদ্ধি আছে বেপারীর। মাথায় ঘিলু না থাকলে মানুষ বেচাকেনা করা যায় না।

পেরিক্লিস বিশ জন ইথিওপিয়ার এবং দশ জন সিরিয়ার দাস কিনলেন। বুড়ো দালাল বেপারীকে বলল, খোজা করছো তো?

বণিক বলল, একেবারে নতুন জিনিস। সময় হয়নি। হুজুর যখন কিনেছেন, তৈরি করেই দেব। হাজাম প্রস্তুত আছে। খোজাখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নতুন কেনা দাসদের খোজা করতে নিয়ে যাওয়া হলো। এরা আর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। এদের কোনো যৌন চেতনা থাকবে না। পুরোপুরি জড়বস্তু করে ফেলতে হবে। না হলে পোষ মানবে না।

পেরিক্লিসের কয়েকজন দাসীও প্রয়োজন। কেমন দাসী দরকার সেটি তার স্ত্রী বলে দিয়েছেন। কিন্তু নারী কেনা-বেচার গলিতে যেতে তার অস্বস্তি হলো। একজন বয়স্ক দাসীকে পাঠালেন নতুন দাসী কিনতে। সে তিনজন দাসী কিনে নিয়ে এলো।

পেরিক্লিস দাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, কিথারা যন্ত্র বাজাতে জানো?

তিনজন নারীই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। এরা কিথারা চেনেই না।

কিথারা এথেন্সের খুব জনপ্রিয় বাদ্য। এখানের সব শিক্ষিত মানুষ কিথারা বাজায়।

পেরিক্লিসের বন্ধু বলল, আমি আগেই বলেছিলাম। আপনার ঘরে কী রকম মেয়ে দরকার, সেটি কিনতে আপনাকে নিজেকেই যেতে হবে। ওই বুড়ি পারবে না। চলেন, আমরাই যাই।

এক বেপারী বলল, আপনি এথেন্সের নেতা। আপনার আবার লজ্জা কী! কীভাবে মেয়ে বেচাকেনা হয়, সেটি সচক্ষে দেখাও আপনার দরকার।

সঙ্গীরা ভিড়ের দিকে হাঁক দিল, এইবার আপনারা কাজে যান। এখানে আর আপনাগো দরকার নেই।

নারী বিক্রির গলিতে ঢোকার বিধিনিষেধ আছে। শুধু ক্রেতা ছাড়া এখানে কেউ ঢুকতে পারে না। টাকা দেখিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ছেলে-ছোকরাদের ঠেকানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। পেরিক্লিসের সাথে অনেকেই ঢুকে পড়ার সুযোগ নিতে চাইছে। পেরিক্লিস সেই সুযোগ দিতে পারেন না। শুধু চারজনকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন দাসী বিক্রির গলিতে।

ক্রিতো আজ দাস কিনতেই এসেছে। তার কাছে টাকা আছে। দারোয়ানদের টাকা দেখিয়ে ক্রিতো আর সক্রেটিসও চলল নারী কেনার গলিতে।

বুড়ি দাসী পেরিক্লিসকে নিয়ে গেল একটি উঁচু ঢিবির সামনে। দীর্ঘ চুলের স্বল্পবসনা অনেকগুলো মেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এথেন্সের মানুষ নারীদের ব্যাপারে ভয়াবহ কট্টর। এখানে নারীরা থাকে পর্দার ভেতরে। শুধু দাসীরাই রাস্তায় বের হতে পারে। কিন্তু এটি তো মানুষ কেনাবেচার বাজার। বেচতে হলে দেখাতে হবে। কিনতে হলে পরীক্ষা করতে হবে। তাই অল্প কাপড়ে সারি সারি করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে মেয়েদের।

এই মেয়েদের বাড়ি মিশরে। এরা যুদ্ধবন্দিদের স্ত্রী-কন্যা। যুদ্ধের পর বিজয়ী সেনারা ইচ্ছেমতো ভোগ করেছে। তারপর বিক্রি করেছে দাস বণিকের কাছে। বণিক কয়েক হাত ঘুরিয়ে এথেন্সে নিয়ে এসেছে। দাস বণিক এক- একজন মেয়েকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে শুরু করল।

পেরিক্লিস বাধা দিলেন। তিনি দেখতে আসেননি। গুণ যাচাই করতে এসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কে কে কিথারা বাজাতে জানে?

দাস বেপারী চারজনকে আলাদা করল।

মাত্র চারজন! অবাক হলেন পেরিক্লিস। এতগুলো মেয়ের মধ্যে মাত্র চারজন কিথারা বাজাতে জানে!

মোসাহেব বলল, ওইসব বর্বর দেশ সংগীতের মূল্য বোঝে না! ওরা মেয়েদের সংগীত-কলা শেখায় না।

পেরিক্লিস সংগীতের জন্য বেদনা অনুভব করলেন। মানুষ আজকাল সংগীতের মূল্য বোঝে না। তিনি প্রধান দাসীকে বললেন, এই চারজনকেই নিয়ে নাও। বেগমকে গিয়ে বলবে, আমার কোনো দোষ নেই। বাজারে মাত্র চারজনই ছিল।

পেরিক্লিস ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

পেরিক্লিস চলে যেতেই সক্রেটিস আর ক্রিতোর খেয়াল হলো যে তারা তো দাস বাজারে এসেছে দাস কিনতে। পেরিক্লিসের আকর্ষণে সব ভুলে গিয়েছিল। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারা দৌড় দিল। পুরুষ দাসের গলিতে যেতে হবে।

গলির মুখে ক্রিতোর পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, আর দৌড়াতে হবে না। আমার দাস কেনা হয়ে গেছে। তোমাদের ছুটি। তোমরা যে কী করবে, সেটি আমি ভালো করেই জানতাম। দুইজনই তো প্রশ্ন রোগী। প্রশ্ন করা ছাড়া আর কিছু পার তোমরা?

বইঘর.নেট নিবেদন
একটি শুভম ও ব্রহ্মচারী পরিবেশনা

৬

‘যে কথা বলছ আজ অন্য জনেরে,
নিশ্চিত থাক— সেকথা আসবে ফিরে তোমার দুয়ারে।’
—হোমার

নতুন একটি জুতার দোকান হয়েছে। আগোরার ঠিক বাইরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাস্তার পাশে দোকান। শুধু দোকান নয়, ছোটখাটো কারখানা। ফরমায়েশ করলে জুতা বানিয়ে দেওয়া হয়। পেছনে কাঠ, চামড়া, আঠা, লোহার পেরেক দেখা যাচ্ছে। দোকানের মালিক তরুণ। বয়স মাত্র বিশ পার হয়েছে। নাম সিমন[২২]। তার পয়সা-কড়ি বেশি নেই, কিন্তু ব্যবসা করার ভীষণ ইচ্ছা। অল্প টাকায় আগোরার ভেতরে দোকান পাওয়া যায় না। তাই বাইরে পথের ধারে এই দোকান নিয়েছে।

জুতার দোকান দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল সক্রেটিসের। সে জুতা পরে না। জুতা একেবারেই অদরকারি জিনিস। এমন অদরকারি জিনিসের দোকান বসেছে তার চলাচলের পথে! প্রতি বেলা এই দোকানের সামনে দিয়ে যেতে হবে। তার মেজাজ ভাদ্র মাসের তালগাছ হয়ে গেল।

খুব ভালো আর খুব খারাপ- দুটো জিনিসের দিকেই মানুষ আকৃষ্ট হয়। সক্রেটিস খারাপ দোকানটির দিকে এগোতে লাগল।

দোকানি সিমন দেখল— খালি পায়ে একজন লোক আসছে। পেশার কারণে মানুষের কিছু অভ্যাস তৈরি হয়। নাপিতের নজর যেমন থাকে মানুষের চুলের দিকে, তেমনই মুচির নজর থাকে পায়ের দিকে। পায়ের দিকে তাকাতে তাকাতে এক সময় সে মুখ দেখা ভুলে যায়। মুখ দেখে আর মানুষ চিনতে পারে না। পা দেখলে ঠিকই চিনে ফেলে।

সক্রেটিসের খালি পা দেখে সিমন খুব খুশি। লোকটি নিশ্চয়ই জুতা কিনতে আসছে। তার মনে হচ্ছে আজকে দিনটা শুভ। একটু বাদে বাদেই খদ্দের আসছে। সে আহ্লাদে বাইরে এগিয়ে এলো।

সিমন বলল, আসেন, আসেন। আপনার তো পা খালি। জুতা ছিঁড়ে গেছে? 'না, ছিঁড়েনি।'

'হারিয়ে গেছে?'

'না, হারায়নি।'

'ওহ, তাহলে চুরি গেছে। কী যে দিনকাল পড়ছে! চোর-ছেঁচড়ে এথেন্স শহরটা ভরে গেল। জুতা চুরি গেল ক্যামনে? ঘটনাটা কোথায় ঘটল?'

'কোনো ঘটনা ঘটেনি।'

'মানে?'

'মানে, আমার জুতা ছিঁড়ে যায়নি, হারায়ওনি। চুরিও হয়নি।'

'তাহলে?'

'আমি জুতা পরি না।'

সিমন ভীষণ বিরক্ত হলো। আজেবাজে লোক দোকানে ঢুকে সময় নষ্ট করছে। কারও পায়ে নতুন জুতা দেখলেই সিমনের ভালো লাগে না। কতদিনে জুতাটা পুরনো হবে, কেবল সেটিই মাথার মধ্যে ঘোরে। আর যদি শোনে কেউ একেবারেই জুতা পরে না, তাহলে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে ইচ্ছে করে।

সক্রেটিসকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া যায় কিনা ভাবছে। তাকে দেখে পথের ফকিরই মনে হচ্ছে। কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি ফকিরের মতো নয়। কেমন একটি জ্ঞানী জ্ঞানী টান আছে গলার স্বরে। একজন জ্ঞানী ফকিরের সাথে কতটুকু খারাপ ব্যবহার করা যায় ভাবছে সিমন

হঠাৎ মনে হলো, আরে, আমি তো ভুল ভাবছি। লোকটা মনে হয় গরিব জুতা কেনার টাকা নেই। এই যুগে জুতা পরে না, 'এমন মানুষ আছে নাকি? বড় মায়া হলো তার। আহা রে, যুবক ছেলে। জুতা কেনার টাকাও নেই। এথেন্স শহরটা বুঝি গরিব হয়ে যাচ্ছে!

সিমন বলল, আমি নতুন দোকান দিয়েছি। আপনাকে এক জোড়া জুতা উপহার দিতে চাই। পয়সা দিতে হবে না। ঐ কোনায় কম মূল্যের জুতা আছে। যেটি পছন্দ হয়, একজোড়া নিয়ে নেন। আমার জন্য দোয়া করবেন।

পিটপিট করে তাকাল সক্রেটিস। তাকে কি সত্যিই ভিখারির মতো লাগছে? এথেন্সে সবাই তাকে এক নামে চেনে। তার জুতা না পরার কেচ্ছা সবাই জানে। আর এই উজবুক জুতাওয়ালা তাকে চেনে না। শুধু চেনে না, তাই নয়। পা খালি দেখে জুতা দান করতে চাইছে। আস্পর্ধা দেখে অবাক হলো সে।

সক্রেটিস জুতা বাছতে শুরু করল। দোকানের সবচেয়ে দামি এক জোড়া জুতা বাছাই করল।

সিমনের মাথায় হাত! এত দামি জুতা সে দান করতে পারবে না। লোকটাকে লাই দেওয়ায় একেবারে মাথায় উঠে গেছে। আশকারা পেয়ে গলাটা সোয়া হাত লম্বা হয়ে গেছে।

সক্রেটিস বলল, এই জোড়া আপনার পায়ে হবে কিনা দেখুন। আমি আপনাকে এই জুতা জোড়া উপহার দিচ্ছি। দাম কত বলুন।

সিমন ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল। সে তার ভুল বুঝতে পারল।

লজ্জিত স্বরে সিমন বলল, মাফ করবেন। অন্যায় হয়েছে। আপনি সত্যি জুতা পরেন না?

'না।'

'কেন?'

'আমার দরকার হয় না। যা দরকার নেই, আমি তা পরি না। যতটুকু না পরলে, রাস্তায় বের হওয়া যাবে না, আমি শুধু ততটুকু কাপড়ই পরি। প্রয়োজনের অধিক নৈব নৈবচ।'

সিমন তাকিয়ে দেখল, কথা সত্য। কোমরে আর উপরের অঙ্গে শুধু দুই টুকরা কাপড় ঝুলছে। মনে হচ্ছে তার আর কোনো সম্বল নেই। কিন্তু মুখে বলছে আর কিছুই দরকার নেই। মুখটাও সুখী সুখী। এত কম জিনিস নিয়েও যে জীবনে সুখী হওয়া যায়, সিমন জীবনে প্রথম দেখল। সে ভালো করে তাকাল লোকটির দিকে। এখন লোকটাকে অত খারাপ মনে হচ্ছে না।

সিমন জিজ্ঞেস করল, আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?

সক্রেটিস উত্তর দেওয়ার আগেই দোকানের বাইরে চিৎকার শোনা গেল। কে যেন খুবই কদর্য ভাষায় গালাগালি করছে। চৌদ্দ গুষ্ঠি তুলে গালি দিচ্ছে। সিমন দৌড়ে বাইরে গেল।

যে লোক চিৎকার করছে, সে একজন ইজারাদার। ইচ্ছা করে মাতব্বরি করা তার স্বভাব। সে গতকাল একজোড়া জুতা বানিয়েছিল, আজ আবার এসেছে। এসেই হম্বিতম্বি শুরু করেছে।

সিমনের কানের একেবারে সামনে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বলল, কি সিমন মুচি, কেমন আছো?

সিমন শান্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ, ভালো।'

'তুমি তো ভালো থাকবাই। মানুষকে আজেবাজে জুতা দাও। লাভ করো সেরের উপর সোয়া সের। এরকম করলে মুচি তো ভালো থাকবেই। কিন্তু মুচি সাহেব, তুমি ভালো থাকলেও তোমার জুতা ভালো নেই। কালকে দিলে, আজকেই শেষ। জুতার সুখতলা খুলে দুঃখতলা হয়ে গেছে। তুমি তো মুচি নামের কলঙ্ক।'

আমি আপনাকে বলেছিলাম জুতা জোড়া দুই দিন পরে নিতে। কাঁচা চামড়ায় আঠা ধরে না। আপনার সময় নেই। জোর করে নিয়ে নিলেন।'

আরে মিয়া, মুচির কথায় জুতা বানামু নাকি? বেশি ফাল্ দিও না। দাও, বদলাইয়া নতুন আরেক জোড়া দাও। এবার মইষের চামড়া দিয়ে বানাবা। পাকা মইষের চামড়া আছে তো? নাকি এখনও খালি কাঁচা চামড়া? কোনটা কাঁচা চামড়া আর কোনটা পাকা চামড়া সেটিই চেনে না, সে আবার মুচি!'

ইজারাদার মুখ বাঁকিয়ে খুবই তাচ্ছিল্য ভরে মুচি শব্দটা বলছে। ইচ্ছে করে সকলের সামনে অপমান করছে। গা জ্বলে যাচ্ছে সিমনের। কিন্তু সে কম বয়সে ব্যবসা দিয়েছে। নতুন দোকান। মানুষের সাথে ঝগড়া করা যাবে না। সে নীরবে চামড়া বাছাই করতে লাগল। মহিষের পাকা চামড়া।

সক্রেটিস ইজারাদারকে চেনে। তার মতো পাজি লোক এথেন্সে আর নেই। প্রতিদিনই কারও না কারও সাথে ঝগড়া করে।

সিমন আবার জুতার মাপ নিচ্ছে।

ইজারাদার বলছে, তুমি তো দেখি আসলেই মুচি নামের কলঙ্ক। কালকে একবার মাপলে। আজ আবার কেন?

'ভুল যেন না হয়, সেজন্য আরেকবার নিয়ে নিচ্ছি।'

'মুচির তো একটিই কাজ— জুতার মাপ নেওয়া। সারাদিন মানুষের জুতার দিকে তাকিয়ে থাকো। তাও জুতার মাপ মনে থাকে না। কেমন মুচি তুমি?'

সক্রেটিস অনেকক্ষণ ধরে শুনছিল। লোকটা মুচি মুচি বলে ছেলেটাকে ভীষণ অপমান করে যাচ্ছে। আর সহ্য হলো না সক্রেটিসের।

সে ইজারাদারকে বলল, জনাব, মুচি কথাটার মানে কী?

ইজারাদার উত্তর দিল, কেন, জানো না? ঐ যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ও একজন মুচি। তার কাজ একটিই— জুতা সেলাই করা।

'উনি তো শুধু সেলাই করেন না। পুরো জুতাটা তৈরি করেন। উনি একজন কারিগর। একজন শিল্পী।'

'শিল্পী? জুতাশিল্পী?'

'জুতার একটি সুন্দর নাম আছে— পাদুকা। উনি হলেন একজন পাদুকা শিল্পী।'

'জুতা বানানোও একটি শিল্প? পাদুকাশিল্প?'

‘আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?’

‘না।’

‘তাহলে বলুন শিল্প মানে কী?’

ইজারাদার সক্রেটিসকে চেনে। তার স্বভাব জানে। সক্রেটিস একবার যদি কী-কেন ধরনের প্রশ্ন শুরু করে, তাহলে কী ঘটে সেটি তার জানা আছে। এই ছেলে একবার প্রশ্ন শুরু করলে, সবার সামনে ইজ্জতের ফালুদা বানিয়ে দেয়। ইজ্জত ফালুদা হওয়ার আগেই সরে পড়তে হবে। সরে পড়লেও মানে মানে সরতে হবে।

ইজারাদার বলল, শোনো মিয়া সক্রেটিস, আমার সাথে জলি-ফলি করবে না। আমি কিন্তু লোক সুবিধার নই। তুমি আসছো জুতা নিয়ে কথা বলতে? তুমি তো মিয়া জুতাই পরো না। তুমি জুতার কী বোঝ? আজ আমার হাতে সময় নাই। আমি এখন যাই। তুমি থাকো তোমার শিল্পীর লগে। তোমার প্রিয় জুতা শিল্পী। না, ভুল বললাম, পাদুকাশিল্পী।

ইজারাদার ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেল। সে বেশ কায়দা করে নতুন মুচিটারে ধরেছিল। চিপড়ানোও শুরু করেছিল। কিন্তু ঝামেলা করল সক্রেটিস। এই ইঁচড়ে পাকা সক্রেটিস দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। ওরে একটি শিক্ষা দিতে হবে।

ইজারাদারের মুখে সক্রেটিসের নাম শুনল সিমন। এই তাহলে সক্রেটিস! অনেকের কাছেই শুনেছে এথেন্সের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হলো সক্রেটিস। কিন্তু কোনোদিন দেখেনি। আজ প্রথমে দেখে মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন লোকটাকে এত বেশি ভালো লাগছে যে সিমনের আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করছে।

সিমন এক মুহূর্তে সক্রেটিসের চ্যালা হয়ে গেল। তার কারণেই সে মুচি থেকে পাদুকাশিল্পী হয়েছে। সে তাকে আদর করে বসাল।

কিছুক্ষণ কথা বলে সক্রেটিসও বুঝল, সিমনও একজন জ্ঞানপ্রেমিক মানুষ। ছেলেটিকে তার পছন্দ হলো। যাকে পছন্দ হয় সক্রেটিস তার কাছে বারবার আসে। সে এই দোকানে আসবে। শীতকালে আড্ডার একটি জায়গা পাওয়া গেল। তার আড্ডার নতুন ঠিকানা হবে সিমনের পাদুকালয়। এখন তারা আড্ডা দেয় আগোরার পেছনে খোলা আকাশের নিচে। ঠাণ্ডার দিনে সন্ধ্যার পর সেখানে বেশিক্ষণ থাকা যায় না।

আড্ডার কথা ভাবতেই সক্রেটিসের মন হু হু করে উঠল। আজ সকাল থেকে কোনো আড্ডা হয়নি। সারাদিন বাবার সাথে মূর্তি বানিয়েছে। তিন অপ্সরার মূর্তি। এক ফোঁটাও আড্ডা দিতে পারেনি। এক বেলা আড্ডা না হলে তার বুক ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কেমন একটি চিন-চিন ব্যথা হয়। তাকে এক্ষুনি বের হতে হবে। বন্ধুরা বসে আছে আড্ডাখানায়।

কিন্তু সিমন বের হতে দিচ্ছে না।

সিমন বলল, সক্রেটিস, আমি শুনেছি তুমি অনেক জ্ঞানী মানুষ। আমি তোমার কাছে এথেন্সের কথা শুনতে চাই।

সক্রেটিস বলল, এথেন্সের তো অনেক কথা। কী কথা শুনতে চাও?

সিমন বলল, যখন পিচ্চি ছিলাম, তখন থেকেই শুনেছি এথেন্স হলো পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর জ্ঞানের নগর। সারা দুনিয়ার সকল জ্ঞানী মানুষ সাগর পার হয়ে এই শহরে চলে আসে। এখানে নাকি টাকা ওড়ে। এই মাটিতে পা দিলেই কপাল খুলে যায়। তো আমাকে বলো, তোমরা এথেন্সের লোকেরা কী এমন করেছ যে সবাই তোমাদের কাছে ছুটে আসে? আমি এথেন্সের একেবারে শুরুর কথা জানতে চাই।

সক্রেটিস বলল, এই কাহিনি আমি বলব না। বলবে চেরোফোন[২৩]। এথেন্সে কীভাবে জ্ঞানের জন্ম হলো সেটি বলার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হলো চেরোফোন।

সিমন বলল, কে তিনি?

'চেরোফোন আমার বন্ধু। খুবই কাছের মানুষ। সে এথেন্সের জন্য একেবারে নিবেদিতপ্রাণ। এথেন্সে যা আছে, চেরোফোনের কাছে সব ভালো। তুমি এথেন্সের নামে ভালো কিছু বললে তুমিও ভালো; আর এথেন্স নিয়ে মন্দ বলেছ তো তোমার মতো খারাপ লোক পৃথিবীতে নেই। এথেন্সের কথা শুনতে এই চেরোফোনকেই তোমার দরকার।'

'তাকে কোথায় পাব?'

'যাবে তার কাছে? তোমার দোকান থেকে বেশি দূরে নয়। আগোরার পিছনে, ঐ পশ্চিম কোণে। ওখানে সন্ধ্যাবেলা আমরা কিছু বোকাসোকা ছেলে গল্পগুজব করি। ওখানে যারা আসে সবাই প্রশ্ন-রোগী। তারা প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলে। খেলাটা একবার শুরু করলে নেশা ধরে যায়। এই নেশা করতে চাও? তাহলে চলো আমার সাথে আমাদের আড্ডাখানায়।'

সিমন প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলাটা বোঝেনি। কিন্তু সে যাবে। সক্রেটিস ডাকলে সে আর না গিয়ে পারবে না। সে সক্রেটিফাইড হয়ে গেছে। সে এখন থেকে সক্রেটিসের সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকবে। তার জীবনের পথ পাল্টে যাচ্ছে। সে নতুন পথের দেখা পেয়েছে।

সক্রেটিস পেল আরেকজন বন্ধু। খাঁটি, অকৃত্রিম বন্ধু সিমন। তারা পা বাড়াল সক্রেটিসের আড্ডাখানার দিকে।

আড্ডার ছেলেরা চলে এসেছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সবাই হাজির। একটি ঝিরঝির বাতাস বইছে। আকাশে এখনও চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। উঁকি দিতে শুরু করেছে একটি দুটি তারা। নিভু নিভু জ্বলছে জলপাই তেলের মশাল। জলপাই তেলের হালকা একটি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। শুরু হচ্ছে সক্রেটিসের সান্ধ্য আসর।

এই আসরের ছেলেদের মধ্যে শুধু সক্রেটিসই গরিব। বাকি সবাই ধনী। এথেন্সের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই সক্রেটিসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর সেই ছেলেদের পিতারাই তার সবচেয়ে বড় শত্রু।

সক্রেটিসের আসর জমানোর প্রধান মানুষ চেরোফোন। সে সক্রেটিসের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। বয়সে বড় হলেও চেরোফোন সক্রেটিসের গুণমুগ্ধ। সক্রেটিসকে ভীষণ

ভালোবাসে। সে যে কোনো ছুতা পেলেই চেঁচিয়ে বলে, পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হলো সক্রেটিস।

কিন্তু আজ চেরোফোনের মাথা ভীষণ গরম। রাগের মাত্রা বিপদ সীমার অনেক উপরে। রাগের কারণ গত কদিনে সক্রেটিস চেরোফোনকে বাদ দিয়েই অনেক কিছু করেছে। তাকে বাদ দিয়েই সক্রেটিস আর ক্রিতো দাস বাজারে ঘুরে এসেছে। সক্রেটিস ও কবির জ্ঞানযুদ্ধে তাকে ডাকেনি। সক্রেটিস থিয়েটারে গিয়েছিল, তাও সে জানত না। এই কারণে চেরোফোনের অভিমান হওয়ার কথা। কিন্তু অভিমান বলতে কোনো জিনিস তার নেই। তার সবটাই রাগ। সে রাগে গজগজ করছে। তার ভালোবাসার প্রকাশ যেমন বেশি, রাগের প্রকাশও অনেক বেশি।

সে সক্রেটিসকে বলছে, তুমি দোস্ত নামের কলঙ্ক। এক নম্বরের বেইমান। দুর্জন যেমন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য, তেমনই বেইমান মানুষ বন্ধু হলেও পরিত্যাজ্য।

সক্রেটিস হাসি মুখে গালি খাচ্ছে। তবুও চেরোফোনের ঝাল মিটছে না। কারণ কেউ পাল্টা গালি দিচ্ছে না। সান্ত্বনাও দিচ্ছে না। সক্রেটিস ভাবছে, এখনই চেরোফোনকে থামাবে, নাকি রাগ কমতে আর একটু সময় দেবে।

এমন সময় হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাওয়া গেল। এই সময় তো এখানে ঘোড়া আসার কথা না। বন্ধুরা কেউ ঘোড়া নিয়ে আড্ডায় আসে নয়। সবাই পেছন ফিরে তাকাল। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলেন মোটাসোটা দশাসই এক লোক। তার সাথে কয়েক জন দাস। নেমেই তিনি উচ্চ স্বরে হাসতে শুরু করলেন। অবজ্ঞার হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি। সক্রেটিস লোকটিকে চেনে না। কিন্তু ভাবে মনে হচ্ছে লোকটি তাকে চেনেন। বোঝা যাচ্ছে, লোকটি ঝামেলা করতে এসেছেন।

হঠাৎ বড় এক ধমক দিয়ে লোকটি বললেন, কী যুবক সমাজ, তোমরা নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছ? সারাদিন শুধু জ্ঞান জ্ঞান করো?

চেরোফোন তার দিকে উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু সক্রেটিস তাকে থামিয়ে শান্তভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা সারাদিন জ্ঞান জ্ঞান করি।

লোকটি বললেন, 'কী সমস্যা তোমাদের? কেন এমন করো?'

'কারণ এটি আমার মায়ের আদেশ। আমি মাতৃআজ্ঞা পালন করি।'

'তোমার মা বলেছেন জ্ঞান-জ্ঞান করতে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মা তো একজন অতি সাধারণ ধাত্রী।'

'হ্যাঁ, আমার মা একজন সাধারণ ধরণী। সাধু ভাষায় ধাত্রী। চলতি কথায় দাইমা। আমার মা একজন দাইমা আর তার ছেলে আমিও দাইমা। আমিও ধাত্রী। খুবই সাধারণ একজন ধাত্রী।'

'তুমি ধাত্রী?'

‘অবশ্যই। আমি আর আমার মা একই কাজ করি।’

‘ছিঃ ছিঃ, সক্রেটিস, ছিঃ। এথেন্সে নারীরা বেগানা পুরুষদের সামনে যেতে পারে না। আমি জীবনে পরিবারের বাইরের কোনো নারীর মুখ দেখিনি। সেখানে তুমি পুরুষ হয়ে একজন ধাত্রী? ছিঃ ছিঃ ছিঃ...’

সক্রেটিস বলল, জনাব, আমার মা একজন ধাত্রী, কারণ তিনি অন্য মায়েদের সন্তান জন্ম দিতে সাহায্য করেন; আমিও একজন ধাত্রী, কারণ আমি অন্যদের মাঝে জ্ঞানের জন্ম দিতে কাজ করি। দুটোই জন্ম দেওয়া, শুধু তরিকা আলাদা। আমি হলাম জ্ঞানের ধাত্রী।[২৪]

‘জ্ঞানের ধাত্রী!’ লোকটি বোঝার চেষ্টা করছেন, সেটি কী জিনিস? মানুষ জ্ঞানের জন্ম দেয়? তাতে আবার ধাত্রীও লাগে? সক্রেটিস সেই ধাত্রী? তিনি সক্রেটিসের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

ক্রিতো মিষ্টি করে লোকটিকে বলল, জনাব, আর কিছু শুনবেন?

লোকটি লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়লেন। যেমন চট করে এসেছিলেন, তেমন ঝট করেই পালিয়ে গেলেন।

চেরোফোন লাফ দিয়ে বলল, জ্ঞানের ধাত্রী! উফ, এক্কেবারে থিয়েটারের সংলাপ। সক্রেটিস জ্ঞানের দাইমা। সে জ্ঞানের জন্ম দিতে কাজ করে। এমন একটি সংলাপ শোনার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা যায়।

সংলাপে দুটো কাজ হয়েছে। লোকটি পালিয়ে গেছেন আর চেরোফনের রাগ পড়ে গেছে। তার রাগ এমনই। দপ করে জ্বলে ওঠে, থপ করে নিভে যায়।

সিমন এই আড্ডায় প্রথম এসেছে। সে সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে এক সাগর মুগ্ধতা।

সিমন ভাবছে, সক্রেটিস সত্যিই জ্ঞানের ধাত্রী। গত দুই ঘণ্টায় সিমন সক্রেটিসের কাছে যা শিখেছে, তাতেই তার মধ্যে অনেক নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে। সক্রেটিস না হলে সে নিজে এসব ভাবতেই পারত না। সক্রেটিস আইডিয়া জন্ম দেয়। ধন্য সক্রেটিসের মা। সক্রেটিস তার মায়ের ধাত্রী পেশাটিকেও কত সম্মান দেয়! এথেন্সে মেয়েদের কাজ করার কোনো অধিকারই নেই, এথেন্সের মানুষ মেয়েদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে চায়, কোনো মেয়ে ধাত্রীর কাজ করলে, সেটিকে নিচু চোখে দেখা হয়। সেখানে সক্রেটিস তার মায়ের ধাত্রী পেশা নিয়ে গর্ব করে। সবার সামনে অহংকার করে বলে, মায়ের মতো আমিও একজন ধাত্রী।

হঠাৎ সিমনের দিকে নজর পড়ল সক্রেটিসের। সিমনকে তো বন্ধুদের সাথে আলাপ করানো হয়নি।

সক্রেটিস সিমনকে দেখিয়ে বলল, দেখো। আজ তোমাদের সাথে যোগ দিল নতুন এক প্রশ্ন-রোগী।

সবাই সিমনের দিকে তাকাল।

সক্রেটিস বলল, এ হলো এথেন্সের এক নম্বর পাদুকাশিল্পী।

সকলে চেঁচিয়ে উঠল, পাদুকাশিল্পী?

এমন শব্দ আগে কেউ শোনেনি।

সিমন লজ্জা পেল। সে বলল, না না, সক্রেটিস মজা করছে। আমি জুতা বানাই। আমার একটি জুতার দোকান আছে। আমি জুতার কারিগর।

চেরোফোন চিৎকার করে বলল, জুতার কারিগরের নাম পাদুকাশিল্পী! আরও কত কী শিখব এই সন্ধ্যায়! দুটি নতুন জিনিস দিয়ে শুরু হলো আজকের সন্ধ্যা, পাদুকাশিল্পী সিমন আর জ্ঞানের ধাত্রী সক্রেটিস।

আড্ডায় প্রাণ এসে গেছে। ঝড়ের মতো কথা চলছে। সিমনের দোকানে আজ ইজারাদার যে বজ্জাতি করল, সিমন সেই ঘটনা বলল। সেদিন সক্রেটিসের কাছে কবি কী রকম নাকাল হলো ক্রিতো সেই ঘটনা বলল।

সিমন সক্রেটিসকে ইশারা করল। সে এথেন্সের কাহিনি শুনতে চায়। এথেন্স নগর কীভাবে তৈরি হলো, কীভাবে আলোর নগরী নাম পেল, সেসব জানতে চায়। সক্রেটিস ফিসফিস করে বলল, 'চেরোফোনকে শুধু এক লাইনের একটি খোঁচা দাও।'

'কী বলে খোঁচা দেব?'

'বলো যে এথেন্স নষ্ট হয়ে গেছে, এখানে কোনো আলো নেই, চারিদিকে খালি অন্ধকার। তাহলেই চেরোফোন ঝাড়ি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, এথেন্স কী রকম আলোর নগরী। ঐ আলো কোথা থেকে এসেছে আর এখন কোথায় আছে; আলো কি শুয়ে আছে, নাকি বসে আছে— সবকিছু একেবারে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করে দিবে।

সিমন চেরোফোনের দিকে পিটপিট করে তাকাল। তারপর সাহস করে বলেই ফেলল, এথেন্সে কোনো আলো নেই, চারিদিকে খালি অন্ধকার?

লাফ দিয়ে উঠল চেরোফোন। বলল, অন্ধকার? এই পাদুকাশিল্পী বলে কী? এথেন্সে অন্ধকার কোথায় দেখলে? এথেন্সে কোনো অন্ধকার নেই। এথেন্স হচ্ছে আলোর নগরী। অন্ধকার দেখতে চাইলে ওই সাগরের ওপারে তাকাও। ওখানে সবই অন্ধকার। ওখানে ইট্রুস ফোঁটাও আলো নেই। আর এথেন্সের চারধারে আলো। জ্ঞানের আলো। বিদ্যার আলো।

সিমন আরও একটু পিন দিয়ে বলল, মুখে বললেই হলো? বুঝিয়ে বলো, কীভাবে এথেন্স জ্ঞানের নগরী হলো? কী এমন কাজ তোমরা করলে যে জ্ঞান হেঁটে হেঁটে এথেন্সে চলে এলো?

সিমন একেবারে জায়গা মতো আঘাত করেছে। এটি চেরোফোনের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। এথেন্সের কাহিনি বলতে তার আবেগ ধরে না, উথলে উথলে পড়ে। গদগদ গলায় সে বলল, এথেন্স একটি জ্ঞানের নগরী। একটি বাচ্চা ছেলেও এই কারণ জানে।

ক্রিতো বলল, কারণটা কী?

'কারণটা হলো আমরা এথেন্সে জ্ঞানকে বন্দি করে ফেলেছি।'

সিমন বলল, বন্দি করে ফেলেছি? জ্ঞানকে? তার মানে এথেন্স হলো একটি কারাগার, আর সেখানে বন্দি আছে জ্ঞান?

চেরোফোন বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমরা এথেন্সে জ্ঞানকে আটক করেছি। শোন সেই কাহিনি:

অনেক বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যাযাবরের মতো ঘুরছিল এক টুকরো মাটির জন্য। কোথায় বসতি গড়া যায়? ঘুরতে ঘুরতে এজিয়ান সাগরের পাড়ে এই জায়গাটি তাদের পছন্দ হলো। তখন তারা দেবতাদের ডাকলো, 'হে মহান দেবতারা, এখানে আমাদের একটি শহর বানিয়ে দাও। আমরা এখানে বাস করব।' কিন্তু দেবতারা তখন নিজেরা ঝগড়া-ঝাঁটি করছিল। তারা কোনো সাড়া দিল না। হতাশ হয়ে মানুষ নিজেরাই কষ্ট করে একটি শহর বানিয়ে তুলল। এক্রোপলিস পাহাড়টিকে ঘিরে তৈরি হলো নগর। যখন বানানো শেষ, তখন দেবতাদের হুঁশ হলো। আরে, আমাদের বাদ দিয়েই মানুষ এত ভালো একটি শহর গড়ে তুলেছে! তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে কার আগে এই নগরের দেবতা হবে?

একটু থেমে চেরোফোন বলল, বন্ধুরা, কিছু ভুল বললে ধরিয়ে দিও।

ক্রিতো বলল, মজা পাচ্ছি। চালিয়ে যাও।

চেরোফোন আবার শুরু করল, নতুন নগর দখল করতে এক্রোপোলিসের উপরে এলো দুই দেবতা। সমুদ্রের দেবতা পোসাইডন[২৫] আর জ্ঞানের দেবী এথিনা। এথিনা আবার যুদ্ধেরও দেবী। তারা দুজন শুরু করল যুদ্ধ। এক্রোপলিসের উপরে ভীষণ যুদ্ধ। কেউ কারে নাহি জিনে— এমন যুদ্ধ। এই দুই দেবতা আবার আত্মীয়। এথিনা হলো দেবতাদের রাজা জিউসের মেয়ে। আর পোসাইডন হলো জিউসের ভাই। সম্পর্কে তারা চাচা-ভাতিজি। নিজের ভাই আর মেয়ের এমন মারামারি দেখে মনে ব্যথা পেলেন জিউস। তিনি বললেন, চাচা-ভাতিজিতে যুদ্ধ করছো! ছিঃ ছিঃ, তোমরা তো দেবতা নামের কলঙ্ক। ঝগড়া বাদ দাও। শান্তির পথে আসো। কূটনীতির রাস্তায় হাঁটো। নতুন শহরের মানুষের কাছে যাও। তাদের উপহার দাও, তাদের খুশি কোরো। মানুষ খুশি হয়ে যাকে মেনে নেবে, সেই হবে নতুন নগরের দেবতা।

সিমন বলল, মানুষকে বাছাই করতে দিলে তারা কি বুড়ো চাচা পোসাইডনকে নেবে? সবাই সুন্দরী তরুণী এথিনাকেই চাইবে। বেচারা পোসাইডনের কোনো সুযোগ নেই।

চেরোফোন হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ, ঘটনা সেটিই হয়েছে। এথিনা জিতেছেন। তবে সুন্দরী তরুণী বলে নয়, জিতেছেন বুদ্ধির জোরে। সেই ঘটনাও মজার। বলছি শোন—

জিউসের অনুরোধে যুদ্ধ বন্ধ হলো। দুই দেবতা ঘুষ নিয়ে মানুষের কাছে এলো। মানুষকে ভোলাতে হবে। পোসাইডন সমুদ্রের দেবতা। পানির কেরামতি তার হাতে। তিনি

ইশারা করলেন আর পাহাড় ফেটে বের হলো পানি। তৈরি হলো ঝরনা। তিনি এথেন্সবাসীকে বললেন, 'এই নাও, এই ঝরনা তোমাদের। আজ থেকে এই নগরের মানুষের আর পানির অভাব হবে না।' মানুষ আনন্দে ঝরনার কাছে গেল। পানি মুখে দিল। কিন্তু হায় হায়! পানি তো সমুদ্রের পানির মতো নোনতা। সাগরের দেবতা সাগরের পানি দিয়েছেন। এই পানি কোনো কাজে আসবে না।

এরপর এলেন দেবী এথিনা। তিনি বুদ্ধির দেবী। তার অনেক বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেবী তার মাথার মুকুট থেকে বের করলেন একটি জলপাই গাছ। বললেন, নাও, এই গাছ তোমাদের। তিনি একটি তুড়ি বাজালেন আর এথেন্সের পাহাড়ি মাটিতে জন্ম হলো হাজার হাজার জলপাই গাছ। এথিনা বললেন, 'আজ থেকে তোমাদের আর কোনো অভাব থাকবে না। জলপাই[২৬] থেকে তেল হবে। সেই তেল বিদেশে বিক্রি করে তোমাদের সকল অভাব দূর হবে।' নগরের মানুষ মহাখুশি। এথিনা কাজের মতো কাজ করেছেন। তারা বাদ্য-বাজনা নিয়ে দেবীকে এক্রোপোলিসের চূড়ায় নিয়ে গেল। ঘোষণা করল, আজ থেকে এই শহরের নাম এথিনা[২৭]।

দেবী অনেক খুশি। খুশিতে তার পোষা পেঁচা বের করে দেবী বললেন, জ্ঞানের আলোতে অন্ধকারেও দেখতে পাওয়া যায়। পেঁচাও অন্ধকারে দেখতে পায়। সেজন্য পেঁচা হলো জ্ঞানের প্রতীক। এই নাও, আজ থেকে এই জ্ঞান এথেন্সের। এখন থেকে এথেন্স হবে জ্ঞানের শহর। এই মুহূর্ত থেকেই তোমাদের অনেক বুদ্ধি হয়ে যাবে।

দেবীর কথায় তক্ষুনি এথেন্সবাসীর অনেক বুদ্ধি হয়ে গেল। বুদ্ধি পেয়ে তারা সেই বুদ্ধি দেবীর উপরেই খাটাল। ফন্দি করল কীভাবে দেবীকে এথেন্সে আটকে রাখা যায়। তারা দেবীর পাখা কেটে দিল। দেবী আর উড়ে যেতে পারলেন না। আটকা পড়লেন এথেন্সে। তিনি জ্ঞানের দেবী, সেজন্য তার সাথে আটকা পড়ল জ্ঞান। সেই থেকে এথেন্সে জ্ঞানের বসতি। এজন্যেই এথেন্স জ্ঞানের শহর, আলোর শহর।

সিমন বলল, এটি কি সত্য কাহিনি? মনে হচ্ছে আমার দাদির কাছে রূপকথার গল্প শুনছি।

ক্রিতো বলল, রূপকথা মনে হলেও, এই গল্পই সবাই বিশ্বাস করে। এথেন্স নগরী প্রতিষ্ঠার কাহিনি এটিই। কাহিনিতে কোনো ফাঁক নেই। আমরা যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে সোজা উপরে তাকাও। ঐ যে এক্রোপলিসের উপরে এথিনার মন্দির দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের পাশের জায়গাটাতেই নাকি এথিনা আর পোসাইডনের সেই যুদ্ধ হয়েছিল। তার একটু পেছনে দেখো— ওই যে এথিনার মূর্তি। মূর্তিটির পাখা সত্যি কাটা।

চেরোফোন বলল, আরও প্রমাণ আছে। আমরা সাগরের দেবতা পোসাইডনকে একেবারে তাড়িয়ে দেইনি। তার জন্য একটি মন্দির করেছি। সেই মন্দিরটিও আমরা সবাই দেখেছি। এথেন্স থেকে একটু দূরে সোনিওতে[২৮]। সমুদ্রের দেবতা খুশি হয়ে আমাদেরকে সমুদ্রে ব্যবসা করার বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জাহাজ দেশ-বিদেশে

যায়। আমাদের বন্দরে সারা দুনিয়ার জাহাজ আসে। জাহাজে করে এথেন্সের জলপাই তেল দেশ- বিদেশে যায়। সমুদ্রপথে ব্যবসায় এথেন্সই সারা দুনিয়ার মধ্যে এক নম্বর। সমুদ্র যুদ্ধেও আমরা সবার উপরে।

সিমনের চোখে এখনও অবিশ্বাস।

চেরোফোন একটু রেগে বলল, শোন পাদুকাশিল্পী, আমার এথেন্সের কাহিনিতে কোনো ফাঁক নেই। এথেন্সের সব মানুষ এই কাহিনিই বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করার জন্য তোমার সামনে সব প্রমাণ হাজির আছে। এখন বিশ্বাস করা না করা একান্তই তোমার ব্যাপার।

সিমন কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে জ্ঞান-পাগল মানুষ। যুক্তি দিয়ে সবকিছু দেখে। দেবতারা এসে এখানে জ্ঞান দিয়ে গেছে, এমন কথা বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছে করছে না। সে সক্রেটিসের দিকে তাকাল।

সক্রেটিসের চোখেও অবিশ্বাস। সে বলল, দেবতাদের গল্প মানুষকে বিশ্বাস করানো কঠিন। এটি সত্য কিনা কেউ জানে না।

পেছন থেকে ইউরিপিডিস বলল, তবে যেটি সত্য, সেটি হলো আজ থেকে চারশত বছর আগে এখানে এক বিশাল যুদ্ধ হয়েছিল। সেটি হলো ট্রয়ের যুদ্ধ। স্পার্টা নগরের সুন্দরী হেলেনকে চুরি করে নিয়ে গেলে গ্রিসের সাথে ট্রয় নগরীর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধটি সত্য। সেই যুদ্ধ নিয়ে মহাকবি হোমার লিখেছেন তার বই ইলিয়াদ। তার বই আমরা সবাই পড়ি। আগোরার বইয়ের দোকানে এখনও সব থেকে বেশি বিক্রি হয় হোমারের বই।

অনলাইনে বেস্টসেলিং বই কিনুন
অনলাইনে বেস্টসেলিং বই কিনুন

কোন ফাঁকে যেন ইউরিপিডিস এসে গেছে। সে এতক্ষণ কিছুই বলেনি। সে যখন শুরু করেছে, এবার আর তাকে থামানো যাবে না।

***

২২. সিমন: দার্শনিক, তিনি Simon the Shoemaker নামে পরিচিতি। আগোরার প্রবেশপথেই ছিল তার দোকান। সক্রেটিস তার দোকানে বসে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।

২৩. চেরোফোন: সক্রেটিসের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং বন্ধু। তার বয়স সক্রেটিসের চেয়ে একটু বেশি।

২৪. প্লেটোর থিটিটাস (Theaetetus) ডায়ালগে সক্রেটিস নিজেকে Midwife to knowledge বলেন।

২৫. পোসাইডন (Poseidon): গ্রিক মিথোলজির সমুদ্রের দেবতা। তিনি জিউসের ভাই।

২৬. প্রাচীন এথেন্সের প্রধান কৃষি পণ্য ছিল জলপাই তেল।

২৭. এথেন্স শহরের নাম দেবী এথিনার নামে, গ্রিক ভাষায় Athina (গ্রিক উচ্চারণ আথিনা)

২৮. সোনিও (Sounion): এথেন্স থেকে ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এজিয়ান সাগরের তীরে পাহাড়ি এলাকা, এখানে এখনও পোসাইডনের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

‘আমরা বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ভালোবাসি,
কিন্তু সেই ভালোবাসা আমাদের বিলাসী করেনি;
আমরা অন্তরের সৌন্দর্যকে ভালোবাসি,
কিন্তু সেই ভালোবাসা আমাদের শক্তিহীন করেনি
— পেরিক্লিস

ইউরিপিডিস আড্ডার জন্য জুতসই লোক নয়।

সে আড্ডা নষ্ট করে। সে সব সময় বড় বড় জিনিস নিয়ে আলাপ করে। উচ্চস্তরের কথাবার্তা বলে। আড্ডার জন্য উচ্চস্তরের কথা ক্ষতিকর। আড্ডায় দরকার তুচ্ছ কথা, টুকরা আলাপ। ইউরিপিডিস কোনো ধরনের টুকরা আলাপে নেই। তার সবকিছু উচ্চপর্যায়ের

ইউরিপিডিস নিজে জানে যে সে আড্ডার জন্য উপযোগী নয়। তাই সে আড্ডায় বেশি কথা বলে না, চুপচাপ শোনে। কিন্তু যেদিন সে কথা শুরু করে, সেদিন সবাই বুঝে যায় যে আজ আর কারও কোনো সুযোগ নেই, আজ সব কথা সে একাই বলবে। সেসব কথা উচ্চস্তরের সাহিত্যের কথা। তখন আর উপায় নেই, সবাই মুখে কুলুপ দিয়ে তার কথা শোনে।

আজ ইউরিপিডিস কথা শুরু করেছে। তাই অন্য সবার মুখে কুলুপ।

সক্রেটিসের মুখেও কুলুপ। সে মনে মনে বলছে ইউরিপিডিস যেন আজ হোমারের বই নিয়ে আলাপ শুরু করে। হোমারের লেখা সে খুব সুন্দর করে বলতে পারে।

ভাগ্য ভালো। ইউরিপিডিস হোমারের লেখা নিয়েই কথা বলছে। সে নাটকের মতো ঘটা করেই শুরু করেছে ট্রয় যুদ্ধের কথা। তার প্রিয় বই হোমারের ‘ইলিয়াদ’। সে এখন ইলিয়াদ আবৃত্তি করবে। সেটি বুঝতে পেরে সক্রেটিস বলল, আজকের আড্ডার একটি নাম দিই। নাম হোক ‘হোমারের আকাশে এক ঝাঁক যুবক।

সিমন বলল, হোমারের আকাশে ঢোকার শুরুতে বলো, ট্রয় যুদ্ধের জায়গাগুলো ঠিক কোনখানে?

ইউরিপিডিস বলল, কোনখানে? মানে আমাকে এখন ভূগোল বলতে হবে? ঠিক আছে, ইতিহাস থাক, আগে ভূগোল। তো শোন, ট্রয় যুদ্ধের ভূগোল হলো তিনটি প্রধান শহর নিয়ে। সেগুলো হলো ট্রয়, স্পার্টা আর মাইসিন। ট্রয় শহরটি আমাদের ঠিক নাক বরাবর। ওদিকে তাকাও, এথেন্স থেকে এজিয়ান সাগরের ঠিক উল্টা পাড়েই ট্রয়। স্পার্টা হলো এথেন্স থেকে আড়াইশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি শহর। স্পার্টার রানি হেলেন ছিলেন বিশ্ব সুন্দরী। সুন্দরী হেলেন ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের প্রেমে পড়ে ট্রয় নগরে পালিয়ে যায়। প্রতিশোধ নিতে হেলেনের স্বামী স্পার্টার রাজা মেলেনাউস ছুটে এলো তার বড় ভাইয়ের কাছে। বড় ভাই মাইসিন[২৯] নগরের রাজা আগামেমনন। আগামেমনন গ্রিসের সব

নগরের মানুষকে নিয়ে একটি বিশাল সেনাবাহিনী একত্র করল মাইসিন শহরে। মাইসিন শহরটি এথেন্স থেকে নব্বই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মাইসিন থেকেই গ্রিক বাহিনী জাহাজে করে ট্রয় আক্রমণ করে। যুদ্ধটা হয়েছিল ট্রয় নগরেই

সিমন বলল, বাহ্, তুমি তো ভূগোলে একেবারে দশে দশ। কোন জায়গা কোন দিকে, কত দূরে সব মুখস্ত।

ইউরিপিডিস বলল, কারণ হলো এই জায়গাগুলো আমার একেবারে তীর্থস্থানের মতো। আমার কয়েকটা তীর্থ আছে, সেই জায়গাগুলোতে আমি বারবার যাই। প্রথম তীর্থ হলো সেই জায়গা, যেখানে হোমার জন্ম নিয়েছিলেন। সেটি হলো কিয়স দ্বীপ। সেখানে আমি দশবার গিয়েছি। এর পরের তীর্থ হলো ট্রয় যুদ্ধের জায়গাগুলো। আমি সময় পেলেই এই জায়গাগুলো ঘুরে আসি। কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম ট্রয় নগরে। এবার সেখানে গিয়ে ঠিক করলাম একদিন ট্রয়ের মেয়েদের নিয়ে একটি নাটক লিখব।

সক্রেটিসের মনে হলো, আড্ডা যত খারাপ হবে ভেবেছিল, তত খারাপ লাগছে না। ইউরিপিডিস নাটকের মানুষ। সে নাটকীয়ভাবে ঘটনা বলতে পারে। হোমারের বই তার টানা মুখস্ত। সে তোতাপাখির মতো ঘটনা বলছে। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তার মনে হলো হোমারের আকাশে সত্যিই জ্বলে উঠেছে এক ঝাঁক যুবক।

কবি হোমারের বই এখানে ধর্মগ্রন্থের মতো। এখানে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। গ্রিসের ধর্ম-কর্ম এরকম-

মানুষ বিশ্বাস করে যে এথেন্সের উত্তরে চারশ কিলোমিটার দূরে অলিম্পাস পাহাড়ে বারোজন দেবতা থাকে। সেই দেবতাদের রাজা হলেন জিউস। জিউস তার সাঙ্গাপাঙ্গ নিয়ে পৃথিবী চালান। এই দেবতারাই মানুষের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। দেবতারা খুশি হলে মানুষ সুখে থাকে আর বেজার হলে ঘটে সাড়ে সর্বনাশ। এক একজন দেবতা আবার এক একটি শহর কবজা করে রাখেন। যেমন এথেন্সের দেবী হলেন এথিনা। এখানে সব কাজ দেবী এথিনার নামে হয়। দেবতাদের সব কাজকর্ম মানুষের মতোই, তবে তাদের সবকিছু একটু বেশি বেশি। তাদের রাগ বেশি, আবেগ বেশি, ভালোবাসা বেশি, হিংসাও বেশি। খুশি হলে তারা হা হা, হো হো করে হাসে; দুঃখ পেলে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে; আবার হিংসায় জ্বলে পুড়ে তীব্রভাবে ঝগড়া করে। তাদের ঝগড়া আর হিংসায় মানুষের জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডি।

এখানে দেবতাদের কথা মানুষের মুখে মুখে, লিখিত কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। ধর্মগ্রন্থের জায়গাটি শূন্য। সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে হোমারের দুটি বই— ইলিয়াদ আর অডিসি। এই দুটি বই বাচ্চারা তোতাপাখির মতো মুখস্ত করে। একটু বড় হলে কথায় কথায় এই বইগুলো থেকে শোলক বলে। বই দুটো প্রত্যেকের জীবনের অংশ। বড় পবিত্র জিনিস। এই দুটোর কাহিনি জানে না এমন মানুষ এথেন্সে নেই। ইলিয়াদ হলো ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনি।

ইউরিপিডিস মায়াভরা গলায় বলছে, ট্রয় নগরীকে আমরা গ্রিকরা বলি ইলিয়ন। ইলিয়নের কাহিনি নিয়ে হোমারের কবিতা, সেজন্য বইয়ের নাম ইলিয়াদ। ইলিয়াদ হলো কবিতা, একটি মহাকাব্য। কবি হোমার এই মহাকাব্যে সুর, ছন্দ, অলংকার মিশিয়ে ট্রয় যুদ্ধের কথা বলেছেন। এই বইতেই হোমার একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে গেছেন। একটি দীর্ঘ কবিতা কীভাবে লেখা যায়; মহাকাব্য কেমন হয়; একটি কাহিনি কীভাবে শুরু করে কীভাবে শেষ করতে হয়, সেটি তিনি তৈরি করে গেছেন।

সক্রেটিস ভাবছে ইউরিপিডিস নতুন কথা বলছে। এখানে সবাই ইলিয়াদের কাহিনি জানে। কিন্তু ইউরিপিডিস যেভাবে ব্যাখ্যা করছে, সেটি কেউ জানে না। ছেলেটা আসলেই সাহিত্যের পণ্ডিত। কিন্তু বেশি পণ্ডিতি করতে দিলে ওর কথা কেউ কিছুই বুঝবে না। ওকে এমনভাবে বলতে দিতে হবে যেন বেশি গভীরে চলে না যায়। হালকার উপর ঝাপসা করে বলতে দিতে হবে।

সক্রেটিস বলল, কবিতার ছন্দ, সুর ওসব তোমাদের কবিদের কাজ। ছন্দ, সুর নিয়ে আমাদের কাজ নেই। আমাদের বলো যে ইলিয়াদ বইটা হোমার এমন কীভাবে শুরু আর শেষ করলেন যে, যেটি একেবারে নতুন একটি ধারা হয়ে গেল?

ইউরিপিডিস বলল, ভেবে দেখো, ইলিয়াদের কাহিনি তো হোমার নিজে তৈরি করেননি। ট্রয় যুদ্ধের কাহিনি মানুষ কয়েক শত বছর ধরে জানে। সেই কাহিনি থেকে একটি মহাকাব্য লিখতে কোনখান থেকে শুরু করবেন, সেটি একান্তই কবির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। হোমার ইলিয়াদ[৩০] শুরু করেছেন এভাবে—

'রাগ, মহারাগ, রাগে ফুঁসছে মহাবীর একিলিস'। এটি ইলিয়াদের প্রথম লাইন।

দেখো— এখানে একটি আকর্ষণ আছে। সবাই জানে একিলিস হলো রক্ত মাংসের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর। সেই বীর রাগে ফুঁসছে। লাইনটি পড়েই মানুষের মনে হয় একিলিস কেন রাগ করেছে? একিলিসের মতো বীর রাগ করেছে মানে ঘটনা সাংঘাতিক। মানুষ জানতে চায় এই রাগের কারণ কী, পরিণতি কী? এই যে শুরুতেই মানুষের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়ে দেওয়া, জানতে চাওয়ার একটি ইচ্ছা জাগিয়ে দেওয়া, এটি হোমার আমাদের শিখিয়েছেন। আজ যদি তুমি তোমার দাদুকে ট্রয় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করো, তিনি শুরু করবেন এভাবে— তিনজন দেবী একটি আপেল নিয়ে ঝগড়া করছিল, তারা হেলেনকে প্যারিসের প্রেমে মশগুল করে দিল, তারা পালিয়ে গেল। কিন্তু হোমার সেভাবে শুরু করেননি। হোমার একজন বীরকে বাছাই করেছেন যার নাম একিলিস, যার রাগ-ক্রোধ-বীরত্বকে কেন্দ্র করে কাহিনি টেনে নিয়ে গেছেন। এখন আমরা সব লেখক এভাবেই কাহিনি বানাই, এভাবেই নাটক শুরু করি।

সিমন বলল, বোঝা গেল যে ইলিয়াদের শুরুটা নাটকীয়। এর মধ্য দিয়ে সাহিত্যে নাটকীয়ভাবে শুরু করার ব্যাপারটা চালু হয়েছে। আর এই বইয়ের সমাপ্তি কীভাবে আলাদা?

ইউরিপিডিস বলল, সেখানেও হোমার নতুনত্ব এনেছেন। ট্রয় যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ইলিয়াদের কাহিনি যায়নি। হোমার ইলিয়াদ শেষ করেছেন ট্রয়ের বীর হেক্টরের মৃত্যুতে। তুমি যদি ইলিয়াদ লেখার আগে কাউকে ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনি জিজ্ঞেস করতে, সে বলত, ট্রয় যুদ্ধের মূল চরিত্র হেলেন বা প্যারিস। হয়তো অন্য কেউ বলত, এই যুদ্ধ জিতেছে গ্রিসের রাজা আগামেমনন, তাই মূল চরিত্র সে। কিন্তু হোমারের কাহিনি এখানে একেবারে অনন্য। তার কাহিনির মূল হলো একিলিস আর হেক্টরের যুদ্ধ। হোমার এই বইতে দুজন বীর মানুষের চরিত্র এঁকেছেন। একিলিস হলেন বিরাট যোদ্ধা, একই সাথে ভীষণ রাগী। আর হেক্টর হলেন মহান বীর, তিনি মানবিক। তার মৃত্যুকেই কবি মনে করেছেন কাহিনি শেষ করার জন্য উপযুক্ত। হেক্টরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইলিয়াদ শেষ করার মাধ্যমে কবি হোমার শুরু করলেন নতুন ধারা। তিনিই দেখালেন কাহিনি শেষ হবে বীরের মৃত্যুতে। তার মৃত্যুই হবে ট্র্যাজেডি। আমরা এখন যত নাটক লিখি— সেগুলোর পরিণতি হয় ট্রাজিক, এই ব্যাপারটা শুরু করেছেন হোমার। তার থেকেই আমরা শিখেছি। তিনিই আমাদের গুরু।

একথা বলতে বলতে ইউরিপিডিস মাথা নুইয়ে হোমারকে সম্মান জানাল। আড্ডার সবাই একেবারে মুগ্ধ। এত চমৎকার করে হোমারের কথা তারা আগে কোনোদিন শোনেনি। এরা সবাই ছোটবেলা থেকেই হোমারের ভক্ত। কিন্তু হোমারের পাণ্ডিত্য যে কতখানি, সেটি তারা জানত না। ইউরিপিডিস আজ সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে দিচ্ছে।

সিমন বলল, এবার তুমি অতি সংক্ষেপে ইলিয়াদের কাহিনি শোনাও। দেখি, এতক্ষণ যা ব্যাখ্যা করলে, সেটির সাথে মিলে কিনা।

ইউরিপিডিস মুচকি হাসি দিয়ে শুরু করলেন ইলিয়াদের কাহিনি। এই কাহিনি তার ঠোঁটের আগায়। সে তরতর করে বলতে শুরু করল:

ইলিয়াদের আগে ট্রয় যুদ্ধের একটি প্রেক্ষাপট বলা দরকার। ট্রয় যুদ্ধ শুরু হয় এভাবে। বীর একিলিসের বাবা-মায়ের বিয়ের উৎসবে সব দেব-দেবী দাওয়াত পেয়েছেন। শুধু দাওয়াত পাননি ঝগড়ার দেবী। সেজন্য তিনি রাগ করে বিয়ের উৎসব ভণ্ডুল করার জন্য সেখানে পাঠালেন একটি সোনার আপেল, আপেলের ওপর লেখা— 'পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নারীর জন্য।' সাথে সাথে আপেল নেওয়ার জন্য ঝগড়া লেগে গেল। তিনজন দেবী এথিনা, হেরা আর আফ্রোদিতি নিজেকে সেরা সুন্দরী বলে দাবি করলেন। দেবতাদের রাজা জিউস ঠিক করলেন, প্রতিযোগিতা হবে। পৃথিবীর প্রথম সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার বিচারক হবেন ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস। প্যারিস সোনার আপেলটা হাতে নিয়ে বসল। তিন সুন্দরীই তাকে ঘুষ দিতে চাইলেন। দেবী হেরা বললেন, আমি হলাম দেবতাদের মহারানি, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীর রাজা করে দেব। দেবী এথিনা বললেন, আমি যুদ্ধের দেবী, তোমাকে সব যুদ্ধ জিতিয়ে দেব। দেবী আফ্রোদিতি বললেন, আমি সৌন্দর্যের দেবী, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে তোমার প্রেমে

পাগল করে দেব। তরুণ প্যারিস প্রেমিক মনের মানুষ। সে ভাবলো, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের প্রেমের চেয়ে বড় পুরস্কার আর হতে পারে না। সে আফ্রোদিতিকে সোনার আপেল দিয়ে দিল। আফ্রোদিতি কথা রাখলেন। পৃথিবীর সেরা সুন্দরী স্পার্টার রানি হেলেন প্রেমে পড়ল প্যারিসের, তার সাথে ট্রয় নগরে পালিয়ে গেল। হেলেনের স্বামী স্পার্টার রাজা মেনেলাউস তার ভাই আগামেমননের কাছে গেল। আগামেমনন সব গ্রিক বীরদের একত্র করে জাহাজে করে আক্রমণ করল ট্রয়। উদ্দেশ্য হেলেনকে উদ্ধার করা। গ্রিকদের ছিল সবচেয়ে বড় বীর একিলিস, সবচেয়ে বুদ্ধিমান অডিসিয়াস আর তাদের সবার নেতা রাজা আগামেমনন। গ্রিকরা ভেবেছিল, তারা খুব সহজে ট্রয়কে ধ্বংস করে মহানন্দে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু সেটি হয়নি। ট্রয়ের আছে বীর যোদ্ধা হেক্টর আর আছে শহরের চারধার ঘিরে অনেক উঁচু দেয়াল। তারা দেয়ালের ভেতরে থাকে। সেই দেয়াল ভেদ করে ট্রয়ের ভেতর কেউ ঢুকতে পারে না। গ্রিকরা ট্রয়ের দেয়ালের চারপাশ ঘিরে রইল।

এই অবস্থা থেকে হোমার তার ইলিয়াদ মহাকাব্যের কাহিনি সাজিয়েছেন। হোমার যেভাবে ইলিয়াদের কাহিনি নির্মাণ করেছেন, সেটি মোটামুটি এরকম—

গ্রিকরা নয় বছর ধরে ট্রয়কে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। দশম বছরের যুদ্ধ চলছে।

একিলিস খুব রাগ করেছে। রাজা আগামেমননের সাথে তার ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়ার কারণ খুবই লজ্জাজনক। ঝগড়া হচ্ছে যুদ্ধে পাওয়া একটি নারীকে দখল করা নিয়ে। ট্রয় আক্রমণ করে লুটের সম্পদ ভাগাভাগি করে নিয়েছিল গ্রিকরা। যুদ্ধে পাওয়া মেয়েদেরও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল গ্রিক বীরেরা। এক সময় হঠাৎ শুরু হলো প্লেগ। প্লেগে গ্রিক সেনারা মারা যাচ্ছে। প্লেগের কারণ রাজা আগামেমনন ট্রয়ের যে মেয়েটিকে যুদ্ধবন্দি করে রেখেছিল, সে ছিল দেবতা এপোলোর মন্দিরের সেবিকা। মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে তার বাবা অনেক কান্নাকাটি করেছে, অনেক ঘুষ দিতে চেয়েছে, কিন্তু একরোখা আগামেমনন কিছুতেই মেয়েটিকে ছাড়বে না। সেজন্য দেবতা এপোলো রাগ করে গ্রিকদের মাঝে প্লেগ ছেড়ে দিয়েছে। প্লেগ থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে আগামেমনন মেয়েটিকে ফেরত দিচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে একিলিসের কাছে যে যুদ্ধনারী ছিল, তাকে নিয়ে নিচ্ছে। সেই রাগে বীর একিলিস ফুঁসছে। সে আগামেমননকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, সে আর তাকে রাজা বলে মানবে না, সে আর এই যুদ্ধ করবে না। একিলিস যুদ্ধ ত্যাগ করে তার মা থেটিসের কাছে কেঁদে কেঁদে নালিশ করল। তার মায়াশীলা মা দেবরাজ জিউসের কাছে ছেলের জন্য তদবির করল, 'দেবরাজ, এমন কিছু করুন যেন গ্রিকরা বিপদে পড়ে, একিলিসকে ছাড়া কিছুতেই যুদ্ধ জিততে না পারে। জিউস আগামেমননকে স্বপ্নে বলল, আর অবরোধ করে থেকো না, ট্রয় আক্রমণ কর।

দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে গ্রিকরা সেনা সাজালো। ট্রয়ও তাদের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলো। যুদ্ধের শুরুতে প্রেমিক পুরুষ প্যারিস একটু বীরত্ব দেখাতে চাইল। সে বলল,

‘হেলেনকে নিয়ে এই যুদ্ধ। আমি আর মেনেলাউস দুজনেই হেলেনকে চাই। তো আসো, আমি আর মেনেলাউস দুজনে যুদ্ধ করি। যে জিতবে হেলেন তার। ট্রয় যুদ্ধ এখানেই শেষ হবে।’ গ্রিকরা রাজি। কিন্তু প্যারিস আসলে প্রেমের মাঠের পাকা খেলোয়াড়, যুদ্ধে খুবই কাঁচা। সে একেবারে গো হারা হেরে গেল মেনেলাউসের কাছে। হারার পর আর তার বীরত্ব থাকল না, জীবন বাঁচাতে পালিয়ে গেল ট্রয়ের দেয়ালের ভেতরে। দুই পক্ষে শুরু হলো বিশাল যুদ্ধ।

হেক্টর তার স্ত্রী ও সন্তানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলো। অনেক বিক্রমে যুদ্ধ করল। কয়েক দিন যুদ্ধ চলল, হেক্টর গ্রিকদের হারিয়ে এগিয়ে চলল। আর একটু আগালেই গ্রিকদের জাহাজ পুড়িয়ে দেওয়া শুরু করবে। অবস্থা খারাপ বুঝে আগামেমনন দেখল আর উপায় নেই, এখন সবচেয়ে বড় বীর একিলিসকে লাগবেই। গ্রিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী অডিসিয়াস ও এজাক্স গেল একিলিসকে বোঝাতে। একিলিসের কাছ থেকে আগামেনন যে নারীটিকে নিয়ে গিয়েছিল, তাকেও ফেরত দিল। কিন্তু না, একিলিস আগামেমননকে ঘৃণা করে, সে যুদ্ধ করতে এলো না। এখানে হোমার একিলিসের মুখে খুব সুন্দর একটি সংলাপ দিলেন। যুদ্ধে যাবে কিনা সেই দ্বিধায় একিলিস বলল,

‘আমার মা থেটিস বলেছেন, আমার সামনে এখন দুটি ভাগ্যরেখা। যদি যুদ্ধ করি, আমার আর বাড়ি ফেরা হবে না, কিন্তু আমার গৌরব রয়ে যাবে চিরকাল। আর যদি যুদ্ধ না করে ফিরে যাই, তাহলে বেঁচে থাকব অনেক দিন, কিন্তু গৌরবের হবে মরণ।’

একিলিস যুদ্ধ করতে গেল না। এদিকে ট্রয়ের হেক্টর এগিয়ে আসছে, সব গ্রিক জাহাজ পুড়িয়ে দেবে। তখন একিলিসের সবচেয়ে কাছের বন্ধু পেট্রোক্লাস একিলিসের যুদ্ধ-পোশাক পরে যুদ্ধে এগিয়ে গেল। হেক্টর তাকে একিলিস মনে করে হত্যা করল। একিলিসের কাছে যখন প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ এলো, সে আকাশ কাঁপিয়ে হাহাকার করে উঠল,

‘কষ্ট, আমার বুকভরা কষ্ট, পিতা বা পুত্রের মৃত্যুও আমার কাছে এত কষ্টের নয়।’

বীর একিলিস হাউমাউ করে কাঁদল। কিন্তু একটু পরেই কান্না থামিয়ে রাগে গর্জন করে উঠল। বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধের নেশায় সে উন্মাদ হয়ে গেল। সে যুদ্ধে গেল। উদ্দেশ্য হেক্টরকে হত্যা করা। হেক্টর তার সাথে যুদ্ধের শর্ত নিয়ে কথা বলতে চাইল। কিন্তু একিলিস হুংকার দিয়ে বলল,

‘সিংহ কোনোদিন মানুষের শর্ত মানে না, নেকড়ে কোনোদিন মেষের সাথে চুক্তি করে না, এই যুদ্ধে কোনো শর্ত হবে না; শর্ত শুধু একটিই— মরতে হবে একজনকে, একজনের রক্তে ভিজতে হবে এই রণাঙ্গনের মাটি।’

ভয়াবহ যুদ্ধে একিলিস হত্যা করল হেক্টরকে। প্রতিশোধের নেশায় একিলিস হেক্টরের দেহ রথের চাকায় বেঁধে ট্রয়ের দেয়ালের চারপাশে উন্মাদের মতো ঘুরতে থাকল। প্রতিশোধ শেষ হলে, একিলিস বন্ধুর দেহ সৎকার করল। বন্ধুর স্মৃতিতে বিশেষ ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা আয়োজন করল। কিন্তু এরপরও হেক্টরের উপর তার রাগ কমল না। সে হেক্টরের মৃতদেহ ফেরত দেবে না, হেক্টরের দেহের সৎকার হবে না, তার মৃতদেহ শিয়াল-কুকুরে খাবে। তখন হেক্টরের বৃদ্ধ বাবা ট্রয়ের রাজা প্রিয়াম অনেক উপহার নিয়ে এসে অনুনয় করলে হেক্টরের দেহ ফেরত দিল। হেক্টরের দেহ চিতায় পোড়ানো হলো। পোড়ানো শেষে হাড়গুলো একটি সোনার ঘটে করে কবর দেওয়া হলো। মহান বীর হেক্টরের দেহ সৎকার পেল।

হোমার এই পর্যন্ত ইলিয়াদ শেষ করেছেন।

ইলিয়াদ এখানে শেষ হলেও ট্রয় যুদ্ধ শেষ হয়নি। একিলিস যুদ্ধ করছিল। একিলিসের একটি মজার বর ছিল। শুধু গোড়ালিতে ছাড়া অন্য কোথাও কোনো আঘাতে তার কিচ্ছু হবে না। দেবতা এপোলো এই গোপন খবর বলে দিল প্যারিসকে। প্যারিস তীর মারলো একিলিসের গোড়ালি লক্ষ্য করে। মারা গেল গ্রিসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর একিলিস। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়নি। হেক্টরের মৃত্যুর পর ট্রয় বাহিনী প্রায় শেষ হয়ে গেছে। গ্রিকদের জয় এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু ট্রয় নগরের দেয়াল বড় কঠিন। গ্রিকরা সেটি ভেঙে ঢুকতে পারছে না, তাই যুদ্ধও শেষ হচ্ছে না। শেষে গ্রিসের কৌশলী নেতা অডিসিয়াস একটি ফন্দি করল। কাঠের একটি বিশাল ঘোড়া বানিয়ে ট্রয়কে উপহার দিয়ে বলল, 'যুদ্ধ শেষ, আমরা গ্রিসে ফিরে যাচ্ছি। এই ঘোড়া আমাদের কাছ থেকে তোমাদের জন্য উপহার। নাও, ঘোড়া নিয়ে আনন্দ করো।' ট্রয়ের মানুষ সেই ঘোড়া নগরের দেয়ালের ভেতরে নিয়ে আনন্দ শুরু করল। তারা যুদ্ধ জিতে গেছে। কিন্তু সেই কাঠের ঘোড়ার ভেতরে লুকিয়ে ছিল গ্রিসের কয়েকজন শক্তিশালী যোদ্ধা। তারা রাতে ঘোড়া থেকে বের হয়ে ভেতর থেকে ট্রয়ের দেয়াল খুলে দিল আর গ্রিক বাহিনী ঢুকে পড়ল ট্রয় নগরে। তারা ট্রয় শহর জ্বালিয়ে দিল। সব পুরুষ নাগরিককে হত্যা করল। নারী আর শিশুদের যুদ্ধবন্দি করে জাহাজে তুলল। রাজা আগামেমনন জিতল ট্রয়ের যুদ্ধ। হেলেনকে ফিরে পেল মেলেনাউস। তারা বাড়ি ফেরার জন্য জাহাজে উঠল।

অনেকক্ষণ ধরে ট্রয়ের কাহিনি বলতে বলতে ইউরিপিডিস ক্লান্ত। সে একজন দাসকে ইশারা করল। গলা শুকিয়ে কাঠ। পানীয় দরকার।

সক্রেটিস ইউরিপিডিসের পিঠ চাপড়ে বলল, আমি নাটক, গল্প, কবিতা এগুলো তেমন ভালোবাসি না। এগুলো মিথ্যার বেসাতি। কিন্তু ইউরিপিডিস যেভাবে বলে, সেটি ভালো না লেগে উপায় নেই। আজ তুমি সত্যিই আসর জমিয়ে দিয়েছো। একেবারে কিস্তিমাৎ।

ক্রিতো বলল, আমরা চাই ইউরিপিডিস প্রতিদিন আমাদের আড্ডায় আসুক। আমরা তার কাছে প্রতিদিন বিনা টিকিটে নাটক দেখব।

সিমন বলল, আমার কিন্তু আরও কিছু কঠিন আলাপ বাকি আছে।

ক্রিতো বলল, কঠিন-তরল যা বাকি আছে সবই বলে ফেল।

সিমন বলল, কবি হোমার কি নিজে ট্রয় যুদ্ধ দেখেছেন?

ইউরিপিডিস হাসতে হাসতে বলল, হোমার কেন, তার দাদার দাদাও দেখেননি। ট্রয় যুদ্ধের চারশো বছর পরে হোমার ইলিয়াদ লিখেছিলেন। সেই সময় সবাই মুখে মুখে ট্রয়ের কাহিনি মনে রাখত। এই কাহিনি নিয়ে কবিরা পালাগান লিখতেন। একদিন হোমার এই কাহিনি নিয়ে চমৎকার কবিতার ছন্দে লিখে ফেললেন বিশাল এক কবিতার বই। একটি মহাকাব্য। নাম দিলেন ইলিয়াদ।

সিমন বলল, চমৎকার।

চেরোফোন অনেকক্ষণ কথা বলেনি। সে বলল, ইলিয়াদ তো বিশাল কাব্য। কয়টি লাইন আছে এই কবিতায়?

ইউরিপিডিস বলল, ১৫৬৯৩ লাইন। এতগুলো লাইনে তিনি চমৎকার সব অলংকার আর তুলনা ব্যবহার করেছেন। একিলিসকে তিনি খুব সুন্দর সুন্দর উপাধি দিয়েছেন। হোমারের ভাষায় একিলিস দ্রুতর চেয়ে দ্রুততর, তুলনাহীন তার ছুটে চলা। হোমার অলংকারের রাজা। আজও যেসব সুন্দর সুন্দর অলংকার ব্যবহার করি, তা শুরু করেছেন হোমার।

সক্রেটিস বলল, সেজন্যেই তো আজকের আড্ডার নামও অলংকারময় 'হোমারের আকাশে এক ঝাঁক যুবক'।

সবাই সায় দিল।

ইউরিপিডিস বলল, তোমরা রাগ না করলে আমি একটি কথা বলি। আমার মনে হয় হোমার যেভাবে ইলিয়াদ লিখেছেন, তাতে এই মহাকাব্যের নায়ক একিলিস নয়। নায়ক হলো ট্রয়ের বীর হেক্টর।

সবাই রে রে করে বলল, আমরা গ্রিক, আমাদের কাছে নায়ক হলো একিলিস। একিলিসই সবার সেরা।

ইউরিপিডিস ত্যাড়া মানুষ। সে বলল, হোমার কিন্তু তার কোনো লেখায় গ্রিকবাহিনী বলেননি। এথেন্সের সেনাবাহিনীও বলেননি। গ্রিক বাহিনীকে তিনি নাম দিয়েছেন আখাইয়ান।

সবাই ইউরিপিডিসকে জেঁকে ধরল। পারলে তাকে পিটুনি দেবে।

চেরোফোন বলল, আরে আখাইয়া তো গ্রিসেরই একটি এলাকা। স্পার্টা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। হোমার যদি গ্রিকদের আখাইয়ান বলেন, তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু হোমারের বইয়ের নায়ক একিলিস। এটি তোমাকে মানতেই হবে। শোন, তুমি একাই ইলিয়াদ পড়নি, আমরাও এক-আধটু জানি। একিলিস যুদ্ধে যাত্রা করার সময় তার বাবা বলেছিলেন, 'যাও, সব সময় সবার সেরা হও, প্রতিদিন নিজেকে ছাড়িয়ে যাও, সবচেয়ে সাহসী হও, মস্তক উন্নত রেখে সবার উপরে থাকো।' একিলিসের জীবনের মন্ত্র ছিল এটি। সে সব সময় সবার সেরা হতে চেয়েছে। আজকে যত গ্রিক তরুণ আছে, সবার মন্ত্রও

এটি। আমরা সবাই একিলিস হতে চাই। আমরাও তার মতো সবার সেরা হতে চাই এজন্য একিলিসই আমাদের নায়ক।

মোটামুটি যুদ্ধ লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। ইউরিপিডিসকে নিয়ে এই আরেক বিপদ। সে প্রচলিত কথা মানে না। সবাই বলে নায়ক হলো একিলিস। আর ইউরিপিডিস বলে, না, হোমার সেভাবে লিখেননি। তিনি হেক্টরের মৃত্যুতে ইলিয়াড শেষ করেছেন। এখানে নায়ক হেক্টর।

ইউরিপিডিস লেখক। সে অনুমান করতে পারে, লেখার সময় হোমারের মনে কি কাজ করেছিল। সে ভাবছে, হোমারের কাছে হেক্টর খুবই উন্নত চরিত্রের। সে দেশ রক্ষায় যুদ্ধ করছে। সে তার স্ত্রীকেই ভালোবাসে। সে সন্তানের জন্য কাঁদে। তার মানবিক দিক খুব মহৎ। আর উল্টো দিকে একিলিস বিরাট বীর, সে বিশাল বড় যোদ্ধা। কিন্তু মানুষ হিসেবে সে হেক্টরের কাছে কিছুই না। একিলিস যুদ্ধে পাওয়া নারীকে দখল করা নিয়ে রাজা আগামেমননের সাথে ঝগড়া করে যুদ্ধ থেকে চলে যায়। শুধু বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে হেক্টরকে হত্যা করে। হেক্টরের লাশ ফেরত দিতে অস্বীকার করে। পরে হেক্টরের বাবার কাছ থেকে অনেক ঘুষ পেয়ে লাশ ফেরত দেয়। তাই একিলিস মানুষ হিসেবে খুব মহৎ না। হোমার যেভাবে লিখেছেন তাতে নায়ক হেক্টরই, একিলিস নয়।

মনের কথা এই আড্ডায় বলা যাবে না। একিলিসকে ছোট করে হেক্টরকে বড় করার কথা বললে পিটুনি খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইউরিপিডিস থেমে গেল।

সবাই ভেবেছে আড্ডা শেষ। ছেলেরা উঠি উঠি করছে।

কিন্তু সিমনের সাধ মিটেনি। তার জ্ঞান তৃষ্ণা পাহাড় সমান। সে বলল, ট্রয় যুদ্ধ শেষে বিশ্বসুন্দরী হেলেনের কী হলো? তার স্বামী কি তাকে মাফ করেছিল?

ইউরিপিডিস বলল, হেলেন হলো ছলনাময়ী সুন্দরী। এক ঝলক আগুনের মতো। আগুনের সামনে গেলে ঘি গলবেই। হেলেনের সামনে তার স্বামীও গলে গিয়েছিল। তারা স্পার্টায় ফিরে সুখে-শান্তিতে বাস করেছে। ভয়ংকর কোনো শাস্তি হেলেন পায়নি।

চেরোফোন চেঁচিয়ে উঠল, ঘটনা দেখেছো! হেলেনের রূপের আগুনে ট্রয় পুড়ে গেছে, হেক্টর মারা গেছে, একিলিস মারা গেছে। আর হেলেন স্বামীর সাথে বাকি জীবন মহাসুখে কাটিয়েছে।

ইউরিপিডিস বলল, আরও আছে। এই যুদ্ধ জয়ী আগামেমননের পরিবার নিঃশেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধ জিতে আগামেমনন ট্রয়ের রাজকন্যা কাসান্দ্রাকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরতেই তার স্ত্রী ক্লিটেমনেস্ট্রা ও স্ত্রীর প্রেমিক মিলে তাদের হত্যা করে। তার স্ত্রী বিয়ে করে নতুন প্রেমিককে। এর কিছুদিন পরে আগামেমননের ছেলে অরিস্টিস ও মেয়ে ইলেকট্রা বাবাকে হত্যার প্রতিশোধের ছক কষে। ছেলে অরিস্টিস হত্যা করে তার মা ও মায়ের প্রেমিককে। কিন্তু মাকে হত্যার পরে সে নিজে অনুশোচনায় পাগল হয়ে যায়।

সিমন বলল, বড়ই দুর্ভাগা আগামেমননের পরিবার।

ইউরিপিডিস বলল, হুঁম, যুদ্ধ শেষে আরেক বীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান অডিসিয়াসও অনেক ভুগেছে। দীর্ঘ দশ বছর সে এখান থেকে ওখানে ঘুরে তারপর বাড়ি ফিরতে পেরেছে। অডিসিয়াসের এই দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাড়ি ফেরার ঘটনা নিয়ে হোমার লিখেছেন তার মহাকাব্য 'অডিসি'।

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ইউরিপিডিস অডিসির কাহিনি শুরু করে দিল—

অডিসিয়াসের বাড়ি ছিল ইথাকা দ্বীপে। ট্রয় যুদ্ধ জিতে গ্রিকদের সবচেয়ে বড় কৌশলী ও কূটনীতিক অডিসিয়াস বাড়ি ফিরতে পারেনি। ভূমধ্যসাগরের ঝড়ে তার জাহাজ ডুবে যায়। সে ভাসতে থাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। দশ বছর কেটেছে পথে পথে। ট্রয়ের যুদ্ধের দশ বছর আর তারপরে আরও দশ বছর— মোট বিশ বছর তীব্র কষ্ট আর অনেক সংগ্রামের পর অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে অডিসিয়াস ফিরে আসে ইথাকায়। ফিরে আসে তার স্ত্রী পেনেলোপির কাছে। এই বিশ বছর তার স্ত্রী পেনেলোপিও সহ্য করেছে ভয়াবহ কষ্ট। টানা বিশ বছর সে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে। তাকে বিয়ে করার জন্য অনেক পুরুষ নানা ফন্দি করেছে, চাপ দিয়েছে। কিন্তু পেনেলোপি রাজি হয়নি। স্বামীর প্রতি অবিচল বিশ্বাস নিয়ে সে অপেক্ষা করেছে। বুদ্ধি করে বড় করেছে নিজের ছেলেকে। ছেলে টেলেমেকাসকে নিয়ে কৌশল করে তার প্রানিপ্রার্থীদের দূরে রেখেছে। পেনেলোপি একজন সত্যিকার স্বামী অন্তঃপ্রাণ নারী। আর অডিসিয়াস একই সাথে অসীম সাহসী আর পরম বুদ্ধিমান মানুষ। অনেক প্রলোভন, অনেক বিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল অডিসিয়াস। তার মনে একটি ভাবনাই ছিল— আমাকে ইথাকায় ফিরতেই হবে। ফিরতেই হবে স্ত্রী পেনেলোপির কাছে। অডিসিয়াস হলো অসীম সাহসের প্রতীক। মানুষের হার না মানা মানসিকতার প্রতীক। অডিসিয়াসের ফিরে আসার মধ্য দিয়ে হোমার শেষ করেন তার মহাকাব্য অডিসি।

ইউরিপিডিস বলল, হোমারের অডিসি বইটি ইলিয়াদের চেয়ে অনেক সহজ। কাহিনিতে তেমন প্যাঁচ নেই। সরাসরি একের পর এক ঘটনা ঘটে গেছে। তবে কবি হোমার এই বইতে কৌশলে একটি প্রেমের গল্প বলেছেন। অডিসিয়াস আর পেনেলোপি দুজনই খুব চমৎকার প্রেমিক-প্রেমিকা 1 পেনেলোপির প্রেমের তো কোনো তুলনাই হয় না। হোমার চমৎকার অলংকরণে অডিসিয়াসের সাহসের গল্পের আড়ালে একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প বলেছেন কবিতার ছন্দে। হোমার অডিসিয়াসের মুখে সুন্দর একটি প্রেমের সংলাপ দিয়েছেন—

'যখন দুটি নর-নারী একে অন্যের চোখে চোখ রেখে ঘর করে, দুজন একজন হয়ে শত্রুকে দূরে আর বন্ধুকে কাছে রাখে— তার চেয়ে ভালো কিছু পৃথিবীতে আর হয় না।'

এটুকু বলেই ইউরিপিডিস থামল। ক্রিতো তাকে থামাল। আজ আর বলা যাবে না। আড্ডা শেষ করতেই হবে। রাত এত গভীর হয়ে গেছে যে এখন বাড়ি ফিরতে না পারলে সবার বাড়ি থেকে লোক চলে আসবে তাদেরকে খুঁজতে। সবাই উঠে পড়ল।

উঠতে উঠতে সিমন বলল, আজকের আড্ডায় আমার অনেক লাভ হলো। হোমারের বই দুটো আর তার আগে-পরের কাহিনি থেকে আমার অনেক সুবিধা হলো। আমি অনেক দিন বিদেশে থেকে এথেন্সে ফিরেছি। এথেন্সে এখন যেসব নাটক হচ্ছে সেগুলোর কাহিনি সবই ট্রয় যুদ্ধ বা আগামেমননের পরিবার এরকম আর দু একটি কাহিনি নিয়েই হয়। আমি ভালো করে বুঝতাম না। এখন এথেন্সের নাটক বুঝতে পারব।

হোমারের ইলিয়াদ আর অডিসি বই দুটো সবাই ভালোবাসে। সক্রেটিসও ভীষণ ভালোবাসে। তবে একটি জায়গায় তার খটকা আছে। সেটি হলো— এই দুটো বইয়ে দেবতাদের বিশাল ভূমিকা। দেবতারাই সব করেছে। তারা চেয়েছে বলেই হেলেন আর প্যারিস প্রেমে পড়েছে, পালিয়ে গেছে, আবার দেবতারা এই যুদ্ধে কেউ গ্রিসের, কেউ ট্রয়ের পক্ষে ছিল। এই যে দেবতাদের ভূমিকা, সেটি নিয়ে সক্রেটিসের মনে খটকা আছে।

ইউরিপিডিসের মনেও খটকা আছে। সেও দেব-দেবী মানে না।

আড্ডার ছেলেপেলে সবাই চলে যাচ্ছে। সক্রেটিস, ক্রিতো আর সিমন একসাথে বাড়ির দিকে চলেছে।

সিমন বলল, আচ্ছা, এই যে দেব-দেবীরা সবকিছু করেছে, মানুষ কিছু করছে না। এটি তোমাদের বিশ্বাস হয়?

সক্রেটিস বলল, এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। দেব-দেবী নেই, আমি অত সহজে এটি বলতে পারব না। সেটি বলতে পারবেন আমার গুরু।

'তোমার গুরু? কে সে মহামানব?'

'তার নাম এনাক্সাগোরাস[৩১]। তিনি থাকেন পেরিক্লিসের বাড়িতে। আমি এখন গুরুর বাড়ি যাব।'

'মানে?'

'মানে হলো তোমরা আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছ। উত্তর খুঁজতে আমি এক্ষুনি গুরুর কাছে যাব।'

'এই গভীর রাতে? এখন রাতের ষষ্ঠ প্রহর। '

'হুঁম, মাঝে মাঝে গভীর রাতে আমাকে নিশিতে ডাকে। তখন কিছুই ভালো লাগে না। তখন তার বাড়ি যাই। এখন যেমন নিশিতে ডাকছে। আমি চললাম গুরুর বাড়ি।'

সক্রেটিস সত্যি সত্যি গুরুর বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। খালি পা। প্রায় উলঙ্গ। বাঁকা বাঁকা পায়ে অন্ধকার পথে ছুটছে।

সিমন তার চলার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভাবছে এটি কোন্ নিশির ডাক, যার জন্য এই যুবক গভীর রাতে পাগলের মতো তার গুরুর বাড়ির দিকে ছুটছে?

***

২৯. মাইসিন (Mycenae): ব্রোঞ্জ যুগে এই শহরকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত মাইসেনিয়ান সভ্যতা (Mycenaean civilization) গড়ে উঠেছিল। ট্রয়ের যুদ্ধ মাইসেনিয়ান সভ্যতার সময়ে ঘটেছিল। এখানে রাজা আগামেমননের সময়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৩০. ট্রয় যুদ্ধ নিয়ে হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াদ (The Iliad)। এই বইয়ে যেখানেই ইলিয়াদ মহাকাব্যের অনুবাদ দরকার হয়েছে, আমি Stanley Lombardo এর ইংরেজি (The Essential Iliad) থেকে বাংলা করেছি।

৩১. এনাক্সাগোরাস (Anaxagoras): সক্রেটিস পূর্ব গ্রিক দার্শনিক। সক্রেটিসের শিক্ষক। তিনিই বৈজ্ঞানিক ধারণা আয়োনিয়া অঞ্চল (বর্তমানে তুরস্কের মধ্যে, সেই সময় গ্রিক) থেকে এথেন্সে নিয়ে আসেন।

৮

‘সিংহ বেঁচে থাকে তার থাবার জোরে,
ষাঁড় বেঁচে থাকে তার শিংয়ের জোরে,
তেমনই মানুষ বেঁচে থাকে মানুষের মস্তিষ্কের শক্তিতে।’
—এনাক্সাগোরাস

নিশির ডাকে সক্রেটিস ছুটছে।

গন্তব্য পেরিক্লিসের বাড়ি। সেখানে তার গুরু থাকেন।

সক্রেটিস দেব-দেবী নিয়ে সমস্যায় পড়েছে। আজ সন্ধ্যার আড্ডায় চেরোফোন মনের গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলল— দেবী এথিনা নিজে এথেন্সকে জ্ঞানের নগর বানিয়ে দিয়েছে। এসব গল্প মিথোলজির মতো। শুনতে মজার। এখানের সবাই এই মজার গল্পগুলো বিশ্বাস করে।

কিন্তু সক্রেটিসের এসব গল্প বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। তবে এমন নয় যে, সে দেবতাদের মানে না। সে দেবতাদের ভক্তি করে। পায়ে ব্যথা পেলে, আপনা-আপনিই বলে ওঠে, দেবী এথিনা, ভালো করে দাও। কিন্তু দেব-দেবী নিয়ে এথেন্সের মানুষ যেসব আজগুবি কথা বলে, সেগুলো নিয়ে তার খটকা লাগে, মনে প্রশ্ন জাগে।

মনে প্রশ্ন জাগলেই সে গুরু এনাক্সাগোরাসের কাছে যায়। এনাক্সাগোরাস তার একার গুরু নন। পেরিক্লিসেরও গুরু। পেরিক্লিস গুরু বলেন বলেই এথেন্সের অনেকেই তাকে গুরু বলে। সক্রেটিসও বলে। গুরুকে এথেন্সে আশ্রয় দিয়েছেন পেরিক্লিস।

গুরু এনাক্সাগোরাসের সাথে পেরিক্লিসের সাক্ষাতের ঘটনা খুবই নাটকীয়। ঘটনাটি এরকম—

পেরিক্লিস তখন মাত্র নেতা হচ্ছেন। তরুণ নেতা। একদিন দেখেন, আগোরার রাস্তায় এক মধ্যবয়সী মানুষ চিৎকার করছেন। তার চারপাশে ভিড়। লোকটি আকাশে আঙুল দেখিয়ে বলছেন, ‘ঐ যে দেখো সূর্য; তোমরা তো বলো সূর্য নাকি দেবতা, এপোলো তাকে ঘোড়া দিয়ে টানছে। এসব ভুয়া কথা। আসলে সূর্য হলো বাদামি রঙের এক খণ্ড ধাতু।’ ভিড়ের মানুষ চিৎকার করে উঠল, ‘আরে, পাগলে বলে কী! দেবতা মানে না! উল্টা-পাল্টা

কথা বলে। উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ!' লোকটি আবার বললেন, 'বিশ্বাস করলে না? দেখো, একদিন না একদিন ঐ সূর্য থেকে একটি বাদামি খণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়বেই।' লোকজন হই হই করে উঠল, 'এত বড় সাহস, দেবতাদের নিয়ে মশকরা? ব্যাটা শয়তান! ওকে আটক কর। সিপাহিদের কাছে দাও।' সে সময় তাকে রক্ষা করল তরুণ পেরিক্লিস। বলল, 'পাগল মানুষ, কী না কি বলছে। ছেড়ে দিন ভাই।' পেরিক্লিস লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করল। লোকটি এজিয়ান সাগরের ওপাড় থেকে এসেছে। এথেন্সে আশ্রয় চায়। ভিড়ের মানুষ টিপ্পনি কেটে বলল, 'পেরিক্লিস, তুমি তো পাগলটার পক্ষ নিলা। এইবার ঠ্যালা সামলাও, ওরে আশ্রয় দাও। ঐ পাগলা, যা, ওর সাথে যা। ওর টাকা আছে, তোর খাওন-পরনের চিন্তা হবে না।' পাগল বললেন, 'টাকা? টাকা দিয়ে কী হবে? আমার কপাল খুবই ভালো, কারণ আমার সব টাকা-পয়সা ফুঁস করে শেষ হয়ে গেছে, তা না হলে ওরা আমাকেই শেষ করে দিত।' পেরিক্লিস পাগলকে বাড়িতে আশ্রয় দিল। কিন্তু পাগল ভালো হলেন না। তিনি সুযোগ পেলেই বলেন, সূর্য থেকে একটা কিছু পৃথিবীতে পড়বেই, তার রং হবে বাদামি। এর কিছুদিন পরেই এথেন্সের প্রায় দেড়শ মাইল পশ্চিমে আকাশ থেকে জ্বলজ্বলে কী যেন একটি মাটিতে পড়ল। যারা পড়তে দেখেছে, তারা বলল, এটি সূর্য থেকে পড়েছে[৩২]। দেখা গেল, সেটি একটি বড় বাদামি রঙের পাথর। সবাই বলল, এটির কথাই পাগল এনাক্সাগোরাস এতদিন বলছেন। পাগল রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। কিছুদিনেই বোঝা গেল, এই পাগল আসলে জ্ঞানের পাগল। সব বিষয়ে এমন জ্ঞান, এমন বুদ্ধি অন্য কারও নেই। তিনি পেরিক্লিসের খুবই আপনজন হয়ে গেলেন। পেরিক্লিস তাকে ডাকেন মুশকিল আসান গুরু। সে মুশকিলে পড়লে গুরুই আসান করেন।

তারপর অনেক বছর গুরুর তেমন কোনো আওয়াজ নেই। সবাই ভাবল পাগল চুপ করে গেছেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে বোঝা গেল পাগল চুপ করেননি। বরং আরও বড় পাগল হয়েছেন। এতদিন তিনি বই লিখেছেন। তার নতুন বই বের হলো। সেই বইতেও তিনি লিখলেন— সূর্য আর চাঁদ আসলে দুটি গোল গোল ধাতু ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এগুলোকে যারা দেবতা বলে তারা আহাম্মক। অনেক হিসাব-নিকাশ করে প্রমাণপত্র দিয়ে তিনি বইতে এসব লিখেছেন।

সেই সময় এই বই নিয়ে শুরু হলো বিশাল ঝগড়া। মানুষ ক্ষেপে তাকে গালাগালি দিতে শুরু করল। কিন্তু পেরিক্লিস তার পক্ষে। পেরিক্লিস জ্ঞানের জন্য সবকিছু করতে রাজি। পেরিক্লিস পক্ষে থাকায় এখন পর্যন্ত গুরুকে কেউ কিছুই বলতে পারেনি।

তরুণ সক্রেটিস গুরুর নতুন বইটা পড়ল। পড়েই তার মনে হলো— এই বইয়ের লেখক সময়ের সবচেয়ে আধুনিক মানুষ, সবচেয়ে স্মার্ট। সক্রেটিস দৌড়ে গেল তার সাথে দেখা করতে। কিন্তু গুরু সক্রেটিসকে পাত্তা দিলেন না। তিনি ভাবলেন, 'পিচ্চি একটি ছেলে, দেখতেও বদখৎ। এর সাথে সময় নষ্ট করে লাভ কী?' তখন সক্রেটিস বলল, 'গুরু, আপনার আর আমার মধ্যে একটি মিল আছে। লোকে যেমন সকাল-বিকাল

আপনাকে গালাগালি দেয়, তেমনই ছুতানাতায় আমাকেও গালি দেয়। আমি নাকি বাচ্চাকাচ্চাদের নষ্ট করে ফেলছি।'

গুরু ভাবলেন, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে ছেলেটার মধ্যে কিছু না কিছু আছে, যেটি অন্যদের থেকে আলাদা। গুরু আলাদা ধরনের মানুষ পছন্দ করেন। তিনি সক্রেটিসের সাথে কথা শুরু করলেন। একটু আলাপেই বুঝলেই সক্রেটিস আসলে একজন উঁচু স্তরের প্রশ্ন-রোগী। সে বিনা প্রশ্নে কিছুই মেনে নেয় না। এরকম মানুষই গুরুর দরকার। তিনি সক্রেটিসকে খুবই পছন্দ করলেন।

গুরু আর একটি জিনিস লক্ষ করলেন। এই ছেলেটির অসাধারণ স্মরণশক্তি। যা একবার শোনে, সাথে সাথে মনে গেঁথে ফেলে। কিচ্ছু ভোলে না। হুবহু বলতে পারে। সে এক অক্ষরও লেখে না। কোনো নোট নেয় না। সব তার মাথার মধ্যে থাকে, দরকার হলেই মুখ দিয়ে পটপট করে বের হয়। এই মেধা দেখে গুরু সক্রেটিসকে তার লাইব্রেরির চাবি দিয়ে দিলেন। সক্রেটিস যখন ইচ্ছা এসে লাইব্রেরিতে বসে পড়ে।

এমন সুযোগ পেয়ে আহ্লাদে সক্রেটিসের বাকবাকুম অবস্থা। সে দিনরাত পড়াশুনা করে লাইব্রেরির সব বই শেষ করে ফেলল। এখানে বই মানে বিশাল পেপিরাস কাগজের টুকরা, এক একটি লম্বায় দুই হাতের বেশি। লম্বা টুকরাগুলো রোল করে রাখতে হয় অথবা দেয়ালে টানিয়ে দিতে হয়। গুরুর লাইব্রেরিতে সব বই দেয়ালে টানানো। তার লাইব্রেরিটি একটি দেখার মতো জিনিস। একটি বিশাল ঘরে বড় বড় বোর্ড লাইন ধরে দাঁড় করানো। বোর্ডগুলোর দুপাশে ঝুলছে লম্বা লম্বা পেপিরাসের টুকরা। এগুলোই হলো বই। এরকম কয়েকশ বই ঝুলছে গুরুর লাইব্রেরিতে।

সক্রেটিস যখন সময় পায়, তখনই এই লাইব্রেরিতে বই পড়তে আসে। সে যখন পড়ে, একেবারে পাগলের মতো পড়ে। এই লাইব্রেরির সব বই তার আগাগোড়া মুখস্ত। কোনোকিছু নিয়ে সন্দেহ হলেই সে এই লাইব্রেরিতে আসে। বইয়ের ভেতর খুঁজতে থাকে। খুঁজে না পেলে গুরুর সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় বসে। সভা সব সময় রাতে হয়। সে সারাদিন আড্ডা দেয়। আর রাতে বই পড়ে। গভীর রাতে সক্রেটিসকে আসতে দেখে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে— নিশিতে ডাক দিয়েছে গো। তাই যাচ্ছি।

তো আজ রাতে সক্রেটিস নিশির ডাকে গুরুর কাছে এসে বললেন, গুরু, এক কথায় বলুন, দেব-দেবী সত্য না মিথ্যা?

গুরু হাসলেন। তার মনে পড়ল, কয়েক বছর আগে সক্রেটিস যখন আরও ছোট ছিল, তখন প্রতিদিন এই একই প্রশ্ন তুলে ঘ্যান ঘ্যান করত।

গুরু বললেন, আবার মাথায় সেই পোকা ঢুকছে। তো যা, ঐ যে তিন নম্বর সারিতে মিলেটাস দ্বীপের তিন জ্ঞানীর বই আছে। ওগুলো আগে পড়েছিস। তবু আর একবার পড়। তারপর তোর মাথার পোকা বের করার ব্যবস্থা হবে।

সক্রেটিস গেলেন মিলেটাস শহরের তিন জ্ঞানীর বইয়ের কাছে। এই তিন জ্ঞানী হলেন থেলিস, এনাক্সিম্যানডার এবং এনাক্সিমিনেস[৩৩]। তারা এজিয়ান সাগরের ওপাড়ে মিলেটাস শহরে জন্মেছিলেন। তারাই প্রথম বলেন যে পৃথিবীর সব ঘটনা দেবতাদের খেয়ালে হয়, একথা ঠিক না। প্রকৃতি চলে একটি ধরাবাঁধা নিয়মে। তারা বললেন, প্রকৃতির সবকিছুরই একটা কারণ থাকে।

সক্রেটিস প্রথম যে পেপিরাস টুকরায় চোখ বুলাচ্ছেন, সেটি লিখেছেন থেলিস। মিলেটাসের তিন জ্ঞানীর মধ্যে পুরনো হলেন থেলিস। তিনিই প্রথম আকাশ, বাতাস, জোয়ার-ভাটা এসব দেখে লিখতে শুরু করেন। আকাশের একটি ঘটনার সাথে আরেকটি মিলিয়ে যুক্তি দাঁড় করালেন। বললেন, সূর্যগ্রহণ হয় এই কারণে; জোয়ার-ভাটা হয় এভাবে। থেলিস-এর এই লেখা থেকেই জ্ঞানের নতুন একটি শাখার জন্ম হলো, যেটির নাম বিজ্ঞান।

গ্রিকরা অবশ্য বিজ্ঞান শব্দটা বলত না, তাদের কাছে যেকোনো জ্ঞান মানে দর্শন বা ফিলোসফি। আর যেকোনো কিছু নিয়ে যারা গবেষণা করে তারাই জ্ঞান-প্রেমিক বা ফিলোসফার। তো প্রকৃতির নিয়ম বের করতে চাওয়া এই জ্ঞানীদের নাম তারা দিলেন প্রাকৃতিক দার্শনিক বা ন্যাচারাল ফিলোসফার। থেলিস হলেন প্রথম প্রাকৃতিক দার্শনিক।

সক্রেটিস থেলিসের ন্যাচারাল ফিলোসফি নিয়ে লেখা পেপিরাসে চোখ বুলাচ্ছে। থেলিস জমিজমার মাপজোক নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন।

মাপ-জোক থেলিস শিখেছিলেন মিশরে গিয়ে। তিনি মিশরে গিয়েছিলেন জ্ঞান লাভ করতে। কিন্তু গিয়ে দেখেন, নীল নদে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। বন্যায় থেলিসের যতটুকু সমস্যা হলো, তার চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা হলো মিশরের রাজা ফারাও সাহেবের। রাজা মিশরের প্রজাদের মধ্যে জমি ভাগাভাগি করে যে দাগ দিয়েছিলেন, বন্যায় সেগুলো সব ধুয়ে গেছে। নতুন করে জমি ভাগ- বাটোয়ারা করে দাগাদাগি করতে হলো। থেলিস নিজের চক্ষে সেই মাপজোক দেখলেন। তিনি শিখে গেলেন কীভাবে জমি মাপতে হয়। বিষয়টি তার ভালো লাগল। তিনি মাপ-জোকের আঁকাআঁকি দিয়ে পেপিরাস কাগজ ভরিয়ে তুললেন।

পাশের পেপিরাসে থেলিস অনেকগুলো ত্রিভুজ এঁকেছেন। তার নিচে কিছু কথা, ত্রিভুজ নিয়ে নানান সূত্র লেখা। থেলিসের ত্রিভুজ জ্ঞানও মিশরেই পাওয়া। মিশরে যে যায়, সেই পিরামিড দেখে হা করে তাকিয়ে থাকে। থেলিস শুধু হা করে তাকিয়েই থাকেননি, তিনি ঠিক করলেন পিরামিড কত উঁচু তা মাপতে হবে। অনেক চিন্তা করে ঠিকই একটি উপায় বের করে ফেললেন। দিনের যে সময়ে মানুষের ছায়া তার উচ্চতার সমান হয়, সেই সময়ে পিরামিডের ছায়া মেপে তিনি পিরামিডের উচ্চতা বের করে ফেললেন। পিরামিডের উচ্চতা মেপে তার আনন্দ হলো, কিন্তু মন ভরলো না। তিনি পিরামিডের ত্রিভুজের গুমর বের করতে চাইলেন। পেপিরাসে ত্রিভুজ আঁকলেন। দিনের পর দিন তিন

কোনা নিয়ে মাপজোখ করলেন। বের করলেন ত্রিভুজের নানান সূত্র। গ্রিকরা থেলিসকে পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী মনে করে।

এর পরের পেপিরাসে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সক্রেটিস। এটিতেই থেলিস তার সবচেয়ে সাহসী কাজটি করেছেন। তিনি লিখেছেন, পৃথিবীতে সকল প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। মারাত্মক কথা। তার মানে দেবতারা প্রাণী সৃষ্টি করেননি। সারা পৃথিবীর মানুষ জানে দেবতারা পুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর পেন্ডোরার কারণে নারীদের সৃষ্টি। থেলিস সে কথা বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন সবকিছু এসেছে পানি থেকে।

সক্রেটিস মুগ্ধ হয়ে দেখছেন পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানীর লেখা। তার ভালো লাগছে এই ভেবে যে 'দেবতারাই সব করে' এই কথাকে যিনি প্রথম ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে সাহস করেছেন, সেই থেলিসের লেখায় হাত বুলাতে পারছেন। একটানা লেখা। কোনো দাঁড়ি-কমা নেই, দুটি শব্দের মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। টানা লিখে গেছেন থেলিস। এখানকার সবাই এভাবেই লিখে।

এরপর সক্রেটিস এনাক্সিমিনডারের লেখা দেখলেন। তিনি থেলিসের ছাত্র ছিলেন। তিনিও থেলিসের মতো লিখেছেন দেবতারা প্রাণীদের সৃষ্টি করেননি। কিন্তু পরের লাইনে লিখেছেন, 'থেলিসের ধারণা সবকিছু পানি থেকে এসেছে, এটি ভুল, আসলে প্রাণীরা এসেছে একটি 'অসীম' ধরনের কিছু একটি থেকে যেটি দেখা যায় না'। পরের পেপিরাসে তিনি একটি মানচিত্র এঁকেছেন। এটি নাকি পৃথিবীর মানচিত্র। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে চারদিকে মহাসাগরের পানি। তার মাঝে তিন টুকরা স্থল : ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা। আর দুটি সাগর— ভূ-মধ্যসাগর আর কৃষ্ণ সাগর। এটিই ইউরোপের কোনো মানুষের আঁকা পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র।[৩৪]

সক্রেটিস পাশের পেপিরাসে গেল। সেটিতে মিলেটাস নগরীর তৃতীয় জ্ঞানী এনাক্সিমিনেসের লেখা। তিনি বৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, বৃষ্টির সময় পানি আর বাতাস কীভাবে যেন একটি থেকে আরেকটি হয়ে যায়। তিনি বাতাসকে খুব গুরুত্ব দিলেন। লিখলেন— 'থেলিস ঠিকই বলেছিলেন, দেবতারা প্রাণীর জন্ম দেয়নি। কিন্তু তিনি ভুল বলেছিলেন, পানি থেকে প্রাণ আসেনি, পৃথিবীতে প্রাণ এসেছে বাতাস থেকে। '

মিলেটাস দ্বীপের তিন জ্ঞানীর লেখা শেষ করলেন সক্রেটিস। তারা দেবতাদের বাতিল করে দিয়েছেন, এই যুক্তিগুলো তার ভালো লাগছে। আরও পড়তে ইচ্ছে করছে। আরেকটি পেপিরাসে তাকালেন সক্রেটিস। এটি লিখেছেন হেরাক্লিটাস নামক এক জ্ঞানপ্রেমী।

হেরাক্লিটাস খুব সুন্দর একটি কথা লিখেছেন, 'পৃথিবীতে সবকিছু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, এক মুহূর্ত পরেই কোনোকিছু আর আগের মতো থাকে না, তুমি একই নদী জীবনে কখনই দুইবার পার হতে পারবে না।'

বাহ, কী চমৎকার কথা! জীবনে কখনই একই নদীকে দুইবার পার হতে পারবে না। নদী প্রতি মুহূর্তে বয়ে চলে, নদী প্রতি মুহূর্তে বদলে যায়। তাই এক নদীকে দুইবার পার হওয়া সম্ভব নয়। জীবনে যে মুহূর্তটি চলে যাচ্ছে, তা আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। হেরাক্লিটাস আবার লিখেছেন, বিশ্বের সবকিছুর একটি সাধারণ নিয়ম আছে। এই নিয়মের নাম হলো লোগোস (logos)। লোগোস থেকে লজিক (logic), মানে যুক্তি বা কারণ। দুনিয়ায় সবকিছুর একটি কারণ থাকে, পেছনে একটি যুক্তি থাকে। যুক্তি দিয়েই পৃথিবী চলে, দেবতাদের খেয়ালে চলে না।

উল্টো দিকের পেপিরাসটি পিথাগোরাসের। তিনি লিখেছেন, প্রকৃতির সবকিছু খুব সুন্দর নিয়মে বাঁধা। সংগীতে যেমন সুর আছে, গণিতে যেমন সংখ্যার একটি ধারা আছে; তেমনই এই মহাবিশ্বও একটি সুন্দর নিয়মে চলে, একটি ধারায় চলে। তিনি মহাবিশ্বের নাম দিয়েছেন 'কসমস'। এর মানে হলো সুশৃঙ্খল।

এঁদের লেখা পড়ে সক্রেটিসের মনের দোনোমনো ভাব দূর হয়ে গেল। সে ভাবলো এঁদের লেখাই সঠিক। দেবতারা অলিম্পাস পাহাড়ে বসে নিজেদের কাজ করে। কিন্তু পৃথিবী চলে পৃথিবীর নিয়মে। সে ঠিক করল, লোকে যা বলে বলুক। সে নিজে বুঝে গেছে, সত্যিটা কী।

বইগুলো পড়া শেষ করে গুরুর ঘরে ঢুকল সক্রেটিস। গুরু জেগেই আছেন।

সক্রেটিস বলল, গুরু, আমার মনের সন্দেহ মিটে গেছে। আর কোনো দোনোমনো ভাব নেই। দেবতাদের নিয়ে আর ঝামেলা নেই।

গুরু বললেন, তুমি অনেক দিন ধরেই এদের লেখা পড়ছো। আজ তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি এদের কথা বুঝতে পেরেছ। আগে পুরোপুরি বোঝনি। আজ বুঝেছ। তারা বলেছেন, পৃথিবী চলে যুক্তি দিয়ে। দেবতাদের ইশারা না, যুক্তিই হলো পৃথিবীর নিয়ম। দেবতারা অলিম্পাস পাহাড়ে বসে কিছুই ঘটায় না, প্রতিটি বিষয় ঘটার পেছনে একটি কারণ আছে। এই নতুন ধারণাটা তারা বের করেছেন। তাদের আগে হয়তো অনেকে বলেছে। কিন্তু সাহস করে বই লিখে মানুষকে জানিয়ে পৃথিবীতে এরাই প্রথম যুক্তির ধারণাটা সামনে এনেছেন। এই যুক্তির ধারণা বের করেছেন গ্রিসের দার্শনিকরা, সেজন্য এটিকে আমরা বলি 'গ্রিক থট' বা গ্রিসের ধারণা।

সক্রেটিস মুগ্ধ হয়ে শুনছে। এমন কথা শোনার জন্যই তো তাকে গভীর রাতে নিশিতে ডাকে। নিশির ডাক জিনিসটা তাহলে মন্দ নয়।

গুরু আবার বললেন, মজার কথা হলো এই গ্রিক থট আবিষ্কার করা হয়েছে এজিয়ান সাগরের ওপাড়ে মিলেটাস শহরে। আশেপাশের কয়েকটা দ্বীপের মানুষও এটি নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু 'গ্রিক থট' এর আসল চর্চা হচ্ছে এথেন্সে। এথেন্সের গণতন্ত্র মানুষকে কথা বলার অধিকার দিয়েছে। অন্য কোথাও দেবতার বিরুদ্ধে কথা বললে, সাথে সাথে মেরে ফেলবে। কিন্তু এথেন্সে আছে আইনের শাসন, আছে গণতন্ত্র। এখানে ইচ্ছে করলেই

কাউকে মেরে ফেলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো এথেন্সে আছেন পেরিক্লিস। তার মতো নেতা আছেন বলেই— এখানে বিনা বাধায় কথা বলা যায়। তোমরা তো কথায় কথায় বলো— এথেন্স হচ্ছে জ্ঞানের নগরী। এই জ্ঞান কী জিনিস? এই জ্ঞান হলো যুক্তি, পণ্ডিতেরা বলেন গ্রিক থট। আর জ্ঞানী কারা? যারা অন্ধ বিশ্বাস বাদ দিয়ে সবকিছুতে যুক্তি খোঁজে, গ্রিক থটের চর্চা করে। এথেন্সে 'গ্রিক থট'-এর চর্চা করা যায় বলেই সারা পৃথিবীর জ্ঞানী মানুষ এখানে ছুটে আসে। আর এই কারণেই এথেন্স হলো জ্ঞানের নগরী।

সক্রেটিস বলল, এই কারণেই আপনিও সেই এজিয়ান সাগরের মধ্যখানের এক দ্বীপ থেকে এথেন্সে ছুটে এসেছেন।

গুরু মাথা নাড়লেন। যার মানে— পাগলা তুই ঠিক ধরেছিস।

সক্রেটিসের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আজ সন্ধ্যায় চেরোফোন যখন বলছিল, দেবী এথিনা এসে এথেন্সে জ্ঞান দিয়ে গেছে তখন থেকেই সমস্যাটা সক্রেটিসের মাথায় ঢুকেছিল। গুরুর কাছে এসে আসল কারণ জানতে পারল। গুরু সত্যিই মুশকিল আসান গুরু।

সক্রেটিসের মন পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে গুরুর বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

রাত প্রায় শেষ। ভোর হয় হয়। এই সময়কে ঊষালগ্ন বলা হয়। ঊষালগ্নেও তিনি বাড়ি ফিরে গেল না। নিশির ডাক শেষ হয়েছে। এখন নতুন ডাক এসেছে। এটিকে বলা যায় ঊষার ডাক।

ঊষার ডাকে সে হাঁটতে লাগল পাহাড়ের ঢালে। পাহাড়ের একটি দিক নিচু হয়ে মিশে গেছে সাগরে। অন্য পাশে কুল কুল করে বইছে একটি ঝরনা। মনে. হয় এখন পাহাড় আর সাগর একান্তে মনের কথা বলবে। এমন জায়গা সবারই ভাবুক হতে ইচ্ছা করে। সক্রেটিস ভাবুক হয়ে গেল। ঊষার ডাকে আবার ভাবতে শুরু করল।

গুরুর বাড়িতে মনে হয়েছিল তার সব হিসাব মিলে গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, একটুখানি মিলেনি। সে নিজে কী যেন ভাবছে, সেটি গ্রিক থট-এর ভেতরে নেই। প্রকৃতির দার্শনিকরা বলছেন, প্রকৃতির সবকিছু নিয়মে চলে, প্রকৃতির সবকিছু যুক্তি দিয়ে হয়। কিন্তু তারা শুধু প্রকৃতির কথা বলেছেন। অন্য একটি বিষয়ের কথা তাদের মাথায়ই নেই। সেটি হলো মানুষ

প্রকৃতির দার্শনিকদের মতে সবকিছু হলো বস্তু, তাহলে মানুষও একটি বস্তু। সব বস্তু যদি যুক্তি দিয়ে চলে, তাহলে মানুষও যুক্তি দিয়েই চলবে। একটি বস্তু তাপে গরম হয়, বর্ষায় পানিতে ভেজে, শীতকালে ঠাণ্ডায় জমে যায়। সক্রেটিস ভাবছেন, মানুষ তো ঠিক এই নিয়মে চলে না। মানুষের ভেতরে অন্য কিছু আছে, যা এসব নিয়ম মানে না। তাই মানুষের জীবনকে কাঠখোট্টা নিয়মে ফেলা যায় না। মানুষ আলাদা জিনিস।

ততক্ষণে সূর্য উঠি উঠি করছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে সক্রেটিস ভাবছে তাহলে মানুষকে কে চালায়?

সক্রেটিস আবার দৌড়ে গুরুর কাছে এলো।

গুরু মাত্র শুয়েছেন। সারা রাত সক্রেটিস তাকে জ্বালিয়েছে। সে যাওয়ার পর মাত্র দুচোখ এক করেছেন। তখনই আবার ডাকাডাকি শুরু করেছে। সক্রেটিসের মাথায় প্রশ্নের পোকা ঢুকলে সে কিছুই মানে না। চোখ ডলতে ডলতে ঘরের বাইরে এসে গুরু ঝিমুতে শুরু করলেন। ঝিমুনি-টিমুনি সক্রেটিস বোঝে না। সে বলল, গুরু, আমার মুশকিল তো আসান হয়নি। প্রকৃতির দার্শনিকরা বলেন, সবকিছু যুক্তি দিয়ে চলে। কিন্তু মানুষের জীবন যুক্তি দিয়ে চলে না। তাহলে মানুষকে কে চালায়?

গুরু ঝিমুতে ঝিমুতে বললেন, প্রতিটি জিনিসের ভেতরে একটা কিছু আছে, যা তাকে নিয়ম মেনে চলতে শেখায়

'মানুষের ভেতর সে রকম কী আছে?'

'মানুষের আছে 'মন'। আত্মাও বলতে পারিস।'

সক্রেটিস লাফ দিয়ে বলল, 'ইউরেকা'। এটি তার ইউরেকা মুহূর্ত। সে গুরুকে একটি চুমো দিয়ে তার বাড়ি থেকে এক দৌড়ে আবার সেই পাহাড়ের উপর গিয়ে বসল।

এই সকালে সক্রেটিস পুরোপুরি নতুন একটি জিনিস নিয়ে ভাবলো। সেটি হলো 'মানুষ'। সক্রেটিসের আগে মানুষকে নিয়ে এমন করে আর কেউ ভাবেন নি।

এতদিন দর্শন ছিল আকাশের জিনিস, উপরের জিনিস। এতদিন দুই রকম জ্ঞানী মানুষ ছিল। একদল বলত, ঐ উপরে অলিম্পাস পাহাড়ে রসে দেবতারা সবকিছু করছে। দেবতাদের কীভাবে খুশি রাখতে হবে, সেটি নিয়েই তারা সারা দিন কথা বলত। তাদের কাছে মাথার উপরের দেবতারাই সবকিছু, মানুষ কিছুই নয়। আর একদল জ্ঞানী সব সময় প্রকৃতি নিয়ে কথা বলছে। তারা বলেন, আকাশে চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-তারা, জোয়ার-ভাটা এসব কীভাবে চলে, সেই নিয়ম বের করাই একমাত্র জরুরি বিষয়। তাদের কাছেও প্রকৃতিই সবকিছু। মানুষ কিছুই নয়।

সক্রেটিস ভাবল, না, এসবের বাইরেও আরও একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে, সেটি হলো মানুষ। মানুষের জীবনকে সুন্দর করাই মানুষের এক নম্বর কাজ। মানুষ যদি সঠিক পথে না আসে, তাহলে সব জ্ঞান বৃথা। আকাশ, বাতাস, সাগর নিয়ে গবেষণা করে কোনো লাভ নেই, যদি সেটি মানুষ না বোঝে। আজ থেকে আমার বিষয় হলো 'মানুষ'। আমি মানুষ নিয়ে কাজ করব। কিন্তু এথেন্সে এখন মানুষের সংখ্যা কত? প্রায় তিন লাখ। তো আমার গবেষণার বিষয় এই তিন লাখ মানুষ। কিন্তু তিন লাখ মানুষ নিয়ে আমি একা কাজ করব? মানুষ তিন লাখ কিন্তু তাদের বিবেক একটি। আমি মানুষের বিবেক নিয়ে কাজ করব। আমি মানুষের বিবেক ছুঁয়ে চলব।

সবার আগে মানুষের জন্য নিয়ম বানাতে হবে। সেজন্য জরুরি হলো মানুষের মন। একটি সুন্দর মন তৈরি করতে হবে। মন সুন্দর হলেই জীবন সুন্দর হবে। তাহলে আজ থেকে আমি সুন্দর মন তৈরির উপায় খুঁজব।

সক্রেটিসের এই এক ভাবনায় দর্শন আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এলো। জ্ঞান বাইরের জিনিস থেকে মানুষের মনের ভেতরের জিনিস হয়ে গেল। পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে নতুন একটি সাম্রাজ্য তৈরি হলো—

সেটি হলো মনের সাম্রাজ্য।

***

৩২. এরিস্টটল বলেন, খ্রি. পূ. ৪৬৭ অব্দে প্রাচীন Aegospotami নামক নদীর তীরে একটি উল্কাপাত হয়েছিল। সেই ঘটনার সাথে এনাক্সাগোরাসের কথার মিল ছিল বলে লোকে এটিকে তার ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

৩৩. এরিস্টটলের মতে. থেলিস (Thales) হলেন বিজ্ঞানের জনক। তার জীবনকাল ছিল খি. পূ. ৬২০-৪৪৬ অব্দ। তার ছাত্র ছিলেন। এনাক্সিম্যানডার (Anaximander) ও এনা।স নেস (Anaximenes)। তারা Pre – Socratic Philosophers যারা দেবদেবীর তত্ত্বকে বাতিল করে প্রকৃতির দর্শন শুরু করেছিলেন। তারা জন্ম নিয়েছিলেন মিলেটাস শহরে, যেটি বর্তমানে তুরস্কের মধ্যে, সেই সময়ে ছিল গ্রিক নগর।

৩৪. তখন ইউরোপের পণ্ডিতগণ জানতেন শুধু ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা নিয়েই পৃথিবী; এর বাইরে আর কিছুই নেই।

৯

‘ভীতি নয়, চাই ভালোবাসা বিনিময়
ভয়ের বদলে ভয়ই পাওয়া যায়,
যার ভয়ে সবে কাঁপে, সে করে সব্বারে ভয়।
—ডিমোক্রিটাস

‘সখী, ভালোবাসা কারে কয়?’

সক্রেটিস আর ক্রিতো একসাথে প্রশ্নটি করল। সামনে ষাট বছরের বৃদ্ধা ডিওটিমা। ভালোবাসা কী জিনিস, সেটি জানতে তারা ডিওটিমার কাছে এসেছে। দিনের আলো কমে এসেছে। সন্ধ্যার আগে গোধূলির আলো নিভু নিভু করছে। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিমাখা নিভু নিভু আলোতে তারা প্রেমের সংজ্ঞা বের করতে চাইছে।

ডিওটিমা একজন রহস্যময় নারী। তিনি জিউসের মন্দিরের পুরোহিত। মুখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। একবার তাকিয়েই কার ভাগ্যে কী আছে, ফটাফট বলে দিতে পারেন। তার কাছে লাইন ধরে লোক আসে। তিনি কাউকে বিশেষ কিছুই বলেন না। তবে যা বলেন, সেটি মিথ্যা হয়েছে এমন নজির নেই। লোকে তাকে বুঝতে পারে না। তিনি রহস্যময়ী নারী।

এই রহস্যময়ী নারীর কাছে আসার জন্য ক্রিতো কয়েক দিন ধরে সক্রেটিসের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। ক্রিতোর বিয়ে হবে। তার মা-বাবা মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন। খুব তোড়জোড় চলছে। বিয়ের আগে ক্রিতোর একটু প্রেম বিষয়ক জ্ঞান দরকার। ভালোবাসা বিষয়ক জ্ঞানের জন্য তারা এখন এসেছে ডিওটিমার আখড়ায়।

ক্রিতো খুব লাজুক। একজন বয়স্ক নারীর কাছে প্রেমের কথা বলা যায় নাকি? লজ্জা-শরম বলে তো একটি কথা আছে! সক্রেটিসের এসব লজ্জা একেবারেই নেই। জ্ঞানের জন্য লজ্জা, ঘৃণা, ভয়— এই তিন থাকতে নেই। তাই জ্ঞানের জন্য সে কোনো লজ্জা করে না। ডিওটিমা তাকে খুবই আদর করেন। একেবারে আপন খালার মতো। তার কাছে সক্রেটিস একেবারে পানির মতো সহজ। তার কাছে গড়গড় করে মনের কথা বলতে পারে।

সক্রেটিস নারীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এথেন্সের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে মেয়েরাও জ্ঞানী হতে পারে। তারা জ্ঞানের আলোচনা করার জন্য কোনোদিনই একজন মেয়ের কাছে আসবে না। সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম সক্রেটিস। জ্ঞানের জন্য ডিওটিমার কাছে আসতে তার কোনো আপত্তি নেই।

ডিওটিমা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। কোনো কিছুর উত্তর করছেন না। সক্রেটিস আবার বলল, ভালোবাসা কারে কয়?[৩৫]

ডিওটিমা তার রহস্যময় গলায় বললেন, ভালোবাসা ভালো নয়।

তার গলার স্বরে একটি ভয়ের ব্যাপার আছে। সক্রেটিস ভয়ে ভয়ে বলল, ভালোবাসা তাহলে মন্দ?

'না, কোনো কিছু ভালো না হলেই মন্দ হবে, এমন কোনো কথা নেই। ভালোবাসা হলো ভালো আর মন্দের মাঝামাঝি একটি জিনিস।'

সক্রেটিস বোঝার চেষ্টা করছে। ভালোবাসায় যে মন্দ কিছু থাকতে পারে, সেটি মানতে তার কষ্ট হচ্ছে। সে মনে করে ভালোবাসা খুবই সুন্দর আর পবিত্র জিনিস।

সক্রেটিস মনে মনে কী ভাবছে, সেটি মনে হয় ডিওটিমা বুঝতে পেরেছেন। তিনি আবার রহস্য করে বললেন, ভালোবাসা সুন্দর নয়।

সক্রেটিস বলল, ভালোবাসা অসুন্দর?

ডিওটিমা বললেন, যা কিছু সুন্দর নয়, তাই অসুন্দর হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ভালোবাসা হলো সুন্দর আর অসুন্দরের মাঝামাঝি একটি জিনিস।

এই নারী মনে হয় মধ্যপন্থি। তিনি সবকিছুর মাঝামাঝি থাকেন। মাঝামাঝি থাকলে ঝুঁকি কম। কেউ ভুল ধরতে পারে না। সুযোগমতো যেকোনো এক দিকে চলে যাওয়া যায়। ডিওটিমাও এখন ভালোবাসাকে সুন্দর আর অসুন্দরের মাঝামাঝি বলছেন। এখন মাঝখানে থাকছেন। পরে সুযোগমতো ডানে-বাঁয়ে একটি দিকে যাবেন।

ডিওটিমা বলছেন, ভালোবাসা কী সেটি বুঝতে হলে, আগে জানতে হবে ভালোবাসার পিতা-মাতা কে?

সক্রেটিস আর ক্রিতো চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ভালোবাসার বাবা-মা? এই বুড়ির মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো!

ডিওটিমা বললেন, ভালোবাসার বাবা হলেন একজন দেবতা, তার নাম ঐশ্বর্য। আর তার মা হলেন— দারিদ্র্য বা অভাব।

ক্রিতো পিটপিট করে বুড়ির মুখের দিকে তাকাচ্ছে। এই বুড়ি একজন পুরোহিত। তার মতে জগতের সবকিছুই করেছেন দেবতারা। তাই এখানেও দেব-দেবী নিয়ে এসেছেন। ক্রিতো ভাবছে, এর কাছে আসাই ভুল হয়েছে। বেহুদা সময় নষ্ট হচ্ছে। এই বুড়ি একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেবতাভক্ত। তার কাছ থেকে জ্ঞানের কথা জানা যাবে না।

ডিওটিমা বললেন, এবার যা বলব, ভালো করে শোন—

‘ভালোবাসার বাবা হলেন ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য মানে সম্পদ, ঐশ্বর্য মানে ক্ষমতা। সেজন্য ভালোবাসার অনেক ক্ষমতা, ভালোবাসার অনেক শক্তি। তুমি ভালোবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারবে। পৃথিবীতে ভালোবাসার মতো এমন শক্তিশালী জিনিস আর নেই। আর ভালোবাসার মা হলেন অভাব। সেজন্য ভালোবাসার চারপাশে সব সময় একটি অভাব। মানুষ প্রেমে পড়লে শুধু চাই আর চাই। আরও বেশি চাই। মনে হয় আমি পেলাম না, সবাই পেল, শুধু আমিই পেলাম না। যখন সে একটু পায়, তখন আরও চায়। যখন আরও বেশি পায়, তখন শুরু হয় হারাই হারাই ভয়। মনে হয় এই বুঝি হারিয়ে যাবে, এই বুঝি চলে যাবে। এই হারানোর ভয় যতদিন থাকে, ততদিনই ভালোবাসা থাকে। যে মুহূর্তে হারানোর ভয় শেষ, সেই মুহূর্তে ভালোবাসাও শেষ। তাই ভালোবাসার সাথে সব সময়ই একটি অভাব জড়িয়ে থাকে, সব সময় একটি না পাওয়ার ব্যাপার থাকে।’

ভালোবাসার এমন চমৎকার ব্যাখ্যা সক্রেটিস আর কোথাও শোনেনি। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল বুড়ির দিকে। বুড়ি কী শুনালো? ক্রিতোর চোখেও এক সাগর মুগ্ধতা। তারা যা শুনতে এসেছে, তা শোনা হয়ে গেছে।

ডিওটিমা বললেন, এবার ভালোবাসার জন্ম কাহিনি শোন। সেদিন ছিল সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির জন্মদিন। তার বাবা জিউস মহাধুমধাম করে জন্মদিন পালন করছেন। সেই অনুষ্ঠানে এসে দেবতা ঐশ্বর্য এবং দেবী অভাবের প্রথম দেখা হয়, আর সেই রাতেই জন্ম হয় ভালোবাসার।

এবার সক্রেটিস আর ক্রিতো হাসি দিল। দেবদেবী নিয়ে এই ব্যাখ্যা হাস্যকর। কিন্তু ডিওটিমা পুরোহিত। তিনি দেবতা দিয়েই সবকিছুর ব্যাখ্যা দেন।

ডিওটিমা বললেন, শোন। এবার আর একটি ভালো কথা বলব-

‘ভালোবাসার জন্ম হয়েছে সৌন্দর্যের দেবীর জন্মদিনে। সেজন্য ভালোবাসা সব সময় সুন্দরের খোঁজ করে। যেখানেই সুন্দর কিছু আছে, সেখানেই ভালোবাসা আছে। যদি তোমার মনে হয় কেউ অসুন্দর কাউকে ভালোবেসেছে, সেটি তোমার বোঝার ভুল। সেখানেও সে সুন্দর কিছু পেয়েছে বলেই ভালোবেসেছে। সেটি না হলে সে ভালোবাসেনি, শুধু ভালোবাসার অভিনয় করেছে।’

সক্রেটিস আবারও মুগ্ধ। সুন্দরের সাথে ভালোবাসার যে সম্পর্ক, সেটিও একেবারে পরিষ্কার।

ডিওটিমা বললেন, আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ভালোবাসা হলো সুন্দর আর অসুন্দরের মাঝামাঝি। ভালো আর মন্দের মাঝামাঝি। এবার সেটির কারণ শোন। আগেই বলেছি, ভালোবাসা হলো ঐশ্বর্য আর অভাবের সন্তান। এই দুটো হলো পুরোপুরি বিপরীত গুণ। ঐশ্বর্য সুন্দর আর অভাব অসুন্দর। তাই এদের সন্তান ভালোবাসা হচ্ছে সুন্দর আর অসুন্দরের মাঝামাঝি। একইভাবে ঐশ্বর্য হলো ভালো আর অভাব হলো মন্দ। তাই এদের সন্তান ভালোবাসা হচ্ছে ভালো আর মন্দের মাঝামাঝি। ভালোবাসার যেমন সুন্দর করার

ক্ষমতা আছে, তেমনই কিছু অসুন্দর করার ক্ষমতাও আছে। ভালোবাসা যেমন মঙ্গল করে, তেমনই হিংসারও জন্ম দেয়। ভালোবাসা শান্তি আনে, তেমনই ভালোবাসা থেকে যুদ্ধও হয়।

সক্রেটিস মনে মনে ভাবছে, এই বুড়ি বিয়ে করেনি, সারা জীবন মন্দিরে দেবতার সেবা করেছে। তবুও এতকিছু কীভাবে জানেন?

ডিওটিমা বললেন, শোন। এবার শেষ কথা বলব:

'মানুষ প্রথমে দেহের সৌন্দর্য দেখে ভালোবাসে। সবাই এভাবেই শুরু করে। এরপর আর একটু জ্ঞান বাড়লে, আর শরীরের সৌন্দর্য নয়, মনের সৌন্দর্য খোঁজে। সেটি আর একটু উচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা। মানুষ যখন আরও একটু বুঝতে শেখে, তখন সে জ্ঞানকে ভালোবাসতে শুরু করে। এক সময় সে হয়ে যায় জ্ঞানের প্রেমিক। আর জ্ঞানের প্রতি প্রেমই হলো সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা। জ্ঞানের প্রেমিক হলেন দার্শনিক বা ফিলোসফার ফিলিন (philein) মানে ভালোবাসা আর সফি (sophie) মানে জ্ঞান। যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন তিনিই হলেন ফিলোসফার (Philosopher)।'

ক্রিতো ভাবছে, এই বুড়ি তো প্রেমের জ্ঞানকে দর্শনের জ্ঞান বানিয়ে দিল।

সে বলল, তার মানে ঘর-সংসার চাইলে অল্প ভালোবাসতে হবে। অল্প ভালোবাসলে নারী-পুরুষের প্রেম থাকবে। আর বেশি ভালোবাসলে জ্ঞানপ্রেমিক হয়ে যাবে। মানে দার্শনিক হয়ে যাবে। আমি তাহলে কোনটা করব?

সক্রেটিস বলল, তোমার মা তোমার জন্য মেয়ে দেখছেন। তোমার জন্য অল্প ভালোবাসাই ভালো। ঘর-সংসার হবে।

ক্রিতো বলল, আর তুমি? তুমি ঘর-সংসার করবে না? তুমি বুঝি জ্ঞান প্রেমিক হবে?

সক্রেটিস হাসলো। মুখে কিছুই বলল না।

ডিওটিমা বললেন, প্রেমের আলাপ বাদ। ভালোবাসার কথায় এখানেই ইতি। এখন অন্য কথার আসি। সক্রেটিস, তোমার মতো লোক আমি জীবনে দেখিনি। জ্ঞানী অনেকেই আছে, তুমি সবার থেকে আলাদা। কিন্তু তুমি মানুষকে প্যাঁচ দিয়ে প্রশ্ন করো। তুমি এমন প্যাঁচ দেওয়া কথা কোথায় শিখলে?

সক্রেটিস বলল, এটি আমার নিজেরই বানানো।

'কারও কাছে শিখোনি?'

'সেভাবে নয়। তবে যদি ওস্তাদ হিসেবে কারও নাম বলতে হয়, তাহলে যার নাম মনে আসছে, তিনি হলেন দার্শনিক জেনো[৩৬]'

'জেনো?'

খেলা

'হ্যাঁ, আমার বয়স তখন পনের। এথেন্সে প্যান-এথেনিয়ান[৩৭] দেখতে দুজন সাধু এসেছেন। একজন থুত্থুরে বুড়ো, চুল সব পাকা। আরেকজন কাঁচা চুলের। তার দুজন

গুরু-শিষ্য। বুড়োজনের নাম পারমিনিডিস। তার মাথা ভরা নতুন নতুন বিষয়। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে। তিনি তেমন কথাবার্তা বলেন না। কথা বলেন কাঁচা চুলের সাধু। তার নাম হলো জেনো। বয়স চল্লিশ হবে। তারা কেরামিকাসে হোটেলে উঠেছেন। হোটেলের বারান্দায় বসে গল্প করছেন। অনেক লোকের ভিড়। ভিড় দেখে আমিও গেলাম। দেখি সাধু জেনো একটি বই পড়ছেন। তিনি বই পড়ছেন আর বলছেন, আমাদের বাইরের পৃথিবীকে যেমন জানতে হবে, তেমনই নিজের ভেতরের আত্মাকেও জানতে হবে।

অনলাইনে বেস্টসেলিং বই কিনুন

আমি দেখলাম আরে, এই সাধু তো আমার মতো কথা বলেন। আমি সারা দিন মন, আত্মা এগুলো নিয়ে ভাবি। আমি মনে মনে যা ভাবি এই সাধু সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে সেগুলোই বলছেন।

আমার তাকে অনেক ভালো লেগে গেল। আমি রোজ তার কাছে যাওয়া শুরু করলাম। খুব ভালো লাগত। তার কথা শুনতাম, তিনি কিছুটা প্রশ্ন-প্রশ্ন মিলিয়ে কথা বলতেন। সেটি আমার মনে লেগে গিয়েছিল। সেই থেকেই প্রশ্ন শুরু করি।'

ডিওটিমা বললেন, প্রশ্নরোগের ঘটনা তাহলে এটি।

সক্রেটিস বলল, ঘটনা আরও আছে, মজার ঘটনা। দার্শনিক জেনোকে আমার এত ভালো লেগেছিল যে, তাকে মাঝে মাঝে বাড়িতে নিয়ে আসতাম। ওনার সাথে প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলতাম।

আমি বলতাম, ঘোড়া কী জিনিস?

তিনি বলতেন, একটি জন্তু।

'জন্তু কী?'

'যারা লাফালাফি করে। চলাচল করে।'

'মানুষও চলাচল করে, তাহলে মানুষও কি জন্তু?'

'হুঁম, মানুষও জন্তু।'

'দেবতারাও চলাচল করে, দেবতারাও কি জন্তু?'

'হুঁম, দেবতারাও জন্তু।'

একথা শুনেই আমার মা দৌড়ে আসতেন। বলতেন, 'কী শিখাচ্ছেন ছেলেটাকে? দেবতারা জন্তু? এসব কথা শুনলে ওকে ফাঁসি দেবে।' ফাঁসির ভয়ে আমরা দেব-দেবীর কথা বাদ দিয়ে নতুন কিছু নিয়ে শুরু করতাম। চলতে থাকত প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা।

জেনো সাহেব এথেন্স থেকে চলে গেলেন। এবার আমি শুরু করলাম প্রশ্ন। প্রথমে ছোট বাচ্চাদের প্রশ্ন করি। তারপর আর একটু বড় বাচ্চাদের। দেখি বিশাল মজা। খেলতে খেলতে আমি হয়ে গেলাম প্রশ্ন-খেলার ওস্তাদ। সেই খেলা এখন খেলি বুড়োদের সাথে।'

'বুড়াদের সাথে?'

‘হুঁম, ধরো একদিন আগোরাতে একজন কবি এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কবি সাহেব, বলুন তো— কবিতা কী জিনিস? কবি উত্তর দেন। তার উত্তর থেকে আবার প্রশ্ন করি। কবি না পারলে, অন্য কেউ উত্তর দেয়। সেটি থেকে আবার প্রশ্ন। এভাবে চলতে থাকে প্রশ্ন আর উত্তরের খেলা। এক সময় দেখি কবিতা কী, সেটি আমরা স্পষ্ট বুঝে গেছি।’

ডিওটিমা বললেন, এমন খেলা আসলেই তোর কাজে লাগছে?

এতক্ষণ ক্রিতো কোনো কথা বলেনি।

এবার ক্রিতো বলল, কাজে লাগছে কি! এই খেলা এখন এথেন্সে ভীষণ জনপ্রিয়। খুব বাজার পেয়েছে। এখন আমার বন্ধুরাও সুযোগ পেলেই প্রশ্ন শুরু করে। এই প্রশ্ন প্রশ্ন খেলাকে তারা বলে সক্রেটিস পদ্ধতি বা ‘সক্রেটিক মেথড’[৩৮]।

‘সক্রেটিক মেথড?’

ক্রিতো বলল, হুঁম, সক্রেটিক মেথডে এখন জ্ঞানের জন্ম হচ্ছে।

ডিওটিমা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন সক্রেটিসের দিকে। এই পিচ্চি ছেলে জ্ঞানের জন্ম দেয়। ডিওটিমার চোখে বিস্ময়। এক আকাশ বিস্ময়।

মা-খালারা এমন বিস্মিত হলে লজ্জা লাগে। সক্রেটিসের লজ্জা-শরম কম। সে তেমন লজ্জা পেলো না।

সে বলল, খালা, মিষ্টি বাতাস আসছে। দখিনা হাওয়ায় হবে নাকি প্রশ্ন- প্রশ্ন খেলা?

***

৩৫. প্লেটোর সিম্পোজিয়াম (Symposium) ডায়ালগে সক্রেটিস ভালোবাসা বিষয়ে ডিওটিমার কাছে শোনা গল্প বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

৩৬. এরিস্টটলের মতে, সক্রেটিস যে ডায়ালেক্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন, সেটি দার্শনিক জেনো (Zeno of Elea) এবং তার গুরু পারমিনিডিস (Parmenides) এর আবিষ্কার। তাদের সাথে সক্রেটিসের আলাপের বিস্তারিত বিবরণ আছে প্লেটোর Parmenides নামক গ্রন্থে।

৩৭. অলিম্পিকের মতো প্রতিযোগিতা হতো গ্রিসের চারটি বড় শহরে চার বছর পর পর। অলিম্পিয়া শহরের আয়োজনকে বলা হতো অলিম্পিক, এটিই সবচেয়ে বড় ছিল। এথেন্সের প্রতিযোগিতার ইংরেজি নাম প্যান-এথেনিয়ান গেমস (Panathenain Games)।

৩৮. সক্রেটিক মেথড: একের পর এক প্রশ্ন করে কোনো জটিল বিষয় বুঝতে পারার পদ্ধতি। প্লেটো তার ডায়ালগগুলোতে যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, সেটিই সক্রেটিক মেথড।

১০

‘সে-ই ধনী, যে অল্পে তুষ্ট হয়,
সুখের চেনা গলির নাম সন্তুষ্টি।’
—সক্রেটিস

সক্রেটিস আর সিমন আগোরার পথ ধরে যাচ্ছে। আগোরায় অগুনতি লোক। সক্রেটিসের হাঁটা কিছুটা উদ্ভট। পাগুলো একটু বাঁকা করে থেমে থেমে আগায়। আর সেই সাথে সারা শরীর সামনে ছুড়ে দেয়। তার এই হাঁটা এথেন্সে বিখ্যাত। এরকম করে অন্য কেউ হাঁটে না।

তাকে হাঁটতে দেখে সবাই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। অনেকে কাজ বন্ধ করে হা করে দেখছে। যারা নতুন দেখছে তারা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

সিমন পড়েছে বিপদে। তার মনে হচ্ছে চারদিকের হাজার হাজার চোখ তাদের গিলে খাচ্ছে। সে রাস্তায় নজর দিতে পারছে না। একবার ডানে একবার বামে তাকাচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকবার হোঁচট খেয়েছে। সক্রেটিসের কোনো হেলদোল নেই। সে একইভাবে হাঁটছে।

সক্রেটিস বলল, সবাই তাকিয়ে আছে কেন জানো?

সিমন বলল, তোমার হাঁটা দেখছে।

‘আমার হাঁটা কেমন?’

‘হাঁটা ভালো, তবে চলনটা বাঁকা।’

সক্রেটিস হো হো করে হেসে উঠল, এটি ঠিক বলেছ। আমার চলন বাঁকা।

সিমন বলল, মানুষ যেভাবে তোমার বাঁকা চলন দেখছে, মনে হচ্ছে এখানে থিয়েটার হচ্ছে। সবাই হা করে দেখছে। আমার ইচ্ছা করছে টিকেটের ব্যবস্থা করি। টিকেট হাতে নিয়ে চিৎকার করে বলব ‘এই যে ভাই, আসুন, দেখে যান, নতুন জিনিস, সক্রেটিসের বাঁকা চলন, টিকেট মাত্র দুই ওবল[৩৯]।

সক্রেটিস বলল, টিকেট করতে চাও? তুমি তো বিরাট বেপারী হয়ে গেছো। বেপারীদের মতো সবখানে টাকার গন্ধ পাচ্ছ। চলো, ঐ দোকানে ঢুকি। ঐ দোকানি তোমার থেকে অনেক বড় বেপারী।

আগোরার রাস্তার দুপাশে অনেক দোকান। দামি দামি জিনিসে ঠাসা I সারা পৃথিবীর সব থেকে দামি জিনিসপত্র এখন এথেন্সে চলে আসে। গলির মুখে বিশাল একটি মনোহারি দোকানে ঢুকল সক্রেটিস। দোকানটি ক্রিতোর চাচাত ভাইয়ের। দোকানে আগে

থেকেই ক্রিতো ও কয়েকজন বন্ধু বসে ছিল। সক্রেটিস এই দোকানে প্রতি মঙ্গলবার ঠিক সন্ধ্যার পর আসে। কোনোদিন কিছু কেনে না। কিন্তু কোনো মঙ্গলবারই বাদ যায় না।

দোকানে ঢুকেই সক্রেটিস সুন্দর একটি হার হাতে নিল। হারটা ঝুনঝুনির মতো ঝুলিয়ে সক্রেটিস বলল, বাহ, বাহারি শব্দ করছে। এই ঝুনঝুনির দাম কত?

দোকানি বলল, দুইশ ওবল।

দুইশ ওবল অনেক টাকা। দুইশ ওবল দিয়ে একটি জাহাজ কেনা যায়। সিমনের জুতার দোকান করতে সব মিলিয়ে লেগেছে দেড়শ ওবল। এই হারের দাম তার দোকানের চেয়ে বেশি।

সক্রেটিস আরেকটা সোনার পুতুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, আহা, বড়ই চকমারি জিনিস। এই চকমারি পুতুল কত?

দোকানি বলল, সাড়ে তিনশ ওবল।

সক্রেটিস বলল, ঘটনাটা দেখেছ— এথেন্স কত ধনী! এথেন্সের মতো দামি শহর দুনিয়ায় আর একটিও কি আছে?

সবাই বলল, না, না। এথেন্সের মতো দামি শহর একটিও নেই।

তারপর একটি ব্রোঞ্জের ছুরি নিয়ে সক্রেটিস বলল, এটির দাম কত?

'তিন ওবল।'

'আর এই বাটি?'

'এক ওবল।'

সক্রেটিস বলল, ঘটনাটা দেখেছ— এথেন্স কত গরিব! এথেন্সের মতো সস্তা শহর দুনিয়ায় আর একটিও কি আছে?

সবাই হাসতে হাসতে বলল, না, না। এথেন্সের মতো সস্তা শহর আর একটিও নেই।

সিমন কিছুই বুঝতে পারছে না। এ কেমন খেলা!

সিমন বলল, এথেন্স একই সাথে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি শহর আবার সস্তা শহর। সেটি কীভাবে?

সক্রেটিস বলল, সন্দেহ হচ্ছে?

সিমন বলল, হ্যাঁ, সন্দেহ হচ্ছে।

সক্রেটিস বলল, বাহ, এর তো সন্দেহ বাতিক আছে।

'সন্দেহ বাতিক আছে? আমার?'

'হ্যাঁ, তোমার।'

'কী বলছ? আমি এখনও বিয়েই করিনি। প্রেমের কোনো ব্যাপার-স্যাপার নেই। সন্দেহ-বাতিক কোত্থেকে আসবে?'

সক্রেটিস বলল, নতুন নতুন বিয়ে করলে যে সন্দেহ-বাতিক হয়, সেটি খুবই জঘন্য একটি জিনিস। আমি বলছি অন্য রকম সন্দেহ-বাতিকের কথা। এই সন্দেহ বাতিক ভালো

জিনিস। আমার সাথে যারা ঘোরে তাদের সবার সন্দেহ-বাতিক আছে।

'কী রকম সেটি?'

'সেটি হলো, কেউ কিছু বললে, সরাসরি মেনে নেয় না। সন্দেহ করে। সবকিছুতে সন্দেহ করে।

'খামাখা সন্দেহ করে লাভ কী?

'সন্দেহ থেকে প্রশ্নের জন্ম হয়। কেউ কিছু বললে, সেটিতে সন্দেহ হলেই মানুষ প্রশ্ন করে। প্রশ্ন থেকেই নক্কুন জিনিস বের হয়। এভাবেই পৃথিবীতে নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়। মানুষের যা কিছু অর্জন, সবকিছুর শুরু সন্দেহ থেকে। তাই সন্দেহ-বাতিক খুবই ভালো জিনিস।'

সিমন চোখ পিটপিট করে বিড়ালের মতো তাকাচ্ছে। সন্দেহ-বাতিক ভালো জিনিস— এটি মানতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে।

সক্রেটিস আবার বলল, তাহলে যেটি দাঁড়াল সেটি হলো সন্দেহ থেকে জন্ম হয় প্রশ্ন। তুমি প্রশ্ন করেছ। তুমি এখন একজন প্রশ্ন-রোগী।

'আমি প্রশ্ন-রোগী?'

'হ্যাঁ, যারা সবকিছুতে প্রশ্ন করে, বিনা প্রশ্নে কিছু মেনে নেয় না, সবকিছু বাজিয়ে দেখতে চায়, নিজে বুঝে নিতে যায়, কারণ জানতে যায়, উত্তর খুঁজতে চায়— তারাই প্রশ্ন-রোগী।'

'এখন বলবে যে সন্দেহ বাতিকের মতো প্রশ্ন-রোগও ভালো জিনিস?'

'না, শুধু ভালো জিনিস নয়। প্রশ্ন-রোগের মতো সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।'

সিমন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে মারামারি শুরু করতে পারে।

সক্রেটিস বলল, যে প্রশ্ন করতে পারে, সে নতুন জিনিস বের করতে পারে। একদিন সাগরের দিকে তাকিয়ে পানির ফুলে ওঠা দেখে একজন প্রশ্ন করল, জোয়ার কেন হয়? প্রশ্নটা তাকে ভাবায়। সে কারণ খুঁজতে থাকে। প্রতিদিন জোয়ারের কাছে গিয়ে বসে থাকে। একদিন বের করে ফেলে জোয়ার-ভাটার রহস্য। একটি ছোট্ট 'কেন' প্রশ্ন থেকে সে বড় একটি রহস্য বের করল। এভাবেই প্রশ্ন-রোগীরা বড় বড় জিনিস বের করে। মানুষ প্রশ্ন করতে পারে বলেই এগিয়ে চলছে। জ্ঞানের প্রথম শর্তই হলো প্রশ্ন।

সিমন অর্ধেক শান্ত হলো। সক্রেটিসের কথায় যুক্তি আছে। প্রশ্ন করতে শুরু না করলে মানুষ নতুন নতুন জিনিস বের করতে পারত না। আজও সেই গুহায়ই বাস করত।

সিমন বলল, ঠিক আছে, মানলাম প্রশ্ন-রোগ খুব ভালো জিনিস। প্রশ্নই হলো সকল আবিষ্কারের জননী। পৃথিবীতে যত বেশি প্রশ্ন-রোগী হবে, তত বেশি মঙ্গল। কিন্তু ঝামেলা হলো, তুমি জোয়ারের কথা বললে। জোয়ারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলে, জোয়ার রাগ করে

না। কিন্তু মুরুব্বিদের প্রশ্ন করলে তারা রাগ করে। একদিন আমার চাচি বলল, শনিবার দিন নখ কাটিস না। আমি বললাম, কেন চাচি? চাচি বলল, দেবতারা অখুশি হয়। আমি বললাম, কেন তারা অখুশি হয়? চাচি বলল, মুখে মুখে তক্ক করিস? তোর মতো খারাপ ছেলে আমি জন্মেও দেখি নাই।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। সক্রেটিসের সব বন্ধুরই এই এক সমস্যা। প্রশ্ন নিয়ে মুরুব্বিদের সাথে ঝামেলা হয়। সকাল-বিকাল ক্যাচাল লাগে। মুরুব্বিরা কথায় কথায় বলেন, এটি কর— দেবতারা ভালোবাসে। ঐটা করিস না— দেবতারা গোস্বা করবে। কিন্তু দেবতারা কেন ভালোবাসে, কেন বেজার হবে, এই প্রশ্ন জানতে চাইলেই বলে, বেআদব, খালি মুখে মুখে তর্ক।

সক্রেটিস বলল, কথা সত্য। প্রকৃতির কাছে প্রশ্ন করলে প্রকৃতি ঝামেলা করে না। কিন্তু মানুষকে তার মনের মতো প্রশ্ন না করলেই, মানুষ রাগ করে। কিন্তু ঘটনা হলো এই সমস্যা চিরকালই ছিল। সমস্যার কারণে প্রশ্ন করা বন্ধ হয়নি। যারা প্রশ্ন করার তারা সারা জীবন করে। তারা অবাধ্য। তারাই নতুন নতুন জিনিস বের করে। যারা ভয় পেয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করে তারা শান্ত শিষ্ট লেজবিশিষ্ট ভদ্র ছেলেমেয়ে। তারা নতুন কিছু বের করতে পারে না।

সিমন বলল, তাহলে আমাদের কী করা উচিত?

সক্রেটিস বলল, তুমি সবকিছুই সন্দেহ করো। সন্দেহ করলেই প্রশ্ন আসবে। মাথায় প্রশ্ন এলে চুপ থেকো না, জিজ্ঞেস করো। বিনা প্রশ্নে কিছু মেনে নেবে না। যদি তুমি সবাইকে প্রশ্ন করতে পার, তাহলেই তুমি সত্যিটা জানতে পারবে। প্রশ্নের পর প্রশ্নেই সত্য বের হয়ে আসে।

সিমন বলল, তাহলে মানে দাঁড়াল সন্দেহ থেকে আসে প্রশ্ন, আর প্রশ্ন থেকে জন্ম হয় সত্য। সেই হিসেবে প্রশ্ন হচ্ছে সত্যের মা। আর সন্দেহ হচ্ছে সত্যের দাদিমা।

সবাই হেসে উঠল।

সিমন আবার বলল, সত্যের মা আর দাদিমাকে তো পেয়ে গেলাম। কিন্তু আমার নিজের মা আর দাদিমা যদি শোনে যে আমার সন্দেহ-বাতিক আছে, আর সেই সন্দেহ থেকে আমার প্রশ্ন-রোগ হয়েছে, তাহলে আমার মা-দাদিকে আর খুঁজে পাব না। সত্যের মা-দাদিকে পেয়ে আমার নিজের মা-দাদিকে হারিয়ে ফেলব গো।

সিমন এমন করে বলছে যেন সত্যিই তারা মা আর দাদিমার কিছু হয়ে যাচ্ছে। তার কথায় সবাই হাসছে।

দোকানে এখন অনেক ভিড়। ভিড়ের মানুষ জানে সক্রেটিস প্রতি মঙ্গলবারে সন্ধ্যার ঠিক আগে এই দোকানে আসে। চার থেকে পাঁচ লাইন মজার কথা বলে। সেটি শোনার জন্যই দোকানে ভিড় জমে যায়। এতক্ষণ সিমনের সাথে সক্রেটিসের যে বড় বড় আলাপ

হলো— ভিড়ের মানুষের কাছে সেটির কোনো মূল্য নেই। তাদের কাছে এগুলো হাবিজাবি কথা। এমন কথা তো সক্রেটিস ঘাটে-পথে বলে। এসব দিয়ে কী হবে?

দোকানি আঙুরের রস নিয়ে এলো। এটিও প্রতি মঙ্গলবারের রুটিন মজার আলাপ শেষ হলে সে সক্রেটিসকে আঙুরের রস দেয়। দুষ্ট লোকেরা বলে, ওটা আঙুরের রস না, ওটা নাকি সুরা। কিন্তু দোকানির কোনো দোষ নেই। সে আঙুরের রস আর সুরার পার্থক্য বোঝে না। আঙুর দিয়েই সুরা বানায়। সক্রেটিসের সবকিছুতেই খামখেয়ালি। ইচ্ছা করলে ফলের রসে এক চুমুক দেয়, ইচ্ছা না করলে নাই। দোকানির বিশ্বাস সক্রেটিস তুকতাক জানে। কালো জাদু ধরনের কিছু। সে যেদিন রসটা খায়, সেদিন দোকানে বিক্রি কম হয়। যেদিন খায় না, সেদিন বিক্রি বেশি হয়। তাই দোকানি মনে মনে চায় সক্রেটিস যেন আঙুরের রস না খায়।

দোকানির মনের কথা সক্রেটিস জানে, কিন্তু বুঝতে দেয় না। সে চায় এই রহস্যটা থাকুক। দোকানে ধনী লোক দেখলে, সে খায় না। আজ দোকানে কয়েকজন টাকাওয়ালা লোক দেখা যাচ্ছে। আজ সে খাবে না। সে বের হওয়ার জন্য পা বাড়ালো।

কিন্তু দোকানি তার হাত ধরে ফেলল। সিমনকে দেখিয়ে বলল, আজ মেহমান নিয়ে আসছো, মেহমানের খাতিরে হলেও খাও।

সক্রেটিস সিমনকে বলল, মেহমান, তোমাকে খাতির করছে, নাও।

সিমন আঙুরের রস নিয়ে বলল, সক্রেটিস, তুমি সত্যি প্রত্যেক মঙ্গলবার এই দোকানে আসো কিন্তু কিছু কিনো না! তাহলে আসো কেন?

সক্রেটিস বলল, এই দোকানে এথেন্সের সব থেকে ভালো ভালো জিনিস আছে। কিন্তু এসবের কিছুই আমার নেই। এগুলো কেনার ক্ষমতাও আমার নেই। এত এত জিনিস ছাড়াও যে আমি ভালো থাকতে পারি, সেটি পরীক্ষা করতে আসি। কত দামি দামি জিনিস বাদ দিয়েও যে সুন্দর জীবন পাওয়া যায়, সেটি বোঝার জন্য আসি। আমার উদ্দেশ্য— অল্প সম্পদে সুন্দর জীবন।

সক্রেটিস মজা করতে করতে এমন সব কথা বলে যে, সবাই অবাক হয়ে যায়।

সিমন ভালো করে তাকাল সক্রেটিসের দিকে। খালি পা। কোমরে ঝুলছে এক টুকরো কাপড়। কাঁধে চিকন সুতার মতো একটা কিছু। আর কিচ্ছু নেই।

প্রথম যখন সিমনের দোকানে ঢুকেছিল, তার পায়ে জুতা না দেখে সিমন রেগে গিয়েছিল। আজ তার খালি পায়ের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা হচ্ছে। তার পা খালি, কারণ তার জুতার দরকার নেই। যা কিছু বর্জন করে জীবন যাপন করা যায়, তা সে অবলীলায় বর্জন করেন।

সক্রেটিসের কথায় সিমন মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু দোকানির মাথায় হাত। দোকানি ভাবছে, সক্রেটিস তো মানুষকে অল্প জিনিস দিয়ে জীবন যাপন করতে বলছে। এটি দোকানির

জন্য ভালো খবর না। এতে তার ব্যবসা কমে যাবে। সে বলল, বড় অন্যায় কথা। লোকে ভালো ভালো জিনিস না কিনলে আমি বেচবো কী?

সক্রেটিস বলল, তোমার ভয় নেই। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। লোকে কী কিনবে, সেটি লোকের স্বাধীনতা। আর তুমি কী বেচবে, সেটি তোমার স্বাধীনতা।

দোকানি ভাবল, এক্ষুনি বিষয় ঘুরাতে হবে। সক্রেটিস যদি বলতেই থাকে যে দামি দামি জিনিস কেনা খারাপ, তাহলে ব্যবসার তেরোটা বেজে যাবে। বিষয় বদলাতে সক্রেটিসকে একটি যুতসই প্রশ্ন করতে হবে। ঠিক মতো প্রশ্ন করতে পারলেই সক্রেটিস সেটি নিয়ে হৈহৈ করে উঠবে। দোকানি চিন্তা করছে। ভালো কোনো প্রশ্ন মাথায় আসছে না। তখন ভাবল এই মাত্র সক্রেটিস বলেছে স্বাধীনতা। এটি দিয়েই প্রশ্ন করি। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি বললে, আমি যা বেচব সেটি আমার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা জিনিসটা কী?

তার কথায় সক্রেটিস খুব খুশি। কেউ যদি এসে বলে, আমি এটি জানি না তাহলে সে খুশি হয়। পৃথিবীতে জ্ঞানের কোনো শেষ নেই। এই বিপুল জ্ঞান সাগরের সবই মানুষের অজানা। মানুষ আসলেই খুব বেশি কিছু জানে না। সেজন্য কেউ যদি এসে বলে আমি একটা কিছু জানি না, তার মানে হলো সে সত্য কথা বলছে। সে আরও জানতে চায়। যারা জানতে চায় সক্রেটিস তাদের খুব ভালোবাসে।

দোকানি জানতে চেয়েছে। সক্রেটিস দোকানিকে ভালোবেসেছে। সে দোকানির জন্য এখন বের করবে 'স্বাধীনতা কী বস্তু'। তার বের করার তরিকা আলাদা। সে নিজে উত্তর করবে না। সে প্রশ্ন করবে। যে জানতে চায়, তার মুখ থেকেই উত্তর বের হবে। এটিই তার প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলা।

সক্রেটিস বলল, চলো বের করি স্বাধীনতা মানে কী। আগে তুমিই বলো স্বাধীনতা কী জিনিস? যা মনে আসে, তাই বলো। কোনো ভয় নেই।

দোকানি বলল, স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতা। আমি অন্য কারও অধীনে নই। নিজের যা ইচ্ছা হবে, তাই করতে পারা।

সক্রেটিস বলল, যা ইচ্ছা তাই করা? তাহলে আমার ইচ্ছা হচ্ছে এখন তোমাকে খুন করব, সেটি কি আমার স্বাধীনতা?

'না, না। কী বলছো? আমাকে খুন করবে? তোমার বিবেক আছে। বিবেচনা আছে।'

'ভালো বলেছ বিবেক-বিবেচনা। যা খুশি করার আগে ভাবতে হবে। কিন্তু ধরো আমার বিবেচনা নেই। আমার ইচ্ছা আমি তোমাকে খুন করব? এটি কি আমার স্বাধীনতা?'

'না, না। দেশে আইন-কানুন আছে তো।'

'খুব ভালো। ঠিক জায়গায় এসে গেছ। তাহলে স্বাধীনতা কী দাঁড়াল, বলো।'

দোকানি বলল, 'নিজের বিবেক-বিবেচনা দিয়ে বিচার করে এবং দেশের আইন মেনে অন্যের অধীন না হয়ে নিজের ইচ্ছায় চলার নামই স্বাধীনতা।'

সক্রেটিস বলল, চমৎকার। আমি একমত।

এতক্ষণ ক্রিতো কিচ্ছু বলেনি। এবার সে দোকানিকে বলল, তুমি দেখেছো, 'স্বাধীনতা কী' সেটি সক্রেটিস বলেনি। সে শুধু প্রশ্ন করেছে। তুমি নিজেই বলেছ, স্বাধীনতা কী।

দোকানি বলল, ঠিক।

ক্রিতো বলল, সক্রেটিসের প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলায় আজ এই দোকানের মধ্যে জ্ঞানের জন্ম হলো। আমরা বুঝতে পারলাম স্বাধীনতা কী। এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জ্ঞানের জন্ম দেওয়া, এটির নাম সক্রেটিসের পদ্ধতি বা সক্রেটিক মেথড। এজন্যেই সক্রেটিস জ্ঞানের ধাত্রী।

দোকানি বলল, জ্ঞানের ধাত্রী?

ক্রিতো বলল, হ্যাঁ, জ্ঞানের ধাত্রী

সক্রেটিস বলল, প্রতিটি মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি আছে। সেটি বোঝা যায় না। সে নিজেও জানে না, তার ভেতরে কী গভীর ক্ষমতা আছে। কিন্তু ঠিক মতো প্রশ্ন করতে পারলে, তার ভিতরের জিনিস বের হয়ে আসে। তখন সবাই বিস্মিত হয়, সে নিজেও বিস্মিত হয়। আমি মানুষের ভেতরের এই বিস্ময়টা ভালোবাসি। প্রশ্ন করে করে ভেতরের শক্তি বের করে আনি। নতুন নতুন জিনিস জানতে পারি 1 সেজন্যেই আমি জ্ঞানের দাইমা। জ্ঞানের ধাত্রী।

এতক্ষণে দোকানে অনেক ভিড় হয়ে গেছে। হই-হল্লায় চারপাশের মানুষ দোকানে ঢুকে পড়েছে। এখন দোকানির বেচা-কেনা শুরু হবে। সক্রেটিস, ক্রিতো আর সিমন দোকান থেকে বের হয়ে গেল।

***

৩৯. খ্রি. পূ. ৫ম শতকে (সক্রেটিসের জীবনকালে) এথেন্সের রুপার মুদ্রার নাম ছিল আউল বা ওবল।

১১

‘Life is short, art long,
opportunity fleeting,
experinence treacherous,
judgement difficult.’
—হিপোক্রাটিস

এথেন্সে অদ্ভুত এক শাসন শুরু হয়েছে।

এই শহরে কোনো রাজা নেই। রানিও নেই। কোনো একজন মানুষের কথায় দেশ চলে না। মন্দিরের পুরোহিত বা যাজকদের নির্দেশেও দেশ চলে না। কিছু ধনী মানুষও দেশ চালায় না। নগরের সব মানুষ মিলে নিজেরাই নিজেদের শাসন করে। যেকোনো বিষয়ে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিস্টেমের নাম তারা দিয়েছে গণতন্ত্র বা মানুষতন্ত্র।

এরকম জিনিস আগে পৃথিবীর কোথাও ছিল না। এথেন্সবাসী গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে। কেউ তাদের উপহার দেয়নি। তারা পথের ধারে কুড়িয়েও পায়নি। কোনো বইতে কেউ লিখেও দেয়নি— নাও, এটি হলো গণতন্ত্র। এথেন্সের মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে শাসন করার জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করেছে। সবাই মিলে ভোট দিয়ে সবকিছু ঠিক করছে। এটির নামই গণতন্ত্র।

সারা দুনিয়ায় নিয়ম ছিল— যুদ্ধ ভালো করতে পারে, এমন কেউ একজন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বলে, আমি রাজা। সে আসলে একজন দস্যু। শক্তির জোরে দস্যু থেকে হয়ে যায় রাজা। রাজার বুদ্ধি থাকলে এসে বলে, আমি দেবতার বংশধর। আমাকে দেবতা পাঠিয়েছেন তোমাদের রাজা করে। মানুষ তাকে মেনে নেয়। তারপর আরও বড় কোনো দস্যু যদি তাকে তাড়িয়ে দেয়, সেই হয় নতুন রাজা। দস্যুদের মারামারি না হলে, রাজার ছেলে রাজা হয়। এভাবে সারা পৃথিবীতে শাসন চলে। একেবারে জোর যার মুলুক তার।

সেই সময়ে এথেন্সের মানুষ ভাবল— মারামারি না করে, সবাই মিলে ভোট দিয়েও শাসক বানানো যায়। তারা সেটিই করল। অস্ত্রের শক্তি বাদ দিয়ে তারা মানুষের শক্তিকে

ধরল। নাম দিল ডিমোস (Demos) ক্রাতিয়া (Cratia) মানে মানুষের শাসন। পণ্ডিতেরা পুঁথির ভাষায় নাম দিল গণতন্ত্র (Democracy)।

পৃথিবীর যেখানে রাজা আছে, সেখানে রাজার কথাই আইন। রাজা যা মনে করে সেটিই বিচার। রাজার যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেয়, যাকে ইচ্ছা মুক্তি দেয়। সেখানে একজন রাজা, বাকি সব প্রজা। সারা দেশের মালিক রাজা একা। প্রজারা তার দয়ায় বাস করে, বিনিময়ে রাজাকে খাজনা দেয়।

কিন্তু এথেন্সের গণতন্ত্রে কোনো প্রজা নেই। তারা নগরে থাকে, তাই নাগরিক। কারও একজনের ইচ্ছায় এখানে কিছুই হয় না। এখানে সবাই সমান। সবার সমান অধিকার। সবাই একসাথে বসে ভোট দিয়ে আইন তৈরি করেছে। আইনগুলো একটি বইতে লিখে রেখেছে। সেই বইয়ের নাম সংবিধান। সংবিধানে যা লেখা আছে, সেভাবেই দেশ চলে। সেভাবেই বিচার হয়। আদালত আছে। এখানে দেশের মালিক সকল নাগরিক।

গণতন্ত্র যে কী জিনিস, এথেন্সের বাইরের মানুষ সেটি বোঝে না। বোঝাতে চাইলেও তারা তা বিশ্বাস করে না। উল্টা হাসাহাসি করে। সক্রেটিসের বন্ধুদের মধ্যে চেরোফোন গণতন্ত্রকে খুবই ভালোবাসে। সুযোগ পেলেই সে গণতন্ত্রের গুণগান শুরু করে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে তাকে বলে গণতন্ত্রের প্রেমিক। গণতন্ত্র প্রেমের জন্য সে মাঝে মাঝেই ঝামেলায় জড়ায়।

গত বছর ডেলফিতে গিয়ে চেরোফোন আলাপ করছিল মিশরের এক লোকের সাথে। এক ঘণ্টা আলাপ করেও ঐ লোককে বোঝাতে পারেনি, কীভাবে এথেন্স চলছে।

লোকটি বলছিল, ধুর, কী সব অদ্ভুত কথা বলো তোমরা! গণতন্ত্র আবার কী জিনিস! যতসব আজগুবি কাহিনি! পৃথিবীর নিয়ম হলো দেবতার নির্দেশে একজন রাজা হবে, তার কথা সবাই মানবে। আর তুমি বলছো, এথেন্সে কোনো রাজা নেই? সাধারণ মানুষ দেশ চালায়? সব মানুষ মিলে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি কিছু হলো? সেখানে কে কাকে মানে? গরু মানে গাধাকে, নাকি গাধা মানে গরুকে? নদীর জল আর ঘটির জল কি এক হলো? চাষি আর বিচারক কি এক রকম সিদ্ধান্ত দিতে পারে? অদ্ভুত, বড়ই অদ্ভুত!

চেরোফোন রেগে বলেছিল, চলো, এক্ষুনি এথেন্সে চলো। নিজের চোখে দেখে যাও গণতন্ত্রী এথেন্স কত সুন্দর! কত সমৃদ্ধ!

লোকটি বিশ্বাস করেনি। সে এথেন্সে আসেও নি। শুধু এথেন্সের বাইরের লোকই নয়, এথেন্সের ভেতরের অনেক লোকও গণতন্ত্র পছন্দ করে না। তাদের মধ্যে চেরোফোনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মানুষ সক্রেটিস একজন। প্রিয় বন্ধু সক্রেটিস গণতন্ত্র পছন্দ করেন না। এটি ভাবলেই চেরোফোনের কষ্ট হয়। সে দুটি জিনিসের ভক্ত। এক. সক্রেটিস আর দুই. গণতন্ত্র। কিন্তু সক্রেটিস আর গণতন্ত্রের মধ্যে ঝামেলা আছে। সক্রেটিস গণতন্ত্র নিয়ে সন্দিহান। তার সন্দেহ দূর করতে চেরোফোন মাঝে মাঝেই তাকে নিয়ে আসতে চায় পিনিক্স পাহাড়ে।

পিনিক্স পাহাড় এথেন্সের সংসদ। গণতন্ত্রের কেন্দ্র। এক্রোপলিসের পশ্চিমে অল্প দূরে এই পাহাড় সব সময় লোকে লোকারণ্য। সেজন্যেই এর নাম পিনিক্স পিনিক্স কথাটার মানে ভিড়ের জায়গা। ছোট্ট পাহাড়ের উপর ছয় হাজার মানুষ জমা হয়। লোকে গিজগিজ করে। চ্যাঁচামেচি, চিৎকার, কোলাহল এমন যে সারা এথেন্স থেকে শোনা যায়। সবাই বোঝে সংসদে অধিবেশন চলছে।

এথেন্সের ধনী এবং মধ্যবিত্ত মানুষের কোনো কাজ নেই। তাদের সব কাজ করে দাসেরা। ধনীদের হাতে অফুরন্ত সময়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তারা চলে আসে পিনিক্স পাহাড়ে। এই পাহাড়ের ঢালে পাথর কেটে কেটে গ্যালারির মতো বসার জায়গা আছে। সেখানে বসে সামনে তাকালেই দেবী এথিনার মন্দির। যেন সেখানে যা কথা হয়, দেবী শুনতে পান। সেখানে খোলা আকাশের নিচে মন্দিরের দিকে মুখ করে সবাই বসে। দেবীকে সাক্ষী রেখে নগরীর বিষয়ে আলাপ শুরু হয়। আলাপ এক সময় বক্তৃতা হয়ে যায়। ঝড়ের মতো যুক্তি দিয়ে বক্তৃতা। আবেগে বুক ভাসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চলে বক্তৃতা। বক্তৃতা করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়, তখন সবাই ভোট দেয়। এভাবে সকল নাগরিক সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এটিই এথেন্সের গণতন্ত্র।

এই মুহূর্তে এথেন্সের গণতন্ত্রের সুদিন চলছে। শহরে শান্তি আছে। মানুষ ধনী হচ্ছে। শিক্ষিত মানুষেরা গণতন্ত্র নিয়ে গর্ব করে। তারা বলে এই গণতন্ত্রে সবাই সমান। এখানে মুচির পাশে বসেছে সৈনিক, দাস বেপারীর পাশে ডাক্তার, নাবিকের পাশে চামড়ার কারবারি— সব এক সারিতে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়। সবার এক ভোট। সবাই হাত তুলে ভোট দেয়।

সক্রেটিস গণতন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে না। যত সব আদিখ্যেতা। পিনিক্স পাহাড়ে আসতে তার ইচ্ছে করে না। এর আগে দুবার এসেছিল। কোনোবারই ভালো লাগেনি I

পিনিক্স পাহাড়ে শুধু পুরুষ নাগরিকরা আসতে পারে। নারীদের স্থান এই গণতন্ত্রে নেই। এথেন্সের নারীরা থাকবে ঘরের মধ্যে। বাইরের জীবন তাদের জন্য নয়। দাসদেরও কোনো স্থান নেই গণতন্ত্রে। শুধু আঠারো বছরের বেশি পুরুষরাই এখানে আসতে পারে।

সক্রেটিস এসেছে পিনিক্স পাহাড়ে। নিজের ইচ্ছায় আসেনি। চেরোফোন জোর করে নিয়ে এসেছে। গণতন্ত্র নিয়ে সক্রেটিসের সন্দেহ দূর করতে তাকে নিয়ে এসেছে চেরোফোন। লোকজন আসতে শুরু করেছে। সক্রেটিসের বয়স আঠারোর বেশি। সে চাইলেই ভোটও দিতে পারবে। কিন্তু সে কোনোদিন ভোট দেননি। এই ছেলেখেলা তার ভালো লাগে না। আজও ভোট দেবে না। সে শুধু দেখনেওয়ালা। দেখতে এসেছে এখানে কীভাবে কী হয়।

তারা দূরে এক কোনায় গিয়ে বসল।

চেরোফোন বলল, ওই তো পেরিক্লিস। একেবারে সামনেই তার আসন।

সক্রেটিস বলল, কিন্তু তিনি মাথায় হেলমেট পরে আছেন কেন! এটি পরে তো লোকে যুদ্ধে যায়। উনি কি শিরস্ত্রাণ পরে বক্তৃতা দেন?

চেরোফোন বলল, পেরিক্লিসের মাথাটা শরীরের চেয়ে বেশ বড়। তাই মাথা ঢেকে রাখেন।

সক্রেটিস বলল, অদ্ভুত, এত বড় নেতা, অথচ মাথা ঢেকে রাখতে হয়!

এবার হেসে উঠল চেরোফোন। বলল, মজা করেছি। তুমি তো এদিকে আসো না, তাই জানো না। পেরিক্লিস সেনানায়ক। তাই এখানেও সৈনিকের পোশাক পরে এসেছেন।'

'সৈনিকের পোশাক মেনে নিলাম। তাই বলে হেলমেট পরে সংসদে? বিদেশি কেউ দেখলে ইজ্জতের ফালুদা হয়ে যাবে। বলবে ঐ দেখ, হেলমেট পরে বসে আছেন এথেন্সের গণতন্ত্র।'

একটি পাথরের উপর বড় পেপিরাস কাগজের টুকরা লাগানো। তাতে লেখা আছে আজ সংসদে কী কী বিষয়ে আলোচনা হবে। পাঁচশ জনের একটি পরিষদ ঠিক করে আলোচনার বিষয়। সংসদের আজকের বিষয় দুটি। এক. জলপাই তেল আরও বেশি করে বিদেশে বিক্রি করা হবে কিনা। দুই. স্পার্টার রাজার চিঠি নিয়ে আলোচনা।

প্রথমে জলপাই তেল নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। একজন প্রস্তাব দিলেন। কয়েকজন পক্ষে বললেন। আবার কয়েকজন বিপক্ষে বললেন।

এবার ভোট। ভোট দিতে সবাই লাইন ধরে আগাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে দুটো করে পাথরের ছোট চাকতি। চাকতির মাঝখানে ছিদ্র থাকলে সেটি 'না' ভোট। আর ছিদ্র না থাকলে সেটি 'হ্যাঁ' ভোট। ভোটাররা হ্যাঁ বা না ভোটের একটি চাকতি মাটির পাত্রে ফেলবে। মাটির পাত্রটি হলো ব্যালট বাক্স। পাশের অন্য একটি পাত্রে বাকি পাথরটি রেখে দেবে।

ভোটাররা সবাই পাথরের মাঝখানে দুটো আঙুল দিয়ে ছিদ্র ঢেকে রেখেছে। এতে কোন ভোট দিচ্ছে, সেটি অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। সবাই পাত্রের মধ্যে পাথরের চাকতি ফেলল। সেগুলো গণনা করে ফলাফল জানাবে। হ্যাঁ ভোট জিতলে আরও বেশি করে জলপাই বিদেশে বিক্রি করতে পারবে। না ভোট জিতলে জলপাই বিক্রি বাড়ানো যাবে না।

সক্রেটিস বেশ মজা নিয়ে দেখছে। সে ভাবছে এই যে এত ভোটার। কতজন জলপাই তেল বিক্রির বিষয়টি বুঝতে পারছে? তারা কি বুঝে ভোট দিচ্ছে?

হঠাৎ চেরোফোন বলল, আমার কিন্তু একটি ভোট দিতে ইচ্ছে করছে।

সক্রেটিস জিজ্ঞেস করল, কী ভোট দিবে, হ্যাঁ নাকি না?

'তা তো জানি না। একটি দিলেই হলো।'

সক্রেটিস চমকে উঠল, বলো কী? এটি একটি ফয়সালা। কতটুকু জলপাই তুমি ঘরে রাখবে আর কতটুকু বিদেশে বিক্রি করতে পারবে, সেই সিদ্ধান্ত। অনেকের জীবন-মরণ

ব্যাপার। যারা জলপাই তেল বানায়, তাদের জন্য খুবই জরুরি। আর তুমি আন্দাজে হ্যাঁ-না কিছু একটা দিয়ে দেবে?

চেরোফোন রাগ করে বলল, তোমার কি মনে হয় যারা ভোট দিচ্ছে, তারা সবাই হিসাব করতে পারছে, কোনটাতে তাদের লাভ?

চেরোফোনের কথা মিথ্যে নয়। মানুষ আনন্দে ভোট দিচ্ছে। যেন উৎসব। দেখে মনে হচ্ছে না, সবাই বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াস। সক্রেটিসের মনে হলো এটি ঠিক হচ্ছে না, দেশ শাসনকে ছেলেখেলা বানিয়ে দিচ্ছে। যার যা ইচ্ছে ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে।

এতক্ষণে দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। স্পার্টার সাথে এথেন্সের বিদেশনীতি। এটি নিয়ে বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন পেরিক্লিস। ধীরে অথচ গম্ভীর একটি স্বরে তিনি শুরু করলেন,

'এথেন্সের ভাইয়েরা।'

তিনি কথা বলামাত্র পিনিক্স পাহাড় নিশ্চুপ। একটু আগে সবাই চিৎকার করছিল। বক্তৃতার মাঝেই না না বলে রব তুলছিল। কিন্তু পেরিক্লিসের ভরাট গলা শুনে সবাই চুপ। একেবারে পিনপতন নীরবতা।

সক্রেটিস ফিসফিস করে বলল, লোকটার মাথা বড়। বড় মাথায় বেশি বুদ্ধি। সবাই কেমন চুপ করে গেছে।

পেরিক্লিস বলছেন, ভাইয়েরা, স্পার্টার চিঠি আপনারা পড়েছেন। সারা গ্রিসের মধ্যে একদিন স্পার্টা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। এখন এথেন্সই ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী নগর। আমরা এখন সব নগরের নেতা। অর্থ বলুন আর অস্ত্র বলুন, সব দিক দিয়েই আমরা স্পার্টাকে হারিয়ে দিয়েছি। স্পার্টার রাজার দূত বলছে তারা এখন আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়। তা তো চাইবেই। বড়লোকের বন্ধুত্ব কে না চায়! আমরা স্পার্টাকে বলব, না, এখন আর মৈত্রীর দরকার কী! এখন এথেন্স সারা পৃথিবীর নেতা হতে চলেছে। আমরা সবাইকে পথ দেখাই। স্পার্টাকেও পথ দেখাব। স্পার্টা এথেন্সের অধীনে আসুক। আপনারা কী বলেন?

সবাই এক বাক্যে বলল, হ্যাঁ।

'এর বিপক্ষে কেউ আছেন?'

কেউ হাত তুলল না।

এটি নিয়ে আর ভোট দরকার নেই। পেরিক্লিসের প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। সক্রেটিস বললেন, এই রাজনৈতিক আলাপ আর সহ্য হচ্ছে না। মাথা ধরে যাচ্ছে। তার চেয়ে চলো তোমাকে আজ এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে এমন কাঠখোট্টা বক্তৃতা নয়, সেখানে আনন্দও আছে।

চেরোফোন বলল, 'কোথায়?'

'চলোই না।'

‘আগে বলো কোথায়।’

‘এথেন্সে নতুন একজন মেয়ে এসেছে। তুমি তাকে দেখোনি। ইউরিপিডিস দেখেছে। একদিন থিয়েটারে তার সাথে ঝগড়া করেছে। মেয়েটির নাম আসপাশিয়া।’

‘কোথায় থাকে?’

‘কেরামেকাস।’

‘কেরামেকাস? সেখানে তো কোনো ভদ্র পরিবার থাকে না।

‘কেরামেকাস অভদ্র পল্লি। কিন্তু আসপাশিয়া অভদ্র নয়। সে খুবই ভদ্র মেয়ে।’

‘ভদ্র মেয়ে হলে কি কেরামেকাসে থাকে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, সক্রেটিস। কী বলছো তুমি? আমরা জ্ঞানপ্রেমী। আমরা কেরামেকাসে যাব? জানাজানি হলে মান-সম্মান থাকবে না।’

চেরোফোন ভয় পাচ্ছে। তার পিতাও তাকে সক্রেটিসের কাছ থেকে দূরে সরাতে চাপ দিচ্ছে। এখন যদি শোনে যে সক্রেটিস তাকে কেরামেকাসে নিয়ে গেছে, তাহলে আর রক্ষা নেই।

সক্রেটিস বলল, আসপাশিয়া অসাধারণ জ্ঞানী। এমন জ্ঞানী নারী এথেন্সে আর একজনও নেই। তার মুখে দর্শনের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি।

‘দর্শনের কথা? একজন নারীর মুখে?’

‘জ্ঞানের জগতে ছেলে-মেয়ে ভেদ নেই। তুমি চলো। ওখানে সব আছে, নাচ আছে, গান আছে, সুরা আছে। তুমি যা চাও সবই পাবে।’

‘বয়স কত ঐ নারীর?

‘আমার বয়সী।’

‘সক্রেটিস, সাবধান। মান-সম্মান হলো কচু পাতার পানি। একটু নাড়া লাগলেই শেষ।’

‘আরে বন্ধু, আমি সেখানে যাই তার কথা শুনতে। আমি তার গুণমুগ্ধ। এথেন্সে অমন নারী আর একজনও নেই। দেখে নিও, এই মেয়েটি একদিন অনেক বিখ্যাত হবে।’

চেরোফোন বলল, ‘সক্রেটিস, এথেন্স হলো জ্ঞানের শহর। এখানে পথে পথে সফিস্টরা ঘোরে। সারা পৃথিবীর জ্ঞানপ্রেমীরা এখানে আসে। সফিস্টদের সাথে জ্ঞানের আলাপ না করে, তুমি যাচ্ছ আসপাশিয়া নামের এক মেয়ের কাছে?

‘ওই সফিস্টরা পয়সাখোর। টাকা নিয়ে জ্ঞান দেয়। তারা জ্ঞানপ্রেমী নয়, টাকাপ্রেমী। আমি ওদের একদম সহ্য করতে পারি না। জ্ঞান টাকার জন্য নয়।’

‘তা, এই আসপাশিয়া বুঝি পয়সা নেবে না।’

‘আমার কাছ থেকে নেবে না। আমি তো জ্ঞানের আলাপ করতে যাই। তাই সে আমাকে পছন্দ করে। আমি তো তার প্রণয়ী নই। আমি তার কাছে রূপ চাই না। সে আমার কাছে নারী নয়। যুবতি নয়। সে আমার কাছে একজন মানুষ। সে একজন জ্ঞানী মানুষ। এখানে টাকা-পয়সার কারবার নেই।’

‘আর একবার ভেবে দেখো। পরে পস্তাবে।’

‘তুমি চলো। আমাকে বিশ্বাস করে কেউ ঠকেনি।’

‘এখুনি যেতে হবে?’

‘হুঁম, এখানে রাজনীতির আলাপে আমার হাত-পা জ্বালা করছে। ওঠো।’ সক্রেটিস জোর করে চেরোফোনকে নিয়ে চলল কেরামেকাসের দিকে।

কেরামেকাস।[৪০]

আগোরার দক্ষিণে এথেন্সের দেয়ালের ঠিক বাইরে খুবই ঘিঞ্জি এলাকা। এটি এথেন্সের কুমোরপাড়া। মাটির হাঁড়ি-পাতিল বানানো হয়। পাহাড়ের ঢালে ছাদখোলা ঘরগুলোতে দিনরাত আগুন জ্বলছে। চরকা ঘুরছে। কুমোররা কাঁচা মাটি ছানছে। পোড়াচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল মাটির পিপে, তৈজসপত্র, গৃহস্থালী আর মনোহারি জিনিস।

এথেন্স থেকে শুধু দুটো জিনিস বিদেশে বিক্রি হয়— জলপাই তেল আর সুরা। এই দুটো জিনিস রাখতেই দরকার হয় বড় বড় মাটির পাত্র। এই পাত্র তৈরি হয় কেরামেকাসে। কেরামেকাসের মাটির পাত্র পৃথিবী বিখ্যাত। জাহাজে করে সারা পৃথিবীতে যায়। কেরামেকাস এথেন্সের শিল্পাঞ্চল।

তবে শুধু মাটির পাত্র নয়, এখানে অন্য কিছুও আছে। কেরামেকাস এথেন্সের প্রধান গণিকাপল্লি। সবাই এক নামে কেরামেকাসকে চেনে। এখানের নারীদের কেউই এথেন্সের নয়। সবাই বিদেশি, আশপাশের নগর থেকে এসেছে।

মারাত্মক রকমের অভদ্র পল্লি কেরামেকাস। এখানে আর যাই থাক, জ্ঞানের কোনো কথা নেই। জ্ঞানের জন্য কেউ কেরামেকাসে আসে না। কিন্তু সক্রেটিস যাচ্ছে। জ্ঞানের সন্ধানেই চেরোফোনকে নিয়ে কেরামেকাসে যাচ্ছে সক্রেটিস।

মাঝপথে ক্রিতোর সাথে দেখা। তাকে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এমনিতেই ক্রিতোর বাবা ক্রিতোকে মারধর করেন। তার ওপর যদি শোনে ছেলে কেরামেকাসে যায়, তাহলে আর উপায় থাকবে না। কিন্তু না বুঝেই ক্রিতোও তাদের সাথে হাঁটা ধরেছে কেরামেকাসের পথে।

একটি দোতলা বাড়ির সামনে থামলেন সক্রেটিস। উপরে তাকিয়ে বলল, ঐ ঘরে থাকে আসপাশিয়া।

আসপাশিয়া জন্মেছিল এজিয়ান সাগরের ওপাড়ে মিলেটাস নামক এক শহরে। খুবই অল্প বয়সে তার বাবা-মা মারা যায়। তারা তিন বোন, কোনো ভাই নেই। আসপাশিয়া সবার ছোট। ভীষণ বিপদের দিনে এথেন্সের এক ধনীর পছন্দ হয় তার বড় বোনকে। বড় বোনকে বিয়ের পর সে তিন বোনকেই এথেন্সে নিয়ে আসে। তখন আসপাশিয়া অনেক ছোট।

আসপাশিয়া এমন কিছু গুণ নিয়ে জন্মেছে, যা সাধারণ মেয়েদের থাকে না। সে সবকিছু পালটে দিতে চায়। দিন বদলের ইচ্ছা তার প্রবল। তার মধ্যে ফিনিক্স পাখির গুণ আছে। সে ধ্বংসের ভেতর থেকে নতুন সৃষ্টি করতে চায়। সে লেখাপড়া শিখেছে।

পৃথিবীকে জেনেছে। গান শিখেছে। সে বুঝতে পেরেছে রূপের বাইরেও তার একটা কিছু আছে, যেটি অন্য মেয়েদের নেই। সে চাইলে সুন্দর একটি বক্তৃতা লিখে ফেলতে পারে। সে কথা বললে সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে।

সে স্বাধীন মেয়ে। বড় হয়ে আর বোনের সংসারে থাকেনি। কিন্তু এথেন্সে একা মেয়ে কোথায় থাকবে? তার ওপর বিদেশি। সে বাসা ভাড়া নেয় কেরামেকাসে। এখানে ছাড়া অন্য কোনো পল্লিতে বিদেশিদের বাসা ভাড়া দেওয়া হয় না। সেখানে সে জ্ঞানের চর্চা করে, সংগীত, কবিতা নিয়ে থাকে। তার মতো মেয়েকে বুঝতে এথেন্সের দেরি হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যেই সে এই শহরের সবচেয়ে আলোচিত নারী সক্রেটিস, ক্রিতো আর চেরোফোন তিন বন্ধু সামনের ঘরে বসে আছে। আসপাশিয়া ভেতরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ফাঁকা আসন আছে। কিন্তু আসপাশিয়া বসছে না।

আসপাশিয়াকে দেখে চেরোফোনের মাথা ঘুরে গেছে। এত সুন্দর মানুষ হয়! সে সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির কথা শুনেছে। কিন্তু দেখেনি কখনই। আফ্রোদিতিকে সংক্ষেপে দিতি দেবী বলে। চেরোফোনের মনে হচ্ছে দিতি দেবীকে আর দেখার দরকার নেই। তিনি কিছুতেই এই মেয়ের চেয়ে রূপবতী হবেন না। তখন দেবীর প্রতি ভক্তি উঠে যাবে।

এথেন্সে মেয়েরা বাইরে আসতে পারে না। তাই এখানের যুবকেরা সারা দিনে কোনো মেয়ে দেখতে পায় না। সেজন্য মেয়ে দেখলে ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়। চেরোফোন কী করবে বুঝতে পারছে না। তার চোখ পিটপিট করছে। বাঁকা চোখে দেখছে আসপাশিয়াকে।

সক্রেটিস আসপাশিয়াকে বলল, আজ বন্ধুদের নিয়ে এসেছি। এই দুষ্ট চেরোফোন বিশ্বাসই করে না যে, একজন নারীও জ্ঞানী হতে পারে।

আসপাশিয়া বলল, ওর আর দোষ কী! জন্মের পর থেকেই যা দেখেছে, তাই তো ঠিক মনে করবে। ঠিক না চেরোফোন?

চেরোফোন যে আড়চোখে আসপাশিয়াকে দেখছে, সেটি ধরা পড়ে গেছে। সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে অ্যা অ্যা করে বলল, কী, কী নিয়ে যেন কথা হচ্ছে!

আসপাশিয়া বলল, তেমন কিছুই নয়, মেয়েদের মাথায়ও ঘিলু-টিলু কিছু আছে কিনা ঐ বিষয়ে।

চেরোফোন বলল, ছিঃ ছিঃ, আমি সেভাবে বলিনি। সক্রেটিস মিথ্যা বলেছে। আশপাসিয়া বলল, তোমাদের দোষ নেই। তোমরা তো এসব দেখেই বড় হয়েছ। এথেন্সে একটি মেয়ে সাত বছর হলেই ঘরে বন্দি। বাইরে যেতে পারে না। বছরে দু-একটি অনুষ্ঠানে শুধু মন্দিরে যেতে পারে। আর থিয়েটারে যেতে পারে। এছাড়া এথেন্সের নারীদের জন্য ঘরের বাইরে কোনো জায়গা নেই। চার দেয়ালেই তার জীবন। তোমরা ভাববে কী করে যে নারীরাও জ্ঞানী হতে পারে!'

চেরোফেন বলল, না না, আমার সেই ভুল ভেঙে গেছে।

'কী করে ভুল ভাঙল?'

'আপনাকে দেখে। এমন রূপ যার, সে জ্ঞানী না হয়ে পারে? রূপের টানেই জ্ঞান চলে আসবে। আপনি অবশ্যই জ্ঞানী। মহাজ্ঞানী।'

'রূপের টানে জ্ঞান চলে আসবে?'

'হুঁম। আমি এখন কান দিয়ে আপনার জ্ঞানের কথা শুনব আর চোখ দিয়ে আপনাকে দেখব।'

'ওহ, তোমার কান আর চোখ হলেই হবে? মনের কোনো দরকারই নেই? ইশ, বিধাতা তোমাকে ভুল করে মন দিয়ে ফেলেছে।'

চেরোফোন এমন মুগ্ধ হয়ে গেছে যে আসপাশিয়ার খোঁচাও বুঝতে পারছে না। সে গদগদ গলায় বলল, 'আমি ভাবতে পারছি না। আমার সামনে এক দেবী বসে আছে। না না। ভুল বলেছি। আমার সামনে এক শরীরে দুই দেবী সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি আর জ্ঞানের দেবী এথিনা।'

সক্রেটিস দেখল সর্বনাশ। চেরোফোন যা শুরু করেছে, তাতে আসপাশিয়ার কাছে মান-ইজ্জত কিছুই থাকবে না। সে চেরোফোনের দিকে একেবারে বজ্র দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু হাঁদা চেরোফোন কিছু বুঝতে পারলো না। সে বলেই যাচ্ছে। হাঁদাটা সব মাটি করে দিচ্ছে। এক্ষুনি বিষয় পাল্টাতে হবে।

সক্রেটিস বলল, চেরোফোন আমরা আসপাশিয়ার কাছে এসেছি জ্ঞানের কথা শুনতে।

চেরোফোন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুরু হোক। সুন্দর মুখে সুন্দর কথা। রূপ দেখব আর জ্ঞান শুনবো।

আসপাশিয়া চেরোফোনের দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু জনাব, রূপ বা জ্ঞান কোনটাই আজ হবে না। তোমাকে আরেক দিন আসতে হবে।

এরপর সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে বলল, সক্রেটিস, আজ এখানে একজন অতিথি আসবেন। বিশিষ্ট অতিথি। তোমরা তাকে চেনো। আজ তোমাদের সময় দিতে পারছি না। আমি সুরা পাঠিয়ে দিচ্ছি, না খেয়ে যেও না কিন্তু আসপাশিয়া ভেতরের ঘরে চলে গেল।

হতভম্ব হয়ে গেছে সক্রেটিস। আসপাশিয়া তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে! অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করছে? তাদেরকে চলে যেতে বলছে? সে কত বড় বড় কথা বলে বন্ধুদের নিয়ে এসেছে। আর আজই আসপাশিয়া এমন অপমান করল! সক্রেটিসের উচিত এক্ষুনি বের হয়ে যাওয়া। কিন্তু অপমানে পা সরছে না

সুরা নিয়ে ঘরে ঢুকল এক দাসী। তার মুখে মিষ্টি হাসি। হাতে সুরাপাত্র। পোড়ামাটির পাত্রটির উপর সুন্দর কারুকাজে লেখা— 'আমাকে নাও'। সক্রেটিসের ইচ্ছা করছে, এক্ষুনি পাত্রটি নিয়ে ভেঙে টুকরা টুকরা করে ফেলতে।

চেরোফোনের মুখে কিন্তু হাসি লেগেই আছে। তার অপমান লাগেনি। আসপাশিয়ার রূপে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। সে এক ভাঁড় সুরা তুলে নিল 1

চেরোফোনকে সুরা নিতে দেখে সক্রেটিসের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল সুরা খেতেই হবে? জীবনে সুরা দেখেনি? সে চেরোফোনের হাত থেকে সুরার ভাঁড় কেড়ে নিয়ে টেবিলে রাখল।

দাসীটি দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ফিক করে একটি হাসি দিল।

ক্রিতো এতক্ষণ কিছুই বলেনি। এবার সে উঠে দাঁড়াল। সক্রেটিসের কথায় এখানে এসে কী অপমানটাই হলো না! দাসীও ব্যঙ্গ করছে। ক্রিতো এক হাতে সক্রেটিসের অন্য হাতে চেরোফোনের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। দুই শয়তানকে ঘর থেকে টেনে বের করতে হবে।

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন পেরিক্লিস।

পেরিক্লিসকে দেখে তারা তিনজনেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল আসপাশিয়ার বিশিষ্ট অতিথি তাহলে পেরিক্লিস! তাদের মুখ হা হয়ে গেছে। এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে। পেরিক্লিস তাদেরকে দেখেছেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই তারা হুড়মুড় করে বের হয়ে গেল।

বের হয়েই চেরোফোন বলল, ঘটনা বুঝেছ? আসপাশিয়ার বিশিষ্ট অতিথি হলেন পেরিক্লিস। সে আমাদের মতো পুঁচকে ছেলেদের পাত্তা দেবে কেন? তার ঘরে এখন এথেন্সের সবচেয়ে বিশিষ্ট অতিথি পেরিক্লিস।

পেরিক্লিসকে দেখে সক্রেটিসের রাগ কমে গেছে। সে কাহিনিটা ধরতে পেরেছে। দুয়ে দুয়ে চার মিলেছে। পেরিক্লিস যেদিন আসপাশিয়ার ঘরে আসবে, সেদিন যে আসপাশিয়া তাদেরকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে সেটিই তো বেশি।

ক্রিতো বলল, কিন্তু পেরিক্লিস এখানে কেন? ওনারও কি মাথা নষ্ট হয়ে গেছে? লোকে দেখলে কী বলবে? ওনার স্বভাব-চরিত্র তো ভালো বলেই জানতাম। ছিঃ ছিঃ। শেষ পর্যন্ত উনিও!

সক্রেটিস বলল, একটু আগে আমরা তো ওখানেই ছিলাম। আমরা কি খারাপ হয়ে গিয়েছি?

'আমরা তো জ্ঞানের জন্য গিয়েছি।'

'আর পেরিক্লিস কিসের জন্য গিয়েছেন?'

'তা তো জানি না। '

'না জেনে বলা কি ঠিক হচ্ছে?'

সক্রেটিসের দিকে তাকাল ক্রিতো। একটু আগেই কী অপমানটাই না করল আসপ্পাশিয়া! সেটি ভুলে গেল সক্রেটিস? এখন তার হয়ে ওকালতি করছে।

ক্রিতো বলল, পেরিক্লিসকে দেখে তুমি মনে হয় খুশি হয়েছ?

সক্রেটিস বলল, হুঁম, খুশি হয়েছি। পেরিক্লিস আসলেই ধুরন্ধর। অতি চতুর লোক। তিনি ঠিকই আসপাশিয়াকে খুঁজে বের করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী নারীটিকে খুঁজে পেয়েছেন পেরিক্লিস। এই দুজনের মতো ভালো জুটি আর সম্ভব নয়। তোমরা দেখো, পেরিক্লিস অনেক বড় নেতা হবেন। তোমাদের গণতন্ত্রের সুদিন আসছে।

'কিন্তু সক্রেটিস, তুমি ভুলে গেছো যে পেরিক্লিস বিবাহিত। তার দু দুটো সন্তানও আছে।'

'অ্যাঁ, তাই তো!'

'আরও আছে। আসপাশিয়া তো এথেন্সের কেউ নয়। সে বিদেশি। আমরা বলি মেটিক। এথেন্সের নিয়মে পেরিক্লিস তাকে বিয়ে করতে পারবেন না। তাকে নিয়ে কী করবেন পেরিক্লিস?'

'তাহলে তো বিরাট ঝামেলা হবে।'

চেরোফোন বলল, ঝামেলা একটু হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পেরিক্লিস জীবনে বড় কোনো ভুল করেননি। এবারও করবেন না। দেখো, তিনি ঠিকই কোনো না কোনো পথ বের করবেন।

ক্রিতো বলল, পেরিক্লিসের পথ উনিই বের করবেন। কিন্তু সক্রেটিস আজ আমাদের কুপথে নিয়ে যাচ্ছিল। কানের পাশ দিয়ে তীর গেল। তামি কান ধরলাম। জীবনে কোনোদিন কেরামেকাসে আসব না।

***

৪০. প্রাচীন এথেন্সের শিল্প নগরী, এখানে মৃৎশিল্প তৈরি হতো। গ্রিকদের মৃৎশিল্পী বা কুমারদের দেবতার নাম Kerameus, তার নাম থেকেই নগরের নাম Kerameikos (কেরামেকোস)। এই কেরামেকোস থেকেই সিরামিকস শব্দটি এসেছে।

১২

'আগে ঠিক করো তুমি কী পেতে চাও,
তারপর যা কর,
ওটা পাওয়ার জন্যই করো।'
— ইপিকটেটাস

আসপাশিয়া খুব বেশি সাজুগুজু করেনি।

হালকা সাদা পোশাক। গলা থেকে ঝুলছে একটি লাল উত্তরীয়। চুলে হাল্কা সুগন্ধি। খোঁপায় ছোট্ট একটি মালা। তাকে মন্দিরের সাধিকার মতো লাগছে। যেন পবিত্র কোনো কাজে যাচ্ছে।

সকাল থেকে সে খুশি। মহাখুশি। খুশিতে বাকবাকুম বাকবাকুম করছে। খুব ভোরে এক দাস এসে খবর দিয়ে গেছে, আজ বিকেলে পেরিক্লিস আসবেন। সেই থেকে আসপাশিয়া উড়ছে। কিছুতেই তার মন বসছে না। সে এই দিনটার আশায়ই ছিল। তার এথেন্সে আসা সার্থক হতে চলেছে।

পেরিক্লিস চোখ বন্ধ করে আছেন। আসপাশিয়া কিথারা বাজাচ্ছে। বাজাতে বাজাতে গুনগুন করে গান ধরল। মহাকবি হোমারের লেখা গান—

‘ও গো মা বসুন্ধরা, আমায় তুমি দিলে ঠাঁই
চিরকাল তোমার বুকে সুখে-দুঃখে হেসে-খেলে দিন কাটাই।
গাছে গাছে সুমিষ্ট ফল, মাঠে মাঠে ভরা ফসল
হাসিমুখ শিশু কলকল, তুমি দু’হাত ভরে দিয়েছো সদাই
চিরকাল তোমার বুকে সুখে-দুঃখে হেসে-খেলে দিন কাটাই
আজ সবাই মিলে দুহাত তুলে তোমাকেই সালাম জানাই
চিরকাল তোমার বুকে সুখে-দুঃখে হেসে-খেলে দিন কাটাই।’[৪১]

পেরিক্লিস বললেন, এই গান আগে কতবার শুনেছি! হোমারের পালা শুরু হওয়ার আগে কয়েকজন মিলে গায়। গানের সাথে অনেকে মিলে নাচে, হৈহৈ করে। আমোদ-ফূর্তি চলে। আজ তুমি একা গুনগুন করে গাইলে। মনে হলো গানটা কত গভীর। মনে হলো আমরা সত্যি সত্যি মা বসুন্ধরাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আসপাশিয়া বলল, আজ গান ভালো লেগেছে, কারণ আজকে আপনার কান ভালো আছে। গান শুনতে কান লাগে।

‘আজকে আমার কান ভালো আছে। তো অন্যদিন কান খারাপ থাকে? আমার কান যে ঠসা, সেটি তো জানতাম না।’

পেরিক্লিস রাগ করেছেন। আসপাশিয়ার ভালো লাগল। প্রণয়ের আগে রাগ ভালো লক্ষণ।

সে বলল, ‘ঘটনা হলো, অন্যদিন গান শোনেন সভার মধ্যে। সেখানে আপনি নেতা। আর আমার কাছে আপনি শ্রোতা। গান নেতার কানে এক রকম আর শ্রোতার কানে অন্য রকম। ‘

মেয়েটির আস্পর্ধা দেখে পেরিক্লিস অবাক হচ্ছেন। গলার স্বরে একটি শাসন শাসন ভাব আছে। মেয়েটি তাকে শাসন করছে। কিন্তু সমস্যা হলো পেরিক্লিস কঠোর হতে পারছেন না। কোনো এক অজানা কারণে মেয়েটার শাসন তার ভালো লাগছে। তিনি নতুন কিছু শুনছেন। তিনি সারাদিন চাটুকারদের মধ্যে থাকেন। তিনি যা বলেন সবাই হ্যাঁ-হ্যাঁ করে। চারপাশে সব জি হুজুরের দল। কেউ নতুন কিছু শোনায় না। কেউ প্রতিবাদ করে না। এই মেয়েটি তাকে নতুন কিছু শোনাচ্ছে। মেয়েটির সাহসও আছে। কত সহজে তাকে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে।

আসপাশিয়া বলল, এবার আপনার পালা। এখন আপনি গাইবেন, আমি শুনব 'আমি গাইব? গান?'

পেরিক্লিস কঠিন চোখে তাকালেন। এবার মেয়েটির সাহস সীমা ছাড়িয়ে গেছে। লাই পেয়ে মাথায় উঠে যাচ্ছে।

আসপাশিয়া আবার বলল, 'আমি আপনার মুখে গানই শুনতে চাই। তবে সেটি অন্য রকম গান।'

'অন্য রকম গান?'

'হ্যাঁ, এ গান আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।'

'তাহলে সেটি মনে হয় পেরিক্লিস সংগীত?'

'কাছাকাছি। পেরিক্লিস সংগীত না, সেটি হলো গণতন্ত্র সংগীত।'

পেরিক্লিস কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি তাকিয়ে রইলেন।

'আমি আপনার কাছে এথেন্সের গণতন্ত্রের কথা শুনতে চাই।'

পেরিক্লিসের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গণতন্ত্রের নাম শুনলেই তার রক্তে আলো জ্বলে ওঠে। তিনি ভাবছেন, এই মেয়ে সত্যি গণতন্ত্রের কথা শুনতে চায়? মেয়েরা বলবে ঘরের কথা, প্রেমের কথা। ফিস-ফিস ভিস-ভিস করবে। গান-টান, আঁকা-আঁকি, শিল্প এসব নিয়ে দু'চার লাইন চেষ্টা করতে পারে। তাই বলে গণতন্ত্র! জীবনে এই প্রথম কোনো মেয়ে তার সাথে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলতে চাইছে। তাহলে তিনি ভুল শোনেননি। এই মেয়েটি অন্য রকম।

তিনি আসপাশিয়ার চোখে ভালো করে তাকালেন। সেই চোখে কৌতুক আছে, প্রেম আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে জ্ঞানের জ্যোতি। তাকালেই মনে হয় এই মেয়ে আমার ভেতর-বাহির সব পড়ে ফেলছে, এই মেয়ে সাংঘাতিক ওর চোখে চুম্বক বসানো আছে।

পেরিক্লিস সাবধান হলেন। এত তাড়াতাড়ি বেশি আহ্লাদ দেখানো যাবে না। পেরিক্লিস গম্ভীর হয়ে বললেন, গণতন্ত্রের কথা বলতে হবে? কী শুনতে চাও বলো।

'এথেন্সে কীভাবে শুরু হলো গণতন্ত্র— সেই কাহিনি বলুন।'

পেরিক্লিস উঠে দাঁড়ালেন। বক্তৃতা করার মতো দুদিকে তাকালেন। তিনি ভুলে গেছেন, তিনি একটি মেয়ের সাথে একা একলা ঘরে খুব কাছে বসে কথা বলছেন। একা মেয়ের

সাথে কথা হবে নরম-তরম। একেবারে একান্ত কথা। ফিসফিস হলে আরও ভালো হয়। পেরিক্লিস ফিসফিসের ধারে কাছেও গেলেন না।

তিনি গদগদ কণ্ঠে শুরু করলেন, 'শোন, এথেন্স হলো সারা দুনিয়ার আলো। যেদিকে তাকাও— আলো আর আলো। সেই আলোর সবচেয়ে উজ্জ্বল বাতিটির নাম গণতন্ত্র।

এথেন্স গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষ এই এক্রোপলিসের উপর বসে আবিষ্কার করেছে গণতন্ত্র। আমরা গণতন্ত্র কুড়িয়ে পাইনি। কেউ এসে আমাদের বলেনি, এই নাও গণতন্ত্র। সময়ের প্রয়োজনে আমরা নিজেরাই বের করেছি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শাসন— গণতন্ত্র। আমাদের কোনো রাজা নেই। কোনো সম্রাট নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা। আমরা নিজেরাই আমাদের শাসন করি। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর নেই। পৃথিবীর জন্য এথেন্সের এক মহা মূল্যবান দান গণতন্ত্র।'

পেরিক্লিসের কণ্ঠে জোয়ার এসে গেছে। গণতন্ত্রের নাম শুনলেই তার রক্ত নেচে ওঠে। মুখে লাভার মতো কথা আসতে থাকে। অজান্তেই বক্তৃতার মতো হয়ে যায়।

আসপাশিয়ার চোখে চোখ হতেই পেরিক্লিস লজ্জা পেলেন। বললেন, বক্তৃতা হয়ে যাচ্ছে, না?

আসপাশিয়া বলল, বক্তৃতাই ভালো। আপনার গণতন্ত্রে তো মেয়েরা নেই। আমরা ঘরের বাইরে যেতে পারি না। আমরা বক্তৃতা শুনতে পাই না। আমি কোনোদিন আপনার বক্তৃতা শুনিনি। আপনি এভাবেই বলুন। আমার ভালো লাগছে। সংসদে যেমন করে বলেন, সেভাবেই বলুন।

পেরিক্লিস বললেন, জানো আসপাশিয়া, আমি গণতন্ত্রকে অনেক ভালোবাসি। যতটুকু এথেন্সকে ভালোবাসি, ততটুকুই গণতন্ত্রকে ভালোবাসি।

'আপনাকেও গণতন্ত্র অনেক ভালোবাসে।'

'ওহ, আমাকে শুধু গণতন্ত্রই ভালোবাসে! অন্য কেউ ভালোবাসে না?'

আসপাশিয়া ভাবছে, কী শুনতে চায় পেরিক্লিস? আসপাশিয়া তাকে ভালোবাসে কিনা, সেটি বলার সময় এখনও হয়নি। সে কিছুই বলল না।

দাসী পেরিক্লিসের সুরার পাত্র ভরিয়ে দিল।

আসপাশিয়া বলল, জনাব, একটি কথা আগে বলে নেই। আপনি যেভাবে গণতন্ত্রের গুণকীর্তন শুরু করেছেন, তাতে মনে হয় এখন বলবেন গণতন্ত্র মানে মানুষের তন্ত্র, গণতন্ত্র মানে আইনের শাসন, সেই আইনে সবাই সমান, গণতন্ত্র মানে কথা বলার অধিকার— এরকম হিজিবিজি বহুত কিছু। আমি আগেই বলেছি, এগুলো আমি জানি। আর খুব ভালো করে মানি। আমিও গণতন্ত্রের ভক্ত। আপনি যেমন গণতন্ত্রের প্রেমিক, আমিও তেমনই গণতন্ত্রের প্রেমিকা। তাই আমাকে এসব ধানাই-পানাই বলার দরকার নাই। আমি শুনতে চাই গল্প। কে গণতন্ত্র চালু করল? কবে, এথেন্সের ঠিক কোন জায়গায়, কেমন করে গণতন্ত্র এলো। আপনি সেই গল্প বলুন।

পেরিক্লিস বললেন, তুমি তো বহুত ঝামেলাবাজ। এমন করে দিনক্ষণ ধরে কেউ বলতে পারে? বড় ফ্যাসাদে ফেলে দিলে।

আসপাশিয়া বলল, আপনি ছাড়া মার কেউ বলতে পারবে না। যেটুকু পারার আপনিই পারবেন। শুরু করুন।

পেরিক্লিস বললেন, এই গল্প অনেক লম্বা। বলা শুরু করলে রাত ফুরিয়ে যেতে পারে। তখন রাতটা নির্ঘুম কাটাতে হবে।

আসপাশিয়া বলল, তাহলে এই রাতের একটি নাম দেই। নাম হোক— 'গণতন্ত্রের চাদরের উপর একটি নির্ঘুম রাত।

পেরিক্লিস শুরু করলেন গণতন্ত্রের জন্মের গল্প:

তিনি বললেন, আমরা সবাই তো হোমারের ইলিয়াড বইটির কথা জানি। হোমার ইলিয়াড শুরু করেছেন কীভাবে?

আসপাশিয়া বলল, ইলিয়াডের শুরুটা হলো এভাবে: ট্রয়ের যুদ্ধ চলছে। একিলিস মারাত্মক রাগ করেছে রাজা আগামেমননের ওপর। রাজার ওপর রাগ করে একিলিস চলে যাচ্ছে। সে যুদ্ধ করবে না।

এথেন্সের সবার হোমারের ইলিয়াড আর অডিসি মুখস্থ। শুধু মুখস্ত নয়, একেবারে ঠোঁটস্থ। ছোটবেলা থেকে এরা তোতাপাখির মতো হোমার পড়ে।

পেরিক্লিস বললেন, 'ঠিক বলেছ। বীর একিলিস রাজার আদেশ মানেনি। সে রাজার অধীনে যুদ্ধ করেনি। সে নিজেকে স্বাধীন মনে করত। এথেন্সের প্রত্যেকটি ছেলে মনে করে, সে একজন একিলিস। ছেলে সন্তান জন্ম নিলে আমরা আশীর্বাদ করি— একিলিসের মতো হও। তো বীর একিলিস যেমন তার রাজাকে মানেনি, আমরাও কোনো রাজা-রানি মানি না। আমরা অনেক দিন আগেই রাজা-রানি বাতিল করে দিয়েছি।

রাজা-রানি বাতিল হওয়ার পরে কিছু ধনী মানুষের একটি কমিটি শাসন করত এথেন্স। অল্প কয়েকজন ধনীর শাসনকে পণ্ডিতেরা বলে অভিজাততন্ত্র। ধনীদের শাসনে ধনীরাই আরও বেশি ধনী হয়, গরিবরা হয় আরও গরিব। তো ধনী-গরিব ঝগড়া শুরু হলো। মারামারি কাটাকাটি অবস্থা। তখন ঠিক হলো আইন লিখতে হবে। পাথরে লিখে শহরের কোনায় কোনায় বসিয়ে দিতে হবে আইন। তাহলে মানুষ সহজে আইন জানবে। জানলে নিজে থেকেই আইন মানবে। শহরে শান্তি আসবে। আইন লেখার দায়িত্ব দেওয়া হলো একজনকে। তার নাম ড্রেকো[৪২]।

ড্রেকো হচ্ছে ইউরোপের প্রথম আইন প্রণেতা। সে আইন লিখল। কিন্তু লোকটার কিছু বাতিক ছিল। সে ভুল সহ্য করতে পারত না। সে ভাবতো— মানুষের কোনো ভুল থাকতে পারবে না। মানুষ হবে পাথরের দেবতার মতো নির্ভুল। ড্রেকো ছোটখাটো সব দোষের জন্য শাস্তি লিখল 'মৃত্যুদণ্ড'। একটি বাঁধাকপি চুরির শাস্তি— ফাঁসি। কাজে ফাঁকি দিলে পরদিনই ফাঁসি। ছোট বড় সব দোষের জন্য ফাঁসি।

আসপাশিয়া বলল, কাজে ফাঁকি দিলে ফাঁসি? ওই আইন থাকলে, প্রতিদিন আমার তিনবার করে ফাঁসি হতো। মাঝে মাঝে আমি সারাদিন শুয়ে থাকি। আমার জন্য ফাঁসির দড়ি নিয়ে জল্লাদ আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত।

পেরিক্লিস হাসলেন।

আসপাশিয়া আবার বলল, মানুষ ড্রেকোকে জিজ্ঞেস করেনি যে, সব অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড কি কারণে হবে?

'হুঁম, জিজ্ঞেস করেছিল। ড্রেকো জবাব দিয়েছিল, আমি ভাবলাম এমন আইন করব যাতে সবাই ভয় পায়। কেউ আর অপরাধ করতে সাহস না পায়। প্রথমে ছোট অপরাধের শাস্তি পাথরের উপরে লিখে ফেললাম 'মৃত্যুদণ্ড'। যখন বড় অপরাধের শাস্তি লিখতে চাইলাম, তখন দেখি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে বড় আর কোনো শাস্তি নেই। অতগুলো পাথরে লেখা হয়ে গেছে, পাথরগুলো নষ্ট করব? তাই ছোট-বড় অপরাধের জন্যও মৃত্যুদণ্ডই থাকল। আফসোস, মৃত্যুদণ্ড খুবই ছোট শাস্তি। এর চেয়ে বড় কোনো শাস্তি থাকলে, বড় অপরাধের জন্য সেটিই দিতাম।'

আসপাশিয়া বলল, এই লোক তো উন্মাদ। মহা উন্মাদ। এজন্যই লোকে বলে, ড্রেকোর আইন কালি দিয়ে লেখা হয়নি, লেখা হয়েছিল রক্ত দিয়ে।

পেরিক্লিস বললেন, তুমি তো দেখি সবই জানো!

'না, আমি সব জানি না। টুকরা-টুকরা জানি। সব জানেন আপনি। বলতে থাকেন। আর কোনো থামাথামি নেই। সামনে পুরো রাত। রাতের নাম— গণতন্ত্রের চাদরের উপর একটি নির্ঘুম রাত।'

আসপাশিয়ার উচ্ছ্বাস পেরিক্লিসের ভালো লাগছে।

সুরা পাত্রে চুমুক দিয়ে পেরিক্লিস আবার শুরু করলেন—

'ড্রেকোর আইন পাথরে খোদাই করে সারা এথেন্সে বসিয়ে দেওয়া হলো। চালু হলো ভয়াবহ সেই আইন। শুরু হলো মৃত্যুদণ্ড। কারণে অকারণে মৃত্যুদণ্ড। ছোটখাট দোষ বেশি করে গরিবরা। ফাঁসিও হতে থাকল তাদের। অল্প-স্বল্প ঋণের জন্য সন্তানদের বিক্রি করে দিতে হলো দাস বাজারে।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন! এক সময় গরিবরা ক্ষেপে উঠল। ধনীরা দেখল সর্বনাশ। এই আইন না পাল্টালে ধন-প্রাণ সবই যাবে। ভালো আইন করতে হবে। সেজন্য একজন ভালো ও যোগ্য মানুষ দরকার। এমন কাউকে দরকার যাকে ধনীরাও পছন্দ করে, আবার গরিবরাও কাছের ভাবে। তারা এক বৃদ্ধকে খুঁজে পেল। তার নাম সলোন[৪৩]।

সলোন উচ্চ বংশের সন্তান। কিন্তু তার পিতা শেষ বয়সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান। সলোন খুবই কষ্টে পড়েন। তিনি একেবারে শূন্য থেকে আবার শুরু করলেন। তিনি গরিবদের সাথে মিশে ব্যবসা শুরু করলেন। তার ব্যবহার ছিল খুবই মিঠা। অল্পদিনেই গরিবদের দোস্ত হয়ে গেলেন। জাহাজ ভাসিয়ে দিলেন ভূমধ্যসাগরে। দেশ বিদেশ ঘুরতে

লাগলেন। লাফিয়ে লাফিয়ে ব্যবসাও হতে লাগল। আবার ধনী হয়ে গেলেন সলোন। মানুষ হাতে পয়সা পেলে গরিব বন্ধুদের ত্যাগ করে। ইজ্জতের গায়ের গরিবীয়ানার ছোঁয়া মুছে ফেলে। ভোল- চাল পাল্টে ফেলে। কিন্তু সলোন সেটি করেননি। তিনি গরিব বন্ধুদের ভোলেননি। তাই তিনি ধনী-গরিব সবারই ভালোবাসার মানুষ।'

আসপাশিয়া বললেন, সলোন তো অনেক বড় কবিও ছিলেন। তার অনেক কবিতা পড়েছি।

পেরিক্লিস অবাক হয়ে বললেন, তুমি সলোনের কবিতাও পড়েছ?

আসপাশিয়া বলল, তার লেখা একটি কবিতা আমার অনেক প্রিয়-

'প্রতিদিন বয়স বাড়ে
প্রতিদিন নতুন কিছু দেখি
পুরনো সূর্য ওঠে নতুন করে
প্রতিদিন আমি নতুন কিছু শিখি'[৪৪]

পেরিক্লিস বললেন, তো ভালোমানুষ সলোনকে এথেন্সবাসী ধরল। নগরে শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ধনী-গরিব দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে হবে। প্রস্তাব শুনে সলোন বললেন, না না, আমি কবি মানুষ। বুড়ো হয়ে গেছি। মাফ করো ভাই।

কিন্তু না, মাফ করা যাবে না। এথেন্সে তখন সলোন ছাড়া গীত নেই। সবার মুখে সলোন। যেন তার হাতেই জাদুর পিদিম। ঘষা দিলেই শান্তি আসবে। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। তিনি একটি ব্যবস্থা করবেন। তবে দুটি শর্তে। প্রথম শর্ত— সবাইকে কথা দিতে হবে, তিনি যে ব্যবস্থা দেবেন, সবাই মেনে নেবে। কোনোরকম গাঁইগুঁই চলবে না। দ্বিতীয় শর্ত— তিনি যা করবেন, সামনের দশ বছর সেটির কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

সবাই বলল, জো হুকুম। শুধু দুইটা কেন, হাজারটা শর্ত দিলেও আমরা রাজি। আপনি এথেন্সকে বাঁচান।

তো সলোন হলেন নগর কমিটির প্রধান। সভার পর সভা হতে লাগল। এথেন্সের নতুন আইন চাই। এমন আইন যাতে ধনীও খুশি, গরিবরাও অখুশি নয়। সলোন নিজে অঢেল সম্পদ আর ভয়াবহ দারিদ্র্য দুটোই খুব কাছে থেকে দেখেছেন। ধনী-গরিব দুই দলের চাওয়া-পাওয়াই তিনি বুঝতেন। তিনি গরিবদের সাথে বসলেন। ড্রেকোর আইনের কারণে অনেক গরিব অতি তুচ্ছ কারণে মৃত্যুদণ্ড পাচ্ছিল। সলোন ড্রেকোর আইন বাতিল করলেন।

আসপাশিয়া বলল, রক্ষা করেছেন আমাকে। না হলে, ঘরে শুয়ে থাকার জন্য আজই আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিত। আচ্ছা, সলোন নাকি দাস প্রথাও বাতিল করেছিলেন?

'না, বাতিল করেননি। দাস না থাকলে এথেন্স চলবে কী করে? তিনি দেনার দায়ে সন্তান বিক্রি বাতিল করেছেন।'

‘কী রকম?’

‘তখন এথেন্সে সন্তান ছিল পিতার সম্পত্তি। টাকার দরকার হলে ছেলে- মেয়ে বিক্রি করা যেত। তো কিছু গর্দভ কোনো কাজ করত না, সারা দিন বসে বসে মদ খেত। মদের টাকা জোগাতে ধার করত। একদিন আর ধার শোধ করতে পারত না। তখন বলত, যাও, আমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাও। আজ থেকে ওরা তোমার দাস। ওদের নিয়ে আমাকে দেনার থেকে রেহাই দাও। এই গর্দভদের পথে আনতে সলোন ঘোষণা করলেন, আজ থেকে সন্তান আর পিতার সম্পত্তি নয়। আর কেউ ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে পারবে না। দেনার জন্য যারা দাস হয়েছে, তারা এখন থেকে মুক্ত। ভবিষ্যতেও দেনার দায়ে আর কাউকে দাস করা যাবে না।’

আসপাশিয়া বলল, তাহলে এজন্যই এখন এথেন্সের নাগরিকরা কেউ দাস হয় না। এথেন্সের সকল দাস বিদেশি।

আসপাশিয়ার বুদ্ধি দেখে পেরিক্লিস অবাক হচ্ছেন। তার কিছুটা ভয়ও লাগছে। প্রেমিকা হবে বোকা বোকা, নাকি নাকি সুরে কথা বলবে। গাল ফুলিয়ে এটি ওটা চাইবে। পুরুষের মনে হবে আমি এই মেয়ের প্রভূ। আমি ছাড়া এর কোনো গতি নেই। তাহলেই পুরুষ সুখী হবে। প্রেমেও শান্তি আসবে। আর এই মেয়ের বুদ্ধি এত বেশি? এর সাথে প্রেম জমবে না।

পেরিক্লিস আবার শুরু করলেন, সলোন গরিবদের জন্য অনেক কিছু করলেন। তিনি সকল ঋণ মাফ করে দিলেন। ঘোষণা করলেন এই মুহূর্তে যার কাছে যত ঋণ আছে, সব মওকুফ। কারও কাছে আর কেউ দেনা নেই। সবাই নতুন করে জীবন শুরু করো। গরিবরা জানাল, ধনীরা বেশি দামে সব ফসল বিদেশে বেচে দেয়। এতে খাবারের দাম বেড়ে যায়। দুর্ভিক্ষ হয়। গরিব মানুষ না খেয়ে মরে। সলোন আইন করলেন, শুধু জলপাই ছাড়া আর কিছুই বিদেশে বিক্রি করা যাবে না।

আসপাশিয়া বলল, বুদ্ধি ছিল লোকটার। তিনি নাকি উচ্চ বংশের সুযোগ- সুবিধা বাতিল করে দিয়েছিলেন?

পেরিক্লিস বললেন, ‘হ্যাঁ, তখন সরকারি চাকরিতে শুধু উচ্চবংশের লোকজন থাকত। তারা হলো অভিজাত। তাদের রক্ত নীল। শুধু তারাই শাসন করবে। বাকি সব শাসিত হবে। সলোন বললেন, ‘এই ব্যবস্থা বাতিল। সবাই সব রকম চাকরি পাবে।’ অভিজাতরা বেজার হলো। তারা বলল, ‘এত বড় আস্পর্ধা! নীল রক্তের মান রাখতে আমরাও যুদ্ধ করতে পারি।’

সলোন দেখলেন বিপদ। উচ্চ বংশের মানুষের রাগও উচ্চে উঠে যাচ্ছে। তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে। এমন ব্যবস্থা করছি যাতে সাপ মরবে, কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। ঘোষণা করলেন, এখন থেকে সরকারি চাকরিতে উচ্চ বংশের জন্য কোটা থাকবে না। কিন্তু ধনী-গরিব থাকবে। চাকরি ভাগ হবে মানুষের টাকা- পয়সা অনুসারে। তিনি সম্পদ

অনুসারে এথেন্সবাসীকে চারটি দলে ভাগ করলেন। সবচেয়ে ধনী দুই দল উচ্চপদে বসতে পারবে। আর নিচের পদগুলো সবার জন্য।'

আসপাশিয়া বলল, কিন্তু যার বেশি টাকা সে উচ্চ পদে— এমন আইন গরিবরা মানলো?

পেরিক্লিস বললেন, না, ধনী বা গরিব কেউই মানলো না। তখন সলোন এথেন্সের আসল ব্যবস্থাই পাল্টে ফেললেন। এগুলো একটু জটিল, সহজে বলা যায় না।

আসপাশিয়া বলল, হোক জটিল। আমি জানি আপনার চেয়ে সহজ করে অন্য কেউ বলতে পারবে না।

পেরিক্লিস মুচকি হেসে বললেন, সলোন এবার নগর শাসনের প্রধান কমিটিই পাল্টে ফেললেন। তখন এথেন্সে একটিই নগর কমিটি ছিল। এর নাম আরিওপেগাস (Areopagus)। রাজাদের মন্ত্রিসভার মতো এটি। এই কমিটিই সব সিদ্ধান্ত নিত। এই কমিটিতে শুধু উচ্চ বংশের লোক থাকত। অভিজাতদের খুশি রাখতে সলোন এই কমিটি শুধু উচ্চ বংশের জন্যই রাখলেন। কিন্তু এর ক্ষমতা কমিয়ে দিলেন। এরা শুধু বিচার করবে আর নামে মাত্র প্রধান হবে। আসল ক্ষমতা এদের থাকবে না। আসল ক্ষমতার জন্য নতুন আর একটি কমিটি বানালেন। সেটির নাম দিলেন বোলি (Boule)। এই কমিটির সদস্য হবে অন্যভাবে। এথেন্সের মানুষদের চারটি জাতি ছিল। চার জাতি থেকে একশ করে মোট চারশো জন হবে এই কমিটির সদস্য। এরাই শাসন করবে এথেন্স। তবু একটি সমস্যা রয়ে গেল। নগর কমিটির প্রধান ছিলেন নয়জন। এদের বলে আরকন। তখন পর্যন্ত এরা সবাই উচ্চ বংশের হতো। সলোন নতুন উপায় করলেন। বললেন, এথেন্সের চার জাতি প্রত্যেকে দশ জন করে চল্লিশ জনের নাম দেবে। এই চল্লিশ জন থেকে লটারি করে নয়জন প্রধান বাছাই করা হবে।

এই 'লটারি' বিষয়টা একেবারে নতুন আবিষ্কার। সলোন বললেন, লটারি হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেবী এথিনা যার কপালে লিখেছেন, তার নামই লটারিতে উঠবে। এতে কে প্রধান হবে কেউ আগে জানবে না। তাতে ঘুষ, দুর্নীতি কমবে। সলোনের নতুন আইনে ধনী-গরিব কেউই খুশি হয়নি। কিন্তু দুই পক্ষই অনিচ্ছায় মেনে নিয়েছে। সলোন কবিতা দিয়ে সকলকে বোঝালেন। শোন—

'দরিদ্ররে দিয়েছি অধিকার, নিদেনপক্ষে যতটুকু দরকার
হ্রাস-বৃদ্ধি করিনি সম্মান
ধনীরাও সুখে থাক অতি লোভ দূরে যাক
এথেন্সে কারও হবে না অপমান।'[৪৫]

সলোনের আইন চালু হলো।

পরদিন সংসদে একটি টকটকে লাল পোশাক পরে এলেন সলোন। এমন পোশাক তিনি কখনো পরেন না। বেশ-ভূষায় তিনি সাদাসিধা মানুষ। কিন্তু আজ একেবারে ঝাকানাকা পোশাকে এসেছেন। তিনি সংসদে বক্তার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

লোকজন ফিসফিস করছে লোকটা আবার কী চায়! কয়েক বছর ধরে তো পরিবর্তনের নামে অনেক ঘ্যান ঘ্যান করছে। অনেক পরিবর্তন হইছে। নতুন কী চায়! নতুন আবার কী মতলব?

সলোন ধীরে ধীরে বললেন-

প্রিয় এথেন্সবাসী, আপনারা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটি জাহাজ চালানোর। সেই জাহাজের নাম এথেন্স। আমি জাহাজকে পথে এনেছি। পাল ও তুলে দিয়েছি। এখন জাহাজ চলবে। আপনারা চালাবেন। আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি এক্ষুনি নগর পরিষদের প্রধান থেকে ইস্তফা দিলাম। আমি আজই এথেন্স ছেড়ে চলে যাব। দেবী এথিনা আপনাদের মঙ্গল করুন।

সবার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। লোকটা বলে কী! এত ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবে? এমন বোকা মানুষ হয় নাকি?

সলোন পিরাউস বন্দরের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। তার কাজ শেষ হয়েছে। তিনি চিরতরে এথেন্স থেকে চলে যাবেন। জাহাজ নিয়ে বের হবেন সাগরে। ভেসে ভেসে দুনিয়া দেখবেন। তাকে বিদায় দিতে এথেন্সের পিরাউস বন্দরে চলে এসেছে সারা এথেন্সের মানুষ। সবার চোখে পানি। সলোনের চোখেও পানি। জাহাজ ছেড়ে দেবে। তিনি হাত নেড়ে বিদায় নিচ্ছেন। এমন সময় পেছনে চিৎকার শোনা গেল। ঘোড়ায় চড়ে একজন চিৎকার করতে করতে আসছে। লোকটি বলছে, থামো, থামো। সলোন জোচ্চুরি করেছে। ওকে যেতে দিও না। আটকাও। ও একটি চোর। মহাচোর।

সলোন জাহাজ থামাতে বললেন।

ঘোড়ার সওয়ার বলল, সলোন আইন করে সকল ঋণ বাতিল করেছেন। আসলে উনি মতলব করে টাকা চুরি করেছেন।

ভিড়ের লোক জিজ্ঞেস করল, কীভাবে টাকা চুরি করেছেন?

অভিযোগকারী বলল, গত সোমবার ওনার কয়েকজন বন্ধু অনেকের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নেয়। পরদিনই সলোন ঘোষণা করেন, আজ থেকে এথেন্সের সবার ঋণ মওকুফ। কেউ কারও কাছে আর কোনো টাকা পাবে না। তারপর ওনার বন্ধুরা আর কাউকে টাকা ফেরত দেয়নি। সেই টাকা নিয়ে উনি চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছেন।

সবাই লোকটিকে বলল, তোর কথা বিশ্বাস করি না। সলোন দেবতুল্য মানুষ। তার নামে নিন্দা করিস। এক্ষুনি তোর বিচার হবে।

সলোন ঘোড়ার মর্দকে ডাকলেন। বললেন, এসো, তুমি নিজে জাহাজ ভালো করে খুঁজে দেখো। আমি টাকা নিলে সেটি জাহাজেই থাকার কথা!

ঘোড়ার মর্দ জাহাজে উঠল। সারা জাহাজ তন্ন তন্ন করে দেখল। জাহাজে অনেক মালামাল। কিন্তু নগদ অর্থ নেই।

সলোনের হিসাব রক্ষক বলল, সলোনের হাতে এখন নগদ আছে মাত্র বিশ মিনা। তার আর কোনো টাকা নেই। তার সব টাকা অন্যরা ধার নিয়েছে। এখন আর কেউ ফেরত দেবে না। নতুন আইনে সব দেনা মওকুফ হয়ে গেছে।

সলোন আবার হাত তুলে বললেন, তোমরা এই ঘোড়-সওয়ারকে কিছু বোলো না। ও যা বলেছে সেটি সত্য। দোষ আমার।

'আপনার দোষ?'

'হ্যাঁ, যখন ঋণ মাফ করার চিন্তা মাথায় আসে, খুব আনন্দ হয়েছিল। আনন্দে কয়েকজনকে আমার সিদ্ধান্তের কথা বলেছিলাম। তার মধ্যেই দু'একজন এই দুষ্ট বুদ্ধি করেছে। তারা অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। আমার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে। আমাকে নিঃস্ব করেছে। তারা আমার বুদ্ধিতে আমাকেই ঘায়েল করেছে। তারা সাংঘাতিক কুটিল। একেবারে চতুর শিরোমণি। আমি তাদের ক্ষমা করলাম। কিন্তু অন্য যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করা হবে না। আমাকে বলো, আমি সব শোধ করে দিচ্ছি।'

'আপনার কাছে তো টাকাই নেই।'

'টাকা নেই কিন্তু আমার জাহাজে অনেক জলপাই তেল আছে। তেল বিদেশে নিয়ে যাচ্ছি বিক্রি করতে। সেখান থেকে সবার দেনা শোধ করা যাবে। বলো কে কত টাকা পাবে?'

ঘোড়ার সওয়ার খুব লজ্জা পেল। সলোনের টাকা সে নিতে পারে না। সে বলল, আমি আপনাকে জোচ্চোর বলেছি। ভুল করেছি। মহাভুল। আমাকে মাফ করুন।

সলোন বললেন, উত্তেজনায় মানুষ অনেক কিছু বলে। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তবে কটু কথা সব সময়ই বিপদ আনে। দেবী এথিনা কটু কথা পছন্দ করেন না। শোন, একটি কবিতা শোন। এটি এথেন্সে আমার শেষ কবিতা—

'ভালো মানুষের ভাঙা ঘর, দুষ্টের গোলা ভরা
তবু ভাঙা ছাদেই নিশিরাতে উঁকি মারে তারা
টাকা-পয়সা দুই দিনের, হাতে-হাতে ঘোরে
গুণ থাকে অন্তরেতে, বুকের ভেতর নড়ে।'[৪৬]

সলোনের জাহাজ ভেসে চলল দূর দেশের দিকে। এথেন্স ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে থামলেন পেরিক্লিস। আসপাশিয়া সলোনের উদ্দেশ্যে সালাম জানাল।

আসপাশিয়া বলল, তাহলে সলোনই এথেন্সে গণতন্ত্র এনেছেন?

পেরিক্লিস বললেন, না, সলোন গণতন্ত্র আনেননি। গণতন্ত্র এসেছে আরও পরে। কিন্তু সলোন যে ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটি আজও আছে। তার বানানো আদালত এখনও আছে। নগর কমিটি মোটামুটি এক রকমই আছে। কিন্তু তিনি গণতন্ত্রের পিতা নন।

'এত কিছু করেও তিনি পিতা নন?'

'না। কারণ তিনি মানুষকে ভাগ করেছেন টাকা-পয়সার বিচারে। তার নিয়মের মূল ছিল সম্পদ। মানুষ নয়। সম্পদের বিচারে চাকরি বণ্টন হতো। এজন্য সলোন গণতন্ত্রের পিতা নন। '

'তাহলে গণতন্ত্রের পিতা কে?'

'তার নাম ক্লিসথেনিস[৪৭]।'

'ও মহান ক্লিসথেনিস? আপনার দাদু।'

'হুঁম, তিনি আমার মায়ের চাচা। তিনিই সবকিছুর কেন্দ্রে নিয়ে আসেন মানুষকে। শুরু করেন মানুষের শাসন। আমরা বলি গণতন্ত্র।'

'সেটি কীভাবে?'

'সেটি বলতে আবার বক্তৃতা শুরু করতে হবে। সেটিও লম্বা কাহিনি।'

'আপনার কপাল খারাপ। আমার মতো সুন্দর মেয়ের সামনে একটু প্রেম- ট্রেমের আলাপ করবেন। সেটি আপনার কপালে নেই। আপনাকে শুধু বক্তৃতা দিতে হচ্ছে।'

পেরিক্লিস বললেন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও গম ভানে। আমি হলাম ঢেঁকি। আমড়া কাঠের ঢেঁকি

'না, না। আমড়া কাঠের ঢেঁকি নন, জলপাই কাঠের ঢেঁকি। এথেন্সে আমড়া কাঠ নেই। জলপাই কাঠ আছে।'

পেরিক্লিস মজা করে বললেন, তুমি কি জানো, তুমি কার সাথে মশকরা করছো?

'জি জনাব, আপনি হলেন পেরিক্লিস। গণতন্ত্রের জনক মহান ক্লিসথেনিসের নাতি। তো, নাতি সাহেব, শুরু করুন। বলুন, আপনার দাদু কীভাবে গণতন্ত্র আবিষ্কার করলেন।'

***

৪১. হোমারের Hymn to the Earth: Mother of All, কবি শেলীর ইংরেজি অনুবাদ থেকে আমি কিছু অংশ বাংলা করেছি।

৪২. ড্রেকো (Draco) এথেন্সের প্রথম আইন প্রণেতা, তার নাম থেকেই draconian শব্দটি এসেছে, যার অর্থ খুব নির্মম। খ্রি. পূ. ৬২২/৬২১ অব্দে তিনি এথেন্সের আইন লিপিবদ্ধ করেন।

৪৩. সলোন: Solon, এথেন্সের আইনপ্রণেতা, দার্শনিক ও কবি। সাত জন গ্রিক জ্ঞানীর একজন। এথেন্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার আইন অবদান রেখেছে। তিনি খ্রি.পূ. ৫৯৪ অব্দে এথেন্সের জন্য আইন প্রণয়ন করেন।

৪৪. সলোনের এই কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ছিল 'Each day grew older, and learnt something new'. বিখ্যাত গ্রিক জীবনীকার Plutarch তার 'Parallel Lives' গ্রন্থে সলোনের জীবনী লিখছেন। সেটির ইংরেজি অনুবাদ (Arthur Hugh Clough সম্পাদিত) থেকে আমি এই কবিতাটি বাংলা ভাবানুবাদ করেছি।

৪৫. Arthur Hugh Clough সম্পাদিত Plutarch এর 'Parallel Lives' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ থেকে সলোনের এই কবিতাটি বাংলা ভাবানুবাদ করেছি।

৪৬. Arthur Hugh Clough সম্পাদিত Plutarch এর Parallel Lives' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ থেকে সলোনের এই কবিতাটি বাংলা ভাবানুবাদ করেছি।

৪৭. ক্লিসথেনিস: Cleisthenes, এথেন্সের গণতন্ত্রের জনক, তিনি খ্রি.পূ. ৫০৮ অব্দে এথেন্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩

'রক্ত-রাঙা মিষ্টি একটি আপেল
রয়ে গেছে সবচেয়ে উঁচু ডালে
চেয়েছে অনেকে, পায়নি নাগালে
আজও অনাঘ্রাত, নিবে কি তুলে?'

আসপাশিয়া মিষ্টি করে কবিতাটি বলল। এটি লিখেছেন লেসবস দ্বীপের নারী কবি শাপো[৪৮]। আসপাশিয়া খুবই আবেগ দিয়ে কবিতাটি বলছে। পেরিক্লিস যেন বুঝতে পারেন

কবিতার এই অনাঘ্রাত আপেল সে নিজে।

পেরিক্লিস বোঝার চেষ্টা করছেন। এটি একটি বিখ্যাত কবিতা। প্রেমের জন্য খুবই ভালো। যুবকদের মুখে প্রায়ই শুনা যায় কবিতাটি। তবে এই মুহূর্তে কবিতটি নিয়ে ভাবছেন না পেরিক্লিস। তিনি ভাবছেন কবিকে নিয়ে। এই কবিতার নারী কবি শাপোকে নিয়ে অনেক কানাঘুষা আছে। তাকে নিয়ে গুজবের শেষ নেই। মেয়েরা কিছু লিখলে সেটি নিয়ে এমনিতেই আলোচনা, সমালোচনা হয়। আর কোনো মেয়ে যদি প্রেম নিয়ে লিখে, সেটি নিয়ে পুরুষের কেমন যেন লাগে। তারা কানাঘুষা শুরু করে, কানাঘুষা থেকে তৈরি হয় গুজব। এই কথা কবি শাপো জানতেন না। তিনি মেয়ে হয়েও প্রেমের কবিতা লিখেছেন। একটি দুটো নয়, পুরো এক বই প্রেমের কবিতা।

শাপোর কবিতার বই প্রকাশের সাথে সাথেই শুরু হলো আক্রমণ। একটি মেয়ে প্রেমের কবিতা লিখেছে। মেয়েরা প্রেমের কবিতা কেন লিখবে? প্রেমের কবিতা লিখবে পুরুষেরা। পুরুষেরা মেয়েদের দেখে প্রেমের কবিতা লেখে। প্রেমের কবিতা হলো মেয়েদের উদ্দেশ্যে লেখা। তো কবি শাপো প্রেমের কবিতা লিখেছে, মানে সে মেয়েদের উদ্দেশ্যেই লিখেছে। তার মানে তার কবিতা হলো মেয়ের প্রতি মেয়ের প্রেম। ছিঃ ছিঃ, শাপো এত খারাপ? সে মেয়ে হয়ে মেয়েদের উদ্দেশ্যে প্রেমের কবিতা লেখে? সে মেয়েদের ভালোবাসে? কেউ জানতে চাইল না, শাপো কার জন্য এই কবিতা লিখেছে। সবাই বলল, কবি শাপো ছেলেদের ভালোবাসে না, সে মেয়েদের ভালোবাসে। কবি শাপোর যেখানে বাড়ি, সেই দ্বীপের নাম লেসবস। লেসবস দ্বীপের নাম থেকে মেয়ের সাথে মেয়ের প্রেম বিষয়টির নাম দিল লেসবিয়ান।

ব্যাপারটা ভাবতেই মাথা ধরে যাচ্ছে পেরিক্লিসের। মানুষ এত খারাপ? তারা মেয়েদের কবিতা লিখতেও দেবে না। মেয়েরা কবিতা লিখলেই গ্রিসে নিন্দা হয়। সেই ভয়ে আজ পর্যন্ত গ্রিসে কোনো মহিলা কবি নেই। ভদ্র মেয়েরা কবিতা থেকে দূরে থাকে। তারা কবিতাকে ভয় পায়।

আসপাশিয়ার এই ভয় নেই। সে কেমন সুন্দর করে কবিতাটি আবৃত্তি করছে। পেরিক্লিস যখন শাপোকে নিয়ে ভাবছিল, সেই ফাঁকে আরও একবার কবিতাটি আবৃত্তি করে ফেলেছে সে।

আসপাশিয়া বলল, কবিতার অনাঘ্রাত আপেল কে জানেন?

‘কে?’

‘এথেন্স। আপনার ভালোবাসার এথেন্স। আমি জানি আপনি এথেন্সকে পাগলের মতো ভালোবাসেন। গণতন্ত্রকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।’

কথা মিথ্যা নয়। পেরিক্লিস এথেন্স আর গণতন্ত্রকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। পেরিক্লিস এবার গণতন্ত্র নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। তিনি বুঝতে পারছেন এই মেয়ে তাকে নাচাচ্ছে। কিন্তু কেন যেন নাচতে তার ভালো লাগছে।

আকাশে অনেক তারা। পেরিক্লিস জানালা দিয়ে আকাশে তাকিয়ে আছেন। রাতটা বড়ো সুন্দর। একটু আগেই আসপাশিয়া এই রাতকে বলেছে 'গণতন্ত্রের চাদরের উপর নির্ঘুম রাত।'

একটি মেয়ে খাবার দিয়ে গেছে। ভুট্টার স্যুপ আর ছাগলের পা। হাল্কা মশলা দিয়ে ছাগলের পা কড়া করে ভাজা। এই খাবারের নাম পাইদাকি আসপাশিয়ার খুব প্রিয় খাদ্য। সে নিজে আজ অনেক মমতা দিয়ে রান্না করেছে। পেরিক্লিস ভুট্টার স্যুপ দিয়ে পাইদাকি খাচ্ছেন।

খাওয়া শেষ হলে আসপাশিয়া বলল, গণতন্ত্রের গল্প ভুলে যেতে নাহি দেব। বলুন, আপনার দাদু কীভাবে গণতন্ত্র আবিষ্কার করলেন।

পেরিক্লিস আবার বক্তৃতার মতো করে শুরু করলেন—

সলোনের আইনে অনেক দিন ধনী-গরিব মিলেমিশে ভালোই চলছিল। কিন্তু সেই সময় ভালো কোনো নেতা ছিল না। যেকোনো ব্যবস্থা সুন্দরভাবে চলতে ভালো নেতা চাই। নেতার অভাবে আবার শুরু হলো অশান্তি। সেই অশান্তির ঘোলা পানিতে ক্ষমতা দখল করলেন এক একনায়ক। তিনি অনেক বছর এথেন্স শাসন করেছেন। তিনি ছিলেন মহাধুরন্ধর। সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারতেন। কিন্তু একনায়কদের নিয়মই হলো কয়েকজনে সব লুটে-পুটে খায়। এথেন্সেও তাই হলো। গরিবরা আবার ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল। সলোনের সুন্দর আইন একে একে বাতিল হয়ে গেল।

অনেক বছর শাসন করে একনায়ক মারা গেলেন। তার ছেলে হলো নতুন শাসক। কিন্তু ছেলে অত চতুর ছিল না। সে সামলাতে পারেনি। আবার ঝগড়া শুরু হলো। ক্ষমতা দখলের ঝগড়া। এবার ঝগড়ায় কোনো গরিব মানুষ নেই। ধনীরা কয়েক দলে ঝগড়া করছিল। ঝগড়ায় হেরে গেলেন এথেন্সের সবচেয়ে উচ্চ বংশের ধনী মানুষ ক্লিসথেনিস।

হেরে গিয়ে ক্লিসথেনিস প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্ষমতা না থাকলে প্রাসাদ আর কারাগার সমান। তিনি গেলেন এক্রোপোলিস থেকে অনেক দূরে যেখানে কামার, কুমার, চাষি, মজুররা থাকে। তারা দরিদ্রের চেয়েও দরিদ্র। দিন আনে আর ঐ দিনই খায়। তারা কোনোদিন শাসন-টাসন নিয়ে ভাবে না। ভাবার সময় কোথায়? ভরপেট খাদ্য জোগাতেই দিন শেষ। তাদের কাছে গেলেন ক্লিসথেনিস। সভা ডাকলেন।

হাত তুলে বললেন, ভাইয়েরা আমার।

গরিবরা অবাক। এথেন্সের সবচেয়ে উঁচু বংশের উঁচু মানুষ তিনি। তার মতো মানুষ কোনোদিন এই পাড়ায় আসেন না। আর তিনি তাদের বলছেন, 'ভাইয়েরা আমার'। মিষ্টি করে আপনজনের মতো বলছেন। তার চোখে আবেগ। কণ্ঠে মায়া। ক্লিসথেনিস বললেন, আর কত দিন তোমরা কলুর বলদের মতো খাটবে? তোমরা খাটো আর সব খাটুনির ফসল চলে যায় ধনীদের ঘরে। তোমাদের লাভের চিনি পিঁপড়ায় খায়। তোমাদের কি ইচ্ছা করে না এই ব্যবস্থা বদলাতে?

সভায় উপস্থিত এক বৃদ্ধ বললেন, ব্যবস্থা বদলাতে রাজা হওয়া লাগে। আমাদেরকে রাজা করবে কে? আপনি?

'চাচা, আমি আপনাকে রাজা করতে পারব না। কিন্তু এমন একটি উপায় করতে পারি যেখানে সবাই রাজা।'

'সবাই রাজা? তাইলে প্রজা কে? যতসব আজগুবি কথা!'

'আজগুবি নয়। সম্ভব। আমরা চাইলেই সম্ভব। সলোনের আইনের কথা আপনারা ভুলে গেছেন?'

সলোনের নামটা টনিকের মতো কাজ করল। সলোনের নামে বৃদ্ধের চোখে পানি চলে এলো।

বৃদ্ধ বললেন, সলোনকে আমরা ভুলে যাব? এটি কী বলেন? কালকেও আমার নাতিকে তার গল্প বলেছি। ওই একটি মাত্র লোকই আমাদের মতো গরিবের কথা ভাবছিল। তারপর আর কেউ ভাবেনি। কেউ কিচ্ছু করেনি।

বৃদ্ধ ঝরঝর করে কেঁদে দিলেন। গরিবের আবেগ সরল হয়। তারা অল্পতেই কাঁদে, অল্পতেই হাসে। বৃদ্ধের কান্না দেখে খুশি হলেন ক্লিসথেনিস। চোখে যখন পানি আছে, সাগর বানানো যাবে

তিনি বললেন, মহান সলোনের আইন দিয়েই আমরা নতুন এথেন্স বানাবো। তিনি যা করতে পারেননি, আমরা এবার তাই করব। আমরা এমনভাবে এথেন্স চালাবো যেন আমরা সবাই সমান।

বৃদ্ধ বললেন, বাবা, আপনি বারবার বলছেন 'আমরা'। এই আমরাটা কে? ধনীরা নাকি গরিবরা?

'আমরা মানে সবাই। আমরা মানে আপনি। আমরা মানে তুমি। আমরা মানে আমি। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেব। সবাই কিছুদিন পর পর নেতা হবো। এক বছর এই দিকের কয়েকজন, পরের বছর অন্য কয়েকজন নেতা হবে। এভাবে সব নাগরিক নেতা হবে। কেউ বাদ যাবে না। আমরা সবাই মিলে আমাদের শাসন করব।

'এটি সম্ভব?'

'সম্ভব। সলোনের আইন দিয়েই সম্ভব। আমরা নতুন এথেন্স বানাব যেখানে সবাই সমান। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। সব নাগরিক একেবারে সমান।'

'কামার আর বিচারক সমান? চাষি আর সৈনিক সমান?'

'সমান হবে। আমরা চাইলে অবশ্যই সমান হবে।'

সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। এই লোকের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। কেউ কিছু বলছে না। কিন্তু তাদের চোখ কথা বলছে। চোখে সম্মতি। খুশি হলেন ক্লিসথেনিস। তার উদ্দেশ্যে সফল হবে। এই জনতাকে আর একটু উস্কে দিলেই তারা যুদ্ধে নামবে।

তিনি বললেন, এখন আমরা যদি এক থাকি, তাহলেই মুক্তি। অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি। অন্যায় থেকে মুক্তি। গরিবি থেকে মুক্তি। ঋণের থেকে মুক্তি।

সবাই ফিসফিস করছে, মুক্তি, মুক্তি ...।

সভা শেষে সবাই ঘরে গিয়ে বউয়ের কাছে বলল, শোন বউ। মুক্তি আসতেছে। কাল সকালেই আসতেছে মুক্তি।

বউয়েরা অবাক—'কিসের থেকে মুক্তি?'

'কিসের আবার? গরিবি থেকে মুক্তি।'

'মুক্তি কীভাবে আসবে? হেঁটে হেঁটে?'

'সবুর করো, সকাল হলেই দেখতে পাবে।

পরদিন সকালে ক্লিসথেনিসের সাথে ছুটে এলো চাষি, মজুর, কামার, কুমারের বিশাল দল। আক্রমণ করল এক্রোপলিস। অত্যাচারী চিরকালই ভীরু। মানুষের স্রোত দেখে ধনী, অভিজাত, একনায়ক সব পালিয়ে গেল। সাধারণ মানুষ দখল করল এথেন্স।

সাধারণ মানুষদের নিয়ে এগিয়ে চলল ক্লিসথেনিস। এক্রোপোলিসের উপরে দেবী এথিনার মূর্তির সামনে দাঁড়াল। বিকেলের রোদে দেবীর মূর্তি ঝকঝক করছে। মূর্তির ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে বললেন, ডিমোক্রেসি। গণতন্ত্র।

মজুর, চাষি, কামারসহ সবাই অস্ত্র উঁচিয়ে বলল, ডিমোক্রেসি বা গণতন্ত্র[৪৯]।

সেই মুহূর্তে এথেন্সে জন্ম নিলো গণতন্ত্র। মানুষের শাসন। ক্লিসথেনিস ঘোষণা করলেন, মানুষ বিজয়ী হয়েছে। এখন থেকে সব সিদ্ধান্ত নেবে মানুষ। এথেন্সে মানুষ মানে ডিমোস। তাই নতুন শাসনের নাম ডিমোক্রেসি।

ক্লিসথেনিস নেতা হলেন। নেতৃত্বের স্বভাব হলো নেতারা প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। কিন্তু তিনি ভুললেন না। গরিবদের পক্ষে আনতে সেদিন কথায় কথায় অনেক কিছু বলে ফেলেছেন। সব মানুষ সমান হবে। ধনী-গরিব ভেদাভেদ থাকবে না। কিন্তু কীভাবে? সেটি কি সম্ভব?

অনেক ভেবে উপায় বের করলেন। উপায় হলো লটারি। নেতা হবে লটারি করে। তাহলে সবাই সমান সুযোগ পাবে।

নতুন গণতন্ত্রের জন্য দুটি বিষয় আবিষ্কার হলো ভোট আর লটারি। সকল পদে মানুষ বসবে লটারি করে। আর সকল সিদ্ধান্ত হবে সংসদের ভোটে।

তিনি সলোনের করা সব আইন ফিরিয়ে আনলেন।

এথেন্সের সকল নাগরিক সংসদের সদস্য। প্রতি মাসে দুই দিন সংসদের সভা বসবে। সেদিন যার ইচ্ছা আসবে, ভোট দেবে। কিন্তু সংসদ চালাতে তো পরিষদ লাগবে। সেটি করবে মহামতি সলোনের বানানো নগর পরিষদ (বোলি)। কিন্তু তার সদস্য অন্যভাবে হবে। সলোন নিয়ম করেছিলেন যার টাকা বেশি, সে উচ্চপদে বসবে। এখন আর সেভাবে নয়। এখন সবার জন্য সমান সুযোগ।

এথেন্সে বারো মাসে বছর না, দশ মাসে বছর। প্রতি মাস ছত্রিশ দিন। দশ মাসে দশটি দল যদি নগর পরিষদ চালায় তাতে সুবিধা হয়। সেজন্য এথেন্সের চারটি জাতি বাতিল করে দশটি জাতি করা হলো। প্রতি জাতি থেকে পঞ্চাশজন করে মোট হয় পাঁচশ জন। এই পাঁচশ জন নগর পরিষদের সদস্য। বছরের শুরুতে লটারি করে সবাইকে বাছাই করা হবে।

এতে যেটি দাঁড়াল—পঞ্চাশ জন মানুষ ছত্রিশ দিন নগর চালাবে। এরা সবাই লটারি করে বাছাই করা। এই পঞ্চাশ জনের মধ্যে প্রতিদিন লটারি করে একজন বাছাই করা হয়। সেদিন সে নগর পরিষদের প্রধান। আবার সংসদেরও প্রধান। এই পঞ্চাশ জনই ঠিক করবে কোনোদিন সংসদে কী নিয়ে আলোচনা হবে, কী নিয়ে ভোট হবে। ছত্রিশ দিন পর নতুন পঞ্চাশ জন দায়িত্ব নেবে। তারাও লটারিতে বাছাই করা। নগরের সব কাজে সবগুলো জাতির সমান কোটা। যুদ্ধ লাগলে সবাই সমান সেনা দেবে। যেকোনো কাজে সবাই সমান খরচ দেবে। আদালত, সরকারি পদ সবখানে সবকয়টি জাতি থেকে সমান মানুষ আসবে। এমনকি সামরিক বাহিনীর জন্য সব জাতি একজন করে সেনাপ্রধান দিবে। দশজন সেনাপ্রধান সবসময় উচ্চপদে থাকবেন। সেনাপ্রধান পদটি শুধু লটারি করা হবে না। এটি যোগ্যতা দিয়েই হতে হবে।

এই গণতন্ত্র যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় সেজন্যও ব্যবস্থা হলো। সারা এথেন্সকে একশ ঊনচল্লিশটি এলাকায় ভাগ করা হলো। প্রতি টুকরার নামও ডিমোস। এই ছোট ছোট ডিমোসেও নগরের মতো সংসদ থাকবে, নগর পরিষদ থাকবে। তারা আবার এথেন্সের প্রধান পরিষদে যোগ দেবে। একেবারে কেন্দ্রীয় সরকার আর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। এভাবে নগরের প্রতিটি নাগরিক গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত হবে। কেউ বাইরে থাকবে না।

প্রথমে সংসদ বসত নগরের কেন্দ্র আগোরাতে। বাজারের পাশের ঘাসের উপর লাইন দিয়ে বসত মানুষ। কিন্তু নতুন জিনিসে মানুষের আকর্ষণ বেশি থাকে। এছাড়া নতুন ক্ষমতা পেয়ে গরিব মানুষরা দলে দলে সংসদে আসতে লাগল। আগোরাতে আর জায়গা হয় না। তখন একটু দূরে এক্রোপোলিসের উল্টোদিকে পিনিক্স পাহাড়কে ঠিক করা হলো। পাহাড় থেকে এক্রোপোলিসের উপর দেবী এথিনার মূর্তিও দেখা যায়। দেবীকে সাক্ষী করে নগরের সিদ্ধান্ত হয়। পিনিক্স পাহাড়ের ঢাল কেটে কেটে পাথর বসিয়ে থিয়েটারের মতো বসার জায়গা বানানো হলো। এটিই পৃথিবীর প্রথম সংসদ।

গণতন্ত্র এথেন্সে সুদিন এনেছে। সবাই মনে করছে এই নগর আমার। আমি এই নগরের নেতা। সবাই নেতা। তাই সবাই উৎসাহে কাজ শুরু করল। এথেন্স উন্নত হতে শুরু করল। রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি সবকিছু বদলে যেতে থাকল। যে দেখে সেই বলে এথেন্সে জোয়ার এসেছে। গণতন্ত্রের জোয়ার। এথেন্সের গণতন্ত্র দেখে পাশের শহর মেগারার এক কবি লিখলেন,

‘নগর নগরই আছে, বদলে গেছে মানুষ
আলো এসেছে, মানুষের ফিরেছে হুঁশ।
যারা ছিল অদ্ভুত, যাদের তোমরা বলতে বুর্বক
তারা পেয়েছে অধিকার, তারা হয়ে গেছে শাসক।
যাদের বলতে অভিজাত, মূর্খসব- চলে গেছে দূর-বহুদূর
আজ হতে সবাই সমান, খোল দ্বার, এসেছে নতুন ভোর।’

এত কিছু করা হলো তবু মন ভরে না গণতন্ত্রের।

নতুন নেতারা ভয় পায় এই বুঝি তাদের গণতন্ত্র হারিয়ে যাবে। কে যেন এসে সব বন্ধ করে দেবে। ভয় কাকে? বাইরের কাউকে নয়। নিজেদের মানুষকেই ভয়। যদি নেতাদের মধ্যেই আবার কারও রাজা হওয়ার খায়েশ হয়? ক্ষমতাশালী কেউ যদি গণতন্ত্রকে ছুড়ে ফেলে! এত সাধের গণতন্ত্র হারিয়ে যাবে? সেটি হতে দেওয়া যাবে না। কোনো নেতাকে এত বেশি ক্ষমতাবান হতে দেওয়া হবে না। সেজন্য আরেক উপায়— নির্বাসন[৫০]। মানে নগর থেকে বহিষ্কার। নির্বাসনও দেওয়া হবে গণতান্ত্রিক পথে। মানুষের ভোটে। এর নাম বহিষ্কার ভোট। প্রতি বছর এক বার আয়োজন করা যাবে বহিষ্কার ভোটের। সেদিন নাগরিকরা ভোট দিয়ে কাউকে নগর থেকে বহিষ্কার করবে। পোড়া মাটির উপর যে কারও নাম লিখে একটি পাত্রে ফেলবে। যার নাম সবচেয়ে বেশি উঠবে সে এথেন্স থেকে বহিষ্কার হবে। সারা জীবনের জন্য নয়। দশ বছরের জন্য। এই দশ বছরের মধ্যে সে এথেন্সে ফেরার চেষ্টা করলে, শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

আসপাশিয়া তাকিয়ে দেখে, গণতন্ত্রের কথা বলতে বলতে পেরিক্লিসের চোখ পানি এসে গেছে। এই তো কত অহংকার নিয়ে বক্তৃতার মতো বলছিলেন। হঠাৎ চোখে পানি! সে ছুটে গিয়ে পেরিক্লিসের হাত ধরলো। পেরিক্লিস বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। নির্বাসনের কথা মনে পড়লে আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারি না। এখানে গণতন্ত্র বড় নির্মম

আসপাশিয়া বলল, আমি জানি। এই নির্বাসনের প্রথম শিকার হয়েছিলেন গণতন্ত্রের পিতা ক্লিসথেনিস নিজে। এথেন্সের মানুষ খুব ভালো প্রতিদান দিয়েছে তাকে। সে বৃদ্ধ চোখের জলে এথেন্স থেকে চলে গেছেন। আর ফিরতে পারেননি এথেন্সে।

‘আরও আছে আসপাশিয়া।’

‘আর কে?’

‘এই নিয়মের শিকার হয়েছে আমার বাবা। তাকেও বহিষ্কার করেছিল দশ বছরের জন্য। আমি এতিমের মতো বড় হয়েছি। এখনও চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই, ছোট্ট আমি পিরাউস বন্দরের দিকে আছি। মা বলছেন, কেঁদো না। একদিন ঐ বন্দর দিয়ে তোমার বাবা ফিরে আসবেন। আমি সুযোগ খুঁজতাম। স্কুল থেকে পালিয়ে বন্দরে চলে

যেতাম। সাগরে তাকিয়ে থাকতাম। জাহাজের পর জাহাজ আসত। আমার বাবা আসতেন না।'

আসপাশিয়া শক্ত করে পেরিক্লিসের হাত ধরল। মানুষটি এত নরম। একেবারে নারিকেলের মতো। বাইরে শক্ত, ভেতরে টলটলে। একটু আগেও বোঝা যায়নি।

আসপাশিয়া বলল, সেই কঠিন সময়ই আপনাকে কঠিন বানিয়েছে। তাই আপনি কঠিন নেতা।

'কঠিন নেতা কি এমন করে কাঁদে? দশ বছর পথে পথে ঘুরেছেন আমার বাবা। তাও তিনি এথেন্সকে ভোলেননি। ফিরে এসে আবার এথেন্সের জন্য যুদ্ধ করেছেন।'

আসপাশিয়া চুপ করে আছে। পেরিক্লিসের নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, গণতন্ত্রের লম্বা কাহিনি শুনতে শুনতে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে গেছো।

'না না, মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। যত ভালো লাগবে ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি ভালো লেগেছে। তবে কাহিনি আসলেই অনেক লম্বা। আপনি নাকি এথেন্সের সবচেয়ে লম্বা মানুষ। কিন্তু আপনার কাহিনি আপনার থেকেও লম্বা।'

'তোমাকে এটুকু সময়ে একশ বছরের কাহিনি বলেছি। তবে এটি নিশ্চিত এর চেয়ে মজা করে আর কেউ বলতে পারবে না। '

আসপাশিয়া বলল, 'মজা করে বলেছেন? কই, আপনি তো বক্তৃতা করলেন।'

'ঠিক আছে, ভুল হয়েছে। আর কোনোদিন বক্তৃতা করব না।' বলেই তিনি আবার বক্তৃতার মতো শুরু করলেন:

'শোন আসপাশিয়া, গণতন্ত্রের চেয়ে মহৎ কোনো জিনিস মানুষ আজ পর্যন্ত বের করতে পারেনি। পৃথিবীর সবখানে যার অস্ত্রের জোর আছে, সেই রাজা। শুধু আমরাই বের করেছি যে অস্ত্র নয়, অর্থ নয়, মানুষের ভোটে আমরা নিজেদের শাসন করি। গণতন্ত্রে সবাই সমান। অন্তত একজন চাষির ছেলেও দেশের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। এটি আর কোথাও পারে না। আর একটি মজা আছে। সেটি হলো গণতন্ত্রে যে কাউকে যা খুশি বলা যায়। কথা বলার অধিকার আছে। এথেন্সে আমাকে কত মানুষ গালি দেয়। আমাকে নিয়ে ছড়া বানায়। ব্যঙ্গ করে। গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোথাও এটি সম্ভব নয়। অন্য কোনো দেশে রাজার নামে কিছু বললে, তক্ষুনি ঘচাৎ করে মুণ্ডু কেটে নেবে।

সমাজে শৃঙ্খলা রাখতে শাসন তো লাগবেই। সেজন্য রাজনীতি করতেই হবে। আর রাজনীতির জন্য গণতন্ত্রের মতো এমন সুন্দর জিনিস আর হয় না। গণতন্ত্রে সবাই সমান। গণতন্ত্রে আমি নেতা, রাজা নই। কেউ আমার প্রজা নয়। তারা ভোট দিয়ে আমাকে নেতা বানায়। আগামী কালই আমাকে বাদ দিয়ে সে নিজেই নেতা হতে পারে। এথেন্সে আমরা সবাই রাজা। এমন জিনিস পৃথিবীর আর কোথাও নেই। গণতন্ত্র সবকিছু থেকে সেরা।

আসপাশিয়া হাসতে হাসতে বলল, এর আগে তবু গল্পের মতো বলছিলেন। এবার যেটি বললেন, সেটি একেবারে রাস্তার বক্তৃতা। জনসভার ভাষণ

পেরিক্লিস রাগে নাক ফোঁস ফোঁস করে বললেন, ঠিক আছে আর কোনোদিন গণতন্ত্রের কথা বলব না।

আসপাশিয়া বলল, পেরিক্লিস শুধু দুটি কাজ জানে। 'কোন দুটি কাজ?'

'এক. বক্তৃতা দেওয়া। দুই. মেয়েদের সাথে রাগ করা।'

'আর কিছুই জানি না?

'না।'

এবার পেরিক্লিস রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেললেন।

একটি কথা পেরিক্লিস বলেননি। এই গণতন্ত্রে নারীদের কোনো স্থান নেই। এতে দাসদের কোনো স্থান নেই। বিদেশিদেরও কোনো জায়গা নেই। শুধু আঠারো বছরের চেয়ে বেশি পুরুষরাই এথেন্সের নাগরিক। শুধু তারাই গণতন্ত্রের অংশ।

আসপাশিয়া ভাবছে পেরিক্লিস মনে হয় ইচ্ছে করে মেয়েদের কথা বললেন না। নাকি এটি এমন তুচ্ছ বিষয় যে, বলার দরকার নেই? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আজ থাক। জিজ্ঞেস করলে ঝগড়া লাগতে পারে। যতটুকু ঝগড়া দরকার ছিল, সেটি হয়ে গেছে। কিছু ঝগড়া থাকুক অন্য দিনের জন্য।

পেরিক্লিস বের হওয়ার সময় আসপাশিয়া তার হাতে একটি পেপিরাস কাগজ দিয়ে বলল, এখন খোলা যাবে না।

***

৪৮. প্রাচীন গ্রিসের সবচেয়ে বিখ্যাত নারী কবি শাপো (Sappho), এই কবিতাটি Edwin Marion Cox এর 'The Poems of Shappo' থেকে বাংলা করেছি।

৪৯. ক্লিসথেনিস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন খ্রি. পূ. ৫০৮ অব্দে। কিন্তু ডিমোক্রেসি শব্দটির তখনও ব্যবহার হয়নি। তখন মানুষ 'মুক্তি, ho demos, 1 the people' বলে স্লোগান দিয়েছিল। Democracy শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন নাট্যকার এস্কিলাস তার 'Supplant Women' নাটকে খ্রি. পূ. ৪৬৪/৪৬৩ অব্দে।

৫০. প্রতি বছর পোড়া মাটির টুকরার উপর নাম লিখে একটি ভোট দেওয়া হতো। যার নাম সবচেয়ে বেশি উঠবে সে নির্বাসনে যাবে। পোড়া মাটির টুকরাকে বলে Ostracon, সেটি থেকে এই ব্যবস্থার নাম হয় Ostracism বা নির্বাসন।

১৪

‘দুঃখের রাত বন্ধুহীন হয়।’
—পিনডার

ঘুটঘুটে অন্ধকার।

খুব কাছের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। পেরিক্লিস আসপাশিয়ার ঘর থেকে বের হলেন মুখ ঢেকে। বের হয়েই চট করে গাড়িতে উঠে পড়লেন। গাধায় টানা গাড়ি। আজ তিনি ঘোড়ার গাড়ি আনেননি। এথেন্সে মাত্র বারোজন লোকের ঘোড়ার গাড়ি আছে। পেরিক্লিস

তাদের একজন। তার গাড়ি এথেন্সের সবাই চেনে। তাই ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে কেরামেকাসের মতো নিষিদ্ধ পল্লিতে আসা যায় না।

গোপন চলাচলের জন্য সবচেয়ে ভালো হলো গাধার গাড়ি। গাধার গাড়ি অনেকেরই আছে। হঠাৎ দেখে লোকে সহজে চিনবে না। তাই পেরিক্লিস আজ গাধার গাড়ি নিয়েছেন। গাড়ির চারপাশে পর্দা লাগানো। গাড়ির কোচওয়ানও একদম নতুন। নতুন কোচওয়ানকে এথেন্সের লোক চেনে না। গাড়ির ভেতর জরুরি আলোর ব্যবস্থা আছে। খুব দরকার হলে জলপাই তেলের ছোট্ট কুপি জ্বালিয়ে নিতে হয়। আজকের আসা-যাওয়া গোপন বিষয়। আলো জ্বালানোর কথা নয়। কিন্তু আসপাশিয়া পেপিরাস কাগজে কী লিখেছে সেটি জানার জন্য পেরিক্লিস ছটফট করছেন। তিনি জরুরি কুপি জ্বালালেন।

কী লিখেছে আসপাশিয়া? মনে হয় প্রেমপত্র ধরনের কিছু। চিঠিতে আসপাশিয়া তাকে কী সম্বোধন করেছে? প্রিয়তম, নাকি জনাব? প্রিয়তম শোনার মতো বয়স কি তার আছে? আর জনাব তো তাকে সবাই বলে। আসপাশিয়ার মুখে জনাব মানাবে না! জনাব বড় ভারী শব্দ। সুন্দর মেয়ের নরম মুখে মানায় না।

পেঁচানো পেপিরাস খুললেন পেরিক্লিস। সেখানে প্রিয়তম বা জনাব কোনোটাই নেই। পেপিরাসে প্রথম লাইন বড় করে লেখা—

'এথেন্স: গণতন্ত্র আবিষ্কারের নগর।'

আসপাশিয়া প্রেমপত্র লিখেনি। পেরিক্লিস আজ সন্ধ্যায় যা বলেছেন, আসপাশিয়া মোটামুটি তার একটি সারাংশ লিখে ফেলেছে। এথেন্সের গণতন্ত্র আবিষ্কারের ইতিহাস দুটো পেপিরাস টুকরায় লিখে ফেলেছে আসপাশিয়া।

পেপিরাস টুকরার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন পেরিক্লিস। এই মেয়ে তো অবিশ্বাস্য রকমের মেধাবী। পেরিক্লিস অনেক বড় বড় যুদ্ধ জিতেছেন। সারা পৃথিবীর জ্ঞানী গুণী মানুষের সাথে তার ওঠাবসা। তার বন্ধুরা পৃথিবীর সেরা শিল্পী, সেরা গায়ক, সেরা রাষ্ট্রনায়ক, সেরা দার্শনিক। কিন্তু আজ আসপাশিয়া যা করেছে, সেটি অসাধারণ। এটুকু সময়ের মধ্যে পেরিক্লিসের মুখে শুনে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখে ফেলার মতো মেধাবী মানুষ তিনি দেখেননি। পেরিক্লিস লেখাটা আগাগোড়া দুইবার করে পড়লেন। অপূর্ব। তেমন কোনো কাটা-ছেঁড়া নেই। ছোট ছোট কথায় কত সহজে লিখে ফেলেছে মেয়েটি।

এরকম নারী এই এথেন্সেই আছে? আর পেরিক্লিস সেই নারীর কাছ থেকে দূরে আছেন? না, আর দূরে থাকবেন না। এখনই ছুটে যাবেন। তিনি গাড়োয়ানকে বললেন, গাড়ি ঘুরাও, আবার কেরামেকাসে চলো।

গাড়োয়ান অবাক। পেরিক্লিসের মাথা কি নষ্ট হয়ে গেছে? ঐরকম নিষিদ্ধ জায়গায় আবার যেতে বলছেন। গাড়োয়ান একটু সাহস দেখাল। বলে ফেলল, হুজুর, আজ জোছনা রাত। মানুষে চিনে ফেলবে।

গাড়োয়ানের দিকে তাকালেন পেরিক্লিস। একটি বাধা খুব দরকার ছিল। ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। গাড়োয়ানের কথা মানলেন তিনি। বললেন, ঠিক আছে। বাড়ি চলো। গাড়োয়ান আবার বলল, কুপিটাও নিভিয়ে দিলে ভালো হয়।

এবারও তার কথা মানলেন পেরিক্লিস। এখন তিনি প্রেমিক মানুষ। প্রেমে পড়লে সবার কথা শুনতে হয়।

সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুম হলো না পেরিক্লিসের। অনেকবার বিছানায় গেছেন। কিন্তু ঘুমাতে পারেননি। মস্তিষ্ক বলছে, ঘুম চাই। কিন্তু হৃদয় বলছে, আসপাশিয়াকে চাই। ঘুমও আসেনি, আসপাশিয়াকেও পাননি। এক সন্ধ্যায় তার পৃথিবী বদলে গেছে। আসপাশিয়াকে ছাড়া তার চলবে না। তাহলে তার স্ত্রীর কী হবে? তার নয় বছরের সুখী সংসার। দুটো ছেলে। এই মুহূর্তে স্ত্রী বাবার বাড়ি গেছে। সে ফিরে আসার আগেই কিছু একটা উপায় বের করতে হবে। ভালো কারও পরামর্শ দরকার।

পরামর্শের জন্য তার গুরু এনাক্সাগোরাস আছেন। দার্শনিক মানুষ। মাথা ভর্তি বুদ্ধি। যেকোনো সমস্যায়, একটি না একটি কায়দা সে বের করেই। তার বুদ্ধিতেই পেরিক্লিস নেতা হয়েছেন। পেরিক্লিস গোপনে তাকে মুশকিল আসান গুরু বলেন। কিন্তু সমস্যা হলো এই গুরু মেয়েদের বিষয়ে কিছুই জানেন না। গুরু বিয়ে করেননি। প্রেম তার দুই চোখের বিষ। নারী তার কাছে নরকস্য দ্বার। এই মানুষ আসপাশিয়া বিষয়ে কোনো পরামর্শ দিতে পারবেন?

পেরিক্লিস দোনোমনো করতে করতে গুরুর ঘরে গেলেন। উদ্দেশ্য আসপাশিয়া বিষয়ক সংলাপ। একটু লজ্জা লাগছে। গুরুর কাছে প্রেমের কথা বলা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু গুরুকে কিছুই বলতে হলো না। আসপাশিয়ার খবর তিনি জেনে গেছেন। এথেন্সের সবাই জেনে গেছে। এক সন্ধ্যায়ই এই খবর সবার কাছে চলে গেছে। খবর যত গোপন হয়, তার পাখা তত হালকা হয়, তত তাড়াতাড়ি ওড়ে।

গুরু বললেন, শোন, পেরিক্লিস। মেয়েমানুষ হলো আগুন, পুরুষ হলো ঘি। তো তুমি ঘি হয়ে আগুনের কাছে গিয়েছো, তাই কিঞ্চিৎ গলে গিয়েছো। খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তুমি কোনো লজ্জা কোরো না। লজ্জার কিছুই নেই। সৃষ্টির নিয়মই এই রকম।

পেরিক্লিস চুপ করে শুনছেন।

গুরু মহা উৎসাহ নিয়ে বলছেন, এখন ঘি কতক্ষণ আগুনে পুড়বে, সেটি তোমার বিবেচনা। তুমি তো বোকা ঘি নও, তুমি হলে সুচতুর ঘি। চতুর ঘি বেশিক্ষণ আগুনে পোড়ে না। সময় হলেই ফুৎ করে ফুঁ দেয়। ঝামেলা খতম। তো তুমিও ফুঁ দেও, আসপাশিয়ার কাহিনি এখানেই শেষ।

পেরিক্লিস মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

গুরু আবার বললেন, ফিরে এসো পেরিক্লিস। তুমি ফিরে এসো। তুমি গণতন্ত্রের নেতা। লোকে আদর করে তোমাকে বলে গণতন্ত্রের বরপুত্র। গণতন্ত্র অনেক সাধনা করে তোমাকে পেয়েছে। তোমাকে এথেন্সের ভীষণ প্রয়োজন। এক নারী গেলে শত নারী আসবে।

গুরু তাকে নীতিকথা শোনাচ্ছেন! তাকে শিশুশ্রেণির ছাত্র মনে করছেন? ঘি আর আগুনের তত্ত্ব দিচ্ছেন? গুরুর কাছে আসপাশিয়া বিষয়ে কোনো সমাধান নেই। যিনি সংসার করেননি, তার কাছে সংসার বিষয়ে পরামর্শ করতে আসাই ভুল হয়েছে। এমন কারও সাথে কথা বলতে হবে, যে সংসার করেছে আর সেই সাথে প্রেমিক হিসেবেও যার সুনাম আছে। এমন লোক একজনই আছে এথেন্সে। তার নাম ডেমন।

ডেমন[৫১] এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক। তার সুর একবার শুনলেই মেয়েরা তার প্রেমে পড়ে। এথেন্সের অনেক নারীই নাকি ডেমনের প্রেমিকা। কিন্তু এথেন্সের আইনে মেয়েরা ঘরের বাইরে আসতে পারে না, তাই সেসব প্রেমের কথা মানুষ জানে না।

পেরিক্লিসের খুবই অন্তরঙ্গ মানুষ ডেমন। বয়সে তার থেকে একটু বড়। ছোটবেলায় তার কাছে গান শিখেছেন। গুরুর মতোই ডেমনও তার বিপদ- আপদের সঙ্গী। পেরিক্লিস তক্ষুনি ডেমনকে আনতে দাসকে পাঠালেন। দুই বাড়ি পরেই ডেমনের বাড়ি। দশ মিনিটেই ডেমন হাজির হলেন। ডেমনকে দেখেই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন পেরিক্লিস। চিৎকার করে বললেন, বন্ধু, গণতন্ত্রে আমরা কত বড় বড় কাজ করছি। কিন্তু নারীদের নিয়ে তো কিছুই করতে পারলাম না। নারীদের কোনো দামই নেই আমাদের কাছে।

ডেমন হাসতে হাসতে বললেন, নারীটি কি আসপাশিয়া?

ডেমনও ঘটনা জানেন? কারও জানতে বাকি নেই। আর রাখ-ঢাকের দরকার নেই। ডেমনের হাত ধরে পেরিক্লিস বললেন, বন্ধু তুমিই বলো, আমার কী করা উচিত? আসপাশিয়াকে ছাড়া যে আমার চলবে না।

ডেমন গায়ক মানুষ। একটু গুনগুন করছেন। তার হাতের আঙুলগুলো নড়ছে। গভীর কোনো চিন্তায় পড়লে তার গায়কসত্ত্বা জেগে ওঠে, আঙুলে তাল খেলতে থাকে। নতুন বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত তাল চলতে থাকে। প্যাঁচ খুলে গেলেই আঙুল থেমে যায়। আসপাশিয়ার বিষয়ে প্যাঁচ মনে হয় খুলে গেছে। ডেমনের আঙুল এখন বন্ধ।

তিনি গায়ক। সব সময় সুর তাল ছন্দ মিশিয়ে কথা বলেন। তিনি বললেন, পেরিক্লিস, ধরো, তোমার কাছে দুটি গানের কলি একটি আসপাশিয়া আর অন্যটি এথেন্স। তুমি কোন গানটা গাইবে?

অস্ফুট স্বরে পেরিক্লিস বললেন, দুটোই।

ডেমন বললেন, তাহলে আসপাশিয়াকে তোমার ঘরে নিয়ে আসার সময় হয়েছে।

'কিন্তু কীভাবে? সেই পথ তো আমিই বন্ধ করেছি। দু'বছর আগে আমিই আইন করেছি এথেন্সের কোনো নাগরিক এই নগরের বাইরের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না।

আসপাশিয়া তো এথেন্সের মেয়ে নয়। তার জন্ম মিলেটাস শহরে।

'তুমি নিজের পায়েই কুড়াল মেরেছ।'

'তা তো মেরেছিই। এখন সেই কুড়াল ছুটাব কী করে সেই বুদ্ধি বাংলাও।'

'আইন বদলাও। বলো, এখন থেকে বিদেশি বিবাহ করা জায়েজ।'

'সেটি সম্ভব নয়। সবাই আসপাশিয়ার কথা জানে। বুঝে যাবে যে আমি তাকে বিয়ে করতেই আইন পাল্টাতে চাচ্ছি। কেউ ভোট দেবে না।'

'তাহলে একটিই উপায়।'

'কী উপায়?'

'তোমরা যে বিয়ে করেছ, সেটি মানুষকে জানাবে না।'

'গোপনে বিয়ে করব?'

'তুমি আসপাশিয়াকে ঘরে নিয়ে এসো। তুমি ভাববে পত্নী। আর লোকে ভাববে উপপত্নী। তুমিও খুশি, লোকেও খুশি।'

'এটি সম্ভব?'

'শুধু এটিই সম্ভব। অন্য কিছু সম্ভব নয়। এথেন্সবাসী উপপত্নী মেনে নেবে। কিন্তু পত্নী হিসেবে আসপাশিয়াকে মানবে না।'

মনে মনে খুশি পেরিক্লিস। ডেমন আসলেই একটি জিনিস। প্রেমের প্যাঁচ ছাড়াতে তার মতো আর কেউ নেই। কিন্তু খুশি প্রকাশ করলেন না।

গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার বুদ্ধিতে অর্ধেক প্যাঁচ খুলবে। বড় প্যাঁচটা এখনও বাকি।

'বড় প্যাঁচ কোনটা?'

'আমার তো স্ত্রী আছে। তার কী হবে?'

ডেমনের আঙুলে আবার তাল খেলছে। গভীর চিন্তা করছেন। তার আঙুল চলতে দেখলে পেরিক্লিস ভরসা পান। সমাধান আসবে।

কিন্তু না, সমাধান এলো না। সমাধান আসার আগেই সেখানে এলো ফিডিয়াস। পেরিক্লিসের আরেকজন কাছের মানুষ শিল্পী ফিডিয়াস। তার হাতে এথেন্সের নতুন নকশা। এথেন্সকে সাজাতে তিনি ডিজাইন করছিলেন। আগোরার কোন ভবনের সামনে কী কী মূর্তি বসবে, কোনটা কী রঙের হবে সেসবের নকশা। পেপিরাস কাগজের উপর নানা রঙের আঁকিবুকি।

নকশা বের করতেই ডেমন বললেন, রাখো তোমার আগোরার নকশা। আগে পেরিক্লিসের জীবনের নকশা ঠিক করো।

ফিডিয়াস কিছুই বুঝতে পারছে না। পেরিক্লিসের সংসার দুপুরবেলার সাগরের মতো স্বচ্ছ। বউ আর দুই ছেলে নিয়ে সুখের ঘরকন্না। তাতে কোনো ঝড় আসতে পারে সেটি কেউই ভাবতেই পারে না। শিল্পী ভাবছে, সামনের নির্বাচনে পেরিক্লিস জিততে পারবে কিনা সেটি নিয়ে তারা ভাবছে।

ফিডিয়াস বললেন, মানুষ চোখ বুজে পেরিক্লিসকে ভোট দেবে, এটি নিয়ে কোনো নকশা লাগবে না।

পেরিক্লিস আর ডেমন দুজনেই হেসে উঠলেন। তখন ডেমন শিল্পীকে আসপাশিয়ার ঘটনা বললেন। ঘটনা শুনে শিল্পী একটি পেপিরাসে আঁকিবুকি শুরু করল। মনে হচ্ছে সে সত্যিই পেরিক্লিসের জীবনের ডিজাইন করছে। ভাবভঙ্গি খুব সিরিয়াস। ঘচাঘচ দাগ টেনে তিনজন মানুষ এঁকে ফেলল। বোঝা যাচ্ছে— এরা পেরিক্লিস, তার স্ত্রী এবং আসপাশিয়া। তাদেরকে লাইন টেনে যোগ-বিয়োগ করছে। হঠাৎ বলল, মিলে গেছে, পেরিক্লিসের জীবনের নকশা মিলে গেছে। আর একজন মানুষ লাগবে।

ডেমন বললেন, আর একজন মানুষ দিয়ে কী হবে।

শিল্পী বলল, সেই মানুষটি পেরিক্লিসের স্ত্রীকে বিয়ে করবে। পেরিক্লিস, তোমার বউকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।

'মানে?'

'মানে হলো— আসপাশিয়াকে ঘরে আনার আগেই তোমার স্ত্রীর সাথে কথা বলো। এথেন্সে তো তালাকের নিয়ম নেই। একমাত্র উপায় হলো, অন্য একজনের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দাও।'

শিল্পীর কথা শুধু হাস্যকরই নয়, অসম্ভবও। কিন্তু এই হাস্যকর অসম্ভব কাজটাই সম্ভব করে ফেললেন পেরিক্লিস। প্রেমের মাঠে তিনি নতুন। কিন্তু রাজনীতির মাঠে নতুন নন। ঘরের রাজনীতিতেও সফল হলেন তিনি। এক সপ্তাহের মধেই স্ত্রীর সাথে অন্য এক লোকের বিয়ে হয়ে গেল। কোনো ঝগড়াঝাঁটি নেই, শান্তিপূর্ণ মিটমাট। এথেন্সের মানুষ বলল, বাপের জন্মেও শুনিনি কেউ নিজের বউয়ের দ্বিতীয় বিয়ের ঘটকালি করতে পারে। সেটিও করে দেখাল পেরিক্লিস। গণতন্ত্র যেমন এথেন্সের আবিষ্কার, নিজের বউয়ের দ্বিতীয় বিয়ের ঘটকালি তেমনই পেরিক্লিসের আবিষ্কার।

***

আজ আসপাশিয়ার বিয়ে।

কিন্তু বিয়ের কোনো অনুষ্ঠান নেই। গীত হচ্ছে না। বাদ্য বাজছে না। দেবতার কাছে কোনো প্রার্থনা হবে না। হলুদ-মেহেদির স্ত্রী আচার নেই। কাউকে নিমন্ত্রণ করাও হবে না। কারণ এটি আইনি বিয়ে নয়। এথেন্সের আইনে আসপাশিয়া বিয়ে করতে পারবে না। সে আজ শুধু পেরিক্লিসের ঘরে গিয়ে উঠবে। বিকেলে পেরিক্লিসের বন্ধু ডেমন আসবেন তাকে নিতে। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সে কেরামেকাস থেকে পেরিক্লিসের বাড়িতে গিয়ে উঠবে। এটিই তার বিয়ে।

প্রথম যেদিন পেরিক্লিস এই দিনের কথা বললেন, সেদিন আনন্দে নেচে উঠেছিল আসপাশিয়া। সে সারা জীবন এই দিনের জন্যই অপেক্ষা করেছে। তার স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে। কিন্তু দিন যত কাছে এসেছে, তার আনন্দ তত কমে এসেছে। সে পেরিক্লিসের পত্নী নয়। হবে উপপত্নী। শুধু পার্থক্য হবে সে কেরামেকাসে থাকব না। থাকবে পেরিক্লিসের ঘরে।

বিয়ের কোনো রকম আচার করতে পেরিক্লিস কড়া নিষেধ করেছেন। তাতে লোকে বুঝে যাবে যে তারা গোপনে বিয়ে করছেন। সেটি এথেন্সের আইনে অপরাধ হবে। পেরিক্লিসের ক্ষতি হবে। মামলাবাজ শত্রুর অভাব নেই। মামলা করলে সর্বনাশ হবে। তাই কোনো রকম আচার হচ্ছে না।

আসপাশিয়ার আপন দুই বোন থাকে এথেন্সে। কোনো বোনই তার বিয়েতে আসেনি। কোনো ভদ্র ঘরের নারী তার বিয়ের আচার করবে না। আসপাশিয়া নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে হাসিমুখে সব মেনে নেবে। একটুকুও কাঁদবে না। কিন্তু গত সাত দিন ধরে দিন রাত কাঁদছে।

তবে একেবারে কিছুই হবে না, এটি মেনে নিতে পারেনি আসপাশিয়া। সে বড় সাহস করে সক্রেটিসকে তার বিয়ের কথা বলেছিল। সক্রেটিস ছেলেটিকে তার পছন্দ। মনে হয় ছেলেটির সাহস আছে। সে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।

সক্রেটিস চেষ্টা করেছে যদি গোপনে আসপাশিয়ার বিয়ের আচার কিছু হলেও করা যায়। কিন্তু বন্ধুরা রাজি হয়নি। ক্রিতো আগাবে না। তার পিতা মানী লোক, সে বেআইনি কাজে থাকতে পারে না। চেরোফোনও থাকবে না। তার কারণ অন্য। আশপাশিয়া তাদের অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। চেরোফোনের সেই জ্বালা মিটেনি। শুধু সক্রেটিসের নতুন বন্ধু সিমন বলেছে, সক্রেটিস যদি থাকে, তাহলে সেও থাকবে। আসপাশিয়াকে উপহার দিতে সিমন একজোড়া জুতা তৈরি করেছে। আর একজোড়া জুতা বানিয়েছে পেরিক্লিসের জন্য। সেটি এখন দেওয়া যাবে না। পেরিক্লিস জানলে তাদের বিয়েতে থাকাই বন্ধ হয়ে যাবে।

সক্রেটিস গোপনে অনেক সাহস করে তার মা আর খালাকে বলেছে। তার মা শেষ পর্যন্ত সাহস করেছেন। তিনি দয়ালু নারী। মেয়েদের বিপদে তার চোখের কোণে পানি আসে। কোনো মেয়ে বিপদে পড়েছে শুনলে, তিনি কিছু একটি না করে থাকতে পারেন না। তিনি ধাত্রী বলে বাইরে বের হলে সমস্যা নেই। সক্রেটিসের মা আর ডিওটিমা খালা গোপনে আসপাশিয়ার বিয়ের কিছু আচার করবেন।

এখানে মেয়েদের বিয়ে হয় একেবারে পুতুল খেলার বয়সে। বিয়ের আগের দিন সব পুতুল কুমারী দেবী আর্টেমিসের কাছে দিয়ে দিতে হয়। এরপর সুগন্ধি পানিতে বিয়ের গোসল করে দেবী দিমিত্রার মন্দিরে পূজা দেয়।

কথা ছিল বিয়ের আগের দিন সক্রেটিসের মা আর ডিওটিমা যাবেন আসপাশিয়ার বাড়ি। তারা তার পুতুল নিয়ে যাবেন দেবীর কাছে। তাকে সুগন্ধি পানিতে বিয়ের গোসল দেবেন। কিন্তু তারা আসেননি। আসপাশিয়া সারাদিন চোখের জলে তাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। সন্ধ্যায় সক্রেটিস এসে বলে গেছে, তার মা কেরামেকাসে আসতে পারলেন না। বিয়ের দিন তারা দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরে আসবেন, সেখানে তারা বিয়ের সব আচার করবেন।

বিয়ের দিন সন্ধ্যায় গাধার গাড়ি এলো আসপাশিয়াকে নিতে। চালক ডেমন। আসপাশিয়া গাড়িতে উঠে ডেমনকে বলল, আমি একটু দিতি দেবীর মন্দিরে যেতে চাই।

ডেমন বললেন, পেরিক্লিস কিন্তু অপেক্ষা করছেন। লোকজন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে বরণ করতে।

'মন্দিরেও তিনজন অপেক্ষা করছে।'

'তারা কারা?'

'সক্রেটিস, তার মা আর খালা।'

ডেমন অবাক। আইন না মেনে আসপাশিয়ার গোপন বিয়ের কাজ করছে, এমন সাহসী পরিবারও এথেন্সে আছে? তিনি চললেন দিতি দেবীর মন্দিরের দিকে।

আসপাশিয়ার দেশ মিলেটাসে এক অসভ্য প্রথা ছিল। বিয়ে ঠিক হলে সব মেয়েকে যেতে হতো দিতি দেবীর মন্দিরে। বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত মেয়েটি সেখানে সেবাদাসী হিসেবে কাজ করত। পুরোহিতদের মনোরঞ্জন করত। ধনী এবং নেতাদের খুশি করত। তাতে মেয়েটি কিছু টাকা পেত। সেই টাকা আফ্রোদিতির মন্দিরে দান করলে দেবী খুশি হয়ে বিয়ে মঞ্জুর করতো। দেবী অনুমতি দিলে পরদিন বিয়ের আয়োজন হতো। এখন আর এসব প্রথা নেই। এখন প্রতীকী হিসেবে বিয়ের আগের দিন আফ্রোদিতির মন্দিরে কুমারীর মাথার চুলের আগা কেটে দেবীকে দান করে। তাতেই দেবী খুশি হয়ে বিবাহের অনুমতি দেয়।

আসপাশিয়া বিয়ের জন্য দিতি দেবীর অনুমতি নেবে। সক্রেটিসের মা সেখানেই বিয়ের আচার করবেন। কিন্তু মন্দিরে গিয়ে দেখল, সেখানে কেউ নেই। সক্রেটিস বা তার মা সেখানে আসেনি।

আসপাশিয়া নিজেই নিজের একটুখানি চুল কেটে দিতি দেবীকে দিল। দেবীকে ভক্তি করে দেবীর কাছে বিয়ের অনুমতি চাইল।

এথেন্সে বিয়ের সময় মেয়েরা দল বেঁধে মন্দিরে এসে বিয়ের গীত গায়। ধনীরা নাচ-গানের আয়োজন করে। আসপাশিয়া রাজরানি হতে চলেছে। কিন্তু তার বিয়েতে গীত গাওয়ার কেউ নেই। কোনো সুর নেই। তার জন্য কেউ নাচবে না। কেউ মঙ্গল প্রদীপ জ্বালবে না।

দিতি দেবীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে আসপাশিয়া। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে কাঁদবে না। সে অন্য মেয়েদের মতো নয়। সে অনেক শক্ত। নতুন নিয়ম তৈরি করার জন্যই তার জন্ম। সে কিছুতেই দুঃখ পাবে না। তার ভেতর ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু চোখের বাইরে যেন এক ফোঁটা পানিও না আসে। সে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছে।

হঠাৎ পেছনে একটি গুনগুন সুর শোনা গেল। অপূর্ব সুরে কে যেন বিয়ের গীত গাইছেন। তাকিয়ে দেখে গীত ধরেছেন এথেন্সের শ্রেষ্ঠ গায়ক ডেমন—

মেয়ে, কাঁদিস না রে আর
রূপের দেবী দিল বর
হবে তোর সুখের ঘর
সোনার কাঠি দু'হাতে নিয়ে
ওঠ মেয়ে— আজ তোর বিয়ে[৫২]

গান শুনতে শুনতে আসপাশিয়া দেখল সক্রেটিস আসছে। সাথে তার মা আর ডিওটিমা খালা। তাদের হাতে মঙ্গল প্রদীপ

ডেমন তখনও গাইছেন। তার সাথে সুর ধরেছে সক্রেটিস, তার মা আর খালা। ততক্ষণে আকাশে তারা উঠেছে। মন্দিরের পেছন দিকে উঁকি দিয়েছে চাঁদ। মনে হচ্ছে দিতি দেবী হাসছেন।

এবার আর কান্না থামাতে পারল না আসপাশিয়া। তার চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে।

***

৫১. ডেমন: পেরিক্লিসের বন্ধু ও সংগীতজ্ঞ।

৫২. এটি কোনো গ্রিক কবিতার অনুবাদ নয়, আসপাশিয়ার বিবাহ উপলক্ষে তাকে আমার উপহার

১৫

‘শুধু বেঁচে থাকা কোনো কাজের কথা নয়,
সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাই মানুষের উদ্দেশ্য।’
-সক্রেটিস

সক্রেটিস, ক্রিতো আর সিমন সন্ধ্যার আড্ডা দিতে যাচ্ছে। আগোরার পেছনের পথ দিয়ে হাঁটছে। রাস্তাটি খুবই সুন্দর। দুপাশে ছোট ছোট জলপাই গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চমৎকার সব মূর্তি। সাদা মার্বেল পাথরের উপর মিশরীয় নীল রঙের প্রলেপ দেওয়া। দেখে মনে হয় মূর্তিগুলো জীবন্ত। বুঝি কথা বলছে।

মূর্তিগুলোতে একটি করে গল্প আছে। গ্রিক পুরাণ বা হোমারের কাহিনির গল্প। ডানদিকের মূর্তিগুলোতে ট্রয়ের যুদ্ধ—সেখানে লড়াই করছে একিলিস আর হেক্টর। বামে দৈত্যদানব মারছে হারকিউলিস। একটু পেছনে পাথরের দেবতারা ঝগড়া করছে, ঝগড়া থামাতে সালিশ ডেকেছে দেবরাজ জিউস। জিউসের চোখ ফাঁকি দিয়ে জলপাই গাছের আড়ালে একজোড়া দেব-দেবী পাথরের শরীরেই প্রেম করছে।

এথেন্সে এখন সবখানে মূর্তি। মানুষের চেয়ে মূর্তির সংখ্যা বেশি মূর্তিগুলোর বিশেষত্ব হলো পুরুষ মূর্তিগুলো সব ন্যাংটা। পরনে কিছু নেই। আর নারী মূর্তিগুলোর পুরো শরীরে কয়েক প্যাঁচ কাপড়। এথেন্সবাসী মনে করে পুরুষের নগ্নতা বীরত্বের বিষয়। বীরত্ব প্রদর্শন করো। আর নারীর নগ্নতা লজ্জার বিষয়। লজ্জা ঢেকে রাখো। পোশাকের দিক থেকে এথেন্সের পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি সভ্য।

গ্রিকরা ভাস্কর্য বানানো শিখেছে মিশরীয়দের কাছ থেকে। কিন্তু মিশরীয়রা যে ধাঁচে ভাস্কর্য বানাত, গ্রিকরা তা একেবারে পাল্টে ফেলেছে। মিশরীয়দের মূর্তির শরীরে কোনো ভাষা নেই। তারা কিছুই করছে না। মোটা মোটা পাথরের উপর মাছের মতো চোখে সটান দাঁড়িয়ে থাকে। সব যেন সৈনিক, তাদের সেনাপতি বলেছে সোজা হও, আর সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছুই করছে না।

সেই অচল ভাষাহীন মিশরীয় মূর্তিতে প্রাণ এনেছে গ্রিসের শিল্পীরা। তারা পাথরে কার্ভ দেওয়া শিখেছে। গ্রিসে পাথরগুলো বাঁকা-ত্যাড়া হয়েছে। এতে মনে হয় মূর্তিগুলো কিছু একটা করছে। তারা চলছে। তাদের চোখে-মুখে ভাষা এসেছে। আড়চোখে তাকিয়ে আছে। চোখ দিয়ে কথা বলছে। এরকম প্রাণবন্ত মূর্তি পৃথিবীতে আগে কেউ বানাতে পারেনি। একেবারে নতুন জিনিস বানাচ্ছে গ্রিসের পাথর শিল্পীরা।

নতুন কিছু করার আনন্দে গ্রিক শিল্পীদের মধ্যে সৃষ্টির জোয়ার এসে গেছে। পাথর দেখলেই তাদের হাত নিশপিশ করে। কেটে ছেঁটে কিছু একটি বানিয়ে ফেলে। সারা শহর

ভরে গেছে মূর্তিতে। শিল্পীদের উৎসাহে এখন এথেন্সে যেটি চলছে, সেটিকে একটি মূর্তি বিপ্লব বলা যায়

মূর্তি বিপ্লবে সবচেয়ে বেশি খুশি সক্রেটিস। সে নিজে একজন শিল্পী। মূর্তির কারিগর। তার বাবার পাথরের কারবার। দালান-কোঠা বানায়। সুযোগ পেলে মূর্তিও করে। বাবাই সক্রেটিসকে মূর্তি বানানো শিখিয়েছেন। সেই হিসেবে সক্রেটিস আসলে একজন শিল্পী।

শিল্পী সক্রেটিস তার আড্ডার জন্য মূর্তিভরা জায়গা বেছে নিয়েছে। রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নিচে সবুজ ঘাস ছড়ানো একটি জায়গা। এই জায়গা বাছাই করার পেছনে সক্রেটিসের একটি উদ্দেশ্য আছে। প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডা শেষ হলে বন্ধুরা চলে যায়। সক্রেটিস একা একা বসে থাকে। মূর্তিগুলোর সাথে কথা বলে। নিজের একান্ত না বলা কথা। কথা বলতে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। হঠাৎ কথা থামিয়ে ঝিম মেরে চিন্তা করতে শুরু করে। রাত যত বাড়ে, তার চিন্তার ধারও তত বাড়ে। চিন্তা করতে করতে ধ্যানের মতো হয়ে যায়। তখন সে কেমন যেন নতুন নতুন শব্দ শোনে। কে যেন তাকে ডাকে। ডেকে নতুন নতুন ভাবনা দেয়। তাই এই মূর্তিঘেরা জায়গাটি সক্রেটিসের অনেক প্রিয়। মূর্তিগুলো তার আড্ডার অংশ, জীবনেরও অংশ। সক্রেটিসের চিন্তাকে ধারালো করে মূর্তিগুলো।

সিমন এখানে আগে আসেনি। সে মুগ্ধ হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে।

সিমন বলল, বাহ, ফাটাফাটি সব মূর্তি। কারা বানাচ্ছে এগুলো?

ক্রিতো বলল, যারা বানাচ্ছে, তাদের একজন তোমার সাথেই আছে।

সিমনের মনে পড়ল, সক্রেটিস তো আসলে একজন ভাস্কর, একজন কারিগর।

এটি কারও মনেই থাকে না। সারাদিন এমন সব কথা বলে সক্রেটিস, তাতে কারও মনেই থাকে না যে— সে একজন ভাস্কর। মনে হয় সে নিজেও ভুলে যায় যে— সে একজন শিল্পী।

সিমন বলল, সক্রেটিস, তাহলে তোমরাই এথেন্সকে মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলছো। কী সুন্দর লাগছে শহরটা! মায়াপুরী হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

সক্রেটিস বলল, আমি হলাম কুট্টি জাতের শিল্পী, আমাকে একজন কারিগর বলতে পার। এথেন্সকে যিনি সত্যই মায়াপুরী বানাচ্ছেন, তার নাম ফিডিয়াস।

সিমন বলল, ফিডিয়াস? তিনি কে?

সক্রেটিস বলল, ফিডিয়াস হলেন সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাস্কর এবং স্থপতি। এই চারদিকে নতুন যত মূর্তি আছে, সব তার বানানো। গত পাঁচ বছরে এথেন্সকে বদলে দিয়েছেন তিনি। তিনি যে পাথরে হাত দেন, সেটিই কথা বলতে শুরু করে। এথেন্সের রাস্তাঘাট, দালানকোঠা সব বদলে দিচ্ছেন ঐ লোক। নতুন নতুন নকশা আর কারুকাজে সেজে উঠছে এথেন্স

সিমন বলল, তিনি একা এত কিছু কীভাবে করছেন? পাথর চাঁচতেই তো দিন পার হওয়ার কথা।

সক্রেটিস বলল, এখন আর তিনি নিজে পাথর চাঁচেন না। তার বিরাট কারখানা। কারখানা বলা ঠিক হবে না। বলতে পার মূর্তিখানা। তার মূর্তিখানায় কয়েকশ শিল্পী দিন-রাত কাজ করে। ফিডিয়াস শুধু নকশা করেন, আর দরকার পড়লে শেষের ছোঁয়া দেন।

সিমন বলল, তাহলে ফিডিয়াস তো বিরাট ধনী লোক। তিনি এত পয়সা কোথায় পান?

সক্রেটিস আর ক্রিতো দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

ক্রিতো বলল, আরে ব্যাটা পাদুকা শিল্পী, তুমি তো দেখি শিল্পীদের টাকা- পয়সার ব্যাপারে খুবই কাঁচা। এই বুদ্ধি নিয়া ব্যবসা করলে কপালে দুর্ভোগ আছে।

সিমন বলল, কিছু ভুল বলেছি? মূর্তি বানানোর টাকা ফিডিয়াস দেন না?

ক্রিতো বলল, না, দেন না। টাকা দেন পেরিক্লিস। সরকারি টাকা। এথেন্স সরকারের টাকা। পেরিক্লিস নিজের পকেট থেকেও অনেক টাকা দেন।

সিমন বলল, পেরিক্লিস নিজের পয়সায় এথেন্সকে সাজাচ্ছেন?

ক্রিতো বলল, ঘটনা হলো, পেরিক্লিসের কাছে এথেন্স একটি সুন্দরী নারী। শুধু সুন্দরী নারী নয়, পেরিক্লিসের প্রেমিকা বলতে পার। এক সকালে উঠে তার মাথায় এলো— তার প্রেমিকা এথেন্সকে অপরূপ করে সাজাতে হবে। সাজানোর জন্য ডাক দিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা শিল্পী ফিডিয়াস সাহেবকে। সেই হিসেবে ফিডিয়াস হলো এথেন্সের এক নম্বর সৌন্দর্যবিদ। বিউটিশিয়ান বলতে পার। আর সক্রেটিসের মতো শিল্পীরা হলো তার চ্যালা।

সিমন বলল, ফিডিয়াসকে একদিন দেখতে চাই। গুণী মানুষ দেখলে পুণ্য লাভ হয়। তার হাতের সাথে আমার হাতটা একটু ঘষা দেব।

ক্রিতো বলল, সেই ব্যবস্থা সক্রেটিসই করতে পারে। সক্রেটিস তো ফিডিয়াসের কারখানায় কাজ করেছে।

সিমন বলল, সক্রেটিস তো দেখি ঘাঘু জিনিস। বাপ রে বাপ, তুমি ফিডিয়াসের শিষ্য?

সক্রেটিস বলল, না না, আমি ফিডিয়াসের শিষ্য নই। সেই কপাল আমার হয়নি। ঘটনা হলো, ফিডিয়াস সাহেব আমাদের প্রজন্মের শিল্পীদের গুরু। এথেন্সে এখন যত শিল্পী আছে, ছোটবেলায় ফিডিয়াস নাম শুনতে শুনতে এদের সবার কান ঝালাপালা হয়ে যেত। সবার বাবা-মা বলতেন, 'শোন বাবা, শিল্পী হতে চাও? তাহলে যাও, ফিডিয়াসকে একটি সালাম করে আসো। দেবতাকে বলো, হে দেবতা, আমাকে ফিডিয়াসের মতো বানিয়ে দাও'। আমার নিজের বাবাও সেই রকম মানুষ। সকাল বিকাল ফিডিয়াসের গুণগান করেন। তিনি বলেন, ফিডিয়াসের হাতে জাদু আছে, ও হাত দিলেই পাথর কথা বলে। ও

নাকি যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর শিল্পী। বাবা আমাকে মাঝে মাঝে তার কারখানায় নিয়ে যেতেন। টুকটাক কাজ করেছি সেই মূর্তিখানায়।

সিমন বলল, তাহলে ফিডিয়াস একাই বদলে দিয়েছেন এথেন্সের মূর্তিশিল্প?

সক্রেটিস বলল, ফিডিয়াস এখন এক নম্বর। তবে তার আগে আসল কাজটা করেছেন কয়েকজন। তারা মিশরীয় প্রাণহীন মূর্তিতে প্রাণ দিয়েছেন।

'তারা কারা?'

সক্রেটিস বলল, তারা কয়েকজন। একজনের নাম ক্রিটিয়াস। তোমরা এক্রোপলিশের উপর একটি বাচ্চা ছেলের মূর্তি দেখেছ। কী সুন্দর বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটি করেছেন ক্রিটিয়াস। এজন্য মূর্তিটির নাম ক্রিটিয়াসের বালক (Kritios Boy)। এই ছোট্ট মূর্তিটিই পৃথিবীর প্রথম মূর্তি যেটি বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতেই প্রথম শরীরের মাপ, হাত-পা, চোখ-কান, নাক সবকিছুর অনুপাত সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে। শরীরের মাপ নিয়ে পলিক্লিটাস নামক আরেক শিল্পী একটি বই লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের মোটামুটি একটি মাপ আছে, একটি অনুপাত আছে। এই অনুপাতকে বলে কন্ট্রাপোস্টো (contrapposto)। সেই অনুপাত ঠিক রেখে মূর্তি বানাতে পারলেই মূর্তি সবচেয়ে সুন্দর হয়। পলিক্লিটাস এই মাপে ব্রোঞ্জ দিয়ে মানুষের সমান উঁচু করে বানালেন একজন বর্শা-বাহকের (Doryphoros) ভাস্কর্য। এটি আগোরাতে ঢোকার রাস্তায় আছে। তোমরা দেখেছ। এটির দিকে তাকালে মনে হয়— যেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা চলছে, চলতে চলতে কারও সাথে কথা বলছে। শরীরের মাপের এই অনুপাতের হিসাব ভাস্কর্য শিল্পকেই বদলে দিয়েছে। এখন সব মূর্তি এই হিসাবেই হয়। সেজন্যেই এথেন্সের মূর্তিগুলো অবিকল মানুষের মতো। তোমরা আর একটি সুন্দর মূর্তি দেখেছ। বাঁকা হয়ে ডিসকাস বা চাকতি নিক্ষেপ করছে একজন খেলোয়াড়। চাকতি-নিক্ষেপের এই মূর্তি করেছেন মিরন নামক আর একজন শিল্পী। তিনিও শরীরের মাপের অনুপাতে এই মূর্তি করেছেন। তাদের পথ ধরে এসব নিয়ম কাজে লাগিয়ে ফিডিয়াস এখন তৈরি করছেন একের পর এক চোখ জুড়ানো মূর্তি।

সিমন বলল, ওরে বাবা! এথেন্সে কত কিছু ঘটছে! মূর্তি নিয়েও হচ্ছে কত চকমারী কাণ্ড। যাক সেসব, সক্রেটিস, এখন তোমার নিজের মূর্তির কথা বলো। তোমার কাজ কেমন চলছে?

সক্রেটিস আকাশের দিকে তাকাল। কিছুই বলছে না।

সিমন আবার বলল, বলবে না? তোমার নিজের মূর্তি নিয়ে তোমার মুখে একটি কথাও শুনিনি। মূর্তি বানাতে তোমার বুঝি ভালো লাগে না?

সক্রেটিস বলল, না না, মূর্তি করতে আমার ভালো লাগে। আমার হাতও মন্দ নয়। তিন অপ্সরার একটি মূর্তি বানানো শুরু করেছি। মনে হচ্ছে জিনিস ভালো হবে। তোমরা চোখ ফেরাতে পারবে না। কিন্তু মূর্তি নিয়ে আমি বড় ঝামেলায় আছি।

‘কী ঝামেলা?’

‘মূর্তি বানিয়ে যখন গভীর রাতে বাড়ি ফিরি, তখন কেমন একটি শব্দ শুনতে পাই। কে যেন ডাকে। অস্ফুট স্বরে কী সব বলে। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। কেমন বেহুঁশ বেহুঁশ হয়ে যাই। চারিদিকের জিনিস অর্ধেক টের পাই, অর্ধেক পাই না। তারপর এক সময় হঠাৎ করে চেতনা ফিরে আসে।’

সিমন বলল, এটি তো ধ্যান।

‘না না, ধ্যান কোত্থেকে করব? ধ্যান করতে এক জায়গায় মনোযোগ দিয়ে বসতে হয়। আমি তো দুই দণ্ডও একখানে বসে থাকতে পারি না। সারাদিন টইটই করি। এটাকে ধ্যান বলে না।’

‘তোমার শরীর ছোটাছুটি করে। কিন্তু মন এক বিষয়েই চিন্তা করতে থাকে। এটিও এক রকমের ধ্যান।’

‘তাই নাকি? এমন করে ধ্যান হয়?’

‘হুঁম, ব্যাপারটা অদ্ভুত। মানুষ ধ্যান করে বসে বসে, আর সক্রেটিস ধ্যান করে হেঁটে-হেঁটে। দৌড়ে-দৌড়েও ধ্যান করে।

‘ধ্যান-ট্যান জানি না। আমি শুধু জানি চেতনা ফিরলে আমার একটি কথাই মনে হয়।’

‘কী কথা?’

‘মনে হয় আমি সুন্দর মূর্তি বানাতে চাই না, সুন্দর জীবন বানাতে চাই।’

‘সুন্দর জীবন?’

‘হ্যাঁ, সুন্দর জীবন। আমার মনে হয় সুন্দর মূর্তি করার চেয়ে জীবন সুন্দর করা লক্ষ গুণ বেশি জরুরি।’

সিমন বলল, সুন্দর জীবন মানে তো বীরের জীবন। মহাবীর একিলিসের মতো জীবন।

‘না, সুন্দর জীবন মানে শুধু বীরের জীবন নয়। সুন্দর জীবন মানে ন্যায়ের জীবন, সত্যের জীবন। সুন্দর জীবন মানে কঠিন এবং সহজ সব অবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের হাত ধরে থাকা জীবন। কেউ বাধ্য করবে না, তবু নিজে থেকেই সত্যের পথে থাকাই সুন্দর জীবন।’

সিমন ও ক্রিতো তেমন বুঝতে পারছে না। সক্রেটিস নতুন একটি কথা বলছে—সুন্দর জীবন। এমন কথা আগে কেউ বলেনি। গ্রিকদের কাছে বীর হওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। হোমারের একিলিস সবার রোল মডেল। তার জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। গ্রিসে কোনো ধর্ম গ্রন্থ নেই। ধর্ম গ্রন্থে মানুষের জন্য ভালো-খারাপ কাজের নির্দেশ থাকে। খুব ছোটবেলা থেকেই একটি নীতিজ্ঞান মাথায় ঢুকে যায়। কিন্তু এখানে সেটি নেই। এখানে সবাই একিলিসের মতো বীর হতে চায়। দেবতাদের মতো ক্ষমতাশালী হতে চায়। তাদের কাছে সেটিই সবচেয়ে ভালো জীবন।

কিন্তু সক্রেটিসের সুন্দর জীবন মনে হচ্ছে অন্য জিনিস। সুন্দর জীবন মানে বীর হওয়া নয়, ভালো মানুষ হওয়া। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সিমনের খটকা কাটছে না। সিমনের ইচ্ছা করছে, সুন্দর জীবন কী সেটি বের করতে সক্রেটিসের সাথে প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলা শুরু করতে। 'সক্রেটিক মেথড' দিয়েই বের করা যায়। কিন্তু সাহস হচ্ছে না। সে ভাবছে— এখন থাক্। সক্রেটিসের সাথে কয়েক দিন ঘুরলেই সুন্দর জীবন কী, সেটি বুঝে যাবে।

সক্রেটিসের হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। গত কয়েক মাস সে পাগলের মতো দিন-রাত কাজ করছে। ছেনি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা পাথর চেঁচেছে। তিনটি মেয়ের মূর্তি বানাচ্ছে। মূর্তির নাম তিন অপ্সরা বা থ্রি গ্রেসেস। মূর্তি প্রায় শেষ। সক্রেটিস মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। কী সুন্দর হয়েছে দেখতে! অপূর্ব! নিজের কাজের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সমস্যা হলো— এই অপ্সরা যত সুন্দরই হোক না কেন, সে কথা বলে না। সে মানুষের মতো অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে না।

সক্রেটিস মূর্তির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রে অপ্সরা, বল তো আমি কে?

অপ্সরা কোনো কথা বলল না।

সক্রেটিস আবার বলল, এই মেয়ে, বল তো, সুন্দর জীবন কী?

এবারও মেয়ে কোনো কথা বলল না।

সক্রেটিস রাগ করে বলল, ধুর, কী সব পাথর-টাথরের পিছে সময় নষ্ট করছি! আর এসব করব না। এ কাজ করার জন্য আমার জন্ম হয়নি। আমি কাজ করব মানুষ নিয়ে। মানুষকে নতুন কিছু শেখাব। আমি কাজ করব জীবন নিয়ে। জীবনকে সুন্দর করব। এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

সে হাঁটছে আর বিড়বিড় করে বলছে, আমি আর মূর্তির কারিগর হব না। আমি জীবনের কারিগর হব। সুন্দর মূর্তি বানাব না। সুন্দর জীবন বানাব

এখন সমস্যা হলো, এ কথা বাবাকে কী করে বলবে? বাবা আগুন হয়ে যাবেন। সে আগুনে সক্রেটিস ভস্ম হয়ে যাবে। সক্রেটিস ভাবছে। একটি বুদ্ধি দরকার। এমন করে বলতে হবে, যাতে মা পক্ষে থাকে। মাকে দিয়ে বলাতে পারলে, অর্ধেক কষ্ট কমে যাবে। অনেক ভেবে সে একটি ফন্দি করল।

ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরে বাবার কাছে গিয়ে বলল, বাবা, একটি ঘটনা আছে। বাবা বললেন, ঘটনা তো প্রতিদিনই হচ্ছে। নালিশ কুমারের জন্য ঘটনা আবার নতুন কী? নতুন নালিশ আসবে, সেই ঘটনা?

'না, নালিশ-টালিশ নয়। ঘটনা হলো আমি আমার বাবার চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসি।'

সক্রেটিসের বাবা বললেন, এটি আবার কোনো ঘটনা নাকি? সব ছেলেই তার বাবার চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে। আমিও আমার বাবার চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসতাম।

‘আপনি মাকে বেশি ভালোবাসতেন ঠিকই, কিন্তু আমি আপনার চেয়েও আমি মাকে বেশি ভালোবাসি।’

‘বেশ, তাহলে তুমি শুধু নালিশ কুমার নও, তুমি হলে মাতৃভক্ত নালিশ কুমার। ত ‘বাবা, আপনি মাকে ভালোবাসলেও, আপনি কিন্তু বাবার কাজটাই করেন। আপনার বাবার যে পেশা ছিল, আপনারও একই পেশা।’

‘হ্যাঁ, সবাই তো সেটিই করে।’

‘না, আমি আমার মাকে এত বেশি ভালোবাসি যে আমি আর আমার বাবার পেশায় থাকব না। আমি আমার মায়ের পেশা গ্রহণ করব।’

বাবা বুঝতে পারছেন না ছেলে কী বলছে। তিনি বললেন, মায়ের পেশা মানে কী? তোর মা তো একজন ধাত্রী।

‘হ্যাঁ, আমিও ধাত্রী হব।’

‘তুই ধাত্রী হবি?’

‘হ্যাঁ, আমিও ধাত্রী হব। আমার মা যেমন সন্তান জন্ম দিতে সাহায্য করে, তেমনই আমিও জ্ঞানের জন্ম দিতে সাহায্য করব।’

বাবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসে রইলেন। তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন বললেন, মাথা তো পুরোই গেছে। তুই অনেক দিন ধরেই জ্ঞান জ্ঞান করছিস। আমি কি বাধা দিয়েছি? এখন নতুন নছল্লা শুরু করছিস। ঠিক আছে যা, আজ থেকেই তুই ধাত্রী। এখন দূরে যা। বিরক্ত করিস না।

‘আমি আর মূর্তি বানাব না।’

‘ও, এটি হলো আসল কথা।’

বাবা এবার মাকে ডাক দিল, শোনো, তোমার ছেলে আর কাজ-কর্ম করবে না। তাই ধানাই পানাই করছে।

সক্রেটিস বলল, না, না। কাজ তো অবশ্যই করব। অন্য কাজ করব। ‘অন্য কী কাজ?’

‘আমি কারিগরই থাকব। কিন্তু মূর্তির কারিগর নয়, জীবনের কারিগর।’

‘জীবনের কারিগর? সেটি আবার কী বস্তু?’

‘সেটি হলো, আমি আর সুন্দর মূর্তি বানাব না, সুন্দর জীবন বানাব।’

‘সুন্দর জীবন বানাবি? তোর জীবন কি অসুন্দর?’

‘আমার জীবন নয়, মানুষের জীবন সুন্দর বানাব।’

‘মানুষের জীবন? কার জীবন? কে তোকে কাজ দিল জীবন সুন্দর করার? বেতন কত দেবে?’

‘কেউ কাজ দেয়নি। আমি নিজেই ঠিক করলাম, আমি মানুষের জীবন সুন্দর করতে কাজ করব।’

এবার বাবা ধমক দিয়ে বললেন, ‘মূর্তি বানাতে না চাইলে না বানাবি। সেজন্য বাবার সাথে ধানাই-পানাই? এসব সুন্দর জীবন, উন্নত জীবনের গল্প বাবাকে বলে না। বাবা তোমার অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছে।’

সক্রেটিস ভাষাহীন। তার মুখের কথা হারিয়ে গেছে। জীবনে এই রকম নাকাল সে কোনোদিন হয়নি। পৃথিবীর ঝানু ঝানু পণ্ডিতকে সে রাস্তায় কাঁদিয়েছে। তার ঠোঁটের আগায় সবসময় যুক্তি তৈরি থাকে। আর বাবার সোজা কথার উত্তর দিতে পারছে না?

এতক্ষণ মা চুপ করে ছিল। এবার মা বললেন, আর মূর্তি বানাবি না? এত কষ্ট করে বাবা তোকে কাজ শিখিয়েছেন। বাবার পেশাকে অসম্মান করছিস?

‘না মা, অসম্মান করিনি। তুমিই বলো— মূর্তির কারিগরের বাবা হওয়া ভালো, নাকি জীবনের কারিগরের বাবা হওয়া ভালো?’

বাবা বললেন, শোন। এসব ভুংভাং আলাপ বাবা-মায়ের সাথে করে না। তোর মূর্তির হাত ভালো। যখন ভালো লাগে তখনই মূর্তি বানাবি। বাকি সময় জ্ঞান নিয়ে থাকিস। সারাদিন সুন্দর জীবন, উন্নত চরিত্র এগুলো সব করিস। মূর্তি বানানো একেবারে ছেড়ে দিস না।

সে ভাবছে, কেমন জ্ঞানী হলাম, নিজের বাবাকে একটি ছোট্ট কথা বোঝাতে পারলাম না।

একটি
শুভম ও ব্রহ্মচারী
ক্রিয়েশন
বইঘর.নেট
নিবেদন

১৬

‘অট্টহাসি হেসো না অন্যের বেদনায়,
দুষ্ট নিয়তি আছে ওঁৎ পেতে, তোমার অপেক্ষায়।’
—ইসোক্রেটিস

সক্রেটিস এক মনে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

মনে হচ্ছে নদীর পানিতে গভীর সমস্যা আছে, আর সেটি সমাধানের জন্য সে এক মনে চিন্তা করছে। বিরাট গবেষণা। তার চোখে মৎস্য-দৃষ্টি। একেবারে ‘পড়ে না চোখের পলক’ অবস্থা।

পাশে বসে আছে সিমন। দুজনে নদীর তীরে বসে আড্ডা দিচ্ছে। সিমন সক্রেটিসের নতুন ভক্ত। সক্রেটিসের সবকিছু তার ভালো লাগে।

সক্রেটিসের চরিত্রে একটি মাধুর্য আছে। মানুষ তাকে পছন্দ করে। তার কাছে বসে থাকতে ভালো লাগে। সে এত কিছু জানে, অথচ কোনো অহংকার নেই। আড়ম্বর বলতে কোনো বিষয়ই নেই। সারাক্ষণ হাসছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। কাউকে কোনো কটু কথা বলছে না। কেউ ঝাড়ি দিলে উল্টো হাসে। হেসে এমন একটি জ্ঞানমাখা কথা বলে, যে তাকে ঝাড়ি দিয়েছে সে লজ্জা পেয়ে যায়। তার সাথে রাগ করা যায় না। যে তার সাথে ভালো মনে একবার মিশে, সে সারাজীবনের জন্য বন্ধু হয়ে যায়।

সে সারাদিন ধরে কথা বলে। কথাও যে কারও সম্পদ হতে পারে, তার উদাহরণ সক্রেটিস। সত্যি বলতে, সক্রেটিসের একমাত্র সম্পদ তার কথা। মন বা মস্তিষ্ক তো ভেতরের ব্যাপার, সেটি বাইরে থেকে দেখা যায় না। সক্রেটিসের যেটি দেখা যায়, সেটি হলো কথা। তার কথার ওজন নেই, একেবারে হালকা। কিন্তু মারাত্মক ধারালো। ছোট ছোট বাক্যে সব সময় রসিকতা করছে। রসিকতার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ এমন সুন্দর কিছু বলে, যা আগে কেউ কোনোদিন শোনেনি।

সিমন হঠাৎ খেয়াল করল— অনেকক্ষণ হলো সক্রেটিস কোনো কথা বলছে না। একদৃষ্টে পানির দিকে তাকিয়ে আছে।

এমন করে কী দেখছে সক্রেটিস! এই নদীতে দেখার মতো কী আছে? এটিকে তো নদী বললে নদী লজ্জা পাবে। পাহাড় থেকে চিকন দুটি ঝরনা কোনোমতে একসাথে মিশে একটি সরু নালার মতো চলে গেছে। ঐ নালার পানির দিকে সক্রেটিস অমন করে তাকিয়ে আছে যেন মহাসাগরের রহস্য খুঁজছে!

তবে সক্রেটিস যখন তাকিয়ে আছে, তখন কিছু একটি ঘটনা অবশ্যই আছে। সিমনও সক্রেটিসের মতো পানির দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখেও মৎস্যদৃষ্টি। সিমন অনেক চেষ্টা করেও আলাদা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবুও তাকিয়ে আছে। ভাবছে কিছু একটি অবশ্যই হবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল। কিছুই হলো না। সক্রেটিস আগের মতোই তাকিয়ে আছে। কোনো নড়াচড়া নেই।

ঘটনা বুঝতে পারছে না সিমন। বোঝার জন্য কিছু বলা দরকার। সে হালকা করে বলল, এই নদীটি বড়ই অদ্ভুত। এর পানিও অদ্ভুত। সারাদিন দেখতে ইচ্ছে করে।

সে মিথ্যে বলল। তাকিয়ে থাকতে তার খুবই বিরক্তি লাগছে। শুধু সক্রেটিসের হাবভাব বোঝার জন্য কিছু একটি বলা দরকার। তাই বলছে।

সক্রেটিস কিছুই বলছে না। আগের মতোই তাকিয়ে আছে।

সিমন ভাবছে, সক্রেটিসের মতো মানুষকে এত তুচ্ছ একটি কথা বলা ঠিক হয়নি। তাই পাত্তা দিচ্ছে না। পাত্তা পেতে হলে একটু উচ্চ স্তরের কথা বলতে হবে। সে মনে মনে উচ্চ স্তরের কথা খুঁজতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর সিমন বলল, এই যে নদী বয়ে চলছে, এটি একেবারে জীবনের মতো। নদী কেমন করে সাগরে যায়? নেচে নেচে যায়, কেঁদে কেঁদে যায়। আবার হেসে হেসেও যায়। জীবনও এমনই— এই কান্না, এই হাসি; তবু বয়ে বয়ে চলে।

কথাটি বলে নিজেই অবাক হলো সিমন। খুবই জ্ঞানের কথা। দার্শনিকের মতো কথা। এবার সক্রেটিস তাকে জ্ঞানী ভাববে।

কিন্তু আশ্চর্য, সক্রেটিস কিছুই বলছে না। সে একভাবেই তাকিয়ে আছে। চোখে সেই মৎস্যদৃষ্টি।

এমন তো হওয়ার কথা নয়। কেউ ভালো কিছু বললে, সক্রেটিস প্রাণখুলে প্রশংসা করে। প্রশংসা করতে তার কোনো কৃপণতা নেই। অথচ এখন কিচ্ছু বলছে না। সিমন এবার ভালো করে সক্রেটিসের চোখের দিকে তাকাল। সেই চোখে ভাবলেশ নেই। মরা মানুষের মতো। মনে হয় কিচ্ছু শুনছে না। হঠাৎ সিমন লক্ষ করল সক্রেটিস ঘামছে। দরদর করে ঘামছে। সিমন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

সে ডাক দিল, সক্রেটিস, শুনতে পাচ্ছ? কোনো উত্তর নেই।

সিমন আরও জোরে ডাক দিল, সক্রেটিস!

সাড়া নেই। সক্রেটিস শুনতে পাচ্ছে না।

সিমন ছুটে গিয়ে সক্রেটিসকে ধরতেই, সে মাটিতে লুটিতে পড়ল।

সিমন চিৎকার করে উঠল, কে কোথায় আছ, বাঁচাও! সক্রেটিস মরে যাচ্ছে। বাঁচাও!

সক্রেটিস যখন চোখ খুলল তাকে ঘিরে অনেক মানুষ। সিমন তার চোখে পানি ছিটাচ্ছে। সিমন কাঁদছে। সক্রেটিস উঠে বসল। বসে আস্তে আস্তে বলল, পাদুকাশিল্পী, ভয় নেই। আমি ঠিক আছি।

সিমন আরও জোরে কেঁদে উঠল

সক্রেটিস ভিড়ের লোকদের বলল, আপনারা তো অনেকেই জানেন, আমার মাঝে মাঝে এমন হয়। আগেও হয়েছে।

ভিড়ের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ বললেন, জানি তো, তুমি পাক্কা খেলোয়াড়। মাঝে মাঝেই খেলা দেখাও। তা আজকে তোমার সাগরেদ অকারণে অমন চেঁচামেচি করল কেন?

সক্রেটিস বলল, আমার এই ব্যাপারটা সিমন জানে না। তাই ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়েছে। মাফ করবেন। আপনাদের কষ্ট দিলাম। শরমিন্দা।

বুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, শরমিন্দা? তামাশা করো, আর মুখে বলো শরমিন্দা! লজ্জা-শরম কিছু আছে?

সিমন দেখল, সক্রেটিস এখনও ঘামছে। আর এই লোকটা যা-তা বলছে। সে বলল, আপনার কি মনে হচ্ছে সক্রেটিস তামাশা করছে?

বুড়ো বললেন, তা নয়তো কী? ও মাঝে মাঝেই এমন করে। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, ভ্যাং ধরে পড়ে যায়। যায় যায় অবস্থা। মানুষজন আসে। হাত মালিশ করে, পায়ে ডলা দেয়। কিছুক্ষণ পরে সব ঠিক। মৃগী রোগীর মতো কাণ্ড। এগুলো তামশা না হলে কী?

সিমন বলল, আপনি একবার ওরকম তামাশা করে দেখান তো।

মুরুব্বি বললেন, তুমি সক্রেটিসের নতুন চ্যালা। তুমি কিছুই জানো না। এখন কী হবে আমার কাছে শোন। এখন তোমার জ্ঞানী সক্রেটিস বলবে, 'আমি এখানে ধ্যান করছিলাম। ধ্যানের মধ্যে একটি আজব সংকেত পেলাম। শব্দ শুনলাম। শোঁ শোঁ শব্দ। শব্দে আমার উপর নতুন এক জ্ঞান এলো। সেই জ্ঞানের কথাবার্তা আমি ঘাটে পথে বিলাই।' কী সক্রেটিস, ঠিক কিনা?

সক্রেটিস মাথা নাড়ল। বৃদ্ধ ঠিক বলেছেন।

মুরুব্বি আবার বললেন, ধ্যান কি এত সহজ বস্তু? ভং করে একদিকে তাকিয়ে থাকো। চোখ দুটি করো মরা মাছের মতো। একে কি ধ্যান বলে? মানুষ ধ্যান করে পাহাড়ের গুহায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে। আর তুমি শহরের মধ্যখানে শত শত লোকের সামনে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকো। এটি কিছু হলো? এটিকে কি পাগলেও ধ্যান বলবে? আর লোক হাসাইও না। তামাশা বাদ দাও।

সিমন উত্তর করতে যাচ্ছিল। সক্রেটিস সিমনের হাত চেপে বলল, ছেড়ে দাও। তারপর বুড়োকে বলল, চাচা, ক্ষমা দেন। আমি তামাশাই করি। আপনারা যারা আমার এই তামাশা আগে দেখেছেন, তারা দয়া করে যেতে পারেন।

তামাশা অনেকেই আগে দেখেনি। তারা গেল না। অনেকে বসে পড়ল। মুরুব্বি চলে গেলেন। সক্রেটিস তখনও দরদর করে ঘামছে। সিমন হাতপাখা দিয়ে বাতাস শুরু করল। সক্রেটিস তাকে নিষেধ করল, বাতাস লাগবে না।

একজন বলল, সক্রেটিস, বুড়া মিয়া চলে গেছে। এবার বলো তো, তোমার কাহিনিটা কী? আমরা তো ভয় পেয়েছিলাম।

সক্রেটিস বলল, কাহিনি যে কী, সেটি আমি নিজেও বুঝি না। আমার মাঝেমধ্যে এমন হয়। ছোটবেলা থেকেই হয়।

'কী হয়?'

'ধরুন, আমি একটা কিছু নিয়ে চিন্তা করছি। গভীর চিন্তা। হঠাৎ মনে হয় আমি আর পৃথিবীতে নেই। চারপাশের কিছুই আর শুনতে পাই না। কিছু দেখতে পাই না। মনে হয় অন্য কারও সাথে যেন কথা বলছি। শুধু একটি শব্দ শুনি। একটানা কিছু শব্দ। মনে হয় কেউ যেন কিছু বলছে। মাঝে মাঝে ছবিও দেখি। ঝাপসা একটি ছবি। স্বপ্নের মতো।

একজন বলল, অদ্ভুত কথা।

'হুঁম, প্রথম প্রথম আমারও খুব অদ্ভুত লাগত। প্রথম দিন তো খুব ভয় পেলাম। মাকে বললাম। মা কান্না শুরু করল— আমার ছেলে পাগল হয়ে যাচ্ছে। তারপর যখন মাঝেমধ্যেই এমন হতে থাকল, তখন থেকে আর মা- বাবাকে জানাই না।'

'কতক্ষণ চলে এমন?'

'তখন আমার সময় হিসাব থাকে না। তবে বন্ধুরা বলছে, একবার নাকি সারা বিকাল এমন করেছিলাম।'

'বিষয়টা শেষ হয় কীভাবে?'

'আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যায়।'

সিমন বলল, আমি তো ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। তো, এখন বলো তো— আজ কী শুনলে? নতুন কোনো সংকেত এলো?

সক্রেটিস ধীরে ধীরে বলল, আজ একটি পরিষ্কার সংকেত পেলাম। এতদিন ভাবনা ছিল; আজ যেন দেখতে পেলাম, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

সিমন বলল, কী দেখতে পেলে?

সক্রেটিস বলল, এতদিন সুন্দর জীবনের কথা বলতাম। আজ আমি সুন্দরকে দেখতে পেলাম।

কয়েকদিন ধরে সক্রেটিস কথায় কথায় শুধু 'সুন্দর জীবন'

'সুন্দর জীবন' করছে। মনে হতো বিলকি-ছিলকি আলাপ, নতুন মুদ্রাদোষ। কথার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, শুধু কথার কথা নয়। সে সত্যিই 'সুন্দর জীবন' নিজের চক্ষে দেখতে পেয়েছে।

সিমন বলল, অদ্ভুত কথা! তুমি 'সুন্দর জীবন' দেখতে পেলে? 'সুন্দর জীবন' আসলে কি? সেটি দেখতে কেমন?

সক্রেটিস বলল, সত্য ও ন্যায়ের জীবনই সুন্দর জীবন। মুখে আর অন্তরে একই সত্য মেনে চলাই সুন্দর জীবন। তুমি মুখে ভালো ভালো কথা বলবে, আর কাজের সময় নিজের স্বার্থ দেখে চলবে, সেটি নয়; ভেতরে আর বাইরে এক থাকলেই জীবন সুন্দর হবে। আর একটি বড় ব্যাপার হলো— একা একা ভালো থাকা যায় না। সবাই মিলে একসাথে ভালো থাকতে হয়। আমি যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই, আরেক জনেরও সেটি দরকার। এটিকে বুঝে সবাই মিলে সত্য আর ন্যায়ের পথে থাকাই সুন্দর জীবন। সবাই যদি সত্য ও ন্যায়কে বুঝে সেই মতো চলে, সেই জীবনই সুন্দর জীবন।

সিমন বোঝার চেষ্টা করছে। সে বলল, যেটি বললে, এরকম জীবন তুমি আজ দেখতে পেলে?

সক্রেটিস বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পেলাম। আজ নদীর তীরে তুমি আর আমি কথা বলছিলাম। কিন্তু কাল রাত থেকেই আমার মাথায় একটি পোকা ঘুরছিল— জীবন কীভাবে সুন্দর হতে পারে— সেই পোকা। সুন্দর জীবনের পোকাটা মাথার ভেতরে কিলবিল করছিল। স্বস্তি দিচ্ছিল না। এর মধ্যেই তুমি কথা বলছিলে। কোন ফাঁকে যেন আমি আর তোমার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার সামনে হঠাৎ একটি ছবি ভেসে উঠল। স্পষ্ট ছবি। আমি দেখতে পেলাম—

একটি সুন্দর শহর। সেই শহরে কেমন মিঠা একটি আলো। সেই আলোতে কেমন করে যেন শহরের সব মানুষ সত্যকে বুঝে গেল। সত্যকে বুঝতে পারামাত্রই সবাই মুখে আর অন্তরে এক হয়ে গেল। কারও ভেতরে আর কোনো অভিনয় নেই। সবার ভেতর আর বাহির এক। সবাই নিজের স্বার্থ আর অন্যের স্বার্থ দুটোই এক রকম করে বুঝতে পারছে। বুঝতে পেরে সবাই সেভাবে চলছে। সবাই সত্য বলছে, সবাই ন্যায় করছে। তাদের কাছে সুখ জিনিসটা আর জিরো-সাম গেম নেই। দুজনের সুখের যোগফল শূন্য নয়। তোমার জন্য যা প্লাস, আমার জন্য তা মাইনাস নয়। তুমি সুখী হলে আমি অসুখী— এরকম নয়। তারা উপায় বের করে ফেলেছে যে, সবাই মিলে একসাথে সুখে থাকা যায়। আর তাতেই সবার জীবন সুন্দর হয়ে গেছে। আমি দেখছিলাম— অপূর্ব সেই শহরের ছবি। একঝাঁক রঙিন মুখ, সবাই হাসছে, অনাবিল সেই হাসি, জ্যোৎস্না রঙের হাসি। প্রেমের ঘ্রাণ লাগা হাসি। ভালোবাসা ছোঁয়া লাগা সেই হাসিতে সত্য ও ন্যায় ঝরে ঝরে পড়ছে।

আর ঠিক সেই সময়েই তুমি আমাকে ধাক্কা দিলে। আমি চোখ মেলে দেখি, আমি মাটিতে পড়ে আছি, আমাকে ঘিরে অনেক মানুষ, তুমি হাউমাউ করে কাঁদছো।'

সিমন তন্ময় হয়ে শুনছিল। গল্পের মতো লাগছে। অবিশ্বাস্য গল্প। কিন্তু সে নিজে দেখেছে, সক্রেটিসের সারা শরীর কেমন কাঁপছিল। তার চোখ এখনও কেমন উদভ্রান্ত, এই চোখ মিথ্যে বলছে না।

সিমন বলল, আমি এখনও তোমার 'সুন্দর জীবন' বোঝার চেষ্টা করছি। যেটুকু বুঝলাম, তা হলো— সবাই মিলে সত্য আর ন্যায়ের পথে থাকাই সুন্দর জীবন। একা একা নয়, সবাই যদি সত্য ও ন্যায়কে বুঝতে পারে, সেই মতো চলে, সেটিই সুন্দর জীবন। তবে একটি খটকা আছে।

সক্রেটিস বলল, কী খটকা?

সিমন বলল, 'সুন্দর জীবন' পেতে সবাইকে সত্য ও ন্যায় বুঝতে হবে? সেটি কীভাবে হবে? সব মানুষকে সত্য পথে কে আনবে? এটি সম্ভব নয়।

সক্রেটিস দৃঢ়ভাবে বলল, 'সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। আমি করে দেখাব। আমি আজ সত্যকে দেখতে পেয়েছি। ন্যায়কে বুঝতে পেয়েছি। সেজন্যই বলছি, সম্ভব। মানুষকে সত্য ও সুন্দর পথে আনার একমাত্র বাধা হচ্ছে অজ্ঞানতা। মানুষ সুন্দর জীবন যাপন করে না, কারণ সে জানেই না— 'সুন্দর জীবন' কী। জানেই না— কীভাবে সেই জীবন পাওয়া যায়। যদি সঠিক কথা জানানো যায়, তাহলেই সে সুন্দর জীবনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। সেজন্য আমি মানুষকে জানাব। আমি মানুষকে ডেকে ডেকে বলব,

'পৃথিবীতে একমাত্র সুন্দর জিনিস হচ্ছে জ্ঞান, আর একমাত্র মন্দ জিনিস হচ্ছে অজ্ঞতা'।

অজ্ঞতা দূর করতে আমি এথেন্সের পথে পথে যুবকদের শিক্ষা দেব। কীভাবে সুন্দর জীবন পাওয়া যায়, সেই কথা বলব। সত্য ও ন্যায়ের বাণী শোনাব। সাহস ও সংযমের কথা শোনাব। সবাইকে সুন্দর জীবনের তরিকা বলাই আজ থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য। মানুষের জীবনে কখন কী করা উচিত— আমি সেটি নিয়ে কাজ করব। সেজন্য এথেন্সের পথে পথে ঘুরে আমি জ্ঞান ভিক্ষা করব। জ্ঞানের মাধুকরী হয়ে আমি মানুষের কাছে যাব। মানুষের ভেতরের জ্ঞানকে বের করে আনব। আমি মানুষের জীবনকে বদলে দেব। সবার জন্য এনে দেব একটি 'সুন্দর জীবন'।

সিমন ভাবছে, সক্রেটিস কত অবলীলায় এমন চমৎকার সব কথা বলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সে যা বলছে, তা একেবারেই নতুন জিনিস। পৃথিবীতে তার আগে এমন কথা কেউ বলেনি। এই মুহূর্তে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করছে।

সে মানুষকে জানানোর জন্য পথ পথে হাঁটবে। সে জ্ঞানের মাধুকরী। সে মানুষের ভেতরের জ্ঞানকে বের করে আনবে। সে জ্ঞানের ধাত্রী। সে মানুষের মনকে বদলে দেবে। গড়ে তুলবে মনের সাম্রাজ্য।

সবচেয়ে বড় কথা— সে বলছে, জ্ঞানই শক্তি। জানতে পারলেই উপায় বের হয়। বদলে দেওয়া যায়। মানুষের ভেতরে জ্ঞানকে বের করে এনে সে তাদের জীবনকে বদলে

দেবে। শুধু থিওরি নয়, একেবারে প্র্যাকটিক্যালি সুন্দর জীবনের পথ দেখিয়ে দেবে। এখন থেকে জ্ঞান আর আকাশের জিনিস নয়, কোনো অশরীরী বিষয় নয়; জ্ঞান মানে নিজেকে জানা, সুন্দর জীবনের উপায় জানা। শুধু জানার মাধ্যমেই সত্যকে ধরা যাবে। সত্যকে বুঝে জীবনকে সুন্দর করে তোলা যাবে। হাজার বছর ধরে অনেক মানুষ জ্ঞানের কথা বলছে। সেসব জ্ঞানের আলাপ শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু সক্রেটিস বলছে তার জ্ঞানের থিওরি সে প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করবে।

এথেন্সে এখন জ্ঞান সাধনার সময় চলছে। এখানে ধনী লোকদের কোনো কাজ করতে হয় না। সব কাজ করে দাসেরা। তাই তাদের হাতে অফুরন্ত সময়। এই অফুরন্ত সময় তারা ব্যয় করে জ্ঞানের কাজে। সারা দুনিয়ায়ই ধনীরা সময় কাটায় সুরা আর সাকি নিয়ে। তাদের বিনোদন মানে হেরেম ভর্তি বাইজি। আর এথেন্সের ধনীরা সময় কাটায় জ্ঞান নিয়ে তর্ক করে। তাদের বিনোদন মানে হোমারের বই থেকে পালা গান আর থিয়েটারের নাটক। এখানেই এথেন্স সবার থেকে আলাদা। সেজন্য এই আলোকিত সময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্ঞানী লোকে এথেন্স ভরে উঠেছে।

অনলাইনে বেস্টসেলিং বই কিনুন

এথেন্সের পথ-ঘাট এখন জ্ঞানী লোকে গিজগিজ করে। তাদের বলা হয় সফিস্ট (Sophist)। গ্রিক শব্দ সোফিয়া (Sophia) মানে জ্ঞান। সফিস্টরা সারাদিন জ্ঞান কপচান, জ্ঞান নিয়ে ওঠা বসা করেন। সুযোগ পেলেই নতুন নতুন থিওরি বলেন। হাতে কাঠের কলম আর পেপিরাস কাগজ নিয়ে আগোরার আশেপাশে কাউকে ঘুরতে দেখলেই সবাই বলে উনি একজন সফিস্ট।

সিমন ভাবছে, সক্রেটিস কি সফিস্ট?

এথেন্সে সফিস্টগণ ঘণ্টা-মেপে জ্ঞান বিক্রি করেন। তারা জ্ঞানের ব্যাপারী। টাকার বিনিময়ে তরুণদের শিক্ষা দেন। তারা অনেক ধনী। জ্ঞান বিক্রি করে মোটা আয় করেন। কিন্তু সক্রেটিস কোনোদিন জ্ঞান দিবে কারও কাছ থেকে কোনো টাকা-পয়সা নেয়নি। সে জ্ঞানের জন্য সারা দিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার সাথে অর্থের ব্যাপার নেই। সে কারও কাছে বেতন নিয়ে জ্ঞান দান করে না। তার জ্ঞান বিক্রির জিনিস নয়। জ্ঞান অমূল্য, জ্ঞানের কোনো আর্থিক মূল্য হতে পারে না।

আবার সফিস্টরা সব মধ্য বয়স পার হওয়া ভদ্রলোক। তাদের মাথায় চুল থাকে না। যদি থাকে, সেই চুল অবশ্যই ধবধবে সাদা। এথেন্সে কঁচা চুলের কোনো সফিস্ট নেই। চুল কাঁচা হলে, যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, তাকে সফিস্ট বলে কেউ মানবে না। সক্রেটিস আর তার বন্ধুরা সব কাঁচা চুলের ছোকরা, বয়স ত্রিশের কম। তাই এখনও কেউ তাদের সফিস্ট বলে মানে না। বয়স্কদের কাছে তারা ইঁচড়ে পাকা বিচ্ছু।

সেজন্য সক্রেটিস সফিস্ট নয়। উল্টো তারা বন্ধুরা সফিস্টদের নিয়ে হাসি- ঠাট্টা করে। তাদেরকে বলে ঘণ্টা-মাপা জ্ঞানের ফরিয়া।

এই ঘণ্টা-মাপা সফিস্টদের বাইরেও আরেক ধরনের জ্ঞানী মানুষ আছে। তারা ঘণ্টা-মেপে পয়সা নেন না। তারা পণ্ডিত মানুষ। তারা বই-পত্র লেখেন, অনেকের স্কুল আছে, শিষ্য আছে। সক্রেটিস তাদের সম্মান করে। এরকম একজন মানুষ ছিলেন পিথাগোরাস। তিনি ছাড়া গ্রিসে সাতজন জ্ঞানী মানুষ আছেন, তাদেরকে একত্রে বলে সেভেন সেইজেস (Seven Sages)। তাদের মধ্যে মহাজ্ঞানী সলোন আছেন, বিজ্ঞানের জনক থেলিস আছেন। তারা সাধু টাইপের পণ্ডিত।

কিন্তু সক্রেটিস পণ্ডিত নয়। সে বই লেখে না। সে স্কুল দেয়নি। সে সভায় বক্তৃতা দেয় না। নতুন নতুন থিওরি দেয় না। পণ্ডিত বললে যে রকম একটি ছবি মনে আসে, সক্রেটিস একেবারেই সেরকম নয়।

অনলাইনে বেস্টসেলিং বই কিনুন

অনলাইনে বেস্টসেলিং বই কিনুন

তাহলে সক্রেটিস আসলে কী?

গ্রিক ভাষায় জ্ঞান আর প্রেম মিলিয়ে একটি সুন্দর শব্দ আছে। সোফিয়া (Sophia) মানে জ্ঞান আর ফিলিন (philein) মানে ভালোবাসা; এই দুটি একত্রে হয় ফিলোসফি (Philosophy) মানে জ্ঞানের জন্য ভালোবাসা। যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন, তিনি হলেন ফিলোসফার (Philosopher)। সক্রেটিসের জন্য এর চেয়ে ভালো শব্দ আর হতে পারে না। অনেকে বলে, ফিলোসফার শব্দটি পিথাগোরাস তৈরি করেছেন। যেই তৈরি করুন না কেন, জ্ঞান-প্রেমিক শব্দটি বললে এথেন্সের সবার চোখে এখন একটি নামই ভাসবে। সে হলো সক্রেটিস।

সক্রেটিসই একজন সত্যিকারের জ্ঞানপ্রেমিক। জ্ঞানই তার জীবনের একমাত্র নেশা। কিছু জানার ইচ্ছা হলে না জানা পর্যন্ত সে ছটফট করে। নতুন কিছু শেখার জন্য গভীর রাতে নিশির ডাকের নাম করে গুরুর কাছে ছুটে যায়। তার প্রেমের গুরু ডিওটিমা তাকে শিখিয়েছেন যে, প্রেমের সবচেয়ে চূড়ান্ত রূপ হলো জ্ঞানের জন্য প্রেম। সক্রেটিস সেটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছে, জ্ঞানপ্রেমী হওয়ার জন্য আত্মনিয়োগ করেছে।

জ্ঞান ছাড়া তার জীবন অর্থহীন। সে জ্ঞান-ভিখারি। পথে পথে ঘুরে জ্ঞান ভিক্ষা করে। সে জ্ঞানের ধাত্রী। প্রশ্ন করে করে মানুষের ভেতরের জ্ঞান বের করে আনে। সে জ্ঞান দিয়ে পয়সা কামায় না। পণ্ডিত হিসেবে নাম করতে চায় না। তবু দিন-রাত জ্ঞান নিয়েই থাকে। জ্ঞানই তার প্রেমিকা, জ্ঞানই তার জীবনসঙ্গী।

সে এখন ঘরে ঘরে জ্ঞানপ্রেমিক বানাচ্ছে। জ্ঞানকে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে ব্যবহার করে করে মানুষের জন্য সুন্দর জীবন আনবে। গণিত, আর্কিটেকচার- এর মতো জ্ঞানেরও প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার থাকবে। এরকম কথা আগে কেউ বলেনি। তার এই ভাবনা থেকে জন্ম হলো একটি নতুন শাস্ত্র 'জ্ঞানের জন্য প্রেম' মানে ফিলোসোফি। যেটি দিয়ে জীবন বদলে দেওয়া যায়। সুন্দর জীবন পাওয়া যায়। ফিলোসফির জনক হলো সক্রেটিস।

তার আগে কি কোনো ফিলোসফার নেই? পিথাগোরাস, থেলিস এঁদেরকে কি ফিলোসফার বলা যাবে না?

যাবে। তবে সত্যি হলো— সক্রেটিসের আগে জ্ঞানকে ভালোবাসার কথা কেউ এমন করে বলেনি। কেউ জ্ঞান দিয়ে মানুষের জন্য সুন্দর জীবন আনতে চায়নি। সক্রেটিসই ফিলোসফিকে আকাশের বিষয় থেকে মানুষের অন্তরের বিষয় করে তুলেছে। তাই সক্রেটিসই ফিলোসফির জনক। তার আগে যারা ছিল, তাদেরকে প্রি-সক্রেটিক ফিলোসফার বলা যাবে।

সিমন সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, একটু আগে সক্রেটিস বলল যে, সে আজ সত্যকে দেখতে পেয়েছে। যে সত্যকে দর্শন করেছে, সেই তো দার্শনিক।

১৭

‘নিজের কাছে জিততে পারাই জীবনের সবচেয়ে বড় জয়।’
–ডিমোক্রিটাস

সক্রেটিসের নাট্যকার বন্ধু ইউরিপিডিস যতই ভালো নাটক লিখুক, সে কখনো প্রথম হতে পারে না। সব সময় প্রথম হন আরেক জন। সে ইউরিপিডিসের জীবনের অভিশাপ। তার জীবনের নেমেসিস। ইউরিপিডিসের নেমেসিস মহাপ্রতিভাধর এই নাট্যকারের নাম সফোক্লিস[৫৩]।

তার বাড়ি এথেন্সের কলোনাস মহল্লায়। আগোরা থেকে চার কিলোমিটার উত্তরে। গত কয়েক বছর ধরে তিনি যা লিখছেন, তাতেই মানুষ মোহিত হচ্ছে। হোমারের পরে তিনিই এখন সেরা সাহিত্যিক। শুধু লেখাই নয়, তার গানের গলা এত মিষ্টি যে, মনে হয় মধু ঝরছে। সেজন্য লোকে তাকে বলে এথেন্সের মধুকর।

সফোক্লিস লিখতে বসেছেন। তার লেখার কায়দা-কানুন খুবই বাহারি। মাথায় যা আসে পটাপট লিখে ফেলেন। তারপর শুরু করেন সেটুকুর অভিনয়। চিৎকার করে হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে অভিনয়। অভিনয়ের শব্দে লোক ভিড় করে। রাস্তার মানুষ ভাবে তার বাড়িতে ঝগড়া লেগেছে। লোক দাঁড়িয়ে যায়, ঘরে উঁকিঝুঁকি দেয়। একটু শুনেই বুঝে যায়, এত মিষ্টি গলায় কেউ চেঁচামেচি করে না। এই মধুর গলা এথেন্সের মধুকর সফোক্লিসের। তিনি লিখছেন আর অভিনয় করছেন। তিনি লিখতে বসলেই চারদিকে ডাক পড়ে যায়। রাস্তা দিয়ে লোক যায়, আর বলে, বুঝেছি নাট্যকার লিখতে বসেছেন। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নাটকবিদ কলম হাতে নিয়েছেন।

সফোক্লিসের জীবনে একটিই নেশা। সেটি হলো পুরস্কারের নেশা। তিনি প্রতি বছর বসন্ত অনুষ্ঠানে প্রথম, না হলে দ্বিতীয় হন। জীবনে কোনোদিন তৃতীয় হননি। কিছুদিন

পুরস্কার না পেলেই তার মনে হয়, লোকে বুঝি তাকে ভুলে গেছে। লোকে যাতে ভুলতে না পারে সেই নেশায় তিনি দিন-রাত লেখেন।

এবার লিখছেন থিবস শহরের রাজার কাহিনি। এথেন্স থেকে ষাট মাইল উত্তর-পশ্চিমে থিবস শহর। এই শহরের পুরনো এক রাজার নাম ইদিপাস ইদিপাসের পরিবারের করুণ কাহিনি সারা পৃথিবীর মানুষের মুখে মুখে। কাহিনিটি ভালো করে বুঝতে সফোক্লিস কদিন আগে থিবস ঘুরে এসেছেন। কাহিনিটি এরকম-

থিবসের রাজপুত্র ইদিপাস না জেনে নিজের বাবাকে হত্যা করে রাজা হয় এবং নিজের মাকে বিয়ে করে ফেলে। তাদের ছেলেমেয়েও হয়। অনেক বছর পরে সত্য পরিচয় জানতে পেরে অনুতাপে ইদিপাস নিজেই অন্ধ হয়ে যায়। তার মা আত্মহত্যা করে। তাদের সন্তানদের সবাই বলে অভিশপ্ত। সন্তানদের জীবনও হয়ে ওঠে ভীষণ করুণ।

এই কাহিনি নিয়ে সফোক্লিস নাটক লিখছেন। নাটকের কাহিনি সবাই জানে। তিনি কাহিনি পাল্টাবেন না। কিন্তু প্লট সাজাচ্ছেন অতি নাটকীয় করে। তিনি নাটকের থিম ঠিক করলেন, মানুষ নিয়তির হাতের পুতুল। ট্র্যাজেডির জন্য খুবই সুন্দর থিম। ইদিপাস রাজা হয়েও নিয়তিকে ঠেকাতে পারেননি। ভাগ্য ইদিপাসকে নিয়ে খেলেছে। পৃথিবীতে সব মানুষই ভাগ্যের হাতের খেলনা। সবার জীবনেই ইদিপাসের মতো খারাপ সময় আসে, যার উপর মানুষের কোনো হাত থাকে না। তাই নিজের ওপর গর্ব করে লাভ নেই, মানুষের অহংকার করার কিছুই নেই। ভাগ্য মানুষকে নিয়ে যেভাবে খুশি খেলতে পারে।

সফোক্লিস একটু লিখছেন আর অভিনয় করছেন। হঠাৎ মনে হলো ধুর্, এই কাহিনি চলবে না। এই সময়ে মানুষ এই কাহিনি গ্রহণ করবে না। এখন এথেন্সে গণতন্ত্রের সুসময় চলছে। গণতন্ত্রের নেতা পেরিক্লিস সবাইকে শিখাচ্ছেন— 'আমাদের ভাগ্য আমাদের নিজেদের হাতে। আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য বানাব। নিজেদের চেষ্টায় এথেন্সকে পৃথিবীর এক নম্বর বানাব।' এখন সবাই গণতন্ত্র আর নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাসী। এই সময়ে ভাগ্যের হাতে ইদিপাসের এমন পরিণতি মানুষ পছন্দ করবে না।

নতুন কিছু লিখতে হবে। কিন্তু ইদিপাসের কাহিনি সফোক্লিসের এত পছন্দ যে এটি বাদ দিতে তার বুকে চিনচিন ব্যথা লাগছে। নতুন কিছু লেখা তার জন্য কোনো ব্যাপার না। কিন্তু মনে হচ্ছে এটি না লিখলে মৃত রাজা ইদিপাস খুব রাগ করবে। আজ রাতে ইদিপাস তাকে ফিসফিস করে বলবে, ছিঃ ছিঃ, সফোক্লিস। এই ছিল তোর মনে? তুই তো লোক সুবিধার না

মন ঠিক করতে পারছেন না সফোক্লিস। বাড়ির বাইরের দিকে জলপাই বাগানে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবছেন। হঠাৎ দেখলেন— বাগানের পেছনের রাস্তা দিয়ে একদল লোক একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছে।

সফোক্লিস জিজ্ঞেস করলেন, কার লাশ?

সামনের লোকটি উত্তর দিল, কার লাশ জানি না। ঐ পেনতিলিস পাহাড়ের ধারে পড়ে ছিল। লাশ নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছি গো। মরা দেহ তো ফেলে রাখা যাবে না, দেবতারা ক্ষেপে যাবে, পাপ হবে। তাই দাফন দিতে নিয়ে যাচ্ছি।

সফোক্লিস চিৎকার করে উঠলেন, 'পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি।' এটি তার ইউরেকা মুহূর্ত। ইদিপাসের কাহিনিতে তার ছেলেমেয়েদের লাশ দাফনের কথা আছে। সেই কাহিনিও খুবই করুণ। লাশ নিয়ে কাহিনি লোকে পছন্দ করবে। এটি লিখে ফেলা যায়। এক্ষুনি লিখতে হবে। না হলে মাথা থেকে ছুটে যাবে। তিনি নাচতে নাচতে ঘরের দিকে দৌড় দিলেন।

লাশ বহনকারী লোকেরা অবাক। সফোক্লিসের কী হলো? একজন বলল, কাণ্ডটা দেখেছ! একটি লাশ দেখে এমন ভয় পেল? এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল! পাশের লোক বলল, ভয় কোথায় দেখলে? সে তো আনন্দে তিড়িং বিড়িং করছে। লাশ দেখে নাচাপিচা করছে। ওনার আর পাগল হতে বেশি দিন লাগবে না।

পাগলের মতোই করছিলেন সফোক্লিস। তিনি পেপিরাস কাগজ নিয়ে বসলেন। ফটাফট লিখতে শুরু করলেন নতুন নাটক। নাম এন্টিগনি[৫৪]।

এন্টিগনি রাজা ইদিপাসের মেয়ে। ইদিপাস অন্ধ হয়ে দূরে চলে গেছে। রাজা হয়েছে তার শ্যালক ক্রিয়ন। ক্রিয়নের কুবুদ্ধিতে ইদিপাসের দুই ছেলে নিজেরা ঝগড়া করে করে দুজনেই মারা যায়। তাদের একজন ক্রিয়নের পক্ষে ছিল। তার দেহ দাফন করা হলো। অন্য জন ছিল ক্রিয়নের বিপক্ষে। ক্রিয়ন আদেশ দিল বিপক্ষের ছেলের কোনো সৎকার হবে না। তার লাশ শিয়াল- কুকুরে খাবে। কিন্তু রুখে দাঁড়াল এন্টিগনি। সে ভাইয়ের লাশ কবর দেবে। সে ক্রিয়নের আদেশ মানবে না। সে দেবতার আদেশ মানবে। দেবতারা সবার লাশ সৎকারের নির্দেশ দিয়েছেন। এন্টিগনি রাতের আঁধারে ভাইকে কবর দিল। সেই অপরাধে ক্রিয়ন এন্টিগনির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। ক্রিয়নের একমাত্র ছেলে ক্রিয়নকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু ক্রিয়ন কারও কথা শুনল না। মৃত্যুদণ্ড হবেই। কিন্তু দণ্ডের আগেই এন্টিগনি আত্মহত্যা করল। সেই সাথে আত্মহত্যা করল ক্রিয়নের একমাত্র ছেলে। ছেলেটি এন্টিগনিকে ভালোবাসত। ছেলের শোকে আত্মহত্যা করল ক্রিয়নের স্ত্রী। ক্রিয়ন দেখল, দুনিয়ায় তার আর আপন কেউ নেই। অন্যায়ের শাস্তি হাতেনাতে পেয়েছে ক্রিয়ন।

ঝড়ের মতো লিখছেন সফোক্লিস। এটি কাহিনির মতো কাহিনি। এই নাটক জনপ্রিয় হবেই। তিনি নাটকে দেখাবেন, ক্রিয়ন একজন একনায়ক, একজন স্বৈরাচার। একনায়করা ভীষণ অহংকারী। এই অহংকারকে গ্রিকরা বলে হুব্রিস। হুব্রিসের কারণে একনায়করা কাউকে মানে না। কারও কথা রাখে না। তাদের পরিণতি হয় ভয়াবহ। এথেন্সের মানুষ একনায়কের পতন মারাত্মক পছন্দ করবে। নাটক দেখে তারা বলবে— ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একনায়করা এত জঘন্য! আর আমাদের গণতন্ত্র দ্যাখো, গণতন্ত্রের মতো

ভালো জিনিস আর কিছু আছে নাকি? তিনি সংলাপ লিখলেন, যে নগরে মাত্র একজনের শাসন চলে, সেটি কোনো নগরই নয়।

সংলাপটি তার পছন্দ হয়েছে। এই সংলাপে অনেক হাততালি পাবে। তবু আরও ভালো করে একটু বলা দরকার। ক্রিয়ন নিজেকে সংশোধনের কোনো চেষ্টাই করেনি। সে একটি গোঁয়ার, এক নম্বরের অহংকারী।

সফোক্লিস লিখলেন, মানুষমাত্রই ভুল করে, কিন্তু যে মানুষ ভুল বুঝতে পারামাত্র সংশোধন করে, সেই হলো ভালো মানুষ। মানুষের একমাত্র অপরাধ হলো অহংকার।

সফোক্লিস দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা করেন না। তিনি মনে করেন— দেবতারা অলিম্পাস পাহাড়ে বসে আরাম করছে। শুধু শুধু তাদের রাগানোর কী দরকার। তিনি দেবতাদের নামে ভালো ভালো কথা লিখেন। দেবতাদের নিয়ে উল্টা-পাল্টা লিখে এথেন্সের নাট্যগুরু এস্কিলাসের করুণ পরিণতির কথা তার মনে আছে। এথেন্সের মানুষ নিজে ধর্ম পালন করুক আর নাই করুক, অন্য কেউ দেবতাদের নিয়ে কিছু বলেছে তো তার অবস্থা কেরোসিন করে দেবে। তাই সফোক্লিস কাউকে চটান না।

তিনি এন্টিগনির মুখে সংলাপ দিলেন, 'মানুষের আইনের চেয়ে দেবতার আইন বড়।' এই সংলাপটিও তার পছন্দ হলো। মঞ্চে দাঁড়িয়ে টনটনে গলায় বলে ফেলা যায়। দর্শক ফিদা হয়ে যাবে। নাটক জমে ক্ষীর হয়ে যাবে। তবে একটি সমস্যা হয়েছে। এই নাটক লিখতে গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় আর একজনের মতো কথা চলে আসছে। তার নাম হেরোডোটাস। হেরোডোটাস খুব সুন্দর গল্প বলে। সেই গল্প তার মাথায় ঢুকে গেছে। মাথা থেকে সেই গল্প কলমে চলে আসছে। বড় ঝামেলা করছে। বারবার কাটতে হচ্ছে।

সফোক্লিস সামোস দ্বীপে গিয়েছিলেন যুদ্ধে। সেখানে দেখা হয়েছে হেরোডোটাসের সাথে। ছেলেটির গল্প শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন, রোজ তাকে ডাকতেন। সে এথেন্সের গল্প বড় মিষ্টি করে বলে। সেটিই এখন কাল হয়েছে। নাটক লিখতে বসে তার মতো সংলাপ চলে আসছে।

সফোক্লিস হেরোডোটাসকে এথেন্সে আসার নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। তার গল্প এথেন্সের মানুষ ভীষণ পছন্দ করবে। সফোক্লিস ভাবছেন হেরোডোটাস বই লিখতে গিয়ে আবার নাটক লিখে ফেলবে না তো? হেরোডোটাস নাটক লিখলে, সফোক্লিস ঝামেলায় পড়বে। এক নম্বর নাট্যকারের জায়গা নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তবে আশার কথা হলো, হেরোডোটাস মনে হয় নাটক লিখবে না। সে বানানো কাহিনি পছন্দ করে না, সে সত্য কাহিনি লিখবে। সে নতুন কিছু করবে। যেটি পৃথিবীতে কেউ করেনি, সেটিই করবে হেরোডোটাস। সফোক্লিস ভাবছে, সেটিই ভালো। নাটকের যে মাধুর্য, সেটি হেরোডোটাস না বুঝলেই ভালো। নাটকে এমন করে মানুষের কথা বলা যায়, যেন মানুষ সেখানে নিজেকে দেখতে পায়। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে নায়ক ভাবতে পারে। এই কাজে

সফোক্লিসই এক নম্বর। পৃথিবীতে তার সামনে দাঁড়ানোর কেউ নেই। হেরোডোটাস চুলায় যাক, সফোক্লিসকে নাটক শেষ করতে হবে। তিনি ঝড়ের বেগে লিখতে শুরু করলেন।

নাটক দাঁড়িয়ে গেছে। সফোক্লিস খুশি। চমৎকার প্লট। রক্ত, খুন, মারামারি, শাস্তি, দেবতা, গণতন্ত্র সবই আছে। নাটকের শেষটাও চমৎকার। গ্রিক ট্র্যাজেডির সব মশলা দেওয়া হয়ে গেছে। শুধু ভালোবাসার কথায় একটু ঘাটতি আছে মনে হয়। ভালোবাসা ছাড়া ট্র্যাজেডি হয় নাকি? ভালোবাসা ছাড়া কাহিনিই হয় না।

সফোক্লিস এন্টিগনির মুখে সংলাপ দিলেন,

আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধুই ভালোবাসার জন্য, কখনই ঘৃণা করার জন্য নয়।

লিখেই চমকে উঠলেন সফোক্লিস। এর চেয়ে ভালো কথা কি হোমারও লিখতে পেরেছেন? জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার অভিনয় করে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধুই ভালোবাসার জন্য, কখনই ঘৃণা করার জন্য নয়।' থরথর করে কাঁপছেন সফোক্লিস। এরকম একটি কথা লিখে মরে যাওয়া যায়। তার মনে হচ্ছে, সেই প্রথম নাটক লিখে যেমন রোমাঞ্চ লেগেছিল, আজ আবার সেরকম লাগছে। এটিই হবে তার সেরা নাটক।

এই সেরা লেখাটিকে খুবই যত্ন করে অভিনয় করতে হবে। কোনো রকম ফাঁক রাখা যাবে না। সফোক্লিস ভাবছেন, শুধু দুজন অভিনেতা এই নাটক জমাতে পারবে না। ট্র্যাজেডিতে এখন পর্যন্ত মাত্র দুইজন অভিনেতা থাকে, আর সাথে কয়েকজন কোরাস গায়। নাট্যগুরু এস্কিলাস এই নিয়ম করে গেছেন। এখনও সবাই সেটিই করে। সফোক্লিস ভাবছেন শুধু দুইজনে হবে না। কম করে হলেও তিনজন লাগবে। সফোক্লিস সিদ্ধান্ত নিলেন, এই নাটক থেকেই আমার নাটকে তিনজন করে অভিনেতা থাকবে।

আরও নতুন একটি কাজ করলেন সফোক্লিস। তিনি ছবি আঁকতে বসে গেলেন। নাটকের দৃশ্য আঁকতে লাগলেন। মঞ্চের পেছনে পর্দা দিয়ে ছবি থাকবে। প্রতিটি দৃশ্যের জন্য আলাদা আলাদা ছবি। ঘটনা কোথায় হচ্ছে সেটি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। এটিও তার আবিষ্কার। এর আগে কেউ দৃশ্যের জন্য ছবি আঁকেনি।

সফোক্লিসের মন অনেক খুশি। চমৎকার একটি নাটক লিখেছেন। নতুন নতুন কায়দা-কানুন, দৃশ্য এসব নিয়ে এবার মঞ্চে উঠবেন তিনি। এবার আর প্রথম হওয়া আটকায় কে? এখন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ইউরিপিডিস। ছেলেটা তার চেয়ে পনেরো বছরের ছোট। ছেলেটা লিখে ভালো, কিন্তু রক্ত গরম। খালি গরম গরম কথা লিখে। সে দেবতা মানে না। সে শুধু মানুষের কথা লিখে। ইউরিপিডিস নাকি আজকাল সক্রেটিসের সাথে চলে। সক্রেটিস যেমন সবকিছুতে মানুষের কথা বলে, তেমনই ইউরিপিডিসও নাটকের মঞ্চে উঠে দেবতাদের কথা বাদ দিয়ে শুধু মানুষের কথা বলে। মঞ্চে উঠে নাটক না করে জ্ঞানের কথা বলে, দর্শনের আলাপ করে। লোকে ঠাট্টা করে বলে সক্রেটিস হলো রাস্তা-ঘাটের দার্শনিক আর ইউরিপিডিস হলো রঙ্গমঞ্চের দার্শনিক। দুজনেই বেহুদা লাফায়।

সফোক্লিস তাদের লাফালাফি মনে করে হাসলেন। তার নাটক লেখা হয়ে গেছে। এবার দুই চ্যাংড়া লাফাতে থাকুক। সক্রেটিস রাস্তায়, ইউরিপিডিস থিয়েটারে।

***

৫৩. সফোক্লিস (Sophocles, 496 – 406 BC), এথেন্সের সেরা ট্র্যাজেডিয়ান এবং নাট্যকার।

৫৪. সফোক্লিসের নাটক এন্টিগনি (Antigone) খ্রি.পূ. ৪৪১ অব্দে মঞ্চস্থ হয়। এই বইয়ে যেখানেই সফোক্লিসের তিনটি নাটক রাজা ইদিপাস, এন্টিগনি বা ইদিপাস কলোনাসে অনুবাদ দরকার হয়েছে, আমি Robert Fagles এর ইংরেজি অনুবাদ (The Three Theban Plays) থেকে বাংলা করেছি।

১৮

‘একটি দয়াশীল হৃদয় যেকোনো দার্শনিকের চেয়ে
অনেক বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারে।’
—সফোক্লিস

এথেন্সের পিরাউস বন্দর।

জাহাজ থেকে নামলো এক যুবক। যুবকের মন খারাপ। খুবই খারাপ। তার পিছনে এজিয়ান সাগরে টলটলে নীল পানি। বিকেলের আলোয় নীল রং উছলে উছলে পড়ছে। কিন্তু নীল পানি দেখে তার মনে কোনো রোমাঞ্চ এলো না। উল্টো মনে হলো নীল হলো কষ্টের রং। তার কষ্টের জন্যই সাগরের পানি নীল হয়েছে।

যুবকটির নাম হেরোডোটাস[৫৫]। জীবনের খুব কঠিন সময়ে সে এথেন্সে এসেছে। হাতে টাকা-পয়সা নেই। এ শহরে কাউকে চেনে না। কিন্তু এথেন্সের কথা সে জানে। অনেক শুনেছে। এখানে জ্ঞান থাকলে কিছু না কিছু করে খাওয়া যায়। সে শুনেছে এথেন্সের ধনীরা তাদের ছেলেদের পড়ানোর জন্য বিদ্বান মানুষ বাড়িতে রাখে। টাকা-পয়সাও ভালোই দেয়। কিছু একটা জুটে যাবে, এই আশায় সে এথেন্সে এসেছে।

হেরোডোটাস জাহাজ থেকে নামলো। সামনে কতগুলো গাধায় টানা গাড়ি। তাতে লেখা— বন্দর থেকে আগোরা। হেরোডোটাস একটি গাড়িতে উঠে বসল। আগোরার কথা সে জানে। সেটিই এথেন্সের কেন্দ্র।

হেরোডোটাস অনেক সাহসী। অচেনাকে ভয় পায় না। বয়স ত্রিশ না হতেই পৃথিবীর বহু জায়গা ঘুরে ফেলেছে। তাকে মস্ত পরিব্রাজক বলা যায়। আগে ব্যবসা করতো। জাহাজ নিয়ে বের হতো বেচা-কেনা করতে। অনেক দেশে গিয়েছে। মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন আশেপাশে সব দেশ ভাজাভাজা করে ফেলেছে। কিন্তু মুস্কিল হলো ছেলেটির মন ঘুরাঘুরিতে। বেচাকেনায় মন নেই। যেখানে যায় নানা রকমের মানুষের সাথে কথা শুরু করে। নতুন কিছু শুনলেই লাফ দিয়ে ওঠে। আরও শুনতে চায়। একটি কথা যাচাই করতে দশজনকে জিজ্ঞেস করে। তার ব্যাগে সব সময় পেপিরাস কাগজের টুকরা রাখে। কিছু ভালো লাগলেই, লিখে ফেলে। বন্ধুরা বলত, 'বাণিজ্যে নেমে অত ঘন প্যাঁচাল করলে চলে না। ব্যবসার নিয়ম হলো— কথা কম, কাজ বেশি।' কিন্তু হেরোডোটাসের কাছে কথার দামই বেশি। সে ঘন প্যাঁচালের লোক। তাই পয়সা করতে পারেনি। কিন্তু সে মনে করে—সে অনেক কিছু জানে। নিজের কাছে সে মহাজ্ঞানী। তাই জ্ঞানের শহর এথেন্সে এসেছে।

সে এথেন্সের কাহিনি জানে। কিন্তু সেটি কাজে লাগবে কিনা সে বুঝতে পারছে না। একটু পরীক্ষা করা দরকার। সে গাধার গাড়ির সহিসকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের এখানে যে ম্যারাথনের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই ম্যারাথন জায়গাটি কোন্ দিকে?

সহিস বলল, ঐ উত্তর দিকে। এখান থেকে পঁচিশ মাইলের কম হবে না।

হেরোডোটাস বলল, 'ম্যারাথন যুদ্ধের কথা তুমি জানো?'

সহিসের মনে অপমান লাগল। এই লোকটা তো উজবুক। সহবৎ শিখেনি। এথেন্সের মানুষকে জিজ্ঞেস করছে ম্যারাথন যুদ্ধের কথা জানে কিনা! সে জবাব দিল, জনাব, এথেন্সের একটি জলপাই গাছকে বলেন, সেই গাছও ম্যারাথন যুদ্ধের কাহিনি বলে দেবে। আর আপনে আমাকে বলতেছেন সেই যুদ্ধের কথা জানি কিনা? বড়ই শরম দিলেন জনাব। বুকে ব্যথা পেলাম।

হেরোডোটাস বলল, দুঃখিত। ব্যথা নিও না, ভাই। আমি ব্যথা দেওয়ার মানুষ না। শুধু সেই যুদ্ধের কথা তোমার কাছে জানতে চাই।

সহিস বলল, বলেন। কী জানতে চান? এই যুদ্ধ আমার আগাগোড়া মুখস্থ।

‘তো আমাকে একটু বলো তো ফিডিপিডিসের বাড়িটা কোনদিকে?’

‘ফিডিপিডিস? কোন ফিডিপিডিস?’

হেরোডোটাস অবাক। সে বলল, এবার কিন্তু আমার মনে ব্যথা দিলে ভাই। ম্যারাথন যুদ্ধের আগাগোড়া তোমার মুখস্থ, আর ফিডিপিডিসের নাম জানো না? ফিডিপিডিস হলো খবর বাহক। খবর আনে বলে তাকে বলে খবরি। পারস্যের সাথে এথেন্সের জয়ের খবর এক দৌড়ে ম্যারাথন থেকে এথেন্সে নিয়ে এসেছিল যে লোক, সে হলো ফিডিপিডিস 1

সহিস লজ্জা পেল। এবার সে সম্মানের চোখে হেরোডোটাসের দিকে তাকাল। হাল্কা স্বরে বলল, আপনি এমনভাবে বলছেন যেন আপনি সেখানে ছিলেন।

হেরোডোটাস হেসে বললেন, আমি ছিলাম না। কিন্তু যারা সেখানে ছিল, তাদের কাছ থেকেই শুনেছি। পৃথিবীতে সত্য জানার দুটি উপায়। একটি হলো, নিজে সেখানে উপস্থিত থাকা। দ্বিতীয় হলো, যে উপস্থিত ছিল, তার কথা বিশ্বাস করা। শোন, তোমাকে ম্যারাথনের কাহিনি শুনাই।

হেরোডোটাস অনেকক্ষণ ধরে ম্যারাথন যুদ্ধের কথা বলল। মুগ্ধ হয়ে শুনল সহিস। সে বলল, আপনি যেমন করে কাহিনি বলেন, এমন করে আর কাউকে বলতে শুনিনি। জনাব, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আমি একজনকে চিনি। উনিও খুব মিঠা করে গল্প বলেন। তিনি আপনাকে পছন্দ করবেন। দেখা করতে চান তার সাথে?

‘কে তিনি? কী নাম তার?’

‘আসল নাম সফোক্লিস। কিন্তু মানুষে বলে ‘মধুকর’।’

‘মধুকর?’

‘হ, মধুকর। মানে মৌমাছি। মৌমাছির যেমন মধু নিয়ে কারবার, তেমনই ওনারও মধু নিয়ে কারবার।’

‘মধু নিয়ে কারবার? মানে মধুর ব্যবসা করেন?’

‘কী যে বলেন? উনি মধুর ব্যবসা করবেন কে? তাঁর কি টাকার অভাব আছে? তিনি এথেন্সের একজন সেনাপতি। বিরাট যোদ্ধা। নিজের বাবার অস্ত্র কারখানা আছে। ঢাল, বর্শা এসবের কারখানা। সেটি বড় কথা নয়। কথা হলো— তার গলার স্বর মধুর মতো মিষ্টি। গান ধরলে মনে হয় মধু চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। তাই সবাই তার নাম দিয়েছে ‘মধুকর’।’

হেরোডোটাস বলল, কী নাম বললে ওনার?

‘সফোক্লিস। তিনি এক বিরাট প্রতিভা। বিরাট নাট্যকার। নিজের লেখা নাটক এমন করে অভিনয় করেন যেন, পুরো থিয়েটারে একটি মাছিও ভ্যান করে শব্দ করে না। হোমারের কবিতা এমন সুন্দর করে বলেন, সবাই এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।’

হেরোডোটাস জিজ্ঞেস করল, কী নাটক লিখেছেন সফোক্লিস?

সহিস বলল, আমি কি আর অত কিছু নাম-টাম মনে রাখতে পারি? আপনি আগোরাতে যেকোনো বইয়ের দোকানে গেলেই দেখবেন, প্রথমেই সারি সারি সফোক্লিসের বই। দোকানে যদি দশজন লোক দেখেন, তাদের পাঁচজন কিনবে হোমারের বই, আর তিনজন সফোক্লিসের বই, আর বাকি দুই জন অন্য লোকের বই। তাহলেই বোঝেন, সফোক্লিস কেমন লেখক। হোমারের থেকে উনিশ-বিশ।

হেরোডোটাস সফোক্লিসকে চেনে। প্রকৃতপক্ষে সে এথেন্সে তার কাছেই এসেছে। সফোক্লিস সামোস দ্বীপে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। তখন হেরোডোটাস সেখানে ছিল। সফোক্লিস তাকে এথেন্সে আসতে বলেছেন। এখন হেরোডোটাসের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। কাজ-কর্ম নেই। তাই এসেছে এথেন্সে। ভেবেছিল আগোরাতে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করবে, সফোক্লিসের বাড়ি কোথায়। কিন্তু এত সহজে যে পেয়ে যাবে, সে ভাবেনি। সফোক্লিস যে এত বিখ্যাত মানুষ, সেটি আগে বোঝেনি হেরোডোটাস।

সে গাড়ির চালককে বলল, চলো, তাহলে সফোক্লিসের কাছেই যাই।

হেরোডোটাসের মনে সন্দেহ আছে সফোক্লিস তাকে চিনবেন কিনা। সামোস দ্বীপে অল্প দিনের আলাপ। মনে নাও থাকতে পারে। মনে না থাকলে, সে চলে আসবে। কথা বাড়াবে না। এই সুযোগে সে একটি বুদ্ধি করল। সে ছদ্মবেশ ধরে সফোক্লিসের বাড়ি যাবে। একবার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখা যাক, পরিচয় না দিলে সফোক্লিস চাকরি দেন কিনা। হেরোডোটাস মাথায় পাগড়ির মতো জড়িয়ে একটি ছদ্মবেশ নিল। তাকে সহজে চেনা যায় না।

বারান্দায় একটি মাচার উপরে বসে আছে হেরোডোটাস। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, কেউ খবর নেয়নি। খুব অপমান লাগছে। অচেনা লোকের বাড়িতে ভিক্ষুকের মতো বসে আছে। চলে যাবে কিনা ভাবছে। এমন সময় পেছন থেকে শুনতে পেল একটি মিষ্টি স্বর, তুমি কি আমার কাছে এসেছো?

হেরোডোটাস পেছন ফিরে তাকাল। ঢুলুঢুলু চোখে দাঁড়িয়ে আছেন সফোক্লিস। একটি হালকা চাদর তার গায়ে। ডান হাতে কালি লেগে আছে। বোঝা যায় তিনি লিখছিলেন। তার মুখে বিরক্তি, চোখে প্রশ্ন।

হেরোডোটাস উত্তর করল, জি, আপনার কাছেই এসেছি। আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি জ্ঞানী মানুষ। প্রতিভাবান মানুষ।

প্রশংসায় বিগলিত না হলেও, একেবারে অখুশি হলেন না সফোক্লিস। মৃদু স্বরে বললেন, তোমার পরিচয়?

‘এশিয়া মাইনর থেকে এসেছি। আমার বাড়ি হালিকারনাসস। নানান দেশে ঘুরেছি। কিন্তু ব্যবসায় সুবিধা হলো না। আপনাদের শহরে জ্ঞানী লোকের সম্মান আছে। সেজন্য এসেছি।’

জ্ঞানী লোক কথাটা কানে লাগল সফোক্লিসের। জ্ঞানীরা নিজেকে জ্ঞানী বলেন না। তিনি বললেন, যার যা আছে, এথেন্সে সবকিছুই বেচতে পারে। তুমি কি জ্ঞানী? জ্ঞান বিক্রি করবে? কিন্তু আমি তো জ্ঞানের বেপারী নই। জ্ঞান কিনতে পারে কম বয়সী সন্তানের বাবারা। তুমি তাদের কাছে যেতে পার। কারও ঘরে মাস্টারি জুটে যাবে।

হেরোডোটাস হতাশ। এই লোক অন্য ধাঁচের। দয়া-মায়া আছে বলে মনে হয় না। তাকে চুপ থাকতে দেখে সফোক্লিস বললেন, ঠিক আছে জ্ঞানী মিয়া, তোমাকে আর একটি সুযোগ দিচ্ছি। বলো কোন মহাজ্ঞান আছে তোমার ঝোলায়? তাড়াতাড়ি বলো, সময় অল্প।

'আমি এথেন্সের গত একশো বছরের কাহিনি আপনাকে শোনাতে পারি।'

হো হো করে উঠলেন সফোক্লিস, 'এটি তো আমার দাদুও বলতে পারেন। এটিকে তুমি বলছো জ্ঞান? জ্ঞান কী জিনিস— তুমি তো সেটিই জানো না।

আবার হতাশ হলো হেরোডোটাস। লোকটা তাকে অপমান করছেন। তবু বিনয়ের সাথে বলল, আমি শুনেছিলাম আপনি গল্প বোঝেন। সমঝদার মানুষ। তাই এসেছিলাম।

'গল্প? এই মাত্র বললে তুমি এথেন্সের ঘটনা বলবে। আবার বলছো গল্প! মানে কী? সত্য ঘটনা, নাকি বানানো কাহিনি?'

'জনাব, আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি। মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন, এথেন্স সব। ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে আমি পৃথিবীর একটি মানচিত্র এঁকেছি।'

'সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্র?' পিটপিট চোখে তাকালেন সফোক্লিস। বিশ্বাস হচ্ছে না। গাঁজাখুরি গল্প বলছে। অবিশ্বাসের চোখে বললেন, বের করো, দেখি তোমার মানচিত্র।

হেরোডোটাস একটি পেপিরাস টুকরো বের করল। টুকরোটি বেশ বড়। লম্বায় প্রায় চার হাত। তাতে কালো আর নীল কালিতে পৃথিবীর নকশা। মেঝেতে বিছিয়ে দিল হেরোডোটাস।

সফোক্লিস সামনে এগিয়ে চোখ বুলালেন নকশাটির দিকে। তিনি সৈনিক মানুষ। নকশা ভালোই বোঝেন। যুদ্ধের মাঠে নকশা নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। কয়েক মুহূর্ত নকশাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। নকশায় মিশরের নীল নদ থেকে ব্যাবিলন, পারস্য, ভারত, এথেন্স সব চিহ্ন দেওয়া। এই জিনিস যদি সত্যি এই ছেলেটি করে থাকে, তাহলে ছেলেটির গুণ আছে। সাধারণ ছেলে নয়। এতক্ষণে সফোক্লিস ভালো করে তাকালেন ছেলেটির দিকে 1 দাসকে ইশারা করলেন ছেলেটিকে কিছু খেতে দিতে। গভীর মনোযোগে মানচিত্র দেখছেন সফোক্লিস। বললেন, তুমি কি সত্যিই এসব জায়গায় গিয়েছ?

হেরোডোটাস বলল, জি, গিয়েছি। যেখানেই গিয়েছি, মানুষের সাথে কথা বলেছি। সৈনিকদের পটিয়ে পটিয়ে বের করেছি যুদ্ধের বিবরণ। যার কাছে যা পেয়েছি, কিছুই বাদ দিইনি। শুধু খুঁজে গেছি।

সফোক্লিস বললেন, 'এই যে দেখো, তুমি দেখিয়েছ নীল নদ এই জায়গাটা থেকে শুরু হয়েছে। এটি তুমি কার কাছে জেনেছ?'

হেরোডোটাস বলল, আমি গিয়েছি সেখানে। সে এক কঠিন ভ্রমণ। রাত- দিন নীল নদের তীর ধরে চলেছি। কখনো ঘোড়ায়, কখনো নৌকায়। মাঝে মাঝে এমন কঠিন জায়গা যে ঘোড়াও চলে না। তখন পায়ে হেঁটেছি। একেবারে পাহাড়ের সেই ছোট্ট ঝরনা যেখানে নীল নদ শুরু, আমি নিজে সেখানে গিয়েছি।

সফোক্লিসের মুগ্ধতা শুরু হয়েছে। এই বয়সেই এত কিছু ঘুরে এসেছে! ছেলেটা যে জ্ঞানের কথা বলেছিল, সেটি যে ওর কিছুটা আছে, তা স্বীকার করতেই হয়।

'তোমার মানচিত্রে এখানে দেখছি ভারত। ভারতের পরে আর কিছুই নেই। তুমি কি ভারতে গিয়েছ?'

'না জনাব, ভারতে যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছা। কিন্তু এখনও ভাগ্যে হয়নি। মানুষের কাছে শুনেছি। আরবের বণিকরা ভারতের কথা জানে। ভারতই পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণে। এরপর আর কিছুই নেই। আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া আর ভারত— সারা পৃথিবীটাকেই আমি নকশায় এনেছি[৫৬]।'

সফোক্লিস নকশা নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন করে বুঝলেন নকশাটি এই ছেলেটিরই আঁকা। তিনি বললেন, হুঁম, তোমার উপরে আমি মুগ্ধ হয়েছি। নাও, নাস্তা খাও।

মাটির পাত্রে তাদের জন্য অলিভ অয়েল মাখা রুটি আর আঙুর রসের সুরা নিয়ে এলো ভৃত্য। সফোক্লিস বললেন, তুমি তো বললে আজই এথেন্সে এসেছ? তা কোথায় উঠবে?

নিচু স্বরে হেরোডোটাস বললেন, আসলে এখানে আমি কাউকে চিনি না। কোথায় উঠব তা এখনও জানি না।

সফোক্লিস বললেন, খোলাখুলি বলো। তুমি কি আমার কাছে আশ্রয় চাও? হেরোডোটাস বলল, বাড়ির ছেলেমেয়ে পড়ানোর ভার আমি নিতে পারি। হেসে উঠলেন সফোক্লিস। তুমি কি জানো, বাড়িতে থেকে যারা বাচ্চাকাচ্চা পড়ায়, এথেন্সে তাদেরও বলে দাস।

'অ্যাঁ!'

'হুঁম, ঐ চিন্তা বাদ দাও। তুমি প্রতিভাবান। এখন পয়সা নেই। পয়সা একদিন হবে। তুমি আমার এখানেই থাকো। তোমার যা জ্ঞান, তা দিয়ে এথেন্সে কিছু একটা করতে পারবেই। তা, এথেন্স নিয়ে কি তুমি কিছু এঁকেছ?'

'না আঁকিনি। তবে আমি এথেন্সের কাহিনি বলতে পারি।'

'আবার কাহিনি? বললাম তো এ আমার দাদুও বলতে পারেন।'

'আমার বিশ্বাস, আমি যা বলতে পারব, সেটি আমাদের দাদুরা বলতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে। আলতু ফালতু কথা বাদ দিয়া সংক্ষেপে বলো।'

হেরোডোটাস বলতে আরম্ভ করলেন এথেন্সের কাহিনি। সফোক্লিস অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন। এ তো কাহিনি নয়। এ তো সত্য ঘটনা। আর ছেলেটি শুধু

ঘটনা বলে না, ঘটনা কেন ঘটছে, আগু-পিছু মিলিয়ে সেটিও বলে। ঘটনার পরে কী হতে পারে তাও বলছে। সফোক্লিসের মুগ্ধতা আরও বাড়ছে।

গল্প বলার এক ফাঁকে সফোক্লিস হেরোডোটাসকে চিনে ফেললেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, এই ছেলে, আমার সাথে এত বড় চালাকি করতে লজ্জা করল না? মাথার পাগড়ি খোল, হেরোডোটাস। আমি তোমাকে চিনে গেছি।

হেরোডোটাস হেসে ফেলল। সফোক্লিস তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

সফোক্লিস বললেন, তোমার চাচা তো একজন কবি। তার কথা আমি শুনেছি। যে অত্যাচারী রাজা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল, সে কি এখনও ক্ষমতায় আছে?

হেরোডোটাস বলল, হুঁম আছে। সে যতদিন আছে, আমি দেশে ফিরতে পারব না। আমার অবস্থা আসলেই খারাপ। টাকা-পয়সা নেই। একটি কাজ হলে মন্দ হয় না। সামোস দ্বীপে বসে আপনার কথা মনে হলো, তাই এথেন্সে চলে এলাম।

সফোক্লিস বললেন, এথেন্সে যখন এসেছো—ভালো কিছু হবেই। চিন্তা করো না। আজ বিশ্রাম নাও। কাল সকালে তোমাকে পেরিক্লিসের কাছে পাঠাব।

সকালবেলা ভৃত্য এসে পেরিক্লিসের হাতে একটি পত্র দিল। একটি লম্বা পেপিরাস টুকরো। ঠিক মাঝখানে অল্প একটু লেখা। তিনি চিঠি পড়লেন-

বন্ধুবরেষু পেরিক্লিস,

পরম করুণাময়ী দেবী এথিনার নামে শুরু করিলাম।

আমি একটি অনন্য অসাধারণ যুবককে তোমার কাছে পাঠাইলাম। যুবকটির নাম হেরোডোটাস। অসামান্য প্রতিভাধর যুবক। তুমি কিঞ্চিৎ আলাপ করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে আমি কোন উদ্দেশ্যে যুবকটিকে তোমার সমীপে প্রেরণ করিয়াছি। তুমি যেইরূপ মহান এথেন্সের স্বপ্ন দেখিয়া থাকো, সেইরূপ এথেন্সের কথা উহার চাইতে উৎকৃষ্টরূপে বলিতে আমি অদ্যাবধি আর কাহাকেও শুনি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যুবকটি তোমার বিশেষ কাজে আসিবে।

পুনশ্চ : তোমার বুঝিবার সুবিধার জন্য উল্লেখ করিতেছি যে, এই যুবক শুধু এথেন্সের কাহিনি জানে তাহাই নহে, সে ইতোমধ্যে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিজের হস্তে সসাগরা পৃথিবীর একখানা নকশাও অঙ্কন করিয়া ফেলিয়াছে।

কল্যাণময়ী দেবী এথিনা তোমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন।

ইতি,
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী,
সফোক্লিস

পত্র পড়েই পেরিক্লিস বারান্দায় এলেন। সফোক্লিস যখন অত জোর দিয়ে লিখেছেন, তখন ছেলেটির মধ্যে কিছু চমক আছে। সফোক্লিস ফালতু কথার লোক নন।

পেরিক্লিসকে দেখে হেরোডোটাস উঠে দাঁড়াল। সে এখানে চাকরির উমেদার। ভাব-হাব সেরকম হতে হবে। মুখে থাকবে একটি ভিক্ষুক ভিক্ষুক ভাব। কিন্তু খুব করে চেষ্টার পরও সে নিজেকে ভিক্ষুক বানাতে পারল না। তাকে একটুও চাকরির উমেদারের মতো লাগছে না। তার ভয় করছে। সে এথেন্সের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটির সামনে চাকরির আশায় দাঁড়িয়েছে। একটি চাকরির জন্য কত তুচ্ছ মানুষ তাকে কতভাবে অপমান করেছে, গলা ধাক্কাও দিয়েছে। আজ কপালে কী আছে, কে জানে!

কিন্তু আজ তার কপাল ভালো। একটু বেশি রকমই ভালো। পেরিক্লিস কোনো ভণিতা না করে সরাসরি বললেন, যুবক, তোমার চোখে ভয় দেখতে পাচ্ছি। কিসের ভয়? তুমি এখন এথেন্সে। এথেন্স মানে গণতন্ত্র। এথেন্স মানে মানুষের শাসন। গণতন্ত্রে কেউ কাউকে ভয় করে না। তোমার কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে ওখানে বসো।

বেশি বড় মানুষ সাহস দিলে উল্টা ভয় লাগে। হেরোডোটাসেরও ভয় লাগল। এবার না চাইতেই একটি ভিক্ষুক-ভিক্ষুক ভাব মুখে এসে গেল। সে কাঁচুমাচু করে বসল।

পেরিক্লিস বললেন, তুমি এথেন্সের কাহিনি বলতে পার? শুরু কর।

হেরোডোটাস উঠে দাঁড়াল।

পেরিক্লিস বললেন, একটু বসো। আর একজন আছে। সে আসুক। তারপর শুরু কোরো।

তিনি আসপাশিয়াকে ডাকতে দাসীকে ইশারা করলেন। আসপাশিয়া ঘরে ঢুকতেই হেরোডোটাস প্রায় ভিরমি খেলো। এমন সুন্দর মেয়ে সে আগে কোনোদিন দেখেননি। এর সামনে গল্প বলতে হবে ভেবে তার তালু আর ও শুকিয়ে গেল। আসপাশিয়া টের পেয়ে তাকে একটু পানি এগিয়ে দিল।

হেরোডোটাস কাহিনি শুরু করল। সফোক্লিস তাকে বলে দিয়েছেন, পেরিক্লিসের কাছে শুধু এথেন্সের কাহিনি বলতে হবে। অন্য দেশের কাহিনি পেরিক্লিস পছন্দ করবেন না। পেরিক্লিসের মনে ঢুকতে শুধু এথেন্সে কথা আর গণতন্ত্রের কথা বলতে হবে।

হেরোডোটাস বলছে আর পেরিক্লিস ও আসপাশিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। সবই তাদের জানা কথা। কিন্তু হেরোডটাসের মুখে এথেন্সের মহিমা কেমন অন্য রকম ভালো লাগছে। কাহিনিতে নেশা ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে ছেলেটির। সে অনেক চতুর। একটু একটু দেবতার কথা ঢুকিয়ে গল্প বলছে। মানুষের কথা পনেরো আনা, সেই সাথে এক আনা অলৌকিক ঘটনা। দারুণ মিশ খাচ্ছে। শুনতে চমৎকার লাগছে।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। হেরোডোটাস বলেই চলেছে। দাস এসে খবর দিল, পেরিক্লিসের সাথে দেখা করতে অনেকে এসেছে।

পেরিক্লিস বললেন, সবাইকে বিকেলে আসতে বলো। আমি ব্যস্ত।

আরও অনেকক্ষণ শুনিয়ে গল্প শেষ করল হেরোডোটাস। আসপাশিয়া হাততালি দিয়ে উঠল। পেরিক্লিস উঠে দাঁড়িয়ে হেরোডোটাসকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন, তুমি তো কাঁচা সোনা। হেরোডোটাস, তুমি কাল বিকেলে একবার এসো। তোমার জন্য কোনো ছোট-মোট কাজ নয়। তোমাকে অনেক বড় কিছু করতে হবে, বিশাল কিছু।

আসপাশিয়া হেরোডোটাসকে বলল, যা বললেন— সেগুলো কি আপনি কোথাও লিখেছেন?

হেরোডোটাস বলল, টুকরো-টুকরো লেখা আছে। নোটের মতো আর কি! ভালো করে লিখিনি।

আসপাশিয়া বলল, আপনি সব গল্প লিখে ফেলুন। একটি বই করুন। পৃথিবীতে এমন কাজ আগে হয়নি। মানুষের ঘটনা আগে কখনো লেখা হয়নি। আপনি লিখুন।

হেরোডোটাস বিদায় নিলে পেরিক্লিস আসপাশিয়াকে বললেন, বলো তো। ছেলেটি তো নতুন কিছু বলেনি। তাহলে আমার এত ভালো লাগল কেন?

আসপাশিয়া বলল, হেরোডোটাস একজন বিদেশি। একজন বিদেশি যখন এথেন্সের কথা বলছে, আমাদের ভালো লাগছে। তার মুখে এথেন্সের প্রশংসা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এথেন্সের কেউ বললে সেটি নিজের ঢাক নিজে পিটানোর মতো ব্যাপার হয়। আর হেরোডোটাস বললে মনে হয় এক পণ্ডিত একেবারে সাচ্চা বয়ান দিচ্ছে।

‘ঠিক বলেছ। তবে ছেলেটির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।’

‘হ্যাঁ, এখন বলেন, এই অসাধারণ জিনিসটাকে কি কাজে লাগাবেন?’

‘তুমিই বলো কী করব।’

‘ওকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেন। জমকালো অনুষ্ঠান। সারা এথেন্সের মানুষকে দাওয়াত দেন। সবার সামনে সে ম্যারাথন যুদ্ধের কথা বলবে।’

‘তাতে আমার লাভ?’

‘আপনার নিজের খরচে আয়োজন করবেন। সবাই বলবে— পেরিক্লিস এথেন্সের গৌরবের কথা প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। আপনার সুনাম আরও বাড়বে।’

‘আর হেরোডোটাস?’

‘সেও বিখ্যাত হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত— অনেকেই তাকে পুরস্কার দেবে।’ পেরিক্লিস হাসি দিলেন। সম্মতির হাসি।

***

৫৫. হেরোডোটাস (Herodotus): ইতিহাসের জনক, পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস বইয়ের লেখক।

৫৬. তখনও পর্যন্ত ইউরোপের মানুষ জানত যে এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকা নিয়েই পৃথিবী। অন্য কোনো ভূখণ্ড তখনও অজানা ছিল।

১৯

‘শুধু সুন্দর নামের কোনো মূল্য নেই,
যদি নামের যোগ্য প্রতিভা না থাকে।’
— হোমার

আজ বিকালে বিশাল অনুষ্ঠান।

সক্রেটিস আর ক্রিতো চলেছে সেই অনুষ্ঠানে। এক্রোপোলিসের দক্ষিণ কোণে একটি নতুন ভবন তৈরি করেছেন পেরিক্লিস। বিশাল ভবন। এখানে গান, নাচ, থিয়েটার হয়। কিন্তু আজ সেখানে নাচ-গান নয়, আজ গল্প বলা হবে। গল্প বলবে হেরোডোটাস।

ভবনের চারদিকে অর্ধ-গোলাকার গ্যালারি। গ্যালারির যেখানেই বসুন না কেন, শব্দ শোনার জন্য আছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। অডিও ভালো শোনা যায় বলে এই ভবনের নাম অডিওন। এই অডিওনই এখন এথেন্সের প্রধান বিনোদন কেন্দ্র।

আজকের বিনোদন অন্য রকমের। মানুষ তো প্রথমে বিশ্বাসই করেনি যে গল্প বলার জন্য অনুষ্ঠান হতে পারে। তবে আয়োজনের বাহার দেখে মনে হচ্ছে বড়ো কিছু একটিই হবে। বিশাল কাণ্ড চলছে। সাত দিন ধরে সারা এথেন্সে ঢোল- নাকারা পিটিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বিকেল হতেই লাইন দিয়ে মানুষ আসছে।

আসপাশিয়া বিশেষভাবে খবর দিয়েছে সক্রেটিসকে। সে যেন অবশ্যই আসে। আজকের অনুষ্ঠানে নাকি পেরিক্লিস একটি নতুন চমক দেবে।

ক্রিতো বলল, পেরিক্লিস অডিওনের অনুষ্ঠান সবার জন্য বিনামূল্যে করে দিয়েছেন। আগে অনুষ্ঠান দেখতে টিকেট লাগত। সে একটি ঝানু লোক।

সক্রেটিস বলল, গণতন্ত্রের নেতাকে সব সময় প্রেমের অভিনয় করতে হয়। মানুষকে ভালোবাসার অভিনয়।

গ্যালারি এর মধ্যেই প্রায় ভরে গেছে। তারা পেছনের দিকে বসল। প্রথম সারি পেরিক্লিস ও অন্য নেতাদের জন্য। দ্বিতীয় সারিতে বসবে সৈনিকরা।

সফোক্লিসের সাথে অডিওনে প্রবেশ করল হেরোডোটাস। তার হাতে কয়েক টুকরো পেপিরাস। সে কিছু কিছু অংশ লিখে এনেছে। সবার দৃষ্টি তার দিকে। গ্যালারি টইটুম্বুর। তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও।

একটু পরেই উত্তরের গেইট দিয়ে ঢুকলেন পেরিক্লিস। তিনি ঢোকার সাথে সাথে সারা গ্যালারিতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই বলছে, কে এসেছে? কে এসেছে? সবাই দাঁড়িয়ে কাকে যেন দেখার চেষ্টা করছে। না, তারা পেরিক্লিসকে দেখছে না। পেরিক্লিসের সাথে এসেছে আসপাশিয়া। তাকেই দেখছে।

ক্রিতো বলল, আসপাশিয়াকে নিয়ে এসে পেরিক্লিস ভীষণ সাহসের কাজ করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো আসপাশিয়ার জন্য হেরোডোটাস তো বিপদে পড়ে গেল। সবাই আসপাশিয়াকেই দেখছে। কেউ হেরোডোটাসকে দেখছে না। আজ আর কেউ তার কথা শুনবে না। সে ডাব্বা মারবে।

অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। হেরোডোটাসকে নিয়ে মঞ্চে গেলেন সফোক্লিস। তিনি বললেন, প্রিয় এথেন্সবাসী, দেবী এথিনার কৃপায় আমাদের মাঝে এখন হাজির হবে হালিকারনাসস শহর থেকে আগত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার নাম হেরোডোটাস। সে গল্প বলবে। আমাদের গল্প। এথেন্সের গল্প। তো আর দেরি নয়-এক্ষুনি মঞ্চে আসছে অসাধারণ গল্পকার, অদ্ভুত কাহিনিকার হেরো... ডোটাস।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন হেরোডোটাস। তার পা কাঁপছে। মনে হচ্ছে গলা দিয়ে স্বর বের হবে না। তার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে শুধু তার কথা

শোনার জন্য এত বড় অনুষ্ঠান? সামনে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী গুণী মানুষেরা বসে আছেন। শুধু তার গল্প শুনবে। ভীষণ ভয় করছে হেরোডোটাসের। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। লোকজন ফিসফিস শুরু করেছে। আরও দেরি করলে হাসি ঠাট্টা শুরু হয়ে যাবে।

হেরোডোটাস মনে মনে দেবী এথিনাকে বলল, 'দেবী, গরিবের ইজ্জত রেখো।' তারপর গভীর নিশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর সবচেয়ে মহৎ মাটির উপর। সারা পৃথিবীর মানুষ যে মাটির কাছে ঋণী, সেই পুণ্যভূমি এথেন্সের মাটিতে দাঁড়াতে পেরে আমি ধন্য।

আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন।

চারিদিকে তুমুল করতালি। চমকে উঠেছেন পেরিক্লিস। চমকে উঠেছেন সফোক্লিস। সংকোচে গুটিসুটি হয়ে ছিল আসপাশিয়া। সেও অবাক।

ক্রিতো চিৎকার করে বলল, সক্রেটিস, হেরোডোটাস তো মাৎ করে দিল একটু আগে সবাই আসপাশিয়াকে দেখছিল। এখন সব চোখ হেরোডোটাসের দিকে। এই ব্যাটা তো কথার জাদুকর।

হেরোডোটাস চোখ বন্ধ করে করতালির শব্দ শুনছে। এত মধুর শব্দ! প্রতিটি করতালি যেন শক্তি হয়ে তার মধ্যে ঢুকছে। ভেতর থেকে বের হচ্ছে নতুন এক হেরোডোটাস। সে ভাবছে আজই সুযোগ। এথেন্সবাসী যদি তার কথা পছন্দ করে, সেও হয়ে যেতে পারে নতুন একজন হোমার।

হেরোডোটাস বলে যাচ্ছে এথেন্সের কাহিনি। তার গলা ভরা আবেগ। এই হাসছে, এই কাঁদছে। তার সাথে দর্শকরাও হাসছে আবার কাঁদছে। একটু পর পর পড়ছে করতালি। হেরোডোটাস গণতন্ত্র আবিষ্কারের কথা বলল। মহামতি সলোন আর ক্লিসথেনিসের কথা বলল। এরপর বলল, আমাদের সামনে এই মুহূর্তে একজন নেতা বসে আছেন। এই নেতা যখন তার মায়ের পেটে ছিলেন, তখন একদিন মা স্বপ্নে দেখলেন— তিনি সিংহ প্রসব করেছেন। মায়ের স্বপ্ন সত্য হয়েছে। আমাদের সামনে এখন সত্যিই বসে আছেন এক সিংহ। তিনি আর কেউ নন; আমাদের সবার প্রিয় নেতা, এথেন্সের সিংহ পুরুষ পেরিক্লিস।

বিশার হাততালি। পেরিক্লিস লজ্জা পেলেও উপভোগ করছেন।

সফোক্লিস চোখ বাঁকা করে হেরোডোটাসকে দেখছেন। ছেলেটা একেবারে জায়গামতো আঘাত করেছে। পেরিক্লিসের এমন প্রশংসা করতে অন্য কেউ পারেনি। হেরোডোটাস তো মহা ধুরন্ধর। তার পেটে বহুত গুড়া প্যাঁচ। সময় মতো প্যাঁচগুলো কাজে লাগাচ্ছে। সে উন্নতি করবে।

হেরোডোটাস বলে চলেছে, এবারে এথেন্সের সবচেয়ে বড় বীরত্বের কথায় আসি। এখন বলব— সেই যুদ্ধের কথা, যে যুদ্ধে এথেন্স গ্রিসকে বাঁচিয়েছে সে যুদ্ধের নাম— ম্যারাথনের যুদ্ধ।

লোকজন সব নড়েচড়ে বসল। এখানের অনেকেই ম্যারাথন যুদ্ধ করেছেন। প্রায় সবার ঘরেরই কেউ না কেউ সেই যুদ্ধে গিয়েছিল। এখন সবাই চুপ। একেবারে পিন পতন নীরবতা।

হেরোডোটাস গম্ভীরভাবে বলছে ম্যারাথন যুদ্ধের কথা—

তখন এথেন্সে মাত্র গণতন্ত্র এসেছে। মানুষ নিজেই রাজা হয়েছে। মানুষের অনেক সাহস। অনেক আনন্দ। আনন্দে সবাই দিন রাত কাজ করছে। পড়াশুনা করছে। গবেষণা করছে। মানুষ জ্ঞানী হচ্ছে। ধনী হচ্ছে। এথেন্স হয়ে উঠছে সুন্দর থেকে সুন্দরতম। সেই সময় এই সুন্দরী এথেন্সের উপর নজর পড়ল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য পারস্যের

পারস্যের রাজা দারিউস। দারিউসের নামে চারদিক থরথর করে কাঁপে। এথেন্সের লোকজন দারিউস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। তারা জানে তার নাম 'বড় রাজা'। সেই বড় রাজার এমনই প্রতাপ যে তার সামনে কেউ চোখ তুলে তাকায় না। মন্ত্রীরাও তার সামনে কাপড়ে মুখ ঢেকে কথা বলে যেন তাদের নিশ্বাসের বাতাসটাও বড় রাজার আশেপাশে না যায়। এশিয়া আর আফ্রিকা জুড়ে তার রাজত্ব। মিশর, ব্যাবিলন থেকে ভারত পর্যন্ত। তিনি অগ্নি উপাসক। আগুনই তার দেবতা।

তো পারস্যের বড় রাজা দারিউস সাহেবের খায়েস হলো এবার ইউরোপে রাজ্য বাড়াবেন। সেনা পাঠালেন। বসফরাস প্রণালি পার হয়ে তার সেনারা আসতে থাকল এশিয়া মাইনরের ছোট ছোট দ্বীপে। অনেক দ্বীপই পারস্যের কাছে হার মানল। শুধু আইওনিয়ান সাগরের কয়েকটা দ্বীপ হার মানল না। তারা একজোট হয়ে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। তারা অন্য সকল গ্রিক দ্বীপের কাছে সাহায্য চাইল। কিন্তু পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে কেউ সাহস পেল না। শুধু একটি নগর সাহস দেখাল। সেই সাহসী নগর হলো আমাদের এই এথেন্স।

অডিওনের দর্শকরা আবার হাততালি দিল।

হেরোডোটাস বলে চলেছেন:

এথেন্সে তখন গণতন্ত্রের বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। সংসদে তর্ক হলো পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রিক দ্বীপগুলোকে সাহায্য করা হবে কিনা। নেতারা বললেন, গণতন্ত্র মানে মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো। দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো। সংসদে পাস হলো, হ্যাঁ, এথেন্স পারস্যের বিপক্ষে আইওনিয়ান দ্বীপগুলোকে সাহায্য করবে। তারা যুদ্ধ জাহাজ পাঠাল। এথেন্সের এই স্পর্ধার কথা শুনল বড় রাজা দারিউস। পুঁচকে এথেন্সের এই দুঃসাহস তার অসহ্য লাগল। সে বিশাল সেনাবাহিনী পাঠাল এথেন্স দখল করতে।

নতুন গণতন্ত্রের জন্য এ এক অগ্নিপরীক্ষা। কী করবে তারা? সবাই ছুটে এলো পিনিক্স পাহাড়ে। আবার ভোট হবে— যুদ্ধ নাকি আত্মসমর্পণ? মুক্তি নাকি দাসত্ব? মুক্তি চাইলে যুদ্ধ করতে হবে। এথেন্সের প্রতিটি নাগরিক জেনে বুঝে ভোট দিল— তারা যুদ্ধ

করবে। তারা বলল, আমরা বীরের জাতি। আমরা প্রত্যেকে এক-একজন একিলিস। এক-একজন হারকিলিউস। আমরা হার মানব না। নিজেদের বাঁচাতে যুদ্ধ করব।

পৃথিবীতে সেদিন একটি নতুন ঘটনা ঘটল। এই প্রথম সাধারণ জনগণ তাদের নিজের ইচ্ছায় যুদ্ধের জন্য ভোট দিল। তাদের যুদ্ধ কোনো রাজার জন্য নয়, রানির আদেশে নয়। নিজেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ। পরিবারকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ। মুক্তির জন্য যুদ্ধ। এথেন্সের গণতন্ত্র সেদিন মাতৃভূমিকে বাঁচাতে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক হলো এজিয়ান সাগরের তীরে ম্যারাথন[৫৭] নামক জায়গায় তারা পারস্যবাহিনীর মুখোমুখি হবে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো। প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ যুদ্ধ করবে। যার যা আছে, তাই নিয়েই যুদ্ধ করবে। সব চেষ্টার পরেও দেখা গেল, এথেন্সের সেনাসংখ্যা পারস্যের অর্ধেকেরও কম। এথেন্সের সাহায্য দরকার। মিত্র দরকার। এই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী নগর হলো স্পার্টা। এই বিপদে স্পার্টা যদি সাহায্য করে, তাহলে পারস্যের মোকাবিলা করা সম্ভব। স্পার্টায় খবর পাঠাতে হবে। হাতে কোনো সময় নেই। দু'এক দিনের মধ্যেই পারস্যের সেনারা এসে পড়বে। তাই কালকের মধ্যেই স্পার্টার সেনাদের নিয়ে আসতে হবে।

পাহাড়ি এলাকা। কোনো রাস্তা নেই। ঘোড়াও যেতে পারে না। খবর দিতে হলে কাউকে দৌড়ে যেতে হবে। এগিয়ে এলো একজন। তার নাম ফিডিপিডিস। সে এক দৌড়ে স্পার্টায় গিয়ে খবর দেবে। সে হলো নতুন খবরি।

ফিডিপিডিস শুরু করল দৌড়। জীবন বাঁচানোর দৌড়। এথেন্সকে বাঁচানোর দৌড়। মাতৃভূমি রক্ষার দৌড়। সে একশ পঁচিশ মাইল দৌড়ে স্পার্টার রাজার দরবারে পৌঁছল। কিন্তু লাভ হলো না। স্পার্টা সাহায্য করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। এখন স্পার্টায় উৎসব চলছে। এই উৎসবের সময় তাদের যুদ্ধ করার নিয়ম নেই। আগামী পূর্ণিমার পরের দিন তাদের সেনারা এথেন্সের দিকে যাত্রা করবে।

হতভম্ব হয়ে গেল ফিডিপিডিস। যুদ্ধ তো কালকে। এথেন্সের মানুষ আশা নিয়ে বসে আছে। ফিডিপিডিস স্পার্টার সেনাদের নিয়ে ম্যারাথনের ময়দানে উপস্থিত হবে। এখন সে ফিরে গিয়ে কী বলবে? তবু এই খবরটাই এথেন্সে দ্রুত পৌঁছাতে হবে। তারা অন্য পরিকল্পনা করবে। সে আবার দৌড় শুরু করল। এবার স্পার্টা থেকে সরাসরি যেতে হবে ম্যারাথনের ময়দানে।

এথেন্সের সব পুরুষ এখন ম্যারাথনে। তাদের সেনাপতি দশজন আর দশজনের প্রধানের নাম মিলটিয়াডিস[৫৮]। তারা যুদ্ধের নতুন এক কায়দা বের করেছে। মাঝারি পর্যায়ের একদল সেনা আছে যাদের নাম হপলাইট। তাদের এক হাতে বর্শা আর অন্য হাতে বিশাল ঢাল। তারা পরীক্ষা করে দেখেছে একসাথে আটজন হপলাইট গোল হয়ে ঢালগুলো কোনাকুনি উঁচু করে ধরতে পরলে চারদিক ঢেকে যায়। তাতে কারও গায়ে আর বিপক্ষ দলের তীরের বা বর্শার আঘাত লাগতে পারে না। সেজন্য তারা আটজন করে

হপলাইট একসাথে গোল হয়ে এগোয়। বিপক্ষে ঢুকে একসাথে আক্রমণ করে টপাটপ কয়েকজনকে মেরেই আবার একসাথে গোল হয়ে যায়। একটু পর পর একসাথে আক্রমণ করে আবার একসাথে গোল হয়ে যায়। এই যুদ্ধ কায়দার নাম হপলাইট যুদ্ধ।

পারস্য সেনারা এসে পৌঁছল। তাদের সংখ্যা এথেন্সের সেনার দ্বিগুণের বেশি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই এথেন্সের কৌশলে পারস্য বিপদে পড়ে গেল। হপলাইটদের কায়দায় বেঘোরে মরতে শুরু করল পারস্য বাহিনী।

টানা দুই দিন দৌড়ে ফিডিপিডিস ম্যারাথনে পৌঁছে দেখে অর্ধেকের কম সেনা নিয়ে কী প্রাণপণ যুদ্ধ করছে এথেন্সবাসী। সে জীবনে অনেক যুদ্ধ দেখেছে, কিন্তু এমন প্রাণপণ সংগ্রাম দেখেনি। সে ভাবছে এমন করে কীভাবে লড়ছে এথেন্সের মানুষ? তার মনে পড়ল — এথেন্সের যারা যুদ্ধ করছে তারা সাধারণ নাগরিক, ভাড়াটে সৈনিক নয়। তারা ভোট দিয়েছে যুদ্ধ করার জন্য। তারা টাকার জন্য নয়; লড়াই করছে নিজেকে বাঁচাতে, পরিবারকে বাঁচাতে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না এথেন্সের সেনারা। এথেন্স জিতে যাচ্ছে। বিশাল পারস্য বাহিনী জাহাজে উঠে পালাচ্ছে। আনন্দে তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে। চিমটি কেটে দেখছে আসলেই কি জিতে গেছি! তারা চিৎকার করে বলল— জয় এথিনা। কিন্তু খবর এলো যুদ্ধ শেষ হয়নি। পারস্য বাহিনী ফন্দি করেছে। তারা জাহাজ নিয়ে ম্যারাথন থেকে ঘুরপথে এথেন্সের দিকে যাচ্ছে। সরাসরি এথেন্স দখল করবে।

আবার শুরু হলো দৌড়। এবার ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দিকে। সবাই একসাথে দৌড়। শত্রুর আগে এক্রোপোলিস পৌঁছাতে হবে। বাঁচাতে হবে এথেন্সকে।

ফিডিপিডিস সবার আগে। তার গতি অনেক বেশি। সবাইকে পিছে ফেলে সে এগিয়ে যাচ্ছে। এথেন্সের কাছাকাছি এসে গেছে ফিডিপিডিস। একজন খবর দিল আর দৌড়াতে হবে না। পারস্যের জাহাজ আর এথেন্সের দিকে আসেনি। তারা পালিয়ে গেছে।

তবু ফিডিপিডিস থামছে না। এখন দৌড়াতে ভালো লাগছে। এই দৌড় জয়ের দৌড়। সে সবাইকে জানাবে এথেন্স জিতে গেছে। সে থামতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে দৌড়ের মতো এত সুন্দর জিনিস আর হয় না।

ফিডিপিডিস এথেন্সে এসে গেছে। ঐ তো এক্রোপলিস! ঐ তো দেবী এথিনা। দেখা যাচ্ছে। পৌঁছে গেছি দেবী এথিনার মন্দিরে। এক্ষুনি দেবীকে গিয়ে বলব, দেবী, আমরা জিতে গেছি। সত্যি জিতে গেছি। কিন্তু তার পা যে চলছে না! মনে হচ্ছে পায়ের পেশি ছিপে যাচ্ছে। গত দুদিনে সে দুইশ মাইলের বেশি দৌড়েছে। এখন ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত একটানা ছাব্বিশ মাইল। আর পারছে না। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে গেছে। তীব্র কষ্ট হচ্ছে। তবু ছুটছে। এথেন্সের লোকজন ছুটে আসছে। তাদের চোখে ভয়। ফিডিপিডিস একা কেন? তাহলে কি এথেন্স হেরে গেছে?

ফিডিপিডিস এখন পা তুলতেও পারছে না। তবুও আগাচ্ছে। মনের জোরেই আগাচ্ছে। তার মাথা ঘুরছে, নিঃশ্বাস টানতে পারছে না, চোখে অন্ধকার দেখছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি লুটিয়ে পড়বে। তবুও সে অবস্থাতেই কোনোমতে পৌঁছল এক্রোপলিসে। এথিনার মূর্তি ছুঁয়ে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল— আমরা জিতে গেছি। আমরা জিতে...

শেষ করতে পারল না কথাটা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ফিডিপিডিস[৫৯]। মন্দিরের লোকেরা ধরাধরি করে তুলতে গেল। কিন্তু না, তার দেহে সাড়া নেই। প্রাণও নেই। শুধু চোখে কয়েক ফোঁটা পানি। ডান হাত মুঠো করে উপরে তোলা। মুখটা হাঁ করে আছে। 'আমরা জিতে গেছি' কথাটা শেষ করতে পারেনি। ফিডিপিডিস পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে দেবী এথিনাকে জয়ের খবর দিয়ে গেছে। গত দুই দিন সে কেবল দৌড়েছে। একটি বিজয়ের খবরের জন্য ছুটেছে। যে খবরের জন্য সে ছুটেছে, সেই খবর সে এনেছে। এথেন্স জিতেছে। ম্যারাথন ময়দান থেকে জেতার খবর নিয়ে এসেছে ফিডিপিডিস। কিন্তু সবাইকে কাঁদিয়ে নিজে চলে গেছে চিরকালের জন্য।

হেরোডোটাস বলে চলছে—

ফিডিপিডিস নেই। এথেন্স আছে। ম্যারাথনের বিজয় আছে। ঐ যে, দেবী এথিনা। দেবী আজও বলছেন, আমরা জিতে গেছি। এথেন্সের বাতাস বলছে, আমরা জিতে গেছি। এথেন্স জিতে গেছে।

শুধু খবরটা আর একবার বলার জন্য ফিডিপিডিস আর নেই। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। চিরতরে চলে গেছে।

বলতে বলতে হেরোডোটাস থামল। তার চোখ পানিতে ভরে গেছে। ফিডিপিডিসের জন্য সে কাঁদছে। বুক ভাসিয়ে কাঁদছে। প্রতিটি দর্শকের চোখে পানি। তারাও কাঁদছে। সবাই ফিডিপিডিসের জন্য কাঁদছে।

আসপাশিয়া ইশারা করল। পেরিক্লিস ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠলেন। জড়িয়ে ধরলেন হেরোডোটাসকে।

অশ্রুভরা গলায় পেরিক্লিস বললেন, ভাইয়েরা আমার। আমরা ফিডিপিডিসকে ভুলিনি। তার স্মরণে প্রতি বছর ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত একটি দৌড় হয়। সে দৌড়ের নাম ম্যারাথন দৌড়। আমরা সবাই এই যুদ্ধের কাহিনি জানি। কিন্তু আজ হেরোডোটাস যেভাবে বলল, তেমন করে কেউ বলতে পারেনি। বিদেশি হয়ে সে এথেন্সের জন্য কাঁদছে। তার সাথে আমরা কাঁদছি। এই কান্না সুখের। এই কান্না গর্বের। এই কান্না এথেন্সের বীরত্বের। আসুন, আমরা হেরোডোটাসের জন্য একটি বড় হাততালি দিই।

মুহূর্তেই সারা ঘর করতালিতে ফেটে পড়ল। তালি চলছেই। মনে হচ্ছে আজ রাতে এই করতালি থামবে না। পেরিক্লিস বললেন, বন্ধুরা, হেরোডোটাসকে আমরা সম্মানিত করব। আমরা তাকে পুরস্কার দেব। আপনারা বলুন, কী পুরস্কার দেব? সোনা নাকি রুপা?

দর্শকরা চিৎকার করে বলল, সোনা।

‘ঠিক আছে। পাস হলো স্বর্ণ মুদ্রা দেব। আমার ইচ্ছা করছে তাকে দু হাত ভরে সোনা দিই। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত এখানে নয়। কত মুদ্রা দেওয়া হবে সেটি সংসদে ভোটে ঠিক হবে।’

দর্শকরা বলল, তাই হোক।

পেরিক্লিস বললেন, আজ থেকে হেরোডোটাস আমাদের সম্মানিত অতিথি। তিনি যতদিন ইচ্ছা এথেন্সে থাকবেন। সব দায়িত্ব এথেন্স সরকারের।

তুমুল করতালি পড়ছে চারদিকে। পেরিক্লিস বললেন, ‘আরও আছে। হেরোডোটাস এই কাহিনি নিয়ে বই লিখবে। আমরা এথেন্সের পক্ষ থেকে সেই বই প্রকাশ করব। সব খরচ আমাদের। শেষ কথা: আমাকে আসপাশিয়া একটি বুদ্ধি দিয়েছে।’

দর্শকরা চমকে উঠল। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল— কে বুদ্ধি দিয়েছে?

‘আসপাশিয়া। সে বলেছে দুই সপ্তাহ পরে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। অলিম্পিকে সারা পৃথিবীর মানুষ আসে। সেখানে আমরা হেরোডোটাসকে নিয়ে যেতে পারি। সবার সামনে হেরোডোটাস এথেন্সের কথা বলবে। আপনারা কী বলেন?’

সবাই রাজি। এরচেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হয় না। পেরিক্লিস বললেন, হেরোডোটাস যদি রাজি থাকে, আমরা তাকে অলিম্পিয়ায় নিয়ে যাব।

হেরোডোটাস বলল, এথেন্সের মানুষ যদি চায়, আমি সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে এথেন্সের কথা বলব। আর অলিম্পিকের ময়দান তো আমার জন্য বিরাট সুযোগ। আমি যাব, অবশ্যই যাব।

এবার উঠে দাঁড়ালেন সফোক্লিস। তিনি মজা করে বললেন, কিন্তু বাপু পেরিক্লিস। তুমি তো অলিম্পিয়ায় যাও না। সেখানে নাকি স্পার্টার সাথে এথেন্সের খেলোয়াড়রা পারে না। তুমি সত্যি সেখানে যাবে?

পেরিক্লিস বললেন, যাব। এই বছর আমি অলিম্পিকে যাব। কারণ এবার আমার সাথে আছে একজন গল্পবাজ খেলোয়াড়। তার নাম হেরোডোটাস। অলিম্পিকে এথেন্সের খেলোয়াড়রা জিতুক আর নাই জিতুক, হেরোডোটাস জিতবে। এথেন্সও জিতবে।

গ্যালারিতে বসে সক্রেটিস আর ক্রিতো সব দেখছিল। সক্রেটিস ক্রিতোকে বলল, পেরিক্লিসের কূটনীতিটা দেখেছো! আসপাশিয়াকে কেমন করে সবার সামনে নিয়ে এলেন। সবাই আসপাশিয়াকে মেনে নিলো। আসপাশিয়ার বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত নিল এথেন্সের মানুষ। তার কথাতেই হেরোডোটাসকে নিয়ে যাচ্ছে অলিম্পিকে। পেরিক্লিস এক ঢিলে দুই পাখি নয়, অনেকগুলো পাখি মারলেন।

ক্রিতো বলল, যাবে নাকি এবার অলিম্পিকে? চলো— তুমি, আমি আর চেরোফোন সবাই মিলে হই হই করে অলিম্পিকে যাই।

***

৫৭. ম্যারাথন: ম্যারাথন যুদ্ধ হয়েছিল খ্রি.পূ. ৪৯০ সালে, ম্যারাথনের প্রান্তর এথেন্স শহর থেকে ৪২ কি.মি. উত্তর-পূর্ব দিকে (প্রায় ২৬ মাইল)।

৫৮. ম্যারাথন যুদ্ধে এথেন্সের সেনাপতি ছিলেন মিলটিয়াডিস (Miltiades), পারস্যের বিরুদ্ধে ম্যারাথন প্রান্তরে তার যুদ্ধকৌশলেই এথেন্স জয়লাভ করেছিল।

৫৯. ম্যারাথন প্রান্তর থেকে জয়ের খবর নিয়ে ৪২ কিলোমিটার দৌড়ে এথেন্সে এসে মৃত্যুবরণ করেন এথেন্সের দৌড়বিদ ফিডিপিডিস (Pheidippides)। তার এই দৌড়ের স্মরণেই এখনও ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হয়।

২০

‘রক্তপাত ছাড়া যে জয়,
সে জয়ই সবচেয়ে গৌরবের।’
—পিটাকাস

সভ্য উপায়ে মানে মারামারি কাটাকাটি না করে, বীর হওয়ার আয়োজন অলিম্পিক। হাজার বছর ধরে গ্রিকরা মনে করে— যুদ্ধে যে সেরা, সেই হলো বীর। যুদ্ধের মাঠে অন্যকে হত্যা করে নিজে বেঁচে ফিরতে পারলেই সে বীর। হোমারের বীর একিলিস তাদের অনুপ্রেরণা। বীর হবে রক্ত পিপাসু, বীর হবে খুনি।

এক সময় কিছু গ্রিক মানুষ ভাবল বীরত্ব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপার নয়। মানুষ ইচ্ছে করলে, মানুষ না মেরেও বীর হওয়া যায়। এই ভাবনা থেকে রক্তপাত ছাড়া বীরত্ব প্রকাশের জন্য তারা একটি খেলার আবিষ্কার করল। সেই খেলার নাম অলিম্পিক।

খেলার ময়দান এথেন্স থেকে তিনশ মাইল দূরে অলিম্পিয়া নামক একটি জায়গায়। সারা গ্রিসের পুরুষরা দৌড়, বর্শা ছোড়া, রথ চালানোর মতো খেলায় অংশ নেয়। এখানে যে জেতে সেই হলো নতুন বীর। অলিম্পিয়ায় হয় বলে এর নাম অলিম্পিক।

সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে আসে। ঘোড়া, রথ, গাধা যার যা আছে সব নিয়ে লাইন ধরে আসে। অলিম্পিয়ার পাশে দুটি নদী একসাথে মিলেছে। নদীপথেও অনেক মানুষ আসে।

অলিম্পিয়া জায়গাটি খুবই সুন্দর। চারিদিকে শুকনো খরখরা পাহাড়ের মাঝে হঠাৎ এক টুকরো শান্ত-সবুজ মাটি। যেন নেই-নেইর মাঝে হঠাৎ করেই অনেক কিছু আছে। পাশেই সুন্দর ঝরনা। এঁকেবেঁকে নিচে নেমে গেছে। শান্ত নদী চলছে কুল কুল শব্দে। লোকে বলে একদিন দেবতাদের রাজা জিউস অলিম্পাস পাহাড়ে বসে খুঁজছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কোনটি। সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত জিউস হঠাৎ অলিম্পিয়া[৬০] নামক নগরের একটি জায়গা দেখে বললেন, হ্যাঁ, এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান। তিনি তার অস্ত্র বজ্র ছুড়ে মারলেন। এখানে তৈরি হলো জিউসের মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই হয় অলিম্পিক খেলা।

গ্রিকরা তাদের সব কাজে দেবতাদের নিয়ে আসে। দেবতাদের নাম নিলে মানুষকে যা খুশি বোঝানো যায়, যেভাবে খুশি চালানো যায়। তাই অলিম্পিক খেলায়ও দেবতা এসেছে। ধুমধাম করে খেলার সাথে ধর্মকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ বিশ্বাস করে দেবতাদের মাধ্যমেই অলিম্পিক শুরু হয়েছে।

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী অলিম্পিক শুরুর কথা মোটামুটি এরকম—

জিউসের ছেলে মহাবীর হারকিউলিসকে বারোটি শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পঞ্চম শাস্তিটি ছিল এলিস নগরের রাজার ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করা। এই রাজার ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘোড়া। সেই ঘোড়ার আস্তাবল এমন নোংরা হয়েছিল যে, মানুষের পক্ষে সেটি পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। হারকিউলিস ভালোমানুষি করে শাস্তি মেনে নিয়েছিল। সে ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করতে এলো। কিন্তু এত বড় বীর হারকিউলিস— সে কিনা ঘোড়ার বিষ্ঠা পরিষ্কার করবে? রাজা তাকে লোভ দেখাল— এটি পরিষ্কার করতে পারলে, তোমাকে আমার ঘোড়াগুলো থেকে দশ ভাগের এক ভাগ ঘোড়া দিয়ে দেব। লোভে পড়ল হারকিউলিস। ঘোড়ার লোভে জান-প্রাণ দিয়ে কাজ শুরু করল। পুরো আস্তাবল ঝকঝকে, তকতকে করে তুলল। রাজাকে বলল, রাজা, তোমার লম্বা নাক দিয়ে ওঁকে দ্যাখো, কোথাও ঘোড়ার মূত্রের কোনো গন্ধ নেই।

কিন্তু কেউ কথা রাখে না। রাজাও রাখল না। রাজা ঘোড়া দিল না। এমন বেইমানি সহ্য হলো না হারকিউলিসের। রাগে সে লণ্ডভণ্ড করে ফেলল এলিস নগরী। সব ভেঙে চুরমার। ভাংচুর শেষ হলে তার মনে হলো— এমন ধ্বংসের কাজ কি আমার মতো বীরকে মানায়? মাথা গরম করে কী করলাম? হারকিউলিসের স্বভাব ছিল এরকম— সে

হঠাৎ মাথা গরম করে উল্টা-পাল্টা কাজ করে ফেলত। তারপর অনুতাপ করে ভালো ভালো কাজ করত। এবারও তার খুব অনুতাপ হলো। ভালো কিছু করতে হবে। সে ঘোষণা করল— এই এলিস নগরের অলিম্পিয়াকে তিনি বিখ্যাত করে যাবেন।

হারকিউলিস একটি খোলা জায়গায় ছয়শ পা হাঁটল। হেঁটে বলল, এখানে শুরু হবে দৌড় প্রতিযোগিতা। এই দৌড়ের নাম হবে স্টেডিওন। আর যেখানে এই স্টেডিওন দৌড় হবে, সেই মাঠের নাম হবে স্টেডিয়াম[৬১]। সেই থেকে স্টেডিয়ামে শুরু হলো অলিম্পিক খেলা।

তো বিজয়ীর পুরস্কার কী হবে? এটি ভাবতে গিয়ে হারকিউলিস হঠাৎ দার্শনিক হয়ে গেল। তার মনে হলো, টাকা-পয়সা তো হাতের ময়লা। অলিম্পিকে কোনো টাকা-পয়সা পুরস্কার দেওয়া হবে না। সম্মানটাই হবে পুরস্কার। এই ভেবে সে একটি জলপাই গাছ লাগাল জিউসের মন্দিরের পাশে। বলল, এই জলপাই শাখার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে বিজয়ীকে।

এভাবে শুরু হয় অলিম্পিক। ধীরে ধীরে সারা গ্রিসের সব নগর থেকে মানুষ আসতে থাকে এই খেলায়। শর্ত একটিই— খেলোয়াড়ের মাতৃভাষা অবশ্যই গ্রিক হতে হবে।

অলিম্পিয়ায় এই প্রতিযোগিতা চার বছর পর পর হয়। সারা গ্রিসের চারটি শহরে এরকম প্রতিযোগিতা হয়। শহরগুলো হলো করিন্থ, নিমিয়া, ইসথিমিয়া এবং অলিম্পিয়া। চারটা শহরে প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে খেলা আয়োজন হয়। সেজন্য অলিম্পিয়ায় আয়োজন ফিরে আসে চার বছর পর পর।

অলিম্পিক হয় গ্রীষ্মকালে। গ্রীষ্মের তৃতীয় পূর্ণিমার দুদিন আগে শুরু হয়। তখন কয়েক মাস ধরে দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়রা আসতে থাকে। তারা অনেকদিন আগেই সেখানে গিয়ে তাঁবু ফেলে। কয়েক মাস ধরে চলে প্রশিক্ষণ।

অলিম্পিকে স্পার্টার মানুষই বেশি জয়ী হয়। তাদের তাঁবুতে লোকও বেশি। কিন্তু এই বছর এথেন্সের তাঁবু সবচেয়ে বড়। এবার এথেন্সের খেলোয়াড়দের নিয়ে এসেছেন পেরিক্লিস নিজে। তার সাথে আছে হেরোডোটাস। তাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন পেরিক্লিস। সেখানে হেরোডোটাস এথেন্সের মহিমা বলবে।

আরও চমক আছে। এবার এথেন্সের বাহিনীর সাথে এসেছে আসপাশিয়া অলিম্পিকে মেয়েরা আসতে পারে না। খেলোয়াড় বা দর্শক কোনো কিছুতেই মেয়েদের কোনো জায়গা নেই। তবু পেরিক্লিস সাহস করে নিয়ে এসেছেন আসপাশিয়াকে। আসপাশিয়া খেলার মাঠে যেতে পারবে না। শুধু হেরোডোটাসের অনুষ্ঠান দেখতে পারবে।

অলিম্পিক পাঁচ দিন চলে। পঞ্চম দিন খেলা শেষে হেরোডোটাসের গল্প বলার অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠান সফল করতে এথেন্সের অনেক মানুষ এসেছে। এটিতেও আসপাশিয়ার একটি গুড়া বুদ্ধি আছে। তার বুদ্ধিতেই পেরিক্লিস ঘোষণা দিয়েছেন, এবার এথেন্সের যে

কেউ বিনামূল্যে অলিম্পিকে আসতে পারবে। সব খরচ দেবেন পেরিক্লিস একা। তাই এই বছর এথেন্সের মানুষ অনেক বেশি। সাতটা বিশাল তাঁবু তাদের।

সক্রেটিসকে আসার জন্য আসপাশিয়া অনেক বলেছিল। সক্রেটিসেরও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি। তার বাবা অসুস্থ। ক্রিতো আর চেরোফোন এসেছে। আসার আগে তারা সবাই মিলে সক্রেটিসের সাথে মস্করা করছিল:

আসপাশিয়া সক্রেটিসকে বলেছিল, দুঃখ কোরো না, আমি যা দেখব, ফিরে এসে তোমাকে বলব। আমি হলাম তোমার দ্বিতীয় নয়ন।

সক্রেটিস বলেছিল, তুমি নয়ন হলে আমার আর কিছুই দেখা হবে না। কারণ তুমি সেখানে কিছুই দেখতে পারবে না। মেয়েরা অলিম্পিকের মাঠে ঢুকতেই পারে না।

আসপাশিয়া বলেছিল, তাহলে ক্রিতো আর চেরোফোন হবে আমার চোখ। তারা দেখে এসে আমাকে বলবে। তারা হবে আমার দ্বিতীয় নয়ন। আর আমি বলব তোমাকে। আমি হবো তোমার তৃতীয় নয়ন।

অলিম্পিকে এসে আসপাশিয়া আসলেই কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। সে মোটামুটি তাঁবুতে বন্দি। ক্রিতো আর চেরোফোন তার দ্বিতীয় নয়নের কাজ করছে। খুব উৎসাহের সাথেই করছে। তারা তাঁবুর বাইরে যায়, আর একটু পর পর ফিরে এসে ধারাভাষ্য দেয়। তাদের এই ছেলেমানুষি দেখে পেরিক্লিস মনে মনে হাসেন। মুখে কিছু বলেন না।

এখানে এসে আসপাশিয়ার একেবারে মাথা নষ্ট। পৃথিবীর কোনো অনুষ্ঠানে এত লোকের সমাগম হতে পারে, এটি তার ধারণাতেই ছিল না। আগে লোকের মুখে শুনেছে। তবু নিজের চোখে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে।

এই খেলার জন্য সারা অলিম্পিয়া সাজানো হয়েছে। আঁকা হয়েছে নতুন নতুন ছবি। মূর্তিগুলো রং করা হয়েছে। একেবারে ঝলমল করছে অলিম্পিয়া। মানুষে কিলবিল করছে। সারা পৃথিবীর যেখানে গ্রিক ভাষা বলতে পারে, সেখান থেকেই লোক এসেছে। এথেন্স, স্পার্টা, থিবস, সিসিলি, কস, ক্রিতি— সবখান থেকে এসেছে। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, নেতা সব গিজগিজ করছে। রাজা নিজে আসতে না পারলেও দূত পাঠিয়েছে। প্রত্যেক নগরের খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা, দাস— সব মিলিয়ে এক একটি বিশাল মিছিল। তাদের সাথে গাড়ি বোঝাই উপহার। বড় বড় নগরের সাথে আছে গায়ক দল, আছেন স্বভাব কবি। কোনো কিছুর অভাব নেই।

অভাব শুধু একটি জিনিসের। অলিম্পিকের কোথাও কোনো নারী নেই। নারী বিবর্জিত এমন বিনোদন পৃথিবীতে আর নেই।

প্রথম দিন খুব সকালে শুরু হলো বিশাল অলিম্পিক মিছিল। শোভাযাত্রা করে সবাই এলো জিউসের মন্দিরের সামনে। অলিম্পিয়ায় তিনটি মন্দির একটি জিউসের, একটি তার স্ত্রী হেরার, আর অন্যটি ধন-সম্পদের দেবী দিমিত্রার। জিউসের মন্দিরের পাশে হারকিউলিসের লাগানো জলপাই গাছ।

এই জলপাই গাছের শাখা দিয়েই মুকুট বানিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় বিজয়ীকে সম্পদের দেবী দিমিত্রার মন্দিরে টাকা-পয়সা উপহার রাখা হয়। এই মন্দিরের পেছনেই অলিম্পিক স্টেডিয়াম। সেখানেই দৌড়, বর্শা-নিক্ষেপ, চাকতি- নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফ হয়। স্টেডিয়ামের দক্ষিণে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ।

অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য পুরোহিত একটি পবিত্র শূকর বলি দিল। সাথে সাথে বাদ্য বেজে উঠল। সকল খেলোয়াড় লাইন ধরে দাঁড়াল। মন্দিরের পুরোহিতের সাথে তারা শপথ নেবে। তারা সুরে সুরে বলছে অলিম্পিক শপথ—

'আমি দেবতা জিউসের নামে শপথ করে বলছি— আমি একজন গ্রিক আমি গ্রিক ভাষায় কথা বলি। এই পবিত্র খেলায় অংশ নিতে আমি গত দশ মাস ট্রেনিং করেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই খেলায় আমি কোনো রকম অনৈতিক উপায়ের আশ্রয় নেব না।'

এরপর খেলার বিচারক ও রেফারিরা শপথ নিলেন। তারা বললেন, আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এই খেলা পরিচালনা করব। কোনো প্রকার ঘুষ বা লোভের আশ্রয় নেব না। বিচারের গোপনীয়তা পুরোপুরি রক্ষা করব।

শপথের পর উপহার প্রদান। বিভিন্ন নগরের রাজা, নেতা ও রাষ্ট্রদূতেরা তাদের উপহার সারি সারি করে রাখল। কারা কী এনেছে সবাইকে দেখাতে হবে। দেখা যাবে কার কত সম্পদ, কোন্ নগর কত ধনী। এই বছর এথেন্সের উপহার সবার থেকে অনেক অনেক বেশি। লোকজন একবার উপহার দেখে আর একবার পেরিক্লিসের দিকে তাকায়। তাকায় আর চোখ টাটায়।

উপহার দেওয়ার পর বালকদের খেলা। বালক মানে যাদের বয়স বারো থেকে আঠারো। কোনো জন্ম সনদ নেই। তাই এক-একজন বালক আসছে, আর পরিচালকরা বড় বড় চোখে তাদের মুখ দেখছে। গালে ঘষা দিয়ে দেখছে দাঁড়ি উঠেছে কিনা। তারাই ঠিক করছে, কে বালক আর কে বালক নয়।

ময়দানের কোনায় ছোট ছোট ভিড় দেখা যাচ্ছে। সেগুলো জ্ঞানী লোকদের জায়গা। সেখানে কবিরা কবিতা পড়ছেন, সফিস্টরা জ্ঞানের কথা বলছেন। ক্রিতো আর চেরোফোন সেদিকে গেল।

চেরোফোন বলল, ঐ যে কবি পিনডার।

পিনডার এখন গ্রিসের জীবিত কবিদের মধ্যে সবচেয়ে নামি। বুড়ো হয়ে গেছেন। বয়স ষাটের বেশি। কিন্তু অলিম্পিকে না এসে থাকতে পারেন না। বিখ্যাত কবিকে ঘিরে অনেক মানুষ। গাছের ছায়ায় বসে কবি পিনডার[৬২] কাঁপা কাঁপা গলায় কবিতা[৬৩] বলছেন —

‘দিন মাস বছর যাবে, ক্লান্ত হবে মহাকাল
তবু পথ গোনা শেষ হবে না
অলিম্পিকের চেয়ে বড় কোনো সমাগম
মহাবিশ্বে আর হবে না, হবে না’

দর্শকরা তুমুল হাততালি দিল। এটি পিনডারের যৌবনে লেখা কবিতা, এখন সবার মুখে মুখে। এটি প্রায় অলিম্পিকের থিম কবিতা হয়ে গেছে। অনেকটা অলিম্পিক সংগীতের মতো।

ক্রিতো বলল, ইস, সক্রেটিস খুব মিস করল। পিনডারের নিজের মুখে কবিতা শোনা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। তারা তাড়াতাড়ি তাঁবুতে গিয়ে আসপাশিয়াকে পিনডারের কবিতাটি শোনাল। শুনেই আসপাশিয়ার মাথায় আর একটি গুঁড়া বুদ্ধি এলো। কবি পিনডারকে দিয়ে এথেন্সের জন্য কবিতা লেখাতে সে পেরিক্লিসকে বুদ্ধি দিল।

পেরিক্লিস কবি পিনডারকে তাঁবুতে নিয়ে এলেন।

আসপাশিয়াকে দেখে কবি একেবারে লা-জবাব। কবি ভাবতেই পারেননি—অলিম্পিকের তাঁবুতে নারী আছে। সেই নারী আবার এমন অসম্ভব রূপবতী। এই রূপে যে কারও মাথা ঘুরে যাবে। কবির বুড়ো মাথা, তাই আরও বেশি ঘুরে গেল। তিনি তখুনি পেপিরাস বের করলেন। আসপাশিয়াকে নিয়ে কবিতা লিখবেন। এমন নারীর জন্য ফটাফট কবিতা লিখতে না পারলে তিনি কিসের কবি!

আসপাশিয়া মিষ্টি করে বলল, কবি, আপনি অবশ্যই কবিতা লিখবেন। তবে আমাকে নিয়ে নয়, কবিতা লিখবেন এথেন্সকে নিয়ে।

কবি মাথা পুরোই আউলা হয়ে গেছে। তিনি বলছেন, এমন রূপ দেখে যদি ঝরঝর করে কবিতা না আসে, সে আবার কিসের কবি? কবিরা হলো রূপের কারবারি। রূপ যেখানে, কবিতাও সেখানে। রূপের মতো রূপ দেখলে, কবিতা কি ভেতরে আটকে থাকতে পারে? সব উথলে উথলে পড়ে।

পেরিক্লিস উঠে দাঁড়ালেন। বুড়োর ভীমরতি আর সহ্য করা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, কবিবর, আমার এথেন্স এই নারীর চেয়ে কম রূপবতী নয়। সেই রূপ দেখলেও আপনার কবিতা উথলে উথলে পড়বে।

পেরিক্লিসের গম্ভীর স্বর ওষুধের মতো কাজ দিল। কবির মাথা ঠিক হয়ে গেল। তিনি লজ্জা পেলেন। তখুনি এথেন্সের জন্য দুটি কবিতা লিখলেন। পেরিক্লিস তাকে দুই টেলেন্ট রুপার মুদ্রা দিলেন। কবি কিছুতেই নেবেন না। আসপাশিয়ার সম্মানে কবিতা। তার জন্য দাম নিলে রূপের অসম্মান হয়। পেরিক্লিস টাকাটা পিনডারের দাসের কাছে দিয়ে দিলেন।

অলিম্পিকের দ্বিতীয় দিন রথের প্রতিযোগিতা। রথচালনা ধনীদের খেলা। রথ বানাতে টাকা লাগে। ঘোড়া পালন করতেও টাকা লাগে। আবার রথ চালানোয় জীবনের ঝুঁকি

আছে। সেজন্য রথের মালিক নিজে রথ চালায় না। চালানোর জন্য মানুষ ভাড়া করে। তাই রথচালনা বহুত খরচান্ত ব্যাপার।

খরচান্ত ব্যাপার হলেও, শুধু টাকা দিয়ে অলিম্পিক জয়ের জন্য আর কোনো খেলা নেই। তাই ঘোড়ার মাঠে বিপুল দর্শক। এখানে টাকার শব্দ শোনা যায়। টাকার একটি নেশা আছে। এই মাঠে টাকার সাথে রক্তের নেশাও আছে। রথের মাঠে রক্তও ঝরে। যত রক্ত, তত আনন্দ। রথ চালাতে গিয়ে প্রতি বছরই দুর্ঘটনা হয়। ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে অনেকে মারা যায়।

তৃতীয় দিন পূর্ণিমা। এদিন সকালে একশ ষাঁড় বলি দেওয়া হয়। এরপর দৌড় প্রতিযোগিতা।

চতুর্থ দিন কুস্তি, বক্সিং এবং পেনক্রাশন[৬৪]।

অলিম্পিকের প্রতিযোগিরা সব ন্যাংটা। গ্রিক খেলোয়াড়রা কেউ মাঠে কাপড় পরে না। গ্রিক শব্দ জিমনেশিয়াম এসেছে জিমনোস থেকে। জিমনোস মানে নগ্ন। জিমনেশিয়াম হলো এমন জায়গা যেখানে নগ্ন হয়ে যাওয়া যায়। এরা জিমনেসিয়ামে নগ্ন হয়ে প্র্যাকটিস করে আর খেলায় অংশও নেয় ন্যাংটা হয়ে।

তবে প্রথম দিকের অলিম্পিকগুলো এমন ন্যাংটা অলিম্পিক ছিল না। একবার দৌড়ানোর সময় মেগারা শহরের এক প্রতিযোগীর কাপড় খুলে যায়। ঘটনাক্রমে সে প্রথম হয়ে যায়। মানুষ বলতে শুরু করল- ন্যাংটা হয়ে দৌড়ালেই প্রথম হওয়া যায়। শুরু হলো কাপড় খুলে ফেলা। এখন আর মাঠে কোনো কাপড় পরা প্রতিযোগী নেই।

পাঁচ দিনে শেষ হয়ে গেল। এবারও স্পার্টার প্রতিযোগিরাই বেশি পদক জিতল। তাদের অনেক আনন্দ। এই পাঁচদিন পেরিক্লিস দাঁত চেপে স্পার্টার জয় দেখেছেন। এবার এথেন্সের সময়। আজ সন্ধ্যায় হেরোডোটাস বক্তৃতা দেবেন।

***

৬০. এথেন্স থেকে প্রায় ৩০০ কি:মি: পশ্চিমে গ্রিসের পেলোপোনেসিস অঞ্চলে প্রাচীন অলিম্পিয়া নগরী। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

৬১. গ্রিক শব্দ stadion থেকে stadium শব্দটি এসেছে।

৬২. কবি পিনডার (খ্রি পূ ৫১৮-৪৩৮): প্রাচীন গ্রিসের গীতিকবি। সক্রেটিসের সময়ে জীবিত কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি অলিম্পিক বিজয়ীদের নিয়ে কবিতা লিখতেন।

৬৩. কবি পিনডার (Pindar) এর Olympian 1 কবিতার অংশ, D. A. Svarlien কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা করেছি।

৬৪. পেনক্রাশন হলো প্রাচীন অলিম্পিকে শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা। এতে কিল, ঘুষি, লাথি, কুস্তি যেভাবে পারে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে হয়।

২১

‘দয়াশীল হও— তোমার চারপাশে যাদের দেখছো,
সবাই একটি কঠিন যুদ্ধের মধ্যে আছে।’
—প্লেটো

অলিম্পিয়ার বিশাল মঞ্চ।

অলিম্পিকের শেষ দিনে সন্ধ্যায় পেরিক্লিস এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। অলিম্পিকে যেখান থেকে যারা এসেছে, সবাই এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত। তারা জানে না এই অনুষ্ঠানে কী হবে। কিন্তু আয়োজন ব্যাপক। একটা বড় কিছুই হবেই। এথেন্সের পতাকা দিয়ে চারদিক সাজানো হয়েছে। তার মাঝখানে আলোয় ঝলমল করছে মঞ্চ।

মঞ্চে উঠেছে হেরোডোটাস। সামনে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার দর্শক। হেরোডোটাস শুরু করল এথেন্সের গল্প:

এথেন্স একটি মহান নগর। জ্ঞানের শহর। এখানে জ্ঞান উৎপত্তি হয়। এই শহরে গণতন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে।

হেরোডোটাস মজা করে কাহিনি বলছে। সে ম্যারাথন যুদ্ধের কাহিনি শুরু করল— এথেন্স আমাদের সব নগরকে বাঁচিয়েছে। পারস্যের হাত থেকে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছে।

সে অনেকক্ষণ ধরে খুব মিষ্টি করে ম্যারাথনের কাহিনি বলল। দর্শকরা তুমুল হাততালি দিল। সবাই খুশি। শুধু খুশি হলো না স্পার্টার লোকেরা। ম্যারাথনের যুদ্ধে স্পার্টা ঠিক সময়ে সাহায্য করেনি। তাই ম্যারাথনের গল্পে এথেন্স উপরে আর স্পার্টা নিচে। স্পার্টানরা একটু বিরক্ত হচ্ছে। হেরোডোটাস খেয়াল করল স্পার্টানদের উসখুস। তাদের শান্ত করতে হবে।

সে বলল, ভায়েরা। পারস্যের সাথে যুদ্ধ শুধু এথেন্স একা করেনি। এথেন্স আর স্পার্টা মিলেমিশে একটি চমৎকার যুদ্ধ করেছে। এখন আমি সেই কথা বলব।

স্পার্টার লোকেরা নড়েচড়ে বসল।

হেরোডোটাস বলে চললো—

ম্যারাথন যুদ্ধে জয়ের পর এথেন্সে উৎসব হচ্ছে। সবার মনে আনন্দ আর আনন্দ। কেউ ভাবতেই পারেনি যে, পিচ্চি গণতন্ত্র এথেন্স সত্যি সত্যি একদিন পারস্যের বিশাল বাহিনীকে হারিয়ে দেবে। সবাই আনন্দে গলাগলি, কোলাকুলি করছে। কয়েকটি মেয়ে কিথারা বাজিয়ে গান গাইছে। তাদের সাথে নাচছে ম্যারাথন যুদ্ধের সেনাপতিরা। সবার মনে থৈ থৈ আনন্দ।

শুধু একজন যোগ দেননি এই আনন্দে। তার নাম থেমিস্টক্লিস[৬৫]। তিনি এথেন্সের একজন সেনাপতি। বয়স পঞ্চাশের মতো। সেই সন্ধ্যায় তিনি গম্ভীর। কিছুটা চিন্তিত। তিনি ভাবছেন— এথেন্সের এই বিজয় কত দিনের। কুট্টি নগর এথেন্সের কাছে হেরে গেছে বিশাল পারস্য। সম্রাট দারিউস কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে? খুব শীঘ্রই আবার আসবে। তখন কী করবে এথেন্স? উপায় ভাবছেন থেমিস্টক্লিস।

উপায় একটি আছে। সেটি হলো নৌযুদ্ধ। মাটিতে যুদ্ধ করলে কিছুতেই পারবে না এথেন্স। সাগরে যুদ্ধ হলে পারস্যকে হারানো যেতে পারে। সেই সন্ধ্যায় থেমিস্টক্লিস

সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি এথেন্সে একটি বড় নৌবাহিনী বানাবেন। কয়েকশ জাহাজ করবেন। সেজন্য দরকার অনেক টাকা।

টাকার বিষয়ে কদিনের মধ্যেই একটি বিরাট সুখবর পাওয়া গেল। এথেন্সে রুপার খনি পাওয়া গেছে। এক্রোপলিস থেকে মাত্র চার মাইল দক্ষিণে লরিয়াম নামক এক জায়গায় আবিষ্কার হয়েছে রুপা। এখন এই রুপার টাকা দিয়ে কী করা হবে, সেটি নিয়ে সংসদে ভোট হবে। পিনিক্স পাহাড়ে সেদিন অনেক লোক। টাকার গন্ধে দলে দলে মানুষ আসছে। সংসদ জমজমাট।

অনেকেই বক্তৃতা দিচ্ছে। টাকার বখরা চাই। তারা বলছে, এই সম্পদ আমাদের সবার, আসুন, সবাই ভাগ করে নিই।

থেমিস্টক্লিস বললেন, আপনারা ঠিক বলেছেন। এই অর্থ আমাদের সবার। আমরা ভাগ করেই নেব। তবে একটি বিষয়। এজিয়ান সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ঐ যে আমাদের শত্রু দ্বীপ এজিনা। আর একটু দূরে আর এক শত্রু দেশ মেগারা। চারিদিকে এথেন্সের শত্রু। তার চেয়েও বড় শত্রু পারস্য। ম্যারাথনে আমরা জিতেছি। কিন্তু পারস্য যদি আবার আসে?

সবার মনে ভয় ঢুকে গেল। তাই তো?

থেমিস্টক্লিস আবার বললেন, সেজন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। আমরা এই টাকা দিয়ে জাহাজ বানাব। নৌবাহিনী বানাব। আমাদের নৌসেনা হবে পৃথিবীর সেরা। নৌবাহিনী দিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবেলা করব।

সবাই দেখল— লোকটি গ্রিক বীরের মতো কথা বলছে। গ্রিক পুরাণের বীরদের আওয়াজ সবাই পছন্দ করে। এই লোককে সমর্থন করা যায়। ভোটে থেমিস্টক্লিসের প্রস্তাব পাস হলো।

তিনি শুরু করলেন জাহাজ বানানো। পাশের শহর করিন্থের লোকজন নতুন এক আশ্চর্য রকমের জাহাজ বানিয়েছে। এর নাম ট্রাইরিম, মানে তিন বহরের জাহাজ। এই জাহাজের সামনের দিক অনেক লম্বা আর চোখা। যুদ্ধের সময় এই চোখা অংশটি হয়ে যায় একটি মারাত্মক অস্ত্র। শত্রুর জাহাজের মাঝ বরাবর দ্রুতগতিতে চালিয়ে দিলে শত্রুর জাহাজ মুহূর্তেই ভেঙে যায়। থেমিস্টক্লিস এই ট্রাইরিম পছন্দ করলেন। তিনি দুইশ ট্রাইরিম জাহাজ বানালেন। অনেক মানুষ নিয়ে তৈরি করলেন এথেন্সের নৌবাহিনী।

কিছু দিন পরে শোনা গেল, পারস্য বাহিনী সত্যিই আবার আসছে। এবার আর বড় রাজা নন, বড় রাজা মারা গেছেন। তার ছেলে ছোট রাজা ড্রেক্সি[৬৬]। অপমানের শোধ নিতে দশ বছর পর বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে। এবার পারস্যের সেনা কয়েক লাখ।

গ্রিসের নগরগুলোর জন্য মোটামুটি দশ নম্বর বিপদ সংকেত। মহাবিপদ টের পেয়ে গ্রিসের ছোট ছোট নগরগুলো একত্রিত হলো। বিপদের দিনে বন্ধু হলো গ্রিসের সবচেয়ে বড় দুই শক্তি এথেন্স আর স্পার্টা। এই যুদ্ধে এথেন্স যুদ্ধ করবে সাগরে, তারা নৌযুদ্ধে

ভালো। আর স্পার্টা যুদ্ধ করবে মাটিতে। গ্রিসের সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি স্পার্টার রাজা লিওনিদাস।

লিওনিদাস গেলেন ডেলফিতে। ডেলফির এপোলোর মন্দিরে ওরাকলের কাছে জিজ্ঞেস করলেন যুদ্ধের ভবিষ্যৎ। ওরাকলের কথা মিথ্যা হয় না। ওরাকল যা বলে, গ্রিসের সবাই সেটিই করে। ওরাকল তিনটি কথা বললেন,

এক. এই যুদ্ধে গ্রিসের জন্য ভয়াবহ বিপদ আসছে।

দুই. সামনের পূর্ণিমায় বিশেষ পূজা আছে, সেই পূর্ণিমার আগে স্পার্টার বাহিনী কিছুতেই যুদ্ধে যেতে পারবে না। তিন. হারকিউলিসের বংশধর কোনো রাজা যদি এই যুদ্ধে আত্মাহুতি দেয়, তাহলেই গ্রিস রক্ষা পাবে।

ওরাকলের প্রথম কথা সবাই জানে পারস্যের আক্রমণ একটি মহাবিপদ। দ্বিতীয় কথাটা সমস্যার। পূর্ণিমার এখনও অনেক বাকি। পারস্য সেনা উত্তর দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। পূর্ণিমার আগেই তারা দখল করে ফেলবে এথেন্স। লিওনিদাস ভাবছেন। ওরাকলের তিন নম্বর কথাটি তার মাথায় ঘুরঘুর করছে। তিনি শুনতে পাচ্ছেন, এই যুদ্ধে গ্রিসকে বাঁচাতে হারকিউলিসের বংশধর কোনো রাজাকে মরতে হবে। হঠাৎ বলে উঠলেন, আমিই তো হারকিউলিসের বংশধর। আমি মরলে যদি স্পার্টা বাঁচে, তবে তাই হোক। কিন্তু পূর্ণিমার আগে স্পার্টা বাহিনী যুদ্ধে যাবে না। এটি মহা চিন্তার কারণ। এটির জন্য কী করা যায়! অন্য কী উপায়ে পারস্যকে আটকানো যায়!

চোখ বন্ধ করে দেখছেন লিওনিদাস। কোন পথ দিয়ে শত্রু আসছে। কোথায় তাদের আটকানো যায়। হঠাৎ চোখ বুজে খুঁজে পেলেন তার 'ইউরেকা মুহূর্ত'। চিৎকার করে বললেন, 'আছে আছে, উপায় আছে। একটি ভীষণ সরু জায়গা আছে। সেখানে আটকে দিলে বিশাল সেনা নিয়ে আর আগাতে পারবে না। অল্প কিছু ভালো যোদ্ধা নিয়েই দিনের পর দিন আটকে রাখা যাবে পারস্য বাহিনীকে। মাত্র তিনশ জন স্পার্টান আমার সাথে আসো। স্পার্টা বাহিনী এখন যুদ্ধে যাবে না। তারা পূর্ণিমার পরেই যাত্রা করবে। আমি মাত্র তিনশ জনকে নিয়েই শত্রুকে আটকে রাখব।'

তিনশ জন সেনা নিয়ে লিওনিদাস পৌঁছলেন পাহাড় আর সাগরের মাঝে একটি সরু জায়গায়। জায়গাটি নাম থার্মোপিলাই[৬৭]। থার্মো মানে গরম আর পিলাই মানে গেইট বা দরজা। এই গরম দরজা ভীষণ অদ্ভুত। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত জায়গা খুব কম আছে। এখানে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে একটি তীব্র গরম পানির ঝরনা। ফুটন্ত গরম পানিতে সালফার মিশে তৈরি হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস। লিওনিদাস সেই বিষাক্ত গরম পানি আটকে লেক তৈরি করে পাহাড়ের সরু পথটা আরও সরু করে ফেললেন। আর নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনশ জন স্পার্টান নিয়ে। ততদিনে আরও কিছু অন্য নগরের গ্রিক সেনা তার সাথে যোগ দিয়েছে।

সম্রাট ড্রেক্সির নেতৃত্বে পারস্য বাহিনী এলো থার্মোপিলাইতে। এত অল্প সেনা দেখে তারা কিছুক্ষণ কৌতুক করল। কিন্তু সরু পথ দিয়ে এগিয়ে আসতেই বুঝতে পারল লিওনিদাসের যুদ্ধ কৌশল। চিকন পথ— একসাথে মাত্র কয়েকজন সেনা যেতে পারে। পাশেই বিষাক্ত তীব্র গরম পানি আর সামনে ভয়-ডরহীন তিনশ জন স্পার্টান। কয়েকজন এগিয়ে এলেই স্পার্টান অস্ত্রের সামনে পড়ে। এমন অদ্ভুত যুদ্ধে টানা সাত দিন সেখানেই লিওনিদাস আটকে রাখলেন বিশাল পারস্য বাহিনীকে। রাগে চুল ছিঁড়তে থাকল পারস্যের রাজা। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। স্পার্টান যুদ্ধ কায়দার কাছে তারা কিছুই করতে পারলেন না।

অবশেষে সাত দিন পর এক বিশ্বাসঘাতক গ্রিক সৈনিক পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে অন্য একটি পথ দেখিয়ে দিল পারস্যদের। সেখান দিয়ে গিয়ে পারস্যরা লিওনিদাস আর তিনশ স্পার্টানকে ঘিরে ফেলল। তীরের ফলায় মৃত্যু হলো লিওনিদাসের। পারস্যের রাজা ড্রেক্সি লিওনিদাসের মাথা কেটে ক্রুশবিদ্ধ করে থার্মোপিলাইতে ঝুলিয়ে দিল।

ওরাকলের কথা রাখলেন লিওনিদাস। দেশের জন্য প্রাণ দিলেন হারকিউলিসের বংশধর রাজা। আজও যদি আমরা সেখানে যাই, শুনতে পাব লিওনিদাস বলছেন—

‘হে পথিক-
স্পার্টায় গিয়ে বলো, আজও এখানেই বসে রয়েছি
ছাড়িনি পথ-
মৃত্যুকে ভালোবেসে আমি জীবনের কথা রেখেছি।’[৬৮]

এই বলে হেরোডোটাস থামল। তার চোখে পানি। সকল স্পার্টানদের চোখে পানি। এতক্ষণে স্পার্টানরা হেরোডোটাসের উপর খুশি।

হেরোডোটাস আবার শুরু করল— ততদিনে পূর্ণিমা শেষ হয়েছে, স্পার্টার সেনারা যুদ্ধযাত্রা করেছে। এথেন্সের বাহিনীও জাহাজ নিয়ে তৈরি।

এথেন্সের সেনাপতি থেমিস্টক্লিস। এতদিন তিনি যে ছক করেছিলেন, এবার সেটি পূরণ করার সময় এসেছে। তিনি ঠিক করলেন, আমরা সবাই এথেন্স ছেড়ে চলে যাব। এথেন্স একেবারে খালি থাকবে। আমাদের সব সেনা জাহাজ নিয়ে সালামিনা দ্বীপে থাকবে। আর নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা দূরের আর একটি দ্বীপে চলে যাবে।

তো পারস্য বাহিনী এথেন্সে এসে দেখে, শহর খালি। তারা ভাবল এথেন্সবাসী পালিয়ে গেছে। তারা বিজয়ের আনন্দ শুরু করল। এক্রোপোলিসের উপর গিয়ে দেবী এথিনার মন্দির পার্থেনন পুড়িয়ে দিল। এথেন্সের মানুষ সালামিনা দ্বীপ থেকে দেখল পার্থেনন পুড়ে যাচ্ছে। তাদের শহর পুড়ে যাচ্ছে। দেবী এথিনা পুড়ে যাচ্ছে। থেমিস্টক্লিস পারস্যদের

খবর পাঠাল, তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজি। জাহাজ নিয়ে পারস্য বাহিনী যেন সালামিনা[৬৯] দ্বীপে আসে। সেখানে আত্মসমর্পণ করবে এথেন্স।

আসলে এটি ছিল একটি ফাঁদ। ড্রেক্সি আনন্দে তার সব জাহাজ নিয়ে সালামিনার দিকে যাত্রা করল। এথেন্সে থেকে সালামিনা দ্বীপে ঢোকার সাগর পথ খুবই সরু। পারস্য তাদের সব জাহাজ নিয়ে সেই সরু পথে ঢুকে পড়ল। এই সুযোগের আশায়ই ছিলেন থেমিস্টক্লিস। যখন পারস্যের সব জাহাজ সরু চ্যানেলে ঢুকে পড়েছে, তখনই এথেন্সের নৌবাহিনী আক্রমণ করল তাদের ট্রাইরিম জাহাজগুলো দিয়ে। লম্বা চোখা মাথার ট্রাইরিম জাহাজগুলো খুব দ্রুত আঘাত করল পারস্য জাহাজের মাঝ বরাবর। মুহূর্তের মধ্যে পারস্যের জাহাজগুলো ভেঙে ভেঙে ডুবে যেতে লাগল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পারস্যের একশ জাহাজ ডুবে গেল। জেক্সি এতক্ষণে বুঝল তারা আসলে ফাঁদে পড়েছে। সে জাহাজগুলোকে পিছে আসতে আদেশ দিল। কিন্তু পথ খুবই সরু। দ্রুত পিছানো যাবে না। এথেন্সের নৌসেনারা একের পর এক পারস্য জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে।

সেই পারস্য বাহিনীতে ছিল এক গ্রিক নারী। তার নাম আর্টিমিসিয়া। সে তার কয়েকটি জাহাজ নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ করল এথেন্সের বিপক্ষে। তার যুদ্ধ দেখে পারস্যের রাজা বলল, 'দেখো, আমার পুরুষ সেনাপতিরা সব নারী হয়ে গেছে, তারা যুদ্ধ ভুলে গেছে। আর আমার নারী সেনানেত্রী পুরুষ হয়ে গেছে, সেই সবচেয়ে ভালো যুদ্ধ করছে।' বীরের মতো লড়াই করে আর্টিমিসিয়া এক সময় মারা গেল।

কয়েক ঘণ্টায় পারস্যের প্রায় সব জাহাজ ডুবে গেল। অর্ধেকের বেশি সেনা মারা গেল। জেক্সি অল্প সেনা নিয়ে পালিয়ে গেল। এথেন্স জিতে গেল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নৌযুদ্ধ। গ্রিসের সব নগরকে আবারও রক্ষা করল এথেন্স। সেদিন যদি এথেন্স হেরে যেত, তাহলে সকল গ্রিক নগর পারস্যের অধীন থাকত।

[হেরোডোটাসের মতে, এই যুদ্ধে পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রিসের বিজয় এশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কোনো শক্তির চূড়ান্ত বিজয়।]

হেরোডোটাস গলা উঁচু করে বলল, সবার পক্ষ থেকে এথেন্সকে অভিনন্দন। সকল দর্শক, শ্রোতা তুমুল হাততালি দিল। সবাই বলল, হ্যাঁ, এথেন্সকে অভিনন্দন। স্পার্টার মানুষরাও হাততালি দিল। তারাও বলল, এথেন্সকে অভিনন্দন।

সব দেশের মানুষ এথেন্সের নামে জয় জয় করছে। সবাই স্বীকার করে নিয়েছে এথেন্সই সব নগরের নেতা। অলিম্পিকে বেশি সোনা জিতেছে স্পার্টা। কিন্তু হেরোডোটাসের মুখের কথায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল এথেন্স।

আসপাশিয়া চুপি চুপি পেরিক্লিসের হাতে টোকা দিল। পেরিক্লিস দ্রুত মঞ্চে উঠলেন। হাত তুলে বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা, বিগত দিনে সব ধরনের বিপদে আপদে এথেন্স আপনাদের পাশে ছিল, সামনের দিনেও কেউ বিপদে পড়লে যে নগর সবার আগে এগিয়ে আসবে, সে হলো এথেন্স।

তুমুল হাততালিতে চারদিক কেঁপে উঠল। পেরিক্লিস জড়িয়ে ধরলেন হেরোডোটাসকে। দুজনে হাত তুলে দর্শকদের অভিবাদনের উত্তর দিচ্ছেন।

আসপাশিয়া চোখ বুজে আছে। তার দু'চোখে পানি। আনন্দের অশ্রু বন্যার মতো বের হচ্ছে তার দু'চোখ বেয়ে। তার বুদ্ধি এমন চমৎকার কাজ করেছে, মনে হচ্ছে সে সত্যি উড়ছে। দেবী আফ্রোদিতির মতো উড়ছে।

***

চেরোফোনের কথা আর ফুরায় না।

অলিম্পিয়া থেকে ফিরে সে বলছে তো বলছেই। অন্য কাউকে সুযোগই দিচ্ছে না। সে তো এমনিতেই বাচাল। এখন মহাবাচাল হয়ে গেছে। কথার গাড়ি চালু করে বন্ধ করতে ভুলে গেছে। চলছে তো চলছেই। হেরোডোটাস কীভাবে সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে এথেন্সকে সেরা বানিয়ে তুলল— সেকথা বলতে বলতে তার মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে।

চেরোফোনের যন্ত্রণায় সক্রেটিস আর সিমনের কান ঝালাপালা। সক্রেটিসের ধৈর্যের কোনো শেষ নেই। সে কিছু বলছে না। কিন্তু সিমন আর সহ্য করতে পারছে না।

চেরোফোন বলছে, এবারের অলিম্পিকে পদক পেয়েছে একজনই। তার নাম হেরোডোটাস।

সিমন বলল, সেটি বুঝলাম। একটি ব্যাপার বলো— অলিম্পিকে সব খেলোয়াড় মাঠে নামে ন্যাংটা হয়ে। হেরোডোটাসের কি কাপড় ছিল?

চেরোফোন রাগে এমনভাবে তাকাল, যেন সিমনকে এক্ষুনি ভস্ম করে দেবে। এ কী কথা? মহান হেরোডোটাস ন্যাংটা হয়ে মঞ্চে উঠবে? এ কেমন রসিকতা! সক্রেটিসের সামনে এমন রসিকতা করছে, তবু সক্রেটিস কিছুই বলছে না?

সিমন চেরোফোনের রাগকে পাত্তাই দিল না। সে সিরিয়াস মুখ করে বলল, ঠিক আছে, কাপড় পরার কথা বাদ দাও। অন্য কথা বলি। হেরোডোটাস তো অলিম্পিক জিতে এসেছে। সেই হিসেবে এথেন্সে ঢোকার সময় তার তো গেইট দিয়ে নয়, দেয়াল ভেঙে ঢোকার কথা। তা কোন দিকে দেয়াল ভেঙে এথেন্সে ঢুকেছে সে?

গ্রিসের সব নগরের চারদিক ঘিরে বাইরের আক্রমণ ঠেকাতে একটি সুরক্ষা দেয়াল থাকে। এথেন্সের চারদিকেও আছে। সে দেয়ালে দরজাও আছে। নিয়ম হলো কেউ অলিম্পিক পদক জিতে এলে, সে এথেন্সের দেয়ালের সদর দরজা দিয়ে ঢুকবে না, ঢুকবে এক জায়গার দেয়াল ভেঙে। অলিম্পিক জিতলে সে তো আর সাধারণ মানুষ নয়। সে দেবতার কাছাকাছি। সে বীর। বীরেরা দরজা দিয়ে নয়, দেয়াল ভেঙে ঢোকে।

চেরোফোন বুঝল, সে হেরোডোটাসকে নিয়ে এত বেশি বলছে যে, সবাই তাকে পিন দিচ্ছে। কিন্তু সে ছেড়ে দেওয়ার লোক নয়। তার নীতি হলো— বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র

মেদিনী।

চেরোফোন বলল, তাহলে শোন— হেরোডোটাস এথেন্সের মানুষের হৃদয়ের দেয়াল ভেঙে ঢুকেছে। উঁকি দিয়ে দেখো— তোমার হৃদয়েও হেরোডোটাস আছে।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। এবারে চমৎকার বলেছে চেরোফোন

সক্রেটিস বলল, হেরোডোটাস আমাদের কাছে অনেক সম্মানের। তাকে নিয়ে আর কচায়ন কোরো না। বেশি কচলালে তিতা হয়ে যায়। এখন বলো আমাদের আসপাশিয়া কেমন ছিল? তার তো ঝামেলা হওয়ার কথা।

চেরোফোন বলল, ঝামেলা মানে? একেবারে মহা ঝামেলা। সবচেয়ে বিপদে ছিল আসপাশিয়া। তাকে চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। মাঠে তো যেতেই পারবে না। সে হলো তাঁবুবাসী। তাঁবুর মধ্যে বন্দি। তাঁবুতে যেন কাক-পক্ষীও ঢুকতে না পারে, সে ব্যবস্থা করেছিলেন পেরিক্লিস। তাঁবুতে ঢুকতে পারতাম শুধু দুজন—আমি আর ক্রিতো।

সিমন বলল, কিন্তু অলিম্পিকে নারী ঢুকতে পারবে না কেন? ঢুকলে নাকি মৃত্যুদণ্ড। এটি কোনো কথা হলো?

চেরোফোন হাসতে হাসতে বলল, একটু আগেই তো বললে অলিম্পিকের খেলোয়াড়রা সব ন্যাংটা। তো অতগুলো ন্যাংটা পুরুষের সামনে নারী আসতে পারে? সর্বনাশ হয়ে যাবে না?

সবাই হেসে উঠল। সক্রেটিস বলল, সারা গ্রিসেই নারীদের জন্য বাইরে আসা নিষেধ। অলিম্পিকেও সেই একই নিয়ম।

চেরোফোন বলল, অলিম্পিক মাঠে কিন্তু একবার এক নারী গিয়েছিল। এক নারী পুরুষ বেশে ঢুকেছিল। তার স্বামী ছিল তাদের ছেলের বক্সিং প্রশিক্ষক। স্বামীও অলিম্পিক জয়ী। কিন্তু ছেলের অলিম্পিক শুরুর আগে হঠাৎ স্বামী মারা গেল। কিন্তু ছেলেকে পদক জিততেই হবে। তাই মহিলা নিজেই ছেলেকে শিখাতে শুরু করেন। তারপর পুরুষ বেশে অলিম্পিক মাঠে চলে আসেন। তার ছেলে বক্সিংয়ে প্রথম হয়ে যায়। কিন্তু ছেলে প্রথম হতেই সে চিৎকার করে ওঠে। তার গলার স্বরে ধরা পড়ে যায়, সে নারী।

সিমন বলল, তো তাকে কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়?

'না, সে বেঁচে যায়। তার ছেলে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, মাকে দণ্ড দিলে ছেলেও সেখানেই প্রাণ দেবে। পরে অলিম্পিক কমিটি মাকে মাফ করে দেয়। বলে — তার স্বামী আর পুত্র দুজনেই অলিম্পিক জয়ী বীর। তাই তাকে এবারের মতো মাফ করা হলো।'

সিমন বলল, যাক, মা হিসেবে প্রাণে বেঁচে গেছে।

চেরোফোন বলল, তবে মাঠে না এসেই নারীরা অলিম্পিকে অংশ নিয়েছে। সিমন বলল, মানে?

‘মানে হলো রথ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর মাঠে আসার দরকার নেই। তার হয়ে রথচালক ঘোড়া নিয়ে মাঠে গেলেই হলো। এই নিয়মে স্পার্টার রাজার বোন রথ পাঠিয়ে কয়েকবার অলিম্পিক জিতেছে।’

সিমন বলল, ভালো খবর। মেয়েদের তো সুযোগ নেই, একটু সুযোগ পেলেই দেখা যায়, মেয়েরা বসে থাকে না।

সক্রেটিস বলল, মূল ঘটনায় আসো। আসপাশিয়ার কী হলো সেই কথা বলো।

চেরোফোন বলল, আসপাশিয়া কোনোমতে পাঁচটা দিন তাঁবুতে কাটিয়েছে। তারপর সে যেতে পেরেছিল হেরোডোটাসের অনুষ্ঠানে। পেরিক্লিস বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করেছিল। ওটা তো অলিম্পিক খেলা নয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাই অনুমতি মিলেছিল। তবে ঘটনা একটি হয়েছিল।

সক্রেটিস বলল, কী ঘটনা?

‘ঘটনা কবি পিনডারকে নিয়ে। আমরা এসে আসপাশিয়াকে পিনডারের কথা বললাম। শুনে সে একটি বুদ্ধি দিল। পেরিক্লিসকে বলল, কবি পিনডারকে দিয়ে এথেন্সের জন্য কবিতা লেখাতে। আসপাশিয়া কিছু বললে পেরিক্লিস সেকথা না রেখে পারেন না। তিনি তক্ষুনি কবিকে আনতে লোক পাঠালেন 1 কিন্তু তাড়াহুড়ায় একটু ভুল করে বসলেন। তিনি কবি পিনডারকে এথেন্সের তাঁবুতে নিয়ে আসেন। আসপাশিয়াকে দেখে তো কবির মাথা ঘুরে পুরোপুরি আউলা হয়ে গেল। অলিম্পিকের ময়দানে নারী আসতে পারে একথা তিনি ভাবতেই পারেননি। তার উপর আসপাশিয়ার রূপে কবি একেবারে দিশাহীন হয়ে গেলেন। সেটি সামলাতে পেরিক্লিস আর আসপাশিয়াকে অনেক ঝামেলা করতে হয়েছিল।’

সক্রেটিস বলল, পিনডার কোন কবিতা লিখলেন?

চেরোফোন বলল, কবিতা ভালোই লিখলেন। তিনি লিখলেন—

‘দিবসের সূর্য আর রজনীর তারা
আজ সব ম্লান, সব জ্যোতিহারা
একটিমাত্র জ্যোতিস্ক জ্বলে, সারা আকাশের নীড়
তোমাকে অভিবাদন- হে অলিম্পিক বিজয়ী বীর।’[৭০]

সক্রেটিস বলল, বাহ, চমৎকার। অলিম্পিকের জন্য এর চেয়ে ভালো কবিতা আর হতে পারে না। আসপাশিয়ার কথা কবি বাইরে গিয়ে বলে দেয়নি?

‘না। পেরিক্লিস ব্যবস্থা করেছিলেন। কবিতা লিখে কবি পিনডার তাঁবু থেকে বের হলে পেরিক্লিসের দাস তাকে বলল, শোনেন কবি, একটি কথা। আপনি কিন্তু তাঁবুতে কোনো মহিলা দেখেননি। ঠিক আছে?’

কবি তো হতভম্ব। কী বলবেন তিনি? কোনো মহিলা দেখেননি?

দাস বলল, এ কথা জানাজানি হলে, জীবনে আর কোনো মহিলা দেখতে পাবেন না। এই শেষ দেখা। অলিম্পিয়া থেকে ফিরতেই পারবেন না।

কবি সারা জীবনে আরও অনেক মহিলা দেখতে চান সেজন্য আসপাশিয়ার কথা চেপে গেছেন।

***

৬৫. এথেন্সের নৌসেনাপতি থেমিস্টক্লিস (Themistocles) পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম সেরা নৌকৌশলী। তার কৌশলেই Battle of Salamis এর যুদ্ধে পারস্যকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে গ্রিস।

৬৬. পারস্যের সম্রাট জেক্সি (Xerxes I), তিনি ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্স আক্রমণ করেন। হেরোডোটাস তাকে অত্যন্ত ক্রূর চরিত্রের হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬৭. এথেন্স থেকে ২০০ কি:মি: উত্তরে সরু যুদ্ধক্ষেত্র থার্মোপিলাই (Thermopylae), এখানে স্পার্টার রাজা লিওনিডাস মাত্র ৩০০ জন সেনা নিয়ে পারস্যকে আটকে রাখেন। লিওনিডাস এখানেই মারা যান। এখন এখানে রাজা লিওনিডাসের একটি মূর্তি আছে।

৬৮. গ্রিক কবি Simonides এর লেখা এই বিখ্যাত কবিতাটি থার্মোপিলাইতে পাথরে খোদাই করা ছিল। হেরোডোটাসের লেখা থেকে এটি অনেকেই অনুবাদ করেছেন। আমি ইতিহাসবিদ Jesse Rufus Fears এর ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছি।

৬৯. ম্যারাথন যুদ্ধের দশ বছর পরে খ্রি. পূ. ৪৮০ অব্দে সালামিনা দ্বীপে (Salamis Island) পারস্য ও গ্রিসের মধ্যে বিশাল নৌযুদ্ধ হয়, যুদ্ধকে Battle of Sis বলা হয়।

৭০. কবি পিনডার (Pindar) এর Olympian 1 কবিতার অংশ, D. A. Svarlien কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা করেছি।

২২

'Understanding a question is the half of the answer.'
—Socrates

পেরিক্লিসের বাড়িতে সিম্পোজিয়াম।

গ্রিকদের সন্ধ্যাকালীন আড্ডার সাথে ডিনারের নাম সিম্পোজিয়াম। তবে হেঁজিপেঁজি লোকজন গোল হয়ে আড্ডা দিলেই সিম্পোজিয়াম হবে না। সিম্পোজিয়ামের শর্ত হচ্ছে দাওয়াতিরা সবাই হবে বিশেষভাবে জ্ঞানী। আড্ডার বিষয় হবে ওজনদার।

সূর্য ডোবার পরেই জ্ঞানীরা চলে আসে। তাদের পরনে বাহারি পোশাক। হাতে সুরা আর মুখে জ্ঞান। তখন একসাথে দুটি নেশা হয়— সুরার নেশা আর জ্ঞানের নেশা। কে কত ভারী ভারী কথা বলতে পারে, সেই নেশা। রাত যত বাড়ে, নেশাও বাড়ে। সেই সাথে বাড়ে ওজনদার কথা। যুক্তি, যুক্তির পিঠের যুক্তি। বিপুল রকম খাওয়া-দাওয়া। আনন্দী-দাসীরা মৃদু লয়ে নাচ-গান করে। জ্ঞান, আনন্দ, সুর, সুরা সবকিছু নিয়ে এগিয়ে চলে রাত। এর নামই গ্রিক সিম্পোজিয়াম।

যেকোনো বড় খুশির ঘটনায় এথেন্সের ধনীরা সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। অলিম্পিয়ায় সুনাম হওয়ায় পেরিক্লিস ভীষণ খুশি। সেই খুশিতে এথেন্সে ফিরেই হেরোডোটাসের সম্মানে সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছেন। পেরিক্লিসের বাড়িতেই হচ্ছে সিম্পোজিয়াম। আসপাশিয়া দিন রাত খেটে সব আয়োজন করেছে।

দাওয়াতির সংখ্যা পঞ্চাশ জনের মতো। তার মধ্যে আসপাশিয়ার অতিথি তিনজন— সক্রেটিস, চেরোফোন আর ক্রিতো। তারা এক কোণে পাশাপাশি তিনটা গদিতে হেলান দিয়ে আছে। আধো-শোয়া আধো-বসা। তারা ফিসফিস করে কথা বলছে।

চেরোফোন আবার শুরু করল হেরোডোটাসের প্রশংসা। বলল, অলিম্পিয়ায় হেরোডোটাস ব্যাপক দেখাল। মানুষ অলিম্পিক জিতে মাঠের খেলায়। কিন্তু হেরোডোটাস মাঠে না নেমে শুধু মুখের কথায় জিতে গেল। তার চাপার জোর আছে।

ক্রিতো বলল, তার চাপাবাজিতে তার সাথে এথেন্সও জিতেছে।

চেরোফোন বলল, হুঁম, হেরোডোটাস জিতেছে, এথেন্সও জিতেছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি জিতেছেন পেরিক্লিস। এখন নেতা হিসেবে পেরিক্লিসের গদি এক্কেবারে পাক্কা। সামনের কয়েক বছর ভোটে কেউ তাকে টেক্কা দেওয়ার আশা করতেও পারবে না।

তারা হেরোডোটাসের দিকে তাকাল। হেরোডোটাসই আজকের সিম্পোজিয়ামের মধ্যমনি। বসেছেও একেবারে মাঝখানে। হাসি হাসি মুখে আসপাশিয়ার সাথে কথা বলছে।

হেরোডোটাস বলল, আসপাশিয়া, আপনার কথা ফেলতে পারলাম না। কথা রাখলাম।

আসপাশিয়া বলল, কথা রাখলেন? কোন কথা? আমি কোন কথা রাখতে বলেছি?

'আপনি আমাকে বই লিখতে বলেছিলেন।'

'ও, তাই তো। লিখবেন?'

'লিখব। আমি এথেন্সের কথা লিখব। যেখানে যেখানে ঘুরেছি সব লিখব। অলিম্পিয়া থেকে ফিরে অনেক ভেবেছি। সিদ্ধান্ত নিয়েই নিলাম। লেখা শুরু করব। বইয়ের কথা আপনিই আমাকে প্রথম বলেছিলেন। তাই সিদ্ধান্তটা প্রথমে আপনাকেই জানালাম।'

আসপাশিয়া দাঁড়িয়ে সুরার গ্লাসে চামচ দিয়ে শব্দ করল। এর মানে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সে বলল, প্রিয় অতিথিরা, সবাইকে একটি খুশির খবর দিতে চাই। ইয়া বড় খবর। আমাদের হেরোডোটাস সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে এথেন্সের কাহিনি নিয়ে বই লিখবে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এথেন্সের কথা।

সবাই হাততালি দিয়ে বলল, ব্রাভো, অভিনন্দন।

আসপাশিয়া বলল, হেরোডোটাস, কী নাম হবে বইয়ের?

হেরোডোটাস বলল, হিস্ট্রি[৭১] বা ইতিহাস।

'কেন, এই নাম কেন? এটি তো গল্পের বই।'

'হিস্ট্রি মানে খোঁজ। অনুসন্ধান। আমি গল্পের মতো বানিয়েছি। কিন্তু এটি আসলে গবেষণা। আমি খোঁজ করেছি। খোঁজ করে যা পেয়েছি, তাই হবে আমার হিস্ট্রি। এতে অবশ্যই এথেন্সের কথা বেশি থাকবে। সাথে অন্য অনেক কিছুই থাকবে। আমি সারা জীবন ঘুরেছি, ঘুরে ঘুরে খুঁজেছি। বের করতে চেয়েছি মানুষ কোথা থেকে এলো। ইউরোপ কোথা থেকে এলো। দেবতা জিউস ইউরোপাকে চুরি করেছিল। ইউরোপার নাম থেকে এসেছে ইউরোপ। একেবারে সেখান থেকে শুরু করব। সেই ইতিহাস চলতে থাকবে এক নগর থেকে অন্য নগরে। শেষ হবে এথেন্সে এসে। এথেন্সেই মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। সেখানেই শেষ হবে আমার বই।'

সবাই আবার হাততালি দিল।

আসপাশিয়া বলল, চমৎকার। এমন কাজ পৃথিবীতে এই প্রথম হবে। আপনি একেবারে নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন।

আসপাশিয়া তাকে একগুচ্ছ পেপিরাস কাগজ দিল। এই পেপিরাসেই শুরু হবে হেরোডোটাসের বই 'হিস্ট্রি'।

সিম্পোজিয়ামে খানাদানা শুরু হলো। সুন্দর পোশাক পরা দাসেরা খাবার দিচ্ছে। কিথারা বাজছে। আনন্দী-দাসীরা মৃদু ভঙ্গিতে নাচছে। সিম্পোজিয়াম জমে উঠেছে

পেরিক্লিস বললেন, আসপাশিয়া, তুমি কিন্তু ঝামেলা করলে। তুমি আসল কথাই ভুলিয়ে দিলে।

আসপাশিয়া বলল, আসল কথা কোনটা?

আসল কথা হলো হেরোডোটাসকে পুরস্কার দিতে হবে।

সবাই বলে উঠল, তাই তো। এক্ষুনি পুরস্কার দেওয়া হোক।

পেরিক্লিস বললেন, পুরস্কার কি মুখের কথায় দেওয়া যায়? এটি গণতন্ত্র। কী দেওয়া হবে, সেটি সংসদে ভোটে ঠিক হবে।

গায়ক ডেমন বললেন, সংসদে কি পুরস্কারের প্রস্তাব দেবে সেটা। আমাদের বললে একটু শান্তি লাগত।

পেরিক্লিস বললেন, ঠিক আছে এই সিম্পোজিয়ামই হোক ছোট সংসদ। আমাদের এখানে সবাই যা বলবে, আমি সেই কথাই সংসদে তুলব।

সফোক্লিস বললেন, হেরোডোটাস যা করেছে, সেটি অলিম্পিক পদক জেতার সমান। আমার মনে হয় অলিম্পিক পদকের চেয়েও বেশি। অলিম্পিক জয়ীদের যে পুরস্কার দেওয়া হয়, সেটিই দেওয়া হোক। তাকে আগোরার ভেতরে প্রিটারিয়ামে থাকতে দেওয়া হোক। থাকা-খাওয়া ফ্রি। সারা জীবন সরকারি ভাতার ব্যবস্থা।

ডেমন বললেন, সমস্যা হলো অলিম্পিক বিজয়ীর সমান পুরস্কার দিলে অন্য নগরের লোকেরা হাসাহাসি করবে। এথেন্সের অলিম্পিক পদক পাওয়া লোকেরাও গোস্বা করবে।

দাওয়াতিরা বলল, ঠিক, ঠিক। এক জনের সম্মানে অন্য লোকের গোস্বা ব্যাপারটা ভালো হয় না। অন্য কিছু দেওয়া হোক।

পেরিক্লিসের গুরু এনাক্সাগোরাস বললেন, হেরোডোটাস তো অলিম্পিক জিতেনি। সে অলিম্পিকের চেয়ে অনেক বেশি কিছু জিতেছে। তাকে স্বর্ণ দেওয়া যায়। আপনারা স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তাব করেন। কত টেলেন্ট সোনা দেওয়া যায়।

এথেন্সে সোনা মাপা হয় টেলেন্ট হিসেবে। এক টেলেন্ট সোনা অনেক টাকা। এক টেলেন্ট সোনার দামে একটি বিরাট যুদ্ধ জাহাজ হয়ে যায়।

দাওয়াতিরা ফিসফাস করছে। কত সোনা দেওয়া যায়। একজন বলল, দুই টেলেন্ট স্বর্ণমুদ্রা। লোকজন সমস্বরে বলল, বেশি, আরও বেশি দিতে হবে। আরেকজন বলল, তিন টেলেন্ট। চেরোফোন বলল, চার টেলেন্ট। পাঁচ টেলেন্টে গিয়ে অতিথিরা থামল।

আসপাশিয়া পেরিক্লিসকে দুই হাতের আঙুলগুলো দেখাল। পেরিক্লিস বললেন, ভায়েরা, আমার প্রস্তাব দশ টেলেন্ট।

সবাই হই হই করে উঠল, বহুত আচ্ছা। সে এথেন্সের জন্য যে কাজ করছে, তাতে দশ টেলেন্টই ন্যায্য।

পেরিক্লিস বললেন, কাল সকালেই আমি সংসদে প্রস্তাব করব। ভোটে পাস হলে কালই পুরস্কার। সব কিছু গরম গরম হোক।

সবাই হাততালি দিল। জোরে কিথারা বেজে উঠল। বাজনদাররাও পুরস্কারের কথায় খুশি হয়েছে। তাদের জোস এসে গেছে।

আসপাশিয়া বলল, এথেন্সের মানুষরা তো বিদেশিদের পাত্তাই দেয় না। যত জ্ঞান, বুদ্ধি সব নাকি এথেন্সের মানুষদের। বাকিরা সব ফাঁটা বাঁশ। এবার হেরোডোটাস দেখিয়ে

দিল।

কথাটা বলে আড়চোখে পেরিক্লিসের দিকে তাকাল আসপাশিয়া। সবাই বুঝল কথাটার উদ্দেশ্য হেরোডোটাস নয়। উদ্দেশ্য পেরিক্লিস। পেরিক্লিস মৃদু হাসলেন। ডেমন বললেন, পেরিক্লিস দেখো, সুযোগ পেয়েই এক বিদেশিনী কেমন করে আর এক বিদেশির পক্ষে চলে গেছে।

আসপাশিয়া বলে চলল, ম্যারাথন আর সালামিনার যুদ্ধ নিয়ে যেমন করে হেরোডোটাস বলল, আমি বাজি ধরতে পারি এথেন্সের কেউ এমন করে বলতে পারত না। হেরোডোটাস এথেন্সের জন্য চিরকাল মনে রাখার মতো কাহিনি বানিয়ে দিল। অপূর্ব কাহিনি: এথেন্সে গণতন্ত্র এলো। সেই নবীন গণতন্ত্রে পারস্য আক্রমণ করল। এথেন্সের মানুষ যুদ্ধের পক্ষে ভোট দিল। প্রাণপণ যুদ্ধ করল। ম্যারাথনে জিতল এথেন্স। কিন্তু পারস্য ছাড়ল না। তারা আবার এলো এথেন্সে। পার্থেনন জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু সাগরের যুদ্ধে পারস্যকে হারিয়ে দিল এথেন্স।

পেরিক্লিস বললেন, এর পরের ঘটনা আরও অদ্ভুত। যুদ্ধ শেষ হলো। সালামিনাস দ্বীপ থেকে সবাই এথেন্সে ফিরে এলো। এসে দেখে সারা এথেন্স পুড়ে গেছে, শহরের দেয়া ভেঙে ফেলেছে। নতুন করে ঘর বানানো হলো, শহরের দেয়াল তৈরি হলো। এর মধ্যে আর একটি কাজ হলো। পারস্য তো আবার যেকোনো সময় আসতে পারে। তাই গ্রিসের সব দ্বীপের একটি জোট দরকার। বানানো হলো জোট। ঠিক হলো সব দ্বীপ প্রতি বছর টাকা দেবে, সেই টাকা রাখা হবে ডিলোস দ্বীপে। ডিলোস দ্বীপে দেবতা এপোলোর বাড়ি। খুব পবিত্র জায়গা। তাই সেখানেই টাকা থাকবে। ডিলোস দ্বীপে প্রধান অফিস, তাই এই জোটের নাম ডিলিয়ান জোট। ডিলিয়ান জোটের নেতা হলো এথেন্স। এভাবে সারা গ্রিসের প্রধান নগরী হয়ে উঠল এথেন্স।

দার্শনিক প্রোটাগোরাস[৭২] এই সিম্পোজিয়ামে আছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছেন। এতক্ষণে সুযোগ পেলেন।

প্রোটাগোরাস বললেন, সেই যুদ্ধের পরে অন্য নগরের সবাই ভাবলো- এথেন্স তো পুঁটি মাছের মতো ছোট্ট একটি নগরী, সেই নগরী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সম্রাটকে হারিয়ে দিল? একবার না, দুই দুই বার। সারা দুনিয়ার মানুষ কারণ খুঁজতে শুরু করল। কারণটি হলো এথেন্সের গণতন্ত্র। যারা বুদ্ধিমান, তারা বুঝতে পারল পার্থক্যটা কোথায়। এথেন্সে কোনো রাজা-রানি নেই। সারা দুনিয়ায় রাজা আছে। রাজারা মুখের কথায় দেশ চালায়। রাজার ইচ্ছাই আইন। রাজা যখন যা মনে করে, তাই করে। কিছু চাটুকার তাকে খবর দেয়। সেই খবর শুনে রাজা আজ একে ধরে, কাল ওকে জেলে আটকে রাখে। রাজাদের হেরেমে হাজার হাজার মেয়ে থাকে। কোনো সুন্দর মেয়ে সৈনিকদের নজরে পড়লে আর রক্ষা নেই। তাই সবাই সেখানে ভয়ে থরথর করে কাঁপে। সেখানে একজন হলেন রাজা আর বাকি সবাই তার প্রজা। সবাই রাজার দাস। সেখানে জ্ঞানীরা থাকেন সবচেয়ে

বিপদে। তারা রাজার আর সৈনিকদের অকাজ-কুকাজ বুঝতে পারে। কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারেন না। বলতে গেলেই কল্লা যাবে। কিছু চাটুকার শুধু রাজার গুণগান করে। তার মধু খায়। বাকি সবাই ডরে ভয়ে জীবন কাটায়। আর উল্টো দিকে এথেন্সের গণতন্ত্রে সবাই সমান। দেশ চলে আইন দিয়ে। কারও একজনের কথায় কিচ্ছু হয় না। মানুষ ভোট দিয়ে এক বছরের জন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দেয়। সব সিদ্ধান্ত সবার ভোটে হয়। এখানে রাজার জুলুম নেই। সৈনিকদের ভয়-ভীতি নেই। মানুষ সত্যিই স্বাধীন। সারা পৃথিবীর জ্ঞানীরা টের পেল— এথেন্সে রাজার জুলুম নেই, সেখানে যা খুশি বলা যায়। লেখকরা শুনতে পেল— এথেন্সে সত্য কথা লেখা যায়। দার্শনিকরা শুনল, সেখানে বাচ্চাদের নতুন নতুন জিনিস শিখানো যায়, কেউ বাধা দেয় না। চিত্রকররা যা খুশি আঁকতে পারে। আর বিস্তর টাকা আছে এথেন্সে। বড় বড় দালান-কোঠা হচ্ছে। হাজার হাজার মূর্তি বানাচ্ছে। তাই ভাস্কর, প্রকৌশলী সবাই এথেন্সে আসতে শুরু করল। দেশ-বিদেশের মেধাবী মানুষ আসতে শুরু করল। যে নিজের দেশে ভয় পায়, সেই চলে আসে এথেন্সে। যার আয় নেই, জ্ঞান আছে; সেও চলে এলো এথেন্সে। কয়েক বছরের মধ্যে এথেন্স হয়ে গেল পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীদের আখড়া। সব বিষয়ে সারা দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ এখন এথেন্সে। আজকের এই সিম্পোজিয়ামের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এমন চাঁদের হাট পৃথিবীর কোথাও নেই।

সবাই চারদিক দেখছে। প্রোটাগোরাস এক বিন্দুও মিথ্যা বলেনি। এই ঘরেই পৃথিবীর সেরা জ্ঞানী-গুণীরা বসে গল্প করছে।

চেরোফোন এবার সক্রেটিসকে গুঁতা মেরে বলল, কী, শুধু আমি নাকি একাই গণতন্ত্রের গুণগান করি? এখন দেখো— পৃথিবীর সব জ্ঞানীগুণী বলছে, গণতন্ত্রই এথেন্সের জীয়নকাঠি। এর জন্যই এই শহর দুনিয়ার সেরা শহর।

সক্রেটিস কিছু একটি বলতে যাবে, এমন সময় একটি ছেলে তাকে ধাক্কা দিল। বলল, এই সরো, ফালতু লোকজনে আলগা ভিড় করে। সরো, জায়গা দাও।

ছেলেটি সক্রেটিসকে ধাক্কা মেরে সামনে এগিয়ে গেল।

সক্রেটিস অবাক। সিম্পোজিয়ামের মতো অনুষ্ঠানে এমন কিছু আশা করা যায় না।

চেরোফোন বলল, ওর নাম এনিতাস[৭৩]। চামড়ার ব্যবসা করে। ট্যানারি আছে। গণতন্ত্রের চ্যাংড়া নেতা। নতুন নতুন নেতা হয়েছে তো, মাথা ঠিক নাই।

ক্রিতো বলল, কিন্তু সক্রেটিসের সাথে ওর কী শত্রুতা?

চেরোফোন বলল, ও নাকি পথে-ঘাটে সক্রেটিসকে গালি দেয়। আজে- বাজে কথা বলে।

সক্রেটিস বলল, আমাকে অনেকেই সুযোগ পেলেই গালি দেয়। এ আর নতুন কী!

সক্রেটিসের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনো একজন ব্যক্তি দায়ী হলে তার নাম এনিতাস।

চেরোফোন বলল, ওর গালি একটু আলাদা। ও খুব পাজি লোক। বিশাল মামলাবাজ। মানুষকে বিপদে ফেলতে ওস্তাদ।

সক্রেটিস বলল, কেউ যদি আমাদের সাথে খারাপ কিছু করে, সেটি তার সমস্যা। আমাদের সমস্যা নয়। তার জ্ঞান নেই। ভালো-মন্দ বোঝে না। তাই সে খারাপ জিনিস করে। আমরা তার সাথে ভালো কাজ করলেই ধীরে ধীরে সে জানবে, জ্ঞানী হবে। জ্ঞানী হলেই সে একজন সুন্দর মানুষ হবে। আসো, আপাতত ওকে ভুলে যাই।

কিন্তু ভুলে যাওয়া গেল না। একটু পরেই সফোক্লিস একটি ঘোষণা দিলেন। তিনি সবার সামনে এনিতাসকে নিয়ে গেলেন। বললেন, ভাইসব, আমার সামনে আছে এথেন্সের তরুণ নেতা এনিতাস। সিদ্ধান্ত হয়েছে, কাল সকালে সংসদে হেরোডোটাসের পুরস্কার প্রস্তাব করবে এই এনিতাস।

সকলে একটু অবাক। পেরিক্লিস প্রস্তাব করবেন না?

পেরিক্লিস হাত তুলে বললেন, আমরা তরুণদের সুযোগ দিতে চাই। এনিতাস তরুণ, সে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। কাল পুরস্কারের প্রস্তাব করবে এনিতাস।

সবাই হাততালি দিল। এনিতাস নেতার মতো সবার দিকে হাত তুলল। চেরোফোন ফিসফিস করে বলল, এনিতাস খুব ধড়িবাজ লোক। পশ্চিম পাড়ায় বাড়ি, মহল্লার নাম ইউনিমন। ঐ মহল্লায় অনেক মানুষ, অনেক ভোট। ও অনেক লোকজন নিয়ে পিনিক্স পাহাড়ে যায়, একসাথে ভোট দেয়। তাই ওর কথা রাখতে হয়। ও সফোক্লিসকে দিয়ে পেরিক্লিসকে ম্যানেজ করেছে। কাল সকালে পিনিক্স পাহাড়ে সংসদে হাজার হাজার লোকের সামনে সে নেতা হয়ে যাবে।

সক্রেটিস চুপ করে দেখছে, গণতন্ত্রে কেমন করে অসভ্য মানুষও নেতা হয়ে যায়! অন্যদের সেটি মেনে নিতে হয়।

ক্রিতো বলল, চলো, আমার আর এখানে ভালো লাগছে না। এর চেয়ে আমাদের খোলা আকাশের নিচের আড্ডা অনেক ভালো।

সক্রেটিস, ক্রিতো আর চেরোফোন বের হয়ে গেল। বের হওয়ার সময় শুনল, আসপাশিয়া পেরিক্লিসকে বলছে, এ কেমন লোককে তোমরা সামনে ঠেলে দিচ্ছ? ঐ এনিতাসের চোখ দেখেছ? ওর চোখে হিংসা, ওর মধ্যে আক্রোশ। এমন মানুষ গণতন্ত্রের নেতা হলে, এথেন্সের বিপদ আছে।

***

৭১. হেরোডোটাসের বইয়ের ইংরেজি নাম ‘The Histories’, গ্রিক ভাষায় Historía, যার অর্থ inquiry

৭২. দার্শনিক প্রোটাগোরাস (Protagoras) গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক। তার বিখ্যাত উক্তি : 'Man is the measure of all things'. প্লেটো তার Protagoras ডায়ালগে সক্রেটিস ও প্রোটাগোরাসের সংলাপে গণতন্ত্র সম্পর্কে সক্রেটিসের ধারণা প্রকাশ করেছেন।

৭৩. এনিতাস (Anytus): এথেন্সের গণতন্ত্রী নেতা, সক্রেটিসের বিরুদ্ধে মামলার বাদী।

২৩

‘ভালোবাসা হলো দুই শরীরে বাস করা একটি মিলিত আত্মা।’
—এরিস্টোটল

আসপাশিয়া সংসার করছে।

সুখের ঘরকন্না। সব মেয়ের মনেই একটি ছোট্ট ছিমছাম সংসারের ছবি থাকে। আসপাশিয়াও একটি ছোট্ট সংসারই চেয়েছিল। কিন্তু তার সংসার ছোট্ট না। ইয়া বড়। পর্বতের মতো। সে পেরিক্লিসের ঘরণী। পুরো এথেন্সই তার সংসার। সারা এথেন্সের নামি-দামি মানুষে তার ঘর গিজগিজ করছে। বড় বড় শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক দিনরাত বারান্দায় বকবক করছে। চব্বিশ ঘণ্টা চুলা জ্বলছে। শ’খানেক দাস-দাসী হাউকাউ করছে। আসপাশিয়া এখন ব্যস্ত ঘরের মহাব্যস্ত ঘরণী।

পেরিক্লিস বাইরে বাইরে থাকেন। তার দম ফেলার সময় নেই। এই বাড়িতে আসার আগে আসপাশিয়া মাঝে মাঝে পেরিক্লিসকে একান্ত নিজের করে পেত। কিন্তু এখন তার সাথে একটু নিরিবিলি কথা বলার সময়ও পায় না।

তবু আসপাশিয়া সুখী। সময় দিতে না পারলেও, পেরিক্লিস একজন তুমুল প্রেমিক। তাকে সুখে রাখতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পেরিক্লিসের আগের তরফের দুই ছেলেকেও আপন করে নিয়েছে আসপাশিয়া। ছেলে দুটি তাকে বড় গলায় মা বলে ডাকে। ছেলেপেলে নিয়ে আসপাশিয়া এখন মস্ত ঘরের ব্যস্ত গিন্নি।

এত কিছু করার পরেও একটি বিশেষ কাজ করে আসপাশিয়া। সে পেরিক্লিসের বক্তৃতা লিখে দেয়। সে না লিখলে, এখন আর পেরিক্লিস বক্তৃতা করতে পারেন না। পেরিক্লিস বক্তৃতা লিখতে বললে, আসপাশিয়া এমন ভাব করে যেন সে মহাবিরক্ত হয়েছে। আসলে এই কাজটি করতেই সে সবচেয়ে আনন্দ পায়।

সব মিলিয়ে নতুন সংসারে সে সুখী, মহাসুখী।

কিন্তু পেরিক্লিস সুখী নয়। তার মাথায় সব সময় ঘোরে তিনি আসপাশিয়াকে সুখী করতে পারেননি। তাকে আইনের বিয়ে করতে পারেননি। তার মনে হয় ভীষণ অপমানের জীবন কাটাচ্ছে মেয়েটি। আসপাশিয়ার চোখে চোখ পড়লেই মনে হয়, কী দিতে পেরেছি এই মেয়েটিকে? এমন ভালো একটি মেয়ে। এমন জ্ঞানী একজন মানুষ। তাকে মান-সম্মান কিছুই দিতে পারলাম না।

ভর দুপুরে বারান্দায় বসে আছেন পেরিক্লিস।

আসপাশিয়া বলল, একটি মজার কথা বলব? রাগ করা যাবে না।

পেরিক্লিস বললেন, মজার কথায় রাগ?

'কথাটা আমার জন্য মজার। আপনার জন্য রাগের।

'ও, তাহলে মজা মাখা রাগের কথা। বলো শুনি।'

'আমার বিয়েতে আচার অনুষ্ঠান একটু হয়েছিল। আপনি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি নিষেধ শুনিনি।'

'তাই নাকি?'

'হুঁম, সক্রেটিস আর তার মা বিয়েতে আচার করেছে।'

'সক্রেটিসের তো দেখি বিরাট সাহস।'

'তার মায়ের সাহসও কম না।'

'বিয়ের অনুষ্ঠান কী রকম হলো?'

'তেমন কিছু না। দিতি দেবীর মন্দিরে গিয়ে কিছু টুকটাক নিয়ম-কাজ। শুভ আলো, মঙ্গল-গোসল এসব।'

'গান বাজনাও হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'হয়েছে। তবে গান সক্রেটিস করেনি। তার গানের গলা ভালো না। ফাটা বাঁশের মতো।'

'তো কার গলা চিকন বাঁশির মতো? কে গান করল তোমার বিয়েতে?'

'আপনার গায়ক বন্ধু ডেমন।'

'ও, শয়তান ডেমনও সাথে ছিল? তলে তলে এত কিছু? কেউ দেখেনি তো?'

'কাক-পক্ষীও দেখেনি।'

মনে মনে খুশিই হলেন পেরিক্লিস। ঝুঁকি ছিল। তাও মেয়েটা কিছু একটি করে একটু হলেও সুখ পেয়েছে— এই ভেবে আনন্দ হলো পেরিক্লিসের।

তিনি আলগা একটু রাগ দেখিয়ে বললেন, কাজটা খুবই খারাপ করেছ? আমার আদেশ অমান্য করেছ। অপরাধ হয়েছে। তুমি হলে এক নম্বর অপরাধী। আর দুই নম্বর অপরাধী হলো সক্রেটিস। ওকে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি হিসেবে ওকে একদিন দাওয়াত করো।

আসপাশিয়া ভীষণ খুশি। স্বামী তার মনের কথা পড়ে ফেলেছেন।

পেরিক্লিস আবার বললেন, এটি কিছু হলো? তারা বিয়ের অনুষ্ঠান করল, কিন্তু বিয়ের খাওয়া খেতে পারল না! একটি বিয়ের ভোজ তার পাওনা আছে। ডাকো, বন্ধুদেরসহ তাকে ডাকো।

আসপাশিয়া গদগদ হয়ে বলল, আগামী শনিবার ডাকি?

পেরিক্লিস বললেন, সেটি তোমার ব্যাপার। সংসার তোমার, ডাকাডাকির ফয়সালাও তোমার।

আসপাশিয়া জানে আইনে বিয়ে করতে পারেননি বলেই পেরিক্লিস কথায় কথায় তাকে তোমার সংসার, তোমার ঘর— এসব বলেন। শুনতে খারাপ লাগে না।

হঠাৎ পেরিক্লিস বললেন, সক্রেটিস ছেলেটাকে তুমি একটু বেশিই পছন্দ করো। তাই না?

আসপাশিয়া চমকে উঠল। পেরিক্লিস কী ইঙ্গিত করছেন? সে তার দিকে তাকাল। পেরিক্লিসের চোখে দুষ্টু হাসি। তিনি রসিকতা করছেন। বাইরে থেকে যে রাগটা দেখাচ্ছেন, সেটি খুনসুটি রাগ। এই রাগের জবাবে পাল্টা খুনসুটি করতে হয়। আসপাশিয়াও তাই করল।

সে বলল, হুঁম, সক্রেটিসকে আমি খুবই পছন্দ করি। সে আমার অনেক অনেক কাছের মানুষ।

পেরিক্লিস বললেন, কাছের মানুষ না হলে কি এত ঘন ঘন আসে?

'তলে তলে সব খবরই আছে! সক্রেটিস বলে, আমি তার শিক্ষক। আমার থেকে সে অনেক কিছু শিখে। আমি নাকি মিষ্টি করে দর্শন, জ্ঞান এসব বলতে পারি। আমার মতো আর কেউ পারে না। তাই আমি তার গুরু।'

পেরিক্লিস অট্টহাসি দিয়ে বললেন, 'তুমি সক্রেটিসের গুরু?'

'কেন? হতে পারি না? আমি যদি মহান পেরিক্লিসকে বক্তৃতা লিখে দিতে পারি, তাহলে সক্রেটিসকে জ্ঞান দিতে পারি না?'

পেরিক্লিস বললেন, তার মানে সক্রেটিসের গুরুগিরি তোমার ভালো লাগছে। চালিয়ে যাও। তবে গুরু সাহেবা, ঘটনা হলো সক্রেটিসকে নিয়ে মুরুব্বিরা নানান কথা বলে। ছেলেটা নাকি উদ্ভট।

আসপাশিয়া বলল, কথা সত্য। সক্রেটিস আলাদা, তাই সে উদ্ভট।

'তোমার মতো গুরু থাকতে সে উদ্ভট হবে কেন? তালিম দিয়ে পথে নিয়ে এসো।'

আসপাশিয়া উঠে বসল। পেরিক্লিসের একেবারে সামনে গিয়ে বলল, অনেক ঠাট্টা হয়েছে। এবার সত্যিটা বলছি। সক্রেটিসের মতো জ্ঞানী মানুষ এথেন্সে আর একটিও নেই। অল্প বয়সেই ওর চিন্তা-ভাবনা একেবারে আলাদা। অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষেরা আমজনতা থেকে আলাদা হয়। আলাদা বলেই লোকে তাদেরকে উদ্ভট বলে।

পেরিক্লিস বললেন, তুমি তো সত্যিই সক্রেটিসের গুরুর মতো কথা বলছো। হুঁম, আমজনতার চেয়ে আলাদা হলে মানুষ উল্টা-পাল্টা বলে।

আসপাশিয়া বলল, আপনি নিজেও আলাদা। এজন্যই এথেন্সের মানুষ আপনাকে নিয়ে কথা বলে। আগে বলত, আপনি নাকি দেবতা জিউসের মতো। একবার যা বলেন, সেটি করে ছাড়েন। তারপর আমি এলাম আপনার জীবনে। মানুষ ভাবছে, আপনি আমার রূপের

টানে দিশাহারা। আমাকে বিয়ে করেননি, কিন্তু ঘরে এনেছেন। আপনার জীবন সবার থেকে আলাদা। স্রোতের বিপরীত। তাই আপনাকে নিয়ে উল্টা-পাল্টা কথা হচ্ছে। আমার ক্ষেত্রেও তাই। এই একই কথা সক্রেটিসের জন্যও সত্যি। সে প্রশ্ন করে, তাই সে খারাপ। অন্য ছেলেরা তাকে ভালোবাসে, তাই মুরুব্বিরা তাকে দেখতে পারে না। তাদের কাছে সে উদ্ভট।

পেরিক্লিস বললেন, ঠিক আছে, সক্রেটিসের গুরু। মেনে নিলাম। আমি উদ্ভট, তুমি উদ্ভট, সক্রেটিসও উদ্ভট। আমাদের চারপাশে যারা আছে তারা সব উদ্ভট।

আসপাশিয়া হেসে উঠল। সে বলল, এখন একটি উদ্ভট আইনের কারণ বলেন।

'কোন আইন?'

'এথেন্সের মানুষ অন্য নগরের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। গণতন্ত্রে এমন অদ্ভুত আইন কীভাবে হলো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পেরিক্লিস। বললেন, এই আইন আমি নিজেই করেছি। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছি।

'মানে?'

'এটি আমার করা আইন। পাঁচ বছর আগে একদিন সংসদে দাঁড়িয়ে বললাম— 'এথেন্স হবে একশ ভাগ খাঁটি জাতি। কোনো ভেজাল রক্ত আমরা এখানে মিশতে দেব না। এখন থেকে এথেন্সের কেউ আর এই নগরের বাইরের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। আইন পাস হলো। অথচ দেখো— ক'বছর পরে সেই আইনের শিকার আমি নিজে। আমাদের ট্র্যাজেডি নাটকের মতো। নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই পড়েছি। তোমাকে কী ভয়ংকর কষ্টে রেখেছি।'

'আমার কোনো কষ্ট নেই। আমি সুখী, অনেক সুখী।'

'আমি সুখী না।'

'কেন?'

'তোমাকে মান-সম্মান দিতে পারছি না।'

'সেটি আপনার হাতে নেই। আপনি চাইলেই আইন পাল্টাতে পারবে না। সবাই বুঝে যাবে তুমি আমার জন্য আইন পাল্টাচ্ছেন। ভোটে হেরে যাবেন। সে ঝুঁকি আপনাকে নিতে দেব না।'

'তাহলে কী করব?'

'আমাকে একটু ভালোবাসতে চেষ্টা করেন।'

'আরও ভালোবাসতে হবে?'

'পুরুষ মানুষের ভালোবাসা হলো পদ্ম পাতার পানি। তাকে যত্ন করে ধরে না রাখলে ফুঁস করে পড়ে যায়।'

পেরিক্লিস জানেন তার মধ্যে পদ্ম পাতার পানি নয়, এক মহাসাগর প্রেম আছে আসপাশিয়ার জন্য। তিনি আসপাশিয়াকে শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা একসাথে হলেই সে সম্পর্ককে হিরন্ময় সম্পর্ক বলে। তাদের মতো হিরন্ময় সম্পর্ক এথেন্সে খুব কম আছে।

পেরিক্লিস ঠিক করলেন, তিনি তো এথেন্সের মানুষকে বলতে পারবেন না যে আসপাশিয়া আমার বউ। কিন্তু তিনি কাজে প্রমাণ করে দেবেন আসপাশিয়া বউয়ের থেকে অনেক বেশি, সে তার সহধর্মিণী।

পেরিক্লিস আসপাশিয়াকে নিয়ে বাইরে যাওয়া শুরু করলেন। তিনি আসপাশিয়াকে নিয়ে আগোরায় যান। সবার সামনে জড়িয়ে ধরেন। ভাষণ দেওয়ার আগে, সবাইকে শুনিয়ে বলেন, ঐ যে, আসপাশিয়া যে ভাষণটা লিখে দিয়েছে, ঐটা বের করো। এমনকি আসপাশিয়ার লেকচার শোনার জন্য তিনি ঘরোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন, যাতে তার বন্ধুদের সাথে তাদের স্ত্রীদেরও আমন্ত্রণ করেছিলেন। এথেন্সের নারীরা সেই প্রথম পুরুষের পাশাপাশি বসে রাজনৈতিক আলাপে অংশ নেয়।

যে প্রেমকে সমাজ স্বীকৃতি দেয় নি, সে প্রেমকে সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ভীষণ বাড়াবাড়ি করছেন পেরিক্লিস। তার এই বাড়াবাড়ি এথেন্সের মানুষের কাছে খুবই গরম খবর। পেরিক্লিস আর আসপাশিয়ার কাহিনি এখন সবার মুখে মুখে। সকালবেলা পেরিক্লিসের যাওয়ার পথে অনেক মানুষ ভিড় করে। দাঁড়িয়ে দেখে পেরিক্লিস কীভাবে আসপাশিয়াকে নিয়ে হেঁটে যান। তারা চলে গেলে বলে, ও তো আসপাশিয়া নয়, ও হলো হেলেন। স্পার্টার হেলেন। হেলেনের রূপে যেমন ট্রয় ধ্বংস হয়েছিল, তেমনই আসপাশিয়ার রূপে এথেন্স ধ্বংস হবে।

এথেন্সে এখন শান্তির সময় যাচ্ছে। পেরিক্লিস শক্তিশালী শাসক। অন্য কোনো দেশ এথেন্সকে আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে না। এথেন্সবাসী সুখে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু একটানা শান্তি মানুষের নিরামিষ লাগে। এক-আধটু হুজ্জতি না হলে জমে না। তারা হুজ্জুতি খুঁজছে।

এই মুহূর্তে এথেন্সে দুটি হুজ্জুতি আছে। একটি পুরনো হুজ্জুতি-ইঁচড়ে পাকা সক্রেটিসের কাণ্ড কারখানা। আর একটি হুজ্জতি নতুন-আসপাশিয়া আর পেরিক্লিস।

সুযোগ পেলেই আসপাশিয়াকে নিয়ে মানুষ ছিঃ ছিঃ করে। এই মেয়েটি বিশাল ঝামেলাবাজ। সে পেরিক্লিসের ঘরে থাকে। কিন্তু তার বউ নয়। তাহলে সে পেরিক্লিসের কী? কোনো ভদ্র মেয়ে এভাবে থাকতে পারে?

পেরিক্লিসকে প্রশ্ন করার সাহস কারও নেই। তার ব্যক্তিত্ব আকাশের সমান। সে গণতন্ত্রের এক নম্বর পুরুষ। কিন্তু এক নম্বর পুরুষ হয়ে দুই নম্বর কাজ করলে হবে?

মেয়েদের ব্যাপারে এথেন্সের অনেক পুরুষই দুই নম্বর তারা কেরামেকাসে যায়। ঘরে বউ থাকা সত্ত্বেও তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আছে বিশেষ আনন্দী-দাসী। সেসব দাসী

নাচ-গান জানে। ধনীদের বাড়িতে সন্ধ্যায় বিশেষ সিম্পোজিয়াম আয়োজন হয়। সেখানে তুমুল আড্ডা হয়। সিম্পোজিয়ামে আনন্দী-দাসীরা নাচ-গান করে। শহরের আদর্শ পুরুষরা সেসব উপভোগ করে। অনেকে আবার দু'একটি আনন্দী দাসী ঘরেই রেখে দেয়।

এসব এখানে কোনো সমস্যা না। সমস্যা হলো পেরিক্লিস তো আসপাশিয়াকে আনন্দী-দাসী বানাননি। ব্যাটা বিয়ে করেনি, কিন্তু ভাবটা এমন যে আসপাশিয়া তার বউয়ের চেয়ে বেশি। তাকে নিয়ে পেরিক্লিস আগোরায় যান। বাজার করেন। সবার সামনে হাত ধরাধরি করে হাঁটেন। ছিঃ ছিঃ।

আসপাশিয়া যদি বারবনিতা হয়ে এথেন্সের রাস্তায় ঘুরত, তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। তখন পুরুষদের ভালো লাগত। কিন্তু যখন পেরিক্লিস তাকে সম্মানের জায়গা দিয়েছে, তখন আসপাশিয়া বাইরে এলে পুরুষদের চোখ টাটায়। এখন তো আর আসপাশিয়া ভোগ্য নয়, তাহলে সে বাইরে আসবে কেন?

আসপাশিয়াকে নিয়ে এখন সবখানে ফিসফিস, ভিসিভিস। তাকে নিয়ে ছেলেরা কেচ্ছা বানায়। ছেলেদের বাপও বানায়। ছেলেদের মায়েরাও হাহুতাশ করে।

সক্রেটিসের কাছে এসব কেচ্ছার খবর আনে চেরোফোন। সে এথেন্সের চলমান বেতার। সব সময় নিত্য নতুন খবর থাকে তার কাছে। তাকে দেখলেই সবাই জিজ্ঞেস করে, আজকের টাটকা খবর কী?

চেরোফোন একটি টাটকা খবর এনেছে। আসপাশিয়া সক্রেটিসকে দাওয়াত করেছে। সে একা নয়, চেরোফোন আর ক্রিতোরও দাওয়াত।

২৪

'ধরার আশাটুকু না থাকলে
অধরা কখনই ধরা দেয় না।'
— হিপোক্রাটিস

সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি।

এই কাক ডাকা ভোরে ক্রিতোদের বাড়ির কুয়ার পাড়ে সভা বসেছে। মায়েদের সভা। পুত্রদায়গ্রস্ত চার মা আলাপে বসেছেন। মায়েরা হলেন সক্রেটিস, ইউরিপিডিস, ক্রিতো আর চেরোফোনের মা। বিশেষ কারণে ক্রিতোর মা তিন বান্ধবীকে ডেকেছেন।

বৈঠক খুবই সংক্ষিপ্ত। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এখানে মেয়েরা খুব সকালেই একটু বাইরে আসতে পারে। দিনের আলো ফুটলে পুরুষরা বের হবে, তখন আর মেয়েরা বাইরে থাকতে পারবে না। তাই মেয়েদের সভা খুব ভোরেই হয়।

সভা খুব গুরুগম্ভীর পরিবেশে চলছে। ক্রিতোর মা ফিসফিস করে বললেন, খবর খারাপ। শুধু খারাপ নয়, ভয়াবহ খারাপ, মাথা নষ্ট হওয়ার মতো খারাপ।

সক্রেটিসের মা বললেন, কোন খবরের কথা বলছো?

'মুখে আনা যায় না, এমন খারাপ খবর। আমাদের ছেলেরা নাকি আজেবাজে জায়গায় যায়।'

ইউরিপিডিসের মা বললেন, মানে? কোন জায়গায় যায়?

'ঐ জায়গায় নামও মুখে আনা যাবে না। খুব খারাপ জায়গায় যায়।'

চেরোফোনের মা বললেন, বলো না, কোন জায়গায়?

'কেরামিকাস। কেরামিকাসে যায়!'

শুনেই তিন মা জড়াজড়ি ধরে হাউমাউ কান্না শুরু করল। ছেলেগুলো এমন কাণ্ড করতে পারল? শুধু সক্রেটিসের মা কাঁদছেন না। তিনি জানেন সক্রেটিস আসপাশিয়ার কাছে যায়। অনেক দিন ধরেই যায়।

তিনি বললেন, তোমরা কেঁদো না। ওরা তো আমাদেরই ছেলে। আমরা ওদের চিনি। গেলেও, কোনো খারাপ কাজে যায় না।

ক্রিতোর মা ফোঁস করে উঠলেন, খারাপ কাজে যায় না তো কোন ভালো কাজটা কেরামেকাসে আছে?

বলেই আবার কান্না শুরু করলেন।

সক্রেটিসের মা বুঝলেন, সক্রেটিস আসপাশিয়ার কাছে জ্ঞানের জন্য যায়, একথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। হাসাহাসি করবে। একজন মেয়ে

জ্ঞানের কথা বলে— আর তা শুনতে বড় ঘরের ছেলেরা যায়, এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর হতেই পারে না।

সক্রেটিসের মা বললেন, সমস্যা আসলেই জটিল। কিন্তু কান্না না করে চলো সমাধান ভাবি।

'সমাধান?'

'হুঁম, সমাধান। সমাধান হলো বিয়ে। চলো, ওদের বিয়ে দিয়ে দিই। ঝামেলা শেষ।'

কথাটা সবার পছন্দ হলো। এটিই সমাধান। তো কোন বাড়িতে ভালো মেয়ে আছে, কোন ঘটক ভালো হবে— সব কিছুর দায়িত্ব নিলেন ক্রিতোর মা। আগামী এক মাসের মধ্যে চারটি রূপবতী মেয়ে আমাদের ঘরে আনার দায়িত্ব তার।

কাঁদতে কাঁদতে শুরু করা অতি সংক্ষিপ্ত বৈঠক হাসতে হাসতে শেষ হলো।

রাতে সক্রেটিস বাসায় ফিরলে মা বিয়ের কথা তুললেন।

মা আদর করে বললেন, সক্রেটিস, তুই তো সুন্দর জীবন চাস।

সক্রেটিস অবাক! ঘটনা কী? মা তার সাথে সুন্দর জীবনের আলাপ করছেন! মা তো জ্ঞানী হয়ে যাচ্ছেন।

সে খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ, মা। আমাদের সবারই দরকার সুন্দর জীবন মা বললেন, সুন্দর জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার একটি সুন্দর বউ।

সক্রেটিস বোঝার চেষ্টা করছে সুন্দর বউ কী জিনিস!

মা বললেন, বউ সুন্দর হলেই জীবন সুন্দর হবে।

সক্রেটিস এখনও কিছুই বুঝতে পারছে না। সে বলল, মা জননী, ঘটনাটা কী?

মা বললেন, ঘটনা হলো তোমাকে বিয়ে করতে হবে। বয়স হয়েছে। এথেন্সে এই বয়সেই ছেলেরা বিয়ে করে।

সক্রেটিস বলল, বিয়ে করতে আমার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো— আমার শ্বশুর হওয়ার মতো লোক এথেন্সে নেই।

মা বললেন, শ্বশুরের দরকার নাই। শ্বশুরের মেয়ে হলেই হবে।

'শ্বশুরের মেয়েও পাবা না। এথেন্সের সকল পিতা আমার নামে কাঁপাকাঁপি শুরু করে। এখানে কোনো বাবা আমাকে কন্যা দেবে না।'

'সে ভাবনা আমার। তুই শুধু বিয়ের জন্য তৈরি হ।'

'আমি তো বিয়ে করে ফেলেছি।'

মা কান্না শুরু করলেন, তুই কাকে বিয়ে করেছিস? আমি কিচ্ছু জানলাম না।

'আমার বউয়ের নাম হলো জ্ঞান বেগম।'

এবার মা বুঝতে পারলেন। তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, জ্ঞানকে বিয়ে করতে তো কেউ মানা করেনি। তুই দশটা জ্ঞান বিয়ে কর। সকাল- বিকাল বিয়ে কর। আমার দরকার একটি, কেবল একটি রক্ত-মাংসের মেয়ে।

'ছিঃ মা, নিজের ছেলেকে কুবুদ্ধি দিও না। চরিত্র খারাপ করতে বল না।' এবার মা ঝাড়ি মারতে শুরু করলেন। সারা জীবন জ্বালাইছিস। এখন ভালো কথা বলছি, বিয়ে কর। বিয়ের কথায় পোলাপান আনন্দে নাচে, আর তুই এটি নিয়াও ক্যাচাল করছিস। তোর বন্ধুরা সবাই বিয়ে করবে। ক্রিতোর পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। চেরোফোনের জন্যও মেয়ে দেখছে। সবাই বিয়ে করবে। শুধু তুই চিরকুমার থাকবি?

সক্রেটিসের বাবা বললেন, তুই তো একটি বলদ। মানুষ বাপের স্বভাব একটু হলেও পায়। তোর বাবা এখনও বিয়ে করতে চায়। আর তুই বিয়ে করবি না?

এবার মা তার বাবাকে কিলবিল করে ধরলেন, এত বড় সাহস! বুড়ো বয়সে ভীমরতি?

সক্রেটিস দেখল এই সুযোগ। মা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। বাবাকে নিয়ে শুরু করেছেন। এই সুযোগেই কেটে পড়তে হবে। সে ভিজা বিড়ালের মতো নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

***

এথেন্সে বিয়ের মৌসুম চলছে। চারদিকে বিয়ে বিয়ে রব।

চেরোফোন ও ক্রিতো দুজনেরই বিয়ে ঠিক হয়েছে। ক্রিতোর বিয়েতে মহা ধুমধাম হবে। এথেন্সের সব মানুষকে দাওয়াত করা হবে। আনন্দী-দাসীরা নাচবে। থিবস নগর থেকে কিথারা বাজাতে যন্ত্রীদল আসবে। স্পার্টা থেকে অস্ত্র খেলা দেখাতে আসবে বর্গা বাহিনী। টানা সাত দিনের উৎসব।

ক্রিতোর পাত্রী অত্যধিক রূপবতী। তার মা তো মেয়েকে দেখেই একেবারে অজ্ঞান। এমন পাত্রী কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। ক্রিতো পাত্রীকে দেখেনি। এথেন্সে বিয়ের আগে বর-কনের দেখা হওয়ার নিয়ম নেই।

চেরোফোন এসব নিয়ম মানবে না। যেভাবেই হোক, সে পাত্রীর সাথে দেখা করবেই। পাত্রী পছন্দের জন্য তার তরিকা খুবই সোজা। পাত্রীকে শুধু দুটি বিষয় জানতে হবে—এক. গণতন্ত্র ও দুই. সক্রেটিস। গণতন্ত্রকে ভালোবাসতে হবে আর সক্রেটিসকে সম্মান করতে হবে। আর কোনো কিচ্ছু দরকার নেই। এই দুটি বিষয় চেরোফোন তার মাকে পই পই করে বলে দিয়েছে। মা বলেছেন, পাত্রী গণতন্ত্র আর সক্রেটিস দুটির কথাই জানে। কিন্তু মায়ের কথায় ভরসা হচ্ছে না। নিজে পরীক্ষা করে বুঝতে হবে। সেজন্য চেরোফোন কয়েক দিন ধরে হবু শ্বশুরবাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করছে। কিন্তু এখনও সুবিধা করতে পারেনি। কনের দেখা পায়নি।

আসপাশিয়া তাদের নিমন্ত্রণ করেছে। তারা এখন আসপাশিয়ার বাড়ি। এখানেও কথাবার্তার একটিই বিষয়। সেটি হলো বিয়ে।

আসপাশিয়া জিজ্ঞেস করল, চারদিকে এত এত সুখবর। বিয়ের গন্ধে এথেন্স শুধু ম ম নয়, একেবারে ব ব করছে। চারদিকে বিয়ের বাদ্য বেজে উঠেছে। মনে হচ্ছে প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি কামনার দেবতা কিউপিডকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে সবাইকে বিয়ে দিতে। তো সক্রেটিসের সুখবর কবে? সক্রেটিস কবে বিয়ে করছে?

সক্রেটিস কিছুই বলছে না। তার চোখে মুক্ত পুরুষের মতো উদাসীন দৃষ্টি। মুখে হাসি বা কান্না কোনোটাই নেই।

ক্রিতো বলল, ওর মা এখনই বিয়ে দিতে চান। কিন্তু সক্রেটিসের সময় কোথায়! সে তো জ্ঞানের প্রেমিক। জ্ঞানপ্রেমীরা বিয়ে-শাদী করে না। সে নাকি বিয়ে করে ফেলেছে, তার বউয়ের নাম-শ্রীমতি জ্ঞান।

সক্রেটিস নিরাসক্ত ঋষি ঋষি মুখে বলল, ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি বিয়ে করব। তোমাদের কাছে কি এমন কোনো মেয়ের সন্ধান আছে, যে শুধু জ্ঞান খেয়ে থাকবে, জ্ঞানকে কাপড় বানিয়ে পরবে, আর রাতে জ্ঞান মাথায় দিয়ে ঘুমাবে?

আসপাশিয়া বলল, আছে, আমার কাছে অমন মেয়ে আছে। মেয়েটি এখন বাবার বাড়িতে বসে সক্রেটিসের জন্য মালা গাঁথছে। ফুলের মালা নয়, জ্ঞানের মালা।

সকলে হো হো হেসে করে উঠল।

সক্রেটিস বলল, আর বিয়ের আলাপ নয়, অন্য কিছু বলো।

চেরোফোন বলল, আমার মাথায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এসেছে। গত কয়েক মাসে অনেক মহা মহা পণ্ডিত সক্রেটিসের কাছে হেরে গেল। এখন যে আসে, সেই সক্রেটিসের কাছে হেরে যায়। জ্ঞানের রাজ্যে সক্রেটিস সবার সেরা। সক্রেটিসই এখন নিঃসন্দেহে এথেন্সের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ।

আসপাশিয়া বলল, আমিও একমত। এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলতে আমি আর কাউকে শুনিনি। সক্রেটিস সত্যিই অসাধারণ। শুধু অসাধারণ নয়, একেবারে অনন্য সাধারণ।

ক্রিতো বলল, কিন্তু এথেন্সে কেউ মানতেই চায় না যে সক্রেটিস সেরা। আসপাশিয়া বলল, আমার মনে হয় সবাই জানে। কিন্তু স্বীকার করে না। চেরোফোন স্বর হালকা করে বলল, আমার একটি ভাবনা আছে। পেরিক্লিস সাহেব যদি একটি ঘোষণা দিয়ে দেন যে, সক্রেটিস এথেন্সের সেরা জ্ঞানী, তাহলে সবাই মেনে নেবে। আপনি কি তাকে একটু বলবেন?

সক্রেটিস তীব্রভাবে বলল, ছিঃ ছিঃ। কী বলছো তুমি?

সক্রেটিস ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে। সে এতদিন জ্ঞানযুদ্ধের বিষয়টি মজা হিসেবে নিয়েছে। বন্ধুরা মজা পায়। তারও ভালো লাগে। কিন্তু এখন তো বিষয়টি একেবারে পেরিক্লিস পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা! সে আলোচনা থামাতে চাইছে।

সক্রেটিস আসপাশিয়াকে বলল, আমি জ্ঞানী নই। ওরা জ্ঞানী জ্ঞানী বলে বলে আমাকে জ্ঞানী হতে বাধ্য করছে।

আসপাশিয়া হাসছে। রহস্যময়ী হাসি। সক্রেটিসের মনে হলো আসপাশিয়া মনে করছে তারা বন্ধুরা যুক্তি করে সক্রেটিসের জন্য তদবির করতে এসেছে।

সে মরিয়া হয়ে বলল, আমি এখানে আলাপ করতে আসি। শিখতে আসি। আর ওরা পেরিক্লিসের কাছে তদবির করতে বলছে। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা! উনি আমাকে ভুল ভাববেন। বড়োই লজ্জার ব্যাপার হবে।

আসপাশিয়া বলল, ভয় নেই, আমি পেরিক্লিসকে বলব না। কারণ সক্রেটিস যে এথেন্সের সেরা জ্ঞানী, একথা পেরিক্লিস বললেই লোকে মানবে না। সবাই বলবে, পেরিক্লিস কোনো একটি মতলবে সক্রেটিসের পক্ষ নিয়েছে।

সক্রেটিস বলল, কথা সত্য।

আসপাশিয়া বলল, এছাড়া আমি অনুরোধ করলেও পেরিক্লিস এমন কথা বলবেন না। সক্রেটিসের মতো অল্প বয়সের ছেলে সবার চেয়ে জ্ঞানী এমন ঘোষণা পেরিক্লিস কোনোদিনই দেবেন না। সত্য হলেও দেবেন না। এতে তার ভোট নষ্ট হবে।

সক্রেটিস বলল, তিনি কি চেরোফোনের মতো বোকা মানুষ? এই বুজরুকি আলাপ এখানেই বন্ধ করো। চলো, আমরা খাওয়া-দাওয়া শুরু করি।

আসপাশিয়া বলল, হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। উপায় একটি আছে।

চেরোফোন লাফিয়ে উঠল, কী উপায়? তাড়াতাড়ি বলুন।

আসপাশিয়া বলল, সক্রেটিস যে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি, এটি মানুষকে দিয়ে স্বীকার করানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ডেলফির ওরাকল।

সবাই একসাথে বলল, ওরাকল?

আসপাশিয়া বলল, হ্যাঁ। ওরাকল যদি একবার বলেন যে, পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলো সক্রেটিস, তাহলে আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি আর হতেই পারে না। সবাই জানে ওরাকল যা বলে, সেটি একেবারে দেবতা এপোলোর কথা। তার কথা অবিশ্বাস করার সাহস কারও নেই। এই উপায়ে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী হিসেবে সক্রেটিসের নাম ঘোষণা করা সম্ভব।

চেরোফোন লাফ দিয়ে উঠল। সে বলল, আমি কালই ডেলফিতে ওরাকলের কাছে যাব।

আসপাশিয়া বলল, তোমার বিয়ের পরেও যেতে পার। তাড়াহুড়া নেই।

'না, আমি কালই যাব।'

সক্রেটিস বলল, পাগলামি কোরো না, চেরোফোন।

'কোনো পাগলামি না। আমি কালই যাব। এমন সুন্দর বুদ্ধি আমার মাথায় এতদিন কেন যে আসেনি! আমার মাথা ভর্তি গোবর। আর আসপাশিয়ার মাথা ভর্তি বুদ্ধি। চিকন চিকন বুদ্ধি। পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমতী নারী সে। তার বুদ্ধিতেই চলব, আমি কালই ডেলফি যাব।'

ক্রিতো বলল, আমার বাবা তো বিয়ের আগে আমাকে কোথাও যেতে দেবে না। ক'দিন পরে তো তোমারও বিয়ে। চলো, বিয়ের অনুষ্ঠানের পরই যাই।

চেরোফোন বলল, বিয়ে করলে মাঝখানে আরেক নারী আসবে। সেই নারীর বুদ্ধি আসপাশিয়ার মতো চিকন নাও হতে পারে। তখন ঝামেলা হবে। তার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। কালই যাব।

ক্রিতো বলল, কিন্তু আমি তো কাল যেতে পারব না।

'তুমি বিয়ে কর। আমি আর সক্রেটিস গেলেই হবে।'

সক্রেটিস বলল, আমি এসব পাগলামির মধ্যে নেই।

চেরোফোন বলল, ঠিক আছে, আমার কাউকে দরকার নেই। আমি একাই যাব। আর সেটি কালকেই।

ক্রিতো বলল, তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। যদি যেতেই চাও, তবে সক্রেটিসকে নিয়েই যেও।

আসপাশিয়া বলল, যাবে ভালো কথা। কিন্তু ওরাকলকে কী প্রশ্ন করবে? চেরোফোন বলল, প্রশ্ন করব— 'পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ কে?'

‘তাহলে পিথিয়া অনেকের নাম বলবে। সেটি পিথাগোরাসের নাম হতে পারে, মহাজ্ঞানী সলোনের নাম হতে পারে। আরও অনেকের নাম বলতে পারে।’

‘এঁরা তো কেউ জীবিত নেই।’

‘তুমি তো প্রশ্নে সেটি স্পষ্ট করোনি।’

‘তাহলে প্রশ্ন করব— পৃথিবীর জীবিত মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? ‘তাতেও সমস্যা। তুমি তো সক্রেটিসের কথা জানতে চাও। প্রশ্নটার ভেতর সক্রেটিসের কথা বলো।’

‘কী বলব- সক্রেটিস কেমন জ্ঞানী?’

‘কাছাকাছি এসে গেছো। তুমি উত্তরে যা শুনতে চাও, সেটির মতো করে প্রশ্ন কোরো। তুমি তো ওরাকলের সাথে খোসগল্প করতে পারবে না। একটি মাত্র প্রশ্নের সুযোগ পাবে। তাই আরও পরিষ্কার করে প্রশ্নটা বোলো।’

একটু চিন্তা করে চেরোফোন বলল, ‘এত কিছু যখন বলছেন, তখন প্রশ্নটা বলে দেন না।’

আসপাশিয়া বলল, ঠিক আছে। যাওয়ার আগে বলে দেব।

২৫

‘পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজেকে জানা
আর সবচেয়ে সহজ কাজ হলো অন্যকে উপদেশ দেওয়া।’
— থেলিস

সক্রেটিস আর চেরোফোন ডেলফি শহরে যাচ্ছে। চেরোফোন শুরু করেছে তার বিশেষ মিশন। সক্রেটিস পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি— এইকথার স্বীকৃতি আদায়ের মিশন।

এথেন্স থেকে ডেলফি অনেক দূরের পথ। সেখানে পাহাড়ের উপর এপোলোর মন্দির। সেই মন্দিরের ওরাকলের কাছে যাচ্ছে তারা।

গাধার গাড়িতে পুরো একদিন লাগবে। ক্রিতো দুটি গাধায় টানা গাড়ি আর দুজন দাস দিয়ে দিয়েছে। একটি গাড়িতে সক্রেটিস আর চেরোফোন। অন্যটিতে মালামাল। এই মালামাল পিথিয়ার জন্য উপহার।

চেরোফোন তালিকা করে মিলিয়ে মিলিয়ে উপহার গাড়িতে তুলেছে। দশ এমফোরা জলপাই তেল, দুই হাঁড়ি কাঁচা জলপাই, পাঁচ বৈয়াম খাঁটি মধু, দুই মটকি আঙুরের রসের সুরা। পঁচিশখানা কাপড় এবং একশো রুপার মুদ্রা। এছাড়াও আছে দুটি ভেড়া, একটি ছাগল।

ছাগল আর ভেড়া উৎসর্গ করা হবে দেবতা এপোলোর উদ্দেশ্যে। পুরোহিত এসে বলবেন, দেবতা উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন কিনা। দেবতা গ্রহণ করলেই শুধু পিথিয়ার কাছে প্রশ্ন করা যাবে।

উঁচু-নিচু সরু পাহাড়ি পথে চলা খুবই কষ্টের। পথের কষ্ট কমাতে চেরোফোন ব্যবস্থা নিয়েছে। সে আনন্দ করতে করতে যাবে। সম্প্রতি সে জাদু শিখেছে। এক ঘণ্টা পর পর যাত্রা বিরতি। গাড়ি থামিয়ে জাদু দেখায়। জাদুর দর্শক সক্রেটিস, দুজন দাস, দুটি গাধা, দুটি ভেড়া আর একটি ছাগল। এরা সবাই জাদুর মর্ম বুঝেছে। শুধু ভেড়া দুটিই বেরসিক। তারা জাদুর মর্ম বোঝে না। জাদু শুরু করলেই, ভেড়া দুটি ব্যা ব্যা করতে করতে গাড়ি থেকে নেমে যেতে চায়। তাতে ভয় পেয়ে গাধাগুলোও অন্যদিকে হাঁটা ধরে।

চেরোফোনের জাদুতে কেউ মজা পায়নি। কিন্তু জাদু দেখে ভেড়া আর গাধা যা কাণ্ড করছে তাতে অনেক মজা হচ্ছে।

গভীর রাতে তারা ডেলফিতে পৌঁছল। মন্দিরের পাশেই রাত কাটানোর হোটেল আছে, কিন্তু ঘর খালি নেই। অনেক চেষ্টা করে চেরোফোন একটি ব্যবস্থা করল। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মন্দ নয়। শুধু পয়সা একটু বেশি। তাতে কোনো সমস্যা নেই। ভালো কাজে ব্যয় তো একটু হবেই। ক্রিতো যথেষ্ট পয়সা দিয়ে দিয়েছে।

সক্রেটিসের চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। সারাপথ চেরোফোনের জাদু দেখেছে। এখনও শেষ হয়নি। পথে ছিল পথ-জাদু। আর এখন ঘরে হচ্ছে ঘর-জাদু।

সক্রেটিস বলল, এই ঘর-জাদুটা কাল দেখালে হয় না?

চেরোফোন বলল, কাল তো জাদু দেখাতেই হবে। এখানে যে ভিড়, তাতে জাদু ছাড়া কাল প্রশ্ন করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। পিথিয়া মাসে একবার মাত্র প্রশ্নের উত্তর দেয়। সেটি আগামীকাল। আগামীকাল প্রশ্ন করতে না পারলে এক মাস বসে থাকতে হবে। তাই জাদু দিয়েই কাল সুযোগ নিতে হবে।

সক্রেটিস বলল, দরকার নেই। চলো ফিরে যাই।

চেরোফোন বলল, নিজের বিয়ে বাদ দিয়ে ডেলফিতে এসেছি। তুমি যে সেরা জ্ঞানী সেটি প্রমাণ করব। চেরোফোন পারে না, এমন কাজ এই জগতে নেই। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। কাল সত্যিকার জাদু দেখবে। পিথিয়া- জাদু। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সকালে দেখা গেল কথা সত্য। চেরোফোন সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সে এখানের লাইন-ঘাট খুবই ভালো জানে। সক্রেটিস এখানের কিছুই জানে না। সে মাত্র একবার ডেলফিতে এসেছিল। তাও অনেক বছর আগে। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছে। এপোলোর মন্দিরের সামনের দেয়ালে বড় করে উজ্জ্বল কালিতে লেখা 'নিজেকে জানো'[৭৪]। সক্রেটিস অনেকক্ষণ প্রতিটি অক্ষরের দিকে তাকিয়ে রইল। এটি তার সবচেয়ে পছন্দের কথা। ঠিক তার পাশেই লেখা 'প্রয়োজনের অধিক কিছু নিও না'[৭৫]। এটিও তার মনের কথা।

সকাল সকাল ভেড়া আর ছাগল বলি দেওয়া হলো। পুরোহিত জানালেন- সুসংবাদ। দেবতা এপোলো চেরোফোনের বলি গ্রহণ করেছেন। আজই পিথিয়ার কাছে প্রশ্ন করা যাবে। সময় বেশি নেই। এক্ষুনি পবিত্র গোসল দিতে হবে। তারপর শুদ্ধ কাপড়ে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যেতে হবে পিথিয়ার গৃহে। প্রধান মন্দিরের নিচতলার ঘরটি পিথিয়ার। ঘরটি অন্ধকার। কোনো জানালা নেই। শুধু একটি ছোট্ট দরজা। চারদিকে ধোঁয়া উড়ছে। এই ধোঁয়া কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে মাটির নিচ থেকে আসছে। ঘন ধোঁয়ায় সামনের জিনিসও ভালো করে দেখা যায় না। সবকিছু ধোঁয়াশা, সবকিছু অস্পষ্ট। চারদিকে একটি অদ্ভুত গন্ধ। গন্ধটায় পবিত্রতা আছে। আবার একটু ভয়ও আছে। কেমন যেন নেশা নেশা লাগছে। সক্রেটিসের মনে হলো— এখানে কিছুক্ষণ থাকলে নেশা ধরে যাবে। সে চেরোফোনের হাত ধরে আছে।

ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটি বেদির উপরে বসে আছেন ওরাকল- পিথিয়া। বৃদ্ধা মহিলা। এই বৃদ্ধা নারী সব জানেন, সারা পৃথিবীর সব রহস্য তিনি অবগত। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এখানে পিথিয়া থাকবেন। মারা গেলে নতুন পিথিয়া হবে। সেও হবে বৃদ্ধা। আগে অল্প বয়সের কুমারীদের পিথিয়া বানানো হতো। কিন্তু খারাপ লোক সবখানে আছে। মন্দিরেও আছে। দু'একজন কুমারী পিথিয়া নাকি বিপদে পড়েছে। তাই এখন পিথিয়া

বানানো হয় শুধু বুড়িদের। সক্রেটিস অবাক হয়ে দেখতে চাইছেন পিথিয়াকে। কিন্তু ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। সবকিছু ধোঁয়াশা, সবকিছু আবছা, সবকিছু রহস্যে ঘেরা।

পিথিয়া বৃদ্ধা, কিন্তু তাঁর পোশাক বাচ্চা মেয়ের মতো। সোনালি এলোচুল। ঝিরঝির উড়ছে। সক্রেটিসের মনে হচ্ছে, ঘরে ধোঁয়া এখন আরও বেড়ে গেছে। ধোঁয়ায় পিথিয়া একবার হারিয়ে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে হালকা করে একটু ভেসে উঠছেন, আবার হারিয়ে যাচ্ছেন। এই আছেন, এই নেই। এক গভীর রহস্যে তিনি আবদ্ধ। ঘরের ঝাঁঝালো গন্ধটা মাঝে মাঝে তীব্র হচ্ছে। মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। হঠাৎ পিথিয়া দুলছেন, সারা ঘর দুলছে। সক্রেটিস কিছুই বুঝতে পারছে না। তার পায়ের নিচে মেঝে কাঁপছে। বেশিক্ষণ এখানে থাকলে সে নিশ্চিত জ্ঞান হারাবে। চেরোফোন তাকে সাহস দিচ্ছে।

পিথিয়াকে সরাসরি প্রশ্ন করা যায় না। খাদেমদের মাধ্যমে করতে হয়। সাদা পোশাক পরা দুজন খাদেম। তারা ভীষণ ব্যস্ত। তারা একই সাথে প্রশ্ন বাহক, আবার উত্তর বাহক।

একজন খাদেম এসে হুকুম করল, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করেন। জনপ্রতি মাত্র একখান প্রশ্ন। বেশিও না, কমও না।

চেরোফোন বলল, আমরা দুইজন মিলে মাত্র একটি প্রশ্ন করব। তাতে কোনো সমস্যা আছে?

খাদেম বলল, বাড়তি কথা বলেন কেন? এটি বাড়তি কথার জায়গা না। শুধু প্রশ্নটা বলুন। স্পষ্ট কথায় এক লাইনের প্রশ্ন।

চেরোফোন কোনো ভুল করবে না। ঠিকভাবে প্রশ্ন করবে। আসপাশিয়ার কাছে মুখস্থ করে এসেছে। মুখস্থ করে পরীক্ষা দিয়েও এসেছে। সে শান্তভাবে প্রশ্ন করল, পৃথিবীতে সক্রেটিসের থেকে জ্ঞানী মানুষ কি কেউ আছে?

খাদেম বলল, সক্রেটিসটা কে?

চেরোফোন আঙুল দিয়ে সক্রেটিসকে দেখাল। খাদেম সক্রেটিসের দিকে তাকাল। তার চোখে অবিশ্বাস। এই জোয়ান ছেলে দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ? এরা সত্যি এটি জানতে এসেছে? সে নিশ্চিত হতে বলল, ভালো করে প্রশ্নটা আবার বলেন। একটি মাত্র সুযোগ। সুযোগ শেষ হয়ে গেলে, আমার কাছে শত কান্নাকাটি করলেও কোনো কাজ হবে না।

চেরোফোন আবার প্রশ্নটা বলল, পৃথিবীতে সক্রেটিসের থেকে জ্ঞানী মানুষ কি কেউ আছে?

খাদেম আবার অবজ্ঞা নিয়ে সক্রেটিসকে দেখল। শেষে বিরক্ত মুখে পিথিয়ার কাছে গেল। সে পিথিয়ার কানে কানে ফিসফিস করে প্রশ্নটা বলল।

পিথিয়া কোনো উত্তর দিচ্ছে না। শুধু তার চোখ থরথর করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে একটি অদ্ভুত আওয়াজ আসছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ হয়ে যাচ্ছে। আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়।

চেরোফোন একটু এগিয়ে গিয়ে নিজেই পিথিয়াকে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবীতে সক্রেটিসের থেকে জ্ঞানী মানুষ কি কেউ আছে?

কোনো উত্তর নেই। সক্রেটিস হতাশ, ফিরে যাওয়া দরকার। হঠাৎ পিথিয়ার মুখ নড়ে উঠল। তার মাথা দুলছে। হাত-পা কাঁপছে। চুলগুলো পতপত করে উড়ছে। খাদেম ইশারা করল, এখুনি উত্তর আসবে।

চেরোফোনের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় স্কুলের পরীক্ষায় বা যুদ্ধ ক্ষেত্রেও সে এত উত্তেজনা পায়নি। সক্রেটিসও তাকিয়ে আছে পিথিয়ার দিকে।

পিথিয়া অস্ফুট উচ্চারণে বললেন, না, সক্রেটিসের থেকে জ্ঞানী কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই।

চেরোফোন এক লাফে সক্রেটিসকে জড়িয়ে ধরে বলল, বিশ্বাস হলো? চেরোফোন ফালতু কথার লোক নয়।

তার চিৎকারে পিথিয়া ভয় পেয়ে গেল। খাদেম চেঁচিয়ে উঠল, কী করছো উজবুক? ওরাকল অভিশাপ দিবে। তখন কিন্তু জ্ঞান-ফ্যান সব হাওয়ায় উড়ে যাবে।

তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলো। চেরোফোনের চোখে মুখে আনন্দ। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ। যে স্বপ্ন নিয়ে তার এত আয়োজন, সেটি সার্থক হয়েছে। ওরাকল ঘোষণা দিয়েছে যে সক্রেটিসই পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। এখন চেরোফোন মনের সুখে বিয়ে করতে পারবে। সে পাঁচ হাঁড়ি মিষ্টি কিনল। দুই হাঁড়ি মন্দিরে দিল। ডেলফিতে সব নগরের একটি করে ভবন আছে। এথেন্স ভবনে দুই হাঁড়ি মিষ্টি দিল। একটি বড় হাঁড়ি নিয়ে বসল সক্রেটিসের সামনে। আজ সে প্রাণ ভরে মিষ্টি খাবে। সারা রাত খাবে। পেট টুম্বুর হয়ে গেলে তখন জাদু দেখাতে শুরু করবে। আজকের জাদুর নাম আনন্দ-জাদু।

কাল সকালে তারা এথেন্সের দিকে যাত্রা করবে।

পরদিন খুব সকালে বাজনার প্রচণ্ড শব্দে সক্রেটিসের ঘুম ভাঙল। একদল বাজনদার তুমুল বাদ্য বাজাচ্ছে। চেরোফোন বাজনা ভাড়া করেছে। সক্রেটিসের বিজয়-বাদ্য বাজছে। বাদ্য বাজাতে বাজাতে তারা ডেলফি থেকে এথেন্সে যাবে। আজ দিনের মধ্যেই ডেলফি থেকে এথেন্স সবখানে সবাই জানবে যে সক্রেটিসই পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ।

সক্রেটিস কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। সে বলল, কী করছো এসব?

চেরোফোন বলল, কেন? বাজনা পছন্দ হয়নি? এরা খুব সুন্দর বাজায়। ভাড়াও বেশি নয়। একটি গাধার গাড়ি খালি আছে। সেই খালি গাড়িটায় এরা এথেন্সে যাবে। বাজনা শুনে সারা এথেন্সের মানুষ ছুটে আসবে। এসে দেখবে গাড়ির সামনে বড় সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ড দেখেই সবাই ঘটনা জেনে যাবে।

সক্রেটিস লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে গেল। গাড়িতে বিশাল পেপিরাস কাগজে সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা:

‘প্রিয় নগরবাসী, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, গতকাল ডেলফির ওরাকল ঘোষণা করেছেন যে— এই পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হলেন এথেন্সের সক্রেটিস। এই শুভ সংবাদে এথেন্সের সকলকে অভিনন্দন। ‘লেখার নিচে জলরঙে আঁকা সক্রেটিসের একটি ছবি।

সক্রেটিসের মনে হলো, এক্ষুনি চেরোফোনকে ভস্ম করে দেওয়া দরকার। সে যা শুরু করেছে, এবার আর মান-সম্মান কিছুই থাকবে না। সে ভয়ংকর রাগে তীব্র চিৎকার করে ডাক দিল, চেরোফোন!

চেরোফোন রাগ বোঝার মতো অবস্থায় নেই। সে হাসি মুখে বলল, সাইনবোর্ড পছন্দ হয়েছে? সাইনবোর্ডে লেখাটি আমার। আর ছবিটি এঁকেছে ডেলফির বিখ্যাত একজন চিত্রকর।

চেরোফোনের মুখের দিকে তাকিয়ে সক্রেটিস দেখল, বেকুব চেরোফোন বুঝতেও পারছে না, সে কী করছে। আজ চেরোফোনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। তার অনেক দিনের আশা পূরণ হয়েছে। এমন অবস্থায় তাকে বকা দিয়ে মনে কষ্ট দেওয়া যায় না।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে শান্ত করে সক্রেটিস বলল, লেখা ও ছবি ভালো হয়েছে। এবার যাও, নাস্তা করে নাও। আমি আসছি।

চেরোফোন চলে যেতেই সক্রেটিস সাইনবোর্ড খুলে ফেলল। আর বাজনাদারদের টাকা-পয়সা মিটিয়ে বিদায় দিয়ে দিল।

ফেরার সময় চেরোফোন ভিন্ন গাড়িতে উঠেছে। সে সক্রেটিসের সাথে এক গাড়িতে যাবে না। সক্রেটিস তার সব আনন্দ ভেস্তে দিয়েছে। সাইনবোর্ড ফেলে দিয়েছে, বাজনদাররা চলে গেছে। মন খারাপ করে চেরোফোন শুয়ে আছে। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। তার মাথায় জাদু এসে গেছে। মন-খারাপ জাদু।

পাহাড়ের নাম পারনাসোস। শীতকালে পাহাড়টি বরফে ঢেকে যায়। এখন শরৎকাল, বরফ নেই। পাহাড়ের সরু পথ দিয়ে গাধার গাড়ি চলছে। আকাশ ঝকঝক করছে। শরতের আকাশ এত ঝকঝকে হয় না। সাদা মেঘ থাকে। কিন্তু আজকের আকাশ আশ্চর্য রকম পরিষ্কার। পাহাড়ের সবুজ গাছগুলো যেন কথা বলছে। মিষ্টি স্বরে পাখি ডাকছে। চমৎকার পরিবেশ। কিন্তু সেদিকে মন নেই সক্রেটিসের। সে চুপচাপ ভাবছে।

তার মাথায় পিথিয়ার কথাগুলো ঘুরছে। ওরাকল কি সত্যিই বললেন, তার চেয়ে জ্ঞানী কেউ নেই? সে নিজের কানে শুনেছে। তবু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দেবতারা তো মিথ্যে বলেন না। ওরাকলের কথা দেবতার মুখের কথা। সব সময় সত্য। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? সে কি সত্যি পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ?

সক্রেটিসের মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সে ভাবছে আমি তো তেমন কিছুই জানি না। এই পৃথিবীতে এত কিছু আছে, তার কী আমি জানি। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল

হয়েছে। হয়তো ওরাকল গড়বড় করে ফেলেছেন। নিশ্চয়ই আমার থেকে জ্ঞানী লোক আছে। এটি আমায় বের করতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে।

এতদিন বন্ধুরা লোক ধরে আনত পরীক্ষা করতে। এখন আমি নিজেই পরীক্ষা করব।

আমি দার্শনিকদের কাছে যাব। কবি-লেখকদের কাছে যাব। নেতাদের কাছে যাব। তারা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে জ্ঞানী। আমি ওরাকলের এই কথা পরীক্ষা করব। এখন থেকে এটিই হবে আমার গবেষণা। যতদিন না এর উত্তর পাব আমি থামব না।

শুরু হলো সক্রেটিসের নতুন মিশন। মানুষকে পরীক্ষা করার মিশন।

***

সক্রেটিস দিন-রাত ছুটছে। মানুষের পিছে ছুটছে।

ছুটে ছুটে তাদের জ্ঞান পরীক্ষা করছে। ডেলফির ওরাকল বলেছেন, পৃথিবীতে সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী কেউ নেই। কথাটি পরীক্ষা করতে সে রাত দিন মানুষকে প্রশ্ন করছে। যাকে সামনে পায় তাকেই ধরছে। কবি, রাজনীতিক, দার্শনিক, শিল্পী কেউ বাদ যাচ্ছে না। সে খুঁজছে, নিশ্চয়ই আমার চেয়ে জ্ঞানী মানুষ আছে।

আজ সক্রেটিস এসেছে লিকাবিথোস পাহাড়ে। তার সাথে ক্রিতো। এথেন্স শহরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম লিকাবিথোস। সেখানে একজন কবির সাথে দেখা। কবির বয়স অল্প। নাম 'মেলিতাস'[৭৬]। সে সক্রেটিসকে চেনে। সে জানে যে সক্রেটিস মানুষকে নানা প্রশ্ন করে। মেলিতাস তৈরি। আসুক সক্রেটিস। আজ একটি জ্ঞান-যুদ্ধ হবে। মেলিতাস ভালো কবিতা লেখে, ভালো বক্তৃতাও করে। তাকে হারানো অত সহজ নয়।

ঠিক তখনই পশ্চিম আকাশে একটি তারা খসে পড়ল। কবি মেলিতাস দেখল, এই সুযোগ। সে গদগদ কণ্ঠে বলল,

'মিটিমিটি নিভুনিভু-প্রদীপে আকাশ ভরা
দিনের বেলা সূর্য হাসে- রাতে কাঁদে তারা।'

কবিতা বলে কবি ব্যাপক খুশি। তার প্রতিভার ঝলক দেখুক সক্রেটিস।

কবি আবার বলল, দেখেছো, আকাশ হতে তারাটি কেমন কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলো।

সবাই বলল, আহা, তারাটি কাঁদল। আমরা তো তারাটির চোখের পানিও দেখতে পেলাম।

কবি বলল, এই তারা খসে পড়া, এই নিশুতি রাত, এই আধো আলো ঘেরা পাহাড়— সব কেমন মায়া। এই মায়ার টানে আমি এখানে ছুটে আসি।

সবাই বলল, আহা, আমরা মায়াটাকে একেবারে চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কবি মেলিতাস খুব খুশি। সবাই তার বুদ্ধির ঝিলিক টের পাচ্ছে।

সক্রেটিস মৃদু স্বরে বলল, কবি, মায়া কী জিনিস?

মেলিতাস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মায়া?

সে বলল, এটি কেমন প্রশ্ন? মায়া কী— সেটি কেন বলতে হবে?

সক্রেটিস বলল, একটু আগে আপনি কবিতার মতো বললেন, সব কেমন মায়া! আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। তাই মায়া কী জিনিস— সেটি বুঝতে চাচ্ছি।

মেলিতাস রেগে গেল। বলল, কী সুন্দর কবিতা বললাম, সবাই খুশি হলো। আর তুমি আসছো সেই কবিতার অর্থ বুঝতে! ঢং করে বলছো, মায়া কী জিনিস?

সক্রেটিস হতাশ। এই কবি না বুঝেই কবিতা লেখে। তার কবিতা তার থেকে অন্যরা ভালো বোঝে। এ আর যাই হোক, কিছুতেই জ্ঞানী নয়। এমনকি সে জানেও না যে, সে কবিতা বোঝে না। এর সাথে আর কথা বলে লাভ নেই। তাকে পরীক্ষা করা শেষ।

সক্রেটিস হাঁটা শুরু করল।

মেলিতাস বুঝল, আশেপাশের সবাই বুঝে গেছে যে, সে না বুঝেই কবিতা লেখে। তার খুব রাগ হলো সক্রেটিসের উপর। খামোখা নিজে থেকে এসে তাকে অপমান করে গেল।

চিৎকার করে সক্রেটিসকে ডাক দিয়ে মেলিতাস বলল, এই জ্ঞানী, যেও না, দাঁড়াও। এই তারা খসা নিয়ে আমি তো কবিতা লিখলাম। তো এই তারা খসা দেখে তুমি কী বুঝলে?

সক্রেটিস হাসি দিল। বলল, এই তারাটিকে ঝরে পড়তে আমরা দেখেছি। আমাদের কাছে এটি খুবই আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু এই মুহূর্তেই হয়তো আমাদের পেছনে আরও একটি তারা খসে পড়ল, যেটি আমরা দেখিনি। সেই না দেখা খসে পড়া তারাটাও নিশ্চয়ই আশ্চর্য ঘটনা?

মেলিতাস বলল, নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস বলল, কিন্তু সেই না দেখা তারাটার কথা আমরা বলছি না কেন?

মেলিতাস কিছুই বলতে পারছে না।

ক্রিতো উত্তর দিল, কারণ এই তারাটাকে আমরা ঝরে পড়তে দেখেছি, আর অন্যটাকে দেখিনি। যেটি আমরা দেখেছি, আমরা শুধু সেটির কথাই বলছি।

সক্রেটিস বলল, একেবারেই ঠিক। আমাদের কাছে একটি তারা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা সেটিকে খসে পড়তে দেখেছি। অন্যটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ আমরা দেখিনি। তাহলে কোনটি জরুরি— আকাশের তারা, নাকি আমাদের দেখা?

ক্রিতো বলল, আমাদের দেখা।

সক্রেটিস বলল, আমরা কারা?

ক্রিতো বলল, আমরা মানুষ।

সক্রেটিস বলল, তাহলে কী দাঁড়াল?

ক্রিতো বলল, মানুষই সবচেয়ে জরুরি বিষয়। আকাশে তারা খসে পড়ুক, আর চাঁদ ঝরে পড়ুক— মানুষ যদি বুঝতে পারে, তাহলেই সেটি বিষয়। না হলে সেটি কোনো বিষয়ই নয়।

সক্রেটিস বলল, ব্রাভো ক্রিতো।

ক্রিতো লজ্জামাখা একটি হাসি দিল।

সক্রেটিস বলল, তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো মানুষ। মানুষের মন। আমার নিজের মন। নিজেকে জানতে হবে। মনকে জানতে হবে। মন যদি সঠিক পথ খুঁজে পায়, তবেই জীবন সুন্দর হবে। তাই জীবনকে সুন্দর করার জন্য মনকে সঠিক পথ দেখানো দরকার। মন যদি বুঝতে পারে, কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, তবেই জীবন সুন্দর হবে।

মেলিতাসের মাথা ভনভন করছে। এ যে একেবারে নতুন কথা। এমন কথা আগে তাকে কেউ কোনোদিন বলেনি। কবি বুঝতে পারছে মানুষ যদি সক্রেটিসের কথা বুঝতে পারে, তাহলে একদিন জ্ঞানের মূল বিষয় হবে মানুষের মন। কীভাবে আরও সুন্দর জীবন যাপন করা যায়— সেটি নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা করবে মানুষ।

তবে ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন, কবির বর্তমানকে খারাপ করে দিয়েছে সক্রেটিস। কবি বুঝতে পেরেছে, সক্রেটিসকে ডেকে আনা দ্বিতীয় ভুল হয়েছে। আশেপাশের সবাই একেবারে স্পষ্ট দেখেছে যে, কবির চেয়ে সক্রেটিস কত বেশি জ্ঞানী। মেলিতাসের ভীষণ অপমান লাগছে। কিন্তু অপমানের শোধ নেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে ঠিক করল, যেদিন সুযোগ পাবে সেদিনই সক্রেটিসকে উচিত শিক্ষা দেবে।

পাহাড় থেকে নেমে আগোরার দিকে আগালো সক্রেটিস আর ক্রিতো।

আগোরা থেকে বের হচ্ছেন একজন সৌম্যকান্তি প্রৌঢ় মানুষ। তার হাতে একটি পেপিরাসের বই। কানের উপর স্টিলো কলম। দেখলেই বোঝা যায় তিনি অনেক পড়ালেখা করেন। জ্ঞান নিয়েই তার কারবার।

ক্রিতো গিয়ে তাকে বলল, শুভ সন্ধ্যা। আপনাকে নতুন দেখছি। আপনি কী করেন?

লোকটি বললেন, আমি একজন সফিস্ট।

'আমি তো একজন সফিস্টকেই খুঁজছি। আমার ছোট ভাইকে একটু জ্ঞান দিতে হবে। ভাইটা একেবারে গর্দভ হয়ে গেল।'

সফিস্ট লাফ দিয়ে বললেন, গর্ভদদের মানুষ বানানোই তো আমার কাজ। ভাইকে কী বানাতে চান বলুন। নেতা না অভিনেতা? কবি না শিল্পী?

'আপনি সবকিছু বানিয়ে দিতে পারবেন?'

‘পারব মানে? এই হাতে কত জনকে কত কিছু বানালাম। বলুন, ভাইকে কী বানাতে চান?’

‘নেতা।’

‘নিয়ে আসুন ভাইকে। নেতা হতে হলে প্রথমে শিখতে হবে ঝাঁঝাঁলো বক্তৃতা। এমন বক্তৃতা শিখিয়ে দেব যে সংসদ কাঁপিয়ে দেবে। ছয় মাস প্রশিক্ষণ দেব, মূল্য মাত্র ছয় মিনা। যদি আপনার তাড়াহুড়া থাকে, তাহলে তিন মাসেই শেষ করা সম্ভব। সেজন্য দিতে হবে আট মিনা।’

ক্রিতো বলল, দামটা একটু বেশি হয়ে গেল যে!

‘এর চেয়ে কমে আমি জ্ঞান দেই না। জ্ঞানের দাম এত কম নয়। এর চেয়ে কম দামে কোথাও পাবেন না।’

‘দাম দিয়ে কি জ্ঞান ক্রয় করা সম্ভব?’— হঠাৎ সামনে এসে বলল সক্রেটিস।

সফিস্ট সাহেব সক্রেটিসকে চেনেন। তিনি ভয়ে চুপ করে গেলেন। আর কথা বলা যাবে না।

সক্রেটিস আবার বলল, জনাব, বলুন না— জ্ঞান কি বিক্রি করার জিনিস? প্যাকেটে করে দোকানে সাজিয়ে রাখার বস্তু?

এই প্রশ্নের উত্তর সফিস্টের কাছে নেই। তিনি কিছুই বলছেন না। চলে যাওয়ার উপায় খুঁজছেন।

সক্রেটিস বলল, আপনি ক্রিতোর ভাইকে যেটি শেখাবেন, সেটি হলো কথা বলার কৌশল। সেটি জ্ঞান নয়। জ্ঞান বেচা যায় না। জ্ঞানের কোনো দোকান নেই। পয়সা দিয়ে কেউ জ্ঞান কিনতে পারে না।

সফিস্ট সাহেব দৌড় দিয়ে অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেলেন। তিনি ভাবছেন, এই ছেলে তো সাংঘাতিক। এর কথাবার্তা মানুষ শুনলে জ্ঞান নিয়ে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ছেলেকে শায়েস্তা করার একটি উপায় খুঁজতে হবে। শাস্তি দিতে হবে। কঠিন শাস্তি দিয়ে ওর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে।

সক্রেটিস বুঝল, যারা সফিস্ট, যারা নিজেদের জ্ঞানী বলে, তারা আসলে জ্ঞান কী, সেটিই জানে না।

ক্রিতো বাড়ি যাবে। তার বাগানের জলপাই কিনতে বেপারী এসেছে। সে চলে গেল। সক্রেটিস একাই আগোরায় ঢুকল। কাঁচা বাজারের পাশে একটি খাওয়ার দোকান হয়েছে। সেখানে কয়েকজন যুবক গল্প করছে। এরা এথেন্সের তরুণ নেতা। মাত্র রাজনীতি শুরু করেছে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এদের হাতে। এদেরকে সক্রেটিস অল্প-স্বল্প চেনে। শুধু একজনের নাম জানে। তার নাম এনিতাস। সক্রেটিস তাদের সামনে গেল। সবাইকে একসাথে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবীর কোন জায়গা আপনাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়?

এই তরুণরা সক্রেটিসকে চেনে। তারা জানে এই লোকটির পাগলামি আছে। সে মানুষকে জ্বালায় কিন্তু মজার মজার কথা বলে। তরুণরা নেশা করে মজা করছিল। নেশার ঝোঁকে উত্তর করতে শুরু করল। একজন বলল, আমি প্রতি গ্রীষ্মের শুরুতে ডেলফিতে যাই। পাহাড়ের উপর ডেলফির এপোলো মন্দির। একেবারে চোখ জুড়ানো। কিছু জানার দরকার হলেই আমি ডেলফিতে ছুটে যাই। ডেলফিই আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান।

এনিতাস বলল, যেখানে অলিম্পিক খেলা হয়, সেই অলিম্পিয়া শহর আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি ভালোবাসি বীরদের লড়াই। সভ্য মানুষের লড়াই দেখতে অলিম্পিকের চেয়ে ভালো অন্য কিছুই হতে পারে না। আমি অলিম্পিয়া শহরকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

আরেকজন বলল, আমি গত বছর স্পার্টায় গিয়েছি। স্পার্টার লোকজন সব ভয়ংকর যোদ্ধা, ছোটবেলা থেকেই ওরা সবাই যুদ্ধ শিখে। বড় বড় চুল রাখে। কী সুন্দর দেখতে স্পার্টানরা! এক-একজন একেবারে হোমারের একিলিস। তবে পুরুষরা যেমন তেমন, স্পার্টার মেয়েদের দিকে তাকালে চোখ আর সরে না। যেন ট্রয় যুদ্ধের সেই হেলেন। বিশ্বাস করতে পারবে না— আমি এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পাই। আহা, আমার শুধু স্পার্টায় যেতে ইচ্ছা করে।

এনিতাস সক্রেটিসকে জিজ্ঞেস করল, এবার তোমারটা শুনি। পৃথিবীতে তোমার প্রিয় জায়গার নাম কী?

অতি মৃদু স্বরে সক্রেটিস উত্তর করল, এথেন্স।

সব যুবক একসাথে চমকে উঠল। আরে আমাদের মাতৃভূমি এথেন্সের কথাই তো আমরা ভুলে গেছি। দূরের কথা মনে করতে গিয়ে আমাদের এই সুন্দর জন্মভূমির কথা মনেই নেই।

সক্রেটিস মৃদু স্বরে বলছে, এথেন্সই আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। এই নগরীটিকে আমি ভালোবাসি। একেবারে প্রেমিকার মতো ভালোবাসি। এই নগর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আমি থাকতে পারি না।

এনিতাস বলল, ভালোই তো চাল দিলে। আমরা সবাই নানান জায়গার নাম বললাম, আর তুমি বললে এথেন্স। এটি ঠিক করেই ভাব নিতে আসছ— তাই না?

সক্রেটিস বলল, যেকোনো রাজনীতিকের সবচেয়ে প্রিয় হবে তার নিজের শহর। নিজের শহরকে ভালো না বাসলে রাজনীতি হয় না।

এনিতাস চেঁচিয়ে উঠল, তুমি কি জানো আমরা এথেন্সকে ভালোবাসি না? খালি কথার প্যাঁচ দিয়ে সত্যকে মিথ্যা বানাও, আর মিথ্যাকে সত্য বানাও। এখান থেকে যাও, ভাগো।

সক্রেটিস সেখান থেকে চলে গেল। বুঝতে পারল—এরা রাজনীতি বোঝে না। রাজনীতির প্রথম শিক্ষা হলো দেশপ্রেম। সেটিই এদের নেই। এদের কোনো রাজনীতি জ্ঞানই নেই। শুধু তাই নয়— জ্ঞান যে নেই, সেটিও এরা জানে না।

সক্রেটিস চলে যেতেই এনিতাস বলল, সক্রেটিসের সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ওকে একটি উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

অনেক দিন ধরে সক্রেটিস এই পরীক্ষা করল। ওরাকলের কথার পরীক্ষা। তারপর সিদ্ধান্তে এলো যে ওরাকল সঠিক বলেছেন।

'আমি জ্ঞানী, কারণ আমি জানি যে— আমি আসলে কিছুই জানি না। আর যারা নিজেকে জ্ঞানী বলে, তারা এটিও জানে না যে, তারা তেমন কিছুই জানে না।

আমার অজ্ঞানতার খবর আমি জানি। সেজন্যই আমি জ্ঞানী।'

***

৭৪. মন্দিরে গ্রিক ভাষায় লেখা ছিল 'Gnothi Seauton'এর মানে 'Know Yourself.

৭৫. 'Meden Agan'এর মানে 'Nothing in Excess'.

৭৬. মেলিতাস (Meletus) কবি তিনি সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অফিসিয়ালি মামলা করেন। তাকে প্ররোচিত করে মামলাটি করান এনিতাস নামের একজন রাজনীতিক।

২৬

'Contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty.'
—Socrates

হেরোডোটাস এথেন্স থেকে চলে যাচ্ছেন।

তিনি থুরিল নগরে বাড়ি করেছেন। সেখানেই স্থায়ী হবেন। সেখানে বসে বই লিখবেন। তার বিদায় উপলক্ষে পেরিক্লিস ডিনারের আয়োজন করেছেন। ডিনার শেষ হয়ে

গেছে। অতিথিরা চলে গেছেন। কিন্তু সফোক্লিস উঠছেন না। তার জন্য হেরোডোটাসও উঠতে পারছেন না।

সফোক্লিস বসে বসে পান করছেন। এক চুমুকে এক পাত্র সুরা শেষ করছেন। শেষ হওয়ামাত্রই মাটির পাত্রটা ছুড়ে ফেলে আরেক পাত্র ধরছেন। ঢালতে একটু দেরি হলেই দাসদের ধমক দিচ্ছেন। পেরিক্লিসের বাড়িতে এমন কেউ করে না। দাসেরা সবাই ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু সফোক্লিসের কোনো হেলদোল নেই। মনে হচ্ছে দাসদের ভয় দেখিয়ে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। নিষ্ঠুর আনন্দ। তার চোখ লাল টকটকে। মাথা ঝিমুচ্ছে। পা টলছে। তবু থামছেন না।

পেরিক্লিস একবার বলেছিলেন, নেশায় আকাশে উঠে যাচ্ছ। আর একটু হলে আকাশ থেকে আর নামতে পারবে না।

সফোক্লিস মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছেন, কী বললে, আমি বেশি খাচ্ছি? তোমার জিনিস শেষ করে দিচ্ছি? কয় গেলাস বেশি খাচ্ছি হিসাব রাখো। তোমাকে পই পই করে পয়সা দিয়ে যাব। বাড়িতে দাওয়াত করে শেষে খোটা দিচ্ছ!

পেরিক্লিস লজ্জা পেয়ে চুপ হয়ে গেছেন। আসপাশিয়া ঘরের ভেতরে সরে পড়েছে। হেরোডোটাস এখনও সফোক্লিসের বাড়িতে থাকেন, তার যাওয়ার উপায় নেই। অপেক্ষা করতেই হবে।

সফোক্লিস পান করছেন আর রক্ত চোখে হেরোডোটাসের দিকে তাকাচ্ছেন।

হেরোডোটাস ভয় পেয়ে বলল, জনাব, ভুল-চুক কিছু করেছি?

সফোক্লিস বললেন, তুমি বই লিখবে? ম্যারাথনের কাহিনি লিখবে? পারস্যকে হারানো নিয়ে লিখবে?

হেরোডোটাস আরও ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি নিষেধ করলে লিখব না। তবু আপনি রাগ করবেন না।

হাতের পাত্রটা এক চুমুকে খালি করে চেঁচিয়ে উঠলেন সফোক্লিস, শোন হেরোডোটাস, তুমিই প্রথম নও। ম্যারাথন আর পারস্য যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে আমরা অনেক কিছু লিখেছি।

হেরোডোটাস আগ্রহ নিয়ে তাকাল।

সফোক্লিস বললেন, পারস্য যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে খুব চমৎকার একটি নাটক লেখেন নাট্যকার এস্কিলাস, নাম দেন 'পারস্য'[৭৭]। এটিই আমাদের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। এটি লেখার জন্যই আমরা এস্কিলাসকে বলি গ্রিক ট্র্যাজেডির জনক।

হেরোডোটাসের চোখ চকচক করে উঠল। সে নতুন কিছু শুনছে।

সফোক্লিস জড়ানো গলায় বলছেন, এস্কিলাস ছিলেন যোদ্ধা। ম্যারাথন ও সালামিনাসের যুদ্ধে পারস্যের বিরুদ্ধে সে লড়াই করেছেন। তার ভাই মারা যান ম্যারাথনের ময়দানে। সেজন্য এস্কিলাসের মনে এই যুদ্ধ আনন্দের স্মৃতি আবার বেদনারও স্মৃতি। তার 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতো' এই কাহিনি। তাই পারস্য বাহিনী যখন গ্রিস থেকে পালিয়ে গেল,

তখনই এস্কিলাস লিখে ফেললেন ট্র্যাজেডি নাটক 'পারস্য'। সেই নাটক অভিনয় করার ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের পেরিক্লিস। তখন ও এক্কেবারে তরুণ। নেতা হওয়ার বয়সও হয়নি। সে নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে নাটকটা মঞ্চে আনলো।

পেরিক্লিসের দিকে মুখ করে সফোক্লিস জড়ানো গলায় বললেন, পেরিক্লিস, তুমি সেই ঘটনা বলতে পার।

পেরিক্লিস মুখ খুললেন না। হাসি দিয়ে চুপ করে রইলেন। নিজের সুখ্যাতি অন্যের মুখে শুনতেই বেশি ভালো লাগে।

বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ইউরোপে গরমের দিনে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু আজ শুরু হয়েছে। বাইরে রিমঝিম শব্দ, ভেতরে বীণার টুংটাং। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দে বাতাস বইছে। রহস্যময় পরিবেশ। নেশা নেশা লাগছে। সফোক্লিস মনে হয় জানতেন, একটু পরে বৃষ্টি হবে। তাই তিনি ইচ্ছে করেই অমন নেশা করেছিলেন।

আসপাশিয়াও এসে বসেছে পেরিক্লিসের পাশে। বৃষ্টি আরও বেড়েছে। তুমুল বৃষ্টিমাখা রাতে আবছা আলোয় তিনজন যুবক-যুবতির কাছে এথেন্সের ট্র্যাজেডি শুরুর কথা বলছেন সফোক্লিস। তিনি নিজে নাট্যকার। গল্প বলতে একেবারে নাটকের পরিবেশ বানিয়ে নিয়েছেন। ফিসফিস করে বলছেন—

তখন গ্রিস আর পারস্যের যুদ্ধ শেষ হয়েছে কয়েক বছর হলো। আজকের মতো এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল এস্কিলাসের। তিনি স্বপ্ন দেখছেন, যুদ্ধের স্বপ্ন। তিনি ছটফট করছেন। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি ম্যারাথন যুদ্ধের কথা মনে করতে পারছেন না। বারবার মনে করতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ধরফর করে বিছানা ছেড়ে উঠে চোখে পানি দিলেন, ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল। কিন্তু এই স্বপ্ন তাকে চিন্তায় ফেলল। তার মনে হলো— মানুষ সত্যিই ম্যারাথন যুদ্ধের কথা ভুলে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের অমন বিস্ময়কর দিনের কথা কেউ মনে রাখছে না। তিনি তক্ষুনি পেপিরাস নিলেন। ঘচাঘচ লিখতে আরম্ভ করলেন। সারা রাত লিখলেন। ভোর হতেই এক দৌড়ে চলে এলেন তরুণ পেরিক্লিসের কাছে। পেরিক্লিসকে ভীষণ পছন্দ করতেন এস্কিলাস। তরুণ পেরিক্লিসও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'আপনি লিখে ফেলুন। ঝাক্কাস করে লিখুন। সামনের ডিওনিসাসের উৎসবে অভিনয় হবে। যত টাকা লাগে, আমি দেব।' এস্কিলাস বললেন, 'এথেন্সের নাটক তো সব দেব-দেবীর কাহিনি। মানুষের কাহিনি নিয়ে নাটক করলে লোকে সেটি মানবে?' পেরিক্লিস বলল, 'অনেক হয়েছে দেব-দেবী আর পুরনো রাজাদের কাহিনি। এবার নিজেদের কথা লিখুন। সেটিই হবে আমাদের নাটক।' সেই রাতে ঘুমালেন না এস্কিলাস। সারা রাত জেগে লিখলেন। আবেগে উত্তেজনায় কয়েক দিনে লিখে ফেললেন নতুন নাটক, নাম 'পারস্য'। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের ঘটনা নিয়ে সেই হলো প্রথম নাটক। এটিই প্রথম গ্রিক ট্র্যাজেডি।

হেরোডোটাস মুগ্ধ হয়ে শুনছে। সে এথেন্সে থিয়েটার শুরুর ঘটনা জানে, কিন্তু প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি কীভাবে লেখা হয়, সেটি জানে না।

হেরোডোটাস বলল, বাহ, এই ঘটনা তো জানতাম না। আমি তো ভাবতাম আমি এথেন্সের সবকিছু জানি। এখন তো দেখছি, অনেক কিছুই জানি না। তো বুঝলাম, গ্রিস-পারস্য যুদ্ধ নিয়ে এস্কিলাস লেখেন প্রথম সার্থক গ্রিক ট্র্যাজেডি 'পারস্য'! তো কী আছে ঐ নাটকে?

সফোক্লিস বললেন, নাটকটি এস্কিলাস একেবারে নতুন ঢঙে সাজিয়েছিলেন। শুরু করেছেন অন্যরকম করে। কাহিনি এরকম:

পারস্য দ্বিতীয়বার এথেন্স আক্রমণে গেছে। রাজা জেক্সি দেশের সব ছেলেকে নিয়ে যুদ্ধে গেছে। দেশ খালি। তার মা পারস্যের রানি আতোসা ছেলের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন, মায়ের মন হুঁ হুঁ করছে। তিনি সভাসদদের ডেকে আলাপ করছেন। এখানে রানির মুখে দিলেন বিখ্যাত সংলাপ–

'ভোগ করার মানুষ না থাকলে দুনিয়া ভরা সম্পদও কোনো কাজে আসে না— তখন সম্পদ আর আবর্জনায় কোনো তফাৎ নেই। আবার পর্যাপ্ত ধন- সম্পদ না থাকলে, শুধু যোগ্যতা দিয়ে ভাগ্যদেবী সহায় হতে পারেন না।'

সংলাপটি খুব গভীর, মনকে নাড়া দেয়। সেদিন থিয়েটারের দর্শকদের মনকেও নাড়া দিয়েছিল। তারা চিৎকার করে বলছিল— আহা, কী শোনালে! মন যে জুড়িয়ে গেল।

এরপর নাটকে একটি স্বপ্নের দৃশ্য। পৃথিবীতে কোনো নাটকে স্বপ্ন-দৃশ্য এটিই প্রথম। রানি সভাসদদের বললেন, আমি চারদিকে কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। রাতের পর রাত স্বপ্ন দেখছি, আজেবাজে সব কুস্বপ্ন। কাল রাতে যেটি দেখলাম, সেটি খুবই ভয়ংকর। দেখলাম দুটি খুব সুন্দর মেয়ে ঝগড়া করছে, একটি মেয়ে পারস্যের, অন্যটি গ্রিক। তাদের ঝগড়া থামাতে আমার ছেলে তাদেরকে তার রথ চালাতে বলল। একটি মেয়ে কথা শুনল, অন্য মেয়েটি শুনল না। হঠাৎ দ্বিতীয় মেয়েটি খুব জোরে রথের রশি নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল, এত জোরে যে, রথের দড়ি ছিঁড়ে গেল, আমার ছেলে রথ উল্টে পড়ে গেল, জামা-টামা ছিঁড়ে একাকার। রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, তার বাবা বড় রাজা তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন। এরকম স্বপ্ন দেখে আমার মনে খালি কু-ডাক ডাকছে। কেন এমন হচ্ছে? তোমরা এর কারণ বের করো। এমন স্বপ্নদৃশ্যের পরে নাটকে এথেন্সের গণতন্ত্রের কথা নিয়ে এলেন নাট্যকার। রানি আর কোরাসের দল গানের ছন্দে ছন্দে বলছে এথেন্সের গণতন্ত্র কেমন চমৎকার:

রানি বললেন, আচ্ছা— এথেন্স কোথায়?
'ঐ পশ্চিমে দেখা যায়,
যেখানে আকাশের সূর্য সাগরের জলে দোল খায়।'

‘আমার ছেলে কি এথেন্স কব্জা করতে চায়?’
‘জি, হ্যাঁ, রানিমাতা, এথেন্সকে পেলেই পুরো গ্রিস তার হয়।’
‘এথেন্সের কি অনেক সৈন্য?’
‘না, সেনা সংখ্যা খুবই নগণ্য।’
‘ওরা কি তীর চালায়?’
‘তীর নয়-
এক হাতে বর্শা, অন্য হাতে ঢাল নেয়।’
‘তাহলে এত ভালো যুদ্ধ করে কেমনে?
কে চালায় সেনা- রাজা কে?’
‘ওদের নেই কোনো রাজা,
কেউ নয় কারও প্রজা।’
‘মানেটা কী হলো তাহলে!
দেশটা কীভাবে চলে?’
‘ওরা সবাই রাজা, নিজের কথা নিজেই বলে।’
‘আর একটু বলবে নাকি খুলে?’
‘ওরা-
নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়
লড়াই করে নগর বাঁচায়
ওদের নেই ভাড়াটে সৈন্য
নিজের যুদ্ধে নিজেই অনন্য
কেউ নয় রাজা, নয়তো প্রজা, সবাই নাগরিক
এক আইন দিয়ে চলছে নগর, শান্তি চারিদিক।’[৭৮]

এই পর্যন্ত বলে থামলেন সফোক্লিস।

আর এক পাত্র সুরা নিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে বললেন, লক্ষ করো হেরোডোটাস, এখানে এস্কিলাস কেমন চমৎকারভাবে এথেন্সের গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। এখানে কেউ কারও প্রজা নয়, সবাই সমান। এই নাটকের আগে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারেনি— কোন জাদুবলে এত অল্প সেনা নিয়েও এথেন্স হারিয়ে দিল বিশাল পারস্যকে। এস্কিলাস বুঝেছিলেন, কারণ হলো গণতন্ত্র। এথেন্সের মানুষ নিজে ভোট দিয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে লড়েছে, তারা পারস্যের বাহিনীর মতো টাকায় ভাড়াখাটা সৈনিক নয়। সেজন্য জিতেছে। এই কথাটা এস্কিলাস ভরা থিয়েটারে নাটকের সংলাপে বললেন। মানুষ বুঝতে পারল গণতন্ত্রের শক্তি কী! হেরোডোটাস, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, মানুষের সে কী মুগ্ধ প্রতিক্রিয়া! এই নাটক থেকেই এথেন্সের লোকের মনে ঢুকে গেছে যে, আমাদের গণতন্ত্র একটি মহান জিনিস, আমরা যে করেই হোক গণতন্ত্র ধরে রাখব।

হেরোডোটাস বলল, আমি আমার বক্তৃতায় সেটিই বলেছি। আমার বইতেও একথাই লিখব।

সফোক্লিস বললেন, আবার 'পারস্য' নাটকের কাহিনিতে ফিরে যাই। রানি এথেন্সের কথা শুনছিলেন। এমন সময় দূত এসে খবর দিল— 'পারস্য হেরে গেছে, সব জাহাজ ডুবে গেছে, পারস্যের হাজার হাজার সেনা সাগরে ভেসে গেছে। রাজা ড্রেক্সি কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে'। সবাই বলছে, 'কেন এমন হলো? কেন আমরা হারলাম? আমাদের এমন বিশাল বাহিনী কীভাবে হারল?' রাজসভার লোকজন ঠিক করল, এর ব্যাখ্যা দিতে আমরা পরলোকগত বড় রাজা দারিয়ুসের আত্মাকে ডাকব। তার আত্মাই পরাজয়ের কারণ বলতে পারবে। মন্ত্রের জোরে বড় রাজা দারিয়ুসের আত্মা এলো। আত্মা বললেন 'হারের কারণ আমার ছেলের অহংকার। কোথায় থামতে হবে, সেটি ও জানে না। সেজন্যেই হেরে গেছে। পরাজয়ের কারণ রাজার হুব্রিস'।

হেরোডোটাস বলল, হুব্রিস[৭৯] বা সীমাহীন অহংকার! সবাই বলে, ট্র্যাজেডির মূল বিষয় হলো হুব্রিস, ট্র্যাজেডিতে নায়কের পতনের কারণ হুব্রিস। এখন যত ট্র্যাজেডি লেখা হচ্ছে, সবগুলোর মূল থিম হুব্রিস। এটি কি এস্কিলাসই ঠিক করে দেন?

সফোক্লিস বললেন, মোটামুটি তাই। তার আগে হোমারের লেখায়ও কিছু কিছু হুব্রিস ধরনের কাহিনি পাওয়া যায়। তবে এই 'পারস্য' নাটকটিকেই আমরা বলি প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। এই নাটকের সংলাপে নাট্যকার সরাসরি বলে দিলেন, পারস্যের পতনের কারণ হুব্রিস। সেই থেকে আমরা সবাই নায়কের হুব্রিসকে কেন্দ্র করে নাটক লিখি। দর্শকরাও খুবই পছন্দ করে। হুব্রিস ব্যাপারটা বোঝাতে এস্কিলাস চমৎকার কথা বলেছেন। হুব্রিস নিয়ে তার চেয়ে ভালো করে অন্য কেউ বলতে পারেননি। অপূর্ব শিল্পমাখা কথায় তিনি বললেন:

'একদিন যাকে মরতে হবে, সে যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। মানুষের সীমাহীন অহংকারের ফুল একদিন আত্মপ্রবঞ্চনার ফল হয়ে ওঠে, আর সেই ফল কুড়াতে গেলে কান্না ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না।'

হেরোডোটাস বলল, চমৎকার।

সফোক্লিস বললেন, 'পারস্য' নাটকে হুব্রিসের উদাহরণ দিতে পারস্যের রাজা দারিয়ুসের আত্মা বললেন, আমার ছেলে হেলেসপন্ট[৮০] পার হয়েছে, বসফোরাস প্রণালির উপর সেতু তৈরি করেছে, পানির দেবতা পোসাইডন রাগ করেছে, তাই সাগরের যুদ্ধে আমাদের সব জাহাজ ডুবে গেছে।

নাটকে রাজা দারিউসের আত্মা তার ছেলেকে বলছেন, জীবনে আর যাই করো— কোনদিন এথেন্সের দিকে তাকিও না। কথাটা মনে রেখো, যদি কোনোদিন কোনো দেবতা এসেও বলে, তবু গ্রিস দখল করতে যেও না। পৃথিবী দেবী ওদের পক্ষে

হেরোডোটাস বলল, এই সংলাপ শুনে এথেন্সের দর্শকদের হাততালিতে ফেটে পড়ার কথা। দেশপ্রেম জেগে ওঠার কথা। এথেন্স নিয়ে গর্বে বুক ফুলে ওঠার কথা।

সফোক্লিস বললেন, সেটিই হয়েছে। তো নাটকের শেষটা শোন, সেখানে আরও বেশি দেশপ্রেমের কথা। নাটকের শেষ দৃশ্যে পারস্যের পরাজিত রাজা ড্রেক্সি দেশে ফিরে এলো ছেঁড়া পোশাকে। সে কাঁদছে। বিলাপ করে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে বলছে 'কষ্ট, ভীষণ কষ্ট! আমার হাতের মুঠোর জয় ছিনিয়ে নিয়েছে গ্রিকরা। আমি যতবার এথেন্সের দিকে তাকাই, ততবারই আমার কান্না পায়। বেদনা, আমার চারিদিকে বেদনা! বেদনায় বুক ফেটে যায়।'

সফোক্লিস বললেন, ভেবে দেখো হেরোডোটাস, মঞ্চে পারস্যের রাজা শোকে মাতম করছে, আর সকল দর্শক হাসছে, তারা চিৎকার করে বলছে, কাঁদো, আকাশ ফাটিয়ে কাঁদো। আর কোনোদিন এথেন্স আক্রমণে এসো না। ট্র্যাজেডির সমাপ্তিতে দর্শকরা হাসে, এমন জিনিস খুব কম হয়। এই নাটকের কাহিনির স্থান গ্রিস নয়, পারস্যের রাজদরবার। আমরা খুব পছন্দ করলাম নাটকটি। একটি সত্যিকারের শিল্পকর্ম আমরা পেলাম। আমরা তরুণরা সবাই এস্কিলাসের মতো লিখতে চাইলাম। তিনি হয়ে গেলেন ট্র্যাজেডির গুরু। আমাদের নাটকের কাহিনিতে নতুনত্ব এলো। দেব-দেবীর জায়গায় মানুষ নিজে হয়ে গেল মূল চরিত্র। সেই মানুষ গভীর দুঃখ পাচ্ছে, লোভের কারণে তার পতন হচ্ছে।

এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি পেরিক্লিস। হঠাৎ বললেন, মজার কথা হলো— এই নাটকের কয়েক বছর পরেই এথেন্সের থিয়েটারে এলো আরেক মহা প্রতিভাধর নাট্যকার। সে হারিয়ে দিল এস্কিলাসকে। বলো তো সে কে?

আসপাশিয়া বলল, তিনি আমাদের সামনে বসে আছেন, এথেন্সের মধুকর সফোক্লিস।

সফোক্লিস লজ্জা পেলেন। তিনি বললেন, তো সেই শুরু, এরপর একের পর এক সুন্দর সুন্দর ট্র্যাজেডি লিখতে শুরু করলাম আমরা। আমি লেখা শুরু করলাম। আমি এস্কিলাসকে হারিয়ে প্রথম হয়ে গেলাম। আমি তাকে হারালেও তিনিই আমাদের নাট্যগুরু।

রাত এগিয়ে চলছে। বাইরে বৃষ্টি আরও বেড়েছে। সবার চোখ ঢুলুঢুলু। ঘুমে আর নেশায় টলমল।

হেরোডোটাস জড়ানো গলায় বলল, তা এস্কিলাস এখন কোথায়? তিনি এলেন না?

সফোক্লিস বললেন, তার আসা সম্ভব নয়। তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। হেরোডোটাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, আমার কপাল মন্দ। এথেন্সে এলাম আর এমন একজন মানুষকে দেখতে পেলাম না।

বাইরে বৃষ্টি আরও বেড়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠছে পুব আকাশে। হঠাৎ মৃদু স্বরে আসপাশিয়া বলল, এস্কিলাসের অনেক কথাই বললেন। কিন্তু আসল কথাটা বাদ দিলেন।

সফোক্লিস রক্ত চোখে তাকালেন আসপাশিয়ার দিকে।

আসপাশিয়া বলল, এস্কিলাসকে যে মেরে ফেলতে চেয়েছিল এথেন্সের মানুষ, সেই কথা।

সফোক্লিসের মুখ থমথমে। তিনি দুঃখের কথা বলতে চান না।

আসপাশিয়া বলল, এথেন্সের মানুষের অমানবিক দিকটাও হেরোডোটাসকে জানতে হবে।

হেরোডোটাস বলল, হ্যাঁ, সবটাই তো জানতে চাই। বই লিখতে হলে আগা-গোড়া জেনেই বসতে হবে। বলুন, আমার জানা দরকার।

সফোক্লিস বললেন, ঠিক আছে। শোনো তাহলে:

লেখার জন্য মরতে বসেছিলেন এস্কিলাস। এথেন্সের মানুষ তাকে মঞ্চেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমাদের গণতন্ত্র অনেক ভালো, অনেক মহান কিন্তু এক জায়গায় বড় খারাপ। বড় অসহিষ্ণু। দেবতাদের নিয়ে কিছু বললেই ভয়ংকর রকম ক্ষেপে যায়। তাতে ধর্ম নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে কোনো মানবতা নেই, ভীষণ অমানবিক। তো ঘটনা হলো— এস্কিলাস একটি নাটক লেখেন, দেবী দিমিত্রার উদ্দেশ্যে এথেন্সের মেয়েদের গোপন একটি আচার নিয়ে কাহিনি। মেয়েদের এই অনুষ্ঠান নিয়ে এথেন্সে কথা বলা নিষেধ। তাতে দেবতাদের অপমান হয়। কিন্তু দুঃসাহস করে সেই গোপন অনুষ্ঠান নিয়েই নাটক লিখে ফেললেন এস্কিলাস। মঞ্চে অভিনয় করছিলেন তিনি। দেবীর কাছে মেয়েরা যেসব হাস্যকর আচার করে, মেয়ে সেজে মজা করে সেসব দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ ক্ষেপে উঠল পুরোহিতরা। বলল, 'নাট্যকার অধর্ম করছেন। পবিত্র গোপন অনুষ্ঠান নিয়ে মশকরা করছেন। ধর্ ওরে।' দর্শকরা হুংকার দিয়ে উঠল। নাট্যকারকে পাথর মারতে শুরু করল। ধব্ ধর্ বলে উঠে এলো মঞ্চে। সেখানেই তাকে খুন করে ফেলবে। দৌড়ে গিয়ে দেবীর মূর্তির পেছনে আশ্রয় নিলেন নাট্যকার। পেরিক্লিস অনেক কষ্টে তাকে রক্ষা করেন। বলেন, 'আমরা তার বিচার করব। এক্ষুনি বন্দি করা হোক নাট্যকারকে।' বিচার হলো এস্কিলাসের। কঠিন শাস্তি হওয়ার কথা। কিন্তু আদালতে তিনি আর তার ভাই অনেক কেঁদে কেঁদে এথেন্সের জন্য তাদের পরিবারের ত্যাগের কথা বললেন। তার পরিবার ম্যারাথন আর সালামিসের যুদ্ধে এথেন্সের জন্য লড়েছে। তার এক ভাই শহিদ হয়েছে। তারা এথেন্সকে সেবা করেছেন আজীবন। আদালতে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পান নাট্যকার।

হেরোডোটাসের মন খারাপ হয়ে গেল। বলল, তিনি ট্র্যাজেডির লেখক। তার নিজের জীবনও তো বিরাট ট্র্যাজেডি।

আসপাশিয়া বলল, এর চেয়েও বড় ট্র্যাজেডি তার মৃত্যু।

সফোক্লিস বললেন, হুঁম, শোনো তাহলে। ডেলফির ওরাকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন— নাট্যকারের মৃত্যু হবে উপর থেকে কিছু একটা মাথার উপর পড়ে। সেজন্য তিনি ঘরে থাকা বাদ দিলেন। যদি ঘরের ছাদ মাথায় ভেঙে পড়ে, এই ভয়ে সব সময় খোলা আকাশের নিচে থাকতেন। রাতে ঘুমাতেনও খোলা আকাশের নিচে। তো একদিন একটি

ঈগল পাখি মুখে কচ্ছপের খোল নিয়ে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পাখির মুখ থেকে সেই খোল সরাসরি পড়ল নাট্যকারের মাথায়। সাথে সাথেই মৃত্যু হলো মহান কবি ও নাট্যকারের। ভয়ংকর ট্র্যাজিডি দিয়েই জীবন শেষ হয় ট্র্যাজেডির জনকের।

এমন মহান লেখকের এরকম করুণ মৃত্যুতে সবার মুখ বেদনায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে। হেরোডোটাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। পেরিক্লিসের চোখ ছলছল করছে। তার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন এস্কিলাস।

তখনও আকাশ কাঁদছে। মেঘের রাজ্য থেকে ধীর লয়ে নামছে কান্নার ঝুমঝুম শব্দ। আসপাশিয়া আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টিস্নাত রাতের নিকষ কালো মেঘে ঢাকা আকাশে তারা হয়ে জ্বলে ওঠেননি এস্কিলাস। শুধু তার জন্য কষ্টের পদাবলি হয়ে আকাশ থেকে ঝরঝর করে নামছে বিন্দু বিন্দু দুঃখ।

***

৭৭. প্রথম সার্থক গ্রিক ট্রাজেডির নাম 'পারস্য' (The Persians), খ্রি. পূ. ৪৭২ অব্দে গ্রিক ট্রাজেডির জনক এস্কিলাস এটি রচনা করেন। স্পন্সর করেন পেরিক্লিস।

৭৮. 'The Persians' নাটকটিকে ইংরেজিতে Janet Lembke & C. J. Herington যে অনুবাদ করেন, আমি সেটি থেকে অনুবাদ করেছি। এই অধ্যায়ে নাটকটির যে হুবহু সংলাপ আছে, সবগুলোই এই অনুবাদ থেকে নেওয়া।

৭৯. হুব্রিস (Hubris) মানে মানুষের লাগামহীন অহংকার, যা প্রথমে অন্যের জীবনে দুঃখ আনে, কিন্তু শেষে তার নিজের জীবনে আনে ভয়ংকর পরিণতি। গ্রিক ট্র্যাজেডির মূল থিম হুব্রিস।

৮০. হেলেসপন্ট (Hellespont): দার্দানেলিস প্রণালি (Dardanelles)-এর প্রাচীন গ্রিক নাম হেলেসপন্ট। এই প্রণালি তুরস্কের এশিয়া অংশ আর ইউরোপ অংশকে আলাদা করেছে, আর যুক্ত করেছে এজিয়ান সাগর ও মর্মর সাগরকে। হেরোডোটাসের 'ইতিহাস' গ্রন্থ অনুসারে, এই প্রণালি পার হয়েই পারস্য বাহিনী গ্রিস আক্রমণ করে।

২৭

'Many are the wonders of the world,
but none is more wonderful than man.'
— Sophocles

অনেক দিন ইউরিপিডিসের খোঁজ নেই।

তাকে খুঁজতে বের হয়েছে সক্রেটিস। কোনো খবর না দিয়েই গোপনে চলে এসেছে সালামিনা দ্বীপে। সে জানে ইউরিপিডিস এই দ্বীপে বসে নতুন নাটক লিখছে। অনেক দিন ধরেই সক্রেটিস ভাবছিল, একবার সালামিনা দ্বীপে ইউরিপিডিসকে দেখতে আসবে। আজ চলে এসেছে।

এই দ্বীপে ইউরিপিডিসের কোনো বাড়ি-ঘর নেই। সে পাহাড়ের ভেতরে একটি গুহায় থাকে। তাকে গর্তবাসী নাট্যকার বলা যায়। এই গর্তবাসী নাট্যকারকে এই দ্বীপের সবাই এক নামে চেনে। সে এই দ্বীপের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। তার গর্তের নাম 'পাতালের নাটকপুরী।

নাটকপুরী খুঁজে পেতে কোনো সমস্যাই হলো না সক্রেটিসের। সে নৌকা থেকে নেমেই একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, ইউরিপিডিসের গুহাটা কোথায় বলতে পার? ছেলেটি একেবারে তাকে সঙ্গে করে পাহাড়ের ভেতরে একটি গর্তের সামনে এনে বলেছে, এই সেই বিখ্যাত নাটকপুরী গুহা। এখানে মানুষ ইউরিপিডিসকে খুবই মান্য করে।

সক্রেটিস কোনো আওয়াজ না করেই গুহায় ঢুকে পড়ল। ঢুকে দেখে, আওয়াজ করলেও কোনো সমস্যা নেই। ইউরিপিডিস গুহায় নেই। সক্রেটিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গুহা দেখতে শুরু করল। সে অবাক। গুহা যে এমন চমৎকার হতে পারে তার ধারণাই ছিল না। তারা ভাবত, ইউরিপিডিস বুঝি অনেক কষ্টে থাকে। কিন্তু এ তো রীতিমতো বিলাসখানা। সক্রেটিসের বাড়ির চেয়ে অনেক উন্নত। এ গুহায় সব আছে। রান্নাঘর, গোসলখানা, স্টাডি, পাঠাগার। পাঠাগারে অনেক বই-পত্র সারি সারি করে রাখা। সামনে লেখার টেবিল। টেবিলে একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি।

এখানে আসার আগে ইউরিপিডিস বলেছিল, সবাই বলে আমি নাকি শুধু মেয়েদের গালাগালি দিই। মেয়েদের নিয়ে আজেবাজে কথা লিখি। তাই এবার একটি মহৎ মেয়ের কাহিনি লিখব। দেখিয়ে দেব যে, মেয়েরাও ত্যাগ করতে পারে, মেয়েরাই খাঁটি প্রেম করে।

একথা বলে সে এথেন্সে ছেড়েছে, আর কোনো পাত্তা নেই। কারও কাছে কোনো খোঁজ নেই। সে এই তিন মাস একাকী সাহিত্য সাধনা করেছে। লিখে ফেলেছে নতুন নাটক।

সক্রেটিস নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়তে শুরু করল।

নাটকের নাম 'এলসেসটিস'।

কাহিনি এরকম : রাজার নাম এডমিটাস। তার ভাগ্যে অল্প বয়সে মৃত্যু লেখা। তবে একটি শর্তে সেই মৃত্যু ঠেকানো যাবে। শর্ত হলো রাজার বদলে যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় মরতে রাজি হয়। রাজা ভাবলেন এটি তো সোজা। রাজ্যজুড়ে এত লোক আমার জন্য জান কোরবান। তাদের একজন রাজি হলেই ঘটনা শেষ। কিন্তু দেখা গেল, কাজের সময় কেউ রাজি নয়। কেউ নিজের ইচ্ছায় জীবন দেবে না। শেষে রাজি হলেন— তার স্ত্রী রানি এলসেসটিস। তিনি প্রাণ দিলেন স্বামীর জন্য। মৃত্যুর সময় স্বামীকে বললেন, কথা দাও, আমার মৃত্যুর পর তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করবে না। রাজা কথা দিলেন রানি নিশ্চিন্ত মনে মারা

গেলেন। সেই বিকেলেই রাজবাড়িতে এলেন বীর হারকিউলিস। তিনি রাজার বন্ধু। রাজা ভাবলেন, বীর বন্ধু অনেক আশা নিয়ে এসেছেন, রাজার বাড়িতে একটু আদর-যত্ন পাবেন। তিনি দাসদের আদেশ দিলেন, হারকিউলিসকে কেউ রানির মৃত্যু সংবাদ দিও না, তাকে ঠিকমতো আদর যত্ন করো। সবাই আদর যত্ন শুরু করল। কিন্তু অতি আদরে বাঁদর হয়ে গেলেন হারকিউলিস, আদর পেয়ে তিনি সীমাহীন মাতলামি শুরু করলেন। তার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে এক দাস রানির মৃত্যু সংবাদ দিল। হারকিউলিস স্তম্ভিত হয়ে ভাবলেন, রাজা আমার কত বিশাল মাপের বন্ধু, আমার আরামের জন্য নিজের স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদও গোপন করলেন। এমন ভালোও মানুষ হয়! আর রাজা তো যেমন তেমন, রানি তো দেখি সত্যিকারের মহীয়সী নারী। নিজের স্বামীর জন্য সত্যি সত্যি জীবন দিয়ে দিলেন? হারকিউলিস ঠিক করলেন, তিনি রানিকে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরিয়ে আনবেন। রাজাকে কিছু না বলে হারকিউলিস চলে গেলেন পাতালে মৃত্যুপুরীতে। যুদ্ধ করে রানিকে নিয়ে ফিরে আসলেন। এসেই রাজাকে বললেন, বন্ধু, আমি একটি প্রতিযোগিতায় একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে পেয়েছি। তুমি, মেয়েটিকে বিয়ে করো। রাজা কিছুতেই দ্বিতীয় বিয়ে করবেন না। তিনি রানিকে কথা দিয়েছেন। হারকিউলিসের ভীষণ পীড়াপীড়িতে তিনি এক সময় রাজি হলেন, কিন্তু পর্দা উঠিয়ে দেখলেন— আরে, এ তো রানি এলসেসটিস। তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন।

সক্রেটিস নাটক পড়ে পুরোপুরি মুগ্ধ। ইউরিপিডিস একটি খাঁটি প্রেমের নাটক লিখে ফেলেছে। প্রেমের আত্মত্যাগের কাহিনি। রানি এলসেসটিস একজন প্রেমময়ী, মমতাময়ী, স্বামী অন্তঃপ্রাণা নারী। তিনি স্বামীর জন্য নিজের জীবন দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েরা যে তীব্রভাবে ভালোবাসতে পারে, ভালোবেসে জীবন দিতে পারে, এমন কথা এর আগে এথেন্সে কেউ বলেনি। ইউরিপিডিস সাহস করে সেটিই বলেছেন। খুব সুন্দর করে একজন প্রেমময়ী নারীর আত্মত্যাগ ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই নাটকের মধ্য দিয়ে আরেকটি নতুন বিষয় এনেছেন ইউরিপিডিস। সেটি হলো ভালোবাসার দৃশ্য। নাটকের প্লট আর সংলাপ দুটোই ভীষণ রোমান্টিক। একেবারে প্রেমে গদগদ। প্রেমের সংলাপগুলো সক্রেটিসের মজা লাগছে, সে কিছু সংলাপ আবার পড়ছে।

মৃত্যুশয্যায় রানি চোখ বুজে বলছেন, 'ঐ যে আসছে, মৃত্যু। আমি দেখতে পাচ্ছি— একটি নৌকা আসছে, আমাকে নিতে আসছে। আসো, তাড়াতাড়ি আসো, আমি প্রস্তুত, আমাকে নাও, দেরি করছো কেন?।' রাজা বলছেন, 'না না না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, ঈশ্বরের দোহাই— যেও না। তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না। তোমার মাঝেই আমাদের বেঁচে থাকা, তোমার মাঝেই মরণ। তোমার ভালোবাসাই আমাদের দুই জীবনের সেতু।' স্বামীর হাত ধরে রানি বললেন, 'কথা দাও, আমার মৃত্যুর পর তুমি আর দ্বিতীয় বিয়ে করবে না। আমার সন্তানরা কোনোদিন সত্মার হাতে পড়বে না।' রাজা কথা দিলেন, তিনি আর কোনোদিন বিয়ে করবেন না। রানি হাসিমুখে মৃত্যুর দিকে চললেন। রানি

বলছেন, 'হে পৃথিবী, তোমাকে বলে যাচ্ছি— আমার স্বামী যেন গর্ব ভরে এই কথা বলতে পারে যে, আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারীটিকে বিয়ে করেছিলাম।' রাজা কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'তোমার সাথে সব আনন্দ চলে গেল। তুমি চলে গেলে এই বাড়িতে আর কোনো অনুষ্ঠান হবে না, ফুল ফুটবে না, বাঁশি বাজবে না।'

এমন সুন্দর প্রেমের দৃশ্য এর আগে কোনো নাটকে হয়নি। এলসেসটিস তার সন্তানদের স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। স্বামী চিৎকার করে বলছেন, তুমি যেও না, তোমার সাথে আমাকে নিয়ে যাও, আমি একা থাকতে পারব না।

রানি মারা গেলেন। রানিকে কবর দিতে যাওয়ার সময় রাজা একটি খারাপ কাজ করলেন। নিজের বাবা-মাকে অনেক গালমন্দ করলেন। বাবা-মা কেন তার জন্য জীবন দিলেন না, সেই অপরাধে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

নাটকের সমাপ্তিও মিলনের। ট্র্যাজেডি যেমন করুণভাবে শেষ হয়, তেমন নয়। মিলন দিয়ে নাটক শেষ হয়েছে। হারকিউলিস রাজাকে না জানিয়ে পাতালে থেকে রানিকে ফিরিয়ে নিয়ে এনে বললেন, রাজা, এই নারীকে বিয়ে করো। কিন্তু রাজা কিছুতেই বিয়ে করবেন না। হারকিউলিস বললেন, 'একবার দেখো তো মেয়েটিকে!' রাজা ঘোমটা তুলে দেখেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার স্ত্রী স্বয়ং।

সক্রেটিস ভাবছে, ইউরিপিডিস সব সময়ই নতুন কিছু করতে চায়। অন্যেরা যা করছে, সে সেটি না করে নতুন কিছু আনতে চায়। এই মুহূর্তে এথেন্সের নাটকে ট্র্যাজেডির জয়-জয়াকার। সবাই নায়কের করুণ পরিণতি দেখে কাঁদতে কাঁদতে থিয়েটার থেকে বের হলে সেটিই ভালো ট্র্যাজেডি। নাট্যকার এস্কিলাস যেমন করে শুরু করেছিলেন, সফোক্লিস সেভাবেই লিখছেন সুন্দর সুন্দর ট্র্যাজেডি। সেখানে ইউরিপিডিস বিয়োগাত্মক নয়, মিলনাত্মক নাটক লিখল। এজন্যেই সক্রেটিস ইউরিপিডিসকে পছন্দ করে। সে আলাদা। সে চেনা পথে হাঁটে না, সে নিরন্তর নতুন পথ সৃষ্টির চেষ্টা করে।

সক্রেটিস ভাবছে, আসপাশিয়া এই নাটক দেখে খুব খুশি হবে। এথেন্সে এমন রোমান্টিক নাটকে আর হয়নি। এখানে এমন করে প্রকাশ্যে প্রেমের কথা বলে না। এখানে প্রেম মানে খুব গোপন জিনিস। রাতের আঁধারের জিনিস। ইউরিপিডিস প্রেমকে মঞ্চে নিয়ে এসেছে। অন্ধকারে নয়, ঝলমলে আলোর মধ্যে প্রেমের কথা বলছে স্বামী-স্ত্রী। তাদের জীবনে প্রেম, মরণেও প্রেম।

সক্রেটিস ভাবছে, ইউরিপিডিসের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ইউরিপিডিস যে এত রোমান্টিক, তার স্ত্রী নিশ্চয়ই সে কথা জানে না। এত রোমান্টিক মানুষের বউ চলে যাবে কেন? তার সংসার হবে ভালোবাসায় ভরা। এত রোমান্টিক কথাবার্তা লিখেছে, এর ছিটেফোঁটা হলেও তার মধ্যে আছে। নিজে অনুভব না করে এমন সুন্দর প্রেমের কথা লেখা যায় না। তাহলে ওর নিজের সংসার টিকল না কেন?

ইউরিপিডিসের সংসারের বিষয়ে সক্রেটিস যেটি বুঝতে পারেনি, সেটি হলো:

ইউরিপিডিসের সবকিছু বিশাল। তার চিন্তা বড়, সে মানুষ হিসেবেও অনেক বড়। তার প্রেমও অনেক বড়। তার প্রেম সাধারণ নয়। সেজন্যই তার সংসার টিকেনি।

ছোট প্রেম সংসার গড়ে আর বড় প্রেম সংসার ভাঙে। বড় প্রেম বিরহের জন্য উপযোগী, সংসারের জন্য নয়। সংসার হলো দুটি মানুষের প্রতিদিনের তুচ্ছ ঝগড়া-ঝাঁটি, রাগ-ক্রোধ, অভিমান মিশানো একঘেয়ে অম্ল-মধুর জিনিস। তার জন্য দরকার সাধারণ, একঘেয়ে ছোট্ট প্রেম। বড় প্রেমে এগুলো খাপ খায় না। বড় প্রেম হলো হঠাৎ উচ্ছ্বাস, যা দুজনকে ভাসিয়ে নেয়, আশেপাশের মানুষকে নাড়িয়ে দেয়। এই প্রেম দিয়ে ভালো সাহিত্য হয়, কিন্তু ভালো সংসার হয় না। এই প্রেম দুটি জীবনকে পুড়িয়ে দেয়, প্রত্যাশার আগুনে ছারখার করে দেয় সংসার। হেলেন আর প্যারিসের প্রেমে পুড়ে যায় ট্রয় নগর। বড় প্রেম কোনো কিছুকে ধরে রাখে না, ধরে রাখে ছোট প্রেম। তাই অনেক আশা নিয়ে শুরু হওয়া বড় বড় প্রেমের সংসার সুখী হয় না। সুখী হয় ছোট প্রেমের সংসার।

ছোট প্রেম নিজে ছোট বলে অন্যায় রাগ-ক্রোধকে জায়গা দিতে পারে, আর জায়গা দিতে দিতে ছোট প্রেমের ব্যক্তিত্ব বড় হয়ে ওঠে, সে সেক্রিফাইস করতে শিখে যায়। আর বড় প্রেম নিজে বড় বলে একটি ছোট্ট অভিমানকেও জায়গা দিতে পারে না, ছাড় না দিতে দিতে বড় প্রেমের ব্যক্তিত্ব ছোট হয়ে যায়, সেক্রিফাইস কী জিনিস সেটিই ভুলে যায়। তাই ছোট প্রেম সংসার গড়ে আর বড় প্রেম সংসার ভাঙে।

সক্রেটিস এখনও বিয়ে করেনি। প্রেমও করেনি। বড় প্রেম, ছোট প্রেমের পার্থক্য সে এখনও বুঝে না। তাই ইউরিপিডিসের সংসার ভাঙ্গার রহস্যও বোঝেনি।

এক মাস পরে বসন্ত উৎসবে নাটক মঞ্চে এলো। কিন্তু এমন রোমান্টিক নাটক করেও ইউরিপিডিস প্রথম হতে পারল না। সে দ্বিতীয় হয়েছে। আবারও প্রথম হয়েছেন সফোক্লিস।

ইউরিপিডিস জ্বানে, সে যত ভালো কিছু লিখুক, তাকে প্রথম বলতে এথেন্সের মানুষের খুব কষ্ট হয়। সে কখনো প্রথম হতে পারেনি। এবার ভেবেছিল হবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত হলো না।

সে প্রতি বছর নাটক লেখে। জমা দেয় নগরপালের অফিসে। নগরপাল সেরা তিনজনের নাটক বাছাই করেন বসন্ত উৎসবে অভিনয়ের জন্য। আশ্চর্য হলো কোনো বছরই ইউরিপিডিসের নাটক বাছাইতে বাদ পড়ে না। সেরা তিনজন নাট্যকারের একজন হয়ে সে প্রতি বছর অভিনয় করে। পুরস্কারের সময় প্রতি বছর একই ঘটনা ঘটে। তিনজন নাট্যকার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নগরপাল মঞ্চে এসে বলেন, এবারের বসন্ত উৎসবে তিনজন নাট্যকারই এত চমৎকার নাটক করেছেন যে, বিচার করতে বিচারকদের ঘাম ছুটে গেছে। তবু বিচার করতে হয়। তো এবারের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়েছেন আমাদের প্রিয় নাট্যকার তরুণ সমাজের গর্ব ইউরিপিডিস।

সে তিনজনের মধ্যে তৃতীয় হয়। প্রতি বছর তৃতীয় হয়। তার মনে হয় এরা আগেই ঠিক করে রাখে ইউরিপিডিস যাই লিখুক, সে তৃতীয় হবে। প্রথম আর দ্বিতীয় নিয়ে বিচার হয়। অনেকে বলে, আসলে প্রথম কে হবে, সেটিও বিচারকরা আগেই ঠিক করে রাখে। প্রতি বছর প্রথম হন সফোক্লিস।

ইউরিপিডিস মনে করে, নগরপাল প্রতি বছর তার নাটক বাছাইতে রাখেন যাতে তৃতীয় বাছাই করতে কোনো সমস্যা না হয়

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তার নাটকের প্রযোজকের কখনো অভাব হয় না। কোনো না কোনো ধনী মানুষ ঠিকই টাকা-পয়সা নিয়ে চলে আসে। ইদানীং তার নাটক প্রযোজনা করছেন তরুণরা।

মন খুব খারাপ করে বাড়ির পেছনের জলপাই গাছের নিচে বসে আছে ইউরিপিডিস। সেখানে হাজির হলো আসপাশিয়া। ইউরিপিডিস বিশ্বাস করতে পারছে না। আসপাশিয়া একা একা তার বাড়িতে এসেছে!

আসপাশিয়া জলপাই বাগানেই বসে পড়ল।

মিষ্টি একটি হাসি দিয়ে বলল, জলপাই শাখা হলো শান্তির প্রতীক। এর তলায় বসলে একটি শান্তি শান্তি ভাব আসে।

কিন্তু ইউরিপিডিসের মনে শান্তি নেই। সে এখনও বুঝতে পারছে না এই মেয়ে কেন এসেছে?

আসপাশিয়া বলল, আজ তোমার সাথে যেটি হলো, সেটি খুবই অন্যায়। বিচারকরা যাই বলুক তোমার নাটকই প্রথম হয়েছে।

ইউরিপিডিস একটু হাসল।

আসপাশিয়া বলল, এমন রোমান্টিক নাটক সারা পৃথিবীতে আর হয়নি। এই নাটকে তুমি যেভাবে প্রেমকে এনেছ, সেভাবে আর কেউ পারেনি। এই নাটকে যেভাবে প্রেম এসেছে, হোমারের হেলেন আর প্যারিসের প্রেম তার কাছে খুবই তুচ্ছ। ওডিসিয়াস আর পেলনোপির প্রেম অনেক বড়, কিন্তু হোমার তাদের প্রেমের বর্ণনা তেমন করে দেননি। তুমি যেভাবে প্রেমকে মঞ্চে এনেছ— সেটি একেবারে নতুন। জানো, নাটক দেখে আমি পেরিক্লিসকে কী বলছিলাম?

'কী?'

'বলছিলাম— এই নাটকে ইউরিপিডিস যেসব সংলাপ বলল, আমি মনে মনে সারা জীবন তোমার কাছে ওরকম কথা শুনতে চেয়েছি'। শুনে পেরিক্লিস বললেন, প্রতিটি নারী তার স্বামীর কাছে ঐ রকম কথা শুনতে চায়, আর প্রতিটি স্বামীও চায় তার স্ত্রী হোক ইউরিপিডিসের লেখা এলসিসটিসের মতো।

'একথা পেরিক্লিস নিজে বলেছেন?'

‘হুঁম। তোমার নাটক দেখে পেরিক্লিস আরও বললেন, তুমি নাটকে যেটি দেখিয়েছ, সেটি বাস্তব। স্বামী যতই শপথ করুক না কেন, বউ মারা গেলে সে দ্বিতীয় বিয়ে করবেই করবে।’

ইউরিপিডিস হাসল।

আসপাশিয়া বলল, তোমার নাটকটা দেখে আমার মনে হচ্ছে আজ রাতে এথেন্সের প্রতিটি নারী-পুরুষ তোমার সংলাপ বলবে। প্রতিটি মেয়ে মনে মনে বলবে— ‘আমার স্বামী যেন গর্ব ভরে বলতে পারে যে আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারীকে বিয়ে করেছি।’ আর প্রতিটি ছেলে বলবে— ‘তোমার মাঝেই আমাদের বেঁচে থাকা, তোমার মাঝেই মরণ। তোমার ভালোবাসাই আমাদের দুই জীবনের সেতুবন্ধন। ‘

ইউরিপিডিস বলল, তাহলে প্রথম হলাম না কেন?

আসপাশিয়া বলল, তুমি নতুন জিনিস মঞ্চে নিয়ে এসেছ। সেটি বিচারকরা বুঝতে পারছে না। বিচারকরা সব বয়সে বড়, তারা সফোক্লিসের প্রচলিত কাহিনি ভালোবাসে। নতুন কাহিনি তারা নিতে পারে না। তবে একটি ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। সেটি হয়তো তোমার নম্বর কমিয়ে দিয়েছে।

‘কোন ঘটনা?’

‘তুমি খেয়াল করেছ কিনা জানি না। তোমার নাটকে ভিলেন হয়ে গেছে রাজার বাবা। নাটকে তুমি স্বামী-স্ত্রীর প্রেম এনেছ। সেই প্রেমের ভিলেন রাজার বাবা। রাজা তার বউয়ের জন্য গদগদ, আর বাবাকে গালি দিচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা ছেলের জন্য জীবন দিলেন না, সেজন্য রাজা তার বাবাকে বকাঝকা করছে। নাটকের বুড়ো বিচারকরা একথা মানবে না। তারা এই জিনিস মঞ্চে দেখতে চায় না। সেজন্য তারা তোমাকে কম নম্বর দিয়েছে। আরও বিষয় আছে।’

‘আর কী বিষয়?’

‘নারীকে মহৎ করে ভাবতে এথেন্সের মানুষ এখনও প্রস্তুত নয়। তুমি যেভাবে মেয়েদের দেখছো, এথেন্সের কেউ সেভাবে দেখছে না। তাই নারীদের বড় করে নাটক লিখে তুমি প্রথম হতে পারবে না।’

‘তাহলে কি আর মেয়েদের নিয়ে লিখব না?’

‘তুমি না লিখলে কে লিখবে? আর কে আছে যে মেয়েদের মনের আসল কথা লিখতে পারে।’

ইউরিপিডিসের মনে পড়ল অনেক দিন আগে থিয়েটারে যেদিন প্রথম আসপাশিয়াকে দেখেছিল, সেদিন সক্রেটিস এই কথাটা বলেছিল। সেদিন সে আসপাশিয়ার সাথে ঝগড়া করছিল। সেদিন ঝগড়া শেষ হয়নি। আজ আসপাশিয়া নিজে এসে ঝগড়াটা শেষ করে গেল। বলে গেল— ইউরিপিডিসই একমাত্র নারীদের মনের কথা লিখতে পারে।

ইউরিপিডিসের মন ভালো হয়ে গেছে। সে ভাবছে, ইশ, এথেন্সের মানুষ যদি আসপাশিয়ার মতো করে বুঝত।

মন ভালো হলেও এথেন্সে থাকবে না সে। আবার সালামিনা দ্বীপে চলে যাবে। এথেন্সের মানুষ তাকে খুব কষ্ট দেয়। এর চেয়ে সালামিনার গুহা অনেক ভালো। সেখানের নিশ্চুপ সাগর তাকে কাঁদায় না। এথেন্সের মাটিতে ফিরলেই সে কাঁদে। আজই চলে যাবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে আবার চলে যাবে সালামিনা দ্বীপে।

সে হাঁটতে শুরু করল সাগর পাড়ের দিকে। নৌকায় করে যেতে হয় দ্বীপে। তার নিজের নৌকা আছে, নিজেই মাঝি। নৌকা ছেড়ে দিচ্ছে। অনেক দিনের জন্য এথেন্স ছাড়বে। হঠাৎ মনে হলো দূরে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে।

একটি ঘোড়া ছুটে আসছে অনেক জোরে। ঘোড়ার চড়ে দুইজন মানুষ তার নৌকার দিকেই আসছে। ঘোড়ার উপর ক্রিতো। সাথের লোকটিকে সে চেনে না। ঘোড়া থামতেই তারা চট করে উঠে পড়ল নৌকায়। ইউরিপিডিস কিছুই বুঝতে পারছে না। তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে প্রশ্ন।

ক্রিতো বলল, তোমাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন সক্রেটিস বলল, 'যাও, সালামিনার পথে দেখো।' তারপর ঘোড়া নিয়ে দৌড়ে ছুটে এলাম সাগর পাড়ে।

ইউরিপিডিস বলল, ঘোড়া ছুটিয়ে আসার মতো জরুরি কিছু হয়েছে? তিনজনের মধ্যে তৃতীয় হওয়া নাট্যকারের কাছে কারও জরুরি কিছু থাকার কথা নয়।

ক্রিতো ইউরিপিডিসের কাঁধে হাত রেখে বলল, নাটকের জন্যই এসেছি। ভালো খবর আছে। তৃতীয় নাট্যকারকেই মানুষ পছন্দ করেছে। সেই খবর নিয়েই এলাম।

ইউরিপিডিস ক্রিতোর সাথের লোকটির দিকে তাকাল।

লোকটি হাত বাড়িয়ে বলল, আমার নাম সক্রেটিস।

'সক্রেটিস?' ইউরিপিডিস অবাক।

ক্রিতো বলল, হুঁম, ওনার নামও সক্রেটিস। বাড়ি এনাগিরোস মহল্লায়। পেশায় সৈনিক। কিন্তু নাটকের খুব সমঝদার

নতুন সক্রেটিস বলল, আমাদের পাড়ায় একটি বড় থিয়েটার হয়েছে। আমরা চাই সেখানে আপনার 'এলসেসটিস' মঞ্চস্থ করব। আপনি যদি পরিচালক হন।

ইউরিপিডিস বলল, আপনাদের থিয়েটার আমি দেখেছি। সারা গ্রিসের এমন কোনো থিয়েটার নেই, যেখানে আমি যাইনি। যাই হোক, আপনারা আমার নাটক কেন মঞ্চে আনবেন? সফোক্লিসেরটা কেন নয়?

সফোক্লিস আমাদের পাড়ায় নাটক করবেন না। আর করলেও যে টাকা চাইবেন, সেটি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা আপনার নাটকটা পছন্দ করেছি। এমন রোমান্টিক নাটক এর আগে এথেন্সে কোনোদিন হয়নি। এমন সংলাপ কোথাও নেই।

আমরা নাটকটা আবার দেখতে চাই। আপনি পরিচালনা করতে রাজি হলে আমি নিজেই প্রযোজনা করতে চাই। অভিনয় আমার পাড়ার ছেলেরাই করবে।

‘কোনো নির্দিষ্ট তারিখ আছে আপনাদের?’

আমরা কালই কাজ শুরু করতে পারি। বাকিটা আপনার হাতে। যেদিন বলবেন অভিনেতারা প্রস্তুত, সেদিনই মঞ্চস্থ হবে।

ইউরিপিডিস ভাবছে, প্রস্তাব ভালো না মন্দ?

ক্রিতো বলল, প্রস্তাব ভালো। ভালো জিনিসই মানুষ বারবার দেখতে চায়। বই বলো, আর নাটক বলো, মানুষ পছন্দ করলেই সেটি টিকে থাকে। আসো, ঘোড়ায় ওঠো।

ইউরিপিডিস নৌকা থেকে নামল।

২৮

‘অসাধারণ নেতা হওয়াও দুর্ভাগ্যের,
তিনি সাধারণের কাছে অসাধারণ জিনিস প্রত্যাশা করেন।’
—খুকিডিডিস

এথেন্সের বাড়ির জানালা খুবই ছোট ছোট

কবুতরের খোপের চেয়ে একটু বড়। জানালায় কোনো দরজা নেই। একেবারে খোলা। খোলা জানালা দিয়ে যাতে চোর না ঢুকে পড়ে, সেজন্য খুব ছোট করে বানানো হয়।

সেই ছোট্ট জানালায় চোখ রেখে পেরিক্লিস একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন এক্রোপোলিসের দিকে। তার চোখে এক সাগর কষ্ট।

এমন দৃশ্য আসপাশিয়া আগে দেখেনি। তার প্রেমিকের চোখে বিষাদ মানায় না। তার প্রেমিক অহংকারী, সে দুর্বিনীত। প্রেমেও যেমন কোনো বাধা মানেন না, নেতা হিসেবেও নয়। গর্বিত হাসি মুখই পেরিক্লিসকে মানায়।

নিঃশব্দে পেছনে এসে পেরিক্লিসের কাঁধে মুখ রাখল আসপাশিয়া একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু আহ্লাদী গলায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ঝামেলা হয়েছে কোনো?

ধীরে ধীরে পেছন ফিরলেন পেরিক্লিস। আসপাশিয়ার মুখ দুই হাতে তুলে ধরলেন। আসপাশিয়ার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে। সে একটা কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু সেই একটা কিছুর দিকে গেলেন না পেরিক্লিস। ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার প্রেমিকাদের মধ্যে তোমার স্থান কিন্তু দুই নম্বরে। তোমার চেয়েও প্রিয় আমার একজন প্রেমিকা আছে।'

চোখ খুলল আসপাশিয়া। বড় আশায় চোখ বন্ধ করে তার ওষ্ঠ কাঁপছিল। কিন্তু দুষ্টু পেরিক্লিস কী শোনালেন? সে বড় বড় চোখে তাকাল।

তার মুখ দেখে মায়া লাগল পেরিক্লিসের। বেশি রহস্য না করে বললেন, ভয় নেই। আমার এক নম্বর প্রেমিকা আসলে তোমারও প্রেমিকা। তার নাম এথেন্স। এই নগরীটিকে আমি তোমার চেয়েও বেশি ভালোবাসি। জ্ঞান সঞ্চারিণী, গণতন্ত্র প্রসবিনী আমার এথেন্স।

'বুঝলাম। কিন্তু হে এথেন্সের মহান প্রেমিক, বলুন, আপনার প্রেমিকা এথেন্সের কী হয়েছে? সে বুঝি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে?'

'হুঁম, কষ্ট দিচ্ছে, এথেন্স আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এথেন্সের দিকে তাকালেই আমি কষ্ট পাই।'

পেরিক্লিসের গলা থেকে ভাষণের স্বর এখনও নামেনি। তিনি ভরাট গলায় বললেন, ওই জানালা দিয়ে তাকাও। এক্রোপোলিসের উপর ভালো করে দেখো। ঐ যে, দেবী এথিনার পোড়া মন্দির পার্থেনন। পারস্য বাহিনী পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। আমি যখনই পার্থেননের দিকে তাকাই, আমার বুকটা হু হু করে ওঠে। পার্থেননের পোড়া ছাই আমাকে কষ্ট দেয়।

আসপাশিয়া অবাক হয়ে বলল, পোড়া পার্থেনন কষ্ট দিচ্ছে? কিন্তু আমি তো জানতাম, এথেন্সের মানুষ ওই পোড়া ছাই দেখে শক্তি পায়। পারস্যকে হারানোর পরে থেমিস্টক্লিস পোড়া পার্থেনন দেখিয়ে বলেছেন, 'দ্যাখো, এথেন্সবাসী দ্যাখো। আমরা হেরে গেলে কী

হতো, দ্যাখো। আর একটু হলেই এই পার্থেননের মতো সারা এথেন্স পুড়িয়ে দিত। তাই আমরা ঠিক করলাম— আমরা আর পার্থেনন বানাব না। পোড়া চিহ্ন রেখে দিলাম। এই চিহ্ন দেখে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝবে, যুদ্ধে হেরে গেলে এথেন্সের কী অবস্থা হতে পারে।' আর আজ ওই পোড়া চিহ্ন আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে?

'হ্যাঁ, আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আর কত দিন আমরা ঐ পোড়া চিহ্ন দেখে যাব? যেদিন পুড়েছিল, সেদিন এথেন্স ছিল একটি দরিদ্র নগর। কিন্তু দিন পাল্টেছে। আজ আর এথেন্স শিশু রাষ্ট্র নয়। এথেন্স এখন সারা গ্রিসের নেতা। সে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র।'

আসপাশিয়া দেখল, পেরিক্লিসের অহংকারী চেহারা ফিরে এসেছে। সে মনে মনে খুশি হলো।

পেরিক্লিস বলে যাচ্ছেন— শুধু অর্থ সম্পদের দিকে নয়। তাকাও জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির দিকে। এথেন্স জ্ঞানের জগতে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগর। সারা পৃথিবীর জ্ঞানী মানুষেরা এথেন্সের দিকে ছুটে আসছেন। এথেন্স হলো আলো। আলোর নেশায় দুনিয়ার আলোক পিপাসুরা আসছেন এই নগরীতে। হেরোডোটাসের কথাই ধরো। আহা, কী চমৎকার জ্ঞানী। কিন্তু কোথায় ছিল তার জ্ঞান? তার নগরী তাকে বিতাড়িত করেছে। আর এথেন্স তাকে বুকে তুলে নিয়েছে। এই এথেন্সে এসেই সে নতুন এক জ্ঞানশাস্ত্র সৃষ্টি করে ফেলেছে।

'হুঁম, সে জ্ঞানের জগতের নতুন একটি বিষয় সৃষ্টি করেছে। সেই বিষয়ের নাম ইতিহাস।'

'আমি আর এথেন্সের পোড়া চিহ্ন নিয়ে গর্ব করতে চাই না। আমি আমার এথেন্সকে নতুন করে বানাতে চাই। এক্রোপোলিসের ওপর সবকিছু নতুন করে বানাব। পার্থেনন হবে দেখার মতো জিনিস। পৃথিবীর মানুষ এথেন্সের জ্ঞানের কথা জানতে পারছে, বিদ্যার কথা শুনতে পারছে। আমি চাই, এই শহরের সৌন্দর্য দেখে সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে। সবাই বলবে, হ্যাঁ, এই হলো এথেন্স। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নগরী।'

আসপাশিয়া বলল, না না, তারা বলবে, এই হলো পেরিক্লিসের এথেন্স।

এতক্ষণে হো হো করে হেসে উঠলেন পেরিক্লিস। বললেন, তোমার চেয়ে আমাকে আর কেউ বেশি বোঝে না। আমি তাই চাই। আমি সত্যিই চাই, এথেন্সে এসে বলবে, এই হলো পেরিক্লিসের সুন্দরীতমা এথেন্স। আমার কিছু চমৎকার পরিকল্পনা মাথায় এসেছে। তোমাকে সেগুলো বলতে চাই। তোমাকে না বলে আমি কোনো কাজ করি না।

কথাটা যে সত্য তা আসপাশিয়া ভালো করেই জানে। কিন্তু সেটি বুঝতে দিলে প্রেমের খেলা পানসে হয়ে যায়। সে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, আমাকে না জানিয়ে কিছুই করেন না? এথেন্সের পুরুষেরা মেয়েদের কী চোখে দ্যাখে তা পৃথিবীর মানুষ জানে।

পেরিক্লিস বললেন, এখন নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলব না। এখন আমি আমার স্বপ্নের এথেন্সের কথা তোমাকে বলব। আমার জীবনের স্বপ্নের কথা বলব। কিন্তু গলাটা

যে বড় শুকিয়ে গেছে।

আসপাশিয়া উঠতে যাচ্ছিল।

'তোমাকে উঠতে হবে না। দাসীকে ডাক দাও। তুমি এখানে এসে বসো।' পেরিক্লিস গদগদ গলায় বলতে শুরু করলেন, আমি স্বপ্ন দেখি— আমি এথেন্সের ইতিহাসে এক নতুন দিন আনব। সারা দুনিয়ার মানুষ, এথেন্সের নামে বিস্মিত হবে। দুনিয়ার মানুষ বলবে পৃথিবীর কোথাও এমন সুন্দর নগরী আগে আর হয়নি। পারস্য, মিশর, ব্যাবিলন, ভারত কোথাও এথেন্সের চেয়ে সুন্দর নগরী নেই। আর সেই কাজটা আমি শুরু করব পার্থেনন দিয়ে। আমি নতুন করে দেবী এথিনার মন্দির পার্থেনন বানাব। আমার পার্থেনন হবে পৃথিবীর সুন্দরতম ভবন। সেই ভবনে প্রবেশ করতে দেবী এথিনাও গর্বিত হবে।

'হুঁম, প্রস্তাব ভালো। কিন্তু এত বিশাল কিছু বানানোর টাকা কই?'

'এথেন্সের ভাণ্ডারে এখন অনেক টাকা।'

'সেই টাকা এথেন্সের টাকা নয়। এই টাকা ডিলিয়ান জোটের'[৮১] টাকা। কয়েকশ নগরী এই টাকা এথেন্সের কাছে জমা রেখেছে। আবার যদি পারস্যের মতো কোনো বড় শক্তি আক্রমণ করে, সেই সময় এই টাকা দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

'সেটি আমার মনে আছে। এই টাকা ডিলিয়ান জোটের টাকা। কিন্তু আমি মনে করি এথেন্সের অধিকার আছে এই টাকা নিয়ে নেওয়ার। এই টাকায়ই নতুন পার্থেনন হবে।'

আসপাশিয়ার বুক দুরু দুরু করে। সে জানে, তার প্রেমিক যখন বলেছে, তখন পার্থেনন করবেনই। পেরিক্লিস পিছু হটার লোক নন।

কিন্তু এই হঠাৎ আবেগে যেভাবে পেরিক্লিস বলছেন, সে ডিলিয়ান জোটের টাকা দিয়েই পার্থেনন বানাবে, সেটি অত সহজে হবে না। সংসদে ভোট হবে। এটি নীতির দিক থেকে অন্যায়। এথেন্সের নাগরিকরা ন্যায়ের পক্ষে। এমন অন্যায় কাজের পক্ষে তারা ভোট দেবে না।

তাছাড়া যেসব নগর টাকা রেখেছে এথেন্সে, তারা এই সিদ্ধান্ত মানবে না। পার্থেনন দেবী এথিনার মন্দির। দেবী এথিনা এথেন্সের দেবী। অন্য শহরগুলো এথিনাকে মানে না, তাদের আলাদা দেবতা আছে। তাহলে সেইসব নগর তাদের টাকার দাবি ছাড়তে রাজি হবে না। পেরিক্লিস যত সহজ ভাবছেন, তত সহজ হবে না বিষয়টি।

পেরিক্লিস গুরু এনাক্সাগোরাস আর গায়ক ডেমনকে ডাকলেন।

গুরু বললেন, ডিলিয়ান জোটের টাকা তুমি ব্যবহার করতে পার না। ডেমন বললেন, এই টাকা নিলে অন্য শহরগুলো ঝামেলা করবে। যুদ্ধও লাগতে পারে।

পেরিক্লিস হতাশ। আসপাশিয়া ঠিকই বলেছিল। ঐ টাকায় পার্থেনন করা যাবে না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। তার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। চাপা কষ্টে তার কান্না আসছে।

কিছুক্ষণ পরে এক দাসী বলল, আপনার একটি চিঠি আছে।

পেরিক্লিস বললেন, রেখে দাও ওখানে।

দাসী বলল, এখুনি পড়তে বলেছেন। খুব জরুরি চিঠি।
চিঠি খুলেই চমকে উঠলেন পেরিক্লিস। চিঠিতে লেখা:

'কেন ডিলিয়ান জোটের টাকায় দেবী এথিনার মন্দির'
প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আমি চাই এথেন্স হোক এই সারা দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর নগর। মানুষ এসে তাকিয়ে বলুক, হ্যাঁ, আমরা এমন একটি জায়গায় এসেছি, যেখানে জ্ঞান আর সৌন্দর্য একসাথে মিশে গেছে। আমরা আবার দেবী এথিনার মন্দির বানাব। এবার এমন করে বানাব যেন এর চেয়ে সুন্দর ভবন পৃথিবীতে আর নেই। এটি বানাতে টাকা লাগবে। সেই টাকা আসবে ডিলিয়ান জোটের টাকা থেকে। কারণ আমরাই ডিলিয়ান জোটের সব শহরকে রক্ষা করেছি। যেকোনো শহরের বিপদে এথেন্সই সেনা দেয়, জাহাজ দেয়। আমরাই জোটের সকল নগররাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছি। সেই দায়িত্ব এথেন্স আগেও পালন করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।

পুনশ্চ :
১. চিঠি পাঠ শেষে আমাকে ডাক দেবে।
২. কাল সকালে ফিডিয়াসকে ডেকে পার্থেননের নকশা শুরু করবে।

ইতি-
আসপাশিয়া

পেরিক্লিস পড়ছেন। আসপাশিয়া বক্তৃতা লিখে ফেলেছে। সংসদে পার্থেননের বিল উঠানোর জন্য ভাষণ লিখে দিয়েছে। তার মানে হলো আসপাশিয়া বলছে পার্থেনন করা যাবে। যখন অন্য সব বন্ধুরা তাকে নিষেধ করছে, তখন আসপাশিয়া বলছে— এগিয়ে যাও। পেরিক্লিসের মনের দ্বিধা চলে গেল। তিনি পার্থেনন বানাবেন।

ফিডিয়াসকে খবর দিতে হবে। সেই হবে নতুন এথেন্স বানানোর শিল্পী।

পেরিক্লিস ফিডিয়াসকে বললেন, তুমি তো রাস্তাঘাটে মূর্তি বানিয়ে বেড়াচ্ছ। এসব বাদ দাও। ভালো কিছু করো।

ফিডিয়াস বলল, আমি রাস্তাঘাটে মূর্তি বানাই? আমি ডেলফিতে এপোলো মন্দিরে মূর্তি বানিয়েছি। ম্যারাথনের প্রান্তরে বানিয়েছি।

'আমি যা ভাবছি সেটির তুলনায় ওগুলো রাস্তাঘাটের কাজই।'

'তুমি কী ভাবছ? তোমার নিজের মূর্তি বানাতে হবে?'

'আমার মূর্তিও বানাবে। তবে সেটি পাথরের নয়, আমার মূর্তি বানিয়ে দেবে মানুষের মনে। মানুষ এথেন্সকে দেখবে, আর আমাকে মনে করবে।'

আজ পেরিক্লিস একটু বেশি সুরা পান করেছেন। তিনি কোনোদিনই অতিরিক্ত পান করেন না। কিন্তু আজ তিনি খুব উত্তেজিত। পার্থেনন বানানোর উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন।

ফিডিয়াস বলল, তোমার মূর্তি তো এথেন্সের মানুষের মনে এমনিতেই আছে। তোমার মতো এই রূপ, এমন যুদ্ধবিদ্যা, এমন ভাষণ এথেন্সের কোনো বীরের কখনো ছিল? তুমি যুদ্ধের মাঠে একিলিস, নেতৃত্বে জিউসের মতো তোমার মূর্তির দরকার হবে না।

'হবে, ফিডিয়াস, হবে। আমি এমন কিছু করব যাতে শুধু এথেন্স নয়, সারা দুনিয়ার মানুষ পেরিক্লিসের মূর্তি তাদের মনে রেখে দেবে।'

'খুলে বলো। কী চাও? অনেকক্ষণ ধরেই এলোমেলো বলছো।'

'আমি এথেন্সকে বদলে দেব। এথেন্স হবে শিল্পের নগরী। এখন সারা দুনিয়ার জ্ঞানী মানুষরা এথেন্সে আসে জ্ঞানের জন্য। এরপর থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ আসবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শিল্পকর্ম দেখতে। আমি এথেন্সকে এমন সুন্দর বানাতে চাই, যা পৃথিবীর কোথাও নেই। আমার ইচ্ছা পূরণ করবে তুমি।'

ফিডিয়াস ভালো করে তাকাল পেরিক্লিসের চোখের দিকে। এটি মাতালের প্রলাপ নয়। এটি সত্যিকারের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পেরিক্লিসের কথা। ফিডিয়াস যেন চোখের সামনে এক সাগর আলোর ঢেউ দেখতে পেল। এমন একটা কিছু শোনার জন্য সে অপেক্ষা করছে।

সে স্বপ্ন দেখত একদিন কোনো এক সম্রাট তাকে ডেকে বলবে, 'ফিডিয়াস, এসো, আমার নগরীটি তোমার মনের মতো করে সাজিয়ে দাও।' সম্রাটের কথা শুনে ফিডিয়াস তার মনের শিল্পরস মিশিয়ে একটি নগর বানাবে। সারা দুনিয়ার মানুষ দেখে বলবে এটি বানিয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা শিল্পী ফিডিয়াস। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আজ তার বন্ধু পেরিক্লিস সম্রাটের বেশে দাঁড়িয়েছেন।

আনন্দে তাইরে নাইরে করে উঠল ফিডিয়াস। জড়িয়ে ধরল পেরিক্লিসকে। আনন্দে আরও সুরা পান করতে ইচ্ছে করছে। সে দাসের হাত থেকে বিশাল এক পাত্র নিল। কোনোদিকে না তাকিয়ে কয়েক পাত্র ঢেলে দিল গলায়।

হঠাৎ তার সুরার পাত্র নিয়ে গেলেন পেরিক্লিস।

তিনি বললেন, ফিডিয়াস, আমি তোমাকে মাতাল হতে এখানে ডাকিনি। ডেকেছি কাজের জন্য। তুমি ভালো করেই জানো, আমি কাজের সময় মাতলামি একেবারেই পছন্দ করি না। অনেক খেয়েছ। এবার কথা শোন।

পেরিক্লিস বলতে লাগলেন, ফিডিয়াস, আমি নতুন করে পার্থেনন বানাব। এক্রোপোলিসের উপরে আগের জায়গায়ই হবে সেই পার্থেনন। এটি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ভবন। তোমার প্রতি আমার অনেক আশা ফিডিয়াস। আমি জানি, তুমি পারবে।

চোখ ডলতে ডলতে ফিডিয়াস উঠে দাঁড়াল। বলল, চলো, এখুনি জায়গা ঠিক করে ফেলি। তুমি ফিডিয়াসকে মাতাল বলেছ। ফিডিয়াসের হাত থেকে মদ কেড়ে নিয়েছ। সেই ফিডিয়াসই তোমাকে কথা দিচ্ছে, এমন জিনিস বানিয়ে দেব যে, সারা পৃথিবী তাকিয়ে রইবে, যুগ যুগ তাকিয়ে থাকবে। ঠিক আছে চলো— আজ রাতেই নকশা বানাব।

তেতে উঠেছে ফিডিয়াস। তার তেতে ওঠা ভালো লাগছে পেরিক্লিসের। সত্যিকার শিল্পীর জন্য জেদ ভীষণ কাজের। জেদের মুহূর্তেই একজন শিল্পী তার জীবনের সেরা কাজ করে।

পেরিক্লিস বললেন, চলো, পোড়া পার্থেননের পেছন দিকটায় চলো।

রাতের আঁধারে এক্রোপোলিসের উপরে দুই অর্ধ-মাতাল বন্ধু। একজন নেতা, অন্যজন শিল্পী। একজন স্বপ্নবান, আরেকজন কারিগর। দুই বন্ধু মিলে পোড়া পার্থেননের চারপাশের জায়গা মাপছেন

তাদেরকে মাপতে দেখে তিনজন দাস দৌড়ে এলো। ছিঃ ছিঃ দাস থাকতে তাদের মালিকরা এমন কষ্টের কাজ করছেন! মাপার রশি নিতে তারা হাত বাড়াল।

কিন্তু রে রে করে উঠল ফিডিয়াস। বলল, খবরদার, আর আগাবি না। দূরে থাক। এটি আমার কাজ, আমাকেই করতে দে। আমিই মাপব

পেরিক্লিস বুঝলেন, শিল্পী ক্ষেপেছে। না হলে এই মাপামাপির কাজ সে নিজ হাতে করত না।

রাত গভীর হচ্ছে। আকাশের শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ এজিয়ান সাগরের দিকে নেমে যাচ্ছে। তবুও ভ্রুক্ষেপ নেই ফিডিয়াসের। দাগ টানছে পেপিরাসের উপর। কাল সকালেই পেরিক্লিসের হাতে নকশা তুলে দেবে।

পেরিক্লিস ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছেন। পাগল ফিডিয়াস যে এমনভাবে কাজ করতে পারে, সেটি তিনি জানতেন না। শিল্পের নেশা যে এমন মারাত্মক হতে পারে, তার ধারণা ছিল না।

তার ভালো লাগছে। তার স্বপ্নের পার্থেনন তৈরির কাজ তাহলে শুরু হয়ে গেল। ফিডিয়াস তো বলছে, কাল সকালেই সে ডিজাইন দিয়ে দেবে। কিন্তু ফিডিয়াস তো আর তার পরিকল্পনার কথা জানেন না। পেরিক্লিস এই মন্দিরকে এমন করবেন যে, এর চারপাশের দেয়ালে সকল গ্রিক বীরের ভাস্কর্য থাকবে। হোমারের প্রতিটি চরিত্র খেলা করবে পার্থেননের দেয়ালে। সেকথা এখনও ফিডিয়াসকে বলা হয়নি। পাগলটা আগে ডিজাইন দিক, ভেতর আর বাইরের ডিজাইন। রং, মূর্তি এসবের কথা সময় হলেই ফিডিয়াসকে বলা যাবে

ফিডিয়াসকে আর একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়নি। অর্থের বিষয়ে কোনো আলাপ হয়নি। সেই আলাপ পরেও করা যাবে। শিল্পীকে অর্থের চিন্তায় আনার দরকার নেই। সেই

চিন্তা পেরিক্লিস একাই করবেন। আর যদি কেউ করে, সে হলো আসপাশিয়া। কালই সংসদে পেরিক্লিস পার্থেননের প্রস্তাব করবেন।

পরদিন খুব সকালে সক্রেটিসের কাছে খবর পাঠিয়েছে আসপাশিয়া। খুব করে অনুরোধ করেছে সক্রেটিসকে সংসদে যেতে। আজ সংসদে পেরিক্লিস নতুন করে পার্থেনন বানানোর প্রস্তাব করবেন। সক্রেটিস যেন তার বন্ধুদের নিয়ে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। আসপাশিয়া জানে, সক্রেটিস কোনোদিন ভোটাভুটিতে যায় না। এসব তার কাছে ছেলেখেলা মনে হয়। তবু আসপাশিয়ার বিশেষ অনুরোধ, আজ যেতেই হবে। সক্রেটিস যেন তার বাবাকেও বলে, বাবা যেন তার লোকজন নিয়ে ভোট দিতে আসে। সক্রেটিসের বাবা রাজমিস্ত্রি। আসপাশিয়া জানে— নতুন পার্থেনন বানানোর খবরে তাদের পরিবার খুশি হবে। নতুন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সক্রেটিস ঠিক সময়ে পিনিক্স পাহাড়ের উপর সংসদে হাজির হলো। তার সাথে তাদের মহল্লার অনেকেই আছে।

খোলা আকাশের নিচে সংসদ লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার মানুষ। এরা সবাই ভোটার। চিৎকার চেঁচামেচিতে কথাই শোনা যায় না।

পেরিক্লিস দুটি প্রস্তাব করলেন। এক. নতুন করে পার্থেনন বানানো হবে, দুই. এথেন্স সরকারের এত টাকা নেই, সেজন্য ডিলিয়ান জোটের টাকা দিয়ে বানানো হবে।

মানুষ অবাক। কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি যে, এমন প্রস্তাব করবেন পেরিক্লিস। তারা জানে, পারস্য যুদ্ধের পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, আর কোনোদিন পার্থেনন বানানো হবে না। পেরিক্লিস আগের নেতাদের সব সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে চাচ্ছেন। তিনি কাজটা ঠিক করছেন না। সব নেতা পেরিক্লিসের প্রস্তাবের বিপক্ষে। শুরু হলো বক্তৃতা। প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তৃতা।

পেরিক্লিস আবার মঞ্চে উঠলেন। আসপাশিয়ার লেখা বক্তৃতাটা তার মুখস্থ। অনেক দরদ দিয়ে তিনি বক্তৃতা করলেন। তিনি ভেবেছিলেন কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু না, কাজ হয়নি। তার প্রথম প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব মানছে না।

বিপক্ষের লোকজন বলল, নতুন পার্থেনন বানাবেন সেটি মেনে নিলাম। কিন্তু ডিলিয়ান জোটের টাকা নেওয়া যাবে না। এটি অন্যায়। অন্য শহরের টাকা জোর করে নেওয়া যাবে না। এথেন্স সাম্রাজ্য নয়, এথেন্স হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে অন্যায় করা যায় না।

সক্রেটিস দেখল, মানুষ যেভাবে না না করছে, তাতে ভোট হলে নিশ্চিত পেরিক্লিস হারবে। জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। নতুন পার্থেনন হবে না। পেরিক্লিসের স্বপ্ন পূরণ হবে না।

হঠাৎ করে পেরিক্লিস হুংকার দিলেন, ভাইয়েরা আমার।

লোকজন সব চুপ। পেরিক্লিস এত জোরে কখনো কথা বলেন না। তিনি কাঁপছেন। এতদিন তিনি যা চেয়েছেন, মানুষ শুধু হ্যাঁ হ্যাঁ করেছে, আজ সবাই না না করছে। তিনি 'না' শুনতে অভ্যস্ত নন। তিনি কাঁপছেন।

পেরিক্লিস হাত উঁচিয়ে বললেন, কাউকে টাকা দিতে হবে না। ডিলিয়ান জোটের টাকা আমি নেব না। কিন্তু আমি পার্থেনন বানাব। আমি নিজে টাকা দেব। আমার যত সম্পদ আছে সব আজই বিক্রি করে দেব। আমার টাকায় পার্থেনন হবে। শুধু পার্থেনন নয়, আমি নিজের টাকায় এথেন্সের চেহারা বদলে দেব। সারা এক্রোপোলিস আর আগোরা নতুন করে বানাব। মানুষ এসে দেখবে এথেন্স কত সুন্দর। তবে একটি শর্ত : আমার নিজের টাকায় সবকিছু বানাব, সেজন্য সবকিছু হবে আমার নামে। সব ভবনের গায়ে লেখা থাকবে পেরিক্লিস। বলুন আপনারা রাজি কিনা?

সারা পিনিক্স পাহাড় চুপ। নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বিরোধী পক্ষের একজন মঞ্চে এসে বলল, এথেন্স কারও একলার সম্পত্তি নয়, কারও নিজের নামে এখানে কিচ্ছু হবে না। ঠিক আছে ডিলিয়ান জোটের টাকা দিয়েই সব কাজ হোক। চলুন, আমরা নতুন এথেন্স বানাই।

পেরিক্লিস হাসি দিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন। ভোটে পেরিক্লিসের প্রস্তাব পাস হয়ে গেল।[৮২]

সক্রেটিস অনেকক্ষণ পেরিক্লিসের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে পেরিক্লিসের এই রূপ আগে দেখেনি। লোকটির মাথায় যে বুদ্ধি আছে, আর দরকার হলে তিনি কীভাবে ব্যবহার করতে পারেন ভেবে অবাক হলো সক্রেটিস। নেতা হতে আলাদা যেসব গুণ দরকার, সেটি পেরিক্লিসের আছে।

সারা এথেন্সে খবর ছড়িয়ে গেল পার্থেনন হবে। আবার পার্থেনন হবে। দেবী এথিনার জন্য মন্দির হবে। বিশাল করে হবে। মানুষ খুব খুশি।

সবচেয়ে বেশি খুশি ভাস্কর ফিডিয়াস।

***

৮১. পারস্যের আক্রমণ রুখতে এথেন্সের নেতৃত্বে গ্রিসের অনেকগুলো নগররাষ্ট্র ৪৭৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি জোট করে। এর সদর দপ্তর ছিল দেবতা এপোলোর জন্মস্থান ডিলস দ্বীপে। তাই এই জোটকে ডিলিয়ান জোট (Delian League) বলা হয়। সব নগরী প্রতি বছর চাঁদা দিত, সেই টাকা এই দ্বীপে জমা থাকত।

৮২. ৪৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্স ডিলিয়ান জোটের (Delian League) অর্থ ডিলস দ্বীপ থেকে এথেন্সে নিয়ে আসে। সেই অর্থেই এথেন্সের বিখ্যাত পার্থেনন মন্দির বানানো হয়।

২৯

‘এথেন্স কাউকে অনুকরণ করে না,
এথেন্সই সবার জন্য উদাহরণ।’
— পেরিক্লিস

ফিডিয়াস আর পেরিক্লিস আবার এসেছেন এক্রোপোলিস পাহাড়ের উপরে। কাল রাতে যে মাপজোক করেছিলেন, সেটি দিনের আলোতে মিলিয়ে নিচ্ছেন ফিডিয়াস। ডিজাইন করার জন্য আলোর হিসাব খুব জরুরি।

পেরিক্লিস বললেন, শোন, তুমি তো শুধু পার্থেননের মাপ নিয়ে পড়ে আছ। আমি সারা এথেন্স নিয়ে ভাবছি। এই এক্রোপোলিস পাহাড়, ঐ আগোরা, ঐ দূরের পিরাউস বন্দর আমি সব নতুন করে করব। সব পাল্টে দেব।

ফিডিয়াস চুপ করে আছে। কী যেন ভাবছে।

পেরিক্লিস বললেন, কী শিল্পী, ভয় পেয়ে গেলে? ঝিম মেরে কী ভাবছ?

ফিডিয়াস বলল, আরও দুইজন লোকের কথা ভাবছি। তুমি যে বিশাল কাজের কথা ভাবছ, সেটি একজনে ডিজাইন করতে পারবে না। একটি টিম লাগবে।

'তো, বানাও তোমার টিম। ঝটপট বানাও। কে কে থাকবে তোমার টিমে?'

'খুব প্রতিভাবান একটি ছেলে আছে। ছেলেটি ভবনের নকশা খুব ভালো পারে। ওর নাম ইকটিনাস[৮৩]। আমার সাথে কাজ করেছে। কয়েকটি বড় বড় মন্দিরের ডিজাইন করেছে। স্পার্টার কাছে বাসাই নামে যে ছোট্ট শহর, সেখানে একটি এপোলোর মন্দির ডিজাইন করেছে। খুব সুন্দর হয়েছে। ছেলেটা আমার পছন্দের। সে বইও লেখে। একটি দালান কীভাবে ডিজাইন করে, সেটি সুন্দর করে লিখে ফেলতেও পারে।'

'তুমি যদি ভাবো ছেলেটা কাজে আসবে, তাই সই। তাকে খবর পাঠাও।'

'আর একজনের নাম কালিক্রাটিস। ওর জ্যামিতি জ্ঞান খুব পাকা। আমি পছন্দ করি। কাজে খুবই ভালো।'

'তাকেও নিয়ে নাও। লাগলে আরও কয়েকজন নাও। সারা এথেন্সের মানুষকে নাও। কিন্তু কাজে নামো। ঝিম মেরে পড়ে থেকো না।'

ফিডিয়াস ঝিম মেরে থাকার লোক নয়। সেটি প্রমাণ করতে সে হঠাৎ পাগলের মতো দৌড় দিল। এক দৌড়ে গিয়ে থামল এক্রোপোলিসের সদর দরজায়। সেখানে থেকে চারদিকে তাকাচ্ছে। পাগলের মতো দৃষ্টি। চোখের খুব সামনে দুই হাত নিয়ে আঙুল দিয়ে ফোকাস করল। কী যেন মাপছে। কয়েকবার ফোকাস করেই আবার দৌড়ে চলে গেল পাহাড়ের উল্টো দিকে। সেখানে গিয়ে একইভাবে চোখের সামনে দুই হাত নিয়ে ফোকাস করল। ঘুরে ঘুরে চারদিকে ফোকাস করল।

বেশ কিছুক্ষণ তার পাগলামি দেখলেন পেরিক্লিস। পাগলামি শেষ হলে ফিরে এসে ফিডিয়াস বলল, আলোর হিসাব নেওয়া শেষ। ডিগ্রির মাপ, জ্যামিতির কোণের হিসাব খাপে খাপ মিলে যাবে। এবার বলো, এই পাহাড়ের কোথায় কী বানাতে চাও। তুড়ি মেরে সব করে দিচ্ছি। ফিডিয়াসের এক জবান। জবান দিছি তাই কাজ শেষ করে উঠব।

পেরিক্লিসের ভালো লাগল। শিল্পীরা তেতে না উঠলে কাজ করতে পারে না। এখন ফিডিয়াস ফুটছে, সে পারবে।

পেরিক্লিস বললেন, আমরা এখন সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। এই দরজা থেকে ডান দিকেই হোক পার্থেনন। মানে আগের জায়গায়ই। এখন যেখানে পোড়া আছে, সেখানেই।

ফিডিয়াস বলল, সেই ভালো। তাতে আগের পাথর যা আছে, সেগুলো কাজে আসবে। বিশাল করে আমরা এই মন্দির বানাব। এটিই হবে এথেন্সের মূল আকর্ষণ। এই মন্দিরের নকশা আমি করব না। করবে ইকটিনাস। এটি খুব মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। আমার তো অনেক কাজ। তাই এই মন্দিরের খুঁটিনাটি দেখবে ইকটিনাস। আমি দেখাশুনা করব।

পেরিক্লিস বললেন, এরপর পার্থেননের ঠিক বিপরীতে উত্তর দিকে চলো। কাহিনি অনুযায়ী এখানে দেবী এথিনা আর তার চাচা পোসাইডনের যুদ্ধ হয়েছিল। এখনও এখানে এথিনার দেওয়া জলপাই গাছ, আর পোসাইডনের দেওয়া ঝরনা আছে। ওগুলো থাকবে, কিন্তু সুন্দর করতে হবে। ওর সামনে ছোট সুন্দর একটি মন্দির করে দিতে পার। ওটার নাম দাও এথিনার ছেলের নামে। নাম ইরেকথিয়ন[৮৪]।

'ঠিক আছে। এই ছোট্ট মন্দির নিয়ে আমার একটি প্লান আছে। অনেক দিন ধরে ভাবছি, একটি ছোট্ট ভবন বানাব যেটির খুঁটি হবে মেয়েদের মুখমণ্ডল দিয়ে।'

'কী বলছ? মানুষ মারবে নাকি?'

হেসে উঠল ফিডিয়াস। বলল, আসল মেয়ে নয়, পাথরের মেয়ে। সামনের এক একটি খুঁটি হবে এক একটি মেয়ে। খুঁটিগুলোকে আমি মেয়েদের মুখ আর শরীরের মতো করে বানাব। মনে হবে কয়েকটি সুন্দর মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাথার উপর পুরো ভবন।

পেরিক্লিস বললেন, চিন্তা ভালো, তবে খেয়াল রেখো, শিল্প বানাতে গিয়ে দালান যেন পড়ে না যায়। এরপর এই এক্রোপোলিস পাহাড়ের সদর দরজা বা প্রধান ফটক। এটি হতে হবে একেবারে চোখ ঝলসানো, দরজার নাম দাও প্রোপাইলিয়া।

ঠিক আছে, এই দরজাও আমি নিজে ডিজাইন করব। দরজা দিয়ে ঢুকেই মানুষের চোখ ঝলসে যাবে।

পেরিক্লিস বললেন, সদর দরজার সামনেই থাকবে এথিনার বিশাল এক মূর্তি। এই মূর্তির নাম দেব— এথিনা প্রোমাকোস মানে 'সম্মুখ সমরে এথিনা'। এটি ব্রোঞ্জ দিয়ে করবে। পারস্য যুদ্ধের সময় পারস্য বাহিনী যত ঢাল, বর্শা ফেলে গেছে, সব আছে সালামিনা দ্বীপে। বিশাল সেই স্তূপ। ওইসব অস্ত্র গলিয়ে মূর্তি বানাবে। যত উঁচু পার করবে।

ফিডিয়াস বলল, ঐ অস্ত্রে তো কয়েক টন ব্রোঞ্জ হবে। সেগুলো সব দিয়ে একটি মূর্তি বানালে, সেটি ত্রিশ ফুট উঁচু হয়ে যাবে। বানাতে কয়েক বছর লাগবে।

পেরিক্লিস বললেন, দেখাও তোমার কেরামতি। যত উঁচু পার কর। কয়েক বছর লাগলে লাগুক, এই পুরো কাজ শেষ হতে কয়েক বছর তো লাগবেই।

ফিডিয়াস বলল, ঠিক আছে, কালই জাহাজ পাঠিয়ে সব অস্ত্র নিয়ে আসব। 'আর ঢোকার মুখে ডান দিকের ঐ জায়গাটা। যেখানে ম্যারাথন যুদ্ধে জেতার খবর এক দৌড়ে নিয়ে এসে মারা গিয়েছিল ফিডিপিডিস, ঐ জায়গাটায় কী করা যায়।'

ফিডিয়াস বলল, ওখানে আগে বিজয়ের দেবী নাইকির একটি মূর্তি ছিল। তো ওখানে নাইকি দেবীর মন্দির আর মূর্তি করা যায়। এটির দায়িত্ব নেবে কালিক্রাটিস।

'ঠিক আছে, মোটামুটি এই হবে আমার স্বপ্নের পাহাড় এক্রোপোলিস। এখন আসল কাজ বাকি। এথিনার মন্দিরের ডিজাইন করতে হবে। কাকে যেন দায়িত্ব দেবে বললে? ছেলেটার নাম কী যেন?

'ইকটিনাস।'

পেরিক্লিস বললেন, যত তাড়াতাড়ি পার ওকে নিয়ে আসো।

পেরিক্লিস যত তাড়াতাড়ি ভেবেছিলেন, ফিডিয়াস তার চেয়েও তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। সেদিন সন্ধ্যায়ই ফিডিয়াস আবার চলে এসেছে পেরিক্লিসের বাড়ি। তার সাথে ইকটিনাস আর ক্যালিক্রাটিস। ফিডিয়াস খুবই কাবিল লোক। যাকে বলে করিৎকর্মা। সে এক বিকেলেই দুই স্থপতি ইকটিনাস আর ক্যালিক্রাটিসকে নিয়ে এক্রোপোলিস ঘুরে এসেছে। তিনজনে পার্থেননের একটি পরিকল্পনাও করে ফেলেছে। এখন পেরিক্লিসের সাথে আলাপ করবে। কেমন হবে নতুন পার্থেনন।

পেরিক্লিস বললেন, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দির হবে এটি। অলিম্পিয়া নগরে জিউসের যে মন্দির আছে, তার চেয়েও বড় করতে হবে।

ইকটিনাস বললেন, অবশ্যই।

ফিডিয়াস বলল, ঠিক কোথায় পার্থেনন করব, সেটি ঠিক করে ফেলেছি। এটি ইকটিনাস ভালো করে বুঝিয়ে বলুক।

ইকটিনাস উঠে দাঁড়াল। তার ভঙ্গি শিক্ষকের মতো। হাতে পেপিরাস কাগজ আর কলম। জীবনে এই প্রথম সে পেরিক্লিসের কাছে এসেছে। কিন্তু কোনো ভয়ডর নেই। এসেই পণ্ডিতের মতো বোঝাতে শুরু করেছে। সে পেপিরাস কাগজে লাইন টেনে টেনে বলতে শুরু করল—

ভবনের উপর সূর্যের আলো আর আমাদের চোখের অবস্থান এই দুটির মধ্যে মিল ঘটাতে আমরা গ্রিক স্থপতিরা অনেক দিন ধরেই কাজ করছি। আমরা একটি মজার জিনিস বের করেছি। আমাদের চারদিকে তিনশ ষাট ডিগ্রির একটি পেনোরামা আছে। বারো জন গ্রিক দেবতাকে এই তিনশ ষাট ডিগ্রি ভাগ করে দিলে প্রত্যেক দেবতা ত্রিশ ডিগ্রি পায়। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এই ত্রিশ ডিগ্রি হলো একটি ভবন দেখার জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থান। একজন মানুষের চোখ থেকে ঠিক ত্রিশ ডিগ্রির মধ্যে ভবনটিকে থ্রি-কোয়ার্টারে রাখতে পারলে, ঐ মানুষটি ভবনের সবচেয়ে বেশি অংশ দেখতে পায়। তো পার্থেননের জন্য আমরা ধরে নেব— দর্শক আছে সদর দরজার ঠিক মাঝখানে। সেই মাঝের বিন্দু থেকে ডান দিকে ত্রিশ ডিগ্রির মধ্যে পুরো পার্থেনন থাকবে। মানুষ যখন সদর দরজা দিয়ে ঢুকবে, তখনই 'থ্রি কোয়ার্টার ভিউ' পাবে। তাতে সে ভবনটা সবচেয়ে ভালো দেখবে এবং সৌন্দর্য বুঝতে পারবে।

পেরিক্লিস বললেন, মজার জিনিস বললে তো। বারো জন দেবতা প্রত্যেকে ত্রিশ ডিগ্রি পায়। সেজন্য ত্রিশ ডিগ্রি হলো সবচেয়ে ভালো অবস্থান তোমরা তো ধর্ম আর জ্যামিতি মিশিয়ে একবারে খিচুরি বানিয়ে দিয়েছো।

ইকটিনাস হাসি দিল। বলল, ধর্ম আর জ্যামিতির খিচুরি আরও আছে। আমাদের গুরু পিথাগোরাস বলতেন, দেবী এথিনার জ্যামিতির প্রতীক হলো সর্বসম ত্রিভুজ। একটি সর্বসম ত্রিভুজের প্রত্যেক কোণ ষাট ডিগ্রি। পিথাগোরাস বলতেন, ষাট ডিগ্রি হলো দেবী এথিনার নিজের পছন্দের কোণ। তার মতে তিনটি জিনিস নিয়ে কাজ করলে— তাদেরকে ষাট ডিগ্রি কোণে সর্বসম ত্রিভুজের তিন কোনায় বসাতে হয়। তাতে দেবী খুশি হন। আর তিনটি জিনিসই দেখতে সবচেয়ে ভালো লাগে।

পেরিক্লিস অবাক। বললেন, ডিগ্রিতে প্যাঁচ লেগে যাবে। সদর দরজার মাঝখান থেকে পার্থেনন বসাবে ঠিক ত্রিশ ডিগ্রিতে। এটি চূড়ান্ত। এরপর পিথাগোরাস বলেছেন যদি তিনটি জিনিস থাকে, তাদেরকে সর্বসম ত্রিভুজের তিন কোনায় মানে ষাট ডিগ্রিতে বসাতে। তো আমাদের সেই তিনিট জিনিস কী কী?

ইকটিনাস প্যাপিরাসে লাইন টেনে বলল, আমাদের তিনটি জিনিস হলো সদর দরজা, ডানদিকে পার্থেনন আর বামদিকে ছোট্ট ইরেকথিয়ন। এই তিনটা জিনিস নিয়ে সর্বসম ত্রিভুজে করতে পারলে, পুরো পাহাড় চমৎকার লাগবে।

পেরিক্লিস হাসি মুখে ফিডিয়াসকে বললেন, এই ছেলে তো প্রতিভার ডিব্বা। হবে, আমার এথেন্স সুন্দর হবে। এরা পারবে।

মন্দির হবে পূর্বমুখী, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। গ্রিসের সব মন্দির পূর্ব-পশ্চিমে লম্বাটে। গ্রিকরা পথ চলার জন্য দেবতা এপোলোকে অনুসরণ করে। তারা মনে করে এপোলো প্রতিদিন চার ঘোড়ার রথ টেনে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যায়। সেজন্য মন্দিরও হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে। শুধু এপোলোর নিজের মন্দির উত্তর-দক্ষিণে।

ফিডিয়াস বলল, এতক্ষণ কোথায় মন্দিরটি হবে, সেটি শুনলে। এবার আসো ভবন দেখতে কেমন হবে। এটি বলুক আরেক প্রতিভার ডিব্বা ক্যালিক্রিটাস।

ক্যালিক্রাটিস একটু লাজুক। বয়সও কম। সে মিনমিন করে শুরু করল— আমাদের আরেক দার্শনিক প্রোটাগোরাস একটি জটিল কথা বলেছেন, 'মানুষই হলো সবকিছুর মাপকাঠি'। আমরা স্থপতিরা ভবন বানাতে গিয়ে তার কথাটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছি— মানুষের শরীরই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। মানুষের শরীরের মাপে বানাতে পারলেই কোনো জিনিস সবচেয়ে সুন্দর হয়। শরীরের মাপ নিয়ে অনেক আগেই পিথাগোরাস খুবই আশ্চর্য একটি জিনিস বের করেছেন। সেটির নাম 'গোল্ডেন রেশিও' বা সোনালি অনুপাত। কোনো মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত উচ্চতাকে তার পা থেকে নাভি পর্যন্ত উচ্চতা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় গোল্ডেন রেশিও। হিসাব করলে সংখ্যাটা মোটামুটি এক দশমিক ছয়ের (১.৬২) মতো হয়। পিথাগোরাস মনে করতেন, পৃথিবীর

সবকিছু কোনো না কোনোভাবে এই অনুপাত মেনে চলে। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের চাবিকাঠি এই মাপ। এই মাপে দিয়ে বানাতে পারলেই কোনো জিনিস সবচেয়ে সুন্দর হয়। আমরাও সেটি বিশ্বাস করি। আমরা পার্থেনন বানাতে এই সোনালি অনুপাতই ব্যবহার করব।

পেরিক্লিস আবার অবাক। গ্রিক স্থাপত্য যে এমন জায়গায় চলে গেছে সেটি তার ধারণাতেই ছিল না। এরা মানুষের শরীরের মাপ দিয়ে সৌন্দর্যকে সংখ্যার মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। সেই সংখ্যা দিয়ে এরা ভবন বানায়! কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

তিনি বললেন, তো আমাদের পার্থেননের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ হবে সোনালি অনুপাতের মাপে?

ক্যালিক্রাটিস বলল, হ্যাঁ, সোনালি অনুপাতেই হবে। তবে এক দশমিক ছয় নয়, অন্য একটু মাপে। সোনালি অনুপাতের মান আরও অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন একটি হলো পাঁচের বর্গমূল, মানে দুই দশমিক দুই চারের মতো। আর একটি সোনালি অনুপাত হলো চার অনুপাত নয় (৪:৯)। আমরা আজকে এক্রোপোলিসের মাপ নিয়েছি। তাতে মনে হয়েছে পার্থেননের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের অনুপাত হবে পাঁচের বর্গমূল। একটি গোল্ডেন রেশিও। মানে প্রস্থ যতটুকু, দৈর্ঘ্য তার দুই দশমিক দুই চার গুণ। এতে মন্দির হবে লম্বাটে। আর যে লম্বা খুঁটিগুলো দেব, সেগুলোর প্রতিটি বসবে একটি সোনালি অনুপাতে।

পেরিক্লসি বললেন, বাহ, আমার তো এখনই চোখ বুজে দেখতে ইচ্ছে করছে।

ফিডিয়াস বলল, এখনও তো শেষ হয়নি। আরেকটা বড় ব্যাপার করব আমরা এই ভবনে।

পেরিক্লিস বলল, আরও বড় ব্যাপার?

ফিডিয়াস বলল, হ্যাঁ, সেটির নাম 'অপটিক্যাল রিফাইনমেন্ট'। মানে মানুষ যাতে দেয়ালের কারুকাজ মাটি থেকে বুঝতে পারে, চোখের সাথে আলোর মিল ঘটানোর জন্য আরও কিছু খুবই মজার কাজ করবে ইকটিনাস। সেটি ইকটিনাসই বলুক।

ইকটিনাস বলল, মানুষ যখন চারকোণ উঁচু কিছুর দিকে তাকায়, চোখ দুই দিকে না তাকিয়ে মাঝখানে দৃষ্টি দেয়। আবার আড়াআড়ি লম্বা কিছু দেখলে মাঝের অংশটা আমাদের চোখে একটু ঝাপসা দেখায়। এসব সমস্যা দূর করতে হবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে মাঝের সৌন্দর্য খুব ভালো করে নজরে আসে। আমরা তিনজন চিন্তা করে বের করেছি পার্থেননের প্রতি পাশে মাঝখানটা একটু উঁচু করে দেওয়া হবে। আর একটি কলামও পুরোপুরি সোজা নয়। প্রতিটি কলাম সূক্ষ্মভাবে একটু একটু বাঁকা করে দেওয়া হবে। এতে একটি পুরোপুরি খাড়া জিনিস দেখতে চোখ যে সমস্যায় পড়ে, সেটি দূর হবে।

পেরিক্লিস বললেন, আমি বুঝলাম যে উঁচু ভবন হলেও, মানুষের পার্থেননের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে, চোখ আলোর ঝামেলায় পড়বে না। কিন্তু তোমরা যে বলছো

খুঁটিগুলো একটু বাঁকা করে দেবে, মাঝে একটু উঁচু থাকবে, এগুলো মুখের কথায় বোঝা যাচ্ছে না। আমার মডেল দরকার। শোনো আমাকে দুটি জিনিস দাও। পুরো নকশার একটি বই আর পার্থেননের একটি মডেল। তাতে মনে হয় পুরোটা বুঝতে পারব।

দুই সপ্তাহ দিন-রাত খাটলো তিন শিল্পী। ইকটিনাস ডিজাইনের উপর একটি বই লিখে ফেলল। আর ক্যালিক্রাটিস বানালো পার্থেননের মডেল। ফিডিয়াস সবকাজ দেখাশুনা করলেন। মডেল আর নকশা দুটোই পছন্দ করলেন পেরিক্লিস। এখন কাজ শুরু করা যায়।

শুরু হলো কাজ। সবকিছুই হবে পাথর দিয়ে। ম্যারাথনের দক্ষিণ-পশ্চিমে পেনতিলিস[৮৫] নামে একটি পাহাড় আছে। এক্রোপোলিস থেকে পনের মাইল দূরে, পেনিতিলিস পাহাড়ের পাথর সবচেয়ে সুন্দর। ভবন কিংবা ভাস্কর্য সব কাজেই এই পাহাড়ের সাদা পাথর অতুলনীয়।

শুরু হলো কাজ। সারা এথেন্স জুড়ে দিন-রাত পাথর কাটার শব্দ। কয়েক হাজার মানুষ কাজ করছে। এদের অনেকেই দাস। তবে সবাই দাস নয়। অনেক ব্যবসায়ী, ঠিকাদার কাজ পেয়েছে, তারা লোক লাগাচ্ছে। অনেক গরিব মানুষ অন্য কাজ বাদ দিয়ে রাজমিস্ত্রি হয়ে গেছে। পাহাড় কেটে পাথর বের করছে, বিশাল বিশাল পাথরের টুকরা আসছে ফিডিয়াসের কারখানায়। সেখানে সমান করে কাটা হচ্ছে। এক চুল এদিক সেদিক হলেই সেই টুকরা দিয়ে আর কাজ হবে না। সমান করা পাথর বিশাল ক্রেন দিয়ে উঠানো হচ্ছে এক্রোপোলিসের উপর। সেখানে পাথরের উপর পাথর বসে তৈরি হচ্ছে দেবী এথিনার মন্দির। নাম পার্থেনন মানে কুমারী দেবীর মন্দির।

ফিডিয়াস বলে, ভবন নয়, মন্দির নয়, এক্রোপলিসের উপরে একটি মহাকাব্য লিখছে এথেন্সের পাথর শিল্পীরা।

***

লোকটার গলায় তিন-চারটি মালা।

সবগুলোই অনেক দামি। একেবারে রত্নখচিত। দুই হাতের দশ আঙুলে এতগুলো সোনার আংটি যে গণনা করা যাচ্ছে না। পেরিক্লিস বারোটা পর্যন্ত গুনতে পেরেছেন। আরও দুই-একটি আংটি আঙুলের ফাঁকে থাকতে পারে। এই গরমের দিনে তার গায়ে রুপালি শীতবস্ত্র, তাতে হলুদ আর কমলা সুতার নকশা।

পেরিক্লিস লোকটার দিকে যতবার তাকাচ্ছেন, ততবার তার হাসি পাচ্ছে। জোর করে হাসি আটকে রেখেছেন। বেশিক্ষণ পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এই রকম মানুষ এথেন্সে আছে, সেটি পেরিক্লিসের জানা ছিল না। জানা ছিল আসপাশিয়ার। কারণ লোকটি

আসপাশিয়ার দেশের লোক। তার বাড়িও সাগরের ওপাড়ে মিলেটাস শহরে। আসপাশিয়াই তাকে খবর দিয়ে এনেছে। তাকে একটি রাস্তার নকশা করার দায়িত্ব দিয়েছে আসপাশিয়া। সেই নকশা নিয়ে পেরিক্লিসের কাছে এসেছে লোকটি

লোকটির নাম হিপোডেমাস[৮৬]।

সে এই মুহূর্তে পেরিক্লিসের বাড়ির বারান্দায় বসে আছে। তার সামনে পেরিক্লিস, আসপাশিয়া আর ফিডিয়াস। সে নকশাটি পেরিক্লিসের হাতে দিল। পেরিক্লিস হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন নকশার দিকে তাকালেই হবে, লোকটির দিকে আর তাকাতে হবে না। এই লোক যে ভালো কিছু করতে পারে, সেটি তার বিশ্বাস হয় না। তবে নকশায় তাকিয়ে থাকলে অন্তত হাসিটা বন্ধ থাকবে। হাসি বন্ধ করার জন্য পেরিক্লিস খুব মনোযোগ দিয়ে নকশার দিকে তাকালেন।

কিন্তু নকশার কিছু বুঝতে পারছেন না পেরিক্লিস। তিনি জ্যামিতি ভালোই বোঝেন। আর কিছুদিন ধরে তিনি আর্কিটেক্টদের সাথেই আছেন, নানান নকশা দেখছেন। তিনি এখন মোটামুটি নকশা বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এই নকশা ঐরকম নয়। একেবারে আলাদা। কেমন দাগ টেনে টেনে প্লটে প্লটে ভাগ করা, নানান সংকেত দিয়ে এঁকেছেন।

তিনি ফিডিয়াসের দিকে তাকালেন। সেও ভালো বুঝতে পারছে না। এরকম করে নকশা তারা করে না। পেরিক্লিস ভাবছেন, এই উড়াধুরা পোশাকের লোক না বুঝে হিজিবিজি এঁকেছে। শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে।

হিপোডেমাস ভরাট গলায় বলল, আপনারা মনে হয় এরকম নকশা আগে দেখেননি। শুধু আপনারা কেন, এরকম নকশা আগে কেউই দেখেনি। দেখবে কী করে— এটি নতুন ধরনের এক নকশা। আমার বানানো। এরকম কাজ আর কেউ করতে পারে না।

তার গলার স্বরে অহংকার। এতক্ষণ পেরিক্লিস তাকে ভেবেছিলেন পাগল। এখন মনে হচ্ছে অহংকারী পাগল।

হিপোডেমাস বলল, এটি এই শহরের নকশা।

'মানে?'

'মানে আগোরা থেকে শুরু করে একেবারে পিরাউস বন্দর পর্যন্ত পুরো শহরের নকশা। এগুলো হলো প্লট। এই যে বড় লাইনটানা এগুলো হলো রাস্তা। এখানে বাড়ি, জলপাই বাগান, মন্দির সবকিছু দেখিয়ে দেওয়া আছে।'

পেরিক্লিস আর ফিডিয়াস বোঝার চেষ্টা করছেন পাগলটা বলছে কী! হিপোডেমাস আবার বলল, সেদিন আমার দেশের মেয়ে আসপাশিয়া আমাকে ডেকে বলল, আগোরার ভেতর থেকে একটি বিশাল রাস্তা করতে হবে। তারপর কথায় কথায় বলে ফেলল যে, আপনি নাকি পিরাউস বন্দরও নতুন করে করবেন। সব শুনে আমি ভাবলাম— আমি পুরোটার ডিজাইন করে ফেলি। নতুন রকমের ডিজাইন বুঝতে কষ্ট হবে। আমার কাছে দেন। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

হেপোডেমাস মেঝেতে নকশাটা ফেলে হাঁটু গেড়ে বসল। নকশা বুঝাতে শুরু করল, ‘এই যে এখানে একটি রাস্তা আরেকটা রাস্তাকে পার হয়েছে। ভালো শহর তখনই হবে, যখন রাস্তা হবে একেবারে সোজা, কোনোরকম বাঁকাতেড়া থাকবে না। দুটি রাস্তার সোজাসুজি একে অন্যকে পার হবে। একেবারে নব্বই ডিগ্রি। এই ব্যবস্থার নাম গ্রিড। আমি গ্রিডের মাধ্যমে সারা শহরের নকশা করেছি। এথেন্সে অনেক পাহাড়, তাই জায়গায় জায়গায় এরকম বাঁক, কিচ্ছু করার নেই। সোজা রাস্তার দুই পাশে যদি দোকান হয়, মানুষের বসতি হয়, তাহলে যোগাযোগ সুবিধা হয়, পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়।’

পেরিক্লিস বললেন, এই বড়টাই তো আগোরার ভেতর থেকে প্রধান রাস্তা?

‘হুঁম, এটিই আপনার স্বপ্নের সেই রাস্তা। এথেন্স শহরের প্রধান রাস্তা। এটি দিয়েই এক্রোপোলিস থেকে আগোরা হয়ে বড় বড় শোভাযাত্রা সারা শহর ঘুরবে। সব অনুষ্ঠানের রাস্তা হবে এটি। এটি চলে গেছে একেবারে সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত। আর এখানে পুরো পিরাউস বন্দরের নতুন নকশা।’

পেরিক্লিস এবার ভালো করে তাকালেন লোকটার দিকে। এখনও লোকটাকে পাগলই মনে হচ্ছে। তবে গুণী পাগল। এথেন্সে গুণী পাগল অনেক আছে। আর একটি বাড়ল।

ফিডিয়াস এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার বলল, এরকম শহরের নকশা ইউরোপে কেউ করেছে?

হিপোডেমাস বলল, না, ইউরোপে আমি দেখিনি। তবে দূরে ব্যাবিলনে নাকি আছে, ভারতের কোথায় কোথায় নাকি আছে। সেগুলো কেমন জানি না। আমি যেটি করেছি, সেটি আলাদা। এই কাজে আমিই প্রথম।

আসপাশিয়া বলল, তাহলে আপনাকে কী বলা যায়? আমাদের প্রথম নগর পরিকল্পনাবিদ।

হিপোডেমাস হাসল। অহংকারের হাসি।

পেরিক্লিস বললেন, আপনার এই সুন্দর পোশাক নকশা করে কে?

‘আমি নিজেই করি।’

পেরিক্লিস বললেন, আমিও সেটিই ভেবেছি। আপনার শহরের নকশা আমি নেব। আপনার ডিজাইন করা পোশাক দেখে যেমন আপনার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, আমি চাই তেমনই সবাই যেন আমার এথেন্স থেকে চোখ ফেরাতে না পারে। কিছু জিনিস আছে, যেগুলো বদলাতে হবে। আপনি এই নকশায় তিন শ্রেণির মানুষের জন্য মানুষের জন্য তিন ধরনের জায়গা ঠিক করেছেন। সৈনিক, শ্রমিক আর কৃষিজীবীদের জন্য আলাদা আলাদা মহল্লা। এসব এথেন্সে চলবে না। এথেন্স গণতন্ত্র। এখানে মানুষের শ্রেণিভাগ নেই। সবাই সমান। আপনি ফিডিয়াসের সাথে আলাপ করে বাকিটা ঠিক করে নেবেন। কোথায় কী থাকবে সেটি ফিডিয়াস জানে, সেভাবে আপনার গ্রিডে ফেলুন।

হিপোডেমাস বিদায় নিল। ভাবটা এমন যেন সে জানত, তার ডিজাইন পছন্দ হবেই।

হিপোডেমাস বের হতেই পেরিক্লিস উচ্চ স্বরে হাসতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে তিনি হাসি চেপে রেখেছিলেন, এখন সব একসাথে বের হচ্ছে। হাসি আর কাশি দুটোই ভীষণ সংক্রামক। পেরিক্লিসের সাথে এখন সবাই হাসছে।

হাসতে হাসতে আসপাশিয়া বলল, লোকটাকে দেখে এমন কেউ নেই যে না হেসে পারবে, তবে লোকটা গুণী, তোমার কাজে আসবে।

ফিডিয়াস একটু পিন দিয়ে বলল, নিজের এলাকার লোক বলে কথা! আসপাশিয়া ক্ষেপে উঠে বলল, আমার শহর মিলেটাস কি তোমাদের কম দিয়েছে? মিলেটাসে জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের জনক মহান থেলিস। তার শিষ্যরা। এখন মিলেটাস তোমাদের দিল আরেক গুণীলোক প্রথম নগর পরিকল্পনাবিদ হিপোডেমাস।

পেরিক্লিস বলল, তুমি তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামটাই বললে না। মিলেটাস আমাকে দিয়েছে পৃথিবীর সেরা নারী, তার নাম আসপাশিয়া।

আসপাশিয়া লজ্জা পেয়ে ফিডিয়াসের দিকে তাকাল। পেরিক্লিসের লজ্জাশরম নেই। বাইরের লোকের সামনেই যা খুশি বলে ফেলেন।

হিপোডেমাস চলে যাওয়ার পরে এলো ক্যালিক্রাটিস।

তাকে দেখে ফিডিয়াস অবাক। তার তো এখানে আসার কথা নয়। পার্থেননের কোনো কাজ নিয়ে ঝামেলা হয়নি তো!

ক্যালিক্রাটিস একটি নকশা বের করল। এথেন্সের চারপাশে একটি উঁচু দেয়ালের নকশা।

পেরিক্লিস এথেন্সের চারপাশ ঘিরে একটি বিশাল দেয়াল বানাবেন। কেউ যেন হঠাৎ আক্রমণ করে এই নগরে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। শত্রু মোকাবেলার আগাম ব্যবস্থা করে রাখতে চান তিনি।

এই মুহূর্তে এথেন্সে শান্তির সময় চলছে। সেই পারস্য যুদ্ধের পরে আর তেমন বড় যুদ্ধ হয়নি। তবে পেরিক্লিস জানেন এই শান্তি চিরস্থায়ী নয়। আছে তাদের চিরশত্রু স্পার্টা। যেকোনো সময় স্পার্টা আক্রমণ করতে পারে এথেন্সকে। স্পার্টানরা ভয়ংকর যোদ্ধা। তাদের সাথে সামনা-সামনি পারা যাবে না। তাই দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি থাকতে হবে। তাই পেরিক্লিস দেয়াল বানাচ্ছেন।

এই দেয়াল আগোরা, এক্রোপোলিসসহ এথেন্সের মূল ভূখণ্ড ঘিরে একেবারে এজিয়ান সাগরে পিরাউস বন্দর পর্যন্ত। বন্দরে আছে এথেন্সের শক্তিশালী নৌবাহিনী। তারা নগরকে রক্ষা করতে পারবে।

এই দেয়াল নকশা করেছে ক্যালিক্রাটিস। শীঘ্রই দেয়ালের কাজ শুরু হবে। কিছুদিনের মধ্যেই হিপোডেমাস পুরো আগোরার একটি নকশা করে ফেলল। শুরু হলো কাজ। ফিডিয়াস সব দেখাশুনা করে। হিপোডেমাসের নকশায় আগোরা আর পিরাউস বন্দরের কাজ চলতে লাগল। আর এই দুটিকে সংযোগ করে হচ্ছে বিশাল রাস্তা।

হিপোডেমাস প্রতিদিন আগোরায় কাজ দেখতে আসেন। তার পরনে সেই ঝলমলে পোশাক। সেই ঝলমলে অলংকার। তাকে দূর থেকে এক নজরেই সবাই চেনে। ঝলমলে পোশাকের গুণ আছে। সবাই এক বাক্যে জানে যে— এই নতুন আগোরার রাস্তা ডিজাইন করেছে হিপোডেমাস। সেজন্য এই রাস্তাকে অনেকে বলে হিপোডেমিয়া বা হিপোডেমিয়াসের রাস্তা।

সারা এথেন্সে শত শত কিছু তৈরি হচ্ছে।

পেরিক্লিস বলছেন, কাজ আগাতে হবে। এক জীবনে কত কাজ করা যায়, সেটি দেখিয়ে দিতে হবে।

এক্রোপোলিসের উপর কাজ চলছে, এত দ্রুত যে কাজ হতে পারে, সেটি কেউ কল্পনাও করেনি। পেরিক্লিস পাগলের মতো কাজ করছেন। ফিডিয়াস রাত-দিন পাথর ঘষছেন।

পার্থেননের কাজ অনেকটাই হয়ে গেছে। চারদিকের দেয়াল পর্যন্ত হয়ে গেছে। এখন পেরিক্লিস আর ফিডিয়াস আলাপ করতে বসেছে— মন্দিরের ভেতরে কী থাকবে আর বাইরের দেয়ালে কী ভাস্কর্য হবে সেটি নিয়ে।

পেরিক্লিস বললেন, আমাদের কাছে ডিলিয়ান জোটের অনেক স্বর্ণ আছে। স্বর্ণ দিয়ে কী করা যায়?

আসপাশিয়া বলল, স্বর্ণ দিয়ে এথিনার একটি মূর্তি বানিয়ে ফেলো। সেটিই হবে এথেন্সের ব্যাংক। যদি কোনোদিন দরকার হয়, স্বর্ণ গলিয়ে নিয়ে নেওয়া যাবে।

ফিডিয়াস বলল, উত্তম প্রস্তাব।

পেরিক্লিস বললেন, সোনার পরিমাণ কত, সেটি তোমাদের ধারণাও নেই। তাহলে আর এই কথা বলতে না। গতকালের হিসাব অনুযায়ী স্বর্ণ আছে চুয়াল্লিশ ট্যালেন্ট।

চুয়াল্লিশ ট্যালেন্ট মানে এগারো শত কেজি স্বর্ণ।

শুনে আসপাশিয়ার মুখ হা হয়ে গেল। সে বলল, এত স্বর্ণ! তাহলে কয়েকটা মূর্তি করতে পার।

ফিডিয়াস বলল, পেরিক্লিসের সাথে থেকে আমি বড় বড় চিন্তা করতে শিখে গেছি। আমি সব স্বর্ণ আর আইভরি দিয়ে একটি মূর্তিই বানাব। সেটিই হবে পার্থেননের প্রধান মূর্তি। সেই মূর্তির নাম 'এথিনা পার্থেনস'[৮৭] বা কুমারী এথিনা। যুগে যুগেই জ্ঞানের দেবীরা কুমারী হন।

পেরিক্লিস ফিডিয়াসের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে কি সত্যিই একা এত কিছু করতে পারবে?

পেরিক্লিস বললেন, ঠিক আছে, একটি মডেল বানাও।

ফিডিয়াস একটি পেপিরাস কাগজে কী যেন হিসাব করল। কিছুক্ষণ আঁকিবুকি করে বলল, আমার হিসাবে ঐ পরিমাণ সোনা দিয়ে মূর্তি বানালে সেটি ছত্রিশ ফুটের কম হবে

না।

পেরিক্লিস বললেন, ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা কর। আর এই মূর্তি এমন হবে যেন, এই মাত্র দেবী এথিনা যুদ্ধ জিতেছে। এক হাতে দাও বিজয়ের দেবী নাইকি। অন্য হাতে দাও একটি ঢাল।

ফিডিয়াস বলল, আচ্ছা, এথেন্সে তো এখন কাপড় ছাড়া মূর্তি হয়। তো এথিনার মূর্তি কি কাপড় বাদ দিয়ে করা যায়?

পেরিক্লিস বুঝলেন, ফিডিয়াস নিশ্চয়ই আজ নেশা করেছে। না হলে দেবী এথিনাকে নিয়ে এমন কথা বলার কথা নয়।

পেরিক্লিস বললেন, ছিঃ ছিঃ এসব বোলো না। এথেন্সের মানুষ এসব সইবে না। এসব উড়া-ধুরা আলাপ বাদ দাও। কাজে লাগো। এথিনাকে পোশাক পরিয়ে দিও।

ফিডিয়াস বলল, তাহলে এথিনার মূর্তিতে এমন কারুকাজে পোশাক দেব যেন কাপড় আছে না নেই, সেটি বুঝতেই মানুষকে অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। তাহলেই সেটি অসাধারণ শিল্প হবে। জ্ঞানীরা যখন কিছু বোঝে না, তখন তার দিকে তাকিয়ে বলে— আহা, কত ভালো! তাই আধা-আধি কোরো। মানুষকে দোটানায় ফেলে দিতে হবে। মানুষ ভাববে— শিল্পী ফিডিয়াস কত খারাপ– দেবীকে কাপড় দেয়নি। আবার ভালো করে তাকিয়ে দেখবে — না, কাপড় তো দিয়েছে। তখন বলবে আহা, কাপড় দিয়েই ফেলল!

আসপাশিয়া বলল, এসব আলাপ বাদ দাও। ভদ্র মনে এথিনার মূর্তির কাজ শুরু করো।

ফিডিয়াস বলল, ঠিক আছে। দেবীর আলাপ বাদ। এবার আসি পার্থেননের দেয়ালে কী মূর্তি বানাব। আমি একটি ডিজাইন করে এনেছি।

সে বেশ কয়েকটা প্যাপিরাস টুকরা বের করল। একটি একটি করে দেখাচ্ছে সে। সে দেখাচ্ছে পার্থেননের কোথায় কোন ভাস্কর্য হবে।

পূর্ব দিকে একেবারে সামনের দেয়ালে হবে এথিনার জন্ম-দৃশ্য। এই দৃশ্যে জিউসের মাথা থেকে বেরিয়ে এলেন জ্ঞানের দেবী এথিনা। তার জন্মই হলো পূর্ণ যুবতি হয়ে, হাতে অস্ত্র, মাথা ভরা জ্ঞান। বামের দেয়ালে এক পাশে সূর্যের রথের ঘোড়াগুলো টগবগ করে ছুটছে, অন্য পাশে চাঁদ দেবী অস্ত যাচ্ছে, তার রথের ঘোড়া সারা রাত চলে ক্লান্ত, ঘোড়ার মুখ অবসন্ন। পশ্চিমের বাইরের দেয়ালে এথিনা আর পোসাইডনের যুদ্ধ। আর উত্তর দিকের দেয়ালের উপর দিকে সাতটা ঘোড়ার একটি বাহিনী। ঘোড়া ছুটিয়ে যোদ্ধা যাচ্ছে।

বাইরের কলামের ভেতরে মূল মন্দির। ভেতরে মূল মন্দিরের বাইরের দেয়ালের চারদিকে দিবে প্যান-এথেনিক শোভাযাত্রার ছবি। এথিনার জন্মদিনে সবাই শোভাযাত্রা করে। পাঁচ দিন ধরে চলে সেই মিছিল। সারা এথেন্স ঘুরে এখানে এসে শেষ হয় সেই শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রার ছবি হবে দেয়ালের চারদিক জুড়ে।

পরদিন সকালেই দেখা গেল ফিডিয়াস পাথরে ছুরি নিয়ে পার্থেননের দেয়াল খুঁড়ছে। ভাস্কর্য বানানো শুরু করেছে। এমন জিনিস পৃথিবীতে হতে পারে, সেটিই কেউ চিন্তা করেনি। কোনো ভাস্কর্যই পাঁচ সেমি-এর বেশি পুরো নয়। দেয়ালে এমন করে ভাস্কর্য করা যায়, এটি কেউ ভাবতেই পারেনি। আসলে পাথরের উপর কবিতা লিখছে ফিডিয়াস।

পাথর দিয়ে যে এমন সুন্দর কবিতা লেখা যায় ফিডিয়াসই সবার আগে করে দেখিয়েছে। পাথর দিয়ে এমন চমৎকার কবিতা আর কোথাও নেই।

***

৮৩. ইকটিনাস (Iktinos) ও কালিক্রাটিস (Callicrates) পার্থেননের মূল স্ট্রাকচার নকশা করেন।

৮৪. ইরেকথিয়ন (Erechtheion) নামে এই সুন্দর ভবনটি পার্থেননের ঠিক উল্টো দিকে এখনও আছে।

৮৫. পেনিতিলিস (Penteli) পাহাড়ের সাদা পাথর দিয়ে পার্থেনন নির্মাণ করা হয়েছে।

৮৬. Hippodamian Plan (grid plan) এর উদ্ভাবক হিপোডেমাস, অনেকে তাকে ইউরোপের নগর পরিকল্পনা শাস্ত্রের জনক বলেন।

৮৭. স্বর্ণ আর আইভরি দিয়ে তৈরি এথিনা পার্থেনস (Athena Parthenos) ছিল পৃথিবীর সর্বকালের সবচেয়ে সুন্দর ভাস্কর্যের একটি। যুক্তরাষ্ট্রের Nashville এর Centennial Park এ এই মূর্তির একটি প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছে।

৩০

‘মানুষ হলো সেই জীব,
যে সারা জীবন শুধু জীবনের অর্থ খুঁজে যায়।’
—প্লেটো

সিমন বই লিখেছে।

সে অনেক দিন ধরে নোট রাখছে। সক্রেটিস তার দোকানে বসে যার সাথে যা বলত সেটি সে সাথে সাথে টুকে ফেলত। সেই টোকাটুকি একত্র করে নাকি সিমন বই লিখে ফেলেছে। নানান বিষয়ে সক্রেটিস কী বলছে সেগুলো গুছিয়ে নাটকের মতো লিখে ফেলেছে।

তার বইয়ের মূল চরিত্র সক্রেটিস।

সেই সাথে আরও একটি বা দুটি চরিত্র আছে। তারাও সক্রেটিসের বন্ধু। কোনো বইয়ের চরিত্র ক্রিতো, কোনোটির চেরোফোন, আবার কোনোটিতে সিমন নিজেই চরিত্র। বন্ধুরা হেসে কুটিকুটি। তারা নিজেরা সবাই বইয়ের চরিত্র হয়ে গেছে+বইতে সক্রেটিস কথা বলছে তাদের সাথে। নানা বিষয়ে কথা।

কথাবার্তার বই। সেজন্য এই বইকে তারা বলে ডায়ালগ বা সংলাপ। নাটকের ডায়ালগ নয়। দর্শনের ডায়ালগ। খুব কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে আলাপ। মূল চরিত্র যেহেতু সক্রেটিস, সেজন্য সবাই এই বইকে বলছে সক্রেটিক ডায়ালগ বা সক্রেটিসের সংলাপ।

সিমন সক্রেটিসের ত্রিশটা সংলাপ লিখেছে। খুব ছোট ছোট সংলাপ। এক একটি কয়েক লাইন মাত্র। মনে হয় দোকানে বসে ব্যবসার পাশাপাশি এর চেয়ে বড় কিছু লিখতে পারেনি। শুধু সার অংশটুকু লিখেছে। ত্রিশটি সংলাপ মাত্র দুইটি বড় প্যাপিরাস কাগজে এঁটে গেছে। এই ছোট ছোট সংলাপের আবার নামও আছে। নামগুলোও চটকদার। যেমন সৌন্দর্য কী, জ্ঞান কী, দেবতা প্রসঙ্গে, ভালোবাসা বিষয়ে ইত্যাদি। সিমন একটি ছুপা রুস্তম। সে বইয়ের কথা কাউকে বলেনি। নিজে নিজে লিখে ফেলেছে। কেউ জানতই না যে তার হাতে লেখা আছে।

সিমনের বই দেখে সক্রেটিস খুবই খুশি। এই প্রথম তাকে নিয়ে বই লিখেছে কেউ। সক্রেটিস ভাবছে, আমি কী? ফিলোসফার নাকি সফিস্ট? নাকি অন্য কিছু? দার্শনিকরা অনেকেই নিজে বই লেখে। আর আমার কথা নিয়ে বই লিখছে অন্যজন। পৃথিবীতে কতই না আজব ঘটনা ঘটে। সিমনের জুতার দোকান। মানুষ তাকে বলে মুচি। অথচ সেই মুচির কলমের মাধ্যমেই প্রথমে মানুষের কাছে গেল সক্রেটিসের কথা।

সক্রেটিস বলল, তুমি লিখেছ, আমি খুবই খুশি, তোমাকে বুকভরা অভিনন্দন। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে যেসব কথা বসিয়েছ, সব তো সঠিক নয়।

সিমন বলল, তুমি নিজে না লিখলে, তোমার কথা হুবহু কীভাবে হবে? আমি যা বুঝেছি লিখেছি। সৎভাবেই লিখেছি। ভুল হলে সেই দায় আমার।

সক্রেটিসের সংলাপ খুব ভালো চলছে বাজারে। দোকানদার রোজ খবর দিয়ে বলে যে আরও কিছু নতুন বই কপি করেছে। সক্রেটিসের নামের মূল্য আছে। মানুষ কিনছে। যারা সক্রেটিসকে গালি দেয়, তারাই বেশি কিনছে। গোপনে গোপনে কিনছে।

এই বই যাতে সবার কাছে পৌঁছে যায়, চেরোফোন তার ব্যবস্থা করেছে। এথেন্সের বাইরেও পৌঁছে দিচ্ছে সক্রেটিসের সংলাপ। সে ভাবছে, লিখে ফেলায় ভালো হয়েছে। মানুষ সক্রেটিসকে জানতে পারছে। এতে তার শত্রু কমবে।

সিমনের বই উপলক্ষে সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছে ক্রিতো। তার বাড়িতে উৎসব। সেখানে আর একটি বড় কাণ্ড হলো। জানা গেল ক্রিতোও নাকি বই লিখেছে। সেও সক্রেটিসের সংলাপ লিখেছে। তাছাড়া নিজের বইও লিখেছে।

সক্রেটিস বলল, বাহ, আমার কত সৌভাগ্য! আমি ছাড়া আমার সব বন্ধু লেখক। সবাই কলমবাজ।

ক্রিতো বলল, একমাত্র তুমি হলে কথাবাজ।

সক্রেটিস বলল, চাপাবাজও বলতে পার। আমি রাগ করব না।

একটি নতুন ফ্যাশান চালু হয়ে গেল। সক্রেটিসের সব বন্ধু তার নামে বই লিখছে। যেই সক্রেটিসের সাথে মিশেছে, সেই একটি সক্রেটিক ডায়ালগ লিখে ফেলছে। অমর হওয়ার কোনো তাড়না সক্রেটিসের ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছে বন্ধুরা তাকে জোর করেই অমর করে ছাড়বে।

সিমন আর ক্রিতোর বই সক্রেটিস দিল আসপাশিয়াকে। পেরিক্লিস খুব পছন্দ করলেন সিমনের লেখা। তিনি সিমনকে ডেকে পাঠালেন।

পেরিক্লিস সিমনকে বলছেন, তুমি অসাধারণ প্রতিভাবান একজন মানুষ। জুতা তৈরির জন্য তোমার জন্ম হয়নি। তোমার আরও কাজ আছে। তুমি আমার সাথে এসে থাকো। এই বাড়িতে থাকবে।

সিমন বলল, অনেক ধন্যবাদ। আমি স্বাধীন মানুষ। নিজেই ভালো আছি। আমি আপনার কাছে এসে থাকতে পারব না। সোনার খাঁচা আমার জন্য নয়। আমি বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো পাখি। খাঁচায় বন্দি হলে পোষাবে না।

আসপাশিয়া ভাবছে এথেন্সে এক নতুন ধরনের দার্শনিক দল তৈরি হয়েছে। এরা ত্যাগী, ভোগী নয়।

সিমন একেবারে খাঁটি সক্রেটিস ভক্ত মানুষ। সে তার জীবনে সক্রেটিসের দর্শন প্রয়োগ করেছে। সে দুটো জিনিস চায়—

প্রথমত, সে নিজে মুক্ত বা স্বাধীন থাকবে। সে কারও অধীনে থাকবে না, এমনকি এথেন্সের সবচেয়ে বড় নেতা পেরিক্লিসের বাড়িতেও নয়। সে গরিব, তবু তার জীবিকা স্বাধীন। সে কারও কাছে বিক্রি হয় না। কারও দয়া নেয় না। দ্বিতীয়ত, সে কথা বলার স্বাধীনতা চায়। সে তার ছোট্ট জুতার দোকানে বসে যা ইচ্ছা তাই বলে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

এই দুটোই সিমন শিখেছে সক্রেটিসের কাছ থেকে। সে তার জীবনে সক্রেটিসকে চর্চা করে। সুন্দর জীবনের চর্চা করে। ন্যায়ের চর্চা করে। আসপাশিয়া বুঝল, সিমনরা বিক্রি হয় না। কারও কাছে মাথা নোয়ায় না।

আসপাশিয়া এই প্রথম এক নতুন ধরনের জ্ঞান দেখতে পেল। সক্রেটিস নতুন এক সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলেছে। মানুষ তাকে অনুসরণ করছে। তার সুন্দর জীবন অনেককে আকর্ষণ করছে। অনেক মানুষই সেটির চর্চা করছে। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য নয়, কোনো পদের জন্য নয়— সক্রেটিসের জীবনের ধরনটা মানুষকে টানছে। এথেন্সের এই নতুন দার্শনিকদের কথা মানুষ বেশি জানে না। নেতারাও জানেন না। হেরোডোটাস এথেন্স নিয়ে বই লিখছে। তার বইতে নেতাদের কথা থাকবে। রাজাদের কথা থাকবে, দেবতাদের কথা থাকবে। কিন্তু এই যে এথেন্সের রাস্তার একদল তরুণ সুন্দর জীবনের খোঁজ করছে— এই কথা হেরোডোটাস জানবে না। তাই কোনো ইতিহাস বইতে এদের কথা লেখা হবে না।

পর পর কয়েকটি ঘটনায় সক্রেটিসের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। সে যে খুব বেশি জ্ঞানী, এটি সে নিজে আগে মনে করত না। ডেলফির ওরাকলের কথাও সে প্রথমে বিশ্বাস করেনি। পরে নানান প্রশ্ন করে দেখেছে যে, যাদের জ্ঞানী বলা হয়, তারা শুধু শুধু জ্ঞানের বড়াই করে। তাদের চেয়ে সক্রেটিস আসলেই বেশি জানে। তারপর সক্রেটিসের মুখের কথা নিয়ে সিমনের বই লিখেছে। সেই বই মানুষ পছন্দ করেছে। গরম ভাঁপা পিঠার মতো বিক্রি হয়েছে সেই বই। সক্রেটিস বুঝেছে মানুষ তার কথা পছন্দ করে।

আগে বুড়োরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত, তার কথা হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু সেই কথা যখন কলমের মধ্য দিয়ে এসেছে, তখন মানুষ বুঝেছে সেই সহজ কথাগুলোর অর্থ কতো বিশাল! তার কথা জীবনকে ব্যাখ্যা করে। তার কথা জীবনকে সুন্দর করার উপায় বলে। অল্প কিছু দিনে সক্রেটিসের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। সে এখন আর ভয় পায় না। সে এখন প্রতিটি বিষয়ে নতুন নতুন মতামত দিচ্ছে। তার কথায় সৃষ্টি হচ্ছে জ্ঞান। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সে কাঁপছে।

আগে সে ছিল আলোকিত নগর এথেন্সের একজন আলোকিত মানুষ। এখন সে নিজেকে মনে করে আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর। তার হাতে তৈরি হবে শত শত আলোকিত মানুষ। সে শিশু, বুড়ো, ছাত্র, বন্ধু, ছেলে, ছেলের বাবা, ছেলের দাদা সবাইকে সুন্দর জীবন যাপন করতে বলছে। ন্যায় আর সুন্দরের একটি মিষ্টি আন্দোলন চলছে।

সক্রেটিস মিষ্টি কথায় তরুণদের ডাকছে। সে এথেন্সের বাঁশিওয়ালা। তার সুরে যে তরুণরা ছুটে আসছে, তারা ভাগ্যবান। যারা আসতে পারছে না, তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই।

***

ক্রিতোর মন খুব খারাপ। তার এক ব্যবসার অংশীদার তার সাথে প্রতারণা করেছে। সেই লোকের নাম আরিস। সে তার অনেক ক্ষতি করেছে। ক্রিতো রাগে জ্বলছে।

ক্রিতো বলল, আমি কালই ওকে পথে বসাব। ও আমাকে চেনে না। ও আমার কী ক্ষতি করছে, আমি তার চেয়ে চারগুণ ফেরত দেব।

সক্রেটিস বলল, কেউ তোমার সাথে খারাপ করলেও, তার সাথে খারাপ কিছু করা উচিত নয়।

ক্রিতোর মেজাজ গরম হয়ে গেল। সে বলল, কেন? ও ইচ্ছে করে আমার লোকসান করেছে। ওকে শিক্ষা দেবই। ও, এখনও জানে না ক্রিতো কী জিনিস!

সক্রেটিস বলল, এবার ঠিক বলেছ। ও জানে না। ও সত্যি জানে না যে— কারও ক্ষতি করা খারাপ। ওর সেই জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলে সে করত না। জ্ঞান থাকলে কেউ খারাপ হয় না।

ক্রিতো রেগে বলল, 'আমি বলছি, ও ইচ্ছে করে আমার ক্ষতি করছে। আর তুমি বলছ, তার জ্ঞান নেই? সে জানে না?

'হ্যাঁ, যেটি জানা দরকার, সে সেটি জানে না। ঐ লোক জানে, কী করলে তোমার ক্ষতি হবে, সেটি জেনেই তোমার ক্ষতি করেছে। কিন্তু জানে না যে, মানুষের ক্ষতি করা অন্যায়। ও হয়তো কথাটা শুনেছে কিন্তু সত্যিকারভাবে বোঝেনি, মন থেকে মানেনি। তার মানে সে অজ্ঞান। ভালো-মন্দের সত্যিকার জ্ঞান থাকলে সে খারাপ কাজ করতে পারত না। মানুষ স্বভাবত ভালো চরিত্রের। কেউ নিজে থেকে খারাপ হয় না। মানুষ খারাপ কাজ করে কারণ সে সত্যিকার বিষয়টা জানে না।'

ক্রিতো বলল, আমি তোমার সব কথা মানি। কিন্তু এটি মানব না। এটি বাস্তব নয়। এসব কথা মুখে বলা যায়, কিন্তু কাজে করা যায় না। একজন ইচ্ছা করে আমার এত বড় ক্ষতি করল, তারে আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব?

'হুঁম, ছেড়ে দেবে। কারণ তুমি সুন্দর জীবনের সাধক। তোমার জ্ঞান আছে। তুমি বোঝ। ও বোঝে না। তুমি ওর সমান নও। তুমি ওর থেকে উপরের স্তরের মানুষ। তুমি ওর কোনো ক্ষতি করবে না, উল্টা ওকে ভালো পথে আনবে। সুন্দর জীবন কী জিনিস সেটি ওকে শেখাবে।'

'আমার কোন ঠেকা পড়ছে— আমি ওকে ভালো পথে আনাব?'

‘কারণ, কেউ একা ভালো থাকতে পারে না। তুমি একা ভালো হলে, আর চারপাশের সব খারাপ রয়ে গেল— তাতে কেউ তোমার মতো ভালো আচরণ করবে না। তাতে তোমার কোনো লাভ হবে না। পৃথিবীরও কোনো লাভ হবে না। ভালো থাকতে হলে— সকলকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। অন্তত বেশির ভাগ মানুষকে ভালো করতে হবে। সেজন্য ওই লোককে তুমি ভালো পথে আনবে।’

‘তোমার কথা শুনতে মধুর। কিন্তু করাটা অত সোজা নয়। তোমার সময় আছে। তুমি একজন একজন করে মানুষকে ভালো পথে আনো। আমার সেই সময় নাই। আমি ওরে শিক্ষা দেব। আমি প্রতিশোধ নেব, বিরাট প্রতিশোধ।’

‘প্রতিশোধ কোনোদিন কারও ভালো করে না। তাতে দুজনেরই ক্ষতি হয়।’

‘তুমি উল্টা-পাল্টা বলছো। আমাদের সমাজে যারা ভয়াবহ প্রতিশোধ নিতে পারে, তারাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেবতারা সবাই প্রতিশোধ নেয়, তারা কাউকে মাফ করে না। জিউস কী সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিয়েছে প্রমিথিউসের উপর, সেটি ভুলে গেছ? ঠিক আছে বাদ দাও দেবতাদের কথা, মানুষের কথায় আসো। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? আমাদের বীর কারা? যারা প্রতিশোধ নিতে পারে তারা। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর একিলিসের কথা মনে করো। হোমার কীভাবে একিলিসের কথা বলেছেন? একিলিস তার বন্ধুকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে হেক্টরকে কী নির্মমভাবে হত্যা করেছে? তার প্রতিশোধ এত জঘন্য যে, সে হেক্টরের লাশকে তার ঘোড়ার সাথে বেঁধে ট্রয়ের চারপাশে ঘুরেছে, হেক্টরের বাবা অনেক টাকা না দেওয়া পর্যন্ত তার ছেলের লাশটাও দেয়নি। এত নির্মম প্রতিশোধ নিতে পারে বলেই সে বীর। আমাদের সকল বীরদের কাহিনি এরকমই। আর তুমি বলছ প্রতিশোধ ভালো জিনিস নয়?’

সক্রেটিস বলল, আমি দেবতাদের নিয়ে কিছু বলব না। বললে, সবাই রাগ করবে। আর হোমারের বীরদের কথা বলছ? হুঁম, হোমারের সময় পৃথিবী ঐরকম ছিল। একজনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে বীর হওয়াই ছিল জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজ। কিন্তু সেই সময়টা আমরা পার হয়ে এসেছি। এখন আমরা সুন্দর জীবন চাই। হোমার যে প্রতিশোধের জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, সেই জীবন বীরের জীবন, সুন্দর জীবন নয়। আমরা একটি সুন্দর জীবন চাই।

ক্রিতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিছুই বলছে না।

সক্রেটিস বলল, তুমি একটু চিন্তা করো ক্রিতো। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। তুমি বুঝবে। তুমি আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। তুমি একজন লেখক। তুমি একজন দার্শনিক। তুমি চেষ্টা করলে বুঝবে।

ক্রিতো অবাক। সে নতুন এক সক্রেটিসকে দেখছে। এই সক্রেটিসকে আগে দেখেনি। এখন সে সীমাহীন বিশ্বাস নিয়ে বলছে— প্রতিশোধ নেওয়া জীবনের লক্ষ্য নয়। কেউ খারাপ কিছু করলেও, তার সাথে খারাপ করা যায় না। ক্রিতো আবার ভাবছে, ছোটবেলা

থেকে আমি সক্রেটিসের সাথে ছায়ার মতো লেগে আছি। কোনোদিন ওর কথা মিথ্যা হয়নি। সে চুপচাপ কিছুক্ষণ ভালো করে ভাবল। বুঝল—

সবাই যদি প্রতিশোধ নিতে চায়, তাহলে তো এর শেষ হবে না। আমি একজনের ক্ষতি করব, সে আমার ক্ষতি করবে। এভাবে প্রতিশোধ চলতে থাকবে। এক সময় আমার ছেলে ওর ক্ষতি করবে, ওর ছেলে আমার ক্ষতি করবে। তো এর শেষ হবে কী করে? কাউকে না কাউকে তো থামতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় প্রথমজনই যদি থেমে যায়। প্রথমজনই যদি প্রতিশোধ না নিয়ে, অন্যায়কারীর ভালো করার চেষ্টা করে, তাহলেই পৃথিবীতে খারাপ কাজ কমে যাবে। হানাহাসি কমে যাবে। মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে পারবে।

ক্রিতো ভাবছে, এটিই কি সক্রেটিসের সুন্দর জীবন?

ক্রিতো এত সহজে মানবে না। সে বলল, ঠিক আছে, তোমার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু তোমার সাথে কেউ একদিন খুব খারাপ কিছু করুক, সেদিন বোঝা যাবে। আজকের ভালো ভালো কথার পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকলাম।

সক্রেটিস হাসি মুখে বলল, তোমাকে পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত।

ক্রিতো অবাক হয়ে ভাবছে— সক্রেটিস একেবারে নতুন কিছু বলল। এখন সে যেভাবে কথা বলছে সেটিকে নৈতিকতা বা এথিকস বলা যায়। এটি একটি নতুন জিনিস। গ্রিসে নীতিজ্ঞান আছে। কিন্তু সেটি বাচ্চাদের জন্য। একজন শিশুসাহিত্যিক বাচ্চাদের জন্য অনেক ছোট ছোট গল্প লিখেছেন। তার নাম ঈশপ। তার গল্পের বই বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না যে-ঈশপের গল্প বড়দের জন্য কোনো কাজ দেবে। বড়রা নিজেরাই তো ওস্তাদ। তাদের আর নীতিজ্ঞান দরকার নেই। এখানে শিক্ষা জীবন হলো সাত থেকে চৌদ্দ বছর। তারপর কয়েক বছর সৈনিকের প্রশিক্ষণ। আর কোনো শিক্ষার দরকার নেই।

বড় বয়সে শুধু দেবতাদের মেনে চললেই হবে। আর একমাত্র লক্ষ বীর হওয়া, একিলিসের মতো হওয়া। কিন্তু সক্রেটিস যেটি বলছে সেটি অন্য রকম নৈতিকতা। সেখানে প্রতিশোধ নেই। আছে ক্ষমা, আছে মানুষকে ভালো পথে আনার আহ্বান।

ক্রিতো পিটপিট করে সক্রেটিসের দিকে তাকাল। হোমার সবাইকে শিখিয়েছে— বীরত্ব মানে প্রতিশোধ, বীরত্ব মানে চোখের বদলে চোখ। হোমারের সে কথা সবাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সবাই বীর হতে চায়। সেই হোমারীয় প্রতিশোধকে এক কথায় বাতিল করে দিল সক্রেটিস? এত মনের জোর সক্রেটিসের? সে শত শত বছরের বীরত্বের ধারণা বাতিল করে নতুন জীবনের সন্ধান দিচ্ছে। ক্ষমা আর ন্যায়ের মধ্য দিয়ে সুন্দর জীবন যাপন করার উপায় বলছে।

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য বদলে যাচ্ছে— সক্রেটিসের এথিকস বা নৈতিকতার মাধ্যমে। সক্রেটিসের এই সুন্দর জীবনের ধারণা হোমারের ছিল না। তার

আগে কারওই ছিল না।

৩১

‘তোমাকে সারা জীবন নোঙরের মতো
ধরে রাখে একজন নারী, সে তোমার মা।’
— সফোক্লিস

আসপাশিয়া মা হবে।

একটি মেয়ের জন্য এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর হতে পারে না। কিন্তু আসপাশিয়া আনন্দে নেই। তার মা হওয়ার খবরে সারা এথেন্সে বিশ্রী রকম রব উঠেছে। নিন্দার রব। মানুষ পথে ঘাটে নোংরা কথা বলছে। আসপাশিয়া সারাদিন কাঁদছে। এসব নিন্দা আগে গায়ে লাগত না। কিন্তু সন্তান তুলে গালি দিলে পৃথিবীর কোনো মা সহ্য করতে পারে না। আসপাশিয়াও পারছে না।

এই প্রথম তার মনে হচ্ছে সে জীবনে ভুল করেছে। পেরিক্লিসের ঘরনি হওয়াটা ভুল ছিল। একটি ভুল জীবনের জালে সে জড়িয়ে আছে। বড় কঠিন সে জাল। ভুল জালটিকে ছিঁড়ে শুদ্ধ করার ক্ষমতা তার নেই। আসপাশিয়া কাঁদছে। দিন-রাত কাঁদছে। সে বুঝতে পারছে তার অনাগত সন্তান এথেন্সে কোনো মর্যাদা পাবে না। সেই শিশুটিকে রাস্তা ঘাটে গালি শুনতে হবে। কুৎসিত সেই গালি। জন্মের অপরাধে গালি। নিষ্পাপ শিশুটি অনেকদিন সেই গালির অর্থ বুঝবে না। যেদিন বুঝবে, সেদিনই তার ছোট্ট পৃথিবীটি ছারখার হয়ে যাবে। আর সেই মুহূর্ত থেকেই তাকে পৃথিবীতে আনার অপরাধে মাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

আমার সন্তান আমাকে ঘৃণা করবে? সারা এথেন্স আমার সন্তানকে ঘৃণা করবে? তার জীবনে থাকবে শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা। কিন্তু কেন? তার আর পেরিক্লিসের ভালোবাসার ফল

কখনো ঘৃণা হতে পারে না। কিন্তু তার জীবনে সেটিই হচ্ছে। একটি অনাগত শিশুর ঘৃণাভরা জীবনের কথা মনে করে আসপাশিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পেরিক্লিসও ভেতরে ভেতরে কাঁদছেন। তিনি ভাবছেন তার সন্তান এথেন্সের নাগরিক হতে পারবে না। তার উত্তরাধিকারীও নয়। তারও মন খুব খারাপ। তিনি বাইরে কাঁদছেন না, কিন্তু ভেতরের একূল ওকূল দুকূলই হু হু করছে। তার ইচ্ছা করছে চিৎকার করে কান্না করতে। কিন্তু তিনি কাঁদলে আসপাশিয়াকে সামলাবে কে?

কিছু দিনের মধ্যেই আসপাশিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভীষণ রকম অসুস্থ। তার' চিকিৎসা দরকার। এখানে রোগ মানে দেবতার অভিশাপ। কেউ অসুস্থ মানে হলো তার উপর দেবতা রুষ্ট হয়েছে। সবাই বলল, কোনো কারণে আসপাশিয়ার উপরে দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে পেরিক্লিস আর আসপাশিয়া দুজন মিলে অনেক চেষ্টা করলেন। পশু বলি দিলেন, ধুমধাম করে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দেবতার রাগ কমছে না, সুস্থ হচ্ছে না আসপাশিয়া।

পেরিক্লিস তাকে নিয়ে গেলেন এসক্লিপিয়ন হাসপাতালে।

গ্রিকদের চিকিৎসার দেবতার নাম এসক্লিপিয়াস। ডাক্তারি শাস্ত্রের সব জারিজুরি তার হাতেই। এ দেবতার বংশধররা সারা গ্রিসে কয়েকটা সুন্দর বাড়ি করে রেখেছে। যেকোনো রোগ হলে, এসব বাড়িতে একবার ঢুকতে পারলেই নাকি সব রোগ সেরে যায়। দেবতা এসক্লিপিয়াসের নাম থেকে এ বাড়িগুলোকে তারা বলে এসক্লিপিয়ন হাসপাতাল।

এসক্লিপিয়াস কীভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শিখল সেটি নিয়ে নানা কাহিনি আছে। হোমার তার ইলিয়াডে বলেছেন, এসক্লিপিয়াস ছিল ট্রয় যুদ্ধের সময়ে গ্রিক সেনাদের চিকিৎসক। কিন্তু গ্রিকরা বিশ্বাস করে যে, সে একজন দেবতা। সে দেবতা এপোলোর ছেলে। এপোলো নিজে তাকে রোগ সারানোর সব উপায় শিখিয়েছেন। আবার অনেকে বলে যে এসক্লিপিয়াস একটি সাপকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, সাপটি তার কানে কানে চিকিৎসা করার সব গোমর বলে গেছে। সেজন্য এসক্লিপিয়াস তার হাতে সব সময় রাখেন একটি সাপ। খালি হাতে সাপ রাখা সমস্যা। সেজন্য তিনি সাপটিকে একটি লাঠিতে পেঁচিয়ে রাখেন। লাঠিতে জড়ানো এই সাপটিই চিকিৎসাবিদ্যার প্রতীক। গ্রিকদের চিকিৎসার ব্যাপারে তাই সাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রিকরা মনে করে, সাপের যেমন বিষ আছে, তেমনই বিষ টানার ক্ষমতাও আছে। রোগ তো দেবতার অভিশাপ, সেই অভিশাপ টেনে নিতে পারে সাপ। তাই সাপের চিকিৎসা ক্ষমতা আছে। সাপ একটি ডাক্তার প্রাণী। চিকিৎসা করতে সাপ লাগবেই।

এসক্লিপিয়ন হাসপাতালেও রোগ ভালো করা হয় সাপের মাধ্যমে। এখানে চিকিৎসা মানেই সর্প-চিকিৎসা। প্রতিটি এসক্লিপিয়ন হাসপাতালে সাপ পোষা হয়। সারা গ্রিসের সবচেয়ে বড় আর বিখ্যাত এসক্লিপিয়ন হাসপাতাল হলো এথেন্স থেকে দেড়শ মাইল

পশ্চিমে এপিদাভরোস নামে একটি জায়গায়। পেরিক্লিস আসপাশিয়াকে সেখানে নিয়ে গেলেন।

এখানে এসেই আসপাশিয়ার মন ভালো হয়ে গেল। এমন জায়গায় আসপাশিয়া আগে কখনো আসেনি।

জায়গাটি ভীষণ মনোরম। তিন দিকে পাহাড়, এক দিকে সাগর। পাহাড়গুলো সবুজের মতো সবুজ, আর সাগরটা নীলের মতো নীল। তিনটি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সাগর থেকে বাতাস আসছে। নির্মল বাতাস। সেই বাতাসে মিষ্টি একটি গন্ধ আছে। সাথে আছে শন শন একটি সুর। সেই সুর মানুষকে উদাস করে দেয়। সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। এখানে এসে আসপাশিয়ার মনে হচ্ছে এই পৃথিবী খুব সুন্দর। কোনো চিন্তা নেই, মানুষের কোলাহল নেই, ঝগড়াঝাঁটি নেই, প্রতিযোগিতা নেই। মনে হচ্ছে— জীবন একটিই, আর সে জীবন বড় স্নিগ্ধ, বড় শান্তির।

এখানে আসার কয়েকদিন পরেই আসপাশিয়ার মনে হচ্ছে সে সুস্থ হয়ে গেছে। তার সর্প-চিকিৎসা এখনও হয়নি। চিকিৎসার জন্য কিছুদিন এখানে থাকতে হয়। দুনিয়ার ঝামেলা বাদ দিয়ে কয়েকদিন ফুরফুরে মেজাজে ঘুরতে হবে। শান্তিতে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। তারপর পূর্ণিমার রাতে হবে চিকিৎসা। সর্প-চিকিৎসা। সেই রাতে একটি ছোট্ট ঘরে একলা ঘুমাতে হবে। আর মনে মনে ভাবতে হবে রাতে একটি সাপ আসবে আমার ঘরে, ডাক্তার সাপ। আমার শরীর থেকে দেবতার অভিশাপ শুষে নেবে। সেই ভেবে ঘুমিয়ে যেতে হবে। ঘুমের ঘোরেও সাপ স্বপ্ন দেখবে। আর সকালে উঠে দেখবে সে সুস্থ হয়ে গেছে।

আসপাশিয়া ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখছে। একটি ঘরে কয়েকটি সাপ। বড় বড় সাপ। সেগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলছে। জিহ্বা বের করছে। লকলকে জিহ্বা। ফণা তুলছে। হিশ্ হিশ্ শব্দ করছে। ভয়ংকর ব্যাপার।

আসপাশিয়া ভাবছে, এই রকম একটি সাপ আমার ডাক্তার। রাতে একলা ঘরে আমার চিকিৎসা করবে। আমার পেটে সন্তান। আমার শরীর পেঁচিয়ে ধরবে ঐ বড় সাপটি। ভেবেই ভীষণ ভয় লাগল তার। সে এই চিকিৎসা করাতে পারবে না। সর্প-চিকিৎসায় ভরসা করতে পারছে না। সে বিজ্ঞানের দেশের মেয়ে, তার শহরে জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের জনক থেলিস। সে ছোটবেলা থেকেই যুক্তি শিখেছে, দেবতার নামে সবকিছু সে বিশ্বাস করে না।

সে পেরিক্লিসকে গিয়ে বলল, তার সর্প-চিকিৎসার দরকার নেই। সে তো ভালো হয়েই গেছে।

পেরিক্লিস বুঝতে পারল। তাদের মনে হচ্ছে এই হাসপাতালের স্নিগ্ধ জলবাতাস, ভালো পরিবেশ সব মিলিয়ে আসপাশিয়ার রোগ ভালো হয়ে গেছে। দেবতা তার অভিশাপ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর সর্প-চিকিৎসার দরকার নেই।

পূর্ণিমার আগেই তারা এথেন্সে ফিরে এল।

এথেন্সে ফিরে আসপাশিয়া জন্ম দিল ফুটফুটে একটি শিশু। ছেলে শিশু। ছেলের নাম রাখল বাবার নামে। ছেলের নামও হলো পেরিক্লিস। লোকে বলে পেরিক্লিস নম্বর দুই

পেরিক্লিস নম্বর দুইকে দেখতে এল সক্রেটিস। ছেলে খুবই ভালো আছে। চোখ পিটপিট করছে, চ্যা চ্যা করে জানাচ্ছে আমি এসেছি পৃথিবীতে। কিন্তু মা ভীষণ দুর্বল। কথা বলতেই কষ্ট হয়। তবে সক্রেটিসকে দেখে আসপাশিয়া যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তার ওস্তাদ সত্ত্বা জেগে উঠেছে। সে কথা বলতে শুরু করল।

আসপাশিয়া সক্রেটিসকে এসক্লিপিয়ন হাসপাতালের কথা বলল। ভীষণ ভয় পেয়েছিল। সাপের কথা মনে পড়লেই এখনও তার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এটিকে কি চিকিৎসা বলে? এর চেয়ে দেবতার কাছে বসে বসে প্রার্থনা করাও ভালো।

সক্রেটিস বলল, সর্প-চিকিৎসা এক কথায় অতি ভয়ংকর ব্যাপার। চেরোফোনের কাছে সারা দুনিয়ার খবর থাকে। সে চিকিৎসা বিষয়ে নতুন এক খবর দিল

আসপাশিয়া বলল, কী রকম খবর?

সক্রেটিস বলল, চেরোফোন শুনেছে কস দ্বীপে নাকি একজন নতুন চিকিৎসক আছেন। আমার বয়সী হবে। তিনি নাকি বলেন, মানুষের রোগের জন্য দেবতার অভিশাপ, আশীর্বাদ এসব কিছুই নয়। রোগ নাকি হয় চারপাশের আলো-বাতাস আর খাবার-দাবার থেকে।

আসপাশিয়া বলল, তাই নাকি! এ তো একেবারে নতুন কথা। দেবতাদের বিরুদ্ধে কথা।

'হুঁম, এমন কথা বলতে সাহস লাগে।'

'কী নাম ঐ চিকিৎসকের?'

'হিপোক্রাটিস। তার বাড়ি এজিয়ান সাগরের মধ্যে কস দ্বীপে। তিনি বললেন, তিনি এক নতুন চিকিৎসা শাস্ত্র বের করছেন। এতদিন চিকিৎসার নামে যেটি ছিল, সেটি নাকি কেবল দেবতার কাছে করুণা চাওয়া। সেটি চিকিৎসা নয়। হিপোক্রাটিস যেটি শুরু করছেন, সেটিই হলো সত্যিকার চিকিৎসা শাস্ত্র। সেই হিসেবে চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হলেন হিপোক্রাটিস।'

***

কস দ্বীপের শান্ত সাগর পাড়ে বসে আছেন হিপোক্রাটিস।

তার মন খুব খারাপ। তিনি একজন চিকিৎসক। কিন্তু তার চিকিৎসায় কাজ হচ্ছে না। রোগ সারছে না। কস দ্বীপে একটি প্লেগ চলছে। অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। চিকিৎসকরা

সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। কিন্তু লোক ভালো হচ্ছে না। দিনে দিনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলছে। চিকিৎসক হিসেবে তিনি নিজের ওপর খুবই বিরক্ত।

আজ সকালেও তার চোখের সামনে তিনজন মানুষ মারা গেছে। খুবই কম বয়সে মারা গেছে। লোকগুলো তার হাত ধরে বলছিল, ডাক্তারবাবু বাঁচান। দেবতাকে বলুন আমাকে মাফ করে দিতে। ডাক্তার দেবতাকে বলেছেন, কিন্তু কাজ হয়নি। লোকগুলো মারা গেছে।

তার বয়স ত্রিশ পার হয়েছে মাত্র। এই বয়সেই তিনি মানুষের খুব পছন্দের ডাক্তার। মানুষ তাকে খুব মান্য করে, ভরসা করে। মানুষ ভাবে যত বড় রোগই হোক, হিপোক্রাটিসের কাছে একবার যেতে পারলেই ভালো হয়ে যাবে। এই বয়সেই তিনি স্বনামে খ্যাত।

কিন্তু এই খ্যাতি তার ভালো লাগছে না। তিনি মনে করছেন আমি এই খ্যাতির যোগ্য নই। গ্রিসের কোনো ডাক্তারই কোনো খ্যাতির যোগ্য নয়। কারণ এখানে ডাক্তাররা কিছুই করে না। এখানে চিকিৎসা বলতে কিছুই নেই। এরা ডাক্তার নয়, এরা মন্দিরের পুরোহিত। অসুখ হলে মানুষ দৌড়ে আসে চিকিৎসার দেবতা এসক্লিপিয়াসের কাছে। মানুষ মনে করে এই দেবতার কিছু বংশধর আছেন, যাদের সাথে দেবতার সরাসরি যোগাযোগ আছে। দেবতা তাদের কথা শোনেন। রোগাক্রান্ত মানুষ এই দেবতাদের বংশধরদের কাছে এসে তাদের কষ্টের কথা বলে, আর দেবতার বংশের লোকেরা দেবতার কাছে রোগের বিধান চায়। দেবতার বিধান অনুযায়ী তারা পশু বলি দেয়, আচার অনুষ্ঠান করে। এর বাইরে এসক্লিপিয়ন হাসপাতালে সর্প-চিকিৎসা করা হয়। এটুকুই হলো চিকিৎসা। এই কাজ যারা করেন, তাদেরকেই বলা হয় চিকিৎসক

হিপোক্রাটিসও এরকমই একজন চিকিৎসক। এই চিকিৎসকেরা সবাই নাকি দেবতা এসক্লিপিয়াসের বংশধর। দেবতার এক মেয়ের নাম হাইজিয়া (Hygieia–গ্রিক উচ্চারণ ইগিয়া), তার নাম থেকেই হাইজিন শব্দটি এসেছে। আরেক মেয়ের নাম পেনাসিয়া (Panacea), মানে সর্ব রোগের নিরাময়। তাদের ছেলেপেলে, নাতি-নাতনিদের বংশধররাই সারা গ্রিসের ডাক্তার। হিপোক্রাটিস চিকিৎসার দেবতার পনেরতম বংশধর। এই বংশের লোক ছাড়া অন্য কারও ডাক্তারি করার অধিকার নেই।

হিপোক্রাটিস ভাবছেন, কস দ্বীপের প্লেগ কেন দূর হচ্ছে না? ডাক্তাররা তো সব রকম চেষ্টা করছেন, তবু দেবতারা কথা শুনছেন না। তাহলে সমস্যা কোথায়? দেবতারা কি সত্যিই শাস্তি হিসেবে রোগ দেন? দেবতারা কি রোগ ভালো করেও দেন? কিছুদিন ধরে খুব ভাবছেন তিনি। দিন-রাত ভাবেন।

তার ভাবনার কথা বললে সবাই রাগ করে। সবাই বলে, দেবতাদের নিয়ে সন্দেহ কোরো না, বিপদ হবে। ডাক্তারি বিদ্যা চলে যাবে। সাবধান হও। তাদের বংশের সবাই

ডাক্তার। বাবা, দাদা, চাচা, খালা, ছেলে, মেয়ে সবাই ডাক্তার। তারা সবাই দেবতাভক্ত লোক। দেবতারাই অসুখ দিয়েছেন, দেবতারাই সারাবেন

হিপোক্রাটিস কিছুদিন ধরে একটি অদ্ভুত কাজ করছেন। যে রোগী দেখেন, তার বিষয়ে নানা কথা লিখে রাখেন। নাম, বয়স, কী রোগ, কত দিন ধরে ভুগছে— এসব কথা তিনি পেপিরাস কাগজে লিখে রাখেন। তার ঘরের কয়েকটা তাক রোগীদের তথ্যে ভরে গেছে। লোকে বলে এগুলো তার পাগলামি। দেবতাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে মানুষ নিয়ে লেখালেখি শুরু করছেন। এই ছেলের ডাক্তারি বিদ্যা আর থাকবে না।

সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হচ্ছেন তার বাবা। তিনি রাগ করে বলছেন, এসব রোগীর কথাবার্তা লিখে কী কাজটা হবে? রোগের বিষয়ে রোগী কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু? প্রকৃত বিষয় হলো দেবতা। তাই দেবতা নিয়ে লেখো। কী করলে দেবতা খুশি হয়ে রোগ সারান, সেটি লেখো। রোগী কোনো বিষয় নয়।

বাবা তাকে ডাক্তারি শিখিয়েছেন। তার যত বিদ্যা সব বাবা আর দাদার কাছে পাওয়া। তিনি বাবার সাথে বেআদবি করেন না। নীরবে মেনে নেন। কিন্তু তার মনে হয় দেবতা নয়, রোগের জন্য রোগীর শরীরই জরুরি। তিনি রোগীর কথাবার্তা লিখতে শুরু করেছেন

সন্ধ্যা হয় হয়। লাফ দিয়ে উঠলেন হিপোক্রাটিস। এক দৌড়ে ঘরে গেলেন। তিনজন দাসকে ডেকে বললেন, এতদিন যত কিছু লিখেছি, সব কাগজ বের কর।

হিপোক্রাটিসের পরিবার খুবই ধনী। তার বংশের লোকেরাই দূর-দূরান্তে রাজাদের রাজবৈদ্য। তারা বিশাল বড়লোক। তাদের অনেক দাস। ডাক্তারদের দাস মানে লেখাপড়া জানা দাস। তিনজন পড়ালেখা জানা দাসকে নিয়ে ডাক্তার সন্ধ্যার আলোয় কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। দাসেরা কাগজ বাছাই করছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি রোগীর পেটের পীড়া।

ডাক্তার একটি নতুন কাগজের উপরে বড় করে লিখলেন পেটে পীড়া। বললেন, পেটে ব্যথার রোগীদের কাগজগুলো জোরে জোরে পড়। তারা ত্রিশ জন রোগীর তথ্য পড়ল। একই রকম কথা পেলেই ডাক্তার লিখে ফেলছেন। ঐ ত্রিশ জন রোগীর বাড়ি কোন্ কোন্ জায়গায়, সেটির তালিকা করলেন।

পরদিন তিনি ত্রিশ জনের বাড়িতে গেলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঘুরছেন। সাথে তিনজন দাস। সব রোগীর সাথে কথা বলছেন। রোগী মারা গিয়ে থাকলে তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলছেন। তারা কী খায়, রোগ হওয়ার আগে কী খেয়েছে, কখন ঘুমায়, কতবার পায়খানায় যায় সবকিছু লিখে ফেললেন। আগের ত্রিশ জন রোগীর মধ্যে নয় জন ভালো হয়ে গেছে, দশ জন এখনও ভুগছে, আর এগারো জন মরে গেছে। যারা মারা গেছে তারা সবাই শিশু বা বুড়ো, যুবকেরা এখনও ভুগছে, আর যারা ভালো হয়ে গেছে, তারা সবাই খাওয়ার পাল্টে অন্য খাওয়ার খেয়েছে। কে কী খাওয়ার খেয়েছে সব লিখে রাখলেন। সবার বাড়ির আশপাশে ঘুরে দেখলেন তিনি

তারপর বাড়ি গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। টানা তিন দিন ঘরের দরজা খুললেন না। এক মনে কী যেন ভাবেন, পেপিরাসের লেখাগুলো মিলান 1 আবার ভাবেন আবার কাটাকুটি করেন। নাওয়া-খাওয়া নেই, কারও সাথে কোনো কথা নেই। সবাই ভাবছে ছেলেটা পাগলই হয়ে গেল।

তিন দিন পরে ঘর থেকে বের হলেন হিপোক্রাটিস। জীবিত দশজন রোগীকে খবর দিলেন।

এরপর ডাক্তারদের ডেকে বললেন, ভাইয়েরা, এখন আমি নিশ্চিত দেবতা-টেবতা কিচ্ছু নয়। রোগ হলো শরীরের একটি নিজস্ব সমস্যা। শরীর যখন স্বাভাবিক নিয়মে চলতে পারে না, তখন যে প্রতিক্রিয়া দেখায় সেটিই হলো রোগ। রোগের চিকিৎসার জন্য এক নম্বর বিষয় হলো রোগী।

হিপোক্রাটিস সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন। লিখে লিখে দেখালেন— তিনি কেন একথা বলছেন। তিনি বললেন, শিশু আর বুড়োরা মারা গেছে, কারণ তাদের শরীরে শক্তি কম, আর জোয়ানরা মরেনি, কারণ তাদের শরীরে শক্তি বেশি। তাই রোগীর শরীরই চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে জরুরি। চারপাশের আলো-বাতাস আর খাবার-দাবার জরুরি। দেবতা জরুরি নয়।

অন্য ডাক্তাররা কিছুই বলছেন না।

তিনি আবার বললেন, এই যে আমার সামনে বসে আছে দশ জন রোগী। আমার বিশ্বাস আমি সবাইকে বাঁচাতে পারব। তারা বাঁচলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তিনি কিছু লতা-পাতা বের করলেন, অনেকটা থানকুনি পাতার মতো পাতা। বললেন, আমার মনে হয়— এই পাতার রস খেলে ওরা ভালো হয়ে যাবে।

রোগীরা সেই পাতার রস খেতে শুরু করল। তিন দিনের মধ্যে সবাই সুস্থ হয়ে গেল। আর রাতারাতি বীর হয়ে গেলেন হিপোক্রাটিস। নতুন গ্রিক বীর। তিনি মানুষের জীবন বাঁচান। তিনিই নতুন দেবতা।

এভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র বের হলো দেবতার খপ্পর থেকে। বিজ্ঞানের সাথে মিশে গেল চিকিৎসা। বিজ্ঞানের জন্য যে রকম নতুন জিনিস করেছেন থেলিস, দর্শনের জন্য সক্রেটিস, স্থাপত্যে ফিডিয়াস, সাহিত্যে এস্কিলাস ও সফোক্লিস, সেরকম চিকিৎসার জন্য একেবারে নতুন কিছু করলেন কস দ্বীপের হিপোক্রাটিস।

পৃথিবীতে যারা নতুন কথা বলেছে, সবাই বিপদে পড়েছে। দেবতার ভক্তরা তাদের বিরুদ্ধে নেমেছে। কিন্তু হিপোক্রাটিস সেরকম বিপদে পড়লেন না। তার কারণ তিনি সবার চোখের সামনে মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছেন। তার কথা মতো কস দ্বীপের প্লেগ দূর হয়েছে মাত্র কয়েক সপ্তাহে, মানুষ সুস্থ জীবন পেয়েছে। তিনি যেটুকু বাধা পাচ্ছেন, সেটি তার নিজের পরিবার থেকেই। সাধারণ মানুষ তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

তাছাড়া রাস্তাঘাটে তিনি দেবতার অপমান করেননি। যা বলার পরিবারের ডাক্তারদের কাছে বলেছেন। তিনি নিজেকে চিকিৎসার দেবতা এসক্লিপিয়াসের বংশের লোক হিসেবেই পরিচয় দেন। তার হাতে সাপের ছবিওয়ালা লাঠি আছে। তিনি মানুষকে বলেননি যে, দেবতাকে মানবে না। তিনি বলেন, দেবতাদের ভক্তি করা ভালো, তাতে দেবতা খুশি হয়ে তোমাকে সুস্থ রাখবে। তবে দেবতারা এখন ভীষণ ব্যস্ত, তাদের অনেক কাজ, তাই সবার শরীরের খবর রাখা তাদের জন্য কঠিন। সেজন্য যার যার নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে নিজেকেই কাজ করতে হবে। ভালো খাওয়ার খেতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে আর চারপাশের পরিবেশ ভালো রাখতে হবে।

সক্রেটিস যেটি মানুষের মনের জন্য করতে চায়, সেটিই মানুষের শরীরের জন্য করলেন হিপোক্রাটিস।

হিপোক্রাটিসের এখন অনেক কাজ। তিনি নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েছেন। বিশাল কিছু। শরীরের এত রকম ঝামেলা, মানুষের এত রকম রোগ, সেই রোগের এত রকম ওষুধ এগুলো নিয়ে একা কাজ করা যায় না। তার পরিবারের ডাক্তারদের দু-একজন তার সাথে আছে, কিন্তু বেশিরভাগই তাকে এখনও পাগল মনে করে। তারা তাকে কোনো সাহায্য করবে না। কিন্তু লোক দরকার। ভালো লোক। যে খেটে খেটে মানুষের শরীর ভালো করার উপায় বের করবে।

তিনি ঠিক করলেন, তার পরিবারের বাইরের ছেলেদের ডাক্তারি শেখাবেন। এটি খুবই দুঃসাহসী কাজ। সারা গ্রিসে এসিক্লিপিয়াসের বংশধর ছাড়া কেউ ডাক্তারি করতে পারে না। চিকিৎসাশাস্ত্র বড় পবিত্র জিনিস। এতে সবার অধিকার নেই। এখন হিপোক্রাটিস যদি বলেন, রাস্তাঘাটের ছেলেমেয়েরা ডাক্তারি করবে, সারা গ্রিসে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। তার লোক দরকার। যে বিশাল কাজ তার সামনে, সেটি করতে লোক লাগবেই।

প্রস্তাব শুনে তার বাবা মহা ক্ষেপে গেলেন।

বাবা বললেন, তোর লোক লাগবে, তো বিয়ে কর। একটা না, তিনটা বিয়ে কর। ভাইদের চারটা-পাঁচটা করে বিয়ে দে। কচি-কাঁচায় ভরিয়ে ফেল পুরো কস দ্বীপ। তাহলেই তোর সংসারেই পেয়ে যাবি একদল ডাক্তার। অন্য বাড়ির পোলাপান দরকার হবে না। ঐ কথা ভুলেও মাথায় আনবি না

হিপোক্রাটিস বললেন, বিয়ে করে ছেলেপেলে বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে, আমার মাথায় যা আছে সব উড়ে যাবে। সেটি সম্ভব নয়, বাবা। আমাকে অনুমতি দিন, না হলে আমি নিজে নিজেই ছেলেদের শেখাতে শুরু করে দেব।

বাবা জানেন, তার ছেলে ভীষণ ত্যাড়া। কিন্তু ত্যাড়ামি করে সমস্যাটা বুঝতে পারছে না।

বাবা বললেন, তুই চিকিৎসা বিদ্যালয় করবি, কিন্তু ছাত্র পাবি কোথায়? কেউ ছেলেকে পাঠাবে না ডাক্তার হতে। তুই কাকে শিখাবি? তারপর যদি কেউ তোর স্কুলে আসেও, সমাজ তাদের বিরুদ্ধে থাকবে। তারা শিখতে পারবে না। তারপর ধর তোর বিশাল কেরামতিতে ছাত্ররা ডাক্তারি শিখেই গেল। তারপরও কেউ তাদের ডাক্তার বলবে না, কেউ ওদের দিয়ে চিকিৎসা করাবে না, ওদেরকে কেউ পয়সা দেবে না। মানুষ একটি কথা জানে এবং মানে, সেটি হলো ডাক্তার হতে দেবতার পুত্র হওয়া লাগে।

হিপক্রাটিস ভাবছেন, এটি বাবা ঠিক বলছে। তিনি এটি ভাবেননি।

বাবা বললেন, ডাক্তারি করতে গিয়ে তুই একটি ভুল করলে, দেবতার ছেলে বলে তোকে কেউ কিচ্ছু বলে না। কিন্তু ওরা কেউ ভুল করলে, মানুষে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

হিপোক্রাটিস বললেন, এগুলো আমার মাথায় আসেনি। আরেকবার বুঝলাম— আপনি আমার ওস্তাদ। কিন্তু আমার কিছু ছেলে লাগবেই। আমার সব কাজ থেমে আছে। এখন আপনিই বুদ্ধি দেন, কী করলে চিকিৎসা স্কুল হবে?

বাবা অবাক। কিছুদিন ধরে ছেলেটা উল্টাপাল্টা করছে। কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলেকে শ্রদ্ধা করেন। এমন প্রতিভাবান ছেলে সারা গ্রিসে আর নেই।

বাবা তার হাতের সাপ আঁকা লাঠি মাটিতে ঠুক ঠুক করছেন। তিনি ভাবছেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, তাহলে একটি কাজ কর। মানুষকে বলতে হবে যে ডাক্তার হচ্ছিস একা তুই। যারা শিখছে— তারা শুধু তোর শিষ্য, তারা ডাক্তার নয়। সব কাজ হবে তোর নামে। এমন হতে হবে রোগী ভালো হলে সুনাম তোর, মন্দ করলে দোষও তোর। এরকম বোঝাতে পারলে লোকে ছেলেদের পাঠাতে পারে।

তিনি বাবাকে পায়ে ছুঁয়ে সালাম করলেন। বাবার আশীর্বাদ নিয়েই হিপোক্রাটিস চালু করলেন পৃথিবীর প্রথম চিকিৎসা বিদ্যালয়। যেকোনো ছাত্র- ছাত্রী আসতে পারবে তার স্কুলে। যে কেউ হতে পারবে ডাক্তার। তার খুব প্রিয় একটি গাছ আছে কস দ্বীপে। অশ্বত্থ গাছের মতো বিশাল এক বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের তলায় গিয়ে বসলেন হিপোক্রাটিস। এটিই তার চিকিৎসা বিদ্যালয়। সুবিশাল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় তিনি প্রথম মেডিকেল ক্লাস নিবেন। ছাত্র মাত্র তিনজন। তিনজনই হিপক্রাটিসের আশ্রিত। তাদের বাবা-মা নেই। তিনি তাদের ভরণ-পোষণ করেন। শুধু তারাই এসেছে। তাও নিজেরা ইচ্ছে করে আসেনি। ডাক্তার জোর করে নিয়ে এসেছেন।

তারাই প্রথম চিকিৎসক, যারা দেবতার সন্তান নন। তারা ছাড়া আর কেউ তাদের সন্তানকে পাঠাতে রাজি হয়নি। তার বাবা ঠিক বলেছিলেন। দেবতার রক্তের সন্তান না হলে, কারও ডাক্তার হওয়া খুব দুষ্কর।

কিন্তু হারবেন না হিপোক্রাটিস। তিনজন ছাত্র নিয়েই তিনি শুরু করবেন। বৃক্ষের নিচে বসে হিপক্রাটিস শান্ত স্বরে বললেন, শোনো, তোমরা চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে এসেছ।

চিকিৎসা হলো একটি শিল্প, একটি আর্ট। এই শিল্প শিখতে হলে সবার আগে বিশ্বাস করতে হবে যে—

জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু শিল্প দীর্ঘস্থায়ী। জীবন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু শিল্প বেঁচে রবে।

ছাত্ররা কোনো উত্তর করছে না। চিকিৎসা যে একটি শিল্প, একথা বিশ্বাস করতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। হিপোক্রাটিস বৃক্ষের দিকে তাকালেন। ওই বৃক্ষ তার সঙ্গী। কস দ্বীপে কেউ তাকে খুঁজতে এলে যে কেউ চোখ বন্ধ করে বলে, ওই গাছটির নিচে গিয়ে বসে থাকো, হিপক্রাটিসকে পেয়ে যাবে। লোকে বলে, তিনি নাকি এই বৃক্ষটির প্রেমে পড়েছেন, বৃক্ষটিও নাকি তার প্রেমে ব্যাকুল। মানুষের মুখে এখন এই বৃক্ষের নাম হিপোক্রাটিস বৃক্ষ।[৮৮]

তার বৃক্ষ প্রেম নিয়ে সবাই মজা করে। তিনি হেসে বলেন, ভুল বলোনি, গাছ তো ডাক্তারের বন্ধুই। গাছ না থাকলে ওষুধ পেতাম কীভাবে? তাই গাছই আমার প্রেমিকা। তবে তোমরা বলো, একটি মাত্র গাছ নাকি আমার প্রেমিকা, সত্য হলো— সব গাছই আমার প্রেমিকা। আমি প্রতিদিন নতুন নতুন ওষুধি গাছ পাই, আর আমার প্রেমিকার সংখ্যা বাড়ে।

বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে তিনজন ছাত্রকে মহা আবেগ নিয়ে হিপোক্রাটিস আবার বললেন,

'যদি তুমি চিকিৎসা শিল্পকে ভালোবাসো, তুমি আসলে মানুষকে ভালোবাসো। চিকিৎসা হলো মানবপ্রেম, অন্য কিছু নয়।'

ছাত্ররা শুনছে। তাদের আগ্রহ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে শিক্ষকের যে ব্যাপক আগ্রহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষক মধুর স্বরে বলছেন—

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।'

ছাত্ররা এবার মাথা উপরে-নিচে নাড়ল। এটি সোজা কথা। তারা বুঝতে পেরেছে। একথা তারা ছোটবেলা থেকেই শুনছে। তারা মনে করছে ডাক্তারি তো খুবই সোজা জিনিস। আমি তো জানিই যে, স্বাস্থ্যই হলো সম্পদ। ছাত্রদের মুখ দেখে হিপোক্রাটিস খুশি হলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো ওষুধ কী জানো?

ছাত্ররা ডানে-বামে না-সূচক মাথা নাড়ল। তাদের জানার কথাও নয়।

হিপোক্রাটিস বলল, 'মানুষের জন্য সর্বোত্তম ওষুধ হলো হাঁটা'।

ছাত্ররা হেসে দিল। এটিও সোজা কথা। এটিও তারা কিছুটা জানে। হাঁটা খুবই ভালো জিনিস। ডাক্তার ছাত্রদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। এবাড়ি থেকে ওবাড়ি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছেন ডাক্তার। হাতে সাপের নকশা করা লাঠি, মুখে মিষ্টি হাসি। মানুষ তাকে দেখলে খুশি হয়। তারা শ্রদ্ধাভরে তাকে বসায়, আদর করে এটি-সেটি দেয়। এত বড় ডাক্তার নিজে থেকে এসে তাদের শরীরের খবর নিচ্ছেন, এটি কি কম কথা! ডাক্তার সবার খাবার-দাবারের কথা জিজ্ঞেস করেন। কে কী খায়, কার কী খাওয়া

উচিত, সেই তালিকা বলে দেয়। ডাক্তার বলছেন, খাবারের মধ্যেই সবকিছু। ভালো থাকতে হলে ভালো খাওয়ার খেতে হবে।

এরপর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোনো, আজ থেকে খাদ্য বিষয়ে আমাদের মন্ত্র হবে—

'খাদ্যই হোক ওষুধ, আর ওষুধই হোক খাদ্য।'

একজন ছাত্র বলল, কথাটায় প্যাঁচ আছে গুরু। একবার মনে হয় বুঝেছি, আবার মনে হয় বুঝিনি। একটু খোলাসা করে বলবেন?

ডাক্তার বলল, 'খাদ্যই হোক ওষুধ'- এর মানে হলো— খাদ্য এমন করে খেতে হবে, যেন সেটি ওষুধের কাজ করে। খাদ্য পরিমাণ মতো খেলে সেটি হবে ওষুধ, আর বেশি খেলে সেটিই হবে বিষ। আমরা গ্রিকরা যেমন সব কিছুতে বলি—

'প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে কোনো কিছুই আর উত্তম থাকে না।'

ছাত্র বলল, বাহ, কবিতার মতো কথা। মজা পাচ্ছি।

ডাক্তার বললেন, এত বেশি মজা পেয়েছ যে আমাকে বলতেই দিলে না। অর্ধেক পথেই থামিয়ে দিলে। বাকি অর্ধেক শোনো। 'ওষুধই হোক খাদ্য- এর মানে হলো যেসব জিনিসে শরীর ভালো থাকে, সেগুলোই হোক খাদ্য। আমরা বেছে বেছে উপকারী জিনিসই শুধু খাব, ক্ষতিকর জিনিস বাদ দেব।

ছাত্র বলল, চমৎকার। আমার তো আরও জানতে ইচ্ছে করছে।

ডাক্তার বললেন, সময়ে সবই জানবে। এখন আরেক বাড়ি চলো। আর শোনো, আমি মানুষের সাথে যত কথা বলছি, যে যা বলছে, সবকিছু লিখে রাখতে হবে। একটি কথাও যেন বাদ না যায়।

এভাবে হেঁটে হেঁটে একবাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাচ্ছেন ডাক্তার। চলছে চিকিৎসা, চলছে শিক্ষা, চলছে গবেষণা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে আর একটি কাজও করছেন তিনি। কোন্ বাড়িতে ডাক্তারি পড়ার মতো ছেলে আছে, সেটিও খোঁজ নিচ্ছেন। তার ছাত্র দরকার। অনেক চেষ্টা করছেন ছাত্রের জন্য। কিন্তু লাভ হচ্ছে না।

অবশেষে আবার এগিয়ে এলেন বাবা। কস দ্বীপের গণ্যমান্যদের ডেকে সভা করে বললেন, হিপোক্রাটিস যেভাবে চিকিৎসা করছে, সেটি দেবতার বিরুদ্ধে নয়। দেবতারা তো বলেছেন, রোগ হলে লতা-পাতা ছেঁচে ওষুধ খেতে হবে। হিপোক্রাটিস তো সেটিই করছে। তাই ওর কাজে দেবতাদের সাথে কোনো বিরোধ নেই।

এর কয়েক দিনের মধ্যে হিপোক্রাটিসের স্কুল কচিকাঁচায় ভরে গেল। মানুষ আর ভয় পেল না। দলে দলে ছেলে আসতে শুরু করল তার মেডিকেল স্কুলে। বাবা-মায়েরা বুঝল — চিকিৎসা করা হতে পারে মানুষের পেশা, একটি মহান পেশা।

নতুন ছাত্র পেয়ে হিপোক্রাটিস আনন্দে বাক-বাকুম। তাকে অনেক কাজ করতে হবে। তিনি ছাত্রদের নিয়ে পথে নেমে পড়লেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে বই লেখা শুরু করেছেন।

তার শিষ্যরাও মেতে উঠেছে। তারা ডাক্তার হবে, আগে কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। জীবনে যে সুযোগ আসার কথা ছিল না, সেই সুযোগ পেয়ে ছাত্ররা গুরুর সাথে দিন-রাত খাটছে। তারাও লিখছে। কারও বিরাম নেই, সবাই অবিরাম লিখছে।

তাদের লেখা নিয়ে বই বের হলো। বইয়ের নাম হিপোক্রাটিক কর্পাস[৮৯]। শুধু রোগ, শরীর আর চিকিৎসা বিষয়ে লেখা। দেবতাদের প্রশংসা নেই, গালাগালিও নেই। সবার জন্য উপকারী বই। সারা গ্রিসে ছড়িয়ে গেল সেই বই। মানুষ জেনে গেল নতুন এক চিকিৎসাশাস্ত্র শুরু হয়েছে। সেটি করেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হিপোক্রাটিস।

হিপোক্রাটিস দিন-রাত গবেষণা করছেন। প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু জানতে পারছেন। নতুন রোগের কথা জানছেন, নতুন ওষুধ নিয়ে কাজ করছেন। তিনি একটি ল্যাবরেটরি বানিয়েছেন। শিষ্যরা দূরে দূরে গিয়ে রোগী দেখে। সন্ধ্যায় একসাথে বসে সবকিছু আলাপ করে। হিপোক্রাটিস সিদ্ধান্ত দেয় কোন কোন নতুন জিনিস আজ শেখা হলো। সেগুলো লিখে রাখা হয়। বই লেখা এখনও চলছে। চিকিৎসাশাস্ত্র সাগরের মতো বিশাল। এই জ্ঞানের শেষ নেই। তাই আরও বই আসবে। চলতে থাকবে হিপোক্রাটিক কর্পাস।

একদিন হিপোক্রাটিস বৃক্ষের নিচে বসে শিষ্যদের পড়াচ্ছেন।

হঠাৎ সাপের লাঠি হাঁকিয়ে বৃক্ষতলে এসে দাঁড়ালেন তার বাবা। তিনি বললেন, তোমরা তো শুনছি অনেক ভালো কাজ করছ। ভালো ভালো বই লিখছ। মানুষের উপকার হচ্ছে। মানুষের উপকার করলে দেবতারাও খুশি হয়।

হিপোক্রাটিস বললেন, বাবা, আমার উপর কি দেবতারা খুশি হয়েছে?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে। তুমি তোমার স্কুল নিয়ে আমাদের এসক্লিপিয়ন হাসপাতালে চলে আসো। সেখানেই ক্লাস নেবে। আমাদের গবেষণাগারেই কাজ করবে।

হিপোক্রাটিসের বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যিই কি বাবা তাকে এত বড় সুযোগ দিচ্ছেন? তিনি বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বাবা বললেন, আর ভেবো না, চলে এসো। তবে একটি কথা।

'কী কথা?'

'তুমি কাজ করবে তোমাদের ছেলেদের নিয়ে আলাদা। অন্য ডাক্তাররা, যারা দেবতার নির্দেশে কাজ করে, তারা থাকবে আলাদা। তাদের নামে কোনো খারাপ কথা বলতে পারবে না। মনে থাকে যেন।'

'ছিঃ বাবা, আমি কি এত খারাপ? আমি কারও নিন্দা করব না।'

কয়েক দিনের মধ্যে ডাক্তার তার শিষ্যদের নিয়ে চলে এলেন এসক্লিপিয়ন হাসপাতালে। এজিয়ান সাগরের পাড়ে পাহাড়ের উপর সুন্দর ভবন। সামনে নীল সাগর। সাগরের পেছনে ছোট্ট পাহাড়। একেবারে মনোরম। এটি তার নতুন মেডিকেল স্কুল। ছাত্ররা আনন্দে সিম্পোজিয়াম আয়োজন করল। নাচে- গানে উদযাপন করল নতুন ভবন।

নতুন ভবনে এসে হিপোক্রাটিসের গবেষণা আরও বেড়ে গেল। এখন তার দু হাতে টাকা আসছে। দূর-দূরান্তের ধনীরা জাহাজ পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে নিতে। তিনি নিজে যেতে না পারলে, তার শিষ্যদের পাঠিয়ে দেন। তাতেই কাজ হয়।

ডাক্তার জাহাজ বানিয়েছেন। জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। ঘুরে ঘুরে মানুষ দেখেন। রোগ চেনেন আর বই লেখেন। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক নতুন নতুন জিনিস লিখে ফেললেন তিনি। ভাঙা হাঁটু জোড়া লাগানোর উপায় বের করলেন। হাড় জোড়া লাগানোর জন্য একটি টুলের মতো জিনিস বের করেছেন। তার শিষ্যরা এই টুলকে বলে 'হিপোক্রাটিক বেঞ্চ'।

তিনি মনে করেন চারটি রস আমাদের শরীরের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এসব রস ঠিকঠাক মতো থাকলে মানুষ সুস্থ থাকে। এই চারটি রস হলো রক্ত, কফ, হলুদ পিত্তরস আর কালো পিত্তরস। তিনি আর তার শিষ্যরা এখন সব রোগীর এই চারটা রস পরীক্ষা করে রোগ বের করেন।

হিপোক্রাটিস ঠিক করেছেন, তিনি গ্রিসের লারিসা নামে একটি জায়গায় আরেকটি চিকিৎসা স্কুল বানাবেন। জায়গাটি পড়াশুনার জন্য উপযোগী। তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদিন প্রতিটি নগরে চিকিৎসা বিদ্যালয় হবে। অনেক যোগ্য চিকিৎসক থাকবে চারদিকে। বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা যাবে না। অকারণে দেবতার জন্য বসে না থেকে মানুষ শরীরের যত্ন নেবে। সবাই স্বাস্থ্য সচেতন হবে। সবাই বুঝতে পারবে— রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ করা উত্তম।

***

৮৮. কস দ্বীপে ঐরকম একটি বৃক্ষ এখনও আছে, মানুষ যাকে হিপোক্রাটিস বৃক্ষ (Tree of Hippocrates) বলে। এটি ঐ দ্বীপের দর্শনীয় স্থান। বৃক্ষটিকে ইংরেজিতে বলে Oriental plane tree, বৈজ্ঞানিক নাম Platanus orientalis।

৮৯. হিপোক্রাটিস ও তার ছাত্ররা চিকিৎসা বিদ্যার যে বইগুলো লিখেছিলেন, সেগুলোকে Hippocratic Corpus' বলা হয়। এগুলোই চিকিৎসা বিদ্যার প্রথম গ্রন্থ।

৩২

‘একটি মাত্র শব্দ আমাদের সকল ব্যথা মুক্ত করতে পারে,
সেটি হলো ভালোবাসা।’
— সফোক্লিস

সক্রেটিস এখন চাচা।

তার সমবয়সী সব বন্ধুর ছেলেদের চাচা। তার বন্ধুরা বিয়ে-শাদি করে ফেলেছে অনেক আগেই। ক্রিতো, চেরোফোন, ইউরিপিডিস সবাই বিবাহিত। সবার ঘরে একের বেশি সন্তান। তাদের যে কারও বাড়িতে সক্রেটিস গেলেই, চাচা চাচা করে শিশুরা এগিয়ে আসে। ক্রিতো বলে, আর কিছু দিনের মধ্যেই সক্রেটিস হয়ে যাবে এথেন্সের সবার চাচা—গণচাচা।

গণচাচা হতে তার নিজের কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা মা-বাবার। তার বাবা এখন খুব ভালো আছেন। এথেন্সের সব রাজমিস্ত্রি এখন ভালো আছে। তাদের হাতে অনেক কাজ। পেরিক্লিস শত শত ভবন বানাচ্ছেন। হাজার হাজার মূর্তি হচ্ছে ফিডিয়াসের কারখানায়। প্রতিদিন ঠিকাদাররা নতুন নতুন কাজ পাচ্ছে। সক্রেটিসের বাবাও বেশ কয়েকটি নতুন কাজ পেয়েছেন। তিনি পয়সার মুখ দেখেছেন। আর অভাব নেই। আর কদিন ভালো করে কাজ করলেই তিনি ধনী হয়ে যাবেন।

কিন্তু তার কপালে ধনী হওয়া নেই। বেশিদিন সুখ সইল না। বুড়ো বয়সে একসাথে অনেক কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। সক্রেটিস পিতৃহীন হলো।

বাবা মারা যাওয়ার পর বিধবা মা প্রতিদিন কান্নাকাটি করেন। তিনি সক্রেটিসকে শুধু দুটি কাজ করতে বলেন। বাবার শুরু করা মূর্তিগুলো শেষ করতে হবে আর তাড়াতাড়ি একটি বিয়ে করতে হবে। সক্রেটিস ভাবল দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টি সহজ। সে বিয়ে করতে রাজি হলো।

সক্রেটিসের জন্য পাত্রী পাওয়া সহজ নয়। তার পরিচিতি সে এথেন্সের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। কিন্তু বাজারে জ্ঞানের কোনো দাম নেই, বিয়ের বাজারে তো কোনো দামই নেই। তবু মা হাল ছাড়ছেন না। মা যেখানে যান, সেখানেই পাত্রী খোঁজেন।

একদিন তিনি এক বাড়িতে গেছেন সন্তান প্রসব করাতে। সেই বাড়িতে একটি মেয়ে খুব চেঁচামেচি করছে। বড় ভাইদের ইচ্ছামতো বকাবকি করছে। ভাইয়েরা বেড়ালের মতো সুড়সুড় করে তার কথা শুনছে। তবে মেয়েটি খুব কাজের। একলা হাতে সবকিছু করছে। বাবাকে হুকুম দিচ্ছে। মাকে কাজ করে দিচ্ছে। দাসকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা একটিই, মেয়েটির মুখ সারাদিন চলছে। সারাক্ষণ কাউকে না কাউকে বকা

দিচ্ছে। আবার বাড়ির সবাই যখন আনন্দ করছে, মেয়েটি এক কোনায় গিয়ে চুপিচুপি কাঁদছে। কান্না শেষ করেই আবার কাজ শুরু করেছে। সাথে সাথেই শুরু করেছে বকাবকি একেবারে নারিকেল স্বভাব। ভেতরে টলটলে পানি, আর বাইরে ভীষণ শক্ত।

সক্রেটিসের মা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী, মা?

মেয়েটি বলল, জেনথিপি।

মা বললেন, সুন্দর নাম। জেনথিপি শব্দের মানে জানো?

'হুঁম, জেনথিপি মানে হলুদ রঙের ঘোড়া।'

মা বললেন, বেশ, জীবনে গাধা হয়ে থাকার চেয়ে, ঘোড়া হয়ে বাঁচাই ভালো। ভালো থেকো মা, সুখে থাকো।

মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারছে না, ঘোড়া আর গাধা কোত্থেকে এলো! সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মা ভাবছেন— সক্রেটিসের জন্য এরকম একটি ঘোড়াই দরকার। শক্ত মেয়ে না হলে সক্রেটিসকে নিয়ে সংসার করতে পারবে না। যে মেয়ে শুধু কাঁদে, সক্রেটিস তাকে নিয়ে সাগরে পড়বে। যে মেয়ে সক্রেটিসকে ধমক দিতে পারবে, সেই মেয়েই পারবে তার সাথে সংসার করতে। মেয়েটিকে মায়ের পছন্দ হয়েছে। শুধু একটিই সমস্যা, মেয়েটির বয়স সক্রেটিসের চেয়ে অনেক কম। মেয়েটি তের বছরের, আর সক্রেটিস সাঁইত্রিশ পার হতে চলল। মেয়েটির বাবার নাম লেমপ্রক্লিস। ভালো মানুষ। এককালে টাকা-পয়সা ছিল, এখন অবস্থা পড়তির দিকে। সেটিই ভালো, বেশি পয়সাওয়ালা কেউ সক্রেটিসের কাছে মেয়ে দেবে না।

এখন একজন ঘটক দরকার। ঘটক হিসেবে এগিয়ে এলো সক্রেটিসের সব কাজের কাজি ক্রিতো।

এক সুন্দর বিকেলে ক্রিতো সক্রেটিসকে নিয়ে থিয়েটারের দিকে বের হলো। ক্রিতোর হাতে একটি আপেল। সক্রেটিস আপেলের মর্ম বুঝতে পারছে না। তারা জলপাই বাগানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বাগানের প্রান্তে গল্প করছে কয়েকটি মেয়ে। তাদের একজন ক্রিতোর স্ত্রী। অন্যদের সক্রেটিস চেনে না।

ক্রিতো বলল, ঐ মেয়েদের মধ্যে মাঝের মেয়েটির নাম জেনথিপি। ঐ মেয়েটিকে তুমি এই আপেলটা ছুড়ে মারবে।

এবার সক্রেটিস আপেল নেওয়ার মর্ম বুঝতে পারল।

আপেল হলো ভালোবাসার প্রতীক। একটি আপেলকে মাঝখানে কাটলে হৃদয়ের মতো দুই খণ্ড হয়। তাই আপেল হলো এমন জিনিস যেখানে দুটি হৃদয় এক হয়ে আছে। প্রেমের জন্য এর চেয়ে ভালো প্রতীক আর হয় না।

সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির প্রতীকও আপেল। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অন্য দেবীদের হারিয়ে মিস ইউনিভার্স হয়ে তিনি আপেল পেয়েছিলেন ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের কাছ

থেকে।

সক্রেটিস আপেল হাতে নিয়ে তাকিয়ে আছে জেনথিপির দিকে। জেনথিপি শব্দটার মানে হলুদ ঘোড়া। মেয়েটি ঘোড়ার মতোই, ঘাড়টা অনেক লম্বা। তবে দেখতে মন্দ নয়। মেয়েটি তাকে দেখেনি এখনও। সক্রেটিস ভাবছে কী করবে। আপেলটা ছুড়বে, নাকি ছুড়বে না।

গ্রিকরা প্রেমের প্রস্তাব দেয় আপেল দিয়ে। কোনো মেয়েকে পছন্দ হলে, তার দিকের ছুড়ে দেয় একটি আপেল। যদি মেয়েটি আপেলটি ধরে মিষ্টি একটি হাসি দেয়, তার মানে মেয়েটি রাজি। আর আপেলটি না ধরলে মেয়েটি রাজি নয়।

সক্রেটিস এখনও ভাবছে— আপেলটি ছুড়বে, নাকি ছুড়বে না।

ক্রিতো বলছে, অনেক ফন্দি করে তোমার ভাবী মেয়েটিকে জলপাই বাগানে এনেছে। দেরি কোরো না, যাও, সামনে গিয়ে আপেলটা ছুড়ে দাও।

জেনথিপি এদিকে ফিরল। সে সক্রেটিসকে চেনে। শুনেছে এই লোক খুব জ্ঞানী। তবে কোনো কাজ করে না। শূন্য পকেটে জ্ঞান নিয়ে ঘোরে। কিন্তু সক্রেটিসের হাতে আপেল কেন? আপেল মানে তো অন্য জিনিস।

জেনথিপি বড় বড় চোখে তাকাল। তার বুক একটু একটু করে কাঁপছে। জলপাই বাগানে আপেল হাতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সক্রেটিস! ঘটনা তো সুবিধার নয়। এই লোক তো জ্ঞানী, প্রেমিক নয়। তো এর হাতে আপেল কেন! তার বুকের কাঁপন বেড়ে গেল। জ্ঞানী লোক ভালোবাসতে পারে নাকি? জ্ঞান আর প্রেম কি এক ঘরে থাকতে পারে?

জেনথিপি কী করবে? দৌড়ে পালিয়ে যাবে? কিন্তু পা তো নড়ছে না। তার সারা শরীর কাঁপছে। কেন যেন কাঁপতে তার ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে একটি সুর শুনতে পাচ্ছে। খুব মিষ্টি একটি সুর। তার মন বলছে এই সুর যেন সারা জীবন চলে। কোনোদিন যেন বন্ধ না হয়। এই মুহূর্তটি যেন কোনোদিন শেষ না হয়। সে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।

ভেবেছে, চোখ খুলে দেখবে সামনে সক্রেটিস। কিন্তু না, চোখ খুলে দেখে কেউ নেই। সক্রেটিস পালিয়েছে।

সেই জলপাই বাগানে আপেল ছুড়তে পারেনি সক্রেটিস। তবু বিয়ে হলো। জেনথিপিকেই বিয়ে করল সক্রেটিস। ক্রিতো সব ব্যবস্থা করল। বসন্তের শুরুতে সক্রেটিসের বিয়ে হলো। অনাড়ম্বর বিয়ে। এক পাখি ডাকা সন্ধ্যায় ইমিতোস পাহাড়ের উপর তাদের চার হাত এক হলো। চাঁদের আলো গায়ে মেখে সক্রেটিসের জীবনে এলো জেনথিপি। জেনথিপি মানে হলুদ ঘোড়া। এই ঘোড়ার বয়স মাত্র তেরো বছর।

ছোট্ট ঘোড়াটি ঘুমিয়ে গেছে। সারাদিন বিয়ের অনুষ্ঠান করে তার ঘুম পাচ্ছে। সেই ঘুমন্ত মুখের দিকের চেয়ে সক্রেটিস প্রতিজ্ঞা করল, এই মেয়েটির সাথে সে কোনোদিন

খারাপ ব্যবহার করবে না। মেয়েটি কিছু বললে, সে রাগ করবে না। ওর সব রাগ-অভিমান মুখ বুজে সহ্য করবে। কিন্তু জেনথিপি বিয়ের রাতে কোনো প্রতিজ্ঞা করল কিনা সেটি জানা নেই। সে প্রতিজ্ঞা করার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিবাহিত জীবন মানুষের এক নতুন অভিজ্ঞতা।

এই জীবনের জন্য আগে কোনো প্রশিক্ষণ থাকে না। তাই এই জীবনের শুরুতে প্রত্যেক নারী-পুরুষ সমস্যায় পড়ে। যারা এই সমস্যা যত তাড়াতাড়ি মেটাতে পারে, তারা তত তাড়াতাড়ি সুখী হয়। কিছু মানুষ আছে, যারা এই সমস্যা সারা জীবনেও মেটাতে পারে না।

সক্রেটিসও সেরকমই। তার দাম্পত্য সমস্যা সারা জীবনেও মিটবে কিনা সে জানে না। বিয়ে করেই তার সমস্যা শুরু হয়েছে। বউ যা চায়, সেগুলোর কোনোটাই করতে তার ইচ্ছা করে না। বউ চায়, সে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরুক, বাজার করুক, খুনসুটি করুক। এর কোনোটাই তার পছন্দের কাজ নয়।

সে সারা জীবন রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়েছে, সিমনের দোকানে বসে জ্ঞানের আলাপ করেছে, জিমনেশিয়ামে গিয়ে ছেলেদের সাথে আড্ডা দিয়েছে। যেখানেই কোনো তরুণ পেয়েছে, শিক্ষা দিতে শুরু করেছে। যখন যার সাথে ভালো লেগেছে, রাতদিন তার সাথে কাটিয়েছে। ভালো না লাগলে নতুন জায়গা খুঁজে নিয়েছে। বাড়ির দিকে নজর না দিলেও কোনো সমস্যা ছিল না।

কিন্তু বিয়ে করে বিপদে পড়েছে। এখন তার জন্য একটি মেয়ে অপেক্ষা করে। সারাদিন তার কথা মনে করে সন্ধ্যা হলে একটু পর পর দরজার দিকে তাকায়। মেয়েটিকে সুখে রাখতে হবে। তার মন রেখে চলতে হবে। সেই মেয়েটির কিছু জিনিস পছন্দ হবে, আবার কিছু জিনিস পছন্দ হবে না। কিন্তু পছন্দ না হলেও মানিয়ে নিতে হবে। পালানোর উপায় নেই।

সিমনের দোকান ভালো না লাগলে অন্য কোথাও যাওয়া যায়। কিন্তু ভালো না লাগলেও জেনথিপির ঘর থেকে দূরে চলে যাওয়া যাবে না। সক্রেটিসের হাঁসফাঁস লাগে। সে সারা জীবন মুক্ত প্রাণী, যা খুশি তাই করে। বউয়ের কথার চেয়ে জ্ঞানের কথা শুনতে তার ভালো লাগে। সে বুঝে গেল— আদর্শ স্বামী সে হতে পারবে না। সেই যোগ্যতা তার নেই। সে ভালো স্বামী হতে চেষ্টাও করল না। তার জীবন খুব বেশি পাল্টাল না। সে আগের মতোই সারা এথেন্স ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুদের জন্য তার সময় কমেনি। তার কাছে বউয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্ঞান।

তবে বিয়ের রাতে যে শপথ সে নিয়েছে, জেনথিপির সাথে কোনোদিন রাগ করবে না, সেটি সে মানে। সে জেনথিপির কথা মুখ বুজে শোনে। কথা ভালো লাগলে জবাব দেয়। ভালো না লাগলে চুপ থাকে। কোনোদিন জেনথিপির সাথে রাগ করে না। তার আশা জেনথিপি একদিন তাকে বুঝে যাবে।

জেনথিপি পড়েছে মহাবিপদে। স্বামীর যে ছবি সে ছোটবেলা থেকে কল্পনা করেছে, সক্রেটিস কোনোভাবেই সেরকম নয়। বিয়ের আগে আপেল হাতে সক্রেটিসকে দেখে যে মধুর সুর জেনথিপির মনে এসেছিল, সেই সুর সব সময় শুনতে চায় জেনথিপি। কিন্তু স্বামী সেই সুর শোনার মতো কোনো কাজই করে না। স্বামীকে পথে আনতে হবে। যে করেই হোক দুই জীবনকে এক করে সুখী দাম্পত্য চাই। সেই উদ্দেশ্যে জেনথিপি স্বামীর জন্য যে অস্ত্র ঠিক করেছে, সেই অস্ত্রের নাম— ঝাড়ি অস্ত্র। সে সারাদিন ঝাড়ি দেয়, উঠতেও ঝাড়ি দেয়, বসতেও ঝাড়ি দেয়। তার বিশ্বাস তার কথা মতো কাজ করলেই সক্রেটিস আদর্শ স্বামী হয়ে যাবে। ফলাফল হয়েছে সক্রেটিসও আদর্শ স্বামী হয়নি, জেনথিপিও হতে পারেনি আদর্শ স্ত্রী। সক্রেটিস হয়ে গেছে সংসারবিমুখ, আর জেনথিপির পরিচয় সে এক মুখরা নারী। জেনথিপি শব্দের মানে হলুদ ঘোড়া। ঘোড়ার মতোই তার মুখে এখন কোনো লাগাম নেই।

তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে। কিন্তু কেউ কাউকে বোঝার চেষ্টাই করে না। তাই তাদের সংসারে সকাল বিকাল চিৎকার। চিৎকার জেনথিপি একাই করে। সক্রেটিস শুধু শোনে, টু-শব্দটিও করে না।

ভর দুপুরে জেনথিপি চিৎকার করছে। সক্রেটিস বারান্দায় বসে আছে।

জেনথিপি বলছে, আমার হলো রানির কপাল! কী সুন্দর কপাল নিয়ে যে পৃথিবীতে আসছি! মানুষের স্বামী হয় নেতা, কারও স্বামী কবিরাজ, কারও স্বামী ব্যবসায়ী। আর আমার স্বামী হলো বিরাট জ্ঞানী। তার জ্ঞানে চারদিক কাঁপে। ডেলফি শহরের ওরাকল তারে সনদপত্র দিয়েছে। সে নাকি পৃথিবীর সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী। এই জ্ঞান দিয়ে আমার কী হবে? আমি কি জ্ঞান ধুয়ে ধুয়ে পানি খাব?

একটু থেমে জেনথিপি আবার শুরু করলেন— তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। না, ভুল বললাম। তিনি জ্ঞানের মহাসাগর। আর আমি হলাম পুকুর। না, এটিও ভুল বললাম। আমি হলাম কুয়া, পাতকুয়া। পাতকুয়া আর মহাসাগরের কি কোনোদিন মিলমিশ হয়?

সক্রেটিস ভাবছে, নারীরা তো স্নেহময়ী। কিন্তু আমার নারীভাগ্য এমন কেন? আমার মায়ের মতো এমন স্নেহময়ী মানুষ সারা দুনিয়ায় নেই। সেই স্নেহময়ীও সারাদিন আমার সাথে ঘ্যান ঘ্যান করে। জেনথিপিও মানুষ ভালো। তবু সেও সারাদিন আমাকে গালাগালি করে। সমস্যাটা কী?

সে ভাবছে জেনথিপিকে প্রশ্নটা করবে। কিন্তু সাহস হলো না। নীরবে শুনতে লাগল জেনথিপির গালাগালি।

জেনথিপি বলল, আপনি মেয়েদের বোঝেন?

সক্রেটিস বলল, না।

'আপনি তো মানুষ নিয়া চিন্তা করেন। তো ঘরের মানুষের কথা, ঘরের মেয়েদের কথা কোনোদিন ভাবছেন?'

সক্রেটিস কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কথা সত্য। নারীদের সে বোঝে না। বোঝার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে হবে। কিন্তু এথেন্সে এই কথা আলাপ করার মতো লোক নেই। এখানে নারীদের অবস্থা দাসদের চেয়ে উনিশ আর বিশ। মেয়েদের মন নিয়ে কথা বললে সবাই হাসাহাসি করবে। যারা সক্রেটিসকে গুরু মানে, তারাও হাসাহাসি করবে। ইউরিপিডিস মেয়েদের মনের কথা নিয়ে নাটক লিখে বিপদে পড়েছে। সবাই তাকে বলে নারীবিদ্বেষী।

নারীর মন নিয়ে আলাপ করার জন্য এথেন্সে একজনই আছে। সে হলো আসপাশিয়া। কিন্তু আসপাশিয়ার কোলে ছেলে। ছেলে কোলে নিয়ে দর্শনের আলাপ করা খুবই কষ্টের। তাই আসপাশিয়া কিছুদিন ধরে লোকজনের সাথে দেখা করে না।

সক্রেটিসের বাড়িতে চেঁচামেচি এখন প্রতিদিনের ঘটনা।

এই চেঁচামেচিতে সক্রেটিসের মায়ের সমর্থন আছে। তিনি জানেন সক্রেটিসকে পথে রাখতে বউকে শক্ত হতে হবে। মা বউকে শক্ত হওয়া শেখাচ্ছেন। তিনি ছেলের বউকে অনেক কাজ শেখাচ্ছেন। সংসারের খরচ চালানোর কৌশল শেখাচ্ছেন। তিনি জানেন, সক্রেটিস যেমন এখন কাজ করে না, ভবিষ্যতেও করবে না। তাই তার বউকেই সব সামলাতে হবে। মা জেনথিপিকে জমিজমার হিসাব, টাকা-পয়সার হিসাব থেকে শুরু করে সবকিছু শেখাচ্ছেন।

কিন্তু মা বেশিদিন শেখাতে পারলেন না। সক্রেটিসের বিয়ের অল্পদিন পরেই মা মারা গেলেন।

এখন সংসারে শুধু দুইজন। ছেলেমেয়ে নেই। একা বাড়িতে জেনথিপির মন হু হু করে। সময় কাটাতে সে সারাদিন কাজ করে। নিজের হাতে কাপড় বোনে। কিন্তু সক্রেটিসের জন্য কাপড় বুনে কী হবে? শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক— সে সারা বছর একটিমাত্র কাপড় পরে। পোশাকের প্রতি তার ধারণা হলো— কাপড়ের দরকার শুধুই লজ্জা নিবারণের জন্য, এছাড়া পোশাকের কোনো দরকার নেই। একটির বেশি পোশাক সে পরে না। তার জন্য পোশাক বুনে লাভ নেই।

জেনথিপি সারাদিন ধরে সক্রেটিসের জন্য রান্না করে। এক ঘর খাবার নিয়ে সারাদিন বসে থাকে, সক্রেটিসের দেখা নেই। বসে থাকতে থাকতে যখন তার মাথা ভীষণ গরম হয়ে যায়, তখন সক্রেটিস বাড়ি ফেরে। তখন আর সক্রেটিসের কপালে খাবার নয়, জোটে রাশি রাশি গালি। তখন সারা বাড়ি জুড়ে শুধু বকা আর গালি। গালি খেতে খেতে তারা বিছানায় যায়। ভোর রাতে জেনথিপির মনে হয় রাতে খেতে না দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। তখন সেই ভোর রাতেই সক্রেটিসকে ঘুম থেকে তোলে। চোখ ডলতে ডলতে সক্রেটিস উঠে বসে। দুজনে মিলে ঠাণ্ডা খাবার খায়। আবার ঘুমিয়ে যায়। সকালে ঘুম ভেঙে জেনথিপি দেখে, সক্রেটিস তার আগেই উঠে বের হয়ে গেছে। সারাদিনে আর দেখা নেই। আবার গভীর রাতে বাড়ি ফেরে। এই হলো— সক্রেটিসের সংসার জীবন।

এই জীবনে সক্রেটিস সুখী। সে মোটামুটি একটি রুটিন করে নিয়েছে। হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছে। সংসার নিয়ে তার কোনো অভিযোগ নেই, কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু জেনথিপি মানতে পারেনি। তাই সে কষ্ট পায় আর গালাগালি করে। তার গালির ভাণ্ডার অফুরন্ত। সক্রেটিস মনে করে গালির ব্যাপারে জেনথিপির মতো বিশেষজ্ঞ এথেন্সে আর কেউ নেই।

এথেন্সের সবাই একথা জানে। জেনথিপিকে নিয়ে বন্ধুরা সক্রেটিসকে ক্ষেপায়। কিন্তু সক্রেটিস জানে জেনথিপির ভালোবাসা তীব্র, তাই রাগও বেশি, সেজন্যই বকাঝকা মাত্রাহীন। সে বন্ধুদের হাসি-ঠাট্টায় বুঝিয়ে দেয় যে, জেনথিপিকে সে ভীষণ ভালোবাসে, অশেষ শ্রদ্ধা করে।

একদিন চেরোফোন বলল, জেনথিপি তো সারাদিন গালমন্দ করে, তুমি তাকে নিয়ে সংসার করো কীভাবে?

সক্রেটিস হালকা হাসি দিয়ে বলল, শোন, জেনথিপি মানে হলুদ ঘোড়া। ঘোড়া যদি আনতেই হয় তো এমন ঘোড়া আনলাম যে ঘোড়া সামলানো সবচেয়ে কঠিন। এখন নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমি যখন জেনথিপি নামের ঘোড়াটিকে সামলাতে পারছি, আমি দুনিয়ার যেকোনো ঘোড়াকেই সামলাতে পারব।

চেরোফন বলল, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার সংসার দেখলে তো তরুণ ছেলেরা বিয়ে করতে ভয় পাবে।

সক্রেটিস হেসে বলল, আমি তরুণদের বলব:

‘এক্ষুনি বিয়ে করে ফেলো, যদি বউ ভালো হয় তাহলে তুমি পাবে একটি সুখের জীবন, আর বউ খারাপ হলে তুমি হয়ে যাবে দার্শনিক।’

৩৩

‘ইতিহাস হলো আসলে দর্শন, শুধু পার্থক্য হচ্ছে-
ইতিহাসে দর্শনের কথা সরাসরি না বলে উদাহরণ দিয়ে বলা হয়।’
—থুকিডিডিস

হেরোডোটাস তার বই শেষ করে ফেলেছেন। পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।

তিনি থুরিল নগরে বসে বই লেখা শেষ করেছেন। এথেন্সে এসেছেন বই প্রকাশ করতে। এথেন্স জ্ঞানী-গুণী মানুষের শহর। তাছাড়া এই শহরে তার সম্মান আছে। অনেক বছর আগে তিনি এথেন্সে এসেছিলেন এক দরিদ্র বেকার ছেলে হিসেবে, আর ফিরে গেছেন সম্মানিত হেরোডোটাস হয়ে। এখানের মানুষ তাকে কদর করে। এখানেই বই প্রকাশ করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়। তার গল্প শুনতে থিয়েটার ভরে যেত। তাই এখানেই তার বই চলবে সবচেয়ে বেশি। বের হওয়ার আগেই কয়েক হাজার কপির ফরমায়েশ চলে এসেছে।

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন পেরিক্লিস। সাথে ছিলেন সফোক্লিস। বিশাল অনুষ্ঠান হয়েছে। বইয়ের নাম ‘হিস্টোরি’ বা ইতিহাস। মানুষের সত্যি ঘটনা নিয়ে এই বই। মানুষের ঘটনা নিয়ে এর আগে কোনো বই লেখা হয়নি।

বই প্রকাশ করে হেরোডোটাস চলে এসেছেন সফোক্লিসের বাসায়। সফোক্লিস তার পুরনো বন্ধু। এথেন্সে এলে হেরোডোটাস তার বাড়িতেই ওঠেন।

আজ বিকেলটা খুব সুন্দর। বসন্ত আসি আসি করছে। হিমেল হাওয়া বইছে। স্নিগ্ধ হাওয়ায় সফোক্লিস আর হেরোডোটাস জলপাই বাগানে গিয়ে বসলেন। দুজন মিলে নতুন বই ‘ইতিহাস’ পড়তে শুরু করলেন।

হেরোডোটাস বই শুরু করেছেন এভাবে—

‘হালকারনিসাস শহরে জন্ম হেরোডোটাস অনেকদিন ধরে যে তদন্ত আর অনুসন্ধান করেছেন, সেটির ফলাফল নিয়েই এই বই। বইটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ঘটনাবলিকে সময়ের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা এবং গ্রিক ও অগ্রিকদের উল্লেখযোগ্য অর্জনের স্মৃতি ধরে রাখা।’

হেরোডোটাস খুবই বুদ্ধির কাজ করেছেন। বইয়ের একেবারে শুরুতেই বইটি যে সত্যি ঘটনা নিয়ে লেখা, সেটি বলে দিয়েছেন। আবার এটি যে তার নিজের তদন্তের ফল, সেটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

মানুষ তার কথা বিশ্বাস করেছে। সবাই বলছে এমন কাজ আগে কেউ করেনি। আগে অনেকে কবিতা লিখেছে, মহাকাব্য, গান, নাটক এসব লিখেছে। কিন্তু মানুষের সত্য ঘটনা, মানুষের মহৎ অর্জন যাতে সময়ের অতলে হারিয়ে না যায়, সেজন্য কেউ বই লিখেনি। এই কাজ প্রথম করলেন হেরোডোটাস। গ্রিক ভাষায় তার বইয়ের নাম হিস্টোরিয়া মানে তদন্ত। তিনি তদন্ত করে মানুষের ইতিহাস বের করেছেন।

হেরোডোটাস গত কয়েক বছর থুরিল দ্বীপে বসে শুধু লিখেছেন, একেবারে নাওয়া-খাওয়া ভুলে লিখেছেন। শেষ করেছেন বিশাল বই। কয়েক বছর আগে এথেন্সে যে গল্প বলেছিলেন, সেটি পুরোটাই আছে তার বইতে। তবে এবার শুধু এথেন্সের কাহিনি লিখেননি। অনেক কিছু নতুন যুক্ত করেছেন। তিনি একটি নয়, আসলে নয়টি বই লিখেছেন। সবগুলো একত্র করে নাম দিয়েছেন ইতিহাস।

হেরোডোটাস দেবতাদের খুব বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন দেবতারা অলিম্পাস পাহাড়ে বসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি তদন্ত করতে গিয়ে যে যা বলেছে, সব কিছু বিশ্বাস করে নিয়েছেন। তাই মানুষ যেসব কথা মুখে মুখে বলে, সেগুলো তিনি সত্যি মনে করে তার ইতিহাস বইয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তাই তার ইতিহাস এলোমেলো ঘটনায় ভরা।

হেরোডোটাস অত্যন্ত সুচতুরভাবে একটি কাজ করেছেন। তিনি ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তার বইতে ইউরোপের মানুষ হলো 'আমি' আর এশিয়ার মানুষ হলো 'তুমি'। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি আর তুমি আলাদা, ইউরোপ আর এশিয়ার মানুষ পৃথক। ইউরোপ হচ্ছে পশ্চিমে আর এশিয়া পূর্ব দিকে। তার বইয়ের বিশাল অংশ জুড়ে পূর্ব আর পশ্চিমের পার্থক্যের কথা। তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, ইউরোপিয়ানরা উন্নত আর এশিয়ানরা বর্বর। এই ধারণা গ্রিসে এমনিতেই ছিল। কিন্তু হেরোডোটাসের মতো বিশাল পণ্ডিত মানুষ যখন তার বইয়ের পাতায় পাতায় এশিয়া আর ইউরোপের পার্থক্যের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন, তখন সেটি সবার মাথায় ঢুকে যায়। তার বই পড়ে ইউরোপের একটি ছোট্ট বাচ্চাও ভাবতে শুরু করবে যে, আমি ইউরোপের মানুষ, তাই এশিয়ার মানুষের থেকে সেরা। পাশ্চাত্যের সভ্যতা উন্নত আর প্রাচ্যের সভ্যতা জঘন্য— এই ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল হেরোডোটাসের 'ইতিহাস' বইটির মাধ্যমে তার বই নয়টি। নয় খণ্ড বিরাট পেপিরাস কাগজে লেখা। কীভাবে ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে শত্রুতা শুরু হলো সেটি নিয়ে হেরোডোটাস প্রথম বইটি শুরু করেছেন।

জলপাই বাগানের ছায়ায় বসে হেরোডোটাসের প্রথম বই পড়েছেন সফোক্লিস। তিনি মিটিমিটি হাসছেন।

সফোক্লিস বললেন, হেরোডোটাস, তুমি খুবই রসিক লোক। তোমার বই শুরু করেছ মেয়ে চুরি নিয়ে। তার মানে তুমি বলতে চাও— মানুষের প্রথম ইতিহাস হলো মেয়ে চুরির ইতিহাস?

হেরোডোটাস হাসলেন। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। ঘটনা সত্য। বইতে তিনি লিখেছেন:

এশিয়া আর ইউরোপের শত্রুতা শুরু হয়েছে মেয়ে চুরি করা নিয়ে। অনেক অনেক বছর আগে এশিয়ায় একটি দেশ ছিল, নাম ফোনিসিয়া[৯০]। এই ফোনিসিয়ার লোকেরা ইউরোপের (গ্রিক) একটি মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায়, মেয়েটির নাম আইও। এর প্রতিশোধ নিতে গ্রিকরা ইউরোপা নামের একটি এশিয়ান মেয়েকে চুরি করে নিয়ে আসে। এই ইউরোপা থেকেই ইউরোপ নাম এসেছে। এভাবে একের পর এক মেয়ে চুরি চলতে থাকে। সেই ধারাবাহিক মেয়ে চোরদের একজন হলো এশিয়ার ট্রয় নগরের রাজপুত্র প্যারিস, যে গ্রিসের স্পার্টার মেয়ে হেলেনকে চুরি করে। তারপর ট্রয় যুদ্ধ হয়। আর সেই যে শুরু হয়েছে এশিয়া আর ইউরোপের ঝগড়া তা এখনও চলছে। সেজন্যই গ্রিস আর পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে।

সফোক্লিস বললেন, এখানে একটু ঝামেলা আছে। তুমি যেভাবে লিখেছ, আমরা ইউরোপিয়রা কিন্তু এভাবে ভাবি না। আমাদের কাহিনিতে আছে দেবতা জিউস ইউরোপাকে চুরি করে গ্রিসের ক্রিত দ্বীপে নিয়ে আসে, আবার দেবতা জিউসই আইওকে গ্রিস থেকে মিশরে নিয়ে যায়। তুমি দেবতার কথা বাদ দিয়েছ। বলেছ ইউরোপা আর আইওকে চুরি করেছিল মানুষ। এই পার্থক্য কেন?

হেরোডোটাস বললেন, আমি এশিয়ার লোকদের সরাসরি জিজ্ঞেস করেছি। ওরা দেবতা জিউসের এই পাল্টাপাল্টি চুরি বিশ্বাস করে না। ওরা বলে চুরি মানুষই করেছে, দেবতা নয়।

সফোক্লিস বললেন, তার মানে তোমার এই বই এশিয়ার লোকদের মতামত, গ্রিকদের মতামত নয়।

হেরোডোটাস বললেন, সেটি নয়। আমি সবার মতামতই নিয়েছি। বইয়ের শেষের দিকে শুধুই এথেন্সের মানুষের কথা।

সফোক্লিস ভাবছেন, হেরোডোটাস খুবই চালাক। তিনি সবাইকে খুশি রাখতে বই লিখেছেন। এশিয়ার লোকেরা যেভাবে ইউরোপকে দেখেছে, হেরোডোটাস সেভাবে শুরু করেছেন।

সকোক্লিস পড়ছেন। এরপর হেরোডোটাস শুরু করেন লিডিয়া নামক দেশের কথা। লিডিয়া দেশটি আর এখন নেই। ট্রয় নগরী, মিলেটাস শহর এসব বিখ্যাত জায়গা লিডিয়ার মধ্যে ছিল। এই লিডিয়ার এক রাজা ক্রোয়েসাসের রাজসভায় গিয়েছিলেন এথেন্সের জ্ঞানী আইনপ্রণেতা সলোন। সলোন রাজাকে বলেছিলেন তার বিখ্যাত উক্তি:

‘মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো মানুষকে সুখী বলা যায় না, সৌভাগ্যবান বলা যায় মাত্র।’ সলোনের এই ঘটনা এথেন্সে বিখ্যাত। হেরোডোটাসও মজা করে লিখেছেন—

সলোন গেলেন রাজসভায়। ততদিনে সলোন জ্ঞানী মানুষ হিসেবে বিখ্যাত। রাজা তাকে তার সব ধন-সম্পদ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘মহামতী সলোন, বলুন তো— পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ কে?’ রাজার মুখে অহংকারের হাসি। তার বিশ্বাস— এত সম্পদ দেখে সলোন তাকেই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ বলবেন। কিন্তু সলোন বললেন, ‘পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী হলেন এথেন্সের টেলাস নামে এক লোক।’ রাজা অবাক হয়ে বললেন, ‘কেন? তার কত সম্পদ আছে?’ সলোন বললেন, ‘তার খুব বেশি সম্পদ নেই। তিনি ধনীও নন, আবার গরিবও নন। তার সন্তানেরা সবাই ভালো ও সুচরিত্রের; তিনি নাতি-পুতিসহ সন্তানদের সুখী দেখে গেছেন এবং একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ হিসেবে নিজের ইচ্ছায় দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছেন। এই লোকটিই সবচেয়ে সুখী।’ রাজা অনিচ্ছায় মেনে নিয়ে বললেন, ‘তাহলে পৃথিবীর দ্বিতীয় সুখী মানুষ কে?’ রাজা ভাবলেন, এবার অবশ্যই রাজার নাম বলবেন। কিন্তু না, সলোন বললেন, ‘সেটি হলেন আগলুস নামক এক মানুষ; তিনি নিজের খামারে কাজ করে এত সুখী ছিলেন যে, কোনোদিন সেই জায়গা ছেড়ে যাওয়ার দরকার মনে করেননি; তিনি পুরো পরিবারের সামনে মারা গেছেন এবং মরার সময় সবাই তার প্রশংসা করেছে।’ রাজা মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তাহলে পৃথিবীর তৃতীয় সুখী মানুষ কে?’ এবারও সলোন রাজার নাম বললেন না, অন্য একজনের নাম বললেন। রাজা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ‘ওহে জ্ঞানী সলোন, আমার সাথে কি তোমার কোনো শত্রুতা আছে? এত সুখী লোকের নাম বলছো, তার মধ্যে আমি নেই?’ সলোন বললেন, ‘রাজা, তোমার আজকে যে সম্পদ আছে তাতে তুমি অবশ্যই সৌভাগ্যবান; কিন্তু দুদিন পরে কী হবে তা তুমি জানো না। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো মানুষকে সুখী বলা যায় না।’ রাজা ভাবল, এই সলোন ব্যাটা একটি মিথ্যাবাদী অথবা মহামূর্খ। আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজা পারস্য আক্রমণ করে হেরে গেল, রাজ্য শেষ হয়ে গেল, সব ধন-সম্পদ নাই হয়ে গেল। তখন তার সলোনের কথা মনে পড়ল। তিনি চিৎকার করে বললেন, ‘ওহে সলোন, তুমি সত্যিই বিচক্ষণ মানুষ।’ এই রাজাকে পরাজিত করেই সাইরাস দ্যা গ্রেট বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

হেরোডোটাসের এই ঘটনা সফোক্লিস খুব পছন্দ করলেন। এথেন্সের মানুষও খুব পছন্দ করবে। এখানে এথেন্সের জ্ঞানী মানুষ সলোনের বিচক্ষণতা বলা হয়েছে। এথেন্সের মানুষের পছন্দ না করার কোনো কারণ নেই।

হেরোডোটাসের বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড মিশর ভ্রমণ নিয়ে। মিশরের ভূগোল, নীল নদ, ধর্ম, পশু-পাখি নিয়ে মজার মজার অনেক কথা লিখেছেন।

দ্বিতীয় বইটি পড়তে পড়তে সফোক্লিস বললেন, এখানে তুমি স্পার্টার হেলেনের কথা লিখেছ। তুমি লিখলে, হেলেন প্যারিসের সাথে ট্রয় শহরে যায়নি, সে পুরো সময়টা মিশরে ছিল। এটি কী করে হলো? হোমারের ইলিয়াড অনুযায়ী হেলেন ট্রয় নগরেই ছিল। হেলেন নিজের চক্ষে ট্রয়ের যুদ্ধ দেখেছে।

হেরোডোটাস বললেন, আমি যেটি লিখেছি, সেই কাহিনিই মিশরের লোকেরা বলে। তারা বলে হেলেন মিশরে ছিল। পারস্যের লোকজনও একথাই বিশ্বাস করে। গ্রিকরা যেভাবে ভাবে, হোমার সেভাবে লিখেছেন। আর আমি মিশর ঘুরে এসে মিশরের লোকেরা যা মনে করে সেভাবে লিখেছি। এখন আপনি কোনটা পছন্দ করবেন, সেটি আপনার বিবেচনা।

সফোক্লিস ভাবছেন, হেরোডোটাস কি তার বই মিশরে বিক্রি করতে চান? তা না হলে হেলেনের মতো একটি পরিচিত কাহিনিকে পাল্টে তিনি মিশরের মানুষের কথা বিশ্বাস করে লিখলেন যে, হেলেন কোনোদিন ট্রয়েই যায়নি। পুরো সময় সে মিশরে ছিল। সফোক্লিস মনে মনে হাসছেন। হেরোডোটাস তো নাট্যকার নন। নাট্যকার হলে দর্শকের মনের কথা বুঝতো।

হেরোডোটাস তার তৃতীয় বইতে লিখেছেন— পারস্যে কীভাবে বিশাল সাম্রাজ্য হলো, পারস্য কীভাবে মিশর দখল করল সেসব কথা। চতুর্থ বইতে লিখেছেন গ্রিসের আশেপাশের কিছু শহরের জীবনযাপন নিয়ে।

সফোক্লিস বললেন, এই যে তোমার চার নম্বর বইয়ে আমাজন নামে নারী যোদ্ধাদের কথা লিখেছ, এটি খুবই মজার। এটি ভালো লেগেছে।

হেরোডোটাস বললেন, পঞ্চম বই থেকে এথেন্সের কাহিনি এসেছে। এটি আপনার আরও ভালো লাগবে।

সফোক্লিস বললেন, কী আছে তোমার পঞ্চম বইতে?

‘পঞ্চম বইতে গ্রিসে বর্ণমালা আসার কথা লিখেছি। ফিনিশীয়দের কাছ থেকে লেখা শিখেছে গ্রিকরা। এথেন্স আর স্পার্টার ঝগড়ার কথা আছে। ক্লিসথেনিস কীভাবে এথেন্সে গণতন্ত্র আবিষ্কার করেন, সেই ঘটনা লিখেছি।

সফোক্লিস বললেন, গণতন্ত্রের জন্মের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ঐ অংশটা পড়, আমি শুনব। তোমার মুখে গল্পে গল্পে গণতন্ত্রের কাহিনি শুনি।

হেরোডোটাস গণতন্ত্র জন্মের অংশটা পড়লেন। ততক্ষণে সূর্য সাগরের মধ্যে ডুবি ডুবি করছে। আলো নিভু নিভু।

হেরোডোটাস বললেন, ষষ্ঠ বইতে ম্যারাথনের যুদ্ধ নিয়ে লিখেছি। আমি এথেন্সে যেভাবে গল্প বলেছিলাম, সেভাবেই লিখেছি।

সফোক্লিস বললেন, এবার আমাদের নিজের জীবনের কাহিনি চলে এসেছে। এবার মজা লাগবে। কিন্তু সময় নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পরের বইগুলোতে কী লিখেছ?

হেরোডোটাস বললেন, সবই আপনাদের জীবনের কথা। সপ্তম বইতে রয়েছে পারস্যের দ্বিতীয়বার এথেন্স আক্রমণ। থার্মোপিলাইয় স্পার্টার রাজা লিওনিদাস মাত্র তিনশো সেনা নিয়ে পারস্যকে আটকে রেখেছিল, সেই কথা। অষ্টম বইতে সালামিনা দ্বীপের যুদ্ধে পারস্য কীভাবে ফাঁদে পড়ে আর এথেন্সের কাছে হেরে যায়, সেই কথা। নবম বইতে গ্রিসের কাছে পারস্যের চূড়ান্ত পরাজয়।

সফোক্লিস বললেন, এগুলো তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি। এগুলো পরে পড়ব।

হেরোডোটাসের বই এথেন্সে আলোড়ন তুলল। তবে তিনি যে ভেবেছিলেন, সবাই পছন্দ করবে, সেটি হয়নি। লোকে বলাবলি করতে লাগল, পুরো বইতে লেখক এশিয়ার দেশগুলোর কথা বেশি লিখেছেন। এথেন্স গুরুত্ব কম পেয়েছে।

এসব কথার উত্তর করেন না হেরোডোটাস। তিনি জানেন, তিনি এথেন্সকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বইতে এশিয়ার মানুষের কথা থাকতেই পারবে না, গ্রিকদের এই ভাবনাটা একেবারেই ঠিক নয়। পাঠকরা বড় স্বার্থপর। শুধু নিজের কথা শুনতে চায়।

কেউ পছন্দ করুক, আর নাই করুক এথেন্সের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ অবশ্যই হেরোডোটাসের বই 'ইতিহাস' পড়েছে। ইতিহাস শব্দটি এখন সবার মুখে মুখে। এই বই থেকেই একটি নতুন বিষয় সৃষ্টি হলো। তার নাম— ইতিহাস। আর হেরোডোটাস হয়ে গেলেন ইতিহাস শাস্ত্রের জনক।

আর এই বই থেকেই শিখে গেল যে, ইউরোপ মানেই উন্নত আর এশিয়া মানেই বর্বর। জ্ঞানের জগতে শুরু হলো পূর্ব-পশ্চিম বিভেদ। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সংঘাত।

***

৯০. ফোনিসিয়া একটি প্রাচীন দেশ। বর্তমানের তুরস্ক, লেবানন, ইসরায়েল অংশ।

৩৪

‘There is nothing permanent except change.’
—Heraclitus

আজ পার্থেনন উদ্বোধন।

এথেন্সের সবচেয়ে গৌরবের দিন। পেরিক্লিসের স্বপ্ন পূরণের দিন। পনেরো বছর ধরে তারা এথেন্স নগরীকে সাজিয়েছেন। আজ সারা দুনিয়াকে দেখানোর সময় এসেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সারা গ্রিসের সব গণ্যমান্য মানুষ এসেছেন। দেশ- বিদেশের হাজার হাজার মানুষে ভরে গেছে এথেন্স। কস দ্বীপ থেকে এসেছেন বড় চিকিৎসক হিপোক্রাটিস। থুরিল দ্বীপ থেকে এসেছেন হেরোডোটাস। গ্রিসের অনেক নগর থেকে রাজারা নিজে এসেছেন। অনেক নগরের রাজপুত্র এসেছেন, আর গণতান্ত্রিক নগরগুলোর নেতারাও এসেছেন। মনে হচ্ছে যেন চাঁদের হাট।

পেরিক্লিস, আসপাশিয়া আর ফিডিয়াস বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে এক্রোপোলিসের উপর উঠলেন। পাহাড়ে উঠেই অতিথিদের চোখ নষ্ট হওয়ার জোগাড়। এখনও তারা শুধু

পার্থেননের দুই পাশ দেখতে পাচ্ছেন। তাতেই বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীতে এরকম ভবন আগে আর হয়নি। পার্থেননের বাইরের দেয়ালের ভাস্কর্য দেখে তারা চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এরকম জিনিস মানুষ বানাতে পারে!

অতিথিরা একবার পার্থেননের দেয়ালে তাকাচ্ছে, একবার শিল্পী ফিডিয়াসের দিকে তাকাচ্ছে। অতিথিদের মধ্যে যারা শিল্পী, তাদের ইচ্ছে করছে ফিডিয়াসের আঙুলগুলো ধরে চুমো খেতে। কীভাবে এই আঙুলগুলো দিয়ে তিনি পাথর খোদাই করে এরকম সুন্দর জিনিস করেছেন!

তারা পার্থেননের দেয়াল দেখেই মুগ্ধ। ভেতরে যে কী আছে, সেটি তাদের ধারণায়ই নেই।

দেবী এথিনার উদ্দেশ্যে পশু বলির পরে ধীরে ধীরে খুলতে লাগল পার্থেননের বিশাল দরজা। আর সেই সাথে ধীরে ধীরে উঁকি দিতে লাগল একটি অপার্থিব সোনালি আলো। সেই আলোয় ঝলমল করছে দেবী এথিনা। অতিথিরা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এর চেয়ে সুন্দর আর জমকালো জিনিস কেউ কোনোদিন দেখেনি। অতিথিদের মনে হচ্ছে— তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দেবী এথিনা। চল্লিশ ফুট উঁচু সোনার এথিনা। তাঁর ত্বক হাতির দাঁতের আর পোশাক সোনার। প্রত্যেকের চোখে এক মহাসাগর বিস্ময়।

এই বিস্ময়ই চেয়েছিলেন পেরিক্লিস। তিনি অতিথিদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অতিথিরা ভবনের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছেন। যেদিকে চোখ যায়, সবই অপূর্ব

অতিথিদের মধ্যে হিপোক্রাটিসও আছেন। বিস্ময়ে তার মুখও হা হয়ে গেছে। পেরিক্লিস যা করেছেন, তা অতুলনীয়। এথেন্স ঝলমল করছে। এক্রোপোলিস পাহাড়টি একেবারে মায়াপুরীর মতো লাগছে। পাহাড়টির উপরে এথিনার মন্দির পার্থেনন, তার উল্টোদিকে ইরেকথিওন, সামনে নাইকি বা বিজয়ের দেবীর মন্দির, এথিনার ব্রেঞ্জের মূর্তি, সোনার মূর্তি সব মিলিয়ে একেবারে অভূতপূর্ব ব্যাপার। এক্রোপোলিসের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে— নিচে আগোরা, খুবই চমৎকার। সুন্দর সুন্দর ভবন, বিশাল রাস্তা। আর চারদিকে একেবারে মানুষের মতো সব মূর্তি। এথেন্সকে একেবারে দেবতাদের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

সক্রেটিস জেনথিপিকে নিয়ে পার্থেনন দেখতে এসেছে। তাদের সাথে বিশাল বহর। ক্রিতো ও চেরোফোন তাদের পরিবার নিয়ে এসেছে। সক্রেটিস একের পর এক ভবনের বর্ণনা দিচ্ছে। সে নিজে একজন পাথর শিল্পী, তাই ভবন বা মূর্তি সে ভালো বোঝে। সে আঙুল দিয়ে দিয়ে বোঝাচ্ছে।

জেনথিপি মনে মনে হাসছে। তার স্বামী এত কিছু জানে? একেই কি জ্ঞান বলে? সংসার জীবনে একটি জ্ঞানতত্ত্ব আছে। পুরুষেরা সারাদিন যার কাছে যা শোনে, রাতে এসে বউয়ের কানে কানে বলে— শোন বউ, ঘটনা হলো এটি। বউ ভাবে ঘটনাটা তার

স্বামীই শুধু জানে; আর কেউ জানে না। তার স্বামী বিরাট জ্ঞানী। এই ভাবনা থেকে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, সে স্বামীকে মান্য করে। আর বউকে কম জ্ঞানী প্রমাণ করে মনে মনে সুখ পায় স্বামী।

সক্রেটিস তার বিবাহিত জীবনে এসব কিছুই করেনি। তাকে বাইরের সবাই জ্ঞানী বলে, তাই বউয়ের কাছে জ্ঞান প্রমাণের কোনো দরকারই মনে করেনি। জেনথিপি কিছু জিজ্ঞেস করলেই শুধু উত্তর দিয়েছে, নিজে থেকে কিছুই বলেনি।

সক্রেটিস পার্থেননের সামনে দাঁড়িয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছে। এই মুহূর্তে সে ভ্রমণ গাইড। মূর্তি নিয়ে তার মতো আর কে বলতে পারে? জেনথিপি মুগ্ধ হয়ে শুনছে। স্বামীর গরবে গরবিনী হতে যে এত ভালো লাগে, তা সে এতদিন জানত না। সে ভাবছে এরকম কথা তো সক্রেটিস তার সাথে কোনোদিন বলেনি। এখন থেকে মাঝে মাঝে ঝগড়া বাদ রেখে অন্য আলাপের চেষ্টা করতে হবে।

ক্রিতো বলল, পৃথিবীতে এথেন্সই এখন সবচেয়ে সুন্দর শহর।

সক্রেটিস বলল, আমি এথেন্সের বাইরে কখনো যাইনি। আমি ঘরকুনো মানুষ না, এথেন্সকুনো মানুষ। পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে এমন কিছু আছে কিনা সেটি জানে আমাদের বিখ্যাত পরিব্রাজক জনাব চেরোফোন।

চেরোফোন লজ্জা পেল না। পরিব্রাজক না হোক, সে যে জীবনে অনেক ঘুরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চেরোফোন বলল, আমি লিখে দিই, এই জগতে এত সুন্দর শহর আর কোথাও নেই। আমি মিশরে গিয়েছি, পারস্য, ব্যাবিলনে গিয়েছি; পিরামিড দেখেছি, উঁচু উঁচু দালান-কোঠা দেখেছি। এক্রোপোলিসের কাছে সেসব কিচ্ছু না, একেবারেই কিচ্ছু না।

পার্থননের উল্টো দিকে ইরেকথিয়ান ভবনটি দেখে মেয়েরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। সুন্দর সুন্দর পাথরের মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাথায় বোঝা। একটু লক্ষ করে দেখল এই মেয়েদের মাথায় সাধারণ কোনো বোঝা না, একেবারে পুরো দালানটি তাদের মাথায়। এগুলো মেয়ে নয়, এগুলো দালানের খুঁটি, বিশাল কলাম। কলামগুলোকে মেয়েদের শরীর আর মুখের আদলে বানিয়েছে। মনে হচ্ছে কয়েকটি মেয়ে পুরো ভবনকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জেনথিপি বলল, এই ভবনের বুদ্ধি যে করেছে, সে খুবই বুদ্ধিমান মানুষ। সে জানে যে মেয়েরা সারাজীবন শুধু ভারই বহন করে।

সক্রেটিস বলল, এই কথাটা আমার সংসারের জন্য একশ ভাগ সত্য। আমার সংসারের পুরো বোঝা জেনথিপির মাথায়।

জেনথিপি দেবী এথিনার কাছে মানত করল, হে দেবী, সক্রেটিসকে একটু সুবুদ্ধি দাও, সংসারে একটু মন দাও। তোমাকে জোড়া-পাঁঠা বলি দেব।

সারা গ্রিসের মানুষ এথেন্সের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলছে। সবাই এথেন্স দেখে একেবারে আহ্লাদিত। কিন্তু বড় চিকিৎসক হিপোক্রাটিস খুব খুশি হলেন না। এথেন্সের মানুষ এত বেশি খায়? এত বেশি খেলে মানুষ সুস্থ থাকে? আর চারপাশে নোংরা-আবর্জনা। এক্রোপোলিসকে কী চমৎকার করে সাজিয়েছে— একেবারে জিউসের সভার মতো। চোখ ঝলসে যায়। কিন্তু নগরের বাইরেটা অপরিষ্কার। এমন সুন্দর নগরের সামনে একটি বড় বিপর্যয় আসছে। এরা স্বাস্থ্য সচেতন নয়। অনেক বার মনে হয়েছিল পেরিক্লিসকে কথাটা বলবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়নি। তারা আনন্দে মশগুল। সবাই এথেন্সের নামে বাক-বাকুম করছে। সবাই মধুর মধুর কথা বলছে। এ সময় নোংরা- আবর্জনা নিয়ে কথা বললে পেরিক্লিস খুশি হবেন না।

***

পার্থেনন উদ্বোধন হয়েছে। সারা গ্রিসে এথেন্সের নাম আরও ছড়িয়ে গেছে। অনেকেই খুশি হয়েছে। কিন্তু খুশি হয়নি স্পার্টা। এথেন্স শক্তিশালী হলে, তাদের জন্য ভয়ের। কিছুদিন ধরেই পেরিক্লিসের নানান কাজে ভয় পাচ্ছিল স্পার্টা। তারা ভাবছে এথেন্সকে দ্রুত আটকাতে না পারলে এমন শক্তিশালী হয়ে যাবে যে আর আটকানো যাবে না।

গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলো মোটামুটি দুটি দলে বিভক্ত। একদলের নাম ডিলিয়ান লীগ। এই দলের নেতা এথেন্স। ডিলস দ্বীপের নামে এই দলের নাম ডিলিয়ান লীগ। আর অন্য দল স্পার্টার নেতৃত্বে পেলোপনেশিয়ান জোট। এথেন্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রিসের বিরাট এলাকাকে বলে পেলপোনেশিয়া। তাদের জোটের নাম পেলোপনেশিয়ান জোট। এই দুই জোটের মধ্যে একটি ঠাণ্ডা লড়াই সব সময়ই ছিল। শুধু যখন মহাশক্তিশালী পারস্য তাদের আক্রমণ করেছিল, তখন তারা বন্ধু হয়েছিল। একসাথে পারস্যের বিরুদ্ধে লড়েছে। পারস্য চলে যেতেই নিজেরা আবার শত্রু হয়ে গেছে। এখন এথেন্সের বাড়-বাড়ন্ত সহ্য হচ্ছে না স্পার্টার। তারা এথেন্সকে আটকাতে ছুঁতা খুঁজছে। যেকোনো উপায়ে যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছে। তারা ছুঁতা খুঁজছে। তারা এথেন্সের ঠিক পাশের নগর মেগারাকে ঘুঁটি হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। এথেন্সকে উস্কে দিচ্ছে।

একদিন পেরিক্লিস বারান্দায় বসে সংসদের বক্তৃতা করছেন। এমন সময় খবর এলো মেগারার কিছু লোক এথেন্সে এসে দেবী দিমিত্রার পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করেছে। পেরিক্লিসের রাগ লাগলেও ধৈর্য ধরলেন। তার পরদিন আবার খবর এলো, আসপাশিয়ার শহরের দুটি মেয়ে এথেন্সে থাকত, তাদেরকে তুলে নিয়ে গেছে মেগারার কিছু যুবক। ছোট্ট নগর মেগারার পায়ে পা দিয়ে ঝামেলা করতে চাইছে? পেরিক্লিস দূত পাঠালেন মেগারাতে। দূত চিঠি নিয়ে গেল। মেগারার নেতারা যেন এথেন্সের দেবীর জমি অপবিত্র

করার জন্য দোষীদের শাস্তি দেয়। আর যে দুটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে, তাদেরকে যেন অবিলম্বে ফিরিয়ে দেয়।

কিন্তু মেগারার নেতারা স্পার্টার বুদ্ধিতে তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। তারা পেরিক্লিসের কথা তো শুনলোই না, উল্টা এথেন্সের দূতকে হত্যা করল। এবার এথেন্সকে শক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। এথেন্সের সবাই বলছে, এক্ষুনি মেগারা আক্রমণ করো, সেনা পাঠাও। কিন্তু পেরিক্লিস ভাবছেন, একটি নতুন কিছু করবেন। তিনি মেগারাকে শিক্ষা দিবেন একটু অন্যভাবে। তাদের হাতে মারবেন না, ভাতে মারবেন।

পেরিক্লিস সংসদে প্রস্তাব করলেন, আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস করেছি। তো আসুন, মেগারাকে শিক্ষা দিতেও আমরা নতুন একটা কিছু করি আমরা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেব। এথেন্সের জোটের সকল নগর মেগারার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে।[৯১] এথেন্সের মিত্র বন্দর ছাড়া মেগারাতে জাহাজ যেতে পারে না। আমরা মেগারার জন্য বন্দর বন্ধ করে দেব।

এটি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা।

প্রথমে মেগারার নেতারা ভাবলো, এসব আবার কী জিনিস। এতে কী হবে? আমরা অতো সহজে মাথা নোয়াবো না। কিন্তু তারা যা ভেবেছিল, বিষয়টি তার চেয়ে অনেক বেশি সমস্যার। বাণিজ্য বন্ধ মানে অন্য নগর থেকে খাদ্য আসা বন্ধ। কয়েক মাসেই এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আর কোনো উপায় নেই। দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। মানুষ মারা যেতে শুরু করল। মেগারাকে মেনে নিতে হলো এথেন্সের বশ্যতা।

মেগারা মানলেও, মানল না স্পার্টা। শীতের শুরুতেই তারা এথেন্সে সেনা পাঠিয়ে দিল। শুরু হবে যুদ্ধ। ভয়াবহ যুদ্ধ। পেরিক্লিস এই যুদ্ধের নাম দিলেন পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ[৯২]।

এথেন্সের সবাই হৈ হৈ করে উঠেছে। স্পার্টার ব্যাটাদের সাহস তো কম না! চলো ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু পেরিক্লিস বললেন, একটু রয়ে সয়ে আগাতে হবে। সাথে সাথে নেমে পড়া যাবে না। আসপাশিয়ার সাথে আলাপে বসেছেন তিনি। আসপাশিয়ার মনেও রাগ। মেগারা তাকে অনেক জ্বালিয়েছে। স্পার্টার শক্তিতেই জ্বালিয়েছে। এখন সময় আসছে, চলো স্পার্টাকে শিক্ষা দিই।

পেরিক্লিস বললেন, আসপাশিয়া, তুমি তো সামনে থেকে যুদ্ধ দেখোনি। যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস। আর স্পার্টার সাথে যুদ্ধ! সে খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। স্পার্টানরা এক একজন ভীষণ যোদ্ধা। ওরা বাচ্চাদের বড় করে শুধুই যুদ্ধ করার জন্য। জন্মের সময় কোনো বাচ্চার শরীরে একটু মাত্র খুঁত থাকলেই তাকে সাথে সাথে মেরে ফেলে। একটি ছেলের সাত বছর হলেই মা-বাবার থেকে দূরে গুরুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। শুরু হয় নির্মম জীবন। গুরু তাকে ভয়াবহ যুদ্ধ শেখায়। বানিয়ে তোলে ভয়ংকর খুনি। এমন করে বড় করে যেন মায়াদয়া বলতে কোনো জিনিসই না থাকে। আঠারো বছর হওয়ামাত্র ছেলেটিকে

একজন শত্রুকে খুন করতে হবে। খুনি না হওয়া পর্যন্ত ঐ ছেলে স্পার্টার নাগরিকত্ব পাবে না।

আসপাশিয়া বলল, উফ, কী ভয়াবহ!

'সেই ভয়াবহ খুনিদের সাথেই এখন যুদ্ধ করতে হবে আমার ছেলেদের।'

আসপাশিয়া বলল, 'স্পার্টানরা তো লিওনিদাসের বংশধর।'

'হুঁম, ওরা সবাই নিজেকে লিওনিদাস মনে করে। লিওনিদাস যেমন একা পারস্যের পথ আটকে ছিল, মৃত্যুর আগে পথ ছাড়েনি, সেরকম প্রতিজন স্পার্টান মরার আগে পথ ছাড়বে না। '

আসপাশিয়া ভয় পেয়ে বলল, তাহলে কী হবে?

'আমদের কৌশল করতে হবে। আমরা শুধু নৌযুদ্ধ করব, কারণ পানিতে আমরা শক্তিশালী। আমরা মাটিতে যুদ্ধ করব না, স্থলে স্পার্টার সাথে পারা যাবে না। তাই ওরা আসার আগেই এথেন্সের সবাই নগর দেয়ালের ভেতরে ঢুকে পড়বে। ওরা এই দেয়াল ভেঙে আসতে পারবে না।'

'এই লাখ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয়ালের মধ্যে চলে আসবে?'

'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সরকার থেকে খাবারের ব্যবস্থা করব।'

'কত দিন দেয়ালের মধ্যে থাকবে?'

'শীতের শেষে স্পার্টানরা চলে যেতে বাধ্য হবে। ওদের অস্ত্র আছে, কিন্তু টাকা নেই। বসন্তের শুরুতে ওদের জমি চাষ করতে যেতেই হবে।'

পেরিক্লিসের প্রস্তাব পাস হলো সংসদে। এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি কেউ বলতে পারেনি। স্পার্টার সেনা আসার আগেই দলে দলে মানুষ ঢুকতে শুরু করল দেয়ালের ভেতরে। মানুষ কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় নিয়ে আসছে। তারা জানে না কোথায় থাকবে, স্ত্রী কন্যার কী হবে, দুধের শিশু কী খাবে। তবু পেরিক্লিস যখন বলেছেন, একটি ব্যবস্থা হবেই। জীবন বাঁচাতে আর তো কোনো উপায় নেই। রাস্তার দুপাশে লাইন ধরে ছোট্ট ছোট্ট ঘুপচি ঘর উঠতে লাগল। আড়াই লাখ লোক ঠাঁই নিল ছোট্ট দেয়ালের ভেতরে। সারা এথেন্স হয়ে গেল একটি বিশাল বস্তি।

এর ভেতরেই কয়েকটা ছোট্ট ঘুপচি বানিয়েছে ক্রিতো। তার একটিতে আছে সক্রেটিস আর জেনথিপি। বাড়ি ঘর নিয়ে সক্রেটিসের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু জেনথিপি কাঁদছে। তার কেবলই ছোট্ট সংসারের কথা মনে পড়ছে। জলপাইগুলো এখনও বিক্রি হয়নি, হাতে কোনো টাকা নেই। কীভাবে চলবে, বস্তিতে কী খাবে কিচ্ছু জানে না। তবুও ভালো যে তাদের এখনও কোনো সন্তান নেই। ক্রিতোর স্ত্রী দুটো দুধের শিশু নিয়ে খুব বিপদে আছে। তাদের টাকার অভাব নেই, কিন্তু এই ছোট্ট ঘুপচি শিশুরা সহ্য করতে পারছে না, থেকে থেকে কাঁদছে। নতুন বস্তিতে দুদিন যেতেই শুরু হয়েছে তীব্র গন্ধ, মল-

মূত্র নিষ্কাশন নিয়ে খুবই ঝামেলা চলছে। কদিনে সেই ঝামেলা মিটলেও গরু, ছাগল, কুকুর নিয়ে বিপদে পড়েছে মানুষ। এদেরকে বাঁচিয়ে রাখাই দায় হয়ে পড়েছে।

সক্রেটিসদের জন্য এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। গত পঞ্চাশ বছর এথেন্সে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি ছিল। পারস্য বাহিনী যাওয়ার পর আর এমন কিছু ঘটেনি। এখন নতুন করে অনেক কিছু করতে হচ্ছে। কোনো রকমে পরিবারের একটু ঠাঁই করেই যুবক পুরুষরা শুরু করেছে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ। সফোক্লিসের অস্ত্র কারখানায় চলছে অস্ত্র বানানো। যার ঘরে যা অস্ত্র আছে সব নিয়ে এসেছে। বর্শা, ঢাল সবকিছু চকচকে করে ফেলা হচ্ছে যাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে মানুষের দেহ।

স্পার্টার সেনারা এসে দেখে বাড়িঘর খালি। মানুষ সব দেয়ালের ভেতরে। মানুষ মারতে না পারার দুঃখে তারা ঘর-বাড়ি, শস্যক্ষেত সবকিছুতে আগুন দিয়ে দিল। মানুষ হাহাকার করে দেখতে থাকল লেলিহান আগুনে পুড়ে যাচ্ছে তাদের ঘর, ছাই হয়ে যাচ্ছে ফসলের মাঠ। লেলিহান শিখায় ঢেকে যাচ্ছে আকাশ, বাতাসে কালো ধোঁয়া। জেনথিপি চিৎকার করে কেঁদে উঠল, তার ছোট্ট সংসার পুড়ে যাচ্ছে। সক্রেটিসের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে ক্রিতো দেখছে, জ্বলে যাচ্ছে তার শত শত বিঘা জলপাই বাগান, ফসলের ক্ষেত। সন্ধ্যার আঁধারকে আলো করে ধিকিধিকি জ্বলছে ক্রিতোর সুন্দর ঘর। ক্রিতো নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে, শুধু তার দু'চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে।

সব ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে এথেন্সের দেয়ালের চারপাশে দাঁড়িয়ে রইলো স্পার্টার সেনা। কেউ বাইরে বের হতে পারবে না। কিন্তু পেরিক্লিসের বুদ্ধি কাজে দিয়েছে। এথেন্সের মানুষ মারা যাচ্ছে না। সাগরের যুদ্ধে এথেন্স সেরা, তাদের জাহাজ উন্নত। স্পার্টা সাগরে তাদের জাহাজ আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে না। তাই খাওয়ার সাপ্লাইয়ে সমস্যা হবে না। অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে এই যুদ্ধে জলভাগ এথেন্সের, আর স্থলভাগ স্পার্টার দখলে। দিন যাচ্ছে। দেয়ালের মধ্যে আছে এথেন্সের মানুষ, অপেক্ষা করছে কবে স্পার্টার সেনারা চলে যাবে। সরাসরি যুদ্ধ হচ্ছে দূরে দ্বীপে। গ্রিসের নানা জায়গায় যুদ্ধ হচ্ছে। এথেন্সের মিত্র নগরগুলোর সাথে স্পার্টার মিত্র নগরগুলোরও যুদ্ধ হচ্ছে। গ্রিসের সব নগর দুই পক্ষে ভাগ হয়ে গেছে। এই যুদ্ধ থেকে কেউ দূরে থাকতে পারবে না।

সক্রেটিসও দূরে থাকতে পারবে না। সক্রেটিসের কাছে খবর এসেছে তৈরি থাকতে, তাদের যুদ্ধে যেতে হবে। সম্ভবত তাকে দূরের কোনো দ্বীপে যেতে হবে যুদ্ধ করতে।

***

৯১. পেরিক্লিস খ্রি. পূ. ৪৩২ অব্দে মেগারা নগরকে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেন (Megarian Decree) যেটি ইতিহাসে প্রথম বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা।

৯২. খ্রি. পূ. ৪৩১-৪০৪ অব্দে স্পার্টার সাথে এথেন্সের যে দীর্ঘ যুদ্ধ হয়, সেটির নাম পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ (Peloponnesian War)

৩৫

‘ঠিক সময়ে ঠিক সাহসটি করতে পারলেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।’
– থুকিডিডিস

সক্রেটিস এখন যোদ্ধা।

সে যুদ্ধ করতে এসেছে উত্তর গ্রিসে। জায়গাটির নাম পটিডিয়া[৯৩]। এত দূরে এসে তার মন হু হু করে। সক্রেটিস জীবনে এথেন্স ছেড়ে কোথাও যায়নি। তবে মন খারাপের আসল কারণ হলো জেনথিপিকে একা রেখে এসেছে। বউ কাছে থাকলে সারা দিন ঘ্যান ঘ্যান করত, তখন মনে হতো বাড়ির বাইরে থাকলেই ভালো। কিন্তু এখন দূরে এসে মনে হচ্ছে সেই ঘ্যান ঘ্যান আমার কত আপন! জীবনে এই প্রথম জেনথিপির জন্য মন কাঁদছে। যুদ্ধে যেকোনো সময় প্রাণ যেতে পারে, তখন মেয়েটি একেবারে অকূল সাগরে পড়বে। মেয়েটি একেবারে একা, তাদের সন্তান হয়নি এখনও।

সক্রেটিস হপলাইট। হাতে বর্শা আর ঢাল নিয়ে আটজন একসাথে গোল হয়ে যারা যুদ্ধ করে সেই সেনাদের বলে হপলাইট। হপলাইট হতে হলে নিজের অস্ত্র থাকতে হবে। সক্রেটিসের বাবার আমলের অস্ত্র আছে।

যুদ্ধে এসে তারা দিন-রাত জাহাজে থাকে। জাহাজ থেকে নেমে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করে আবার জাহাজে ফিরে যায়।

তাদের সাথে আছে এলসিবিয়াডিস নামক এক তরুণ। সে পেরিক্লিসের ভাগ্নে। তার ভাবসাব একেবারে পেরিক্লিসের মতো। যুদ্ধেও নিপুণ, এই যুদ্ধে সে অশ্ববাহিনীর প্রধান। অন্য যত গুণই থাক, ছেলেটিকে এক নজরে চোখে পড়ে তার অপূর্ব রূপের জন্য। একেবারে দেবতা নিন্দিত মুখশ্রী। এথেন্সে অনেক সুন্দর মানুষ আছে, কিন্তু এই ছেলেটির মতো এত সুন্দর মুখ আর কারও নেই। এই যুদ্ধেও সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ এলসিবিয়াডিস।

এলসিবিয়াডিস জনপ্রিয় কিন্তু ভীষণ অহংকারী। তার রূপের দেমাগ আছে, বংশের গর্ব আছে, প্রতিভার ফুটানি আছে। সে কাউকে মানে না, নিজে যা ভালো মনে করে তা-ই করে। এখানে সে খুব ভালো যুদ্ধ করছে।

কিন্তু যুদ্ধে সুবিধা করতে পারছে না এথেন্স। এখানে স্পার্টানরা শক্তিশালী। একদিন যুদ্ধে হঠাৎ এথেন্স বিপদে পড়েছে। এথেন্সের সেনাপতি হুকুম করলেন, পিছে হটো, পালাও, যেভাবে পার জাহাজে গিয়ে ওঠো। সবাই ছুটছে। সক্রেটিসও জাহাজের দিকে যাচ্ছে। খুব দ্রুত ছোটা যায় না। তার হাতে বিশাল ঢাল। পরনে লোহার বর্ম। মাথায় অনেক ভারী হেলমেট। তবুও প্রাণপণে ছুটছে সক্রেটিস।

সবাই পালাচ্ছে। কিন্তু একজন পালাচ্ছে না। সে হলো এলসিবিয়াডিস। এই তরুণ ছেলের রক্ত খুবই গরম। সে মনে করে সে নতুন যুগের এসকিলিস। সে পালাবে না। সাহস দেখিয়ে সে হঠাৎ বিপক্ষের একজনকে বর্শা মেরে বসল। শত্রুরা দেখল, এ কোন্ চ্যাংড়া। ওর দলের সবাই পালাচ্ছে, আর ও একলা আমাদের মারছে? তবে দ্যাখ্ মজা! চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল তাকে।

সক্রেটিস পেছনে তাকিয়ে দেখে এলসিবিয়াডিসকে ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা। চারদিকে শত্রু। এলসিবিয়াডিস একা। ছেলেটা বীরের মতো লড়ছে। কিন্তু এত লোকের সাথে কিছুতেই পারবে না। ছেলেটি মারা যাবে। এথেন্সের কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে যাচ্ছে না। সবাই পালাচ্ছে। ছেলেটিকে বাঁচাতে হবে। হুংকার দিয়ে উঠল সক্রেটিস। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

এলসিবিয়াডিস ততক্ষণে মার খেতে শুরু করেছে। সে রক্তাক্ত। মনে হচ্ছে মৃত্যু খুব কাছে। যেকোনো সময় তার হৃদপিণ্ডে শত্রুর বর্শা বিঁধে যাবে। সে মাটিতে পড়ে গেল। তাকে মারতে বর্শা হাতে এগিয়ে আসছে শত্রু, সে চোখে অন্ধকার দেখছে। বর্শা উঁচিয়ে ফেলেছে একজন। এই তার মৃত্যুদূত। আর এক মুহূর্ত পরেই মৃত্যু। কিন্তু হঠাৎ লোকটা পিছে চলে গেল। তার সাথের শত্রুরাও দূরে সরে যাচ্ছে। এলসিবিয়াডিস ঘুরে দেখল ক্ষিপ্র বেগে সেদিকে আসছে সক্রেটিস। সে হাতে বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে বুনো ষাঁড়ের মতো। তাকে অমন করে আসতে দেখে সামনের সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। এলসিবিয়াডিসের সামনে গিয়ে সক্রেটিস বর্শা উঁচিয়ে ধরে দেখে শত্রুরা কেউ নেই। ততক্ষণে এলসিবিয়াডিস মাটিতে পড়ে গেছে। সে প্রায় অজ্ঞান। সক্রেটিস তাকে কাঁধে তুলে নিয়েই দৌড় দিল জাহাজের দিকে[৯৪]।

স্পার্টার জেনারেল ঘটনাটি লক্ষ করল। সে সক্রেটিসকে ডেকে বলল, এই যুবক, তোমার সাহস তো একেবারে স্পার্টানদের মতো। তোমার সাথে আমার কথা আছে। যুদ্ধ নয়, অন্য বিষয়ে কথা। বিকেলে দূত পাঠাব তোমাদের জাহাজে। তুমি এসো আমার শিবিরে

সক্রেটিসের উত্তর দেওয়ার সময় নেই। সে এলসিবিয়াডিসকে কাঁধে নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে। সে কিছুই বলল না।

জাহাজে আসতে আসতে এলসিবিয়াডিস পুরোপুরি অজ্ঞান। তার জ্ঞান ফিরল কয়েক ঘণ্টা পরে। মাথা ঝিমঝিম করছে। কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে সক্রেটিস তাকে কাঁধে নিচ্ছে। আর কিচ্ছু মনে নেই। সে সক্রেটিসের দিকে তাকাল। এই লোকটি তার জীবন বাঁচিয়েছে।

সক্রেটিস বলল, বিপদ কেটে গেছে। তুমি ঘুমাতে চেষ্টা করো।

এলসিবিয়াডিস ঘুমাতে পারছে না। চোখ বুজলেই দুঃস্বপ্ন দেখছে। শত্রুরা বর্শা নিয়ে আসছে। এই বুঝি তাকে মেরে ফেলল। সে থেকে থেকে জেগে ওঠে। দু'একবার

সক্রেটিসকেও দেখেছে স্বপ্নে। সে সক্রেটিসকে চেনে। রাস্তা- ঘাটে ছেলেদের জ্ঞান দেয়, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। তার মামি আসপাশিয়া বলে, সক্রেটিস নাকি অনেক জ্ঞানী মানুষ। তার সাথে আলাপ করলে অনেক কিছু শেখা যায়। এলসিবিয়াডিস নিজেকে মনে করে বিরাট পণ্ডিত। সে নিজেই ওস্তাদ। কারও কাছে তার শেখার দরকার নেই। কিন্তু সক্রেটিস যেভাবে তার জীবন বাঁচিয়েছে, সেটি সবাই করবে না। অন্যের জন্য নিজের জীবনের এত বড় ঝুঁকি নিতে অন্য রকম কলিজা লাগে।

এদিকে জাহাজে সবাই সক্রেটিসের প্রশংসা করছে। সে চাইলে যুদ্ধেও নেতা হতে পারে।

সক্রেটিস বললেন, ছিঃ, ছিঃ, লজ্জা দিও না। অস্ত্রের সাধনা করতে আমার জন্ম হয়নি। আমি জ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করেই ভালো আছি। তোমরা যদি নেতা বানাতে চাও, তবে ভবিষ্যতে এলসিবিয়াডিসের কথা ভাবতে পার। ছেলেটা যুদ্ধ জানে, সাহসও আছে।

সন্ধ্যায় স্পার্টান দূত এলো এথেন্সের জাহাজে। এথেন্সের জেনারেল ভাবল, তার জন্য খবর পাঠিয়েছে বিপক্ষ, তিনি হাসি মুখে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু না, শত্রুরা কথা বলতে চায় সক্রেটিসের সাথে। জেনারেলের অপমান লাগল। তিনি সক্রেটিসকে যেতে দেবেন না। শুনে এলসিবিয়াডিস বলল, 'ওকে যেতে দাও। ও আজ যা করেছে, সেটি একজন মহান বীরের চেয়ে কম নয়।

জেনারেল বললেন, শত্রুরা তো ওকে মেরে ফেলতে পারে।

সক্রেটিস বলল, স্পার্টানরা কাউকে শিবিরে ডেকে নিয়ে হত্যা করবে, তারা এত খারাপ বলে কেউ শোনেনি।

জেনারেল ক্ষেপে গিয়ে বললেন, বাহ, আমার সৈনিক আমার সামনে স্পার্টার প্রশংসা করছে। চমৎকার সক্রেটিস। তুমি যাও, স্পার্টার শিবির ঘুরে দেখে এসো তারা কত ভালো।

ঝামেলা দেখে সক্রেটিস শেষ পর্যন্ত আর গেল না স্পার্টান শিবিরে। তার মন খারাপ। জেনারেলের সাথে কথা কাটাকাটি তার ভালো লাগেনি। মানুষ আসলে খুবই ছোট মনের প্রাণী। সে ক্লান্ত। আজ যুদ্ধে ভীষণ ধকল গেছে। সে জাহাজে নিজের কক্ষে বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে। আঁধার রাতে সাগরের গর্জন তার ভালো লাগে। মনে হয় সাগর চিৎকার করে কাঁদছে। সে জাহাজে আছে, এখানে সব সময়ই সাগর এমন গর্জন করছে, এমন করেই কাঁদছে। কিন্তু অনেক দিন সে সাগরের কান্না শোনেনি। আজ মন খারাপ বলে সাগরের কান্না শুনতে পাচ্ছে। সাগর সারাক্ষণ কাঁদলেও মানুষ যখন সেই কান্নাকে নিজের কান্নার সাথে মিলাতে পারে, শুধু তখনই সাগরের কান্না শুনতে পায়।

সক্রেটিস সাগরের কান্না শুনতে শুনতে যুদ্ধের কথা ভাবছে। সে একজন দার্শনিক। তার জীবনের উদ্দেশ্য মানুষের জন্য সুন্দর জীবনের খোঁজ করা। অথচ সে এই যুদ্ধ ছে। তার সাথে যুদ্ধ ব্যাপারটা একেবারেই যায় না। সে গভীর জিনিসকে হালকা করে দেখে,

সহজ করে দেখে। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যেটিকে যতই সহজ করে দেখতে চাও না কেন, সেটি সহজ হয় না। তেমন একটি জিনিস হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ বড় কঠিন জিনিস। এখানে মারতে হবে, না হলে মরতে হবে। এখানে চোখের বদলে চোখ নিতে হয়, রক্তের বদলে রক্ত। তো কী হবে তার সুন্দর জীবনের? সে কি জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ হচ্ছে? হঠাৎ মনে পড়লো সে আজ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এলসিবিয়াডিসকে বাঁচাল। এটি কি তার সুন্দর জীবনের অংশ নয়? যে জীবন সকল সময়ে মানুষের ভালো করার চেষ্টা করছে, সেটিই তো সুন্দর জীবন। আজ আমি একটি তরুণের প্রাণ বাঁচিয়েছি। যুদ্ধে এসেও আমার উদ্দেশ্য থেকে সরে যাইনি। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই প্রথম যুদ্ধে সে আপন সত্তাকে ফিরে পেল। সে এথেন্সের জন্য যুদ্ধ করছে; কিন্তু সুন্দর জীবনের স্বপ্ন সাথেই আছে।

এমন সময় তার দরজায় কে যেন নক করল। দরজা খুলে সক্রেটিস অবাক। দাঁড়িয়ে আছে সৌম্যকান্তি এলসিবিয়াডিস। আহা বেচারা, এই ক্লান্ত শরীরে সে ছুটে এসেছে তার সাথে দেখা করতে। সক্রেটিস তার হাত ধরে তাকে বসাল। কিন্তু এলসিবিয়াডিস শুয়ে পড়ল, সে আসলেই ক্লান্ত।

এলসিবিয়াডিস উদ্ধত মানুষ, সে কাউকে মানে না। কিন্তু আজ সক্রেটিসের কাছে এসে তার কান্না পাচ্ছে। সে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। সক্রেটিস তাকে পরম মমতায় সান্ত্বনা দিচ্ছে। আহা রে, ছেলেটির বাবা-মা নেই। মামা পেরিক্লিসের কাছে মানুষ হয়েছে। এই তরুণ বয়সেই কেমন কঠিন যুদ্ধে এসে প্রায় মারাই যাচ্ছিল। ছেলেটির প্রতি ভীষণ মায়া হলো সক্রেটিসের। সে বলল, কান্না থামাও, এসো গল্প করি। তোমাকে মজার কিছু শুনাই। আমার বন্ধু চেরোফোনের গল্প শোনো। সে গিয়েছিল ডেলফিতে। ওরাকলের কাছে গিয়ে সে কী কাণ্ডটাই না করল!

আর গল্প করে লাভ নেই। এলসিবিয়াডিস ঘুমিয়ে গেছে[৯৫]।

সক্রেটিস তার গায়ে একটি চাদর তুলে দিল।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে এলসিবিয়াডিস দেখে সে সক্রেটিসের খাটে ঘুমিয়ে আছে। সক্রেটিস তখনও ঘুমাচ্ছে। সে ঘুম থেকে উঠে গেল। সক্রেটিসের ঘর থেকে এলসিবিয়াডিসকে বের হতে দেখল জাহাজের কয়েকজন। দেখেই তারা ফিসফিস শুরু করল। এলসিবিয়াডিস চমকে উঠল। কেন ফিসফিস করছে? এরা কী ভেবেছে? আমি সক্রেটিসের ঘরে ঘুমিয়েছিলাম বলে কি এরা ফিসফিস করছে?

তার মনে পড়ল, এথেন্সে তরুণ ছেলেদের নিয়ে বুড়োদের ব্যাপারে ভয়ংকর বিশ্রী সব কেচ্ছা আছে। এই ব্যাপারে এথেন্সে খারাপ বুড়োর অভাব নেই। এরা কি তাই ভাবছে? তখন তার মনে হলো সক্রেটিস পরম মমতায় তার পাশে ঘুমিয়ে ছিল একজন বাবা বা বড় ভাইয়ের মতো। সক্রেটিস এসব ব্যাপারেও বড় মাপের মানুষ, এথেন্সের বিশ্রী বুড়োদের মতো নয়। অথচ সেই বুড়োরাই সক্রেটিসকে গালি দেয়।

কিন্তু ঘটনা হলো জাহাজে তাকে আর সক্রেটিসকে নিয়ে বিশ্রী কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। কী করা উচিত তার? ওদের ভুল ভাঙ্গানো উচিত? এলসিবিয়াডিস এবার নিজের কাছেই চিৎকার করে উঠল। আমি কেন বাজে লোকের কাছে ব্যাখ্যা দিতে যাব? আমি এলসিবিয়াডিস, আমি পেরিক্লিসের ভাগ্নে, সেরা যোদ্ধা, আমি যা করি নিজের ইচ্ছায় করি। আমি কেন ওদের কাছে ব্যাখ্যা করতে যাব? আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। কাউকে কিছু বলা মানে সক্রেটিসের অসম্মান। যে মানুষটি সারা রাত আমাকে সেবা করেছে, তার নামে এসব কথা যারা বলে আমি তাদের খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব। আমি সক্রেটিসের কাছে যাওয়াও বন্ধ করব না। সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে। যুদ্ধে তো অনেকেই সেখানে ছিল। অন্য কেউ তো এগিয়ে আসেনি, নিজের জীবন তুচ্ছ করে এসেছিল একমাত্র সক্রেটিস। আমার জীবনের জন্য আমি তার কাছে ঋণী। যতদিন বাঁচব আমি এই ঋণ মনে রাখব। আজ থেকে আমার জীবনের একমাত্র গুরু হবেন সক্রেটিস।

সেদিন থেকে সক্রেটিসের আরেকজন অকৃত্রিম বন্ধু হলো। তার নাম এলসিবিয়াডিস। কিন্তু একই সাথে নতুন এক কানাঘুষা শুরু হলো তাদের দুজনকে নিয়ে। মানুষ রগরগে গল্প তৈরি করল।

যুদ্ধ থেকে এথেন্সে ফিরেছে সক্রেটিস।

পটিডিয়ার যুদ্ধে বীরত্বের জন্য এথেন্সের সরকার পুরস্কার দিল এলসিবিয়াডিসকে। সরকারের কেউ সক্রেটিসের কথা উল্লেখও করল না। সক্রেটিসকে পুরস্কার দিয়ে কী হবে! সে নেতা নয়, নেতার ছেলেও নয়; নেতাদের কোনো কাজেও আসে না, তার জন্য কেউ সুপারিশও করে না। সে খালি পায়ে ঘোরে আর ছেলেদের সুন্দর জীবনের কথা বলে। তার সুন্দর জীবন যুদ্ধে কোনো কাজে লাগে না। তাকে পুরস্কার দেওয়ার কিছুই নেই।

এলসিবিয়াডিস পুরস্কার গ্রহণ করল। সাহসিকতার পুরস্কার। পুরস্কার নিতে তার ভালোই লাগছিল, কিন্তু বারবার সক্রেটিসের মুখটা ভেসে উঠছিল। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। যদি কোথাও সক্রেটিসকে দেখা যায়। কিন্তু সক্রেটিস তো পুরস্কারের মঞ্চের মানুষ নয়; সে রাস্তার মানুষ, তাকে মঞ্চে পাওয়া যাবে না, তাকে খুঁজতে নামতে হবে পথে।

বাড়িতে ফিরে এলসিবিয়াডিস খুব সুন্দর সাজুগুজু করেছে। তাকে দেখে আসপাশিয়া মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। কী সুন্দর লাগছে ছেলেটিকে! চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না। দেখতে দেখতে বিশ বছর হয়ে গেছে ছেলেটির।

এলসিবিয়াডিস বলল, মামি, দোয়া নিতে আসলাম।

‘দোয়া কী জন্য?’

‘আমি দীক্ষা নিতে যাচ্ছি। গুরুর কাছে দীক্ষা।’

‘মানে কী? কে তোর গুরু?’

‘সক্রেটিস।’

আসপাশিয়া খুব খুশি। এই অহংকারী ছেলেটার অনেক গুণ। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। কেমন সুন্দর করে কথা বলে। কিন্তু দোষ একটিই। সে নিজে যা ভাবে, তাই করে; কারও কোনো কথা শোনে না। এমনকি পেরিক্লিসের কথাও শোনে না। তাকে নিয়ে পেরিক্লিসের অনেক চিন্তা। এ বাপ-মা মরা ছেলেটাকে অনেক আদরে বড় করেছেন পেরিক্লিস। কিন্তু লোকে বলে আদরে বাঁদর হয়ে গেছে। সে কাউকে মানে না। সে মনে করে পেরিক্লিস হলো এথেন্সের রাজা, আর সে নিজে হলো যুবরাজ।

তবে আর চিন্তা নেই। এখন এলসিবিয়াডিস সক্রেটিসের সাথে মিশবে। সক্রেটিসের চরিত্র খুবই উন্নত। এতদিনে সে কোনোদিন আসপাশিয়ার দিকে কামনার চোখে তাকায়নি। সে মানুষের জন্য সুন্দর জীবনের উপায় খোঁজে। এমন লোকের শিষ্য কোনোদিন খারাপ হতে পারে না।

আজ পেরিক্লিস বাড়ি ফিরলেই বলতে হবে এলসিবিয়াডিসকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই। সে এবার সঠিক জহুরির পাল্লায় পড়েছে। আর খারাপ হতে পারবে না।

এলসিবিয়াডিস সক্রেটিসকে খুঁজছে। কোথাও পাচ্ছে না। আজ কেউ তাকে দেখেনি। এমনিতে আগোরায় একটি চক্কর দিলে আর কাউকে পাও আর নাই পাও, সক্রেটিসকে পাবেই। কিন্তু আজ তার দেখা নেই।

তাকে খুঁজতে এলসিবিয়াডিস সক্রেটিসের বাড়ি চলে এলো।

সে অবাক। এমন ভাঙাচোরা বাড়ি। খুবই অল্প একটু জায়গা। পেছনে একটি জলপাই বাগান, এই বাগানই তার সম্বল। সে ঠিক করল সক্রেটিসকে এক টুকরা জায়গা দেবে। একেবারে মধ্য এথেন্সে। এক্রোপোলিসের পাশেই। সে সক্রেটিসকে বলছে, ‘শোনো, ঐ জায়গায় একটি বাড়ি করবে। সামনের ঘরটা করবে আকাশি। সেখানে আমরা বসব। ভেতরের ঘরটা বেগুনি। বেগুনি হলো স্নিগ্ধ রং। তোমার স্ত্রীর মন ভালো থাকবে। সে আর তোমার সাথে চ্যাঁচামেচি করবে না। তখন তোমার ঘরভরা শান্তি, আর মাথাভরা জ্ঞান।’

জেনথিপি ভেতর থেকে শুনছিল সব কথা। সক্রেটিসের বন্ধুরা তেমন কেউ বাড়িতে আসে না। সক্রেটিসই তো বাড়িতে থাকে না, বন্ধুরা আসবে কী করে!। জেনথিপি কান পেতে শুনছিল তারা কী বলে। এলসিবিয়াডিসের মতো উচ্চ ঘরের তরুণ তার বাড়িতে আসবে, সে ভাবতেও পারেনি। জেনথিপি মনে মনে খুশি। ছেলেটি বাড়ি করে দেবে। এই বাড়ি ভেঙে জলপাই গাছ লাগাবে। তাদের আর অভাব থাকবে না।

কিন্তু সক্রেটিস বলল, শোনো বউ, লোকে তোমাকে গরিবের বউ বলে। সেটি খারাপ। কিন্তু তুমি কি চাও লোকে তোমাকে ভিখারির বউ বলুক?

জেনথিপি কী উত্তর দেবে? সে জানে এই লোক প্যাঁচ দিয়ে কথা বলে সারা এথেন্সের মানুষকে নাচায়। তার মতো নারী তো তার কাছে নস্যি।

জেনথিপি কাঁদতে শুরু করল। একটি সুখের স্বপ্ন হাতের সামনে পড়ে আছে। তার স্বামী সেটি ধরছে না। কান্না ছাড়া আর কীই বা করতে পারে স্ত্রী?

সক্রেটিস আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বউয়ের কান্নাকে গুরুত্ব দিয়ে বসে থাকলে সে আর দার্শনিক হতে পারবে না। তার চিন্তা সারা এথেন্সের মানুষ নিয়ে। তাদের জীবন সুন্দর করতে হবে। একলা জেনথিপির জীবন সুন্দর করতে সব মানুষকে বঞ্চিত করলে সেটি খুবই স্বার্থপরের মতো কাজ হবে। সক্রেটিস আর যাই হোক, স্বার্থপর নয়।

সে হাল্কা পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাড়ি থেকে বের হলেও বিপদ। যুদ্ধ চলছে। স্পার্টার সেনারা এথেন্সের দেয়ালের বাইরে অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই এথেন্সের কেউ দেয়ালের বাইরে যেতে পারে না। দেয়ালের ভেতর লোক আর লোক। এজন্য সক্রেটিসের ঘোরাঘুরি কমে গেছে। আড্ডার জায়গা কমে গেছে।

যুদ্ধ যেভাবে চলছে, তাতে মনে হয় এই যুদ্ধ অনেক বছর চলবে। ট্রয়ের যুদ্ধ চলেছিল দশ বছর। এথেন্সের সাথে স্পার্টার যুদ্ধ যে কত বছর চলবে কেউ জানে না। যুদ্ধ সারা বছর হয় না। যুদ্ধেরও গ্রীষ্মের ছুটি হয়। গরমের সময় যুদ্ধ বন্ধ থাকে। তখন সবাই অলিম্পিক খেলায় অংশ নেয়। অলিম্পিকের সময় গ্রিসের কোথাও কোনো যুদ্ধ হবে না। গরমকালে বীরত্ব দেখাতে চাইলে খেলার মাঠে গিয়ে পদক জিতে নাও। অলিম্পিক শেষ হলে শীতকালে যুদ্ধ শুরু, তখন মানুষ হত্যা করে বীরত্ব দেখাও। তাই যুদ্ধে মাঝে মাঝে বিরতি হয়। আবার শুরু হয়। নিয়ম-কানুন ভালো।

স্পার্টার সেনারা প্রতি বছর শরতের সময় বাড়ি ফিরে যায়। এই সময় তারা ফসল ফলায়। অলিম্পিক পদক জেতে। আমোদ-ফূর্তি করে। আনন্দ শেষ করে শীতের শুরুতে আবার এথেন্সকে আক্রমণ করে। স্পার্টা যখন আক্রমণ করে, তখন এথেন্সের সবাই বাড়ি-ঘর ফেলে শহরের মূল দেয়ালের ভেতর ঢুকে পড়ে। এই দেয়াল ভেঙে স্পার্টার সেনারা ঢুকতে পারে না। যুদ্ধের গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় সবাই যার যার বাড়িতে ফিরে যায়। এই সময় এথেন্সের লোকজন ফসল ফলায়, নাটক করে। শীতের শুরুতে স্পার্টার সেনা আসার আগেই ঘর-বাড়ি ফেলে আবার শহরের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

এটি পেরিক্লিসের যুদ্ধকৌশল। তিনি আশা করেন যে, কয়েক বছর এরকম করে স্পার্টানরা ক্লান্ত হয়ে যাবে। আর এথেন্সের দিকে আসবে না। এভাবেই একদিন যুদ্ধ শেষ হবে। অল্প রক্তপাতে যুদ্ধ শেষ করার জন্য তিনি এই কৌশল নিয়েছেন।

যুদ্ধে তরুণরা মারা যাচ্ছে। প্রতিদিনই লাশ আসছে। প্রতিটি পাড়ার কোনো না কোনো ছেলে মারা যাচ্ছে। এর মধ্যেই শহরের সব কাজ চলছে।

***

৯৩. উত্তর গ্রিসের পটিডিয়ায় (Potidaea) খ্রি. পূ. ৪৩২ অব্দে সক্রেটিস প্রথম যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

৯৪. প্লেটোর Symposium ডায়লগে এলসিবিয়াডিস উল্লেখ করে যে সক্রেটিস পটিডিয়া যুদ্ধে তার জীবন রক্ষা করেছেন।

৯৫. সক্রেটিসের বিছানায় ঘুমানোর বিষয়টি প্লেটোর Symposium ডায়ালগে এলসিবিয়াডিস উল্লেখ করে।

৩৬

'মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ তখনই পায়,
যখন সে নিজেকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে।'
—সক্রেটিস

ভর সন্ধ্যায় পেরিক্লিস একা বারান্দায় হাঁটছেন। তার মন ভীষণ খারাপ। বাইরে শীতের ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হয়েছে। কেমন একটি হু হু শব্দ চারদিকে। শব্দটি পেরিক্লিসের বুকের ঠিক মাঝখানে আঘাত করছে। সব দিক থেকে ভাঙনের শব্দ আসছে। পেরিক্লিসের বুক ভেঙে যাচ্ছে।

এনাক্সাগোরাস চলে গেছেন। এথেন্স থেকে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন। পেরিক্লিসই তাকে চলে যেতে বলেছেন। এথেন্সের মানুষ গুরুকে থাকতে দিল না। তাকে মামলা দিয়ে নগরছাড়া করল।

গুরু পাগলা কিসিমের মানুষ। নিজের মনে থাকতেন। কারও কোনো ক্ষতি করেছেন বলে কেউ শোনেনি। তার কোনো শত্রু নেই। কিন্তু শত্রু আছে পেরিক্লিসের। তারা পেরিক্লিসকে তাড়াতে চায়। কিন্তু পেরিক্লিসকে তাড়ানো সহজ নয়। মানুষ তাকে ভালোবাসে, তাকে ভোট দেয়। তাকে তাড়ানোর চেয়ে তার কাছের মানুষদের তাড়ানো অনেক সহজ। পেরিক্লিসের প্রিয় মানুষ এনাক্সাগোরাস। সবচেয়ে কাছের দার্শনিক। তার নামে মামলা দিল। অভিযোগ: তিনি নাকি ধর্ম মানেন না। তিনি দেবতাদের অপমান করেন।

পেরিক্লিস চেষ্টা করেছেন, মামলা বন্ধ করতে। কিন্তু না, মামলাবাজ শত্রুরা প্রমাণ নিয়ে হাজির। এনাক্সাগোরাস নিজের মুখে বলেছেন, সূর্য হলো একটি লাল ধাতুর গোল্লা, সূর্যের চলাচলে দেবতাদের কোনো হাত নেই। এই কথা হাজার হাজার মানুষ শুনেছে। আরও অনেক বড় প্রমাণ আছে। গুরু তার বইতে দেবতাদের নিয়ে হাসাহাসি করে অনেক কথা লিখেছেন।

এত দিন তার নামে নানা কথা হলেও পাগল বলে সবাই হাসি-ঠাট্টা করেছে। কিন্তু এখন সময় আলাদা। কিছুদিন হলো পেরিক্লিসের শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা

পেরিক্লিসকে শিক্ষা দিতে চায়। সেজন্য সহজ শিকার তার গুরু এনাক্সাগোরাস। তার নামে মামলা করল। মারাত্মক মামলা। ধর্ম বিরোধিতার মামলা। এই মামলার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বিপদ বুঝে পেরিক্লিস নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, গুরু পালিয়ে যাক। এই মামলায় তার মাফ পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বুড়ো মানুষ। প্রাণে বাঁচুক। এথেন্স ছেড়ে চলে গেলেই তার আর কোনো সমস্যা নেই। গুরু যেতে চাননি। সে পাগল হলেও তার বিবেক টনটনে। সম্মান জ্ঞান মারাত্মক। তিনি জানেন, তিনি কোনো দোষ করেননি। তিনি জ্ঞানপ্রেমিক মানুষ। জ্ঞানের টানে যা সত্য বলে মানেন, তাই বলেছেন। কোনো অন্যায় করেননি। তিনি এথেন্স ছাড়বেন কেন?

কিন্তু পেরিক্লিস জানেন এই জেদের পরিণাম কী হবে। তিনি জোর করেই গুরুকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। গুরুর জীবন বাঁচাতে আর কোনো উপায় ছিল না।

পেরিক্লিস পুবের ঘরটার দিকে তাকাতে পারছেন না। খোলা জানালাটার দিকে চোখ গেলেই বুকটা চিনচিন করে। এই ঘরে টানা ত্রিশ বছর ছিলেন গুরু। আজ সেই ঘরটা শূন্য। ঘরের বাসিন্দা বৃদ্ধ বয়সে ঘুরছেন পথে পথে। খুঁজছেন নতুন ঠিকানা। পেরিক্লিস তরুণ বয়সে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বিপদে-আপদে সব সময় সুবুদ্ধি দিয়ে পাশে থেকেছিলেন গুরু। পেরিক্লিসের চোখে কেউ কোনোদিন পানি দেখেনি। তিনি দেবতা জিউসের মতো গম্ভীর কিন্তু গুরুর দুঃখে তার চোখ বেয়ে পানি এলো। পেরিক্লিস কাঁদছেন। বুক চেপে কাঁদছেন।

আসপাশিয়াও কাঁদছে। গুরু যাওয়ার সময় সে সবকিছু গুছিয়ে দিয়েছে। আসপাশিয়ার দর্শন আলোচনার এক নম্বর সঙ্গী ছিলেন এই বৃদ্ধ। সে শব্দ করে কাঁদছে। এমন দুঃখের পরিবেশ পেরিক্লিসের ঘরে আগে আর আসেনি। পেরিক্লিসের ভীষণ অসহায় লাগছে। জীবনে এই প্রথম নিজেকে খুব দুর্বল লাগছে।

একদিকে চলছে স্পার্টার সাথে যুদ্ধ। অন্যদিকে এসব ঝামেলা। পেরিক্লিসের সময় ভালো যাচ্ছে না।

খাওয়ার ঘরে রাতের খাওয়ার পড়ে আছে। আজ এই ঘরে কেউ খেতে পারবে না। এমন সময় দাস খবর দিল ফিডিয়াস আর ডেমন এসেছে।

পেরিক্লিস বললেন, ওদেরকে এখানে নিয়ে আয়।

দুই শিল্পী ঘরে ঢুকে বসল। চারজনই চুপ।

ফিডিয়াস একটি পেপিরাস কাগজ দিল পেরিক্লিসের হাতে। আর একটি মামলার নোটিশ। পেরিক্লিস নোটিশে চোখ বুলিয়ে শুকনো মুখে আসপাশিয়াকে দিলেন কাগজটি।

শিল্পী ফিডিয়াসের নামে মামলা হয়েছে। অভিযোগ: পার্থেনন আর এথিনার মূর্তি বানাতে টাকা চুরি করেছে ফিডিয়াস। এথিনার মূর্তিতে অনেক স্বর্ণ দেওয়া হয়েছিল। সব স্বর্ণ নাকি মূর্তিতে দেওয়া হয়নি। ফিডিয়াস নিজে নিয়ে গেছে সেই সোনা।

পেরিক্লিসের মুখে কোনো কথা নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন ফিডিয়াসের দিকে। গুরুকে সরিয়ে দিয়েই ওরা ক্ষান্ত হয়নি। এবার টার্গেট ফিডিয়াস।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ফিডিয়াস। পেরিক্লিসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি গুরুর মতো আমাকেও এথেন্স থেকে চলে যেতে বলবে?

পেরিক্লিস কিছুই বলছেন না।

চিৎকার করে উঠল ফিডিয়াস— পেরিক্লিস, আমি বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু পালিয়ে যাব না। আমি শিল্পী। জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছি এথেন্সকে। নিজের হাতে সাজিয়েছি এই স্বপ্নের এথেন্স। এই স্বর্ণপুরী আমার নিজের ডিজাইন করা। আমি এখান থেকে কোথাও যাব না। আমি মামলা লড়ব। আমি আমার কাছে পরিষ্কার। এক রত্তি সোনাও সরেনি। ওরা পরীক্ষা করুক।

আসপাশিয়াও হুংকার দিয়ে বলল, হ্যাঁ, এবার আমাদের লড়তে হবে। গুরুর মতো পালাতে বলবে না ওকে।

সবাই এমন করে কথা বলছে যেন এর জন্য পেরিক্লিসই দায়ী। সবাই ধরেই নিয়েছে, ফিডিয়াসকেও পালিয়ে যেতে বলবে পেরিক্লিস।

পেরিক্লিস দাঁড়িয়ে বললেন, না, তুমি পালাবে না ফিডিয়াস। গুরুর পালানোর কারণ ছিল। তাকে যে মামলা দিয়েছিল, তাতে গুরুর মৃত্যুদণ্ড হতো। আমি গুরুকে বাঁচাতে পারতাম না। ওরা গুরুকে ফাঁসি দিয়ে দিত। কিন্তু তোমার মামলা চুরির মামলা। এই মামলা আমরা লড়ব। তুমি প্রমাণ জোগাড় করো ফিডিয়াস। আসপাশিয়া তোমার জন্য আদালতের জবাব লিখে দেবে।

রাত-দিন খেটে হিসাব বানাল ফিডিয়াস। হিসাব এক্কেবারে পাকা। এক সুতাও ফাঁক নেই। সে খুশি। এবার চলো আদালতে।

আদালতে ফিডিয়াস নির্দোষ প্রমাণিত হলো। সে মাথা উঁচু করে আদালত থেকে বেরিয়ে এথিনার মন্দিরে গেল। দেবী তাকে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়েছেন। দেবীকে ভক্তি করতে হবে। কিন্তু মন্দির থেকে বের হতেই তার দাস আর একটি নোটিশ তার হাতে দিল। তার নামে নতুন মামলা হয়েছে। এবার অভিযোগ মারাত্মক।

এবারের অভিযোগ: ধর্মদ্রোহিতা। ফিডিয়াস এথিনার সোনার মূর্তিতে দেবীর হাতে যুদ্ধের ঢালের উপর যে দুইজন যোদ্ধার মুখ এঁকেছেন, সেই দুজন নাকি পেরিক্লিস আর ফিডিয়াস। সে দেবীর ঢালে নিজেদের মুখ বসিয়েছে। আর এটি করে ফিডিয়াস নিজেকে আর পেরিক্লিসকে দেবতা বলে ঘোষণা করেছে।

এটি ভয়াবহ অপরাধ। এই মামলা মারাত্মক। ফিডিয়াস পার্থেননের দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকাল মূর্তির দিকে। দেবীর হাতে ঢালটা দেখা যাচ্ছে। সোনার মূর্তির উপর দুজন

সোনালি যোদ্ধা। চকচক করছে। এক নজরেই বোঝা যায় ঐ দুইজন যোদ্ধা আসলে পেরিক্লিস আর ফিডিয়াস।

ফিডিয়াস জানে এটি সত্য। সে এটি করে ফেলেছে। সৃষ্টির আনন্দে তখন সে দিশাহারা। ঐ সময় সে পেরিক্লিসের উপর ভীষণ মুগ্ধ। ভীষণ কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতায় তার মুখ বানিয়ে ফেলেছিল। পেরিক্লিস দেখে লজ্জা পেয়ে বলেছিলেন, এটি কী করেছ তুমি? ফিডিয়াস বলেছিল, যা করেছি ভালো করেছি। পেরিক্লিস বলেছিলেন, তাহলে আর একজন যোদ্ধা তুমি হয়ে যাও। দুজনেই তখন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মগ্ন। বিপদের কথা মাথায়ই আসেনি

এই মামলা ভয়াবহ। নতুন মামলার কথা শুনে পেরিক্লিস বললেন, ফিডিয়াস, এইবার তুমি পালিয়ে চলে যাও। ওরা তোমাকে এথেন্সে থাকতে দেবে না।

'আমার অপরাধটা কী বলো তো?'

'তোমার অপরাধ তুমি আমার বন্ধু।'

না, ফিডিয়াস যাবে না। তিনি শিল্পীদের ওস্তাদ মহাশিল্পী। শিল্পীরা ভীষণ একরোখা হয়। শেষ দেখে ছাড়বে। পেরিক্লিস অনেক বলেও তাকে পালাতে রাজি করাতে পারল না। ফিডিয়াস শিল্পীমানুষ। সে রাজনীতি বোঝে না। সে জানে না যে স্বার্থের জন্য মানুষ কত খারাপ হতে পারে।

মামলা আদালতে উঠল। ফিডিয়াস দোষী। সে দেবতাদের আসনে মানুষকে বসিয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। শাস্তি ঘোষণা হলো যাবৎ জীবন জেল। ফিডিয়াস জেলে গেল।

অন্ধকার কারাগারে বন্দি শিল্পী ফিডিয়াস। যে মানুষটি এথেন্সে আলো আনতে দিন-রাত খেটেছে, সে এখন অন্ধকারে। যে নিজের হাতে কয়েকশ অট্টালিকা ডিজাইন করেছে, সে এখন ছোট্ট এক ঘুপচি কুঠুরিতে বন্দি। এটি মানতে পারলেন না ফিডিয়াস। কয়েক দিনেই শিল্পীর মনের শক্তি চলে গেল। সে উল্টা-পাল্টা কী যেন করে। দিন-রাত কী সব আঁকিবুকি করে। জিজ্ঞেস করলে বলে, আর একটি পার্থেনন বানাচ্ছি।

জেলের খাদ্য তার ভালো লাগে না, তবু খেতে হয়। খেলেই তার বুক জ্বালা করে, মনে হয় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে আসছে। তাকে যে খাবার দেওয়া হতো, তাতে বিষ ছিল। স্লো পয়জনিং করা হয়েছে। একদিন খবর এলো, প্রতিদিন একটু একটু করে বিষের যন্ত্রণা সয়ে সয়ে ধীরে ধীরে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে মারা গেছে ফিডিয়াস। মিশর থেকে আনা নীল রং দিয়ে সে এথেন্সকে সাজিয়েছিল, আজ বিষে নীল হয়ে পড়ে আছে তার নিথর দেহ। যে হাত একদিন পাথরকে কথা বলাত, সেই হাত আজ নিশ্চল। যার অপরূপ মূর্তি দেখতে ছুটে আসে সারা পৃথিবীর মানুষ, সে একাকী মরে পড়ে আছে কারাগারের স্যাঁতসেঁতে ঘরে। এথেন্সে হাজার হাজার মূর্তি কথা বলছে, কিন্তু সেই মূর্তির কারিগরের মুখ অন্যায়ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে।

পেরিক্লিসের আরেকজন কাছের মানুষ চলে গেল। তার কথা মনে হলেই পেরিক্লিস কোঁদে ওঠেন। তার বুক ফেটে দুঃখ বেরিয়ে আসে। পেরিক্লিস পার্থেননের দিকে তাকাতে পারেন না। এথেন্সের রাস্তায় বের হতে পারেন না। যেদিকে তাকান, সেদিকেই ফিডিয়াসের বানানো নানান জিনিস। এক একটি জিনিস চোখে পড়লেই তার কান্না আসে।

আসপাশিয়াও দিন রাত কাঁদছে।

পেরিক্লিস আসপাশিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, পেরিক্লিসের সভার দুটি পাখি উড়াল দিল। এর পরে কে?

আসপাশিয়া অস্ফুট স্বরে বলল, দার্শনিক প্রোটাগোরাস।

প্রোটাগোরাস এথেন্সের সবচেয়ে শক্তিশালী দার্শনিক। সবাই জানে তিনি দেবতা মানেন না। তার কথা হলো 'মানুষই সবকিছুর পরিমাপক'। দেবতারা কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে না। মানুষের নিজের চিন্তা থেকে দেবতা তৈরি হয়েছে। পেরিক্লিসের কাছের মানুষদের যখন একে একে মামলা দিয়ে ফাঁসাচ্ছে, তখন প্রোটাগোরাস বাদ যেতেই পারেন না।

পরের সপ্তাহেই মামলা হলো। প্রোটাগোরাস আগে থেকেই তৈরি ছিল। প্রাণ বাঁচাতে তিনি এথেন্স ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

তার কয়দিন পরেই শিল্পী ডেমনের নামে মামলা হলো। অভিযোগ: সে নাকি পেরিক্লিসকে ভোটে জেতাতে গান লেখে। তার গানে মানুষের মাথা বিগড়ে যায়। সে দেবতার গান গায় না। মানুষকে পাগল বানাতে গান বানায়। খুবই হাস্যকর মামলা। কিন্তু ডেমন ভয় পেল। ফিডিয়াসের মারা যাওয়ার কথা মনে পড়ল। ডেমন এথেন্স ছেড়ে পালিয়ে গেল।

পেরিক্লিস আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। এথেন্সের মেঘমুক্ত রাতের নির্মল আকাশে অনেক তারা জ্বলজ্বল করছে। পেরিক্লিসের মনে হচ্ছে আকাশ থেকে একটি একটি করে তারা খসে পড়ছে। তিনি অনেক চেষ্টা করছেন, কিন্তু থামাতে পারছেন না। সব তারা ঝরে যাচ্ছে। পেরিক্লিসের মনের ভেতরটা হু হু করছে।

পেরিক্লিস ভেবেছিলেন, তার খারাপ সময় চলে গেছে।

কিন্তু দেখা গেল দুঃসময় কাটেনি। আরও বড় দুঃসময় আসছে। এবার মামলা হলো আসপাশিয়ার নামে। মামলা করেছে হার্মিপাস নামক একজন কবি ও নাট্যকার।

আসপাশিয়ার নামে অভিযোগ: সে নাকি এথেন্সের মেয়েদের কুপথে নিচ্ছে। সে পেরিক্লিসের মনোরঞ্জনের জন্য দূর থেকে মেয়েদের নিয়ে আসে।

অভিযোগ শুনে আসপাশিয়া সারাদিন কাঁদল। এথেন্সের মানুষ যে এত নিচু মনের হতে পারে, সে ভাবতেও পারেনি। পেরিক্লিস তাকে সাহস দিল। এই অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই। এই মামলায় কিচ্ছু হবে না।

পেরিক্লিসের কথাই ঠিক হলো। সে মামলা থেকে খালাস পেল।

কিন্তু এত সহজে তাদের ছাড়বে না শত্রুরা। আসপাশিয়ার নামে আবার মামলা করেছে সেই একই কবি। এবার অভিযোগ আসপাশিয়া দেবতাদের অপমান করেছে। সে দেবতা মানে না। দেবতাদের নামে সে যা খুশি বলে।

এবার ভয় পেল পেরিক্লিস। দেবতাদের অপমানের মামলা ভয়াবহ। এই মামলায় কোনো প্রমাণ লাগে না। অভিযোগ করা মানেই বিপদ। এরকম মামলায়ই সাজা পেয়েছে ফিডিয়াস।

পেরিক্লিস দিনে দিনে দুর্বল হয়ে গেছেন। একের পর এক আঘাত আর সইতে পারছেন না। একদিকে স্পার্টার সাথে যুদ্ধ চলছে। তিনি রাত-দিন বৈঠক করে যুদ্ধের কৌশল করেন। তার উপর একের পর এক মামলা দিয়ে বিরোধীরা তাকে দম ফেলতে দিচ্ছে না।

আসপাশিয়ার মামলা তাকে একেবারে কাবু করে ফেলল। আসপাশিয়াকে ছাড়া তিনি বাঁচতে পারবেন না। গুরু চলে গেছে, প্রোটাগোরাস মরে গেছে। যারা তার মনের জোর ছিল তারা একে একে বিদায় নিয়েছে। যাকে নিয়ে এথেন্সকে সাজিয়েছিলেন, সেই ফিডিয়াস জেলে পচে মরেছে। ডেমন পালিয়েছে। এসব আঘাত পেরিক্লিসের বুকে ঘা করে ফেলেছে। কিন্তু এবার যেটি এসেছে, সেটি একেবারে মরণ বাণের মতো। আসপাশিয়ার কিছু হলে তিনি বাঁচতে পারবেন না।

মামলা চলতে দেওয়া যাবে না। তার যা ক্ষমতা আছে, সব দিয়ে আসপাশিয়াকে বাঁচাতে হবে।

আসপাশিয়া কাঁদছে না। ফিডিয়াসের জন্য সে কেঁদেছে, গুরুর জন্য চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছে। কিন্তু নিজের বিপদে সে কাঁদবে না। তার জন্য পেরিক্লিস কাঁদছেন। পেরিক্লিস ভেঙে পড়েছেন। তাই সে নিজে ভেঙে পড়বে না। পেরিক্লিসকে সোজা করে দাঁড় করাতে হবে। শুধু ছেলের দিকে তাকালে কান্না আসে। ছেলের বয়স পাঁচ বছর। মা চলে গেলে তাকে দেখার কেউ নেই।

আসপাশিয়া ভাবছে কী করা যায়। পরামর্শ নেওয়ার কেউ নেই। বন্ধুদের আগেই দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভালো বন্ধু বলতে আছে সক্রেটিস। কিন্তু সক্রেটিস রাজনীতি করে না। মামলা-মোকদ্দমা বোঝে না। আসপাশিয়া ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছে না।

গুরু এনাক্সাগোরাসের জন্য সক্রেটিস কেঁদেছে। এমন ভোলাভালা ভালো মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে এথেন্সের কী লাভ হলো? তার মানে এই গণতন্ত্রে ভালো মানুষদের সাজা দেওয়া যায়। এটি মারাত্মক ব্যবস্থা।

সক্রেটিস আসপাশিয়ার মামলার কথা শুনল। তার মন ভীষণ খারাপ। এথেন্সে কী শুরু হয়েছে! একের পর এক মামলা। পেরিক্লিসকে শেষ না করে ওরা ছাড়বে না। সক্রেটিস আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল।

সক্রেটিস জেনথিপিকে আসপাশিয়ার মামলার কথা বলল। জেনথিপি সরল মেয়ে। সে মামলা-টামলা বোঝে না। কোনো মেয়ের নামে মামলা হয়েছে, এটি সে কোনোদিন শোনেনি।

জেনথিপি বলল, আজব ঘটনা। মেয়েমানুষের নামে আবার মামলা হয় নাকি?

সক্রেটিস বলল, এটি ঠিক বলেছ, এথেন্সে মেয়েদের নামে মামলার কথা শোনা যায়নি। আজব ঘটনাই।

জেনথিপি বলল, এথেন্সে কী শুরু হয়েছে? দেবতার শাপ লাগছে। ঘোর দুর্দিন আসছে। দেবতারা সইবে না। মেয়েরা হলো ঘরের শান্তি। তাদের নিয়ে আদালতে টানাটানি!

সক্রেটিস বলল, আসপাশিয়া ঘরের শান্তি ধরনের মেয়ে নয়। অত ভোলাভালা নয়। সে পুরুষের চেয়ে কয়েক কাঠি সরেস।

জেনথিপির বিশ্বাস হচ্ছে না। মেয়েমানুষ আবার পুরুষের চেয়ে সরেস হয় নাকি? সে বলল, কিন্তু মামলা কেন করেছে? দোষ কী? কিছু চুরি করছে? নাকি প্রেম-ট্রেম, পরকীয়া?

সক্রেটিস হাসল। এথেন্সে প্রেমের কোনো কারবার নাই। একমাত্র প্রেমের ঘটনা হলো পেরিক্লিস-আসপাশিয়া জুটি।

'তাহলে কী নিয়ে মামলা?'

'মামলায় ওরা যাই লিখুক, আসল অপরাধ সে পেরিক্লিসের ঘরনি। পেরিক্লিসের শত্রুরা তার সকল আপন মানুষদের পিছনে লেগেছে। ছুতানাতায় তাদের নামে মামলা দিচ্ছে।'

'কী মতলবে এমন করছে?'

'মতলব হলো পেরিক্লিসকে একা করে ফেলা। সামনে থেকে পেরিক্লিসকে কিছুই করতে পারছে না, তাই পেছন থেকে ছুরি মারছে। সে জন্য তার নিজের লোকদের সরিয়ে দিচ্ছে। একে একে সবার নামে মামলা হচ্ছে।'

'তো পেরিক্লিস কি বসে বসে আঙুল চুষছেন? তিনি কিছু করতে পারেন না? তিনি তো রাজা। রাজার বউয়ের নামে মামলা করে, আর রাজা বসে থাকেন?'

সক্রেটিস বলল, পেরিক্লিস রাজা নন। তিনি গণতন্ত্রের নেতা। রাজা হলে, তার বউয়ের নামে কেউ মামলা করতে পারত না। সেটি সম্ভব নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে সম্ভব।

'এত কিছু বুঝি না। আমরা তো জানি পেরিক্লিস ত্রিশ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। এত লোক এলো-গেল কিন্তু পেরিক্লিস ঠিকই রয়ে গেছেন। তিনি রাজা নয় তো কী? এথেন্সে এমন কে আছে যে পেরিক্লিসের কথা ফেলে দেবে? তিনি চাইলে এসব মামলা-টামলা সব পানি-ভাত হয়ে যাবে।

সক্রেটিস কিছুই বলল না। জেনথিপি একেবারে মিথ্যা বলেনি। পেরিক্লিস যদি গোপনে চেষ্টা করে, সংসদে এই মামলা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারে।

কয়েক দিনেই দেখা গেল, এই বুদ্ধি শুধু জেনথিপির নয়। সবাই এই পরামর্শ দিচ্ছে। পেরিক্লিস যদি সংসদে অনুরোধ করে বলেন যে, আসপাশিয়া নির্দোষ, এই মামলা বন্ধ করেন, তাহলে মামলা বন্ধ হবে। এখনও লোকে পেরিক্লিসের কথা বিশ্বাস করে, তিনি এথেন্সকে কতটা ভালোবাসেন, তা মানুষ জানে।

কিন্তু পেরিক্লিস মন ঠিক করতে পারছেন না। মানুষ যাই বলুক গণতন্ত্র, আইন, বিচার এগুলো তিনি মন থেকেই মানেন। তার কাছে এথেন্সের গণতন্ত্র সারা পৃথিবীর জন্য উদাহরণ। এথেন্সে আইন নিজের মতো চলে, তাতে কেউ নাক গলায় না। বিচার বিচারের মতোই হয়, শাসকরা কেউ বিচারে হাত দেয় না। এখানে সবার অধিকার সমান। পেরিক্লিসই এই ব্যবস্থা তৈরি করেছেন। তিনি নিজে এই আইন ভাঙবেন না। যেদিন তিনি আসপাশিয়াকে ঘরে এনেছেন, সেদিনও আইন ভাঙেননি। নিয়ম মেনে নিজের বউকে তালাক দিয়ে আসপাশিয়াকে ঘরে এনেছেন। এত বছর আইনের বিয়েও করতে পারেননি। তবু আইন ভাঙেননি পেরিক্লিস।

কিন্তু এখন শত্রুরা চূড়ান্ত আঘাত করছে। মামলা চললে আসপাশিয়ার মৃত্যুদণ্ড বা যাবৎ জীবন জেলও হতে পারে। বিনা দোষে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের এই পরিণতি মানা যাবে না।

পেরিক্লিস সংসদে গেলেন। পিনিক্স পাহাড়ের উপর হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। সবাই অবাক। তাকে এইরূপে কেউ দেখেনি। তিনি সবার কাছে জিউসের মতো। সবাই জানে যে তার কোনো আবেগ নেই, কোনো হতাশা নেই। তিনি দাঁড়ালেই মানুষ ভরসা পায়। তিনি সব বিপদ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। সেই পেরিক্লিস হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছেন।

পেরিক্লিস ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন— গত পঁচিশ বছরে তিনি কীভাবে এথেন্সকে আজকের জায়গায় এনেছেন। আজ এথেন্সের সামনে কোনো নগর দাঁড়াতে পারে না। অর্থ, বিত্ত, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সৌন্দর্য সব ক্ষেত্রে এথেন্স সবার সেরা। সেটি হয়েছে এই পেরিক্লিসের সময়েই। সবাই তার কথায় সায় দিল। এর চেয়ে সত্য কথা আর হয় না।

এরপর তিনি বললেন আসপাশিয়া এথেন্সের জন্য কী করেছে। আসপাশিয়ার বুদ্ধিতে এথেন্স যে সুনাম পেয়েছে সেটি দুনিয়ার সেরা।

তারপর পেরিক্লিস, সকলের কাছে আসপাশিয়ার মামলা বাতিল করার অনুরোধ করলেন। বলতে বলতে তার চোখে পানি চলে এলো।

অশ্রু ভরা চোখে পেরিক্লিস বললেন, যদি কোনো দোষ হয়ে থাকে, সেটি আমার। আসপাশিয়া কোনো দোষ করেনি। তাকে রেহাই দাও।

এথেন্সের সংসদে ভীষণ এক বেদনার পরিবেশ। এথেন্সের মানুষ এভাবে পেরিক্লিসকে দেখতে চায় না। পেরিক্লিস তাদের বিপদের কাণ্ডারি। সুখের দিনে আরও সুখ আনার

মানুষ। তিনি দুঃখে আছেন, সেটি ভেবে মানুষের কষ্ট হলো। এই মামলা চলবে কিনা সেই বিষয়ে তখুনি ভোট হলো। ভোটে মামলা বাতিল হয়ে গেল।

হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন পেরিক্লিস। কিন্তু তাকে দেখেই হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল আসপাশিয়া। সে জানে এই মামলা শেষ করতে পেরিক্লিসকে কতখানি ছোট হতে হয়েছে। পেরিক্লিস মানুষের কাছে তার জন্য দয়া চাইছেন, এটি ভাবলেই আসপাশিয়ার কান্না পাচ্ছে। এর চেয়ে তার মরে যাওয়াই ভালো ছিল।

৩৭

‘আমি কাউকে কিচ্ছু শেখাতে পারি না,
আমি শুধু তাদের দিয়ে চিন্তা করাতে পারি।’
—সক্রেটিস

যতই কান্না পাক, দুঃখ বিলাস করার সময় নেই আসপাশিয়ার। সে মহাব্যস্ত। দম ফেলার সময় নেই। সক্রেটিস ব্যস্ত নয়। সে অপেক্ষা করছে। কখন আসপাশিয়ার লেখা শেষ হবে।

আসপাশিয়া পেপিরাস কাগজে লিখছে। খুব দ্রুত লিখছে। মেয়েটি এমন চমৎকার করে লিখতে পারে! সক্রেটিসের ঈর্ষা হলো। সক্রেটিস কিছু লেখে না। কলম তার দুচোখের বিষ। লিখতে গেলে তার আঙুলে ব্যথা লাগে। আর এই মেয়েটি ঘচাঘচ লিখে যাচ্ছে। কেমন করে আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলো বসিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ঐ চিকন আঙুলে জাদু আছে।

লেখা শেষ করে সক্রেটিসকে পেপিরাসগুলো দিল আসপাশিয়া পেপিরাসের উপর লেখা:

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বক্তৃতা[৯৬] অথবা আখেরি বিদায় বক্তৃতা।

বক্তা : পেরিক্লিস

সক্রেটিস বুঝল পেরিক্লিস বক্তৃতা দেবেন। স্পার্টার সাথে যুদ্ধে যারা মারা যাচ্ছে, তাদের কবর দেওয়া হবে। ধুমধাম করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। এতক্ষণ ধরে আসপাশিয়া সেই বক্তৃতা লিখছে

আসপাশিয়া বলল, যুদ্ধে আমাদের ছেলেরা মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন লাশ আসছে। লাশ দেখে মানুষ ভয় পাচ্ছে। মানুষের সাহস ধরে রাখতে হবে। সেজন্য পেরিক্লিস ঠিক করেছেন, তিনি ভাষণ দেবেন। এথেন্সের মহিমা বলবেন, যাতে মানুষ সাহস পায়। এথেন্স যে একটি মহান নগর, সেটি মানুষ বুঝতে পারে।

সক্রেটিস বলল, কবে এই অনুষ্ঠান?

আসপাশিয়া বলল, পরশু বিকেলে। কেরামেকাসের গোরস্তানে। এখন বক্তৃতাটা পড়ো। পড়া হলে বিশেষজ্ঞ মন্তব্য কর।

সক্রেটিস বক্তৃতাটি পড়তে শুরু করল। আসপাশিয়া খুব মিষ্টি করে লেখে। শুনলে মনে হয় যেন খুব আপনজনকে বলছে। সক্রেটিস পড়ছে আর মুগ্ধ হচ্ছে। এত চমৎকার ভাষণ সে কোনোদিন শোনেনি।

সক্রেটিস আসপাশিয়ার দিকে তাকাল। এই লেখা এই মেয়েটি লিখেছে? বলে না দিলে, কেউ বিশ্বাসই করবে না। তার চোখে এক সাগর মুগ্ধতা।

সে বলল, কী চমৎকার লিখেছ। বারবার পড়তে ইচ্ছে করছে। এ বক্তৃতাটি মানুষ অনেক দিন মনে রাখবে। তোমার এই শব্দগুলো যখন পেরিক্লিস গদগদ গলায় বলবে, এটি একটি কালজয়ী বক্তৃতা হয়ে যাবে। মানুষ এই বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দেবে। হোমারের লেখার মতো আলাদা কিছু সৃষ্টি করে ফেলেছ তুমি। তোমার শব্দগুলো কেমন মিঠা, বারবার শুনতে মন চায়।

আসপাশিয়া বলল, প্রশংসা করার জন্য তোমাকে ডাকিনি। প্রশংসা করার জন্য আমার পিছে সারাদিন ছয় হালি লোক ঘোরে। আমার ভুল ধরার লোক নেই। আমি তোমাকে ডেকেছি ভুল ধরার জন্য। ভুল ধরো। সমালোচনা করো। চাঁছাছোলা সমালোচনা। কঠিন শিক্ষকের মতো বলো, ভাষণের মধ্যে কী দিতে ভুলে গেছি।

সক্রেটিস বলল, দেবতাদের কথা দিতে ভুলে গেছ। এথেন্সে বক্তৃতা হবে, আর দেবী এথিনার নাম নেই। লোকে মানবে?

আসপাশিয়া বলল, দেবীকে আমি ভক্তি করি, সেটি আমার মনের ব্যাপার। সরকারি কাজে দেবীর দরকার নেই।

সক্রেটিস বলল, ঝুঁকি নিচ্ছ?

আসপাশিয়া বলল, দেবতাদের নাম নেবে কিনা, সেটি পেরিক্লিসই ঠিক করুক। সে আমার চেয়ে অনেক ঝানু নেতা। সিদ্ধান্ত তার। আমি গণতন্ত্রের কথা, এথেন্সের কথা লিখে দিলাম। আর কোনো সমালোচনা?

'নারীদের কথাও নেই। তুমি নারী হয়ে তোমার লেখায় মেয়েদের নিয়ে একটি শব্দও নেই। অদ্ভুত লাগছে।'

আসপাশিয়া বলল, নারীদের কথা শুনতে তোমাদের এথেন্স কি তৈরি?

সক্রেটিস কিছুই বলছে না। এর উত্তর তার জানা নেই।

আসপাশিয়া বলল, যেদিন এথেন্স মেয়েদের মনের কথা শুনতে চাইবে, সেদিনের বক্তৃতায় নারীদের কথা আসবে। তার আগে মেয়েদের কথা লিখতে গেলে তোমার বন্ধু ইউরিপিডিসের মতো অবস্থা হবে। সে বেচারা মেয়েদের মনের সত্য কথা লেখে, আর সবাই তাকে বলে নারীবিদ্বেষী। আর কিছু বলবে?

সক্রেটিস বলল, এই লেখায় বিকেলের নরম রোদের মতো সুন্দর করে এথেন্সের কথা আছে। ছোট্ট পাখির পালকের মতো গণতন্ত্রের কথা আছে। গণতন্ত্র নিয়ে এত সুন্দর সুন্দর কথা অন্য কেউ বলতে পারেনি। সহজভাবে আমাদের কথা লিখেছ তুমি। এক কথায় চমৎকার। এথেন্সের যে শুনবে, সেই ভাববে, এটি তার মনের কথা।

আসপাশিয়া ক্ষেপে গেল। সে প্রশংসা চায় না, সমালোচনা চায়।

সক্রেটিস বলল, অসাধারণ হয়েছে। তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি পেরিক্লিসকে জিজ্ঞেস করতে পার।

সক্রেটিস কিছু শব্দ পাল্টে দিল।

আসপাশিয়া বলল, ঠিক আছে। সমালোচক হিসেবে তুমি বেশি নম্বর পেলে না। আরেকজনকে দেখাতে হবে।

'কাকে দেখাবে?'

'তার নাম থুকিডিডিস'[৯৭]।

'সৈনিকদের জেনারেল থুকিডিডিস?'

'তোমাদের কাছে সে শুধু একজন সৈনিক। কিন্তু তার অন্য একটি গুণ আছে। সে চমৎকার লেখে।'

'তাই নাকি? তার লেখা তো দেখিনি। শুনিও নি।'

'হুঁম, এখনও বেশি কিছু লিখেনি। কিন্তু লেখার হাত চমৎকার। সে ইতিহাস লেখে। এখন পেলোপোনেসিস যুদ্ধের কথা লিখে রাখছে।'

'হেরোডোটাসের মতো?'

'হুঁম, তবে হেরোডোটাস হিজিবিজি করে লিখে। থুকিডিডিস পরিষ্কার করে লেখে। সে একজন সত্যিকার ইতিহাসবিদ।'

পরদিন বিকেলে কেরামেকাসের সমাধিক্ষেত্র লোকারণ্য। এথেন্সের প্রায় সব মানুষ এসেছে। পেরিক্লিস মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। সামনে সারি সারি কফিন। ফুল দিয়ে ঢাকা। স্পার্টার সাথে যুদ্ধে যারা মারা গেছে, তাদেরকে কবর দেওয়া হবে। পেরিক্লিস বক্তৃতা করবেন। অনেক বড় বক্তৃতা।

প্রথমেই তিনি পূর্ব-পুরুষদের শ্রদ্ধা জানালেন। এথেন্সের জন্য যারা প্রাণ দিচ্ছে, তাদের প্রতি সম্মান জানালেন। তারপর গদগদ গলায় বলতে শুরু করলেন:

আমরা সারা পৃথিবীর জন্য অনুকরণীয় ব্যবস্থা চালু করেছি। সেই ব্যবস্থার নাম গণতন্ত্র। আমাদের শাসন শুধু কয়েকজনের হাতে নয়, আমাদের নগর সবার হাতে। এখানে সবার সমান অধিকার। আমরা আইন দিয়ে দেশ চালাই। আমরা আইন মানি। তাই অন্যায় করি না। আদালত ও বিচারকাজে আমরা সবার চেয়ে অনেকগুণ এগিয়ে।

সক্রেটিস শুনছে। সে বুঝতে পারছে পেরিক্লিস গণতন্ত্র দিয়ে শুরু করেছেন। আসপাশিয়ার লেখার পিছনের জিনিস তিনি আগে নিয়ে এসেছেন।

পেরিক্লিস বলছেন— এথেন্সে সব কাজে একটিই মাপকাঠি, সেটি হলো যোগ্যতা। সব নাগরিকের যোগ্যতার মূল্যায়ন হয়। যোগ্যতা থাকলে যেকোনো নাগরিক সরকার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। দারিদ্র্য কোনো বাধা নয়।

ইউরিপিডিস সক্রেটিসের পাশে ছিল। সে প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলল। ভুলে গেছে যে এটি শোকের অনুষ্ঠান।

পেরিক্লিস বলছেন, আমাদের নগর মুক্ত। সারা পৃথিবীর জন্য মুক্ত। আমরা কোনোদিন কোনো বিদেশিকে নগর থেকে বের করে দেইনি। কোনো বিদেশিকে এই নগরের কোনো কিছু দেখা থেকে বিরত রাখিনি 1

সক্রেটিস ইউরিপিডিসকে বলল, আসপাশিয়া নিজে বিদেশি। তাই বিদেশিদের অধিকারের কথা লিখেছে।

বক্তৃতা চলছে—

অন্যরা যেখানে শিশুদের কঠিন পরিশ্রমে একরোখা সৈনিক বানায়, আমরা সেখানে শিশুদের সহজভাবে শিক্ষা দিই। শিশুদের বানাই জ্ঞানী ও সাহসী।

সক্রেটিস ইউরিপিডিসকে বলল, স্পার্টা শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধ শেখায়, সেটি নিয়ে খোঁচা দিল।

পেরিক্লিস মিষ্টি ভাষায় বলছেন:

এথেন্স হচ্ছে সমগ্র গ্রিসের জন্য একটি পাঠশালা। এটি শুধু কথার কথা নয়, এটি ধ্রুব সত্য। আমরা সুন্দর নগরের সুন্দর মানুষ। অন্যরা আমাদের দেখে শিখতে পারে।

ইউরিপিডিস বলল, বাহ, কী সুন্দর কথা! প্রতিটি দেশে কীভাবে সরকার চলা উচিত, সেটি এই বক্তৃতায় বলে দিলেন।

পেরিক্লিস শেষ করছেন—

এই যুদ্ধে যারা সন্তান হারালেন, আমরা তাদের গর্বে গর্বিত। তারা এথেন্সের সবচেয়ে মহান সন্তান। সবচেয়ে মহৎ নাগরিক। আমরা তাদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করব।

বক্তৃতা শেষ হলো।

পেপিরাস কাগজে থুকিডিডিস বক্তৃতাটি লিখে ফেলেছে। সে এখন ঘষা- মাজা করছে। সে খুবই আনন্দিত। এমন সুন্দর কথা সে জীবনে শোনেনি। গণতন্ত্র যে কী জিনিস, এথেন্স যে কীভাবে চলছে সেটি সাধারণ মানুষ বোঝে না। পেরিক্লিস সহজ ভাষায় সেই বিষয়গুলো বলে দিলেন।

থুকিডিডিস বললেন, এটি হলো গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতা। ভবিষ্যতে যে-ই বুঝতে চাইবে গণতন্ত্র কী, সে এই বক্তৃতা একবার হলেও দেখবে। এই বক্তৃতা নিয়ে আমি লিখব। আগামী দিনে মানুষ যাতে পেরিক্লিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বক্তৃতাটি জানতে পারে, সে জন্য আমি বিস্তারিত লিখব।

সবাই পেরিক্লিসকে বাহবা দিচ্ছে। অনেকেই বলছে, বাহ, এমন চমৎকার বক্তৃতা পেরিক্লিস ছাড়া আর কে দিতে পারেন? সবাই বলছে, কী মধুর কথা বললেন! এথেন্স

হচ্ছে সমগ্র গ্রিসের জন্য একটি পাঠশালা। স্পার্টা এক কথায় বুঝে যাবে, আসলে কে সেরা।

সক্রেটিস প্রশংসা শুনছে আর আসপাশিয়ার দিকে তাকাচ্ছে। আসপাশিয়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

সক্রেটিস ভাবছে, সবাই পেরিক্লিসের প্রশংসা করছে। কিন্তু বক্তৃতাটা যে আসপাশিয়া লিখেছে, সেকথা কেউ জানে না। একদিন হয়তো থুকিডিডিসের লেখা থেকে এই বক্তৃতা মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে, সেদিন সবাই বলবে পেরিক্লিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বক্তৃতা। সেদিনও আসপাশিয়ার কথা কেউ জানবে না। এথেন্সের মাটিতে একজন দার্শনিক নারী নীরবে পুরুষদের চেয়ে অনেক মহৎ কাজ করে যাচ্ছেন, ইতিহাসে তার কথা লেখা থাকবে না। কিন্তু এই কেরামেকাসের ঘাস মনে রাখবে যে, এই বক্তৃতা লিখতে আসপাশিয়ার কয়টা নির্ঘুম রাত পার হয়েছে।

বক্তৃতা শেষে বাড়ি ফিরছেন পেরিক্লিস।

তিনি খুব খুশি। সুন্দর বক্তৃতা করেছেন। অনেক দিন ধরে তার মন খারাপ ছিল। স্পার্টার সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মনে শান্তি ছিল না। আজ বেশ শান্তি শান্তি লাগছে। বিকেলের আকাশ ঝকঝকে নীল। মনে হচ্ছে আকাশের নীল বুঝি তাকে ছুঁতে চাইছে। আকাশ থেকে এক মুঠো নীল রং বুঝি বাতাসেও ছড়িয়ে গেছে। বাতাসও আজ নির্মল। একটি মিষ্টি গন্ধ চারদিকে। যুদ্ধ শুরুর পরে এমন শান্তি আর লাগেনি।

মনের আনন্দে হেঁটে হেঁটেই বাড়ির ফিরছিলেন তারা।

দূর থেকে একজন দাস দৌড়ে আসছে। সে চিৎকার করে ডাকছে পেরিক্লিস দাঁড়ালেন। দাস কাছে এসে বলল, বিপদ, মহাবিপদ। এথেন্সে আচানক এক রোগ শুরু হয়েছে। ভয়ংকর অজানা রোগ। মানুষ মারাও যাচ্ছে। কয়েক দিনেই বোঝা গেল, এথেন্সে প্লেগ এসেছে। মহামারী শুরু হয়েছে। ঘরে ঘরে লোক মারা যাচ্ছে। এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। ডাক্তাররা কিছুই করতে পারছেন না। একেবারে নতুন রোগ।

প্রথমে মাথায় ভীষণ জ্বর হয়। মাথা ঘুরায়। কদিন পরে আরম্ভ হয় চোখ জ্বালা। তীব্র জ্বালায় চোখ ছটফট করে। তারপর শুরু হয় পেট ব্যথা। পেটের ব্যথা থেকে ডায়রিয়া। শরীর শুকিয়ে যায়। আরম্ভ হয় পানির তীব্র পিপাসা। গলা ফেটে যায়। পানি পানি বলে চিৎকার করতে করতে এক সময় মারা যায়।

ভয়াবহ দিন এসেছে এথেন্সে। পৃথিবীর সবচেয়ে আলোকিত নগরে অন্ধকার এসেছে। মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এথেন্সের ছোট্ট দেয়ালের মধ্যে প্লেগের জীবাণু কিলবিল করছে। যারা ভেতরে আছে, একে একে মারা যাচ্ছে। পালানোর পথও নেই। দেয়ালের বাইরে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে স্পার্টার সেনা

পেরিক্লিস যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব পাঠালেন স্পার্টার কাছে। কিন্তু স্পার্টা মানল না।

স্পার্টার সেনাপতি লাইসেন্ডার বলল, প্লেগের দেবতা এপোলো আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, আর এথেন্সকে শাস্তি দিচ্ছেন। ওরা পাপী। একে একে সবাই মরবে। আমাদের কিছুই হবে না। আমরা চারিদিকে ঘিরে থাকব। কাউকে বের হতে দিব না। যুদ্ধ বন্ধ হবে না। একজন স্পার্টান বেঁচে থাকতেও যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ছোট্ট দেয়ালের মধ্যে আড়াই লাখ মানুষে গিজগিজ করছে। তার মধ্যে প্লেগ। দেদারছে মানুষ মরছে।

এথেন্সের সবখানে লাশ। চারদিকে লাশের গন্ধ। তীব্র গন্ধে রাস্তায় নামা যায় না। অনেক দাস মরে গেছে। অনেক দাস পালিয়ে যাচ্ছে। লাশ দাফন করার লোকও পাওয়া যাচ্ছে না।

সারি সারি লাশ যাচ্ছে গোরস্তানের দিকে। নানা পথ থেকে লাশ আসছে। মানুষ লাশের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করছে। যে যার মতো বিলাপ করছে। কান্না আর কান্না। ঘরে ঘরে কান্না। চিৎকার করে কান্না। এথেন্সে অন্য কিছুই শোনা যায় না, শুধু কান্নার শব্দ।

দেবতাদের কাছে অনেক প্রার্থনা চলছে। মন্দিরের সামনে চলছে পশু বলি। তবু কোনো উন্নতি নেই। দিনে দিনে অবস্থা খারাপ হচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে।

এই সময় স্পার্টার সেনাপতি লাইসেন্ডার একটি ভয়ংকর কূটচাল দিল। সে খবর পাঠাল, স্পার্টা যুদ্ধ বন্ধ করবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এথেন্সের নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে হবে পেরিক্লিসকে। পেরিক্লিস না থাকলে, স্পার্টা আর যুদ্ধ করবে না।

আসলে এই সুযোগে স্পার্টা পেরিক্লিসের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। পেরিক্লিস এথেন্সকে সাজিয়েছেন। তিনিই এথেন্সকে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নগর করেছেন। তার কারণেই লোকে স্পার্টার কথা ভুলে গেছে। তিনিই দেশ-বিদেশের গুণী মানুষকে এথেন্সে জায়গা দিয়েছেন। আজকের এই আলোকিত এথেন্স আসলে পেরিক্লিসের এথেন্স। পেরিক্লিস না থাকলে, এথেন্স এমন থাকবে না। তখন স্পার্টার সুদিন আসবে। তাই পেরিক্লিসকে সরতে হবে। পেরিক্লিস সরে গেলেই স্পার্টা যুদ্ধ থামাবে।

স্পার্টা গুজব ছড়িয়ে দিল যে পেরিক্লিস খারাপ মানুষ। তিনি দেবতা মানেন না। তিনি অনাচার করেছেন। তাই দেবতা প্লেগ পাঠিয়েছেন। শাস্তি দিচ্ছেন এথেন্সকে। এখন এথেন্সের মানুষের হাতে দুটো পথ— পেরিক্লিস থাকলে এথেন্স ধ্বংস হবে, আর এথেন্সকে বাঁচাতে চাইলে পেরিক্লিসকে সরাতে হবে।

দিন যায়। এসব কথা লোকের মুখে মুখে ছড়ায়। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, পেরিক্লিসই সবকিছুর জন্য দায়ী। আগোরার পথে পথে এটি নিয়ে আলাপ হচ্ছে।

একজন বলছে, ভাই, এমন প্লেগ কেন হলো এথেন্সে?

আরেকজন উত্তর দিচ্ছে, কারণ, দেবতা রাগ করেছে।

কেন রাগ করেছে?'

'তোমরা অনাচার করেছ। এথেন্সের ঘরে ঘরে মারাত্মক অনাচার চলছে।'

'আমরা অনাচার করলাম কোথায়? আমরা তো সকাল-বিকাল দেবীর কাছে প্রার্থনা করি। মাঝেমধ্যে দেবতার কাছে ছাগল বলি দিই। টাকা হাতে থাকলে মহিষ বলি দিই। আমরা তো ভক্ত মানুষ। অনাচার কোথায় দেখলে?'

'অনাচার কি সবাইকে করতে হয়? অনাচার করে দেশের রাজা। একা রাজার পাপেই মরে সকল প্রজা।'

'এথেন্সে তো রাজা নেই।'

'কেন, পেরিক্লিস কী? তিনিই তো রাজা। গণতন্ত্র বলো, আর যা-ই বলো, গত ত্রিশ বছর এথেন্স চালাল কে?'

'পেরিক্লিস।'

'হুঁম, তিনিই হলেন নষ্টের মূল। পেরিক্লিসই পাপী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ঘেন্না। তার কথা মনে পড়লেই ঘেন্না লাগে। তার অনাচারেই এই প্লেগ।'

'কী অনাচার করছেন?'

'কী করেন নাই? কেরামেকাস পাড়ার একটি মেয়েকে নিজের ঘরে এনেছেন। তার নাম আসপাশিয়া। তারা বিয়ে করেননি। বিয়ে না করেই লীলা করছেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তাদের আবার সন্তান আছে। ভেবে দ্যাখো কত বড় অনাচার! এমন অনাচার দেবতা কত দিন সহ্য করবে? দেবতার সহ্যেরও একটি সীমা আছে।'

'হুঁম, এটি কিঞ্চিৎ সত্য।'

'কিঞ্চিৎ নয়, পুরোই সত্য। ওদের নষ্টামির জন্যই দেবতা এপোলো ক্ষেপে গেছেন। শাস্তি হিসেবে প্লেগ পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'এরকম নষ্টামি তো কত মানুষই করছে। এথেন্সের অনেক মানুষই তো গোপনে কেরামেকাসে যায়। কত কিছু করে।'

'অন্য মানুষের করা আর রাজার করা কি এক হলো? রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট— প্রজা কষ্ট পায়।'

'এটি কিছুটা সত্য।'

'এর চেয়েও বড় সত্য আছে। পেরিক্লিস দেবতা মানেন না। তিনি আসলে নাস্তিক।'

'এটি সত্য নয়। তিনি দেবী এথিনার ভক্ত। দ্যাখো কেমন সুন্দর করে দেবীর মন্দির বানিয়েছেন। পার্থেননে দেবীর মূর্তি দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে, পেরিক্লিস দেবীকে মানেন না।'

'ওইসব হলো মানুষকে দেখানোর জন্য। মানুষকে দেখাতে মন্দির বানিয়েছেন। মন্দির বানিয়ে কি ভক্তি হয়? ভক্তি হলো মনের জিনিস। মনে মনে তিনি দেবতাদের মানেন না।'

'একথা লোকে বিশ্বাস করবে না। মানুষ প্রমাণ চায়।'

‘প্রমাণ চাও? একজন মানুষকে চিনতে চাও? তার বন্ধুদের দিকে তাকাও। গত ত্রিশ বছরে পেরিক্লিস কাদের সাথে ওঠা-বসা করেছেন? কে কে ছিল তার সব সময়ের সঙ্গী? তার সাথে যারা ছিল তারা একজনও দেবতা মানে না।’

‘কাদের কথা বলছো?’

‘মনে করে দ্যাখো— তার বাড়িতে থাকত এই দুনিয়ার এক নম্বর নাস্তিক এনাক্সাগোরাস। সে বইতে লিখেছিল— সূর্য, চাঁদ এসব নাকি দেবতা নয়, এরা নাকি বড় ধাতুর গোল্লা। এরকম একজন ধর্মবিদ্বেষী লোক ত্রিশ বছর পেরিক্লিসের বাড়িতে ছিল। পেরিক্লিস তাকে বাড়িতে রেখেছিলেন, তার বুদ্ধিতে কাজ করতেন। তারপর আরেক দার্শনিক প্রোটাগোরাস। সে তো সরাসরি বলল, দেবতা-টেবতা কিচ্ছু না, পৃথিবীর সবকিছুর মূলে মানুষ। এই শয়তান দার্শনিক ছিল পেরিক্লিসের প্রাণের দোস্ত। তারপর তার বন্ধু ভাস্কর ফিডিয়াস। সে তো দেবীর হাতের ঢালের উপর পেরিক্লিসের মূর্তি এঁকেছে। তারপর ডেমন— সংগীত শিল্পী। সে মানুষের মাথা নষ্ট করতে গান বানাত, দেবতাদের নিয়ম উল্টে দিতে চেয়েছিল। তারপর সক্রেটিস। সে তো এথেন্সের এক নম্বর খারাপ লোক। দেবতা মানে না। সে প্রতিদিন পেরিক্লিসের বাড়িতে গিয়ে আসপাশিয়ার সাথে গুজুর গুজুর ফুসুর-ফাসুর করে। তো তাহলেই দ্যাখো! কাদের নিয়ে পেরিক্লিস চলেছে এত বছর। তার সব বন্ধুরা নাস্তিক। তো সে কী করে ধোঁয়া তুলসী পাতা হয়? সেই হলো এসব নাস্তিকদের এক নম্বর পাণ্ডা। এদের সবাইকে সাহস দিয়েছে সে। তাই দেবতারা রাগ করেছেন। এই প্লেগের জন্য একমাত্র দায়ী পেরিক্লিস। পেরিক্লিস ক্ষমতা ছাড়লেই প্লেগ থামবে, তার আগে প্লেগ থামবে না।’

এমন কথা এখন অনেকেই কানাঘুষা করে। পেরিক্লিসের বিরোধীরা সব খানে এই কথা শোনাচ্ছে। স্পার্টার নেতারাও বলছে পেরিক্লিস চলে গেলেই প্লেগ থামবে, যুদ্ধও থামবে।

সফোক্লিস আগোরার পথে এসব কথা শোনেন। তার মাথায় নতুন নাটকের কথা ঘোরে। তিনি নাটক লিখবেন। এবার তিনি প্লেগ আর পেরিক্লিসকে মিলিয়ে নাটক লিখবেন।

***

৯৬. খ্রি. পূ. ৪৩১ অব্দে পেরিক্লিস গণতন্ত্রের ইতিহাসের সুবিখ্যাত ভাষণ ‘Pericles’ Funeral Oration’ প্রদান করেন। ভাষণটি আসপাশিয়া লিখেছিলেন বলে প্লেটো তার Menexenus ডায়ালগে উল্লেখ করেন।

৯৭. গ্রিক ইতিহাসবিদ থুকিডিডিস (Thucydides), পেলোপোনেসিস যুদ্ধ নিয়ে তিনি লেখেন বিখ্যাত বই ‘History of the Peloponnesian War’, এতে তিনি ‘Pericles’

Funeral Oration' লিপিবদ্ধ করেন।

৩৮

'তুমি যাকে খুঁজছো, সেটি তুমি নিজেই।
তুমি নিজেই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।'
—সফোক্লিস

কোথাও খারাপ কোনো কিছু ঘটলে মানুষ প্রথমেই খোঁজে দায়ী কে? কারও ঘাড়ে দোষটা দিতে না পারা পর্যন্ত মানুষ শান্তি পায় না।

সফোক্লিস ভাবছেন, শহরে প্লেগ এসেছে। মানুষ কী শুনতে চায়? শুনতে চায়— এজন্য দায়ী কে? কার দোষে এই প্লেগ?

সবাই কারণ খুঁজছে। অনেকেই ভাবছে, কারণ হলেন পেরিক্লিস। সফোক্লিসও বিশ্বাস করেন, এই প্লেগের কারণ হলেন পেরিক্লিস। কিছু দিন ধরে তিনি পেরিক্লিসকে খুবই অপছন্দ করছেন। এখন তার কাছে পেরিক্লিসের সবকিছু খারাপ লাগছে।

কিছুদিন আগে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। সফোক্লিস আর পেরিক্লিস একসাথে সামোস দ্বীপে গিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে। সেখানে এক দুষ্টুমি থেকে দুজনের শত্রুতা শুরু হয়। পেরিক্লিস সফোক্লিসকে শত্রু ভাবেন না। কিন্তু সফোক্লিস তাকে ভয়াবহ দুশমন মনে করেন। ঘটনাটা ছিল এমন—

যুদ্ধের অবসরে দুজন গল্প করছিলেন। অনেকেই পাশে ছিল। সেখানে একটি অল্প বয়সী ছেলে ব্যায়াম করছিল। ছেলেটিকে দেখে সফোক্লিস বললেন, 'বাহ, ছেলেটি তো সুন্দর! মুখখানা বড় নিষ্পাপ।' এথেন্সে তরুণ ছেলেদের প্রতি বুড়োদের আকর্ষণ নিয়ে অনেক আজেবাজে কানাঘুষা আছে। পেরিক্লিস সেদিকে ইঙ্গিত করে কঠিনভাবে বললেন, 'সফোক্লিস, তুমি একজন সেনানায়ক, একজন জেনারেল। একজন জেনারেলের হাত যেমন নিখুঁত হওয়া উচিত, তেমনই তার চোখও পরিষ্কার থাকা উচিত। তোমার চোখ ঠিক করো।' কথাটি শুনে লজ্জায় হেঁট হয়ে গিয়েছিলেন সফোক্লিস। পেরিক্লিস এটি বলতে পারলেন? এতগুলো লোকের সামনে তার মতো সেরা নাট্যকারকে এভাবে বললেন! সেই মুহূর্ত থেকেই সফোক্লিস ঠিক করেছেন, এই জীবনে যেদিন সুযোগ পাবেন, সেদিনই পেরিক্লিসকে শিক্ষা দেবেন। অপমানের প্রতিশোধ নেবেন।

এবার সময় এসেছে পেরিক্লিসকে শিক্ষা দিতে হবে। সফোক্লিস নাটক লিখবেন। পেরিক্লিসকে নিয়ে নাটক। নাটকের মাধ্যমেই তার চেহারা সবার সামনে খুলে দেবেন। কাহিনি কী হতে পারে? নাটকের প্লট খুঁজছেন সফোক্লিস। ভালো প্লটের কথা মনে হলেই তার মাথায় আসে রাজা ইদিপাসের কাহিনি।

তিনি ইদিপাসের কাহিনি খুব ভালোবাসেন। রাজা ইদিপাসকে নিয়ে লিখতে বসলেই তার কলমে সোনা ঝরে। মুক্তার মতো সংলাপ বের হয়। তিনি আবার ইদিপাস লিখবেন।

কয়েক বছর আগে ইদিপাস নিয়ে লিখেছিলেন নাটক এন্টিগনি। ইদিপাসের মেয়ে এন্টিগনিকে নিয়ে ছিল কাহিনি। সেই নাটকের সংলাপ এখনও মানুষের মুখে মুখে। এবার সরাসরি রাজা ইদিপাসের কাহিনি। নাটকের নামও হবে 'রাজা ইদিপাস'। কাহিনি সবাই জানে—

থিবসের রাজপুত্র ইদিপাস না জেনে নিজের বাবাকে হত্যা করে রাজা হয়। না জেনেই নিজের মাকে বিয়ে করে ফেলে। তাদের ছেলেমেয়েও হয়। অনেক বছর পরে আসল ঘটনা জানতে পেরে অনুতাপে ইদিপাস নিজেকে অন্ধ করে ফেলে। তার মা আত্মহত্যা করে।

সফোক্লিস ভাবছেন, কীভাবে ইদিপাসের সাথে পেরিক্লিসকে মিল করা যায়। সফোক্লিস অমিত প্রতিভাধর। তিনি সর্বকালের সেরা নাট্যকার। প্রতি বছর বসন্ত উৎসবে তার নাটক প্রথম হয়। সে কাশি দিলেও দু'একটি কাহিনি বের হয়ে যায়। তার কাছে পেরিক্লিস আর ইদিপাসকে মিলানো কোনো ব্যাপারই নয়। জানালায় হাত দিয়ে ভাবছিলেন সফোক্লিস।

একটু পরেই চিৎকার করে উঠলেন, পেয়েছি, এটি তো আমার বাঁ হাতের খেল্। তার মাথায় রাজা ইদিপাস নাটকের প্লট এসে গেছে।

উত্তেজনায় সফোক্লিস কাঁপছেন। এই নাটক দিয়ে তিনি পেরিক্লিসের মুখোশ খুলে দেবেন। এটি তার প্রতিশোধের নাটক। এটিকে খুব ভালো করতেই হবে। নিজের সবটুকু ঢেলে তিনি এই নাটক বানাবেন। তিনি প্লট লিখতে বসলেন।

ইদিপাসকে হিসেবে তিনি পেরিক্লিসকে এথেন্সের মানুষের কাছে তুলে ধরবেন। এথেন্সে এখন প্লেগ চলছে। তাই রাজা ইদিপাসের কাহিনিও শুরু করতে হবে প্লেগ দিয়ে। মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এটি আসলে এথেন্সের কাহিনি। সফোক্লিস ভাবছেন ইদিপাসের শহর থিবস। তো নাটকের শুরুতেই থিবস শহরে এথেন্সের মতো প্লেগ আসুক। ভয়াবহ প্লেগ।

থিয়েটারে সবাই শুরুতেই বুঝে যাবে যে, নাটকের থিবস শহর আসলে এথেন্স। এথেন্সের প্লেগকে বোঝাতেই নাট্যকার থিবস শহরে প্লেগ দেখাচ্ছে। নাটকে প্লেগের ভয়াবহতা দেখে সবাই নিজেদের কষ্টের কথা মনে করবে। অভিনেতার সাথে সবাই কাঁদবে।

সফোক্লিস প্লট বানাচ্ছেন:

থিবস শহরে সবাই প্লেগের কারণ খুঁজছে? রাজা ইদিপাসও খুঁজছেন। রাজা লোক পাঠাচ্ছেন ডেলফিতে— প্লেগের কারণ জানার জন্য। জানা গেল রাজা নিজেই এই প্লেগের কারণ। জানা গেল ইদিপাস নিজেই একটি পাপ। সে নিজেই একটি অভিশাপ। তার নিজের জন্যই শহরে খরা এসেছে। তার জন্যই মড়ক লেগেছে। রাজা নিজেই দায়ী।

এটি দেখলে, মানুষ এথেন্সের সাথে মিলাতে চাইবে। তারা ভাববে— এথেন্সেও এমন কিছু হয়েছে। এজন্য কে দায়ী? কার পাপে এথেন্সে প্লেগ এসেছে? মানুষের মনে প্রশ্ন আসবে— এথেন্সে কে রাজা? রাজা তো নেই, কিন্তু প্রধান নেতা আছেন। তিনি হলেন পেরিক্লিস। সবাই ভাববে, এথেন্সের প্লেগের জন্য পেরিক্লিস নিজেই কি দায়ী?

সফোক্লিস কাহিনি লিখছেন— প্লেগের জন্য ইদিপাস কীভাবে দায়ী? উত্তর হলো ইদিপাস ব্যভিচারী। সে নিজের মাকে বিয়ে করেছে। তাদের সন্তান হয়েছে। একইভাবে— পেরিক্লিসও ব্যভিচারী। সে বিয়ে না করেই আসপাশিয়াকে ঘরে এনেছে। তাদেরও ছেলে আছে।

ইদিপাস অন্যায় করেছে না জেনে। আর পেরিক্লিস করেছে জেনে। পেরিক্লিস আসলে ইদিপাসের চেয়েও খারাপ। ইদিপাসের পাপে থিবস শহরে প্লেগ এসেছে। আর পেরিক্লিসের পাপে এথেন্সে প্লেগ এসেছে।

এবার কাহিনি শেষ করতে হবে। সফোক্লিস ভাবছেন নাটকের শেষ কি হবে? পেরিক্লিসের পরিণতি কি দেখানো যায়? মৃত্যু? না, মৃত্যু বেশি হয়ে যায়। পেরিক্লিসের মৃত্যু দেখালে এথেন্সের মানুষ মানবে না। সবচেয়ে ভালো হয় নির্বাসন। যদি পেরিক্লিস এথেন্স থেকে চলে যায়, সেটি সবচেয়ে ভালো হবে। যদি ভোট দিয়ে তাকে এথেন্স থেকে নির্বাসিত করা হয়, তাতেও চলবে। তিনি ঠিক করলেন নাটকের কাহিনিতে ইদিপাস তার শহর থেকে চলে যাবে। রাজা চলে গেলে শহর পাপমুক্ত হবে। পেরিক্লিস বিদায় নিলে এথেন্স পাপমুক্ত হবে।

এভাবে কাহিনি শেষ হবে।

সফোক্লিসের মন খচখচ করছে। কী যেন হয়নি। কিছু একটি বাকি রয়ে গেল। অনেক ভেবে সফোক্লিস মনে করল, সামোস দ্বীপে পেরিক্লিস তার চোখ ভালো করতে বলেছিল।

চোখ! চোখ শব্দটা বারবার মনে আসছে। আমার চোখ ভালো করতে চায় পেরিক্লিস! আমার চোখ খারাপ? তো পেরিক্লিসের চোখ নষ্ট হোক। তার নাটকে পেরিক্লিস হলো ইদিপাস। তিনি কাহিনি ঠিক করলেন— অনুশোচনায় ইদিপাস নিজের চোখ নষ্ট করে ফেলল। অন্ধ হলো ইদিপাস।

প্লট বানানো শেষ। এবার নাটকের শিল্পগুণ ঠিক করতে হবে। ট্র্যাজেডির সব গুণ দিয়ে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলতে হবে। প্লট সেভাবেই হয়েছে। এত বছর ধরে নাটক লিখছেন সফোক্লিস। এখন আর ট্র্যাজেডির গুণ নিয়ে তাকে ভাবতে হয় না। এমনিতেই চলে আসে। ট্র্যাজেডিতে নায়কের পরিণতি হয় ভয়াবহ। অনেক উঁচু থেকে ধপাস করে

পড়ে যায় নায়ক। কাহিনিতে সেটি হয়ে গেছে। রাজা ইদিপাস ছিল সবার চোখের মনি। সে হয়েছে ঘৃণিত অভিশাপ। হয়েছে অন্ধ, নির্বাসিত। এর চেয়ে করুণ আর কিছুই হতে পারে না।

এখন দৃশ্য আর সংলাপ দিয়ে ট্র্যাজেডিকে প্রাণবন্ত করতে হবে।

সফোক্লিস সংলাপ লেখেন আর অভিনয় করেন। তার নাটক লেখার দৃশ্যটিও একটি নাটকের মতো। তিনি লিখছেন রাজা ইদিপাস—

ইদিপাসের দরবারে অনেক মানুষ এসেছে প্লেগের কারণ জানতে। তারা খুব দুঃখ নিয়ে বলছে—

লাশ আর লাশ, চারিদিকে লাশ
পুষ্পবনে লাশ, শস্যক্ষেতে লাশ
প্রতি মায়ের কোল জুড়ে শুধুই লাশ[৯৮]

সফোক্লিস ভাবছেন এই কথা শুনলেই দর্শকরা এথেন্সের প্লেগের কথা মনে করবে। তিনি ঝড়ের বেগে লিখছেন—

রাজা ইদিপাস তার শ্যালক ক্রিয়নকে ডেলফিতে পাঠিয়েছেন, প্লেগের কারণ জানতে। ডেলফির ওরাকল বলেছে— 'একটি দুষ্ট পাপ আছে এই নগরেই। সে আমাদের মাটিকে দূষণ করছে। তাকে তাড়াতে পারলেই শুধু আমরা বাঁচতে পারব।'

ক্রিয়ন খুলে বলল, এই নগরের আগের রাজা লাইয়াসের খুনি এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটিই হলো অভিশাপ। সেই অভিশাপেই এই প্লেগ। খুনিতে তাড়াতে হবে, অথবা খুনের বদলে খুন করতে হবে। কিন্তু কেউ জানে না কে সে খুনি। ইদিপাস শপথ নিল খুনিকে খুঁজে শাস্তি দেবে। খুনির খবর জানতে নগরের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ অন্ধ বৃদ্ধ তেইরেসিয়াসকে নিয়ে আসা হলো। তিনি সব জানেন। কিন্তু বলবেন না। জেনেও বলবেন না দেখে ইদিপাসের ভীষণ রাগ হলো। ইদিপাস তাকে অন্ধ আর অজ্ঞান বলে অপমান করল। অন্ধ বৃদ্ধ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন, মূর্খ ইদিপাস, তুমি নিজেই সেই খুনি।

এখানে সফোক্লিস সংলাপ দিলেন জ্ঞানী বৃদ্ধের মুখে:

'তুমি যাকে খুঁজছো, সেটি তুমি নিজেই। তুমি নিজেই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।'

কথা দুটি লিখে খুব ভালো লাগল তার। কথাগুলোর ভালো অর্থ আছে। খুব দার্শনিক কথা হয়েছে। তিনি এই কথা দুটি কয়েকবার অভিনয় করলেন।

সফোক্লিস লিখে চলছেন— ইদিপাস জ্ঞানী তেইরেসিয়াসের কথা বিশ্বাস করল না। সে ক্রিয়নকে বলল, 'তুমি এই অন্ধ লোককে দিয়ে মিথ্যা বলাচ্ছ।' শুরু হলো ক্রিয়নের সাথে ঝগড়া। সেই ঝগড়া থামাতে এলো তার স্ত্রী রানি জোকাস্টা। সে আবার ক্রিয়নের বোন। সব শুনে রানি বলল, ভয় নেই। তুমি খুনি হওয়ার কোনো কারণ নেই। ডেলফির ওরাকল

বলেছিল, রাজা খুন হবে তার নিজের ছেলের হাতে। সেজন্য আমাদের যখন ছেলে হয়, আমরা তাকে মেরে ফেলতে এক মেষপালকের কাছে দিয়ে দিই। মেষপালকের কথা শুনেই চমকে উঠলেন ইদিপাস। তিনিও বড় হয়েছেন মেষপালকের কাছে। ইদিপাস ডাকল মেষপালককে। তার সাথে অনেক আলাপের পর তারা নিশ্চিত হলো, ইদিপাস আসলে রাজা লাইয়ুস আর রানি জোকাস্টার সন্তান। তার জন্মের পর বাবা-মা মেষপালককে দিয়ে দিয়েছিল মেরে ফেলার জন্য। মেষপালক তাকে বড় করেছে। বড় হয়ে সে একদিন না জেনে পথের মধ্যে নিজের বাবাকে খুন করে। তারপর থিবস শহরে এসে দেখে ভয়ানক দৈত্য স্ফিংস শহরকে কব্জা করে রেখেছে। দৈত্যের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে থিবস শহরের মানুষকে বাঁচায়। তারা তাকে থিবসের রাজা করে। বিধবা রানির সাথে তার বিয়ে হয়। তার মানে তার স্ত্রী আসলে তার মা। এই ভয়াবহ সত্য সামনে এলে রানি জোকাস্টা অপমান ও অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেন। প্রচণ্ড অপমানে কাঁদতে কাঁদতে ইদিপাস বললেন,

‘চারিদিকে যা দেখি সবকিছুই কুৎসিত। এই চোখ দিয়ে আর কিচ্ছু দেখতে চাই না’।

নষ্ট হোক চোখ। তিনি কাঁটা দিয়ে নিজেকে অন্ধ করে ফেললেন। অন্ধ হলেন ইদিপাস। শুরু হলো তার ভয়াবহ কষ্টের জীবন। একা, অন্ধ, পাশে কেউ নেই। নিজে কোনো অপরাধ করেননি, কিন্তু এমন ঘটনায় জড়িয়ে গেছে তার জীবন যেখানে তাকে সমবেদনা জানাতেও কাউকে পাবেন না। সে চিৎকার করে বলল:

অন্ধকার, সবখানে কালো নিকষ অন্ধকার,
জড়িয়ে আমায় তমসামাখা ভয়াল চাদরে
নিয়ে যাচ্ছে, অন্তহীন এক আঁধার-নগরে

অন্ধ হয়েও ইদিপাসের শান্তি নেই। অতীত জীবনের স্মৃতি তাকে কাঁদায়। সব সময় কাঁদায়। সফোক্লিস আবার লিখলেন—

আহারে জীবন,
অন্ধ হয়েও কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে রাখি
তবু নেই মুক্তি-
পেছনে ছুটছে সারা জীবনের দুর্বিষহ স্মৃতি।

ইদিপাসের রাজত্ব শেষ। রাজা হলো তার শ্যালক ক্রিয়ন। ইদিপাস রাজ্য ছেড়ে নির্বাসনে গেলেন।

বসন্ত-উৎসবে 'রাজা ইদিপাস' নাটক অভিনীত হলো। সফোক্লিস ফাটাফাটি অভিনয় করলেন। দর্শকরা খুবই পছন্দ করল। আর প্রত্যেক বছরের মতো তার নাটক আবারও প্রথম হলো।

পেরিক্লিস আর আসপাশিয়া থিয়েটারে বসে দেখলেন, তাদের বন্ধু সফোক্লিস কী নির্মমভাবে পেরিক্লিসকে রাজা ইদিপাস সাজিয়েছেন।

পেরিক্লিস বললেন, এখন এথেন্সের এমন অবস্থায় সফোক্লিস আমাকে এথেন্স ছেড়ে যেতে বলছে? আমি চলে গেলে কে বাঁচাবে এথেন্সকে?

বাড়ি ফিরে আসপাশিয়া অনেকক্ষণ কাঁদল। সে কি নাটকের জোকাস্টা? তার কি আত্মহত্যা করা উচিত?

ইউরিপিডিস নাটকটির গঠন আর সংলাপ খুব পছন্দ করল। এমনিতে তার সফোক্লিসের নাটক ভালো লাগে না। কিন্তু এই নাটকটি ভালো লাগল। ইউরিপিডিসের নাটক ছাড়া সক্রেটিস থিয়েটারে যায় না। এই নাটক দেখতেও সে যায়নি। তাতে কোনো সমস্যা নেই। ইউরিপিডিস তার কাছে পুরো নাটকের বিবরণ দিয়ে দিয়েছে।

নাটকের ঘটনা শুনে সক্রেটিস বলল, সফোক্লিসের চিন্তা-ভাবনা খুবই পুরনো। ইদিপাস খুনি, তাই তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। অথবা খুন করতে হবে। খুনের বদলে খুন। প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি যে সুন্দর জীবনের কথা বলি এটি সেই সুন্দর জীবন নয়। সুন্দর জীবনে প্রতিশোধ বলতে কিছুই নেই। আছে ক্ষমা, আছে মানবিকতা।

ইউরিপিডিস বলল, তবে সফোক্লিস কিন্তু এই নাটকে তোমার মতো সংলাপ দিয়েছেন। রাজা ইদিপাসের মুখে তিনি বলেছেন— 'তুমি যাকে খুঁজছো, সেটি তুমি নিজেই।' আরেক জায়গায় বললেন, 'তুমি নিজেই তোমার শত্রু'। কথাগুলো ঠিক তোমার কথার মতো। তুমি যে বলো— 'নিজেকে জানো' সেরকমই কথাগুলো।

সক্রেটিস ভাবছে, সফোক্লিসও তাহলে তার মতো ভাবতে শুরু করেছেন!

এথেন্সের সাধারণ মানুষ সব সময় সফোক্লিসের নাটক অনেক পছন্দ করে। তারা বিশ্বাস করল, এথেন্সের প্লেগের জন্য পেরিক্লিস নিজেই দায়ী। পরের নির্বাচনে পেরিক্লিস হেরে গেলেন। জীবনে প্রথমবার ভোটে হারলেন পেরিক্লিস। তার নামে মামলা হলো। তিনি নাকি এথেন্স সরকারের টাকা সরিয়েছেন। তিনি জরিমানা দিলেন। কিন্তু মানুষ অল্প দিনেই ভুল বুঝতে পারল। সেজন্য পরের বছর ভোটে তিনি আবার নির্বাচিত হলেন।

এত কিছু হচ্ছে। কিন্তু প্লেগ কমছে না। যুদ্ধও থামছে না। থামছে না মানুষের মৃত্যু।

***

৯৮. এই অধ্যায়ে 'রাজা ইদিপাস' এর যেসব সংলাপ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ (Robert Fagles, Penguin Books) থেকে বাংলা করা

হয়েছে।

৩৯

‘মানুষমাত্রই ভুল করে, কিন্তু যে ভুল বুঝতে
পারামাত্র সংশোধন করে, সেই হলো ভালো মানুষ।
মানুষের একমাত্র অপরাধ অহংকার।’
—সফোক্লিস

দিনে দিনে প্লেগ ভয়ংকর রূপ নিয়েছে।

মিনিটে মিনিটে মানুষ মরছে। প্রতি ঘরে ঘরে মরছে। যত দিন যাচ্ছে মৃত্যু বাড়ছে। যেন ভয়াবহ মৃত্যুর মিছিল। এথেন্স খালি হয়ে যাচ্ছে। গরিব ধনী কেউ বাদ যাচ্ছে না। তাজা ছেলে মায়ের সামনে ছটফট করছে। সুন্দর মুখের কচি মেয়ে রক্ত-বমি করছে। মা কিছু করতে পারছেন না, বাবা বুক চাপড়াচ্ছে। কোনো উপায় নেই। এই প্লেগ যাকে ধরছে, সেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আগেই মরে শেষ। সারা এথেন্সে আর মনে হয় একটি বাচ্চাও বেঁচে নেই। কোনো ঘর থেকে এখন আর কোনো শিশুর কান্না শোনা যায় না।

পেরিক্লিস দিন-রাত ঘুরছেন। সারা এথেন্স চষে বেড়াচ্ছেন। ঘরে ঘরে যাচ্ছেন। আগে তিনি কোনোদিন কারও বাড়ি যেতেন না। কত লোক তাকে সিম্পোজিয়ামে দাওয়াত দিত, তিনি কারও বাড়ি যাননি। এখন তিনি সবার ঘরে ছুটছেন। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে আক্রান্ত মানুষদের দেখছেন। তার দুই ছেলে তার সাথে সবখানে যায়। পেরিক্লিস মানুষের গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। হাত ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ভরসা দিচ্ছেন। আশার কথা বলছেন।

পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তিনি বলছেন, ভাই আর একটু ধৈর্য ধরো। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই ঠিক হলো না। বরং পেরিক্লিসের নিজের ঘরেই চলে এলো প্লেগ। তার প্রথম স্ত্রীর দুই ছেলেকে একসাথে প্লেগে ধরল।

তাগড়া যুবক ছেলে দুটি। বড়টি হুবহু পেরিক্লিসের মতো দেখতে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বাবা বাবা বলে চিৎকার করে বলছে, 'কষ্ট, অনেক কষ্ট। বুক জ্বলে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট, বাবা।'

পেরিক্লিসের বুক ফেটে যাচ্ছে। তিনি এদিক ওদিক ছুটছেন। যে যা বলছে সব করছেন। যত রকম তুকতাক আছে সব চলছে।

আসপাশিয়া রাত-দিন খাটছে। ছোটাছুটি করছে। ছোট ছেলে বলছে, 'মা, বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই।' আসপাশিয়া ছেলেদের জন্য সবকিছু করছে। দুই ছেলের জন্য বারো জন দাস-দাসী সব সময় তৈরি আছে। তারা পাগলের মতন খাটছে।

পেরিক্লিসও অনেক খাটছেন। তিনি নিজেই ছেলেদের মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন। সারা গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। বাবার ছোঁয়ায় যদি একটু কষ্ট কমে।

কিন্তু কষ্ট কমছে না। বরং দিনে দিনে বাড়ছে। এমন ভয়াবহ দিন পেরিক্লিসের বাড়িতে আগে আসেনি। সারা দিন চিৎকার করছে দুটি জোয়ান ছেলে। বলছে, আর পারছি না বাবা। মেরে ফেলো। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। আমার সারা গা জ্বলছে। গলা জ্বলছে। চোখ দুটি বের হয়ে আসছে। মাথা তুলতে পারছি না। আমাকে মেরে ফেলো।

এক সন্ধ্যায় পেরিক্লিস বুঝলেন যে ছেলেদের সময় শেষ। তিনি তাদের মাকে আনতে লোক পাঠালেন। তাদের মা এসে সারা রাত দুই ছেলেকে জড়িয়ে রইলেন। কিছুতেই যেতে দেবেন না। কিন্তু ভোরবেলা আর ধরে রাখতে পারলেন না। সকালেই মারা গেল দুই ছেলে। একজন ঊষালগ্নে, আর একজন কয়েক ঘণ্টা পরে। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল পেরিক্লিসের বংশধর। জিউসের মতো যার শক্তি, সেই পেরিক্লিস কিছুই করতে পারলেন না। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দাফন করে এলেন।

বাড়ি ফিরে ছটফট করছেন পেরিক্লিস। আসপাশিয়া বিলাপ করে কাঁদছে। ছেলে দুটি তাকে বড় গলায় মা বলে ডাকত। অল্প বয়সেই দুটি বড় বড় ছেলের মা হয়েছিল আসপাশিয়া, কিন্তু কপালে সইল না।

বিকেলে আসপাশিয়া ধীরে ধীরে পেরিক্লিসকে বলল, তোমার কোনো উত্তরাধিকারী রইল না।

পেরিক্লিস তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আসপাশিয়া আবার বলল, এই যে এত সম্পদ তোমার, কে খাবে? খাওয়ার লোক কই?

কথা সত্য। পেরিক্লিসের দুই ছেলে মারা গেছে। এক ছেলে আছে। সেই ছেলে আসপাশিয়ার। তার নামও পেরিক্লিস। লোকে বলে পেরিক্লিস নম্বর দুই। কিন্তু এই পেরিক্লিস নম্বর দুই এথেন্সের নাগরিক নয়। এথেন্সের নিয়মে বাবা-মা দুজনই এথেন্সের

নাগরিক হলেই শুধু সন্তান এথেন্সের নাগরিক হবে। সেই হিসেবে আসপাশিয়ার সন্তান এথেন্সের নাগরিক নয়। তাই পেরিক্লিসের সম্পদের উত্তরাধিকারীও সে হতে পারবে না।

আসপাশিয়া অনেকক্ষণ হাউমাউ করে কাঁদল। পেরিক্লিস কোনো রকমে তাকে শান্ত করলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেল। কারও মুখে কথা নেই।

আসপাশিয়া খুব নিচু স্বরে বলল, একটি উপায় আছে তোমার উত্তরাধিকারী হওয়ার।

পেরিক্লিস মুখ তুলে তাকালেন।

আসপাশিয়া আবার বলল, আমাদের ছেলে তোমার ওয়ারিশ হতে পারে। 'কীভাবে?'

'যদি সংসদে পাস করানো যায়।'

'সেটি কীভাবে?'

'তোমার জীবনে কী ঘটছে সবাই জানে। এখন তুমি যা চাইবে, মানুষ তাতেই ভোট দেবে। তুমি যদি সংসদে একবার গিয়ে অনুরোধ করো যে তোমার ওয়ারিশ নেই, এথেন্সে তোমার চিহ্ন মুছে যাচ্ছে। তারা যেন আমাদের ছেলেকে নাগরিকত্ব দেয়।'

পেরিক্লিস তাকালেন আসপাশিয়ার দিকে। সে কী বলছে? আসপাশিয়া কি সৎ ছেলেদের মৃত্যুতে খুশি হয়েছে? এই সুযোগে তার পেটের ছেলের জন্য জায়গা বানাতে চাইছে? নাকি সে রাজনীতির মাঠের পাক্কা খেলোয়াড়? বিপদেও রাজনীতি বুঝে চলতে চাইছে। নাকি সে সত্যিই পেরিক্লিসকে ভালোবেসে এমন বলছে?

পেরিক্লিস বুঝতে পারছেন না। তারা মাথা কাজ করছে না। তবে আসপাশিয়া যে বুদ্ধি দিয়েছে, তার চেয়ে অন্য কিছু তার মাথায় আসছে না।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, যদি পার, একটি বক্তৃতা তৈরি কর। আমি আমার ছেলের জন্য নাগরিকত্ব চাইব। যারা চলে গেছে, তাদের তো আর পাব না। যে বেঁচে আছে, সেটিকে যদি রেখে যেতে পারি।

সেই রাতে আসপাশিয়া ঘুমাল না। তার দুটি কাজ। দুটিই মহা গুরুত্বপূর্ণ। এক. পেরিক্লিসের জন্য বক্তৃতা লিখে দেওয়া। তার ছেলেকে নাগরিক বানানোর জন্য বক্তৃতা। সেটি সারা রাত বসে লিখবে আসপাশিয়া। তার আগে আরেকটি কাজ করতে হবে। তার পরিচিত সব মানুষকে খবর দিতে হবে যাতে তারা কাল অবশ্যই সংসদে গিয়ে পেরিক্লিসের পক্ষে ভোট দেয়। আসপাশিয়া একজন দাসকে ডেকে লিখতে বসল। যাদের কাছে আজ সন্ধ্যায়ই খবর দিতে হবে। সে বলছে আর দাস লিখছে— সক্রেটিস, ক্রিতো, চেরোফোন, সফোক্লিস, এনিতাস... অনেক লম্বা লিস্ট।

আসপাশিয়া ছোট্ট একটি চিঠি লিখে দিল। অনেকগুলো দাস সেটি কপি করবে। চিঠিগুলো সবার কাছে দিয়ে আসবে আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে।

আর একটি চিঠি লিখল সংসদের স্পিকারের জন্য। এটি স্বাক্ষর করবে পেরিক্লিস। সংসদের স্পিকারকে বলা হচ্ছে কাল সকালে আলোচনার তালিকায় নতুন একটি বিষয়

থাকবে। নতুন একটি বিল আসবে সংসদে। পেরিক্লিস নম্বর দুইয়ের নাগরিকত্ব বিষয়ে বিল।

পরদিন খুব সকালে পিনিক্স পাহাড়ে চলে গেলেন পেরিক্লিস। সকলের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, ভাইয়েরা, এথেন্স মরে যাচ্ছে। আমরা সবাই মরে যাচ্ছি। তোমরা জানো আমার ছেলেরা নেই। আমার কোনো উত্তরসূরি নেই। তোমরা আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দাও।

সংসদে লোক কম এসেছে। এই বিপদের দিনে যার কাজ নেই, সে আসেনি। যারা এসেছে, তাদের মধ্যে পেরিক্লিসের পক্ষের লোকই বেশি। আসপাশিয়ার চিঠি পেয়ে তাদের কাছের লোকেরা দলে দলে এসেছে। তারা ফিসফাস করছে।

পেরিক্লিস বললেন, আমার আরেক ছেলে আছে। ওর নামও পেরিক্লিস। তোমরা চাইলে সে আমার ওয়ারিশ হতে পারে। ওকে তোমরা এথেন্সের নাগরিক করে নাও। এথেন্সে পেরিক্লিসের একটি চিহ্ন থাকুক। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি। এই বিপদে পাশে দাঁড়াও।

বলতে বলতে তার চোখে আবার পানি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সংসদে কাঁদলেন তিনি। তার কান্নার দাম আছে এথেন্সে। দাম ফেরত পেলেন পেরিক্লিস।

তাকে সমর্থন করে অনেকেই বক্তৃতা দিল। এনিতাস বলল, ভাইয়েরা, পেরিক্লিস আর আসপাশিয়ার ছেলে মানে তো আসলে এথেন্সের রক্ত। তাকিয়ে দ্যাখো ঘরে ঘরে আমাদের যুবকরা মারা যাচ্ছে। এথেন্স যুবকশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আসো, ভাইয়েরা, আমরা এথেন্সের মুখের দিকে চেয়ে পেরিক্লিস নম্বর দুইকে এথেন্সের নাগরিক করে নিই।

আজ অনেক দিন পরে আবার সংসদে এসেছে সক্রেটিস। তার কাছে এটি হলো ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ গণতন্ত্র। এখানে সে আসে না। আজ শুধু আসপাশিয়ার কথায় তার ছেলের জন্য ভোট দিতে এসেছে। সব সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসেছে। সবাই মিলে দুই হাত তুলে ভোট দেবে। তারা চিৎকার করে বারবার বলেছে— হ্যাঁ ভোট, হ্যাঁ ভোট।

ভোটে বিরোধীরা পাত্তা পেল না। পেরিক্লিস নম্বর দুই এথেন্সের নাগরিকত্ব পেল। তাকে ডেকে পরিচয়পত্র দেওয়া হলো। পেপিরাস কাগজে সিল দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো নতুন পরিচয়পত্র:

নাম: পেরিক্লিস

মহল্লা: হোলারগোস

পিতা: পেরিক্লিস

মাতা: ...

(মাতার ঘর খালি, তার মা এথেন্সের নাগরিক নন)

নতুন পরিচয়পত্র নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে। সাথে ফুফাত ভাই এলসিবিয়াডিস। সেও কাল রাত থেকে অনেক চেষ্টা করে ছোটাছুটি করে লোক নিয়ে এসেছে ভোট দিতে।

ভোটে জিতে সে খুশি। কিন্তু মুখ বেজার অন্য কারণে।

তিতা মুখে এলসিবিয়াডিস বলল, এটি কিছু হলো? তোর বাপ হলো এথেন্সের মা-বাপ। তার কথায়ই মানুষ ওঠে-বসে। সে হলো দেবতা জিউস। রাজার থেকে বড় রাজা। তুই হলি রাজার ছেলে। রাজকুমার। রাজকুমারকে নাগরিকত্ব দিতে রাজাকে মানুষের সামনে কাঁদতে হয়? তোর বাপ একটি বোকা। সে সারা জীবন এসব গণতন্ত্র-টনতন্ত্র বলে বলে নষ্ট করল। এসব করে না পারল নিজে কিছু করতে, না দিল আমাদের কিছু করতে।

পেরিক্লিস নম্বর দুই কিছুই বুঝতে পারছে না। সে বলল, আমার বাবা কোন দোষ করেছে?

এলসিবিয়াডিস বলল, না, তোর বাপ কোনো দোষ করেনি, সব দোষ আমার। আমার দোষ আমি চাই তোর বাপ রাজা হয়ে যাক। এসব গণতন্ত্র বাদ দিক। তিনি না পারলে আমাদের বলুক। আমরা লোক জড়ো করব। আমিই সব করব।

পেরিক্লিস নম্বর দুইয়ের বয়স কম হলেও বুদ্ধিতে অন্তত এলসিবিয়াডিসের চেয়ে ভালো। সে বলল, এখন চুপ করো। মানুষে শুনলে বাবার বিপদ হবে। তার চেয়ে চলো বাড়ি যাই। মাকে পরিচয়পত্রটা দেখিয়ে আসি।

এলসিবিয়াডিস বলল, হুঁম, ঠিক বলেছিস, তুই যে বুদ্ধিমতী আসপাশিয়ার ছেলে সেটি বোঝা যায়। তোর মাথায় ঘিলু আছে। যা, তুই বাড়ি যা। দাসদের সাথে চলে যা। বাড়ি গিয়ে মাকে সালাম কর। এই পরিচয়পত্র আসলে পেয়েছে তোর মা। জিতেছে বুদ্ধিমতী আসপাশিয়া। তুই তো দুধ-ভাত।

'তুমি যাবে না?'

'না, আমি একটু সক্রেটিসের কাছে যাই। সে আজ দলবল নিয়ে এসেছে। আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। তার সাথে একটু সাক্ষাৎ করে আসি।'

প্লেগের ভয়ে দলে দলে মানুষ এথেন্স ছেড়ে যাচ্ছে।

আসলে ছেড়ে যাচ্ছে না, পালাচ্ছে। যে যেভাবে পারে পালাচ্ছে। এথেন্সের বাতাস দূষিত প্লেগে ভরা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মরছে। এটি এখন মৃত্যুপুরী। জীবন বাঁচাতে এথেন্স ছাড়ছে মানুষ।

এতদিন স্পার্টার সেনারা রাস্তা আটকে ছিল। কেউ পালাতে পারেনি। এখন প্লেগ বেড়ে গেছে। স্পার্টার সেনারা ভয়ে পালিয়েছে। এখন যে কেউ পালাতে পারে। তাই অনেকেই এথেন্স ছেড়ে পালাচ্ছে।

ক্রিতোও এথেন্স ছেড়ে যাবে। অনেক দিন ধরেই সে যাব যাব করছে। সাহস করে অনেক দিন রয়ে গেছে। বেশি সাহস করলে শেষে জানে-প্রাণে মরতে হবে। গ্রিসের উত্তরে থেসালি নগরে ক্রিতোর অনেক বন্ধু আছে। সে সময়ে-অসময়ে বিস্তর মানুষকে

সাহায্য করেছে। আশ্রয়ে দিয়েছে। এখন নিজের বিপদে পরিবারসহ থেসালিতেই যাবে। ক্রিতোর টাকা-পয়সার অভাব নেই। সে থেসালিতে বাড়ি বানাতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে।

চেরোফোনও যাচ্ছে ক্রিতোর সাথে। প্লেগ শুরুর প্রথমে তার খুব চোটপাট ছিল। বলত, সবাই গেলেও আমি কোনোদিন এথেন্স ছাড়ব না। দেশের মাটি বড় পবিত্র। কিন্তু আর ভরসা পাচ্ছে না। এখন চারধারে লাশ আর লাশ। যে কোনোদিন লাশ হয়ে যেতে হবে। জান বাঁচাতে পালাতে হবে।

পাদুকা শিল্পী সিমনও সাথে যাবে। তার পাদুকা ব্যবসা একেবারে বন্ধ। কারিগর সব মারা গেছে।

শুধু সক্রেটিস যাবে না। সে কোনোদিন এথেন্স ছেড়ে যায়নি। এই নগরী তার কাছে প্রেমিকার মতো। ভালো-মন্দ যাই হোক, সে যাবে না। মরতে হলে এই মাটিতেই মরবে।

ক্রিতো বলল, সক্রেটিস, অল্প কিছু দিনের জন্য হলেও চলো। এথেন্সের বাতাসে অসুখ ঢুকে গেছে। যখন তখন রোগে ধরে ফেলবে। বাতাস ঠিক হলেই আমরা ফিরে আসব। টাকা-পয়সা নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না। আমি সবার ভার নিলাম। দশখান গাধার গাড়ি বানিয়েছি। সাথে কয়েকজন দাসও নিলাম। একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা। এক চিলতেও ভুল ধরতে পারবে না। শুধু শরীরটা নিয়ে গাধার গাড়িতে বসে একটা ঘুম দাও। চোখ খুলে দেখবে আমরা উত্তর গ্রিসের থেসালি নগরে চলে গেছি।

কিন্তু না, সক্রেটিস যাবে না। ক্রিতো যতই বলুক, সে এথেন্স ছাড়বে না।

ক্রিতোর মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। গোয়ার্তুমির একটা সীমা আছে। এমন একগুঁয়ে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে ভুল করেছে।

চেরোফোন সক্রেটিসকে ভালো জানে। সে সক্রেটিসকে কিছুই বলল না। সে গেল জেনথিপির কাছে। স্ত্রী রাজি হলে অমত করবে এমন স্বামী পৃথিবীতে নেই। সতীর ইচ্ছাই পতির ইচ্ছা।

চেরোফোন জেনথিপিকে বলল, ভাবী, দেখছেন তো যে অবস্থা চলছে, তাতে এথেন্সে কেউ বাঁচবে না। আপনি সক্রেটিসকে বুঝান। আমরা চলে গেলে ও কার সাথে থাকবে? কিছু একটা হলে, সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।

জেনথিপি সব সময় সক্রেটিসের বিরোধী দল। সক্রেটিস ডানে গেলে তিনি যান বামে। কিন্তু কেন যেন সে আজ সক্রেটিসের পক্ষে চলে গেল। আজ সক্রেটিসের কথায় সায় দিয়ে দিল।

জেনথিপি চেরোফোনকে বলল, ভাই, আপনারাই তো বলেন সক্রেটিস নাকি ভুল কিছু করে না। সে নাকি সবার চেয়ে ভালো বোঝে। তাহলে সে যা বলেছে, বুঝেই বলেছে। আমরা এথেন্সেই থাকব।

চেরোফোন বিশ্বাস করতে পারছে না। এই মহিলা কথায় কথায় সক্রেটিসের গুষ্ঠি উদ্ধার করেন, এখন তার স্বামীপ্রেম জেগে উঠেছে। হঠাৎ ভালোবাসা একেবারে উথলে

উথলে পড়ছে। চেরোফোন নীরব। তার কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

সক্রেটিস গেল না। ক্রিতো, চেরোফোন আর সিমোনের পরিবার এথেন্স ছেড়ে গেল। যাওয়ার সময় সবাই কাঁদছে। শুধু সক্রেটিস তাদের হাসিমুখে বিদায় দিল।

গাধার গাড়ি ছাড়ার সময় ক্রিতো বলল, আমার বাড়িতে কিছু দাস আছে। এখনও সবাই মরেনি। একটি গাধার গাড়ি রেখে গেলাম। যখনই মত পাল্টাবে, গাড়ি নিয়ে চলে এসো। আমরা অপেক্ষায় থাকব।

সক্রেটিস বললেন, উল্টা হবে। প্লেগ কমে যাবে, আর আমি নিজে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব। তোমার গাধার গাড়িটা তখন কাজে লাগবে।

সবাই চলে গেলে সক্রেটিস একেবারে একা হয়ে গেল। কাছের কেউ নেই। একেবারে বন্ধুহীন। তারচেয়েও বড় বিপদ হলো ঘর থেকে বের হতে পারছে না। রাস্তার দুধারে পড়ে আছে মানুষ আর মানুষ। কেউ মরা, কেউ আধমরা। এর মধ্য দিয়ে হাঁটলে ভয় লাগে। মনে হয় দুদিন পরে আমিও এরকম রাস্তার ধারে পরে থাকব। সরকারি মেথর এসে লাথি দিয়ে দেখবে মারা গেছি কিনা। না মরলে তার মন বেজার হবে। মরলে পায়ে রশি বেঁধে যাবে মাটি দিতে।

সক্রেটিস ঘর থেকে বের হতে পারছে না। মনে হচ্ছে জেলখানায় আছে। এমন ঘরের মধ্যে আটকা থাকলে প্লেগে নয়, দম বন্ধ হয়েই মরতে হবে।

শুধু খুশি হয়েছে জেনথিপি। স্বামী টো টো করে সারা এথেন্স বেড়াতে পারছে না। ঘরে আটকা পড়েছে। এতদিনে দিনে একটু কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। সক্রেটিসও কাউকে না পেয়ে বউয়ের কাছেই জ্ঞানের কথা বলছে—

'বউ শোনো, আমি কিসের জন্য বেঁচে আছি জান?'

'কিসের জন্য?'

'জীবন কীভাবে উন্নত করা যায় সেটি বের করার জন্য। কীভাবে ভালোভাবে বাঁচা যায় সেটি জানার জন্য।'

'জানতে পেরেছেন?'

'হুঁম, অনেকখানি পেরেছি।'

'তাহলে তো আপনে ভালো জীবনের উপায় জানেন। আপনার জীবন নিশ্চয়ই অনেক ভালো। সকালে বাড়ি থেকে খালি পায়ে বের হয়ে যান, সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন। গভীর রাতে ফিরেন। খুব ভালো জীবন। অতি উত্তম জীবন, তাই না?'

সক্রেটিস কোনো উত্তর দিল না। কথা এক ফোঁটাও মিথ্যা নয়। তার ট্র্যাজেডি হলো, তার সাধনা সে নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারছে না। সেই চেষ্টাই করছে না।

সক্রেটিস উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

জেনথিপির মন খারাপ হলো। সে ভেবেছিল সক্রেটিস যতদিন একা আছে, যতদিন প্লেগ না কমে, ততদিন বকাঝকা করবে না। কিন্তু অভ্যাস খুব খারাপ জিনিস। অনেক

দিনের অভ্যাস হঠাৎ করে বদলানো যায় না।

জেনথিপি বলল, আচ্ছা, সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কী করেন?

'মানুষ দেখি। মানুষের সাথে কথা বলি।'

'তো আমার সাথে কথা বলেন না কেন? আমি বুঝি মানুষ নই?'

'শোনো, আমি শুধু মানুষের সাথে কথা বলি সেটি নয়। আমি মানুষকে দিয়ে কথা বলাইও। আমি তোমার সাথে কম কথা বলি এটি সত্য। কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমি অনেক কথা বলাই। আমাকে দেখলেই তুমি চেঁচামেচি শুরু করো। কথার তুবরি ছোটাও। বলো, সত্য কিনা?'

'সত্য। ষোল আনা সত্য। তো, আপনি আমার সাথে এটি ইচ্ছে করে করেন?'

'ঠিক তা নয়। বলতে পার এটিও আমার মানুষ দেখার অংশ। আমি তোমাকে দেখি। স্বামীর প্রতি অতি বিরক্ত একটি ভালো মেয়ে কেমন ব্যবহার করে, সেটি বুঝতে চাই।'

'বুঝতে পেরেছেন?'

'না, এখনও পুরোপুরি বুঝিনি।

'কোনোদিন কি বুঝতে পারবেন?'

'মনে হয় না।'

'তাহলে এত গবেষণা করে লাভ কী?'

'মানুষকে শিখাই। কীভাবে ভালোভাবে বাঁচা যায়, সেটি মানুষকে শিখাই। তুমিই বলো কিছু মানুষ কি শিখছে না?'

জেনথিপি ভেবে দেখল কথা সত্য। কিছু মানুষ শিখছে। ক্রিতো, চেরোফোন, সিমনদের মতো লোকেরা তো সক্রেটিসের জন্য একেবারে ফিদা। এরা অনেক কিছু শিখছে। কিন্তু এটি স্বীকার করা যাবে না। তাহলে কথার পিঠে কথা জমবে না। উল্টা কিছু বলতে হবে।

জেনথিপি বললেন, কিছু লোক শিখছে, তবে বেশিরভাগ মানুষই কিছু শিখছে না। তারা আপনার শত্রু। আপনাকে মানে না।

'তারাও শিখছে। শত্রুতা করতে হলেও বিষয়টি বুঝতে হয়। আমার কথাকে মূল্য দেয় বলেই তারা আমাকে শত্রু ভাবে।'

'কিন্তু ভয় লাগে, আপনার মিত্র অল্প, শত্রু অনেক বেশি।'

'শোনো, শত্রু-মিত্র বুঝি না। আমি শুধু বুঝি আমার গবেষণার বিষয় মানুষ। আর আমার গবেষণাগার হলো এথেন্স। আমি এথেন্সের মানুষ নিয়ে ভাবি। তাদের ভালো জীবনের উপায় বলি। আমি স্বপ্ন দেখি একদিন প্রতিটি মানুষ সুন্দর জীবন যাপন করবে। সত্য ও ন্যায়ের কথা সবাই বুঝতে পারবে। সবাই পাবে একটি অন্যরকম সুন্দর জীবন।'

জেনথিপি মুগ্ধ হয়ে শুনছে। সে সক্রেটিসকে এভাবে বলতে কোনোদিন শোনেনি। তার স্বামী যে কত বড় মানুষ, সেটি দেখার সুযোগই তার হয়নি।

জেনথিপি বলল, আপনার কথাগুলো এত মধুর লাগছে। এই কথা আমার সারাদিন শুনতে ইচ্ছা করত, শুধু আমি যদি আপনার স্ত্রী না হতাম।

এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই। সক্রেটিস বুঝল দার্শনিকের বউ হওয়ার চেয়ে দুর্ভাগ্য একটি মেয়ের জন্য আর কিছু হতে পারে না। সক্রেটিস করুণা নিয়ে জেনথিপির দিকে তাকিয়ে রইল। দার্শনিকরা বউয়ের জন্য করুণা নিয়ে তাকিয়ে থাকতেই পারে, আর কিছুই পারে না।

চারিদিকে প্লেগ আর ঘরে ঘরে মৃত্যু যন্ত্রণার মাঝে সক্রেটিস আর জেনথিপির একটু ভালো সময় কাটল।

৪০

‘তুমি যা চাও, তা না পেলে কষ্ট পাও;
যেটি চাও না, সেটি পেলেও কষ্ট পাও;
যেটি চাও সেটি পেলেও কষ্ট, কারণ চিরকাল রাখতে পারবে না;
তাই যত সমস্যা সব তোমার ভেতরেই।’
—সক্রেটিস

পেরিক্লিস রাত-দিন মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন।

এক সন্ধ্যায় পিরাউস বন্দরের পাশের কয়েকটা বাড়িতে প্লেগের রোগী দেখে বাড়ি ফিরলেন পেরিক্লিস। মনে হচ্ছে তার গা গরম গরম লাগছে। মাথাটা ধরেছে। আসপাশিয়াকে কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, রাতে খেতে ইচ্ছে করছে না। আসপাশিয়া জোর করল না।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল আসপাশিয়ার। কে যেন কোঁকাচ্ছে। অস্ফুট একটি গোঙানি। অন্ধকারে পেরিক্লিসকে ছুঁতেই ভিরমি খেল আসপাশিয়া। পেরিক্লিসের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত দেওয়া যাচ্ছে না। সে প্রায় অচেতন। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। আসপাশিয়া তাকে ধাক্কা দিল। পেরিক্লিস চোখ খুলতে পারছেন না। চোখ জ্বলছে, তীব্রভাবে জ্বলছে।

আসপাশিয়া চিৎকার করে উঠল।

প্লেগ ধরেছে পেরিক্লিসকে।

আসপাশিয়া পেরিক্লিসকে মরতে দেবে না। তাকে বাঁচাতেই হবে। সে সবাইকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাছের মানুষজন দাস-দাসী সব উঠে-

চ-পড়ে লাগল। যে যা বলে, আসপাশিয়া সেটিই করতে শুরু করল। ঝাড়ফুঁক চলছে, দেবীর কাছে পশু বলি দেওয়া হচ্ছে সকাল বিকাল, চলছে নানান মানত। কেউ বলে এথেন্সের বাতাস খারাপ হয়ে গেছে। বাতাস দূরে রাখতে আসপাশিয়া সব সময় দরজা-জানালা বন্ধ রাখে।

আসপাশিয়া সারা জীবন নিজেকে বিজ্ঞানের মানুষ মনে করেছে। আজেবাজে কুসংস্কার সে মানে না। কিন্তু এবার আর পারছে না। পেরিক্লিস চলে গেলে, তার জীবনের আলো নিভে যাবে। এথেন্সের সবাই তার শত্রু। শুধু পেরিক্লিসই তাকে আগলে রেখেছেন। পেরিক্লিস না থাকলে সে এথেন্সে থাকতেই পারবে না। তাই প্রাণান্ত চেষ্টা করছে পেরিক্লিসকে ভালো করতে। এথেন্সের দূর-দূরান্ত থেকে ওঝা আনা হচ্ছে। নানান তুকতাক চলছে।

কিন্তু ভালো হচ্ছেন না পেরিক্লিস। মারাও যাচ্ছেন না।

পেরিক্লিসের কাছে মনে হচ্ছে, তিনি প্রতিদিন একটু একটু করে মারা যাচ্ছেন। একটু একটু করে শক্তি শেষ হয়ে আসছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে শীতকালে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। পেরিক্লিসের খুব ইচ্ছা করে বৃষ্টির আঁচে দাঁড়িয়ে এথেন্সকে দেখতে। কিন্তু সেটি হবে না। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। আসপাশিয়া কিছুতেই দরজা খুলবে না।

দলে দলে মানুষ আসে পেরিক্লিসকে দেখতে। সক্রেটিসও এসেছে। তার সাথে কথা বলে আসপাশিয়া সিদ্ধান্ত নিল, কস দ্বীপের বড় চিকিৎসক, যিনি চিকিৎসা শাস্ত্র নতুন করে লিখেছেন, সেই ডাক্তার হিপোক্রাটিসকে আনতে বিশেষ দূত পাঠাবে। আসপাশিয়ার দূত জাহাজ নিয়ে গেল কস দ্বীপে। অনেকগুলো তাগড়া জোয়ান নাবিক। তারা ঝড়ের বেগে জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে অনেক উপহার। আসপাশিয়ার আদেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে ফিরতে হবে।

কস দ্বীপে জাহাজ পৌঁছতে অন্তত দশ দিন লাগবে। যেতে আসতে বিশ দিন। ততদিন পেরিক্লিস বাঁচবে কিনা, কেউ জানে না।

ডাক্তার হিপোক্রাটিস আগেই খবর পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, এথেন্সে এরকম কিছু একটা হবে, একটি বড় মহামারী আসবে এথেন্সে। তিনি এথেন্সে দেখেছিলেন জায়গায় জায়গায় খুব নোংরা, আবর্জনা। জীবাণু কিলবিল করছে। সাধারণ মানুষ না ধুয়েই জিনিসপত্র খাচ্ছে। কারও কোনো সচেতনতা নেই। পেরিক্লিস ব্যস্ত ছিলেন নগর সুন্দর করতে। কিন্তু দেয়ালের বাইরেই সাধারণ মানুষ যে নোংরা বস্তিতে থাকছে, সেটি নিয়ে কেউ ভাবেনি।

এথেন্সের উপহার দেখে ডাক্তার বললেন, কেউ স্পর্শও করবে না। আলাদা করে ঐ দূরে রাখো। এগুলো এক্ষুনি আগুনে জ্বলিয়ে দাও।

এথেন্সের দূত তো ভীষণ অবাক। এ কী কথা! ডাক্তার সাহেব তাদের অপমান করছেন? এথেন্সের উপহার নেবেন না! তাই বলে আগুনে পুড়িয়ে দেবেন? দামি দামি জিনিসগুলো আগুনে ঝলসে যাচ্ছে, তাদের চোখের সামনে।

ডাক্তার বললেন, অতিথিরা কষ্ট পেলেন?

দূতেরা কোনো কথা বলতে পারছে না। ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছে।

ডাক্তার স্মিত হাসি দিয়ে বললেন, যা করলাম, সবার ভালোর জন্য করলাম। এথেন্সের আকাশে-বাতাসে এখন জীবাণু। জীবাণুগুলো তো উপহার বোঝে না, তারা উপহারের মধ্যেও ঢুকে পড়ে।

এরপর দাসদের ডেকে বললেন, শোনো, অতিথিদের জামাকাপড় পুড়িয়ে দাও। তাদের গোসলখানায় নিয়ে যাও। নগ্ন হয়ে আগুন-গরম পানিতে গোসল দাও।

এরপর ডাক্তার অতিথিদের বললেন, আপনাদের জাহাজটা চলে যেতে হবে, এক্ষুনি।

দূতরা বাকরুদ্ধ। এই উন্মাদ ডাক্তার আর কী করবে? একজন ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি যাবেন না এথেন্সে? তাহলে আর ন্যাংটা গোসল করে লাভ কী?

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, আমি চিকিৎসক। মানুষের জীবন বাঁচানোর ডাক এলে, আমি বসে থাকতে পারি না। আমাকে যেতেই হবে। আমি অবশ্যই যাব। তবে আপনাদের জাহাজে নয়, আমি আমার নিজের জাহাজে যাব।

দূত হাত জোড় করে বলল, আপনার অনেক দয়া, ডাক্তার বাবু। এখন আর একটু মেহেরবানি করেন। আজই যাত্রা করেন। পেরিক্লিস সাহেবকে বাঁচাতে হবে।

ডাক্তার বললেন, যথাশীঘ্রই যাব। কিন্তু আজ নয়। খালি হাতে গিয়ে কোনো কাজ হবে না। কিছু ওষুধপথ্য নিতে হবে। সেটির জোগাড়-যন্ত্র আছে। দিন দুয়েক সময় লাগবে। পরশু ঊষালগ্নে যাত্রা।

আপনাদের জাহাজ এক্ষুনি আমার কস দ্বীপ থেকে চলে যেতে বলুন। বলে দিন, আমার বিধান হচ্ছে এথেন্সে চারদিকে যত ময়লা-আবর্জনা আছে, সব পুড়িয়ে ফেলতে। কোনোখানে যেন কোনো পচা, গন্ধময় কিছু না থাকে। যে ঘরে প্লেগ হয়েছে, তাদের জামা-কাপড়ও যেন পুড়িয়ে ফেলে। সবকিছু অগ্নি দেবতাকে দিয়ে দাও, প্লেগ আপনা-আপনি চলে যাবে। আপনারা গোসলে যান। আপনাদের গা ভর্তি প্লেগের জীবাণু। যত দেরি করবেন, আমার দ্বীপ তত দূষিত হবে।

ডাক্তার সাহেব দেরি করেননি। তিনি সময় মতোই তার জাহাজ ভাসিয়ে দিয়েছেন এজিয়ান সাগরে। একটি খবর এসেছে। এথেন্সের শত্রু স্পার্টা জেনে গেছে যে, পেরিক্লিসের চিকিৎসা করতে ডাক্তার সাহেব এথেন্সে যাচ্ছেন। ডাক্তার যাতে পৌঁছতে না পারেন, সেজন্য স্পার্টার সেনারা নাকি যেকোনো সময় ডাক্তারের জাহাজ আক্রমণ করতে পারে।

ডাক্তার বিশ্বাস করেন না। সারা গ্রিসে এমন খারাপ লোক নেই যে তার ক্ষতি করতে পারে। তাও সাবধান হওয়া দরকার।

হিপোক্রাটিসের জাহাজখানা হলো একটি ভাসমান হাসপাতাল। এই জাহাজে কী নেই! নানান ওষুধি গাছপালা, লতা-পাতা, কাটা-ছেঁড়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে সে এক মহা কারবার। দূর থেকে এক নজরেই বলে দেওয়া যায়, ঐটা হিপোক্রটিসের জাহাজ। জাহাজে আলো ঝলমলে করছে, বেশ জাঁকজমক আছে। জাহাজে পতাকাও আছে। পতাকায় স্বাস্থ্যের দেবতা এসক্লিপিয়াসের প্রতীক সাপের চিত্র আঁকা। তিনি এখন সারা দুনিয়ার এক নম্বর ডাক্তার। এক নগর থেকে অন্য নগরে গেলে তাকে বরণ করতে অনেক লোক হাজির হয়।

নাবিকেরা ভয় পাচ্ছে। স্পার্টার সেনারা হানা দিতে পারে। পতাকা নামিয়ে ফেলা দরকার। শুধু শুধু বিপদ ঘাড়ে আনার দরকার কী! ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে, তোমরা

যদি ভাবো একটি পতাকা নামালে তোমরা বাঁচতে পারবে, তো পতাকার আর কাজ কী, নামিয়ে ফেলো।

পতাকা নামলো কিন্তু বিপদ দূর হলো না। স্পার্টার সেনা আসেনি, জাহাজ আটকে গেল অন্য কারণে। সাগরে হঠাৎ শুরু হলো উল্টা বাতাস। জাহাজ উল্টো দিকে যেতে চাচ্ছে, নাবিকরা অনেক চেষ্টায় আটকে রাখছে। তাই জাহাজ নড়ছে না। দিনের পর দিন যাচ্ছে। জাহাজ এগোচ্ছে না। এর মানে কী? দেবতা মহারুষ্ট হয়েছেন। এথেন্সে প্লেগ তো দিয়েছেনই, এখন ডাক্তার সাহেব যাতে সেখানে পৌঁছতে না পারেন, সেজন্য জাহাজ আটকে রেখেছেন মাঝ সাগরে। সাগরের দেবতা ক্ষেপেছে, প্লেগের দেবতা ক্ষেপেছে। এই প্লেগ এথেন্সকে নিশ্চিহ্ন না করে যাবে না। জাহাজে বসেই নাবিকরা দেবতা এপোলো আর তার ছেলে স্বাস্থ্যের দেবতা এসক্লিপিয়াসের উদ্দেশ্যে বলি দিল। তাও কিছু হলো না। এথেন্সকে দেবতারা ভালোই শাস্তি দিচ্ছেন। পেরিক্লিসের শেষ না দেখে তারা ছাড়বেন না। এজিয়ান সাগরের মাঝে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে আছে হিপোক্রাটিসের জাহাজ।

দিন যাচ্ছে আর একটু একটু করে শক্তি কমছে পেরিক্লিসের। তিনি এখন উঠেও দাঁড়াতে পারেন না। শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে চোখ বুজে এথেন্সের কথা ভাবেন। কয়েক মাস হয়ে যাচ্ছে তিনি শয্যাশায়ী। কিন্তু এখন যেন বেশি ক্লান্ত লাগে। মাথা কাজ করছে না। বারবার পায়খানা করতে করতে তার শরীরের আর কিচ্ছু বাকি নেই। তিনি এথেন্সের সবচেয়ে লম্বা মানুষ। এখন মনে হয় তিনি প্রতিদিন ছোট হয়ে যাচ্ছেন। মুখ চুপসে গেছে, চোখের দীপ্তি হারিয়ে গেছে।

আসপাশিয়া মিনিটে মিনিটে ডাক্তারের খবর নিচ্ছে। না, হিপোক্রাটিস এসে পৌঁছেননি। তার জাহাজ আসেনি। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে পেরিক্লিসের। ডাক্তার আসছে না। ঝাড়ফুঁকে কাজ হচ্ছে না।

সারাদিন ঘুমের মতো পড়ে থাকেন পেরিক্লিস। ঘুম আসে না। চোখ জ্বলে। এর মধ্যেই এথেন্সের খবর নেন। একজন এসে প্রতিদিন সকাল আর সন্ধ্যায় তাকে সব খবর শুনিয়ে যায়। কোনো ভালো খবর নেই। হাজার হাজার মানুষ মরছে, গোরস্তানে তিল ধারণের জায়গা নেই, লাশ নিয়ে ভয়ংকর বিপদ, সৎকারের মানুষ নেই। যেসব দাস সৎকার করত, ভয়ে তাদের অনেকেই পালিয়ে গেছে। কয়েকজন দাস পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাদের বিচার হচ্ছে। সারা শহরে একটি লাশ লাশ গন্ধ, মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারছে না। এগুলোই হলো খবর। প্রতিদিন একই খবর। একই বিষয়।

সক্রেটিস মাঝে মাঝে আসে পেরিক্লিসকে দেখতে। আসপাশিয়ার সাথে প্লেগ নিয়ে কথা বলে। এথেন্সের অল্প কিছু যুবকের একজন সক্রেটিস, যে এখনও প্লেগে আক্রান্ত হয়নি। সফোক্লিস আসেননি একবারও। তিনি উল্টা পেরিক্লিসকে ইদিপাসের সাথে তুলনা করে বিশ্রী আক্রমণ করে নাটক লিখেছেন। নাটকের নাম ‘রাজা ইদিপাস’।

আসপাশিয়া ভাবছে, সফোক্লিসকে কতবার নিজের হাতে পুরস্কার দিয়েছেন পেরিক্লিস। আর সেই সফোক্লিস বিপদের দিনে পেরিক্লিসকে এমন আক্রমন করে নাটক লিখেলেন! কবিরা তো মহৎ হওয়ার কথা। তাহলে কবি এমন করছেন কেন? বিপদে বন্ধু না হয়ে, শত্রু হলে তিনি কেমন কবি?

পেরিক্লিসের অসুস্থতা ছয় মাস হয়ে গেল। প্লেগ ধরার পর এতদিন কেউ বেঁচে রয়েছে, এমন শোনা যায়নি। তিনি যে কীভাবে টিকে আছেন, সেটি এক রহস্য। এই যাত্রায় বেঁচেও যেতে পারেন পেরিক্লিস। সবাই আশায় বুক বাঁধছে। পেরিক্লিস নিজেও ভাবছেন, সত্যিই কি প্লেগকে হারিয়ে দিলাম! জীবনে অনেক কিছুতেই তিনি জিতেছেন, প্লেগের সাথে জেতাও অস্বাভাবিক নয়।

আজ সকাল থেকে তার বেশ চাঙ্গা লাগছে। মনে হচ্ছে হাতে-পায়ে শক্তি ফিরে এসেছে, মাথা ধরাও নেই, বুকের ধড়ফড়ানি কমে গেছে। হঠাৎই যেন মনটা ফুরফুরে লাগছে। তিনি একটু পর পর আসপাশিয়াকে ডাকছেন, কারণে- অকারণে ডাকছেন। হাত ধরে বলছেন, তুমি তাহলে খেলা দেখিয়ে দিলে? আমাকে ভালো করেই তুললে! আমার এই নতুন জীবন তোমার ভালোবাসার দান। আসপাশিয়া লজ্জা পাচ্ছে। পেরিক্লিস সবার সামনে কেমন করে বলছে। অনেক দিন পর তার গালে লজ্জা রং ফুটে উঠল।

অনেক দিন পর আজ পেরিক্লিস বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। দরজা বন্ধ, ফাঁকা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করেছেন। এথেন্সকে দেখতে ইচ্ছে করছে, এতদিন সামনের জিনিসও দেখতে পাচ্ছিলেন না। এখন মনে হচ্ছে চোখের দৃষ্টি ফিরে এসেছে। তিনি ভালো হয়ে যাচ্ছেন। শুধু মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রার মতো আসছে। ঘুম ঘুম ভাব হলেই বারবার শিল্পী বন্ধু ফিডিয়াসের কথা মনে পড়ছে। ফিডিয়াসকে যেন দেখতে পাচ্ছেন। মনে হয়, শিল্পী যেন কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না। কী বলতে চায় শিল্পী? সে তো মারা গেছে অনেক দিন হলো, এক সময় তার জন্য পেরিক্লিস প্রতিদিন কাঁদতেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন তার কথা মনেই আসেনি। আজ হঠাৎ শিল্পীর মুখটা বারবার ভেসে উঠছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দুই পাহাড়ের ফাঁকা দিয়ে ডুবছে সূর্য। আজকের সূর্য বুঝি একটু বেশিই লাল, একেবারে রক্তমাখা লাল। পেরিক্লিস দরজার ফাঁকা দিয়ে সূর্যাস্ত দেখছেন। রক্তমাখা সূর্যটা ডুবি ডুবি করেও ডুবছে না। যেন থেমে আছে। যেন কিছু বলতে চাইছে। বলা হচ্ছে না দেখে ডুবতে পারছে না। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে কখন যেন পেরিক্লিসের ঘুম ঘুম এসে গেছে।

ঘুমের ঘোরে তিনি বিড়বিড় করছেন। কার সাথে যেন কথা বলছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, তার বন্ধুরা তাকে ডাকছে। শিল্পী ফিডিয়াস, গায়ক ডেমন, নাট্যকার এস্কিলাস, গুরু সবাই তাকে ডাকছে। তারা একসাথে হাত তুলে ডাকছে। পেরিক্লিস সাড়া দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না। কে যেন গলাটা চেপে ধরেছে। হাঁসফাঁস

লাগছে। নিশ্বাস নিতে পারছেন না। তিনি চোখ খুলতে চাইছেন, কিন্তু খুলতে পারছেন না। অনেক চেষ্টায় পিটপিট করে চোখ খুললেন। কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কেন? চারদিকে আঁধার, ভয়াবহ আঁধার। জগতের সকল আলো নিভে গেছে। এত আঁধার কেন? ভীষণ ভয় লাগছে। আবার চিৎকার করতে চাচ্ছেন, কিন্তু স্বর বের হচ্ছে না। প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আসপাশিয়াকে ডাকতে। কিন্তু ডাকতে পারছেন না। কিচ্ছু করতে পারছেন না, শুধু অনেকের ডাক শুনতে পাচ্ছেন। সবাই তাকে ডাকছে, অজানা এক সুদূরের দিকে ডাকছে।

কেন ডাকছে? এটিই কি মৃত্যু ডাক?

হঠাৎ তীব্র ব্যথা শুরু হলো বুকে। তার বুক ফেটে যাচ্ছে। জোরে জোরে শব্দ করে বড় বড় নিশ্বাস নিতে শুরু করলেন। নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে ছুটে এলো আসপাশিয়া। অবস্থা দেখে হাউমাউ করে পেরিক্লিসকে জড়িয়ে ধরল। ধরতেই পেরিক্লিসের গলায় স্বর ফিরে এলো।

অনেক কষ্টে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন, ওই যে পার্থেনন, ওই যে এথিনার মূর্তি, দেবী এথিনা হাসছেন। এখনও দেবী ঝলমল করছে, এখনও এথেন্স ঝলমল করছে। আমি এমন এথেন্স দেখতে দেখতেই মরতে চেয়েছিলাম।

হঠাৎ চোখ বন্ধ হয়ে গেল। চোখ কি খুলবে না? একটু পর অস্ফুট স্বরে আবার বললেন, ফিডিয়াস! ঐ যে শিল্পী ফিডিয়াস। ফিডিয়াস ডাকছে, আমাকে ডাকছে। পাতালপুরী থেকে ডাকছে।

আসপাশিয়া বুঝল, আর বেশি সময় নেই। সে পেরিক্লিসের মাথাটা কোলে নিয়ে বসল। চারপাশে অনেক মানুষ। সবাই কাঁদছে। এথেন্সের এক নম্বর নাগরিক চলে যাচ্ছেন। তার স্বপ্নের এথেন্স ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছেন। পৃথিবীর নিকষ কালো অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছেন স্বপ্ন পুরুষ পেরিক্লিস।

আসপাশিয়ার চোখ থেকে দুফোঁটা পানি পড়ল পেরিক্লিসের কপালে। পেরিক্লিস আসপাশিয়ার হাতটা চেপে ধরলেন। তার চোখ পার্থেননের দিকে। চোখের জ্যোতি স্পষ্ট। হঠাৎ বলে উঠলেন, আসপাশিয়া, হোমারের সেই লাইনগুলো একবার বলবে! মরণ নিয়ে লেখা কথাগুলো—

আসপাশিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল,

‘সবখানে মরছে মানুষ, লাশগুলো করে আছে চুপ
মরণ, বল না রে, কতো রকম তোর রূপ
সামনে-পিছনে ডানে বাঁয়ে, যে দিক পানে চাই
আসছে মরণ, চোরা গলি দিয়ে, বাঁচার উপায় নাই।’

পেরিক্লিসও তার সাথে বলছেন, 'সবখানে মরছে মানুষ, লাশগুলো করে আছে চুপ... আসছে মরণ, চোরাগলি দিয়ে, বাঁচার উপায় নাই'।

পেরিক্লিস চোখ বুজলো।

দূরের আলো-ছায়ায় একটি পাখি কাঁদছে। ঝরঝর বৃষ্টি নেমেছে। মহাকালের করুণতম সুরে সন্ধ্যার বাতাস বলছে, আসছে মরণ, চোরাগলি দিয়ে, বাঁচার উপায় নাই...।

এথেন্সের এক নম্বর নাগরিককে কেড়ে নিল ভয়ংকর প্লেগ। নিভে গেল এথেন্সের স্বপ্ন। গণতন্ত্র হারাল তার প্রধান মানুষ।

ঠিক তখুনি দূত এসে খবর দিল চিকিৎসক হিপোক্রাটিস এসে গেছেন ডাক্তার শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলেন, তার চোখের সামনে দিয়ে পেরিক্লিসের লাশ সৎকারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

৪১

'শিক্ষা দেওয়া মানে আলোক শিখা জ্বালানো,
জাহাজে তেল দেওয়া নয়।'
—সক্রেটিস

ডাক্তার হিপোক্রাটিস তীব্র মনঃকষ্টে আছেন।

সবাই ভেবেছিল তিনি পেরিক্লিসকে সুস্থ করে তুলবেন। কিন্তু তিনি আসার আগেই পেরিক্লিস মারা গেছেন। তিনি পেরিক্লিসকে বাঁচাতে পারেননি। কথাটা যতবার মনে পড়ে, মনে হয় আমি ব্যর্থ, আমি পারলাম না, মানুষ কত আশা নিয়ে আমার জন্য বসে আছে, তবু পারলাম না।

সেই মনকষ্ট থেকে ডাক্তার নিজের কাছে শপথ নিলেন, আমি এথেন্স ছেড়ে যাব না। আমি এথেন্স থেকে প্লেগ তাড়াব। পেরিক্লিস তো মারা গেছেন আমি আসার আগে। আমার কিছুই করার ছিল না। এখন আমার যা করার আছে আমি করব। এই মহামারী না তাড়িয়ে আমি এথেন্স ছাড়ব না। শুরু করলেন কাজ। দিন-রাত ছুটছেন। ঘরে-ঘরে, দুয়ারে দুয়ারে, কবরে-শ্মশানে, দরবারে-থিয়েটারে, আগোরায় সবখানে যাচ্ছেন। মানুষের শোয়ার ঘর থেকে রান্নাঘর প্রতিটি জায়গায় ছুটছেন।

তার ছাত্ররাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি শিষ্যদের বললেন, তোমরা সারা জীবনে যত রোগী দেখবে, এই মুহূর্তে এথেন্সে তার চেয়েও বেশি রোগী। শহরের সবাই তোমার রোগী। এটিই সুযোগ, যাও, মানুষ বাঁচাও। সারা এথেন্স এখন তোমাদের জন্য একটি হাসপাতাল।

তার নিদান একটাই— সেটি হলো আগুন। সবকিছু আগুনে দিয়ে দাও। যেখানেই মনে হবে কেউ আক্রান্ত হয়েছে, সেখানে সবকিছু আগুনে জ্বালিয়ে দাও। আগুনে ঝলসে শুদ্ধ হোক এথেন্স।

সবাই তার কথা মেনে নিয়েছে। নগরের কর্তারা ক্ষমতা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। নগর চলছে হিপোক্রাটিসের কথায়। অন্য কোনো উপায় নেই। পেরিক্লিসের মতো সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ মারা গেছেন। কেউ কোনো প্রতিকার দিতে পারেনি। তাই ডাক্তার হিপোক্রাটিসই শেষ ভরসা। তিনি যা বলেন, সবাই মেনে নিচ্ছে। যার যা কিছু আছে সব পুড়িয়ে ফেলছেন। ডাক্তার ঠিক করেছেন প্লেগের সময় সব লাশ পুড়িয়ে দিতে হবে। লাশ থেকেই জীবাণু ছড়াচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তাই মৃত্যুর সাথে সাথে লাশ পুড়িয়ে দিতে হবে। সেজন্য এখন চারদিকে আগুন আর আগুন। আলোর নগরী এথেন্স এখন আগুনের নগরী।

ডাক্তারের বুদ্ধিতে কাজ হলো। কদিনেই দেখা গেল প্লেগের প্রকোপ কমতে শুরু করেছে। আবহাওয়াও পরিবর্তন হচ্ছে। তীব্র গরম কমে শীত পড়তে শুরু করেছে। এখানে শীতকালে বৃষ্টি হয়। এক সকালে ধুম বৃষ্টি শুরু হলো। একটানা কয়েক দিন বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সারা এথেন্স ভেসে গেল। সেই সাথে ভেসে গেল প্লেগের জীবাণু। বৃষ্টির পরেই প্লেগ কমে গেল। হঠাৎই যেন মানুষ মারা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যেরকম ঝুপ করে মহামারী এসেছিল, আবার চলেও গেল হুট করেই। মনে হচ্ছে একটি বিশাল ঝড়ের রাতের পর হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মৃত্যু চিৎকারও বন্ধ হয়েছে।

হিপোক্রাটিস হিরো হয়ে গেলেন। তিনিই এথেন্সকে বাঁচালেন স্মরণকালের ভয়াবহতম মহামারী থেকে। এখন তার সম্মান দেবতার কাছাকাছি। ঘরে ঘরে মানুষ বলছে, এই একটি লোকই এথেন্সকে বাঁচিয়েছে। কৃতজ্ঞতার ফল স্বরূপ এথেন্সের সংসদে ডাক্তারকে পুরস্কার দেওয়া হলো। এথেন্সের পক্ষ থেকে সোনার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হলো ডাক্তারকে। তাকে এথেন্সের নাগরিকত্ব দেওয়া হলো।

আসপাশিয়া একা বসে কাঁদছেন, সেই তো ডাক্তার এলেন, কিন্তু কয়টা দিন আগে কেন এলেন না? তিনি সময়মতো এলে, পেরিক্লিস বাঁচতেন। আজ প্লেগমুক্ত হয়েছে এথেন্স, আজ তার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হতেন না। আসপাশিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। তাকে ভরসা দিচ্ছে এলসিবিয়াডিস। সাহস দিচ্ছে। তরুণ ছেলেটি পেরিক্লিসের সংসারের হাল ধরেছে। তার ছেলে পেরিক্লিস নাম্বার টু এখনও অনেক ছোট।

সারা এথেন্সে সক্রেটিসই একমাত্র মানুষ, যে প্লেগে কাবু হয়নি। সক্রেটিস শক্ত-সমর্থ মানুষ। জীবনে কবে জ্বর হয়েছিল, মনে পড়ে না। সে সারা জীবন খালি পায়ে সারা শহরে

হেঁটেছে। কোনোদিন আরামের কথা ভাবেনি। রোগ- ব্যাধি তার ধারে কাছে আসে না। প্লেগও আসতে পারেনি। এই প্লেগেও তার শরীর কাবু হয়নি।

লোকজন ফিরতে শুরু করেছে। সক্রেটিস গাধার গাড়ি নিয়ে রওনা হলো ক্রিতোদের আনতে। কিন্তু পথেই দেখল তারা সবাই ফিরে আসছে।

প্লেগ শেষ হয়েছে। এই প্লেগ অনেক কিছু নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে পেরিক্লিসকে। নিয়ে গেছে এথেন্সের সুখের দিন। ফেলে গেছে দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, অশান্তি। মানুষের ঘরে ঘরে দুঃখ। সারা এথেন্সের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ মারা গেছে। প্রতি ঘরে ঘরেই কেউ না কেউ মারা গেছে। ঘরে ঘরে এখন শুধুই শোকের মাতম।

জেনথিপির বাবা-মা দুজনই মারা গেছেন। ক্রিতোর মা, চেরোফোনের তিন কাকা সবাই মারা গেছেন। শিশুরা প্রায় সবাই মারা গেছে। সক্রেটিস আর জেনথিপির ভাগ্য ভালো। তাদের কোনো সন্তান নেই। ছোট্ট শিশু এই প্লেগে বাঁচতে পারত না।

প্লেগ শেষ হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়নি। যুদ্ধ এখনও চলছে। স্পার্টা আবার আক্রমণ করেছে। আবার যুবকেরা মারা যাচ্ছে। বয়স্ক আর শিশুরা সব প্লেগে মারা গেছে। এখন যুদ্ধে মারা যাচ্ছে যুবকেরা। এখন এথেন্সে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। অনেক ঘরেই সংসার চালানোর মতো কোনো পুরুষ নেই।

উপায় না পেয়ে নারীরা বের হয়ে আসছে। এখন নারীরা নিজেরা বাজার করে। বাইরে কাজ করে। ব্যবসা করতে শুরু করেছে। আগে শহরের রাস্তায় কোনো মেয়ে দেখা যেত না। প্লেগের পর রাস্তায় অনেক মেয়ে। প্লেগ এথেন্সে নারীদের নিয়ম ভাংতে বাধ্য করেছে। আগে মেয়েরা বাইরে এলে নিন্দা হতো। এখন আর নিন্দা হয় না। সময় নিন্দার মুখে কুলুপ দিয়ে দিয়েছে।

প্লেগের পর এথেন্স বদলে গেছে। মানুষও বদলে গেছে। আইনও বদলাতে হলো।

লোকজন টের পেল তারা মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছে না। যুবক ছেলে নেই। ছেলের চেয়ে মেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। এথেন্সে কোনোদিন বহুবিবাহ ছিল না। একজন পুরুষ একটি নারীকেই বিয়ে করতে পারত। সেটি বদলে গেল। আইন করা হলো— এখন থেকে একজন পুরুষ একাধিক মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে।

শহরে শিশুর সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো দরকার। তারা আবার নিয়ম করল— স্বামী-স্ত্রী রাজি হলে অন্য পুরুষ বা স্ত্রী দ্বারা সন্তান নিলেও সেটি বৈধ হবে। এসব আইন-কানুনের ফলে খুব তাড়াতাড়ি শহরটা বদলে যাচ্ছে। আগে যেমন সবকিছুতে শৃঙ্খলা ছিল, সেটি এখন কমে গেছে। সমাজ পাল্টে যাচ্ছে। মানুষের মনও পাল্টে যাচ্ছে।

সক্রেটিস ও তার বন্ধুরাও অনেক বদলে গেছে। শহরের বয়স্করা সব মারা যাওয়ায়, তারা এখন এথেন্সের বয়স্কদের কাতারে। তারা মুরুব্বি হয়ে গেছেন। যারা তাদের তুমি করে বলতেন, তারা আর কেউ বেঁচে নেই। এখন যারা আছে, সবাই তাদের আপনি করে বলে। তারা এখন বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রবীণের কাতারে তরুণরা তাদের মুরুব্বি জ্ঞান করে,

সবাই তাদের আপনি করে বলে। এখন সক্রেটিসদের কথা উঠলে আর কেউ ‘সে’ বলে সম্বোধন করে না। সম্বোধন করে ‘তিনি’।

সক্রেটিসের বিশ্বাস হয় না তিনি প্রবীণ হয়ে যাচ্ছেন। তার এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। এত তাড়াতাড়ি বয়স্ক ভাব আনতে ভালো লাগে না। মনের বয়স তার এখনও বারো কি তেরো। কিন্তু রাস্তায় যখন সবাই তার চেয়ে কম বয়সের, তখন মনের বয়সও বেড়ে যায়। তাকে মেনে নিতে হচ্ছে তিনি এখন প্রবীণ ব্যক্তি।

এই প্লেগ ভয়ংকর প্লেগ জ্ঞানী লোকদের মেরে ফেলেছে। বিদেশ থেকে যেসব সফিস্ট, দার্শনিক বা জ্ঞান-প্রেমিক এথেন্সকে ভরিয়ে তুলতেন, তারা প্লেগের শুরুতেই পালিয়ে গেছেন। জ্ঞানী লোকেরা সাধারণত প্রবীণ হন। প্রবীণরা সব মারা গেছেন। তাই এথেন্সে এখন জ্ঞানী লোকেরও অভাব।

এই জ্ঞানহীন নগরে এখন বাবা-মায়েরা সন্তানকে পড়ানোর জন্য জ্ঞানী লোকদের তালাশ করেন। সক্রেটিসের কাছে ছাত্র পড়ানোর প্রস্তাব আসে। সক্রেটিস সবাইকে পড়ান। কিন্তু একেবারে বিনামূল্যে, কারও বাড়ি গিয়ে নয়। আগের মতোই সিমনের দোকানে, আগোরার পাশে, পথে-প্রান্তরে যেখানে তরুণ যুবকেরা আছে, সেখানেই সক্রেটিস পড়ান। সক্রেটিস এখন শিক্ষক। রাস্তা-ঘাটের শিক্ষক। বেতন ছাড়া বেগার খাটা শিক্ষক। কিন্তু যারা সুন্দর জীবন খোঁজে, তাদের কাছে এই বেগার-খাটা শিক্ষকের দাম অনেক বেশি। তারা সক্রেটিসকে ভালোবাসে। তাকে না পেলে, জ্ঞান-প্রেমিক তরুণদের হাঁসফাঁস লাগে। এখন অনেক তরুণই নিজেকে সক্রেটিসের ছাত্র বলতে গর্ব অনুভব করে।

ডাক্তার হিপোক্রাটিস প্রায়ই রাস্তাঘাটে সক্রেটিসকে দেখেন। তারই বয়সী, কিন্তু কথাবার্তায় মনে হয় উঁচু স্তরের। লোকটি প্লেগের মধ্যেও রাস্তায় হেঁটেছেন, ভয়-ডর নেই। সব সময় হাসি-ঠাট্টা মিশিয়ে কথা বলছেন। তার সাথে সব সময় কিছু তরুণ দেখা যায়। তরুণরা তার মস্ত ভক্ত। ডাক্তার ভাবেন, লোকটি কদাকার কিন্তু তাকে লক্ষ না করে পারা যায় না। তার কথার মধ্যে কিছু একটি আছে, যা তাকে অন্যরকম আকর্ষণীয় করেছে। এটি ডাক্তার বোঝেন না, তিনি শরীরের খবর জানেন, মানুষের মনের তালাশ এখনও করেননি।

ডাক্তার তার কথা যেটুকু শুনেছেন ভালোই লেগেছে। আরও শুনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ডাক্তার মহাব্যস্ত, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সক্রেটিসের কথা শোনার সময় তার নেই। তারচেয়ে বড় কথা, ডাক্তার যেখানেই যান, দলে দলে মানুষ তাকে ঘিরে ধরে। তার মতো সেলিব্রেটির পক্ষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারও কথা শোনা অসম্ভব।

তবে তিনি জানেন সক্রেটিস তরুণদের সুন্দর জীবনের কথা বলেন, নিজেকে জানতে বলেন। ‘সুন্দর জীবন’ কথাটি তার পছন্দ হয়েছে। সবারই সুন্দর জীবন দরকার।

ডাক্তারদেরও দরকার। তিনি সুন্দর জীবনের কথা ভাবেন।

কিন্তু কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছে ডাক্তারদের জীবন সুন্দর নয়, ঘাপলা আছে। ছাত্রদের মধ্যে এলোমেলো ঘটনা দেখছেন। ছাত্ররা কিছু কিছু বাড়িতে ঘন ঘন যেতে চায়, আবার অনেক বাড়ি থেকে লোক এসে বসে থাকলেও যেতে চায় না। খোঁজ নিয়ে দেখলেন, বড়লোকের বাড়িতে যেতে ছাত্রদের খুবই আগ্রহ, কিন্তু তারা গরিব রোগীদের হেলাফেলা করে।

খুব কষ্ট পেলেন ডাক্তার। তিনি মনে করেছিলেন, তার ছোঁয়ায়ই ছাত্ররা বুঝে যাবে যে, চিকিৎসককে সাম্যবাদী হতে হয়। চিকিৎসার জগতে কোনো উঁচু-নিচু নেই। ডাক্তারের চোখে সবাই সমান। কিন্তু ছাত্ররা বোঝেনি। তারা সাম্যবাদী হয়নি। যেখানে বেশি টাকা, সেখানেই ছুটছে।

ডাক্তার ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলেন। শ-কার, ব-কার তুলে বকাঝকা করলেন। আর যদি কেউ এমন করে, তাহলে জীবনে আর তার মুখ দেখবেন না বলে সাবধান করলেন। কিন্তু সাবধান বাণীতে কাজ হলো না। এমনিতে সবাই তাকে মানে। তবু মাঝে মাঝে টাকার কাছে হেরে যায়।

ডাক্তার বুঝলেন— চিকিৎসকও তো মানুষ। আজ ওরা ডাক্তারি করছে বলে ওদের মানব চরিত্র রাতারাতি বদলে যাবে না। ওরা মানুষ, মনের কাছেই বন্দি। মনের চারধারে হাজার রকম প্রলোভন, কোনো না কোনো প্রলোভনে মন সাড়া দেবেই। কিন্তু বিষয়টি তাকে ভাবাচ্ছে। চিকিৎসক মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি যায়। মানুষের একান্ত গোপন জিনিস জানতে পারে। সেখানে ডাক্তার খারাপ হলে খুবই বিপদ। ভালো করতে গিয়েই ক্ষতি করা সবচেয়ে সহজ। এই ব্যাপারে তাকে কিছু একটা করতে হবে। তিনিই চিকিৎসা শাস্ত্র সবার জন্য উন্মুক্ত করেছেন। তিনিই প্রথম চিকিৎসা বিদ্যালয় খুলেছেন। তাই নতুন চিকিৎসকরা যাতে নীতিবান হয়, সেটি তাকেই নিশ্চিত করতে হবে।

সক্রেটিস যেরকম সুন্দর জীবনের কথা বলেন চিকিৎসকদের জন্যও তেমনই সুন্দর জীবন দরকার। ন্যায়, নীতি ও সত্যের জীবন দরকার। তাদের জন্যও নিয়ম-কানুন দরকার। সক্রেটিস যদি মানুষের মনের জন্য নিয়ম-কানুন বানান তাহলে হিপোক্রাটিসও ডাক্তারদের জন্য নিয়ম বানাবেন।

কিছুদিন আগে এক বৃদ্ধ তাকে অনেক অনুনয় করে বলছিলেন, 'ডাক্তার বাবু, প্লেগের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না, এমন একটি ওষুধ দেন যেন আমি এক্ষুনি মরে যাই।' ডাক্তার বলেছিলেন, 'যা খেলে আপনি মরে যাবেন, সেটি তো বিষ। চিকিৎসার ধর্ম অনুযায়ী কাউকে বিষ দেওয়া যায় না।' বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'আমি আর সইতে পারছি না। আমি আপনাকে অনেক টাকা দেব, আমার সব টাকা গোপনে রক্ষিত আছে। সব আপনাকে দেব। শুধু একটি ব্যবস্থা করেন।' সেদিন বৃদ্ধের কথা শুনে একজন ছাত্রের চোখ চকচক করে উঠেছিল। কিন্তু ডাক্তার বলেছিলেন, 'আমার কাজ মানুষ বাঁচানো, মানুষ

হত্যা নয়। আপনাকে আমি কিছুতেই বিষ দিতে পারব না। দেবতার নিষেধ আছে। তার চেয়ে আসেন, আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করি।' ঘরে ফিরলে এক ছাত্র জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি কি দেবতার নিষেধ আছে? উনি তো নিজেই মরতে চাচ্ছেন, আমরা একটু সাহায্য করতেই পারি।' ছাত্রের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, কী বলছে তার ছাত্র! প্রচণ্ড রাগে গর্জন করে বলেছিলেন, 'নিষেধ আছে। নিষেধ না থাকলেও আজকে থেকে নিষেধ। হিপোক্রাটিসের নিষেধ।' সেদিন মনে হয়েছিল ওই ছাত্রটি সুযোগ পেলে টাকার জন্য বিষ দিতে দ্বিধা করবে না।

ভালো করে বুঝতে হবে ছাত্ররা কী অনিয়ম করছে। ভালো করে পরখ করতে হবে। ছাত্ররা সব তরুণ ছেলে। এদের জন্য সবার আগে দরকার নারী বিষয়ক পরীক্ষা। পরের দিন তিনি ছাত্রদের খুব সুন্দর কিছু নারী রোগীর কাছে নিয়ে গেলেন। নারী রোগীদের সাথে ছাত্রদের একা ঘরে ছেড়ে দিয়ে নিজে আড়াল থেকে লক্ষ করতে লাগলেন। বেশিরভাগ ছেলেই ভালো আচরণ করছে। তাদের স্পর্শ বা চাহনি স্বাভাবিক। শুধু কয়েকজন দুষ্ট আচরণ করছে। তাদের হাতের ছোঁয়া যেন কেমন কেমন, ঠিক ডাক্তার সুলভ নয়। তাদের মনে কিন্তু আছে।

আর একদিন ডাক্তার দেখলেন, এক তরুণ ছাত্রকে এক বিধবার বাড়ি থেকে ঘন ঘন ডাকতে আসে। সেখানে এতদিনে রোগ সেরে যাওয়ার কথা। কিন্তু তবুও ছাত্রটি সেই বাড়িতে যায়। সেই বাড়ির কথা উঠলে তার ফর্সা গাল টকটকে লাল হয়ে যায়।

হিপোক্রাটিস ভাবছেন, কী করা যায়! আমি কি ভুল করছি? ডাক্তারি বিদ্যা দেবতাদের বংশধরদের কাছ থেকে মুক্ত করে সবার জন্য খুলে দিয়ে কি ভুল করলাম? আগে শুধু ডাক্তারের ছেলেরাই ডাক্তারি শিখতে পারত। তারা নিজেদের দেবতার সন্তান ভাবত। ভুল করতো কম। তাদের সবার বাবার কঠিন শাসন ছিল। একটু স্খলন হলে পরিবারের ভয়াবহ অসম্মান হতো। চিরতরে ডাক্তারি ছেড়ে দিতে বাধ্য হতেন। তখন তাদের পেট চালানোই অসম্ভব হতো। কিন্তু এখন যেকোনো মানুষ ডাক্তার হচ্ছে। তাদের দেবতার ভয় কম। পারিবারিক অনুশাসন নেই। ছোটবেলায় বাবাকে ডাক্তারি করতে দেখেনি। একজন চিকিৎসকের নৈতিক গুণ কী হওয়া উচিত, সেটি ওরা জানে না। সেটি ওদের শেখাতে হবে। নতুন ডাক্তারদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, সেটি অবশ্যই জানাতে হবে। তিনি ডাক্তারদের নৈতিকতার নিয়ম বানাবেন।

তিনি মনে মনে একটি নাটকীয় বুদ্ধি করলেন। এথেন্সে এসে তিনি অনেক নাটক দেখেছেন। এথেন্সের লোকেরা প্লেগের মধ্যেও নাটক করেছে। নাটক দেখে ডাক্তারের মাথায় শুধু প্লট ঘোরে। তার ইচ্ছা হয় একটি নাটক করবেন। সেটি সম্ভব হচ্ছে না। তাই এখন ছাত্রদের দিয়ে একটি খণ্ড নাটক করবেন। তিনি সব ছাত্রকে ডেকে বললেন, আজ বিকেলে আমাদের বিশ্রাম। আমরা কোনো রোগী দেখব না। সবাই আমার সাথে যাবে। আমরা এজিয়ান সাগর পাড়ে বনভোজন করব।

এক ছাত্র বলল, সাগর পাড়ে বনভোজন? তার চেয়ে বলি সমুদ্রভোজন।

দিনটি সুন্দর। বিকেলের আলোয় এজিয়ান সাগর একেবারে শান্ত। কোনো ঢেউ নেই। থমথমে পানিতে নীল আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। সেখানে চলছে ডাক্তারদের সমুদ্রভোজন।

হিপোক্রাটিস সুরা বের করলেন। করিন্থ শহর থেকে আনা কড়া মাপের সুরা। ছাত্ররা অবাক। তারা জানে যে হিপোক্রাটিস সকল প্রকার নেশা থেকে হাজার হাত দূরে থাকেন। সুরা তার দু'চক্ষের বিষ। ছাত্ররা কেউ যাতে আসক্ত না হয়, সেজন্য তার কঠিন নির্দেশ আছে। তবু আজ সবকিছু ভুলে ডাক্তার নিজেই সুরা নিয়ে এসেছেন।

ছাত্ররা আহ্লাদে বাকবাকুম। আজ ডাক্তার তাদের দোস্ত হয়ে গেছেন। নিজ হাতে সুরা ঢেলে দিচ্ছেন। বড় বড় মাটির পাত্র কানায় কানায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে ডাক্তারের জন্য আজ বিশ্ব সুরা দিবস। ছাত্ররা খাচ্ছে, আর মাতাল হচ্ছে। ছাত্রদের পা কাঁপছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, তখন থামলেন ডাক্তার। এতক্ষণ তিনি ছাত্রদের প্রস্তুত করেছেন। এখন সবাই মাতাল। ঢুলুঢুলু। এবার যা জিজ্ঞেস করবেন, ফরফর করে বলে দেবে। এটিই তার নাটক।

ডাক্তার তাদের সাথে শুরু করলেন হালকা আলাপ। দোস্তের মতো আলাপ। ছাত্ররা বলতে লাগল— কবে কার সাথে কী করেছে। কোন রোগীর সাথে কী হয়েছে। কার কাছে বিষ বিক্রি করেছে। কার গোপন কথা কাকে বলেছে। কত টাকা পেয়েছে। তারা মনের আনন্দে ঝরনার মতো বলছে। কার মনে কী আছে সব বলে দিচ্ছে। কী ভালো কাজ করতে চায় সেটি বলছে। কার ক্ষতি করতে চায় সেটিও বলছে। ডাক্তার ঝড়ের বেগে লিখছেন তাদের ঘটনা।

সূর্য ডুবছে। সাগর এখনও শান্ত। জলে আর নীল নেই, এখন মিষ্টি একটি লালচে লালচে ভাব। সাগরের ঐ পাড়ে ছোট্ট দুটি পাহাড়। দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে জলে ডুবে যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য। একটি নরম আলো ভেসে আসছে সাগর থেকে। ঘরে ফিরছে এক ঝাঁক সাদা পাখি। এমন জায়গায় কিছুক্ষণ থাকলে মন ভিজে ওঠে। ছাত্রদের মন ভিজে গেছে। ভেজা মনে ছুরি চালিয়ে মনের সব কথা বের করছেন ডাক্তার। ছাত্ররা বুঝতেও পারছে না যে, এই ঘোরলাগা সন্ধ্যায় তাদের মাতাল করে কী করছেন হিপোক্রাটিস।

তারা বুঝতে পারল পরদিন সকালে। সারা রাত হিপোক্রাটিস কাজ করেছেন। খুব ভোরেই সবাইকে ডেকে তিনি বললেন, ওঠো, এটি দেখো।

একটি পেপিরাসের টুকরায় কয়েক লাইন লেখা। লেখার শিরোনাম— 'চিকিৎসা বিদ্যার শপথ'[৯৯]। শুরুটা এমন:

আমি এপোলো, এসক্লিপিয়াসসহ সকল দেবদেবীর নামে শপথ করে বলছি, আমি আমার যোগ্যতা ও বিচার বিবেচনা অনুযায়ী এই শপথ মেনে চলব।

হিপোক্রাটিস বললেন, প্রত্যেকে একটি করে শপথ পড়ো।

ছাত্ররা ভয় পেয়ে ভাবছে, এটি মনে হয় আর একটি নাটক। ওস্তাদ ইদানীং প্রতিবেলা নাটক করছেন।

একজন প্রথম বাক্য পড়ল: চিকিৎসা বিষয়ে আমি রোগীর যা কিছু শুনি বা দেখি তা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখব। কারও ব্যক্তিগত কোনো তথ্য প্রকাশ করব না এবং সবকিছু পবিত্র গোপনীয় বলে মান্য করব।

এটি শুনে একজন মুচকি হাসি দিল। তার স্বভাব হলো রোগীদের কথা হরহর করে বলে দেওয়া। সে ভাবছে, ওস্তাদ মনে হয় আমার কথা মনে করেই এটি লিখেছেন। তার ভয় ভয় লাগছে।

আরেকজন দ্বিতীয় বাক্য পড়ছে: আমি শুধু চিকিৎসা সেবার উদ্দেশ্যেই কারও গৃহে প্রবেশ করব, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় এবং অবশ্যই সব ধরনের ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকব; বিশেষত কোনো নর-নারীকে কখনই শারীরিকভাবে অপব্যবহার করব না।

এটি পড়ে প্রেমিক ছাত্রদের মাথায় হাত। ওস্তাদ তাদের মন পড়ে ফেলেছেন।

আরেকজন পড়ছে: আমি আমার চিকিৎসা বিদ্যা শুধুই অসুস্থ মানুষকে ভালো করার জন্য কাজে লাগাব, কখনই কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাব না। কোনো অবস্থায়ই আমি কাউকে বিষ প্রদান করব না। কোনো নারীকে এমন কিছু দেব না যাতে তার গর্ভপাত হতে পারে।

এভাবে একে একে অনেকগুলো শপথ পড়ল ছাত্ররা। তাদের মুখ কাঁচুমাচু। মনে হচ্ছে তারা সবাই অপরাধী। অপমানিত লাগছে। মনে হচ্ছে আমরা সবাই চোর। সেজন্য এমন করে বলতে হবে। ওস্তাদ খুব জটিল নাটক করল। তাদের মুখ দেখে মায়া লাগল হিপোক্রাটিসের। এরা তার সবচেয়ে ভালো ছাত্র। বাছাই করে এনেছেন এথেন্সে।

তিনি বললেন, শপথ পড়ে কী মনে হচ্ছে?

সবাই চুপ। কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন, কিছু একটা বলো। ভয় নেই।

একজন মিনমিন করে বলল, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।

'আর কার কী মনে হচ্ছে?'

আর একজন বলল, কাল বিকেলে আমরা যা বলেছি, তার জন্য দুঃখিত। তখন আমাদের হুঁশ ছিল না। আমরা ভুল করেছি।

ডাক্তার বললেন, তোমরা সবাই নির্ভয়ে বসো। তোমরা কেউ চোর নও। তোমাদের বকা দেওয়ার জন্য এটি লিখিনি। ভালো করে শিরোনাম দ্যাখো। কী লেখা আছে?

ছাত্ররা পড়ল, 'চিকিৎসা বিদ্যার শপথ'

‘এটি হলো সব চিকিৎসকদের জন্য শপথ। এটি তোমার আমার ব্যক্তিগত কিছু নয়। কালকে সমুদ্রভোজনের নামে আমরা একটি নাটক করেছি। তাতে তোমাদের গোপন কথা আমি জেনে গেছি। কিন্তু সেটি গোপনই থাকবে। দেখো, শপথে আছে— রোগীর গোপন তথ্য কাউকে বলা যাবে না।’

ছাত্রদের মনে সাহস ফিরে এলো। তারা একে অন্যের মুখে তাকাচ্ছে।

এরপর ডাক্তার তার ডাক্তারি জীবনের কিছু ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, চিকিৎসা হলো জীবন নিয়ে কারবার। মানুষের নাড়ির খবর নেওয়া, হাঁড়ির খবর নেওয়া। চিকিৎসকরা যদি অসৎ হন, সেটি হবে ভয়ংকর। তাই একটি নিয়ম লাগবে। আমরা সবাই দেবতাদের কাছে এই শপথ নিয়ে চিকিৎসা করতে বের হব। অক্ষরে অক্ষরে মানব এই শপথ।

ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। তাদের খুব ভালো লাগছে। বড় ডাক্তার এথেন্সে এসে ভাষণ দেওয়া শিখে গেছেন। এথেন্সে নেতারা ছুতানাতায় ভাষণ শুরু করে। কিছুদিন এখানে থাকলে আর কিছু শিখুক আর নাই শিখুক, ভাষণ যে শিখবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ছাত্রদের ভয় কেটে যাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে, ওস্তাদ আরেকবার সত্যিকার ওস্তাদের মতো কাজ করেছেন। যেভাবে তিনি দেবতাদের বাদ দিয়ে রোগ নির্ণয়ে রোগীর দেহ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, যেভাবে সবার জন্য চিকিৎসা বিদ্যালয় করেছেন, সেভাবেই আর একটি বিশাল কাজ করলেন। তিনি চিকিৎসকদের নৈতিকতা ধরে রাখতে একটি শপথ লিখে ফেলেছেন।

একজন ছাত্র বলল, আমার মনে হয়, এই শপথের নাম হোক ‘হিপোক্রাটিক শপথ’

সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। এর চেয়ে ভালো নাম আর হতে পারে না। একজন বলল, এই শপথ সবার ঘরে ঝুলিয়ে রাখব। আরেকজন বলল, আমাদের হাসপাতালের সামনে পাথরে খোদাই করে দেব।

ডাক্তার বললেন, সবই করা যাবে, আগে শপথ চূড়ান্ত হোক।

‘মানে কী? এটি চূড়ান্ত নয়?’

‘মনে হয় না। তোমরা সবাই ভাবো। আর কী যোগ করা যায়। দেশে ফিরে অন্য ডাক্তারদের কথা শুনব। সবার মতামত নিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চূড়ান্ত করব। আমরা এমন একটি শপথ বানাব, যেটি সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা মেনে চলবে। যেদিন পাস করে বের হবে, সেদিন এই শপথ নিয়েই তারা কাজে নামবে।

তিনি আবার বললেন, আর একটি কাজ করতে হবে। ডাক্তারদের জন্য আইন বানাতে হবে। সবাই কাজ শুরু করো। সবাই লিখতে থাকো। আমরা একসাথে চিকিৎসা শাস্ত্রের আইন তৈরি করব।

এক ছাত্র বলল, আমার মাথায় একটি কথা এসেছে। আমি ছিলাম এক গরিবের ছেলে। কোনোদিন ভাবিনি যে, জীবনে ভালো কিছু করতে পারব। আপনি আমাকে নতুন

জীবন দিয়েছেন। আমাকে ডাক্তার বানাচ্ছেন। আমরা আমাদের শপথে আপনার জন্য কিছু রাখতে চাই। আমরা আপনার কাছে সারা জীবন যাতে কৃতজ্ঞ থাকি, সেরকম কিছু আমাদের শপথে রাখতে চাই।

হিপোক্রাটিস কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ঠিকই বলেছ। শপথে শিক্ষকদের বিষয়ে কিছু রাখা উচিত। তোমরা আমার কথা বলছো, কারণ এখন আর কোনো শিক্ষক নেই। আমি একাই শিক্ষক। কিছুদিন পরে তোমরাই শিক্ষক হবে। তোমরা শত শত ছেলেমেয়েকে ডাক্তার বানাবে। শপথে শিক্ষকদের নিয়ে কিছু যুক্ত করতে হবে।

যে ছাত্রটি শিক্ষকের কথা প্রস্তাব করেছিল সে বলল, আমি একটি লাইন বলতে চাই, 'আমার শিক্ষককে আমি নিজের পিতা মনে করব এবং তার পরিবারকে নিজের পরিবার বলে ভাবব। '

হিপোক্রাটিস ছাত্রটির দিকে ভালো করে তাকালেন। এই ছেলেটি তাকে বাবা বলছে। তার চোখ ছলছল করে উঠল। তার নিজের বাবার কথা মনে পড়ল। নিজের ছেলের কথাও মনে পড়ল। হিপোক্রাটিস সম্প্রতি বিবাহ করেছেন। তার একটি শিশু সন্তান আছে। তার মনে হচ্ছে জীবনটা একেবারে মন্দ নয়। অনেকগুলো ছেলে তার কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শিখছে। তারা তাকে নিজের পিতার মতো দেখছে। তার কষ্ট সার্থক হয়েছে।

ডাক্তারদের মাঝে একটি আবেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সবাই অনেক দিন ধরে দূরে আছে। সবার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ছে।

তারা এথেন্স ছেড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

***

৯৯. এটি চিকিৎসকদের Hippocratic Oath, এখনও সারা পৃথিবীর চিকিৎসকগণ এই শপথটি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশে মূল থিম ঠিক রেখে শপথের ভাষাটি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

৪২

'বিস্ময়ই হলো জ্ঞানের সূতিকাগার।'
—সক্রেটিস

চেরোফোন কপাল চাপড়াচ্ছেন। নিজের কপালে ছোট ছোট আঘাত করছেন আর বলছেন, এ কী করল এথেন্স? এর নাম কি গণতন্ত্র? পেরিক্লিস বেঁচে থাকলে কোনোদিন এটি দেখতে হতো না। আমরা কি মানুষ? এথেন্স কি সব নীতি ভুলে গেল? এটি গণতন্ত্রের নিয়ম নয়।

চেরোফোন একা নয়, এথেন্সের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ আজ হতভম্ব। সক্রেটিস বাকরুদ্ধ। এথেন্স জঘন্যতম অন্যায় করতে যাচ্ছে একটি দ্বীপের মানুষদের সাথে। দ্বীপটির নাম লেসবস। এই দ্বীপের বিরুদ্ধে এথেন্সের সংসদে পাস হয়েছে এক ভয়ংকর প্রস্তাব। এথেন্সের সেনারা দ্বীপের সব পুরুষকে মেরে ফেলবে; আর সব নারী ও শিশুকে বেঁচে দেবে দাস বাজারে।

এই ভয়াবহ প্রস্তাব যে করেছে, তার নাম ক্লিয়ন। পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর এথেন্সের গণতন্ত্রের নতুন নেতা সে। পেরিক্লিসের মারা যাওয়ার পর এথেন্সে নতুন নতুন নেতা হচ্ছে। যে যার মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। উদ্ভট সব সিদ্ধান্ত। ক্লিয়ন ছিল পেরিক্লিসের ঘোর বিরোধী। সে বলত, স্পার্টার সাথে যুদ্ধের জন্য দায়ী পেরিক্লিস। কিন্তু পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর সে যুদ্ধ বন্ধ করল না, উল্টা আরও বেশি করে যুদ্ধ শুরু করল। রক্ত গরম করা যুদ্ধের কথা বললে ভোট বাড়ে। ভোটের চক্করে পড়ে শান্তিকামী ক্লিয়ন হয়ে গেল যুদ্ধবাজ। সে এখন যুদ্ধের জন্য উসখুস করে। অল্প দিনেই বড় একটি যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে গেল।

খবর এসেছে, এজিয়ান সাগরের লেসবস দ্বীপের মানুষ এথেন্সের পক্ষ ত্যাগ করে স্পার্টার জোটে যোগ দিয়েছে। এই খবরে ক্লিয়ন বিশাল বাহিনী নিয়ে ঐ দ্বীপের রাজধানী মিতিলিন শহর দখল করল। এখন মিতিলিনের মানুষের বিচার হবে। তারা এথেন্সের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ক্লিয়ন সংসদে পাস করাল, 'ওরা বেইমানি করেছে।

বেইমানির শাস্তি হিসেবে এথেন্সের সেনারা দ্বীপের সব পুরুষকে মেরে ফেলবে, সব নারী ও শিশুকে দাস বাজারে বিক্রি করে দেবে।[১০০]' এই ভয়াবহ আদেশ নিয়ে জাহাজ রওনা হলো লেসবসের দিকে। আদেশ হাতে পেলেই সেনারা শুরু করবে তাণ্ডব।

এই ভয়াবহ খবরে সারা এথেন্সের শুভবুদ্ধির সব মানুষ হতভম্ব। এটি কী হলো? এথেন্স কি এরকম? গণতন্ত্রের এ কী মারাত্মক পরিণতি! পেরিক্লিস মারা যেতেই আমরা এমন আমানবিক হয়ে গেলাম?

সক্রেটিস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, মানুষ যখন 'আরও চাই', 'আরও চাই করতে থাকে, তখন গণতন্ত্র শুধু একটি সাইনবোর্ড হয়ে, যায় যেটাকে সামনে রেখে শুধু যুদ্ধ করা যায়।

চেরোফোন বললেন, ক্লিয়ন গণতন্ত্রের নামে অন্যায় করছে, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ঠকাচ্ছে।

পরদিন সকালেই ভালো খবর এলো। এথেন্সের নেতারা ভুল বুঝতে পেরেছে। সংসদে নতুন বিল পাস হয়েছে। লেসবস দ্বীপের মানুষদের মারা হবে না। শুধু বেইমানদের বিচার হবে। আদেশ বাতিলের খবর নিয়ে আরেকটি জাহাজ রওনা হলো লেসবসের দিকে। সব শুনে সক্রেটিস বললেন, এথেন্সের গণতন্ত্রে সার্কাস চলছে। পেরিক্লিস শেষ, তো গণতন্ত্রের দিনও শেষ।

সিমনের দোকানে তুমুল আড্ডা চলছে। কথার তুবড়ি ছুটছে। চারপাশে অনেক মানুষ।

চেরোফোন বলছেন, একটি দ্বীপের সব মানুষ মেরে ফেলবে এমন কাজ এথেন্স করতে পারে? ক্লিয়ন একটি বর্বর। সে চামড়া ব্যবসায়ী। তার ট্যানারি আছে। সে সারা জীবন পশু জবাই করেছে, চামড়া ছাড়িয়েছে। ও কী করে মানুষের মর্ম বুঝবে?

সক্রেটিস বললেন, চামড়ার ব্যবসা করা দোষের কিছু নয়। কোনো কাজই ছোট নয়। তবে ঘটনা অন্যখানে। এই গণতন্ত্রের মারাত্মক সমস্যা অন্যখানে।

সিমন বললেন, গণতন্ত্রের সমস্যা কোনখানে?

সক্রেটিস বললেন, এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা[১০১] শুনতে চাও? তাহলে শোন, আসল সমস্যা হলো— এখানে কোনো কাজে কোনো বিশেষজ্ঞ নেই। ধরো, তোমার জুতা দরকার, তো জুতা বানাতে কার কাছে যাবে?

'মুচির কাছে।'

'কেন তার কাছে যাবে?'

'কারণ সে কাজটা জানে, সে জুতা বানানোর বিশারদ।'

'একটি যুদ্ধ জাহাজ চালাতে কার কাছে যাও?'

'নাবিকের কাছে, বা জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে।'

'কেন?'

‘কারণ সে জাহাজ বিশারদ, সে কাজটা জানে।’

‘বাড়ি করতে হলে কাকে ডাকবে?’

‘রাজমিস্ত্রি।’

সক্রেটিস বললেন, তাহলে কী দাঁড়াল? আমরা প্রত্যেক কাজের জন্য, সেই কাজের একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাই। জুতা বানাতে মুচি, ঘর বানাতে রাজমিস্ত্রি, জাহাজ চালাতে ক্যাপ্টেনকে ডাকি। তো সব কাজেই বিশেষজ্ঞ দরকার। আর শুধু দেশ চালাতে বিশেষজ্ঞের দরকার নেই? এখানে গণতন্ত্রে নেতা হতে কোনো যোগ্যতা লাগে না। কিছু মানুষ নিয়ে গলাবাজি করতে পারলেই কাজ হয়ে যায়। এরা নেতা নয়, এরা গলাবাজ। এরা ভোটের জন্য মানুষকে লোভ দেখায়। এখানে সরকারি কাজে লোক নিয়োগ হয় লটারিতে। আসল কাজে কোনো বিশেষজ্ঞ নেই। দেশ চালায় গলাবাজরা আর তেলবাজরা। এটি দেশ শাসন নয়। এটি ছেলেখেলা।

এর মধ্যে সিমনের দোকানে এসেছে এনিতাস। তার চামড়ার ব্যবসা। সে সিমনের কাছে চামড়া বিক্রি করে। সক্রেটিসের মনে পড়ল, এই সেই লোক যে তার নামে উল্টা-পাল্টা বলে। পেরিক্লিসের বাড়িতে হেরোডোটাসের সিম্পোজিয়ামে সে সক্রেটিসকে সবার সামনে ধাক্কা মেরেছিল। ধমকও দিয়েছিল। এনিতাস পেছনে বসে ছিল। সে রাগে গজগজ করছে। সক্রেটিসের এত বড় সাহস! সে এথেন্সে বসে প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের নিন্দা করে? ওকে একটি শিক্ষা দিতে হবে।

এমন সময় সিমন বললেন, সক্রেটিস। তোমার সাথে দেখা করার জন্য সেই থেসালি থেকে একটি ছেলে এসেছে। ওর নাম মেনো[১০২]। ওর অনেক প্রশ্ন। জানার অনেক আগ্রহ। ও তোমার সাথে একটু একা কথা বলতে চায়।

সক্রেটিস বললেন, একা কথা বলতে চায়? এখানে এত মানুষ। এদের মধ্যে একা একা কথা বলব?

সিমন বললেন, উনি জ্ঞানের আশায় সেই পাঁচশ মাইল দূর থেকে আসছেন। জ্ঞানের জন্য চাতক পাখি না হলে এমন হয় না। চাতক পাখিকে সময় দাও।

সক্রেটিস দোকানের এক কোনায় বসলেন। তার সামনে চাতক পাখি মেনো জড়োসড়োভাবে হাঁটুগেড়ে বসেছে।

সক্রেটিস বললেন, উঠে বসো। জ্ঞানের কথা হয় সমান আসনে। এই মুহূর্ত থেকে আমি আর তুমি সমান। আমি যা বলব, ভালো লাগলে হ্যাঁ করবে, আর মন্দ লাগলে চিৎকার করে বলবে, মানি না। তাহলেই জ্ঞানের কথা জমবে।

মেনো উপরে উঠে বসল।

সক্রেটিস বললেন, সরাসরি আসল কথায় চলে যাও।

মেনো বলল, আমি শুনেছি আপনি সুন্দর জীবনের কথা বলেন। জীবন সুন্দর করার জন্য আমাদের সদগুণ (Virtue) দরকার। অন্তরের ভেতরের গুণ দরকার। তো এই সদগুণ কার কাছে শিখতে পারি?

সক্রেটিস বললেন, তার আগে বলো 'সদগুণ কী?

শুরু হলো প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা। সক্রেটিস আর মেনোর অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন আর পাল্টা প্রশ্ন দিয়ে আলাপ চলতে লাগল।

শেষে সক্রেটিস বললেন, সদগুণ হলো জ্ঞান। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, সেই জ্ঞান। এই জ্ঞান পেলে মানুষ ভালোটা করবে আর মন্দটা বাদ দেবে। সুন্দর জীবন পাবে। যতদিন ভালো আর মন্দের পার্থক্য করতে না পারবে, ততদিন এই গুণ অর্জিত হবে না। ততদিন সুন্দর জীবনও পাবে না।

মেনো বলল, এত সহজ! সদগুণ মানে ভালো-মন্দের জ্ঞান? আর কিছু নয়? এত আলাপ করে এই সহজ কথা বুঝলাম!

সক্রেটিস হাসছেন। পৃথিবীতে ভালো জিনিস যা আছে তা সবই সহজ। শুধু বুঝতে পারলেই হলো। প্যাঁচ দিয়ে কঠিন করে বলে মানুষ পণ্ডিতি দেখায় মাত্র। কিন্তু সত্যি হলো — সহজ করে বলতে পারাই পাণ্ডিত্য।

মেনো মনে মনে ভাবছে সে ঠিক বুঝল কিনা। সদগুণ মানে ভালো-মন্দের জ্ঞান। জ্ঞানই হলো শক্তি। সঠিক জ্ঞান থাকলে, মানে সঠিক পথটি জানতে পারলে, সেভাবে জীবন যাপন করা যায়। সেটিই হলো সুন্দর জীবন I

এমন সময় এগিয়ে এলো এনিতাস। সে বলল, বসতে পারি? সক্রেটিস তাকে হাসিমুখে বসালেন। বললেন, এসো, এনিতাস। এই হলো মেনো। ও জানতে চায় যে কার কাছে গেলে সে সদগুণ পাবে?

এনিতাস বলল, ওরে বাপ রে! গুণ, সদগুণ, অন্তরের গুণ। বহুত কঠিন কথাবার্তা। তো আমিও শুনি কে আমাদের গুণ শেখাতে পারেন।

সক্রেটিস বললেন, ডাক্তারি শিখতে হলে যেমন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, জুতা বানানো শিখতে হলে যেতে হয় পাদুকাশিল্পীর কাছে, তেমনই গুণ পেতে হলে এমন কারও কাছে যেতে হবে, যার সেই গুণ আছে।

'সে কে? কার সেই গুণ আছে?'

'তারা হলেন জ্ঞানপ্রেমিক বা দার্শনিক।'

দার্শনিক শব্দটা শুনেই এনিতাস ক্ষেপে গেল। চিৎকার করে বলল, দার্শনিক আবার কী জিনিস? আবার বলে জ্ঞানপ্রেমিক! যতসব বুগিজুগি কথা আসলে তুমি নিজে একজন সফিস্ট। সেজন্য সফিস্টদের পক্ষে কথা বলছো। আমার কাছে শোনো, সফিস্টরা হলো পয়সাখোর। তারা বাচ্চা পড়িয়ে রক্তচোষার মতো টাকা নেয়। তাদের কাছে শেখা যাবে গুণ?

সক্রেটিস তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

এনিতাস আবার বলল, তুমি আসলে কিছুই জানো না। তুমি একটু আগে গণতন্ত্রের নামে অনেক আজেবাজে কথা বলেছ। আমি সব শুনেছি। তুমি চাও গণতন্ত্র চলে যাক, স্বৈরাচার আসুক?

এনিতাসের গলায় তীব্র ঝাঁজ। রাগে চোখ বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে সে সক্রেটিসকে ভস্ম করে ফেলবে। সক্রেটিস কোনো অবস্থায়ই কারও সাথে ঝগড়া করেন না। তিনি শান্তভাবে তাকিয়ে আছেন।

এনিতাস বলল, এথেন্সে বসে গণতন্ত্রের নিন্দা করো?

সক্রেটিস বললেন, আমি দেশ চালাতে যোগ্যতার কথা বলছি। গণতন্ত্রেও যোগ্য লোক দরকার, সেই কথা বলছি।

এনিতাস বলল, তুমি কী বলেছ সেটি আমি শুনেছি। আমার লোক আছে চারদিকে। শোনো সক্রেটিস, সাবধান হও। তুমি গণতন্ত্রের এক নম্বর শত্রু। এখনও সাবধান হও। খুব বিপদে পড়বা।

চেরোফোন অনেকক্ষণ সহ্য করেছেন। তিনি এনিতাসের দিকে এগিয়ে এলেন। তার চোখে চোখ রেখে বললেন, হুমকি দিও না। তুমি একা গণতন্ত্রের নেতা নয়। আমরাও গণতন্ত্র ভালোবাসি।

এনিতাস চেরোফোনকে পাত্তাই দিল না। সে জানে যে চেরোফোন গণতন্ত্রের পক্ষের লোক। সে এটিও জানে যে এখানে চেরোফোন কোনো বিষয় নয়। সক্রেটিসই আসল পাণ্ডা। সে সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে বলল, শোনো, সক্রেটিস। আমি হুঁশিয়ার করে বলে দিচ্ছি, খুব খেয়াল করে শোনো:

'পৃথিবীর যেকোনো নগরে কারও ভালো করার চেয়ে খারাপ করা অনেক সহজ। এথেন্সে সেটি আরও বেশি সহজ। এখানে মন চাইলেও কারও উপকার করা যায় না, কিন্তু ইচ্ছা হলেই তাকে বিপদে ফেলা যায়।'

বলেই সে গটগট করে বের হয়ে গেল। এনিতাস হাঁটছে আর বিড়বিড় করছে, ওকে একটি শিক্ষা দিতেই হবে। আমি ওর নামে মামলা করব। এমন মামলা যেন কিছুতেই রেহাই না পায়।

সাথে ছিল এনিতাসের একজন দাস। সে বলল, কী মামলা দেবেন? ওনার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ আছে?

এনিতাস বলল, না, প্রমাণ নেই। ও খুব ধড়িবাজ। কাউকে গালি দেয় না, একা দেয় না, মারামারিও করে না।

'তাহলে সমস্যা কী? সে কী করে?'

'খালি লম্বা লম্বা কথা বলে। গণতন্ত্র বিরোধী কথা। কিন্তু কোনো প্রমাণ রাখে না। এর নামে মামলা দিয়ে লাভ হবে না।'

‘তাহলে কী করবেন?’

‘মামলায় কাজ হবে না। অন্য একটি প্যাঁচ দিতে হবে।’

‘চলেন, আচ্ছা রকম একটি পিটুনি দিয়ে দিই?’

‘ধুর, আমি গণতন্ত্রের নেতা। গণতন্ত্র হলো সভ্য মানুষের কারবার। এখানে মার-ধরের মতো অসভ্য কাজ হয় না।’

‘তাহলে কী করবেন?’

‘ওকে পিটুনিই দিতে হবে। কিন্তু সভ্য পিটুনি। গণতান্ত্রিক পিটুনি। আঘাত শরীরে লাগবে না, লাগবে অন্তরের গহিন ভিতরে।’

‘সেই আঘাত কী রকম?’

‘আছে, গণতন্ত্রে সেই রকম আঘাতের ব্যবস্থা আছে। সময় হলেই দেখতে পাবে।’

মেনো মাথা নিচু করে আছে। এথেন্সের মানুষ যে সক্রেটিসের সাথে এমন ব্যবহার করে, সেটি সে জানত না।

সক্রেটিস বললেন, দেখলে মেনো। এই হলো এথেন্সের অবস্থা। সে নাকি আবার নেতা! এথেন্সে কী সব মানুষ নেতা হচ্ছে। সে গালাগালি করে গেল।

মেনো বলল, ওর কথায় কী আসে যায়?

‘কিছুই আসে যায় না। ও যদি জানত যে, গালাগালির ফলে কী হতে পারে, তাহলে আর এসব করত না। ‘

‘তার মানে ঐ লোক ভালো-মন্দ জানে না। ও জ্ঞানহীন। জ্ঞানের অভাবেই আপনাকে গালাগালি করল।’

‘হ্যাঁ, জ্ঞানহীন। এরকম মানুষদেরই ভালো-মন্দের জ্ঞান শেখাতে হবে।’

‘কে শেখাবে?’

‘শেখাবেন জ্ঞানপ্রেমিকগণ, দার্শনিকগণ। তাদের কাছ থেকেই মানুষ সুন্দর জীবনের উপায় জানবে। যখন অনেক মানুষ সুন্দর জীবনের উপায় জেনে যাবে, সবাই মিলে সেই জীবনের অভ্যাস করবে, তখন জীবন সত্যিকার সুন্দর হবে।’

সক্রেটিস আবার বললেন, তবে জ্ঞান বিষয়ে আর একটি ব্যাপার আছে। মানুষ যখন জ্ঞানকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে, তখন তাকে বলে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা কাউকে শেখানো যায় না। প্রজ্ঞা হলো স্বর্গীয় জিনিস। যে এটি পায়, সে আপনা-আপনি পায়। একটি অবস্থায় যাওয়ার পর আর কোনো শিক্ষক থাকে না।

এখানে সক্রেটিস একটু ধোঁয়াটে। মনে হয় এনিতাস সক্রেটিসের মাথা আউলা করে দিয়ে গেছে। মেনো মুখে বলছে যে, সে বুঝেছে। কিন্তু প্রজ্ঞা কী জিনিস সেটি সে বোঝেনি। সে ভাবছে আমার সব বুঝে কাজ নেই। প্রজ্ঞা ব্যাপারটা সক্রেটিস বুঝলেই হবে।

মেনো যা বুঝেছে, তাতেই সে সক্রেটিসের অনেক বড় ভক্ত হয়ে গেল। যে আশা নিয়ে সে এসেছিল, তা পূরণ হয়েছে। এখন থেসালিতে ফিরে গিয়ে সক্রেটিসের মতো করে কথা বলবে। তার মতো সবাইকে বলবে, জ্ঞানই হচ্ছে সদ্‌গুণ (Knowledge is Virtue), জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি।

সক্রেটিসের সবকিছুই তার খুব ভালো লেগেছে।

মেনোর মতো অনেকেই এখন সক্রেটিসের কাছে আসে। দূর-দূরান্ত থেকে আসে। কয়েক দিন থাকে। সক্রেটিসের সাথে আলাপ করে। তার থেকে শিখে নিজের শহরে ফিরে গিয়ে সক্রেটিসের মতো কথা বলতে শুরু করে। এভাবে সক্রেটিসের কথা, তার ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছে গ্রিসের বিভিন্ন শহরে। গ্রিসের সকল নগরের মানুষ সক্রেটিসকে এক নামে চিনছে।

সক্রেটিস বিমূর্ত কোনো ধারণা নিয়ে কথা বলেন না, তার সবকিছু প্র্যাকটিক্যাল, কোনো কিছুই অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়। তিনি মানুষের জীবনের প্রতিদিনের সমস্যা, মনের উন্নতি এসব নিয়েই কথা বলেন। তিনি এমন জ্ঞানের কথা বলেন, যে জ্ঞানকে জীবনে ব্যবহার করা যায়। তাই তার কথা সহজ। অর্থ গভীর কিন্তু শুনতে খুবই সহজ। মানুষের কাছে মনে হয়, সে তার নিজের কথা শুনছে। তাই তরুণরা সক্রেটিসকে ভালোবাসে, দূর থেকে ছুটে আসে তার কাছে, দূরে নিয়ে যায় তার ভাবনা।

***

১০০. খ্রিস্টপূর্ব ৪২৮/৪২৭ অব্দে এথেন্স মিতিলিন শহর অবরোধ করে, যেটি 'Siege of Mytilene 'নামে পরিচিত। তবে পরদিনই গণহত্যার আদেশ বাতিল করে, সেখানে গণহত্যা হয় নি।

১০১. এথেন্সের গণতন্ত্রের বিষয়ে সক্রেটিসের এই মনোভাব প্লেটো তার Protagoras নামক সংলাপে বলেছেন।

১০২. প্লেটো Meno নামে একটি ডায়ালগ লিখেছেন, যেখানে সক্রেটিস Virtue (সদগুণ) ব্যাখ্যা করেছেন। এই সংলাপে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে মামলাকারী 'এনিতাস'-এর সাথে তার কথা কাটাকাটির কথাও বিস্তারিত আছে।

৪৩

‘আমাদের শোনার জন্য দুটি কান,
বলার জন্য একটি মুখ দেওয়া হয়েছে,
তাই আমরা বলব কম, শুনব বেশি।’
—জেনো

একটি ছেলে কথায় কথায় চুটকি বলে।

ছেলেটির নাম এরিস্টোফানিস[১০৩]। এক্রোপোলিসের খুব কাছেই তার বাড়ি।

গণতন্ত্রে মানুষ কথা বলতে পারে। মত প্রকাশ করতে পারে। যা ইচ্ছা বলা যায়। কেউ বাধা দেয় না। যে কারও নামে যে কোনো মজা করা যায়। কেউ রাগ করতে পারে না। হাসি-ঠাট্টা গণতন্ত্রের নাগরিক অধিকার।

সেজন্য এথেন্সের তরুণরা সব সময় হাসি-ঠাট্টা করে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। ধনীর দুলালরা মাস্টার রেখে বক্তৃতা দেওয়া শেখে, কিন্তু স্কুলের বয়স শেষ হয়ে গেলে দেখে, তাদের বক্তৃতা দেওয়ার জায়গা নেই, অন্য কোনো কাজও নেই। সবার বাড়িতে দাস-দাসী আছে। নিজের কিছুই করতে হয় না। শুধু যুদ্ধ লাগলে সরকার থেকে ডাক পড়ে। বাকি সময় বসে বসে গলির মুখে আড্ডা মারা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই। এই অফুরন্ত সময়ে তাদের কিছু একটা তো করতে হবে।

তাই সমবয়সীরা একত্র হলে তারা অশ্লীল কৌতুকের ঝাঁপি খুলে বসে। কিন্তু ঐসব কৌতুক তো আর সবার সামনে করা যায় না। সবার সামনে মজা করার জন্য তারা এথেন্সের নেতাদের নিয়ে চুটকি বানায়। বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে ছড়া বানায়। এটি এখন এথেন্সের সংস্কৃতির অংশ।

কৌতুক, ছড়া, চুটকি সবকিছুতেই এরিস্টোফানিস সবচেয়ে পাকা। ছেলেটির বয়স মাত্র বিশ বছর। কিন্তু একেবারে ঝুনা নারকেল। সারাদিন যা তা নিয়ে পিন মারতে থাকে। পিনমারা কথার বেশিরভাগই অশ্লীল। কিন্তু মুখে মিঠা ভরা। অশ্লীল হলেও রাগ করা যায় না, হাসি পায়। পাহাড়ের নিচে রকের উপর বসে থাকে, কিন্তু রকবাজি করে না, যেটি করে সেটিকে ফস্কেমি বলা যায়। ছোটবেলা থেকেই সে পড়াশুনায় একেবারে এক নম্বর, প্রখর স্মরণশক্তি কিন্তু দোষ ঐ একটিই— বেহুদা চুটকি বলে।

এই রকম অশ্লীল রসিকতা করে দেখে বুড়োরা তার কাছে বেশি আসে না। জ্ঞানীরা তাকে এড়িয়ে যায়। একদিন এক সদয় জ্ঞানী লোক তাকে বলল, তুমি তো ভীষণ মজার মজার কথা বলো। এক কাজ করো। এভাবে ঘাটে-পথে ফস্কেমি না করে, এগুলো লিখে

ফেলো। তোমার ভেতরে জিনিস আছে, কলম হাতে নাও, নোংরা কথা কমাও, বুদ্ধির খোঁচা বাড়াও। তোমাকে দিয়ে হবে।

কথাটি ভালো লাগল এরিস্টোফানিসের। সে সাহস করে লিখতে শুরু করল। লেখায় বাজিমাৎ। যা লিখে একেবারে রসে ভরে যায়। মানুষ না হেসে পারে না। ছোট ছোট চুটকি লিখে সে একে ওকে দেয়। সবাই হেসে কুটিকুটি। বন্ধুরা তার নাম দিয়েছে চুটকির ডিব্বা।

এই চুটকির ডিব্বা গত বছর বড় একটি চুটকি লিখে নিজেই পাড়ার থিয়েটারে অভিনয় করেছে। দেখে সবাই বলেছে এমন হাসির কাণ্ড নাকি তাদের জীবনেও হয়নি। এতে সাহস হয়েছে। এখন সে বড় করে হাসির কাহিনি লিখবে। পাড়ার থিয়েটারে নয়, এথেন্সের সবচেয়ে বড় ডিওনিসাস থিয়েটারে নিয়ে যাবে। সফোক্লিস, ইউরিপিডিসরা যেখানে ট্র্যাজেডি করে, সেখানে সে হাসির নাটক করবে।

সে ভাবছে, ট্র্যাজেডি ভালো জিনিস, কিন্তু এই ট্র্যাজেডির সাথে একটু হাসি যোগ হলে একেবারে সোনায় সোহাগা হবে। ঠিকভাবে হাসিটুকু যোগ করতে এই নাট্যকারগণ পারেন না। আমি সেটিই করব। আমি মানুষকে নতুন জিনিস দেব। মানুষ হাসতে হাসতে কাঁদবে, কাঁদতে কাঁদতে হাসবে।

ও যা করে, তাতেই মানুষ হাসে। কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে হয় না। এমন সব সংলাপ বলে যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। তার একটি ভালো দিক হলো, সে যুদ্ধ দুই চক্ষে দেখতে পারে না। তার কথা হলো মানুষ পৃথিবীতে আসে আনন্দ করতে। আনন্দ না করে যারা যুদ্ধ করে সময় নষ্ট করে তারা মূর্খ, মহামূর্খ। সে বলে, এথেন্স এখন মহামূর্খের মতো একটি যুদ্ধ করছে। একেবারে খামাখা, বেহুদা যুদ্ধ। এখুনি এই যুদ্ধ বন্ধ হোক। সে কলম হাতে নিল। লিখে ফেলল যুদ্ধ বিরোধী একটি চমৎকার হাসির নাটক। নাম দিল আখারনিয়ান[১০৪]। কাহিনি এমন:

এক সৈনিক যুদ্ধে আহত হয়েছে। তার শরীর মন আর যুদ্ধ চাইছে না, সে শান্তি চায়। সে পিনিক্স পাহাড়ে যায়, এথেন্সের নেতাদের সাথে কথা বলে। কিন্তু নেতারা কেউ শান্তি চায় না, যুদ্ধ বন্ধের কোনো আলাপ নেই। তখন ওই সৈনিক নিজে উদ্যোগী হয়ে দেবতাদের সাহায্যে স্পার্টার সাথে একটি শান্তিচুক্তি করে যুদ্ধ বন্ধ করে ফেলল।

নাটক তো লিখে ফেলেছে, কিন্তু তার বয়স মাত্র উনিশ বছর। রাজনীতি নিয়ে নাটক লেখার বয়স হয়নি। লোকে কী বলবে! এই নাটক মঞ্চে অভিনয় করতে তার বুক কাঁপে। সে একজন ভালো অভিনেতার কাছে গেল। তার নাম ক্যালিস্ট্রাটাস। অভিনেতা নাটক পড়ে অবাক। এই বাচ্চা ছেলে এরকম জিনিস লিখেছে! সে বলল, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, আমি আমার নামে এই নাটক করব। তোমার কোনো ভাবনা নেই, যদি কেউ গালি দেয়, আমাকে দেবে, তোমাকে কেউ ফুলের টোক্কাও দিতে পারবে না।

লিনিয়া উৎসবে নাটকটি মঞ্চস্থ হলো। হয়ে গেল সেরা নাটক। পেল প্রথম পুরস্কার। পুরস্কার নিল অভিনেতা। নাট্যকারকে কেউ চেনে না। তবু নাট্যকার খুশি। তার নাটক লোকে পছন্দ করছে, এটিই যথেষ্ট, নাম তার একদিন হবে।

তার সাহস বেড়ে গেল। এবার সে সরাসরি আক্রমণ করবে নেতাদের। গণতন্ত্রের নামে ভণ্ডামিকে আক্রমণ করবে। এথেন্সের নেতা ক্লিয়ন মিতিলিনের সব মানুষকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, সেটি নিয়ে নাটক লিখল। নাম দিল 'ব্যাবিলোনিয়ান'[১০৫]। এটিও অভিনয় করবে অভিনেতা ক্যালিস্টাটাস, নাট্যকারকে কেউ চিনবে না।

এই নাটকে বিশ্রীভাবে দেখানো হলো অন্য নগরগুলো হলো এথেন্সের দাস, এথেন্স তাদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। নাটক দেখে ক্লিয়ন একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। নাটকে এথেন্সকে অপমান করা হয়েছে। সে মামলা করল। যেই মামলা হলো অমনি অভিনেতা বলল, নাটক লিখেছে এরিস্টোফানিস, আমি কিছুই জানি না। অভিনেতা তাকে বলেছিল, তোমার গায়ে কেউ ফুলের টোক্কাও দিতে পারবে না। কিন্তু ফুলের টোক্কা আসার আগেই অভিনেতা পালিয়ে গেল। সকলের সামনে এলো পিচ্চি এক নতুন নাট্যকার।

আদালতে সকলে অবাক! এই বাচ্চা ছেলে এরকম নাটক লিখেছে! এ তো প্রতিভার হাঁড়ি। তার মামলা নিয়ে সংসদে ভোট হলো। সবাই বলল, আহা রে, বাচ্চা ছেলে, একেবারে আগুনের ফুলকি। এই ছেলেকে আদালতে ডেকে এনেছে? ও নাটকে তো মিথ্যা বলেনি। আমরা মিতিলিন শহরের সাথে যা করেছি, তা মানুষ দাসদের সাথেও করে না। নাট্যকারের বিরুদ্ধে মামলা বাতিল কর। হলো।

আদালত থেকে বের হয়েই কলার ঝাঁকুনি দিল এরিস্টোফানিস। দেখি, এবার আমাকে কে আটকায়! সে এখন আহত সিংহ। হুংকার দিয়ে সব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবার সে দেখে নেবে। কলম কী করতে পারে, এবার দেখিয়ে দেবে। ক্লিয়ন তার নামে মামলা করেছে, ক্লিয়নকে সে চরম শিক্ষা দেবে। সেই রাতেই লিখতে বসল নতুন নাটক। এবার কোনো রাখঢাক নেই। সে মুখোশ খুলে দেবে। ক্লিয়নকে নিয়ে লিখে ফেলল নাটক। নাম: 'নাইটস'[১০৬] বা নেতা

নাইটস নাটকের কাহিনি এমন:

নাটকের একটি চরিত্রের নাম ডিমোস, মানে জনগণ। তাদের মিথ্যে আশ্বাস আর মিষ্টি কথা দিয়ে ক্লিয়নের মতো দুষ্ট নেতারা সব লুটে নিচ্ছে। জনগণ বুঝতে পারছে না। শেষে এক চতুর লোক তাদের মুখোশ খুলে দেয়, ক্লিয়নের মতো দুষ্ট নেতা পালিয়ে যায়। এরিস্টোফানিস লিখল—

'হে এথেন্সের জনগণ, দেশের ধন তো তোমার ধন
ওরা সব নিল কেড়ে, মিষ্টি কথায় ছুরি মেরে

কিছুই তুমি বুঝলে না রে।
ক্ষমতা তোমার হাতে, তবু নুন জোটে না তোমার পাতে?
তোমার মুখে কাঁচকলা শুধু, খাচ্ছে ঘি যদু আর মধু
তবু রয়েছো চুপ করে- হে বেকুব জনগণ?
বুঝেছি, তুমি গিয়েছিলে বাঁশবন
বাঁশ খেয়ে হারিয়ে ফেলেছো মন।'[১০৭]

নাটক দেখে মানুষ হেসে একেবারে লুটোপুটি। মানুষ দেখছে, এই ছেলে তো আমাদের কথা বলেছে। দর্শক সারিতে প্রথমেই নেতা ক্লিয়ন বসা। ক্লিয়নের সামনেই তাকে গালাগালি দিচ্ছে। একটি করে গালি দেয়, আর দর্শকরা হাততালি দেয়। ক্লিয়ন টের পাচ্ছে সে কেমন চিপায় পড়েছে। এর নাম গণতন্ত্রের মাইনকা চিপা। কিচ্ছু করার নেই। সে রাজা নয়। সে গণতন্ত্রের নেতা। গণতন্ত্রে কথা বলার অধিকার আছে। তাই সহ্য করতে হবে।

ক্লিয়নের আর কিছুই করার নেই। সে ভাবল আর এইসব পুঁচকে নাট্যকারের পিছে লাগবে না। সে ভোটের রাজনীতি করবে। নাটকে আর আসবে না।

এথেন্সে শুরু হলো নতুন এক নাট্যধারা। এর নাম কমেডি বা প্রহসন। এটি জন্ম দিলেন তরুণ নাট্যকার এরিস্টোফানিস।

***

সকাল সকাল এরিস্টোফানিসের বাড়িতে কড়া নাড়ছে।

বাইরে থেকে জোরে জোরে ডাকছে, রসিকরাজ বাড়ি আছো? ওহে রস সম্রাট, রসিক চূড়ামণি, আছো নাকি?

নাট্যকারকে ডাকছে এনিতাস। দাস খবর দিল। নাট্যকার অবাক। এনিতাসের মতো বড় একজন গণতন্ত্রী নেতা তার মতো বাচ্চার কাছে এসেছে? নিশ্চয়ই ঘটনা সাংঘাতিক। তার নামে নতুন মামলা করবে নাকি? ভয়ে ভয়ে সামনে এলো নাট্যকার।

এনিতাস হাসি মুখে বলল, তোমার গুণে মুগ্ধ হয়ে দেখা করতে এলাম। তুমি তো সারা এথেন্স নাড়িয়ে দিয়েছ।

নাট্যকার একটু হাসি দিল। মুখচোরা হাসি। সে এনিতাসের মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। তার চিন্তা লাগছে। অল্প সময়ের মধ্যেই চিন্তা দূর হলো। এনিতাস এমন প্রশংসা করছে, বাচ্চা নাট্যকার আহ্লাদে একেবারে গদগদ হয়ে যাচ্ছে।

এনিতাস বলছে, শোনো, রসিকরাজ, তোমাকে আমি রসিকরাজ ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকব না কিন্তু! তুমি এমন কাজ করেছ যে, নাটক কী জিনিস মানুষ সেটিই নতুন

করে বুঝতে শিখল। জানো, কালকে ওরা কী বলাবলি করছিল?

'কী বলছিল?'

'বলছিল, তোমার হাসির নাটকের কাছে নাকি সফোক্লিসের নাটকও কিছুই নয়।'

'ধুর, কী সব বলছেন! মশকরা করছেন।'

'তোমার সাথে কি আমার মশকরার সম্পর্ক? শোন, সফোক্লিস সত্যিই ভয় পেয়েছেন। আর ইউরিপিডিসের তো পাত্তাই নেই।'

এরিস্টোফানিস আরও ফুলতে শুরু করল। তার মনে হচ্ছে, এই লোকটি তার পরম বন্ধু। বন্ধু ছাড়া এমন করে কেউ প্রশংসা করে? কেমন মধুর করে বলছে! ওনার প্রতিটি কথা একেবারে ধ্রুবতারার মতো সত্য। এতদিনে নাটকের একজন সত্যিকার সমঝদার তার কদর করছে। এনিতাসের মতো সিনিয়র নেতা কি তাকে মিথ্যে বলতে পারে? তাহলে সত্যিই সে সফোক্লিস আর ইউরিপিডিসের সমান হয়ে উঠেছে! তারা তাকে ভয় পাচ্ছেন?

এনিতাস বুঝল, তার কাজ হচ্ছে। সে পিচ্চি নাট্যকারকে দিয়ে একটি কাজ করাতে এসেছে। তার কথায় নাট্যকারের ভেতর আগুনটা জ্বলে উঠেছে। এখন আর একটু হাওয়া দিতে হবে। সে বলল, আবার শুনলাম ইউরিপিডিস তো নাটক লেখাই ছেড়ে দেবেন। তিনি বুঝে গেছেন, তোমার মতো নতুন প্রতিভার কাছে পারবেন না।

এতক্ষণে নাট্যকার পুরোপুরি গলে গেছে। এনিতাস জানত, বাইশ বছরের ছেলেকে বশে আনতে তার বেশি সময় লাগবে না।

নাট্যকার বলল, না না, সে কী! আপনি ইউরিপিডিসকে বলেন, তিনি যেন নাটক লেখা বন্ধ না করেন। খালি মাঠে গোল দিয়ে বাহাদুর হতে চাই না।

এনিতাস বলল, ইউরিপিডিসের যা খুশি করুক। ও তো এমনিতেই একটি মাকাল ফল। তাকে নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা তোমাকে নিয়ে।

'আমাকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ, তোমার জন্য একটি প্লট এনেছি।'

'প্লট? নাটকের কাহিনি?'

'তো আবার কী? তুমি হলে হাসির সম্রাট, আমাদের রসরাজ। তুমি এমন কাজ করবে যেটি সারা পৃথিবীর লোক জানবে। তোমার সংলাপ মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে। যুগের পর যুগ তোমার নাটক মানুষ করবে। তুমি তো হোমারের সমান হয়ে যাবে!'

'হোমার?'

'তো আবার কী! তোমার কলমে যে কী রকম জাদু আছে, তা তুমি নিজেও জানো না। খালি সাহস করে কয়েকটা কালজয়ী নাটক লিখতে হবে। তার জন্য ভাবনা নেই। আমি তোমার জন্য একটি প্লট নিয়ে আসছি। খুবই বাহারি প্লট।'

'কাহিনি কী নিয়ে?'

‘কাহিনি হলো সক্রেটিস।’

এরিস্টোফানিস কিছুই বুঝতে পারছে না। অস্ফুট স্বরে বলল, সক্রেটিস? সক্রেটিস একটি কাহিনি?

এনিতাস বলল, হুঁম, সক্রেটিস হলো বিরাট এক কাহিনি। সে অদ্ভুত এক জিনিস। তোমার নাটকের জন্য এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হতে পারে না।

নাট্যকারের চোখ পিটপিট করছে। সে এখনও বিষয়টি বুঝতে পারছে না। এনিতাস কি সক্রেটিসকে নিয়ে নাটক লিখতে বলছে?

এনিতাস বলল, মানুষের চরিত্র নিয়ে নাটক লেখার ক্ষমতা তোমার মতো আর কারও নেই। তুমি ক্লিয়নকে নিয়ে যেরকম নাটক লিখেছ ‘নাইটস’, ঐ রকম একটি নাটক লিখবে সক্রেটিসকে নিয়ে।

‘কিন্তু কেন? সক্রেটিস কী করেছে?’

‘সক্রেটিস কী করেনি? সে এথেন্সের সব ছেলেপেলেকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে। সে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে। তুমি এসব জানো না? ছিঃ ছিঃ, তোমার মতো জ্ঞানী ছেলে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খেয়ালই করোনি?’

এনিতাস এমন করে বলল, যেন সক্রেটিসের কুকীর্তি খেয়াল না করা বিরাট অন্যায়।

নাট্যকার লজ্জা পেয়ে বলল, না, না, খেয়াল করেছি তো। সক্রেটিস তো দিন-রাত আগোরার আশেপাশে তরুণদের নিয়ে আড্ডা দেয়।

‘আড্ডা না ছাতা! ও যুবকদের কানপড়া দেয়।’

‘কী দেয়?’

‘কানপড়া। মানে কুবুদ্ধি। বাড়িতে গিয়ে ছেলেরা আর বাবা-মাকে মানে না।’

‘তাই নাকি?’

‘হুঁম, যুব সমাজ হলো দেশের ভবিষ্যৎ। দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলছে সক্রেটিস। এর প্রতিবাদ করতে হবে। তোমার মতো বুঝদার যুবককেই করতে হবে। বলো, ঠিক কিনা?

‘ঠিক। আমার কাজই তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। আমার নাটকের আসল উদ্দেশ্য হলো সমাজের দুষ্ট লোকদের মুখোশ খুলে দেওয়া।’

‘ষোল আনা খাঁটি কথা। সক্রেটিসের মতো দুষ্ট লোক এথেন্সে আর কেউ আছে? দাও, ওর মুখোশ খুলে দাও। ওঠো, কলম ধরো, রসরাজ। এমন কিছু লিখো যাতে এথেন্সের মানুষ শয়তান সক্রেটিসের আসল রূপ জানতে পারে।’

নাট্যকার এখনও নিশ্চিত নয়, কী করা উচিত? সক্রেটিস কী আসলেই নাটক লেখার মতো খারাপ একটি চরিত্র? সে কিছুই বলছে না।

এনিতাস বলল, শোনো, নাটকের খরচাপাতি যা লাগে, আমিই দেব। তোমার কোনো চিন্তা নেই। তুমি তো এখন উদীয়মান তারকা। তোমাকেও আমি খুশি করে দেব। সম্মানী

ভালোই পাবে। লেখা শুরু করো। দেবী এথিনার নামে শুরু করে দাও।

লেখক এখনও ভাবছে একজন দার্শনিককে নিয়ে উল্টাপাল্টা লেখা কী উচিত? এনিতাস কি তাকে ব্যবহার করছে? সক্রেটিসের সাথে এনিতাসের কি কোনো শত্রুতা আছে? আর একটু জানা দরকার। আমি কি ভাড়ায় খাটা লেখক হয়ে যাব?

সে বলল, ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে দেখি। আপনাকে জানাব।

এনিতাস দেখল, পিচ্চি লেখক পয়সার টোপ গিলছে না। পিছলে যাচ্ছে।

সে বলল, আমি সফোক্লিসকে বললে এক কথায় লিখতে বসে যাবে। এমন গরম কাহিনি সে ছাড়বে না। কিন্তু আমি চাচ্ছি তোমার মতো একজন যুবককে কাজটি দিতে। তুমি না পারলে, বলো। আমি সফোক্লিসের বাড়ি যাই।

এনিতাসকে নাট্যকার যতটা সহজ ভেবেছিল, সে তত সহজ নয়। সে বিরাট প্যাচের লোক। এক কথায় রাজি না হওয়ায় সে সফোক্লিসকে দিয়ে লেখানোর হুমকি দিচ্ছে। লেখক ভাবছে বড় একটি কাজ ফস্কে যেতে পারে।

সে বলল, তাহলে সক্রেটিসকে একদিন ভালো করে দেখে আসি। নাটক নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে, বহুদিন সক্রেটিসের চালচলন নিজের চোখে দেখিনি। এনিতাস ভাবল, এই ছেলেকে সক্রেটিসের সামনে পাঠানো যাবে না। বাচ্চা ছেলে, সক্রেটিসের সাথে মিশলেই তার ভক্ত হয়ে যাবে। তার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আর নাটক লিখবে না।

সে বলল, আরে ধুর, ওর কাছে যাওয়ার কী দরকার? ও তুকতাক জানে, ধুলাপড়া জানে। তুমি কাজটা শুরু করো। সময় নষ্ট কোরো না। ওর ব্যাপারে কী জানতে চাও বলো। আমি ওর হাঁড়ির খবর জানি, হাড়ে হাড়ে চিনি। তুমি লেখা শুরু করো। কিছু জানার থাকলে আমার কাছে জিজ্ঞেস কোরো

নাট্যকার আমতা আমতা করছে। এনিতাস বলল, শোনো, আরেকটা কথা। তুমি যে এটি লিখছ, সেটি যেন কাক-পক্ষীতেও টের না পায়। খুব গোপনে করতে হবে। জানব শুধু তুমি আর আমি।

নাট্যকার এখনও চুপ। এনিতাস বলল, শোনো, তুমি তো হোমার হবে? হোমার হতে হলে একটি বড় ঝাঁকুনি দিতে হবে। সবচেয়ে বড় গাছকে ঝাঁকুনি দিতে হবে। সক্রেটিস হলো সেই বড় গাছ। গাছটা যদি তোমার ঝাঁকুনিতে উল্টে পড়ে, তাহলেই তুমি হোমার হয়ে যাবে। রাজনীতি বলো আর সাহিত্য বলো, সবখানেই এই নিয়ম

এরিস্টোফানিস বলল, সক্রেটিসের দুই-একজন বন্ধুর নাম বললে ভালো হতো। হাসির নাটকে ভাঁড়ামি করতে বন্ধু লাগে। বন্ধু সব কথায় হয় হয় করবে। মজার কাণ্ড-কারখানা করবে।

এনিতাস খুশি হলো। নাট্যকার টোপ গিলে ফেলেছে। তার কাজ হাসিল।

সে বলল, সক্রেটিসের তো হাজার হাজার বন্ধু। সবগুলোই এক-একটি জিনিস। তাদের মধ্যে কৌতুক করার চরিত্র হিসেবে তুমি যাকে নিতে পার, তার নাম ‘চেরোফোন।’

সে ভালোই লাফালাফি করে।

***

জানুয়ারি মাস। আকাশ ঝকঝকে।

আকাশ আর সাগর মিলে চারধারে নীল আর নীল। কোথাও ছিটেফোঁটাও মেঘ নেই। কিন্তু সারা এথেন্সের মানুষ বলছে, চল, 'মেঘ' দেখতে যাই। 'মেঘ' দেখতে যাই। বিকেল হতেই তারা লাইন দিয়ে হেঁটে চলছে। 'মেঘ' দেখবে।

'মেঘ'[১০৮] একটি নাটকের নাম। এথেন্সের রসিকরাজ এরিস্টোফানিস লিখেছে নাটক। সে নিজেই আজ বিকেলে অভিনয় করবে নাটকটি।

সক্রেটিস সেজেগুঁজে তৈরি। তিনিও নাটক দেখতে যাবেন। তিনি নিজে থেকেই যাবেন। কারণ আজ যে নাটক অভিনয় হবে, সেটির প্রধান চরিত্র সক্রেটিস নিজে। জীবন্ত সক্রেটিস দেখবেন মঞ্চের সক্রেটিসকে।

সক্রেটিস জানেন না কী দেখানো হবে সেই নাটকে। তবে খুব ভালো কিছু যে হবে না, সেটি নিশ্চিত। যে নাট্যকার লিখেছে, সে বিদ্রূপ করে হাসি-ঠাট্টার নাটক লেখে। সে যাকে ধরে, তার চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করে দেয়। তাই আজ থিয়েটারে সক্রেটিসের ইজ্জতের বারোটা বাজার সম্ভাবনা আছে।

চেরোফোন বললেন, আমাদের নাটক দেখার জন্য লাইন ধরে মানুষ যাচ্ছে। থিয়েটার নাকি হাউজফুল হবে।

সক্রেটিস বললেন, আমাদের নাটক মানে কী? আমি তো জানি আমাকে নিয়ে নাটক।

চেরোফোন বললেন, তোমাকে নিয়েই নাটক। তোমার সাথে আমিও নাটকের একটি চরিত্র।

সক্রেটিস বললেন, বাহ, আমরা তো বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের বিখ্যাত করে লাভটা কার হবে, সেই খবর বের করতে পেরেছ?

চেরোফোন বললেন, লাভ হবে এনিতাসের। থিয়েটার যাতে ভরে যায়, সেজন্য এনিতাস তুমুল আয়োজন করেছে। লোকের বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে। তোমার নিজের মহল্লাতেই বেশি করে প্রচার করেছে। এমন প্রচার আগে কোনো নাটকের জন্য হয়নি।

ক্রিতো আর সিমন যাবেন না। তারা সক্রেটিস আর চেরোফোনকে যেতে মানা করেছেন। কিন্তু তারা যাবেনই। সক্রেটিসের যুক্তি, আমাকে নিয়ে মানুষ কী লিখে সেটি নিজের চোখে দেখা আমার কর্তব্য। আর চেরোফোন বলেছেন, লেখা হলো গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতন্ত্রে আমরা কাউকে কোনোকিছু লিখতে বাধা দিই না। তার লেখার কাজ

সে লিখছে, যারা অভিনেতা তারা অভিনয় করবে, আর তোমার আমার কাজ হলো নাটকটা দেখা। আমরা দেখব।

জেনথিপি যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সক্রেটিস না করেছেন। নাটকে তো ভালো কিছু দেখাবে না। স্বামীর নামে উল্টা-পাল্টা দেখে শেষে থিয়েটারেই কেঁদে-কেটে অস্থির করে ফেলবেন। সেজন্য জেনথিপি যাচ্ছেন না।

সক্রেটিস আর চেরোফোন যাচ্ছেন থিয়েটারে। শত শত মানুষ যাচ্ছে সেই পথে। এনিতাসের প্রচারে কাজ হয়েছে। মহল্লার সবাই হাঁটা শুরু করেছে।

রাস্তায় নানান জায়গায় পোস্টার চোখে পড়ছে। পেপিরাস কাগজের পোস্টারে ছেয়ে গেছে আগোরা। পোস্টারে বড় বড় করে লেখা,

সুখবর, সুখবর, সুখবর
এই প্রজন্মের সবচেয়ে হাসির, সবচেয়ে মজার নাটক
মঞ্চে আসছে হাসির সম্রাট, উদীয়মান তরুণ নাট্যকার, রসরাজ এরিস্টোফানিস
নাটকের নাম : মেঘ।
স্থান : ডিওনিসাস থিয়েটার, এক্রোপোলিস।
সময় : আগামী শুক্রবার, বিকেল চার প্রহর গতে।

পোস্টারের ডান দিকে ডিজাইন করে লেখা:

সক্রেটিসকে চিনেন? না, আপনি চিনেন না। তাকে চিনতে হলে এই নাটক আপনাকে দেখতেই হবে।

পোস্টারে চোখ বুলিয়ে সক্রেটিস বললেন, হ্যাঁ, ওরা যখন লিখেছে, সক্রেটিসকে চিনতে এই নাটক দেখতেই হবে; চলো, দেখে আসি সক্রেটিস কেমন

চেরোফোন গম্ভীর। তার চিন্তা হচ্ছে। তিনি কিছু কথা শুনেছেন। এনিতাস নাকি সক্রেটিসকে অপমান করতে নিজের পকেটের পয়সায় এই নাটক করিয়েছে। তবু তারা থিয়েটারে পৌঁছে গেলেন।

থিয়েটার কানায় কানায় ভরা। বসার জায়গা নেই। অনেক মানুষ দাঁড়িয়েও আছে। সক্রেটিস আর তার বন্ধুদের জন্য সামনের সারিতে জায়গা রেখে দিয়েছে এনিতাস। সক্রেটিস সেখানেই বসলেন। নিজেকে মঞ্চে দেখবেন। ভালো করেই বসলেন।

নাটক শুরু হলো। মঞ্চে এরিস্টোফানিস অভিনয় করছে। নাটকের কাহিনি এমন: নাটকের সক্রেটিসের একটি দোকান আছে। দোকানের নাম 'চিন্তার দোকান'। সে চিন্তা বিক্রি করে। অনেক দাম চিন্তার। এক বাবা সক্রেটিসের কাছে এসেছে তার ছেলেকে নিয়ে। সেই চিন্তার দোকানে ছেলেকে ভর্তি করাবে। ছেলে যাতে ভালো বক্তৃতা শিখে নেতা হতে পারে সেজন্য। তো ছেলের বাবা এসে ডাকছে, 'সক্রেটিস, সক্রেটিস।' সক্রেটিস

বলছে, 'আমি এখানে।' কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক খুঁজে দেখা গেল— সক্রেটিস অনেক উপরে ঝুলছে। তাকে একবার দেখা যায়, আবার হারিয়ে যায়, সে মেঘের মধ্যে ভাসছে। বাবা অবাক! সক্রেটিস বলল, 'শোনো, দেবতা বলতে কিছুই নেই, জিউস বলতে কেউ নেই।' বাবা বলল, 'তাহলে বৃষ্টি দেয় কোন দেবতা?' সক্রেটিস বলল, 'বৃষ্টি দেয় মেঘ। তাই মেঘ হলো দেবতা। জিউস বলতে কেউ নেই।' বাবা মনে করল, বাহ, কী সুন্দর যুক্তি! সক্রেটিস তো বিরাট কাবিল মানুষ। সে তার ছেলেকে সক্রেটিসের 'চিন্তার দোকান'-এ শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়ে দিল।

মঞ্চে তুমুল অভিনয় হচ্ছে। সারা থিয়েটার হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। দর্শকরা দুয়ো ধ্বনি দিচ্ছে, 'সক্রেটিস ভুয়া, ভুয়া। সবাই নাটক দেখছে আর সামনের সারিতে সক্রেটিসের দিকে তাকাচ্ছে।

সক্রেটিস প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হচ্ছেন। তার কান লাল হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ক্রিতোও এসেছেন থিয়েটারে।

ক্রিতো বললেন, চলো, বের হয়ে যাই।

সক্রেটিস বললেন, না, সেটি ঠিক হবে না। তাতে কাল সকালে লোকজন আরও বেশি ঠাট্টা করবে।

সক্রেটিসের ঠিক উল্টো পাশে বসেছে এনিতাস। নাটক চলছে আর সে বলছে, বাহ, চমৎকার।

মঞ্চে অভিনয় চলছে। তুমুল অভিনয় করছে এরিস্টোফানিস। অভিনয় চলছে: একজন বলছে সক্রেটিসের চিন্তার দোকান কই? সক্রেটিস কাপড় খুলে ন্যাংটা হয়ে পশ্চাৎদেশ দেখিয়ে বলল, এই যে এখানে।

সারা থিয়েটার হাসিতে ফেটে যাচ্ছে। সক্রেটিসও হাসছেন। এখানে কান্না করা যাবে না।

মঞ্চে অভিনয় চলছে: নাটকের সক্রেটিস বলছে, জিউস বলতে কোনো দেবতা নেই। দেবতা হলো মেঘ, আজ থেকে কেউ আর জিউসকে ডাকবে না, সবাই ডাকবে 'মেঘ' দেবতাকে।

দর্শকরা চিৎকার করে বলছে,

সক্রেটিস ভুয়া, দেবতাকে মানে না।
সক্রেটিস ভুয়া, জিউসকে মানে না।

মঞ্চে কাহিনি এগোচ্ছে, ছেলেটি সক্রেটিসের কাছে শিক্ষা লাভ করে বাড়িতে ফিরে গেল। বাড়িতে গিয়ে সে বাবাকে পিটাচ্ছে। বাবা বলছে, আমাকে মারছিস কেন? ছেলে

বলছে, সক্রেটিস শিখিয়েছে, বাবা ভুল করলে বাবাকেও পিটাতে হবে। ছেলে ইচ্ছা মতো মারছে বাবাকে, রক্ত বের হচ্ছে।

দর্শকরা আবার দুয়ো দিচ্ছে—

সক্রেটিস ভুয়া, শিক্ষক নামের কলঙ্ক
সক্রেটিস ভুয়া, বাবা-মায়ের আতঙ্ক।

সক্রেটিসের মনে হচ্ছে স্লোগান সব ঠিক করা। তিন-চারজন একসাথে স্লোগান ধরছে, তাদের সাথে গলা মিলাচ্ছে সারা থিয়েটারের মানুষ। স্লোগানও কি এনিতাস আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে?

এনিতাসের মুখে হাসি। সক্রেটিসের মনে হচ্ছে, এই হাসিটা খাটাসের মতো। এনিতাস তার বন্ধুকে বলছে, এমন ব্যবস্থা করছি, কাল সকাল থেকে সক্রেটিস মানুষকে মুখ দেখাতে পারবে না। ওকে হাতে মারব না, ওকে ভাতে মারব না— অন্যরকম মাইর দেব। গণতান্ত্রিক মাইর। সে সুর করে বলছে,

জমিয়ে দিলাম খেলা,
কাঁদতে হবে একেলা।

মঞ্চে কাহিনি এগোচ্ছে— ছেলের হাতে মার খেয়ে বাবা কোনোমতে বাঁচল। সে এবার হুংকার দিল। তার ছেলেকে নষ্ট করেছে সক্রেটিস। সে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করতে শিখিয়েছে। সক্রেটিসের কোনো ক্ষমা নেই। বাবা দৌড়ে গেল সক্রেটিসকে ধরতে। তাকে আর চেরোফোনকে আটক করল একটি ঘরের মধ্যে, বাইরে থেকে শিকল দিয়ে আগুন জ্বেলে দিল। প্রায় মরে যাচ্ছিল তারা, কোনোমতে দুয়ার খুলে এথেন্স থেকে পালিয়ে গেল সক্রেটিস। চিরতরে বিদায় হলো দুষ্টটা। এভাবে শেষ হলো নাটক।

দর্শকরা আবার দুয়ো দিচ্ছে—

সক্রেটিস ভুয়া, উচিত শিক্ষা পেয়েছে
সক্রেটিস ভুয়া, জান নিয়ে পালাইছে।

নাটক শেষ হলে দর্শকরা বের হচ্ছে আর সক্রেটিসকে দেখে দুয়ো দিচ্ছে। অনেকক্ষণ চলল এই অপমান। ক্রিতো আর সিমন চেষ্টা করছেন তাকে আড়ালে রাখতে। চেরোফোন হাউমাউ করে কাঁদছেন।

এনিতাস বলছে, কাঁদো, বুক ভাসিয়ে কাঁদো। কান্না তো মাত্র শুরু। এমন দিন আসবে যে, সেই পিথাগোরাসের শিষ্যদের যেমন পুড়িয়ে মেরেছিল, তেমনই সক্রেটিসকে এথেন্সের

মানুষ পুড়িয়ে মারবে।

চেরোফোন থিয়েটার ফেরত মানুষদের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। তাদের যে ভাবভঙ্গি, তাতে সক্রেটিসকে পুড়িয়ে মারা কোনো বড় ঘটনা নয়। দর্শকদের মুখ বলছে, তার আগুন শাস্তিই প্রাপ্য।

সক্রেটিস ভাবছেন— নাটকের বার্তা কত মারাত্মক! এই থিয়েটারের প্রতিটি মানুষ ভাবছে— সক্রেটিস দেবতা মানে না, ধর্ম মানে না, সে যুবকদের নষ্ট করে। তারা চায় সক্রেটিসকে পুড়িয়ে মারা হোক।

পিথাগোরাসের নামেও মিথ্যা রটনা ছিল যে, তিনি দেবতা মানেন না, ধর্ম মানেন না। তার শিষ্যরা শুধু গণিত, জ্যামিতি আর সংগীত জানেন, ধর্ম-কর্ম জানেন না। সেজন্য একবার পিথাগোরাসের কিছু শিষ্য যখন সভা করছিলেন, তখন বাইরে থেকে তালা মেরে ঘরে আগুন দিয়ে দেয়, পুড়িয়ে মারে অনেক দার্শনিককে[১০৯]। দেবতাদের অস্বীকার করে জ্যামিতি আর গণিত চর্চা করার অপরাধে তাদের নিশ্চিহ্ন করেছিল গ্রিসের মানুষেরা।

এই নাটক দিয়ে মানুষকে বলা হচ্ছে সক্রেটিসও ঐ রকম। তাকেও পিথাগোরাসের শিষ্যদের মতো পুড়িয়ে মারা হোক।

বাড়ি ফিরে সেই রাতে আর খেতে পারলেন না সক্রেটিস। জেনথিপি অনেক জিজ্ঞেস করলেন নাটকের কথা। সক্রেটিসের মুখ থেকে কিছুই বের হলো না। জেনথিপি শুনলে কাঁদবেন। এই মেয়েটির বকা তিনি নীরবে সহ্য করেন, কিন্তু কান্না তাকে কষ্ট দেয়। আজ সক্রেটিস একাই কাঁদবেন, যুগল কান্নার কোনো মানে হয় না।

'মেঘ' নাটক অভিনয় হওয়ার পরে সারা এথেন্সে ঢি ঢি পড়ে গেছে।

সক্রেটিসের মনে হচ্ছে, কে যে আসল সক্রেটিস, সেটিই মানুষ ভুলে গেছে। নাটকে যে সক্রেটিসকে দেখানো হয়েছে, সেটিকেই সবাই মনে করছে আসল সক্রেটিস। মানুষ তাকে দেখে হাসে। পেছন থেকে টিপ্পনি দেয়।

ছিচল্লিশ বছরে এসে সক্রেটিস আবিষ্কার করলেন নাটকের শক্তি কত বিশাল হতে পারে। একটি মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে পারে একটি নাটক।

এথেন্সে কোনো খবরের কাগজ নেই। এখানে সকাল বিকাল সংবাদ শোনানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে প্রধান মিডিয়া হলো নাটক। সব শিক্ষিত মানুষ নাটক দেখে। নাটকের সংলাপ মুখে মুখে ঘোরে। কোনো সংলাপ ভালো লাগলে সেটি প্রবাদের মতো হয়ে যায়।

'মেঘ' নাটকের সংলাপ যাতে মানুষের মুখে মুখে ঘোরে, সেই ব্যবস্থা করতে এনিতাস কোনো ত্রুটি রাখেনি। সে এথেন্সের সব পাড়ার থিয়েটারে 'মেঘ' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করল। সেখানে আর এরিস্টোফানিস নয়, বিভিন্ন লোকে অভিনয় করে। প্রতিটি পাড়ার মানুষ কয়েক দিনেই জেনে গেল সক্রেটিস কেমন। শুরু হয়ে গেছে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে মিডিয়া ট্রায়াল।

তবে প্রচারের একটি গুণ থাকে। দেশ-বিদেশের মানুষ সক্রেটিসের কথা আরও বেশি করে জেনে গেল। নানা নগরের মানুষ এসে খোঁজ করে সক্রেটিস কোথায়। আর একবার যদি কেউ সক্রেটিসের সাথে কিছু সময় কাটায়, সেই ব্যক্তিই সক্রেটিসের সুন্দর মন আর পরিষ্কার জীবনের একটি ছবি পেয়ে যায়। তারা সক্রেটিসের গুণের কথা নগরে নগরে নিয়ে গেল।

এভাবে বিভিন্ন নগরের সফিস্টরা সক্রেটিসের জ্ঞান নিয়ে প্রচার শুরু করল। সারা গ্রিসে সক্রেটিস হয়ে গেলেন একজন অতি পরিচিত মানুষ। একইসাথে নন্দিত আর নিন্দিত মানুষ সক্রেটিসের মতো আর কেউ নেই।

***

১০৩. এরিস্টোফানিস (Aristophanes, ৪৫০-৩৮৮ খ্রি. পূ.) কমেডি সাহিত্য বা ‘প্রহসন’ এর জনক।

১০৪. এরিস্টোফানিসের কমেডি আখারনিয়ান (The Acharnians), খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫ অব্দে এটি লিনিয়া উৎসবে প্রথম পুরস্কার পায়।

১০৫. এরিস্টোফানিসের কমেডি (The Babylonians)।

১০৬. এরিস্টোফানিসের কমেডি The Knights, খ্রিস্টপূর্ব ৪২৪ অব্দে এটি লিনিয়া উৎসবে প্রথম পুরস্কার পায়।

১০৭. এরিস্টোফানিসের কমেডি The Knights এর Paul Roche কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ থেকে এই অংশটুকু বাংলা করেছি।

১০৮. সক্রেটিসকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে তুলে ধরে এরিস্টোফানিস ৪২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখেন কমেডি ‘The Clouds’, আমি কমেডিটির Paul Roche কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ থেকে কাহিনি নিয়েছি।

১০৯. খ্রি. পূ. ৪২৪ অব্দে বর্তমান ইতালির Croton শহরে পিথাগোরাসের শিষ্যদের পুড়িয়ে মারা হয়।

৪৪

‘সময়ের সেরা হও, প্রতিদিন নিজেকে ছাড়িয়ে যাও
বিপদের ভয়ভরা পথে সাহস বিছিয়ে দাও
পথ কঠিন? নিজের পথ তৈরি করে লও।’
-হোমার // (একিলিসের প্রতি তার পিতার উপদেশ)

প্লেগে এথেন্সের জ্ঞানী-গুণীরা মারা গেছেন। জ্ঞানী লোকের অভাব পূরণের জন্য প্লেগ সমাপ্ত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই একটি শিশুর জন্ম হলো। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর শিশু।

শিশুটিকে আসল নামে কেউ ডাকে না। ডাকনামেই ডাকে। ডাকনাম প্লেটো[১১০]। প্লেটো শব্দের অর্থ চওড়া। এই ছেলের কপাল চওড়া, কাঁধ চওড়া, আর এই বয়সেই বুকের সিনাও বিশাল চওড়া। সবকিছু চওড়া দেখে তার নামই হয়ে গেছে চওড়া বাবু বা প্লেটো।

অতি পিচ্চিকাল থেকেই সে সবাইকে চমকে দিচ্ছে। নতুন নতুন বিনোদন দিচ্ছে। তার ইঁচড়ে পাকা কাণ্ডে সবাই চমৎকৃত হচ্ছে। প্লেটো নিত্যনতুন চমক দিচ্ছে। সে যা করে, তা-ই দেখার মতো।

একবার যা শোনে, আর ভোলে না। তোতাপাখির মতো বলতে থাকে। তোতাপাখিকে নিয়ে তার মা মাঝে মাঝেই বিপদে পড়েন। তখন তার বয়স মাত্র চার বছর। মা একদিন দুষ্টুমি করে স্বামীকে একটি অশ্লীল কথা বললেন। স্বামী-স্ত্রী ধরনের অশ্লীল কথা। কথাটি শুনে ফেলল প্লেটো। শোনামাত্রই উচ্চ স্বরে বলতে শুরু করল। কী লজ্জার কথা! অতটুকু বাচ্চা সবার সামনে অমন মারাত্মক অশ্লীল কথাটি বলছে। সুর করে করে বলছে। বাড়িতে নতুন লোক এলে বেশি করে বলছে। লজ্জায় মায়ের মাথা কাটা যাচ্ছে।

এই ঘটনায় অবশ্য আখেরে মা-বাবার লাভই হয়েছে। তারা সব রকম বাজে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। চার বছরের ছেলের ভয়ে বাবা-মা অশ্লীল থেকে সুশীল হয়েছেন। বাবা টিপ্পনি কেটে মাকে বলেন, এভাবে চললে তোমার ছেলে একদিন সারা পৃথিবীর মানুষকে সুশীল হতে শেখাবে।

প্লেটোর বাবার নাম এরিস্টোন, মায়ের নাম পেরিকটোন। তার মায়ের দাদার বাবা ছিলেন প্রখ্যাত আইন-প্রণেতা সলোন। খুবই উচ্চবংশ তাদের। এথেন্সের সেরা পাঁচটি অভিজাত পরিবারের একটি তাদের পরিবার। আত্মীয়- স্বজন সবাই বড় বড় রাজনীতিক, যোদ্ধা, সরকারি চাকুরে। বাড়িও শহরের প্রাণকেন্দ্রে, আগোরার একেবারে লাগোয়া।

একেবারে পিচ্চিকাল থেকেই প্লেটো সবাইকে চমকে দিচ্ছে। তখন তার বয়স মাত্র তিন। প্লেটোর বাবা লিখতে বসেছেন। সামনে একটি পেপিরাস কাগজ। তিনি একটি অনুষ্ঠানে হোমারের লেখা আবৃত্তি করবেন। পেপিরাস কাগজের উপর লিখলেন 'হোমার'।

মন নেই লেখায়। কী যেন ভাবছেন। হঠাৎ দেখলেন, পেপিরাস কাগজে তার লেখার পাশেই আর একটি হোমার লেখা। কলম প্লেটোর হাতে। বাবা ভাবছেন আর একটি 'হোমার' লিখল কে? প্লেটো কি লিখতে জানে?

বাবা ডাক দিলেন মাকে, প্লেটোকে লেখা শিখিয়েছে কে?

তার মা অবাক! কী আবোল-তাবোল বকছেন? প্লেটোকে লেখা শেখাবে কে? ওর কি লেখার বয়স হয়েছে?

'এসে দেখে যাও।

বাবা প্লেটোকে বললেন, আবার লিখ্ তো।

প্লেটো একটি খিলখিল হাসি দিয়ে বাঁকা বাঁকা করে লিখল, হোমার

বাবা-মা দুজনেই একেবারে স্তম্ভিত।

বাবা বললেন, তোমার ছেলে তো একখান প্রতিভার হাঁড়ি। এজন্যেই ওর কপালটা এত বড়। এই ছেলে একদিন রাজা হবে।

মা বললেন, ধুর, কী যে বলো, এথেন্স তো গণতন্ত্র। রাজা-রানি নেই। ছেলে রাজা হবে কী করে?

বাবা বললেন, শুধু কি দেশেরই রাজা হয়! জ্ঞানের রাজাও হতে পারে। তোমার ছেলে হবে জ্ঞানের রাজা। হোমারকেও ছাড়িয়ে যাবে।

ছেলে জ্ঞানের রাজা হবে কিনা সেটি দেখে যাওয়া বাবার কপালে ছিল না। কিছুদিন পরেই বাবা মারা গেলেন। মা আবার বিয়ে করলেন। প্লেটোর সৎ-বাবা একজন কূটনীতিক। তিনি পেরিক্লিসের দূত হিসেবে পারস্য রাজার দরবারে ছিলেন। পেরিক্লিস মারা যাওয়ার পর এখন রাজনীতি করেন।

দিনে দিনে দেখা গেল— প্লেটোর মতো শ্রুতিধর ছেলে তার আশেপাশে কেউ নেই। ছয় বছরেই হোমারের সব কবিতা মুখস্থ। সে গড়গড় করে বলে যেতে পারে। আট বছর হতেই সে নিজে কবিতা লেখা শুরু করল। দিন যায়, আর ছেলের গুণে সবাই চমৎকৃত হয়। কারও সন্দেহ নেই যে, এই ছেলে একদিন অনেক বড় কবি হবে, নামি নাট্যকার হবে। সে নাটক লিখবে, কবিতা লিখবে। প্রথম পুরস্কার পাবে।

তার মুখটা খুব মিষ্টি। শুধু মিষ্টি নয়, মুখের রেখায় একটি অন্যরকম আভিজাত্য, একটি পাণ্ডিত্য। উজ্জ্বল নীল চোখ। তাকালে মনে হয় ওই চোখ এই পৃথিবীর কিছু দেখছে না, অন্য কোনো দুনিয়ার রহস্য খুঁজছে। লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে চওড়া কাঁধে। সব মিলিয়ে একেবারে দেবকান্তি। দেখলেই মনে হয়, এই ছেলে শুধু সোনার চামচ নয়, একেবারে হীরের চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। সেই চামচ থেকে বুদ্ধি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে।

প্লেটো যা ধরে তাতেই সে এক নম্বর। ব্যায়ামের মাঠে সে সবার সেরা। বড় বড় পালোয়ানদের তুলে আছাড় মারছে। গণিত, জ্যামিতিতে সে সবার সেরা। কী সুন্দর সুন্দর জ্যামিতির আকৃতি বানায়! যুদ্ধ কৌশলেও সে খুবই ভালো। কিন্তু যুদ্ধ তার ভালো লাগে না।

বারো বছর হতে না হতেই তার ঘর ভরে গেছে নিজের লেখা নাটকে। পেপিরাসের পর পেপিরাস লিখে ফেলেছে প্লেটো। সে বসলেই লেখা হয়। অন্যরা কষ্ট করে লেখে, আর তার নাকি লেখা পায়। লেখা পেলে তার আর হুঁশজ্ঞান থাকে না; কে মা, কে বাবা কিচ্ছু বোঝে না, খাওয়া-দাওয়া নেই; মাথায় যা আছে, পেপিরাস কাগজে না আঁটা পর্যন্ত সে থামতে পারে না।

জ্ঞানের জগতে এমন মানুষ এথেন্সের লোকেরা আর দেখেনি। সবাই একবাক্যে বলে, এই ছেলে একদিন দুনিয়া জোড়া নাম করবে। একদিন সারা দুনিয়ার মানুষ তাকে এক নামে চিনবে। সে মুখে মুখে ডায়ালগ লেখে। তার মাথায় সব সময় নাটকের প্লট ঘোরে।

প্লেটোকে অনেক কিছু শেখায় তার মায়ের দুই মামাতো ভাই। তার দুই মামা। তাদের নাম ক্রিটিয়াস ও কারমিড। তারা রাজনীতি করে। কিন্তু গণতন্ত্রের রাজনীতি নয়, তারা স্পার্টার মতো রাজতন্ত্র চায়। এথেন্সের ক্ষমতায় আছে তাদের বিরোধীরা, গণতন্ত্রের লোকেরা। তাই ক্রিটিয়াসরা গোপনে রাজনীতি করে।

ক্রিটিয়াস আর কারমিড দুজনেই সক্রেটিসের ভক্ত। তারা গর্বের সাথে সবাইকে বলে বেড়ায় যে, 'সক্রেটিস যা বলেন, তারা সেভাবেই কাজ করে।' তারা সারাদিন সক্রেটিসকে নিয়ে আলাপ করে। তাই প্লেটোর কাছে ছোটবেলা থেকেই সক্রেটিস খুবই পরিচিত নাম। সক্রেটিস দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি, তা সে কুট্টিকাল থেকেই জানে। তার মামারা সক্রেটিসের নাম শ্রদ্ধার সাথে নেয়। তাই প্লেটোও সক্রেটিসকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু কোনোদিন সামনে যায়নি।

প্লেটোর মন চায় আর একটু বড় হলে একদিন চুপি চুপি একা গিয়ে সক্রেটিসকে বলবে 'আপনি নাকি সত্যিই দুনিয়ার সেরা জ্ঞানী? কিন্তু পথে পথে ঘুরে কয়জনকে শেখাবেন? তারচেয়ে একটি স্কুল দেন, বাচ্চাদের স্কুল নয়, বড়দের জন্য উচ্চশিক্ষার স্কুল।

***

উঠানের এক কোণে বসে আছেন সক্রেটিস।

ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করছেন জেনথিপি, 'ঘরে আর মাত্র তিন দিনের খাবার আছে। এক্ষুনি বাজারে গিয়ে কিছু রুটি নিয়ে আসেন।'

কথাটি শুনেও শুনলেন না সক্রেটিস। তিনি ভাবছেন তার মনের সাম্রাজ্যের কথা। কী করলে মানুষ আর একটু ভালো থাকে সেই চিন্তায় তিনি মশগুল। জেনথিপির মতো সাধারণ একটি নারীর কথায় মনোযোগ দেওয়ার সময় তার নেই। তিনি আরাম করে চিন্তা করছেন।

জেনথিপি চিৎকার করছেন, এথেন্স শহরে এমন মানুষ কি আর একটিও আছে? নিজের ঘরে ভাত নেই, উনি রাস্তার ধারের চ্যাংড়া পোলাপানের সাথে আড্ডা মারেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাবর কাটেন। এমন মানুষ বিয়ে করবে কেন? আমাকে দেবী এথিনা অভিশাপ দিয়েছেন। না হলে আমার কপালে এমন লোক জুটবে কেন?

সক্রেটিস আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। মনে হচ্ছে আজ দুপুরে খাবার জুটবে না। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। আবার ভাবছেন, আর একটু দেখি, যদি রাগ কমে যায়। এই ভেবে তিনি আবার চিন্তায় মগ্ন হলেন।

জেনথিপি চিৎকার করেই যাচ্ছেন। স্বামী নির্বিকার।

জেনথিপির মনে হলো, সক্রেটিস অনেকক্ষণ ধরে তার কথা কিছুই শুনছেন না। ভীষণ জিদ লাগছে, 'এত কষ্ট করে চেঁচাচ্ছি, আর তিনি শুনবেন পর্যন্ত না?'

জেনথিপি আর সহ্য করতে পারলেন না। সামনে বড় একটি বালতিতে রাখা ছিল রান্নারঘরের কালি-ঝুলি মাখা ময়লা পানি। সেই বালতিটি তুলে ঢেলে দিলেন সক্রেটিসের মাথায়।

শীতের দুপুরে এক বালতি ময়লা পানিতে আপাদমস্তক ভিজে গেল সক্রেটিসের সক্রেটিস হতভম্ব, কিন্তু কিছুই বললেন না। উঠেও দাঁড়ালেন না, পুরো পানিটা মাথায় ঢালতে দিলেন। এবার জেনথিপি ভাবলেন, এতটা বোধহয় ঠিক হলো না। এবার নিশ্চয়ই সক্রেটিস রেগে যাবেন।

কিন্তু না, সক্রেটিস মিষ্টি হেসে বললেন, সকাল থেকে আমার ঘরের আকাশটা গর্জন করছে। আকাশের নিয়ম হলো, গর্জনের পরে একটু বর্ষণ হয়। মেঘ ডাকাডাকির পরে বৃষ্টি হয়েছে। তাই আমার মাথা কিঞ্চিৎ ভিজে গেছে।

জেনথিপি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। এই মানুষকে ভালো কথা বললে, কানে নেন না। মন্দ কথা বললে শোনেন না। মাথায় পানি ঢেলে দিলে, হেসে মশকরা করেন। একে নিয়ে কী করা যায়!

কী করবেন বুঝতে না পেরে জেনথিপি কেঁদে ফেললেন। তার কান্নাও মারাত্মক। একেবারে মরাকান্না। চিৎকার করে শুধু একটি শব্দই বলছেন, সক্রেটিস! সক্রেটিস!

সক্রেটিস দেখলেন, সর্বনাশ! জেনথিপি যেভাবে কাঁদছে, দূর থেকে শুনলে যে কেউ ভাববে যে, সক্রেটিস মারা গেছেন। এই কান্না এখুনি থামাতে হবে। কিন্তু কান্না থামানোর উপায় তিনি জানেন না। তিনি বাইরের মানুষের মনের নীরব কান্না দূর করার উপায় জানেন। ঘরের বউয়ের চিৎকার করে কান্না থামাতে জানেন না।

জেনথিপি কেঁদেই যাচ্ছেন। স্বামীর মাথায় ময়লা পানি ঢেলে দিয়েছেন, এখন সেই দুঃখে কাঁদছেন।

একটু ভেবে সক্রেটিস জেনথিপির মাথায় হাত রেখে বললেন, ভালোই হয়েছে, এখন দুজনের গায়েই পানি। আমার মাথায় পানি, আর তোমার চক্ষে পানি। চলো, এবার দুজনে মিলে গোসল করি।

তারা দুজনে মিলে স্নান-ঘরে গেলেন। অনেকদিন পর আজ দুপুরে সক্রেটিস দুপুরের খাবার জেনথিপির হাতে খেলেন। দুপুরটা ভালোই কাটল। অনেক দিন পর তার সংসারে একটি ভালোবাসার ছোঁয়া লাগল। আজকের ভালোবাসাকে বলা যায় গর্জন-বর্ষণ ভালোবাসা। জেনথিপির গর্জন আর বর্ষণ থেকে এর উৎপত্তি।

কান্নার পরে ভালোবাসা বদলে যায়, চোখের জল ভালোবাসার মধ্যে লবণ ঢেলে দেয়, সেজন্য কান্নার পরে ভালোবাসা একটু নোনতা নোনতা, একটু মিষ্টি-মিষ্টি, একটু অন্যরকম।

সক্রেটিস বাজার করতে গেলেন। জেনথিপি তার হাতে কিছু টাকা দিলেন। টাকা-পয়সার হিসাব জেনথিপিই করেন। শাশুড়ি তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে গেছেন। বাড়ির পাশে জলপাই বাগান। সেই বাগান সারা বছরের জন্য ঠিকা দিয়ে দেন, এককালীন টাকা পান। দূরে পাহাড়ের নিচেও কয়েকটা জলপাই বাগান কিনেছিলেন তার শ্বশুর। সেগুলো থেকেও কিছু আসে। সবকিছু ভালো করে দেখে শুনে রাখতে পারলে, খাওয়া-পরার কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, সক্রেটিস এসব কিছুতেই মন দেন না। সবকিছু জেনথিপিকেই করতে হয়। ক্রিতো তাকে সাহায্য করেন। ক্রিতো তার দাসদের বলে দিয়েছেন, জেনথিপি যেকোনো কাজে ডাকলে, সাথে সাথে যেন করে দেয়।

এই গর্জন-বর্ষণ ভালোবাসার কিছুদিন পরেই জেনথিপি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। ছেলে হয়েছে সক্রেটিসের। বন্ধুরা ধরেই নিয়েছিলেন, এই দম্পতির ছেলে-মেয়ে হবে না। তাও তাদের পুত্র হলো। দেরিতে হলেও সন্তান হলো। পঞ্চান্ন বছর বয়সে সক্রেটিস প্রথম পিতা হলেন। এতদিনে জেনথিপি করার মতো একটি কাজ পেলেন। তিনি খুশি, মহাখুশি। সক্রেটিসও খুশি। মহাখুশিতে দুজন মিলে ছেলের নাম রাখতে বসলেন।

গ্রিসে সন্তানের নাম রাখার অদ্ভুত নিয়ম আছে। সবাই এই নিয়ম মানে। প্রথম ছেলে হলে নাম রাখে বাবার বাবার নামে। দ্বিতীয় ছেলে হলে নাম রাখে মায়ের বাবার নামে। প্রথম মেয়ে হলে নাম বাবার মায়ের নামে। তারপরের মেয়ের নাম মায়ের মায়ের নামে। এভাবে দাদা-দাদি, নানা-নানিরা নিজেদের নামটা রেখে যান বংশের তৃতীয় প্রজন্মের মাঝে

সক্রেটিসের প্রথম সন্তান ছেলে। তো নিয়ম মতো নাম রাখা উচিত সক্রেটিসের বাবার নামে। মানে সফ্রোনিকাস। কিন্তু সক্রেটিস উদার মানুষ। মেয়েদের ব্যাপারে তার মতো উদার এথেন্সে কেউ নেই।

তিনি বললেন, সন্তান জন্ম দিতে মা যে কষ্ট করে, বাবার কষ্ট তার কাছে কিছুই নয়। এই সন্তানের প্রথম দাবি জেনথিপির। তাই আমরা নাম রাখব জেনথিপির বাবার নামে। আমাদের প্রথম ছেলের নাম হবে লেমপ্রোক্লিস।

জেনথিপি মহাখুশি। তার স্বামী সক্রেটিস যে অনেক বড় মনের মানুষ, সেটি তার মনে থাকে না। মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা টের পান। আজ ছেলের নাম রেখে মনে হচ্ছে, সে স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী। মনে হচ্ছে বাবার নামে নাম রেখে তার স্বামী তার বাবাকেই তার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আনন্দে জেনথিপি সাত দিনের ছেলেকে বলছেন, জানিস, তুই যেদিন জন্ম নিলি, সেদিন এথেন্সের দেয়ালের বাইরে যুদ্ধ হচ্ছিল। বিশাল যুদ্ধ।

ছেলে বলল, ওয়া।

মা বললেন, সেই যুদ্ধের মধ্যে সন্ধ্যার পর তোর জন্ম। সেই সময় তোর বাবা ছিলেন না ঘরে। না, তিনি যুদ্ধে যাননি। তার বয়স হয়েছে। এখন আর যুদ্ধে যাওয়া লাগে না। তিনি তখন জ্ঞান বিতরণ করছিলেন।

ছেলে বলল, ইয়া।

মা বললেন, ভেবে দেখ, ঘরে তার স্ত্রী সন্তান জন্ম দিচ্ছে, আর তিনি রাস্তার মোড়ে জ্ঞানের জন্ম দিচ্ছেন। ঘটনাটা মজার নয়?

মজার কিনা ছেলে জানে না। ছেলের ঘুম পাচ্ছে।

জেনথিপির ঘুম পাচ্ছে না। গল্প করতে তার ভালো লাগছে। তিনি বললেন, জানিস, এখন যদি তোর বাপেরে বলি, ছেলে হয়েছে, আনন্দ করো। তিনি বলবেন, ঠিক আছে। ছেলে হয়েছে, তো সেই আনন্দে জ্ঞানের বাত্তি জ্বালাই। এই বলে তিনি আগোরার দিকে হাঁটা ধরবেন। জানিস কেন? কেন আবার— জ্ঞানের বাত্তি কিনতে!

ছেলে হেসে দিল।

মা-ছেলের এই আনন্দে সক্রেটিস নেই। তিনি এখন সত্যি সত্যিই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন। হয়তো সিমনের দোকানে অথবা জিমনেসিয়ামে।

কিন্তু ছেলের সাথে সময় কাটানো হলো না সক্রেটিসের। এর মধ্যেই ডাক এলো আবার যুদ্ধে যেতে হবে। এথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ শেষ হয়নি। শিশুপুত্রকে রেখে এথেন্স থেকে টানা দুই দিন উত্তর দিকে মার্চ করে করিন্থ সাগর পার হয়ে সক্রেটিস পৌঁছলেন ডিলিয়ন নামক এক জায়গায়। কিন্তু তার যুদ্ধ ভাগ্য ভালো নয়। ভয়াবহ যুদ্ধের পর এখানেও হেরে গেল এথেন্স। নির্মমভাবে মারা গেল তার অনেক সঙ্গী। আহত হয়ে কোনোরকমে জান নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। কিন্তু বিশ্রামের সুযোগ নেই। কিছু দিন পরেই আবার যেতে হলো যুদ্ধে। এবারও উত্তর দিকে, জায়গার নাম এম্ফিপলিস। এখানে স্বর্ণের খনি দখল নিতে চায় এথেন্স, কিন্তু পারল না। এখানেও হেরে গেল এথেন্স। নির্মম যুদ্ধে মারা গেল হাজার হাজার মানুষ। আহত রক্তাক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। জীবনে তিনটি যুদ্ধ করলেন সক্রেটিস। তিনবারই রক্তাক্ত হয়ে ফিরেছেন। তিনি প্রতিবারই দেখেছেন যুদ্ধের নির্মমতা, চোখের সামনে দেখেছেন মানবতার অপমান।

***

১১০. প্লেটো খ্রি. পূ. ৪২৭/৪২৮ অব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রিক ভাষায় তাকে বলা হয় Platon (প্লাতন)। আরবের পণ্ডিতদের কাছে তিনি আফলাতুন নামে পরিচিত ছিলেন। তার রচিত আটত্রিশটি ডায়ালগ এবং তেরোটি চিঠি ইউরোপীয় দর্শনের সূচনা করে। প্লেটোর লেখাই সক্রেটিস ও তার দর্শনকে জানার প্রধান উৎস। আমিও এই বইয়ে প্লেটোর ডায়ালগগুলোকেই প্রধান রেফারেন্স হিসেবে নিয়েছি।

৪৫

‘তোমার সাথে যেটি করলে তুমি কষ্ট পাও,
সেটি কোনোদিন অন্যের সাথে কোরো না।’
—সক্রেটিস

সাগর তীরে বসে ইউরিপিডিস কষ্ট উদযাপন করছেন।

তার কষ্ট উদযাপনের তরিকা আলাদা। কষ্ট পেলে তিনি সাগরের কাছে আসেন, চোখ বুজে সাগর দেখেন। নীল সাগরের নীল জলে কষ্ট ভিজিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। তিনি লেখক। লেখকদের সমস্যা হলো, কষ্ট পেলে সেটি কলমে আনতে চান। কলমে আনতে হলে কষ্টটা একেবারে নিজের করে অনুভব করতে হয়, অন্যের কষ্টে নিজেকে বসিয়ে নীরবে কাঁদতে হয়। ইউরিপিডিস সেটি করেন সাগরের কাছে এসে। চোখ বন্ধ করে সাগরের কান্নার সাথে নিজে কাঁদেন।

তার আজকের কষ্ট ব্যক্তিগত নয়, এথেন্সের নির্মমতায় তিনি কষ্ট পেয়েছেন। আলোর নগরী এথেন্স এমন মায়াহীন হতে পারল! এমন কাজ করতে পারল? পনেরো বছর ধরে এথেন্স আর স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এথেন্সের পক্ষের দ্বীপগুলোকে আক্রমণ করে স্পার্টা, আবার স্পার্টার মিত্র দ্বীপকে দখল করে এথেন্স। এভাবেই চলছে। যুদ্ধ সব সময়ই ভয়ংকর। তবে মাঝে মাঝে তা হয়ে ওঠে একেবারেই অমানবিক। কয়েকদিন আগে এথেন্সের নৌবাহিনী স্পার্টার মিত্র দ্বীপ মিলোস[১১১] দখল করেছে। কিন্তু মিলোস দ্বীপের নেতারা ভীষণ ত্যাড়া, তারা আত্মসমর্পণ করবে না। তখন এথেন্স দ্বীপটির সব পুরুষকে হত্যা করল, নারী ও শিশুদের বিক্রি করে দিল দাস বাজারে।

এই ভয়াবহ ঘটনা মানবতাবাদী নাট্যকার ইউরিপিডিসকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তিনি মর্মাহত হলেন, কিছুতেই মানতে পারছেন না। কিন্তু কী করবেন তিনি! তিনি নেতা নন, তার অস্ত্র নেই। তিনি লেখক মাত্র, তার দৌড় কলম পর্যন্ত। লেখা ছাড়া কিছু করার ক্ষমতা নেই। তিনি ঠিক করলেন, তিনি লিখবেন। যুদ্ধ বিরোধী নাটক লিখবেন।

তিনি গত বছরই একটি নাটক শুরু করেছেন। নাটকটির প্লট ট্রয়ের যুদ্ধ। গ্রিকরা ট্রয়কে হারানোর পরে সেখানের হতভাগ্য মেয়েদের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে একটি যুদ্ধবিরোধী নাটক লেখার ইচ্ছা তার অনেক দিনের। এখন সঠিক সময়। এখন সবাই মিলোস দ্বীপের ঘটনায় মর্মাহত। এখন নাটকটি শেষ করবেন। এই নাটকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, যুদ্ধ কত জঘন্য বিষয়। তিনি নাটকের নাম দিলেন ‘ট্রয়ের নারীরা’[১১২]।

সালামিনা দ্বীপে গুহায় বসে তিনি কাহিনি বানাচ্ছেন। জেতার পরে গ্রিকরা ট্রয় পুড়িয়ে দিয়েছে, সকল পুরুষকে মেরে ফেলেছে। এখন নারীদের ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে গ্রিসের যোদ্ধাদের মাঝে। এক-একজন গ্রিক পুরুষ বেছে নিচ্ছে ট্রয়ের নারীদের। সেই করুণ হতভাগ্য নারীদের নিয়ে প্লট সাজালেন। নাটকের চরিত্র: হেলেন, ট্রয়ের রানি হেকুবা, রাজকন্যা কাসান্দ্রা, হেক্টরের স্ত্রী।

যুদ্ধ বিরোধী এমন কাজ গ্রিসে আগে কেউ করেনি। ইউরিপিডিস সব সময়ই নতুন নতুন বিষয় নিয়ে লেখেন। প্রতিবার লেখার পর লাফ দিয়ে ওঠেন, মনে হয় এমন চমৎকার জিনিস আগে কেউ করেননি। এবারও তিনি ভীষণ খুশি। চমৎকার হয়েছে। এই বছর তিনি অবশ্যই প্রথম হবেন। কারণ এবার সফোক্লিস কোনো নাটক লেখেননি। সফোক্লিস থাকলে, বিচারকরা ইউরিপিডিসকে হিসাবেই ধরেন না। তাই সফোক্লিস না থাকায় এবার তার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

কিন্তু ইউরিপিডিস জানেন না যে, তিনি যে কাহিনিটি নিয়েছেন সেটি মানবতার বিবেচনায় মর্মস্পর্শী, কিন্তু গ্রিকরা কি সেই বেদনায় সাড়া দেবে? পরাজিত নগর ট্রয়ের নারীদের গ্রিকরা ভাগ করে নিচ্ছে লুটের মাল হিসেবে। সেই নারীদের বেদনা কি গ্রিকদের ছুঁতে পারবে? এথেন্সের থিয়েটারে যখন গ্রিক দর্শক দেখবে, তাদের বীরেরা ট্রয়ের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে, সেটি কি তাদের ভালো লাগবে? ইউরিপিডিসের মানবতার মধুর কথায় গ্রিকরা কি নিজেদের পূর্বপুরুষদের অন্যায়কে স্বীকার করতে শিখবে? এতটা উন্নত মনের কি এখনও হতে পেরেছে মানুষ? তারা কি সক্রেটিসের মতো বলতে পারবে, খারাপ সবার জন্যই খারাপ? অন্যায় গ্রিকরা করলেও, সেটি অন্যায়ই।

সালামিনা দ্বীপের গুহায় নাটকটি লেখা শেষ করে এথেন্সে ফিরলেন ইউরিপিডিস। বসন্ত উৎসবে মঞ্চস্থ হবে।

থিয়েটারে নাটক চলছে:

ট্রয় নগর পুড়িয়ে দিয়েছে গ্রিকরা। ট্রয়ের সব সমাধি, সব মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে। গ্রিকদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত সাগরের দেবতা পোসাইডন। প্রথমেই পোসাইডন মঞ্চে এসে বলছেন, 'যে মানুষ নগর পোড়ায়, মন্দির আর সমাধি ধ্বংস করে, তার মতো হটকারী আর কেউ নেই। সে নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে। আমি শাস্তি দেব, কঠিন শাস্তি।'

ট্রয়ের রানি হেকুবা বিলাপ করছে। সে ছিল রানি, হয়ে যাচ্ছে দাসী। তাকে নিচ্ছে গ্রিক বীর অডিসিয়াস। তার মেয়ে ট্রয়ের রাজকন্যা কাসান্দ্রা যাবে রাজা আগামেমননের ঘরে। মা-মেয়ে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে মা বলছে অতি পরিচিত সংলাপ, 'একজন মানুষ যতই ধনী হোক না কেন, মৃত্যুর আগে তাকে সুখী বলা যাবে না।' সংলাপটি আইনপ্রণেতা সলোনের। প্রায় একশ বছর আগে সলোন এটি বলেছিলেন। এই সংলাপ এথেন্সের সবাই জানে। হেরোডোটাস তার বক্তৃতায়ও এটি বলেছিলেন। এটি গ্রিক ট্র্যাজেডির একটি বৈশিষ্ট্যবাহী সংলাপ।

এরপর মঞ্চে এলো ছলনাময়ী সুন্দরী হেলেন, যার জন্য ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছে। হেলেনও কাঁদছে। কিন্তু তার কান্নায় কেউ কষ্ট পাচ্ছে না। ট্রয়ের রানি হেলেনের স্বামীকে বলছে, 'হত্যা কর, হেলেনকে হত্যা কর, আর সব নারীর জন্য এই নিয়ম লিখে দাও, যে নারী তার স্বামীর সাথে প্রতারণা করবে, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর যদি হত্যা না করো, যদি তুমি হেলেনকে গ্রিসে নিয়ে যাও, তবে তার সাথে এক জাহাজে যেও না। ও ছলনাময়ী। ও একবার ধরলে আর ছুটতে পারবে না।'

ইউরিপিডিসের নাটক মানেই থিয়েটারে সক্রেটিস আছেন। তিনি ভাবছেন, ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু দরকার, চরম অধঃপতন দরকার হয়। এই নাটকে সেটি কোথায়? সারা ট্রয়ের ট্র্যাজেডি নিয়েই তো নাটক। তাহলে নতুন করে আর মৃত্যু বা চরম পরিণতির কী দরকার? ট্রয়ের মেয়েরা কাঁদছে, তাদের সাথে দর্শকরা কাঁদছে। নাটক জুড়ে শুধু কান্না। এটি ভালো। মানুষ থিয়েটারে বসে কাঁদলেই নাটক সার্থক হয়।

আজ সক্রেটিস জেনথিপিকে নিয়ে এসেছেন। জেনথিপি নাটক দেখছেন আর কাঁদছেন। ট্রয়ের রানি হেকুবার দুঃখে তার গাল ভেসে যাচ্ছে। এরপর যখন হেক্টরের স্ত্রীর কাছ থেকে তার কোলের ছেলেকে কেড়ে নিচ্ছে গ্রিসের সেনারা, সেই দৃশ্য দেখে জেনথিপি চিৎকার করে কাঁদছেন।

নাটকে হেক্টরের স্ত্রী তার শিশু পুত্রকে বলছে—

'আয় রে সোনা, চাঁদের কণা, তোরে শেষ-চুমো দেই,
আঁচল টানিস না, অসহায় মা, কিছুই করার নেই
ওরা তোকে নেবে কেড়ে, জোর করে, ঐ হত্যাপুরীতে
আসবে না পিতা তোর বীর হেক্টর কবর হতে বর্শা হাতে
হে গ্রিক, বলো, কে বানাল নিয়ম এমন বর্বর নিষ্ঠুর
জিতেছ, তাই নিতে হবে প্রাণ নিষ্পাপ দুধের শিশুর?'[১১৩]

পাঁচদিন নাটক হওয়ার পরে পুরস্কার ঘোষণা হলো ইউরিপিডিস দ্বিতীয় হয়েছেন। প্রথম হয়েছেন জেনোক্লিস নামের নতুন এক নাট্যকার।

ইউরিপিডিস স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এথেন্সের বিচারকদের খুশি করতে আর কী দরকার সেটি তার জানা নেই। সকলেই অবাক। সবাই ধরে নিয়েছিল, এবার ইউরিপিডিস নিঃসন্দেহে প্রথম হবে। কিন্তু হলো না।

ইউরিপিডিসের কাঁধে হাত রেখে সক্রেটিস বললেন, ব্যাপার নয়। তোমার নাটক দেখে বিচারকরা কাঁদতে কাঁদতে নম্বর দিতে ভুলে গেছে। বাদ দাও, তুমি সুন্দর নাটক করেছ, সেটিই আসল কথা। পুরস্কার যারা দেয়, তারা তাদের যোগ্যতা দিয়ে বিচার করে।

চেরোফোন পাশে ছিলেন। তিনি বললেন, এথেন্সে নাটক হলে ইউরিপিডিসকে হারতে হবে, এটিই নিয়ম। বিচারকরা এই নিয়ম মানেন। কে প্রথম হলো, সেটি কোনো ব্যাপার

নয়। ইউরিপিডিস প্রথম হয়নি, সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

তারা কেউ জানেন না, কেন ইউরিপিডিস প্রথম হতে পারেন না। যে কারণে মানুষ সক্রেটিসকে পছন্দ করে না, সেই একই কারণে ইউরিপিডিস কোনোদিন প্রথম হন না। তারা যুগের চেয়ে এগোনো মানুষ। তাদের চিন্তাকে ধারণ করার ক্ষমতা এখনও এথেন্সের মানুষের হয়নি। সক্রেটিস নতুন নতুন কথা বলেন, পুরনো মতবাদকে প্রশ্ন করতে বলে, তাই তার অনেক শত্রু। একইভাবে ইউরিপিডিসও মঞ্চে নতুন নতুন কথা বলেন। তার নাটকের কাহিনি গতানুগতিক নয়, তিনি নাটকে পুরনো ধারণা বাদ দিয়ে নতুন ধারণার জন্ম দেন। তিনি সফোক্লিসের মতো মানুষ যা পছন্দ করে, শুধু সেই কাহিনি নিয়ে নাটক বানান না; তিনি বিপ্লবী, তিনি সমাজ বদলের নাটক লেখেন। গ্রিকরা খারাপ কিছু করলে, তিনি নাটকে সেটিকে অন্যায় বলেই দেখান। মানুষের মন- রাখা কথা তার নাটকে নেই। তার নাটককে গ্রহণ করার মন এথেন্সের মানুষের এখনও হয়নি। তাই তার অনেক শত্রু। এই শত্রুরা অনেক ক্ষমতাবান, এরাই নাটকের বিচারক। তাই তিনি কোনোদিন প্রথম হন না, হতে পারবেনও না।

***

১১১. এজিয়ান সাগরে সান্তোরিনি দ্বীপের পাশে মিলোস (Milos) দ্বীপ। এই সাগরে ভূমিকম্পে সাইকেল বা চক্রাকারে তৈরি হয়েছে অনেকগুলো দ্বীপ, যেগুলোকে বলে সাইক্লাডিস (Cyclades) দ্বীপ। এগুলোর একটির নাম মিলোস। এটি এথেন্সের কাছে, দূরত্ব মাত্র ১১০ কিলোমিটার; কিন্তু পেলোপোনেসিস যুদ্ধে তারা স্পার্টার পক্ষে যোগ দিয়েছিল। সেজন্য এথেন্স খ্রিস্টপূর্ব ৪১৬ অব্দে দ্বীপটিকে আক্রমণ করে এবং ভয়াবহ গণহত্যা চালায়।

১১২. 'ট্রয়ের নারীরা' (The Trojan Women) ইউরিপিডিসের বিখ্যাত যুদ্ধ-বিরোধী ট্র্যাজেডি। নাটকটির গ্রিক নাম Troades, এটি খ্রিস্টপূর্ব ৪১৫ অব্দে প্রথম রচিত হয়।

১১৩. ইউরিপিডিসের The Trojan Women ট্র্যাজেডিটির D.A. Svarlien কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ থেকে আমি সংলাপের বাংলা করেছি।

৪৬

‘আমার জীবনের জন্য আমি মা-বাবার কাছে ঋণী,
আর সুন্দর জীবনের জন্য ঋণী শিক্ষকের কাছে।’
— আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট

আজ প্লেটোর জীবনের বিশেষ দিন।

তরুণ প্লেটো আজ সক্রেটিসের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। সে ছোটবেলা থেকেই সক্রেটিসের নাম শুনেছে। সক্রেটিস ভীষণ জ্ঞানী। মানুষ হিসেবেও খুবই অসাধারণ। প্লেটোর মামা ক্রিটিয়াস উঠতে বসতে সক্রেটিসের নাম করে। তিনি নাকি জীবন বদলে দেন। এক নিমিষে চক্ষু খুলে দেন। মজায় মজায় এমন কথা বলেন যে মধুর মতো লাগে। সেই কথায় যুক্তি আর জ্ঞান একেবারে ঝরে ঝরে পড়ে।

কিন্তু সক্রেটিসের ব্যাপারে প্লেটোর একটি খটকা আছে। সেটি হলো সক্রেটিস নাকি নাটক পছন্দ করেন না। তিনি শুধু ইউরিপিডিসের নাটক ছাড়া থিয়েটারে যান না। প্লেটো একজন লেখক। সে কবিতা, নাটক লেখে। সক্রেটিস নাটক পছন্দ করেন না শুনে প্লেটোর খারাপ লাগে। শুধু এই কারণেই সে সক্রেটিসের সামনে যায়নি। শুধু দূর থেকে আগোরায় দেখেছে।

মামা ক্রিটিয়াস প্লেটোকে সিমনের দোকানে নিয়ে যাচ্ছে। মামা বলেছে, সক্রেটিস তার শিক্ষক হবেন। সেজন্য প্লেটোর ভয় ভয় লাগছে। অজানা একটি আশঙ্কায় তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

তাকে দেখেই সক্রেটিস বললেন, এই ছেলের কপাল এত চওড়া কেন? এ তো মাথা দিয়েই জগৎ কিনে ফেলবে।

প্লেটো চমকে উঠল। মনে হলো এমন মধুর স্বর সে জীবনে আর শোনেনি এথেন্সে সবাই তার প্রশংসা করে, ভালো ভালো কথা শুনে সে অভ্যস্ত। কিন্তু সক্রেটিস ছোট্ট করে যা বলল, তাতে সে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল, মনে হলো কোথা থেকে একটি শক্তি আসছে তার মধ্যে। তার ভয় কেটে গেল।

সক্রেটিস অনেকের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন। তার কাছে এক দল মানুষ যায়, আরেক দল আসে। কথার বিষয় বদলে যাচ্ছে। কিন্তু সক্রেটিসের রসালো যুক্তি বদলাচ্ছে না। তিনি প্রশ্ন করছেন, আর অন্যরা উত্তর করছে। একের পর এক প্রশ্ন চলছে, যে পারছে উত্তর দিচ্ছে। এক সময় সবাই মেনে নিচ্ছে যে, তারা যেটি বুঝতে চায়, সেটি বুঝতে পেরেছে। এটিই তাহলে সেই সক্রেটিস মেথড! প্রশ্ন করে করে কোনো জিনিসের একেবারে গভীরে চলে যাওয়া। সকলে সম্মিলিতভাবে নতুন কিছু বের করা। প্লেটো মুগ্ধ হয়ে শুনছে। ক্ষণে ক্ষণে টপিক বদলে যাচ্ছে।

সক্রেটিস বলছেন, মানুষ শব্দটার মানে একজন মানুষ নয়। মানুষ মানে অনেক মানুষের একত্র শক্তি। একা একা জ্ঞানী হয়ে লাভ নেই। একা কোনোদিন সুন্দর জীবন পাওয়া যাবে না। অনেকে একসাথে সুন্দর জীবন যাপন করলেই জীবন সুন্দর হবে। আর এই কারণেই আমি মানুষ খুঁজি। মানুষ না দেখলে আমি হাঁসফাঁস করি। শুধু মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি।

একেবারে নতুন কথা। কেমন অদ্ভুত! প্লেটোর কেমন যেন লাগছে। সে একজন মহাপড়ুয়া মানুষ। গ্রিক ভাষায় কিছু লেখা হয়েছে আর প্লেটো পড়েনি, এমন কিছুই নেই। কিন্তু সক্রেটিস যা বলছেন, এমন কথা কোথাও লেখা নেই।

প্লেটো এথেন্সের সব নেতার বক্তৃতা শুনেছে। কিন্তু কারও মুখে এমন কথা শোনেনি। কেমন মিষ্টি করে বলছেন, 'শুধু মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি।'

সক্রেটিস বলে যাচ্ছেন, সুন্দর জীবনের জন্য সাধনা দরকার, চেষ্টা দরকার। জীবন এমনি এমনি সুন্দর হয় না।

যত শুনছে, তত অবাক হচ্ছে প্লেটো। আরও বেশি শুনতে ইচ্ছে করছে। প্লেটো তন্ময় হয়ে শুনছে।

একটু পরে সেখান এক ফেরিওয়ালা এলো। সক্রেটিস তার সাথে কথা বললেন। একটু আগে ছাত্রদের সাথে যেভাবে বলেছেন, ফেরিওয়ালার সাথেও একইভাবে বলছেন। যেন ফেরিওয়ালাও তার বন্ধু। ফেরিওয়ালা তার কথায় অনেক খুশি। এরপরে সেখানে এলো এক দাস। সক্রেটিস দাসের সাথেও একই স্বরে কথা বললেন। দাস তার কথায় হাসতে হাসতে চলে গেল। তিনি ছাত্র, ব্যবসায়ী, নেতা, দাস সবার সাথেই একইভাবে কথা বলছেন। কোনো পার্থক্য নেই।

প্লেটো ভাবছে, এ কেমন মানুষ! এর কাছে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ নেই। ছোট-বড় সবাই সমান। মুচি আর সেনাপতি দুজনের সাথেই একইভাবে কথা বলেন। নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ নেই। দাস আর মনিবকে একই রকম চোখে দেখেন। এরকম সাম্যবাদী মানুষ সে জীবনে দেখেনি। সে ভাবছে, সক্রেটিস যদি ভালো মানুষ হন, তাহলে সাম্যবাদ ব্যাপারটিও ভালো। জীবনে সাম্যবাদের চর্চা করা ভালো।

হঠাৎ সক্রেটিস বললেন, চলো আমরা বের হই। সিমনকে এক দিনে যতটুকু জ্বালানো দরকার, সেটি শেষ।

বলেই তিনি হাঁটা শুরু করলেন। তার পিছে পিছে ছুটল ছাত্ররা। প্লেটোও যোগ দিল সেই দলে। আগোরার রাস্তার পাশে তার ছাত্রদের নিয়ে বসে গেলেন। দর্শন আলাপ করছেন। কঠিন সব জ্ঞানের আলাপ হচ্ছে। হঠাৎ রাস্তায় ভুস করে বের হলো ঝাকানাকা সুন্দর একটি মেয়ে। এথেন্সের রাস্তায় কোনো মেয়ে আসতে পারে না। মেয়েদের ঘরের বাইরে আসা নিষেধ। এই মেয়েটি নিষিদ্ধ পল্লির। সেজন্য বাইরে আসতে পেরেছে। মেয়েটিকে দেখে সক্রেটিসের ছাত্ররা সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ বাঁকিয়ে হাঁ করে রইল। একেবারে 'পড়ে না চোখের পলক' অবস্থা। এই ছেলেরা সারা মাসে একটিও মেয়ে দেখতে পায় না। হঠাৎ অপ্সরা ধরনের কাউকে দেখে পলক ফেলতে পারছে না।

ছেলেদের কাণ্ড দেখে মেয়েটি আহ্লাদে বাক-বাকুম। মেয়েটি সক্রেটিসকে চেনে। সক্রেটিসকে ছোট্ট একটু পিন দিয়ে মেয়েটি বলল, দেখুন, সক্রেটিস, আপনি তো বিরাট জ্ঞানী। কিন্তু আপনার চেয়ে আমার শক্তি অনেক বেশি। আমি চাইলে এক্ষুনি আপনার সব ছাত্রকে আঙুলের ইশারায় যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আপনি চাইলেও আমার কোনো অনুরাগীকে নিয়ে আসতে পারবেন না।

সক্রেটিস বললেন, কথা সত্য। এটির কারণ হচ্ছে তুমি ওদেরকে নিয়ে যাবে নিচের দিকে, আর আমি নিয়ে যাচ্ছি উপরের দিকে। নিচে নামা খুবই সহজ, কিন্তু উপরে ওঠার পথ সব সময়ই কঠিন। ভীষণ কঠিন

প্লেটোর খুবই মজা লাগল। সবার সাথে কথায়ই তিনি খোঁচা দিচ্ছেন। প্রতিটি বাক্যে খোঁচা আছে। কারও সাথে রাগ করছেন না। কিন্তু বুদ্ধি করে পিন দিচ্ছেন। এমন রসালো, বুদ্ধিদীপ্ত পিন প্লেটো আগে কখনো শোনেননি।

এই এক বিকেলে প্লেটোর জীবন পাল্টে যাচ্ছে। সে সব সময় নতুন কিছু খোঁজে। নতুন কিছু শেখার আশায় দেশ-বিদেশের জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে তার ফালতু মনে হয়েছে। তারা যা বলে, প্লেটো নিজেই তার চেয়ে অনেক বেশি জানে। তার ধী-শক্তি অনেক তীক্ষ্ণ। কিন্তু এই প্রথম মনে হচ্ছে, কোনো মানুষ তাকে শেখাতে পারেন। নতুন যদি কিছু জানার থাকে, তো সেটি বলতে পারেন এই সক্রেটিস। এত দিন কেন আসেনি সক্রেটিসের কাছে? অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়েছে।

এথেন্সে গণতন্ত্রে সবাই কথার রাজা। কিন্তু গণতন্ত্রের নেতাদের কথা বোমার মতো। শব্দ দিকে দিকে ছড়িয়ে যায়। ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে যায়। সেখানে একজন বলে, সবাই শোনে। কিন্তু সক্রেটিসের কথা বোমা নয়, তার কথা মিষ্টি সংলাপ। তার প্রতিটি বাক্যে খোঁচা আছে। তিনি কথা একা বলেন না, অন্যদের দিয়ে বলান।

প্লেটো ভাবছে, সক্রেটিস একজন জ্ঞান ভিখারি। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে জ্ঞান ভিক্ষা করে বেড়ান। নাকি জ্ঞানের ফেরিওয়ালা, জনে জনে জ্ঞান বিলি করেন? এ কার সাথে তার দেখা হলো! তার মনে হলো, এই লোক তাকে টানছে, কেমন একটি আবেশের মতো টানছে। কাল আবার আসতে হবে সিমনের দোকানে। প্লেটো সক্রেটিফাইড হয়ে গেল।

হঠাৎ সক্রেটিস প্লেটোকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি শুধু শোননেওয়ালা? কিছুই বলবে না?

প্রশ্নের জন্য প্লেটো প্রস্তুত ছিল না। কী বলবে সে? অমন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলে কিছু উত্তর করা যায়? তার জিভের ডগায় যা এলো দুম করে সেটিই জিজ্ঞেস করল, আপনি কিছু লিখেন না কেন?

সক্রেটিস হেসে বললেন, এথেন্সে পেপিরাস কাগজের অনেক দাম। এত টাকা আমার নেই। পেপিরাস কিনতে পারি না বলে আমি কিছু লিখি না।

প্লেটো এমন তন্ময় হয়ে ছিল, সক্রেটিস যে মজা করছেন, সেটি বুঝতেই পারল না। সে ঝোলার ভেতর থেকে এক গোছা পেপিরাস বের করে সক্রেটিসের হাতে দিয়ে বলল, এই নিন। এখন থেকে আপনি লিখবেন। যত পেপিরাস লাগে, আমি দেব।

হো হো করে উঠলেন সক্রেটিস। ক্রিতোও হাসছেন।

সক্রেটিস বললেন, দেখো ক্রিতো, দেখো। এতদিন তো আমার বিপদে শুধু তুমিই এগিয়ে আসতে। এখন থেকে আর একজন পেলাম। আমার কাছ থেকে লেখা বের করার জন্য ও নিজের সব পেপিরাস দিয়ে দিচ্ছে।

ক্রিতো বললেন, প্লেটো তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে। ওর চোখের দিকে তাকাও। ঐ চোখে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা উপচে পড়ছে।

যারা সক্রেটিসকে ভালোবাসে, তারা পাগলের মতো ভালোবাসে। আর যারা ঘৃণা করে, তারা তীব্র শত্রুর মতো ঘৃণা করে।

গুরুগম্ভীর পরিবেশ বেশিক্ষণ ভালো লাগে না সক্রেটিসের। তিনি প্লেটোকে বললেন, ওরে ঈশ্বর সবাইকে সবকিছু দেন না। তিনি আমাকে একখান মুখের মতো মুখ দিয়েছেন। সেই মুখে আমি কথা বলি। ঈশ্বর আমাকে লেখার জন্য সেরকম হাত দেননি। সেই হাত তোমাকে দিয়েছে। তুমি লিখতে পার। তুমি লেখা শুরু কর।

***

প্লেটো সেই যে সক্রেটিসের পিছু ধরেছে, আর ছাড়তে পারেনি। এখন প্রতিদিন সকালে উঠে তার একটিই রুটিন। সেটি হলো সক্রেটিসকে খুঁজে বের করা। কেন যে সক্রেটিসের সাথে সময় কাটাতে তার এত ভালো লাগে, সে জানে না। প্লেটো এথেন্সের সবচেয়ে যুক্তিবাদী ছেলে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছুর কারণ বের করে। অথচ এই কারণটি বের করতে পারছে না! একটি অতি সহজ কারণ হলো: সক্রেটিস সবার মতো নন, তিনি অন্যরকম; তিনি হাবেভাবে খুবই সহজ; কিন্তু আসলে রহস্যময়, তাকে বোঝা যায় না। সেজন্য ছেলেরা তার পিছে পিছে ঘোরে।

কিন্তু এই কারণ প্লেটো বিশ্বাস করে না। হাবভাব অন্যরকম বলেই তার মতো ছেলে একজনের পিছে পিছে ঘুরবে, এটি হতে পারে না। অন্য কিছু একটা আছে। সেই কিছুটা যে কী, প্লেটো এখনও বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু সত্যি হলো, প্লেটো সক্রেটিসের পেছনে ঘুরছে। এথেন্সের সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ছেলেটিও সক্রেটিসের চ্যালা হয়ে গেছে।

প্লেটো এখন সক্রেটিসের সাথে উদ্ভট উদ্ভট জায়গায় যায়। এমন এমন জায়গা যেখানে আগে সে কখনো যায়নি। যেমন এই মুহূর্তে তারা একটি অন্যরকম জিমনেশিয়ামে এসেছে। এসেই প্লেটোর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

এটি ভদ্রলোকের জিম নয়। যেসব ছেলের বাবার পরিচয় নেই অথবা বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাদের জন্য এথেন্সের সরকার এই জিম'[১১৪] বানিয়ে দিয়েছে। এখানে শুধু সমাজের একেবারে নিচুতলার ছেলেরা আসে। আর প্লেটো এথেন্সের সবচেয়ে উঁচু তলার মানুষ। সে ভদ্রলোকের জিমে যায়, এথেন্সের সবচেয়ে ধনীদের জন্য যেসব জিম, সেগুলোতেই প্লেটো ব্যায়াম করে। সেখানে জ্ঞানের আলাপ হয়। হোমার, সফোক্লিসদের বই নিয়ে কথা হয়, সেখানে সবাই প্লেটোকে হোমারের সাথে তুলনা করে। ব্যায়াম শিক্ষক তাকে নিয়ে গর্ব করেন। সেখানে সে হিরো। আর এখানে তেমন কেউ তাকে চেনে না। এখানে কি জ্ঞানের কোনো আলাপ হবে? কতগুলো অজ্ঞাতকূলশীল, অশিক্ষিত ছেলে

খেলাধুলা করছে। সক্রেটিস কেন যে এখানে এসেছেন, প্লেটো বুঝতে পারছে না। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষটি এই অশিক্ষিত, ন্যাংটা জন্মপরিচয়হীনদের মাঝে এসে বসে আছেন, ভাবতেই তার মাথা ধরে যাচ্ছে।

গ্রিসে শরীরচর্চা খুবই জরুরি বিষয়। এখানে প্রতিটি ছেলেকে যুদ্ধ করতে হয়। অনেকেই অলিম্পিকে অংশ নেয়। তাই শরীর ভীষণ দরকারি জিনিস। ছেলেরা দিনের অনেকটা সময় জিমনেশিয়ামে কাটায়। গ্রিক শব্দ জিমনোস থেকে এসেছে জিমনেশিয়াম। জিমনোস মানে ন্যাংটা। তাই যেখানে ন্যাংটা হয়ে খেলাধুলা করা হয়, সেই জায়গার নাম জিমনেশিয়াম। এখানে ছেলেরা ন্যাংটা হয়েই শরীরচর্চা করে। জিমনেশিয়াম মানে খোলা আকাশের নিচে ঘাস বিছানো অনেক বড় প্রান্তর।

সেই ঘাসে বসে সক্রেটিস নিচুতলার ছেলেদের সাথে খোশগল্প করছেন। গল্পে গল্পে চলছে সক্রেটিস মেথডে প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা। দুষ্টু-মিষ্টি আলাপ। প্লেটো কিছুই বলছে না, মাথা নিচু করে শুনছে। সে বিন্দু বিন্দু ঘামছে। তার ঘামকে বলা যায় 'মন খারাপের ঘাম'। আগামীকাল থেকে সে আর সক্রেটিসের কাছে আসবে না। দুপুর রোদে এমন অ-জায়গায় কু-জায়গায় যাওয়ার জন্য তার জন্ম হয়নি।

এর ফাঁকে আধান্যাংটা ছেলেরা আলাপ শুরু করেছে। আলাপের বিষয়, তরুণরা কেন সক্রেটিসকে ভালোবাসে? একেকজন একেক উত্তর দিচ্ছে। ভালো ভালো উত্তরই আসছে। প্লেটোর মাথায়ও উত্তর এসেছে, কিন্তু এই ন্যাংটা মূর্খদের মাঝে কিছুই বলবে না। হঠাৎ পেছন ভেসে এলো একটি স্বর,

'সক্রেটিসকে ভালোবাসার কারণ: সক্রেটিস দেখতে কদাকার কিন্তু মনটা বিশাল, তিনি জুতা পরেন না, তাই তার পা কাদায় ভরা; তিনি যেখানে যান কাদামাখা পায়ের চিহ্ন পড়ে থাকে, সেই চিহ্নটি অনুসরণ করতে পারলে পাওয়া যায় সুন্দর জীবন।'

সবাই চমকে পেছনে তাকাল। সবচেয়ে বেশি চমকে গেছে প্লেটো। এমন জায়গায় এমন মিষ্টি আর সুন্দর কথা কেউ বলতে পারে, সেটি সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে উঠে দেখতে গেল কথাটি কে বলল। দেখে আরও অবাক! যে বলেছে সে শুধু জন্মপরিচয়হীন নয়, সে আরও নিচুতলার মানুষ। সে একজন দাস। তার মাথা ন্যাড়া। দাসটির বয়স অল্প, প্লেটোর চেয়েও ছোট হবে। ছেলেটি মাথা নিচু করে কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দাসদের কোনো ভদ্রসমাজে কথা বলার নিয়ম নেই। তাই সে ভয়ে কাঁপছে।

সক্রেটিস হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি বালক?

ছেলেটি উত্তর দিল, আমি একজন দাস। আমার নাম ফিদো'[১১৫]। বাড়ি এলিস নগরে, যেখানে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয় সেখানে।

'তুমি দাস হলে কীভাবে?'

'খুবই সহজ উপায়ে। আমাদের নগর যুদ্ধে হেরে গেলে বিজয়ীরা আমার বাবা-মাকে মেরে ফেলে আর আমাকে দাস বাজারে বিক্রি করে দেয়। আমাকে যে কিনেছে, সে নিয়ে

এসেছে এথেন্সের কেরামেকাসে।'

'কেরামেকাসে!' চমকে উঠলেন সক্রেটিস। কেরামেকাস মানে এথেন্সের ভয়ংকর নিষিদ্ধ পল্লি। সেখানে তরুণ ছেলেদেরও রাখা হচ্ছে! ছেলেটি কী সাংঘাতিক জীবন যাপন করছে! কেরামেকাসের নাম শুনেই সক্রেটিসের মনে পড়ল আসপাশিয়ার কথা। সেই মেয়েটিও কেরামেকাসে ছিল। আসপাশিয়াকে বাঁচিয়েছিলেন পেরিক্লিস। এখন এই ফিদোকে বাঁচাবে কে? কিছুক্ষণ আলাপ করেই সক্রেটিস বুঝলেন, ছেলেটি জ্ঞানী। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর কথা বলে। সাহসও আছে। সক্রেটিস ছেলেটিকে পছন্দ করেছেন। তিনি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু তার টাকা নেই। টাকা দেবেন অন্য কেউ।'

দুদিন পরে খুব সকালে ফিদোর মালিক তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। ফিদো বের হয়ে দেখে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন সক্রেটিস ও প্লেটো। আর ক্রিতো গুণে গুণে অনেকগুলো টাকা দিচ্ছেন ফিদোর মালিককে I

ঘটনাটি ফিদোর এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। সে চিমটি কেটে দেখছে ঘটনা সত্য কিনা। বিশ মিনা পরিমাণ অর্থ দিয়ে তাকে মালিকের কাছ থেকে কিনেছেন ক্রিতো। সক্রেটিস যে সত্যি সত্যি তাকে মুক্ত করে ফেলবেন, সে বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছে, মানুষ তো কত কথাই বলে। সকালে বলে, বিকেলে ভুলে যায়। তার উপর সক্রেটিস হলেন বাচাল শ্রেণির লোক। এরা সারাদিন কথা বলেন। কাজ- কর্ম করেন না। তারা যে সত্যিই তাকে গোলামি থেকে বাঁচাবেন, এত বড় আশা সে করেনি।

ক্রিতো তাকে কিনেছেন। হিসাব মতো এখন থেকে ফিদো ক্রিতোর দাস। সে ক্রিতোকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে যাচ্ছে।

ক্রিতো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তুমি এই মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত মানুষ। আমি শুধু টাকা দিয়েছি, আসল লোক তো সক্রেটিস। যাও, ঐ বুড়োকে ধরে আনন্দ করো।

কিন্তু আনন্দ করতে গিয়ে ফিদো কেঁদে ফেলল। গত কয়েক বছর সে দেখেছে মানুষ কত খারাপ হতে পারে। কত নিষ্ঠুর হতে পারে। তার নগর যুদ্ধে হেরে গেলে তাকে বন্দি করে ফেলে শত্রুরা। মাথা ন্যাড়া করে এথেন্সে দাস বাজারে বেচে দেয়। শুরু হয় তার গোলামি জীবন। তখন তার বয়স তেরো। গত চার বছর ধরে এমন কোনো কষ্ট নেই যেটি সে করেনি। সে যে একজন মানুষ, সেটিই ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছিল। গোলামি যে কোনোদিন শেষ হবে, ভাবতেও পারেনি। তার মনে হতো মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো জীব পৃথিবীতে নেই।

আজ সক্রেটিস আর ক্রিতোর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের মতো ভালো প্রাণী আর নেই। ছোটবেলায় ভালো মানুষের কথা সে বইতে পড়েছে। সেরকম ভালো মানুষ দু'একজন এখনও পৃথিবীতে আছেন।

ফিদো কাঁদছে। দুই প্রবীণকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। সক্রেটিস তার মুক্তিদাতা আর ক্রিতো হলেন মুক্তির জন্য অর্থদাতা। দুজনকে ধরে সে অঝোরে কাঁদছে। ক্রিতো তার কান্না থামাতে চাচ্ছেন। সক্রেটিস নিষেধ করলেন। ফিদো কাঁদুক। মুক্তির আনন্দে কাঁদুক। নতুন জীবনের জন্য কাঁদুক। কিছু আনন্দের উদযাপন কান্না ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না।

ফিদো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, আমি জীবনে কোনোদিন এই ঋণ শোধ করতে পারব না।

সক্রেটিস হাসতে হাসতে বললেন, ঋণ-টিন কিচ্ছু নয়। তোমাকে ছাড়িয়ে নিলাম কারণ তুমি একজন জ্ঞান-প্রেমী। অন্য কোনো কারণে নয়। এথেন্সে হাজার হাজার দাস আছে। আমি কি অন্যদের মুক্ত করতে গিয়েছি? সেই সাধ্য আমার নেই। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে তোমাকে ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে এই ছেলেটি দাস হয়ে থাকার জন্য জন্মায়নি। সুন্দর জীবনের অধিকার ওর আছে।

ফিদো ভাবছে, এথেন্সে তো কত মানুষ। কত ধনী, কত নেতা। অন্য কেউ তো এগিয়ে আসেনি। এই দুই পাগলা বুড়োই তাকে গোলামি থেকে বাঁচালেন। এই বুড়োরা অন্য রকম। এথেন্সের মানুষ এদের সত্যিকার পরিচয় জানে না।

ক্রিতো বললেন, তোমার তো থাকার একটি জায়গা লাগবে। তুমি চাইলে আমার বাড়ি থাকতে পার।

সক্রেটিস বললেন, তাতে একটি সমস্যা আছে, ক্রিতো। তুমি ওকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন তোমার বাড়িতে থাকলে ও নিজেকে তোমার দাসই ভাববে। মুক্তির স্বাদ পেতে ওকে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। ক্রিতো বললেন, ঠিক আছে। তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

প্লেটো বলল, আপনাদের আপত্তি না থাকলে ফিদো আমার বাড়িতে থাকতে পারে। সে আমাকে পছন্দ করে।

সক্রেটিস ফিদোর দিকে তাকালেন। তার চোখে সম্মতি।

সক্রেটিস ফিদোকে বললেন, তলে তলে প্লেটোকেও বন্ধু করে ফেলেছো? তুমি তো মহাচালবাজ। তোমাকে দিয়ে হবে। যাও, প্লেটোর বাড়িতেই ওঠো। সে কিন্তু বিশাল চিন্তাবিদ। তার সাথে যা করবে, বুঝে শুনে করবে।

ফিদো বলল, জি, আচ্ছা।

সক্রেটিস বললেন, এসব জি হুজুর, জি আচ্ছা এগুলো বাদ দাও। তুমি এখন মুক্ত মানুষ। চালচলনে একটি মুক্তি মুক্তি ভাব আনো। আর একবারও 'জি আচ্ছা' বলবে না।

ফিদো ঘাড় বাঁকা করে আবার বলল, জি আচ্ছা।

চারজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

সক্রেটিস বললেন, শোনো, পুরনো বোল-চাল বাদ দাও। নতুন সাজসজ্জা করো। নতুন জীবন, নতুন সাজ। এতদিন ছিলে দাস, ওরা তোমার মাথা ন্যাড়া করে দিত। এখন থেকে

লম্বা চুল রাখবে। মাঝে মাঝে চুলে হাত দিয়ে বলবে এটি আমার নতুন জীবন, আমার সুন্দর জীবন।

ফিদো ঠিক করল, আজ থেকে তার জীবনের আদর্শ হলো সক্রেটিস। সক্রেটিসের সুন্দর জীবনের তত্ত্বকে সে তার জীবনে প্রয়োগ করবে। তিনি যেভাবে বলেন, সেভাবেই জীবন যাপন করবে। এই মুহূর্ত থেকে ফিদো সক্রেটিসের ছায়াসঙ্গী। ছায়ার মতো অনুসরণ করবে সারা জীবন।

***

১১৪. এথেন্স দেয়ালের বাইরে এলসাস নদীর তীরে অবৈধ সন্তানদের জন্য এই সরকারি জিমের নাম Kznosarges.

১১৫. ফিদো (Phaedo): সক্রেটিসের শিষ্য এবং পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত দার্শনিক। তিনি প্লেটোর সমবয়সী বলে ধারণা করা হয়। সক্রেটিস তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। তার মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত ফিদো তার সাথে ছিলেন। সক্রেটিসের মৃতদৃশ্যের বর্ণনা করে প্লেটো যে ডায়ালগ লেখেন, সেটির নাম Phaedo সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে তিনি Elis নগরে Elean School of Philosophy প্রতিষ্ঠা করেন।

৪৭

‘সময়ের থেকে কিছু লুকিও না,
ও সব দেখতে পায়, সব শুনতে পায়;
একদিন সব প্রকাশও করে দেয়।’
— সফোক্লিস

আজ জেনথিপি তার ভালোবাসার শক্তি পরীক্ষা করবেন।

গত কিছুদিন ধরে জেনথিপি খুব ভালো আছেন। তিনি বেশি বেশি বাইরে যাচ্ছেন। আগে বাইরে যেতে পারতেন না। এখন পুরুষের সংখ্যা কমে গেছে। এখন মেয়েরা নিয়মিতই বাইরে যায়। বাইরে গিয়ে তিনি টের পেলেন সক্রেটিস আসলে খুব জনপ্রিয় মানুষ। তার অনেক ছাত্র। অনেক শিষ্য। তার কথায় ওঠে বসে, এমন মানুষের সংখ্যা এথেন্সে অনেক। রাস্তা দিয়ে জেনথিপি হাঁটলে, লোকজন ফিসফিস করে, ঐ যে সক্রেটিসের বউ যায়। তার স্বামী এথেন্সের খুবই পরিচিত মানুষ। জীবিত মানুষদের মধ্যে তার মতো শ্রদ্ধার মানুষ খুব অল্প আছে। এথেন্সের যেকোনো নেতার চেয়ে এখন সক্রেটিসকে মানুষ বেশি ভালোবাসে। যারা শ্রদ্ধা করে না, তারা গালি দেয়; কিন্তু সক্রেটিসকে সমীহ করে না এমন মানুষ খুব কম আছে। খুব অল্প বয়সে যারা সক্রেটিসের ভক্ত হয়েছিল, তারা এখন মধ্যবয়সী। তারা সক্রেটিসকে চেনে। তারা তাকে আপন ভাবে। তবে শত্রু কমেনি। কিছু মানুষ আগে যেমন শত্রু ছিল, এখনও তাই আছে।

এখন দেশ-বিদেশের অনেক ছেলে আসে সক্রেটিসের সাথে আলাপ করতে। অন্য দেশ থেকে অনেকেই তাকে নিমন্ত্রণ করে। সক্রেটিস যে বিশেষ কেউ, সেটি দেশ-বিদেশের লোক জানে।

স্বামীর জন্য গর্ব হলো জেনথিপির। এত বছর এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। সক্রেটিসের ঘরের জীবন আর বাইরের জীবনের সূত্র হতে পারেননি। এখন সময় এসেছে। স্বামীর প্রতি নজর দেওয়া দরকার।স্বামী এখন প্রায় ষাট বছরের বুড়ো।

বুড়ো স্বামীকে সাজাতে চান জেনথিপি। অনেক বছর আগে একজোড়া চটি কিনেছিলেন। সক্রেটিস ছুঁয়েও দেখেননি। সেই চটি জোড়া বের করলেন। আজ তিনি স্বামীকে জুতা পরাবেনই। দেখি ভালোবাসার শক্তি কতখানি!

আজ বিকেলে সক্রেটিসের দাওয়াত আছে। একটি সিম্পোজিয়াম আছে। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। সিম্পোজিয়ামে সবাই অনেক সেজেগুজে যায়। তার স্বামী কোনোদিন সাজেন না। আজ তিনি স্বামীকে সাজাবেন। একটি নতুন কাপড় বের করলেন। আর চিরুনিটা সামনে রাখলেন। নিজের হাতেই যা করার করতে হবে।

সক্রেটিস কিছুই বুঝতে পারছেন না। কী ভূত চেপেছে স্ত্রীর মাথায়!

জেনথিপি নিজের হাতেই নতুন কাপড় পরিয়ে স্বামীর চুল আঁচড়ে দিলেন। এবার চটি পরার সময়। চটি দেখেই সক্রেটিসের মুখ কালো হয়ে গেল। এতক্ষণ যা করেছেন, তা না হয় হলো। কিন্তু জুতা? সবাই জানে তিনি জুতা পরেন না। এখন লোকে কী বলবে? তাছাড়া তার জীবনের লক্ষ্য হলো— যথাসম্ভব কম জিনিসে সুন্দর জীবন।

এখন বউয়ের জন্য জীবনের একেবারে মৌলিক জিনিস ত্যাগ করতে হচ্ছে। তিনি জেনথিপির মুখের দিকে তাকালেন। সেই মুখে একটি মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে আছে। হাসিতে আবদার আছে। স্বামী কথা রাখবেন সেই আবদার।

সক্রেটিসের মনে পড়ল সফোক্লিসের সংলাপ, 'আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধু ভালোবাসার জন্য'। তিনি মাঝে মাঝেই বন্ধুদের বলেন, 'আমি শুধু একটি জিনিসই বুঝি, সেটি হলো ভালোবাসা'। সেই ভালোবাসার জন্য তিনি একবেলা জুতা পায়ে দিতে পারবেন না? লাফ দিয়ে উঠলেন তিনি। জীবনে প্রথমবারের মতো জুতা পায়ে দিলেন।

সক্রেটিস বললেন, তোমার মান রাখতে আমি সাজলাম। জুতা পরলাম। সেজেগুজে সিম্পোজিয়ামেও যাচ্ছি। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। এখন আমার একটি কথা রাখবে? তুমি সক্রেটিসকে বদলে ফেলো না। সক্রেটিস যেমন আছে, সেরকম থাকলেই পৃথিবীর ভালো হবে। তাই আজকের পরে আর জুতা পরব না।

জেনথিপি প্রথমে একটু হতাশ হলেন। পরে বুঝলেন, সক্রেটিস বদলে গেলে লোকে আর তার কাছে সুন্দর জীবনের উপায় জানতে চাইবে না। তাই তিনি যেমন আছেন, সেরকমই থাকুন। আজ তো কথা রেখেছেন।

জেনথিপির ভালোবাসা জয়ী হয়েছে। চটি পরে রাস্তায় নেমেছেন সক্রেটিস।

সক্রেটিস চটি পায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন।[১১৬]। তিনি জীবনে কোনোদিন পায়ে চটি পরেননি। আজই প্রথম। ছোট বাচ্চা ছেলে প্রথম চটি পরলে যেমন শব্দ করে হাঁটে, সেরকম হাঁটছেন। শব্দ হচ্ছে টাস-টুস। শব্দে লোকজন তাকাচ্ছে। এই অবস্থায় সক্রেটিসকে দেখার ভাগ্য আগে কারও হয়নি।

দেখা হলো তার এক ছাত্রের সাথে। ছেলেটি বিশ্বাস করতে পারছে না। দুইবার চোখ ঘষে সে নিশ্চিত হলো, এটি সক্রেটিসই। সক্রেটিসের বেশভূষা দেখে সে ভিড়মি খেয়েছে। কাঁচুমাচু হয়ে সামনে এলো ছেলেটি। সে হাসবে, না কী করবে বুঝতে পারছে না। তার গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে সে যদি সবাইকে ডেকে দেখাতে পারত। তার বলতে ইচ্ছে করছে, এই যে ভাই, শুনুন। চটি-পায়ে সক্রেটিসকে দেখতে হলে এখুনি আসুন। এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না।

সক্রেটিস হাসি দিয়ে বললেন, কবি আগাথনের বাড়ি যাচ্ছি। সিম্পোজিয়ামে। গতকাল সে ট্র্যাজেডি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। আজ তার বাড়ি সিম্পোজিয়াম।

ছেলেটি বলল, আপনার এই সাজগোজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এই বেশে আপনাকে কেউ চিনবে না। ভাবীও চিনবেন না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সন্ধ্যায় কিন্তু ভাবী বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।

সক্রেটিস মনে মনে ভাবলেন, মেয়েদের বোঝা এত সহজ নয়। সেটি বললেন না। একটি লজ্জার ভাব মুখে এনে বললেন, সুন্দর হয়ে সুন্দরের কাছে যাচ্ছি। যাবে নাকি বিনা নিমন্ত্রণে সিম্পোজিয়ামে খেতে?

ছেলেটি বলল, আপনি যদি বলেন, তো যাব।

সক্রেটিস একা থাকতে পারেন না। একা থাকলেই তার হাঁসফাঁস লাগে। তিনি মানুষ খোঁজেন। তিনি বললেন, তো চলো আমার সাথে। যার বাড়িতে অনুষ্ঠান, সেই আগাথন ভালো মানুষ। কবি মানুষ। বিনা নিমন্ত্রণে গেলেও বেজার হবে না। তার কলিজা বড়।

ছেলেটিকে ভুংভাং দিয়ে সক্রেটিস সিম্পোজিয়ামে নিয়ে চললেন। তারা দুজনে চলছেন। চলতে চলতে কোনো এক ফাঁকে যেন সক্রেটিস পেছনে পড়ে গেছেন। ছেলেটি আগাথনের বাড়ির সামনে যেতেই বাড়ির দাস তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। তাকে সমাদরে স্বাগত জানিয়ে আগাথন বলল, তুমি তো সব সময় সক্রেটিসের পিছে পিছে ঘোর। তুমি এলে, আর সক্রেটিসকে আনলে না।

ছেলেটি পেছনে তাকিয়ে দেখে, সেখানে কেউ নেই। সে অবাক হয়ে বলল, সক্রেটিস তো আমার পেছনেই ছিলেন। কোথায় গেলেন?

আগাথন সক্রেটিসকে খুঁজতে তার দাসকে পাঠাল। দাস এসে বলল, সক্রেটিস পাশের বাড়ির বারান্দায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে কত ডাকাডাকি করলাম। কোনোরকম টু শব্দও করছেন না।

আগাথন খুব চিন্তায় পড়ে হাঁকডাক শুরু করল, ওরে তাড়াতাড়ি যা, সক্রেটিসকে ধরে নিয়ে আয়।

ছেলেটি বলল, না, না। সক্রেটিসকে। কছুক্ষণ একা থাকতে দিন। মাঝে মাঝে তার এরকম হয়। তিনি একটা কিছু চিন্তা শুরু করেন। এক রকম ধ্যানের পর্যায়ে চলে যান। আবার ঠিক হয়ে যান। আমার মনে হয় একটু পরেই উনি চলে আসবেন।

সিম্পোজিয়াম শুরু হয়েছে। তক্তপোষের উপর আধাশোয়া হয়ে অতিথিরা পান করছে। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা চলছে। আয়োজক আগাথন বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে—কখন সক্রেটিস আসবেন? খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয়, সক্রেটিস ঘরে ঢুকলেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাল।

আগাথন বলল, আপনাকে কিন্তু আমার পাশে বসতে হবে। আপনার একটু ছোঁয়ায় আমার মধ্যে জ্ঞানের কণা প্রবেশ করবে।

সক্রেটিস তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, নাও তোমাকে জাপটে ধরলাম, যত জ্ঞান আছে, শুষে নাও। কিন্তু আহার-পানীয় যা আছে, তাড়াতাড়ি দাও। এমন ক্ষুধা লেগেছে, আজকে আমি সাগর খেয়ে ফেলব।

সবাই জানে, সক্রেটিস ঠাট্টা করছেন। তিনি একেবারেই পরিমিত আহার করেন। কোনোদিন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু নেন না।

হাসি-ঠাট্টা চলতে চলতে খাওয়া শেষ হলো। আগাথন প্রস্তাব দিল, বন্ধুরা, আপনারা রাজি হলে, আজ আমরা একটি জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলব।

সবাই অবাক। সিম্পোজিয়ামে জটিল বিষয়?

আগাথন বলল, জটিল বিষয়টি হলো— প্রেম। উপস্থিত সবাই একে একে বলবে, প্রেম কী জিনিস?

সবাই হই হই করে উঠল। প্রেম আবার কোনো জটিল বিষয় নাকি! এই বিষয়ে সবাই ওস্তাদ। সবাই বলতে রাজি। সিম্পোজিয়ামের গান-বাজনা বন্ধ করা হলো। বিদায় দেওয়া হলো শিল্পীদের। সক্রেটিস বললেন, তাহলে সুরা পানও বন্ধ হোক। নেশামুক্ত পরিবেশে আলাপ হোক।

সুরা পান বন্ধ করতে ছেলেদের ইচ্ছে করছে না, তবু মেনে নিল। সক্রেটিস জীবনে কোনোদিন মাতাল হননি। তাকে ছোটবেলা থেকে কেউ কোনোদিন মাতাল হতে দেখেনি।

আজ এখানে আছে নাট্যকার এরিস্টোফানিস। সে সক্রেটিসকে নিয়ে 'মেঘ' নাটকটি লিখেছিল। কিন্তু পরে সে ভুল বুঝতে পেরেছে। এনিতাসের পরামর্শে এই নাটক লিখেছিল, তখন সে সক্রেটিসকে জানতই না। এখন সক্রেটিসকে জেনেছে এবং ভুল স্বীকার করেছে।

সক্রেটিস তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ক্ষমা করার মাঝে যে আনন্দ আছে, সেটি সক্রেটিস ভালোবাসেন। সবাই প্রস্তুত। প্রেমের আলাপ শুরু হবে।

তারা বারান্দায় বসেছে। আকাশে রুপালি চাঁদ। ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে। চাঁদের আলোতে কয়েকজন যুবক একটি গোলটেবিল বৈঠকে বসেছে। বৈঠকের বিষয়— ভালোবাসা কাকে বলে?

সবাই মনের কথা উজাড় করে বলছে, ভালোবাসা কী জিনিস। মনে হচ্ছে এরা সবাই ভালোবাসার স্কুলের শিক্ষক।

সবশেষে সক্রেটিসের পালা। সক্রেটিস বলবেন। সবাই নড়েচড়ে বসল। সক্রেটিস সবার কথাবন্ধু, কথার জাদুকর। তিনি কথা শুরু করলে সবাই গভীর মনোযোগ দেয়, একেবারে পিনপতন নীরবতা।

সক্রেটিস শুরু করলেন-

'ভালোবাসা বিষয়ে আমার গুরু হলেন ডিওটিমা। ভালোবাসা নিয়ে আমি যা কিছু শিখেছি, সেটি তার কাছ থেকেই। অনেক বছর আগে তিনি এথেন্সে এসেছিলেন। তিনি আমাকে ভালোবাসা নিয়ে অনেক কিছু বলেছিলেন। আজ সব মনে নেই। যতটুকু মনে আছে বলছি—

ভালোবাসার বাবার নাম ঐশ্বর্য। আর মা হলেন দারিদ্র্য বা অভাব। ভালোবাসা তার বাবা-মা দুজনের বৈশিষ্ট্যই পেয়েছে। ভালোবাসার বাবা ঐশ্বর্য মানে সম্পদ, ঐশ্বর্য মানে ক্ষমতা। সেজন্য ভালোবাসার অনেক ক্ষমতা, অনেক শক্তি। তুমি ভালোবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারবে। পৃথিবীতে ভালোবাসার মতো শক্তিশালী জিনিস আর নেই। আর ভালোবাসার মা হলেন অভাব। সেজন্য ভালোবাসার চারপাশে সবসময় একটি অভাব। মানুষ প্রেমে পড়লে শুধু চাই আর চাই। তাই ভালোবাসার সাথে সব সময়ই একটি অভাব

জড়িয়ে থাকে, সব সময় একটি না পাওয়ার ব্যাপার থাকে। ভালোবাসার জন্ম হয়েছে সৌন্দর্যের দেবীর জন্মদিনে। সেজন্য ভালোবাসা সব সময় সুন্দরের খোঁজ করে। যেখানেই সুন্দর কিছু আছে, সেখানেই ভালোবাসা। ভালোবাসা হলো ঐশ্বর্য আর অভাবের সন্তান। এই দুটো হলো পুরোপুরি বিপরীত। ঐশ্বর্য সুন্দর আর অভাব অসুন্দর। ভালোবাসার যেমন সুন্দর করার ক্ষমতা আছে, তেমনই কিছু অসুন্দর করার ক্ষমতাও আছে। ভালোবাসা যেমন মঙ্গল করে, তেমনই হিংসারও জন্ম দেয়। তাই ভালোবাসা শান্তি আনে, তেমনই ভালোবাসা থেকে যুদ্ধও হয়।

সক্রেটিস বললেন, আমার গুরু ডিওটিমা ভালোবাসার ধাপ বলেছেন। সেটিও চমৎকার। তিনি বললেন—

মানুষ প্রথমে দেহের সৌন্দর্য দেখে ভালোবাসে। সবাই এভাবেই শুরু করে। এরপর আর একটু জ্ঞান বাড়লে, আর শরীরের সৌন্দর্য নয়, মনের সৌন্দর্য খোঁজে। সেটি আর একটু উচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা। মানুষ যখন আরও একটু বুঝতে শেখে, তখন সে জ্ঞানকে ভালোবাসতে শুরু করে। এক সময় সে হয়ে যায় জ্ঞানের প্রেমিক। আর জ্ঞানের প্রতি প্রেমই হলো সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা। জ্ঞানের প্রেমিক হলেন দার্শনিক বা ফিলোসফার (Philosopher)। ফিলিন (philein) মানে ভালোবাসা আর সফি (Sophie) মানে জ্ঞান। ফিলোসফার হলেন যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন। জ্ঞানপ্রেমিক। তাই ভালোবাসার সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা হয়, মানুষ দার্শনিক হয়ে যায়।'

সবাই হাততালি দিল। প্রেমের এমন ব্যাখ্যা কেউ আগে শোনেনি।

সক্রেটিস যখন কথা বলছিলেন, তার মাঝখানে সেখানে এসে হাজির এলসিবিয়াডিস। সে খুব চমৎকার সাজসজ্জা করে এসেছে। তার মাথায় বেগুনি ফুল। সে এসে দেখে, সক্রেটিস কথা বলছেন।

সক্রেটিস শেষ করতেই এলসিবিয়াডিস বলল, অন্য কারও কথায় আমরা তেমন পাত্তা দেই না। কিন্তু যখন শুনি সক্রেটিস বলছেন, তখন শ্রোতা নারী- পুরুষ, শিশু যেই হোক না কেন, সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। আমি নিজে যখন সক্রেটিসের কথা শুনি, আমি কেঁপে উঠি, কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগে। আমি রোমাঞ্চিত হই, আমার বুক ধড়ফড় করে, আমার চোখে পানি চলে আসে।

আজকের সিম্পোজিয়ামে সক্রেটিস খাওয়া-দাওয়ার মাঝখানে এসেছিলেন। তিনি যে জুতা পরেছেন, সেটি কেউ লক্ষ করেননি। এলসিবিয়াডিস লক্ষ করলেন। মহা-হট্টগোল শুরু হলো সক্রেটিসের চটি নিয়ে। সক্রেটিস যে জীবনে কোনোদিন চটি পরবেন, সেটি কেউ ভাবেনি। সবাই জিজ্ঞেস করল, শেষ জীবনে এই জুতা পরার রহস্য কী?

সক্রেটিস লাজুক স্বরে বললেন, জেনথিপি।

সবাই হা হয়ে গেল। সক্রেটিসের হলুদ ঘোড়া তাকে যে এমন ভালোবাসে, সেটি কারও বিশ্বাসই হচ্ছে না।

সক্রেটিস বললেন, জেনথিপির কথায় পরতে হলো। তবে চুক্তি হয়েছে মাত্র এক দিনের জন্য চটি। আজই প্রথম, আজই শেষ।

***

সিম্পোজিয়ামে কী কথা হয়েছে, সেটি প্লেটো শুনেছে। অনেকে তার কাছে এসে বর্ণনা দিয়েছে। তার খুব ভালো লেগেছে। প্রেমের এমন ব্যাখ্যা আর কেউ দিতে পারেনি। কোনো নাট্যকার এমন করে প্রেমের কথা বলতে পারেনি। কেমন আলতো ছুঁয়ে দেওয়ার মতো করে প্রেমকে বর্ণনা করলেন। তাই প্লেটো মনে করছে, সক্রেটিস আসলে অনেক বড় নাট্যকার। প্লেটোর ভালো লাগল।

বিষয়টি নিয়ে সক্রেটিসের কাছে সে বারবার জিজ্ঞেস করেছে। অনেক দিন আলাপ করেছে। প্রেমের এই দিকটা প্লেটোর খুব মনে ধরল। জ্ঞানের প্রতি প্রেম বিষয়টি তার খুবই ভালো লাগল। প্লেটো ঠিক করল সে নিজে একটি প্রেমের তত্ত্ব বানাবে। মানুষের প্রেম কেমন হওয়া উচিত সেটি বের করবে। সক্রেটিসের সিম্পোজিয়ামের কথা শোনার পর সে শুধু এটি নিয়েই ভাবছে। সে কিছুদিন চিন্তা করল। তারপর সে প্রেমের একটি নতুন ধারণা বলল। সেই প্রেমে কোনো কামনা নেই। কোনো শরীরের আকর্ষণ নেই।

প্লেটোর বন্ধু ফিদো বলল, এরকম প্রেমের ভাবনা এসেছে প্লেটোর মাথা থেকে। তো এই প্রেমের নাম হোক প্লেটোনিক প্রেম।

এই ধরনের প্রেমের কথা গ্রিকরা জানে না। ইউরোপে এমন প্রেমের কথা কেউ বলেনি। এখানে দেবতারা প্রেমে পড়েন, খুব ঘন ঘন তাদের প্রেম পায়। সেই প্রেম এরকম— কোনো দেবতার কোনো মেয়েকে ভালো লাগলে, সাথে সাথে তাকে তুলে নিয়ে যায়। আগু-পিছু ভাবার সময় নেই। দেবতাদের রাজা জিউস ইউরোপাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইউরোপার নাম থেকেই ইউরোপ নাম এসেছে। দেবতাদের প্রেম ঐরকম। ধর-মারো-ছাড়ো রকমের প্রেম। কাউকে পছন্দ হয়েছে, তুলে আনো, কিছু দিন পরে ছেড়ে দাও— ভুলে যাও।

দেবতাদের ছাড়া মানুষের প্রেমের কথা তুললে মনে পড়বে বীর একিলিসের প্রেম। একিলিস ট্রয় যুদ্ধে গিয়ে ট্রয়ের রাজার মেয়ে ব্রিজিতকে লুট করে আনে। সে যুদ্ধে পাওয়া নারী। একসাথে থাকতে গিয়ে সেই যুদ্ধ-নারীকে একিলিস পছন্দ করে। কিন্তু তাকে নিয়ে যায় রাজা আগামেমনন। সেই রাগে গ একিলিস অনেক দিন ট্রয়ে যুদ্ধ করেনি। এই হলো বীরের প্রেম

হোমারের আরেক বীর অডিসিয়াস প্রেমের জন্য বিখ্যাত। সে দশ বছর ভীষণ কষ্ট করে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে। একটি সুন্দর প্রেমের মতো বিষয়। কিন্তু এই দশ বছর সে স্ত্রীর জন্যই বসে থাকেনি। নানান নারী এসেছিল তার কাছে। সে তাদের না

করতে পারেনি। ট্রয়যুদ্ধের পর ট্রয়ের রানি হেকুবাও তার যুদ্ধ-নারী হিসেবে বরাদ্দ ছিল। তাই তাকে একজনের জন্য নিবিষ্ট প্রেমিক বলা যায় না।

এখানে প্রেম মানে শুধু পুরুষের ব্যাপার, মেয়েদের জন্য প্রেম-ট্রেমের কোনো বিষয় নেই। সাধারণ মানুষের প্রেমের কথা তেমন শোনা যায় না। একজনের প্রেম কাহিনি খুব বিখ্যাত। তিনি অবশ্য সাধারণ মানুষ নন। একেবারে অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। তিনি হলেন পেরিক্লিস। পেরিক্লিস প্রেম করেছেন। তিনি আসপাশিয়াকে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। তারা বিয়ে করতে পারেননি কিন্তু একসাথে সংসার করেছেন। প্রেমের কথা উঠলেই মানুষ তাদের কথা বলত, আবার ছিঃ ছিঃ করত।

আরেক ধরনের ঘটনার ফিসফাস শোনা যায় এথেন্সে। এখানের বুড়োরা নাকি তরুণ ছেলেদের পছন্দ করে। কেউ এসব কথা প্রকাশ্যে বলে না। তবু ফিসফাস চলে।

কিন্তু প্লেটো সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি প্রেমের কথা ভাবছে। সক্রেটিসকে ডিওটিমা যেরকম প্রেমের কথা বলেছিলেন, সে রকম প্রেম।

কোনো কামনা নেই। শরীর কোনো বিষয়ই নয়। প্রেম হবে একটি আত্মার ব্যাপার। পবিত্র একটি অনুভূতি। যাকে ছোঁয়া যায় না। যে ছুঁতে চায়ও না। কবিরা বলেন, খাঁটি প্রেমে নাকি একটুকু ছোঁয়া লাগে, কিন্তু প্লেটোনিক প্রেমে একটুকুও ছোঁয়া লাগে না। একেবারে-

‘প্রেমের পবিত্র শিখা চিরদিন জ্বলে,
স্বর্গ হতে আসে প্রেম, স্বর্গে যায় চলে’

***

১১৬. প্লেটো Symposium ডায়ালগে সক্রেটিসের চটি পায়ে হাঁটার কথা উল্লেখ করেছেন। কবি আগাথনের বাড়িতে সিম্পোজিয়াম এবং ভালোবাসা বিষয়ে সংলাপও এই বইয়েই আছে।

৪৮

‘শক্তিকে সুপথ না দেখালে তা ক্ষতিই ডেকে আনে।’
—ইউরিপিডিস

এথেন্সে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হচ্ছে। নারীদের নয়, পুরুষদের। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ বাছাই করা হচ্ছে। সে হবে মিস্টার এথেন্স।

প্রতিযোগী হিসেবে খোলা আকাশের নিচে অনেক অল্পবয়সী ছেলে স্বল্প বসনে লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে। বিচারকরা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ নিচ্ছেন। ছেলেদের চলন-বলন পরীক্ষা হচ্ছে। সারাদিন বিস্তর মাপামাপির পর শেষ বিকেলে ঘোষণা হলো, ‘এ বছর মিস্টার এথেন্স হয়েছে এথেন্সের অহংকার এলসিবিয়াডিস।’ তাকে জলপাই শাখার মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে আগের বছরের মিস্টার এথেন্স। তার উপর ফুল বর্ষণ হচ্ছে। সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে। তার চারদিকে এখন প্রশংসার বন্যা।

সক্রেটিস নীরবে শিষ্যের বিজয় দেখছেন। দেখতে দেখতে ভাবছেন সৌন্দর্য কী জিনিস? তার পাশে হিপ্পিয়াস’[১১৭] নামের একটি ছেলে। সক্রেটিস দুম করে ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, সৌন্দর্য মানে কী?

হুট করে এমন প্রশ্নে ছেলেটি ঘাবড়ে গেছে। উত্তরে খুঁজে পাচ্ছে না। একটু ভেবে লাজুক লাজুক মুখে বলল, সুন্দরের কথা ভাবলে আমার শুধু মেয়েদের ছবি মনে আসে। একটি সুন্দর মেয়েই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস।

সক্রেটিস হাসতে হাসতে বললেন, মনের সত্য কথাটাই বলেছ। তবে মেয়েদের মতো সুন্দর আরও অনেক কিছুই আছে। মেয়েদের চেয়ে দেবীরা আরও বেশি সুন্দর। এই তুলনার শেষ নেই। দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। আজ যে মেয়েকে সুন্দর ভাবছো, কালকে তাকে অসুন্দর ভাববে। পরদিন আরেক মেয়েকে তার চেয়ে বেশি রূপবতী মনে হবে। তাই দেহের সৌন্দর্য দিয়ে কিছুকে সুন্দর বলা যায় না। দেহের সৌন্দর্য ফুরিয়ে যায়।

ছেলেটি ভাবছে রূপ ফুরিয়ে যায়? রূপ ক্ষণস্থায়ী, তাহলে দীর্ঘস্থায়ী কী আছে? ভেবে বলল, সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা এগুলোর মূল্য ফুরায় না। এগুলোই হলো সুন্দর জিনিস।

সক্রেটিস আঙ্গুল দিয়ে দেবী এথিনার মূর্তি দেখিয়ে বললেন, মূর্তিটিতে স্বর্ণ আছে, আবার হাতির দাঁতের কারুকাজও আছে। সোনার চেয়ে হাতির দাঁতের কারুকাজ বেশি সুন্দর। ধন-সম্পদ একটির চেয়ে অন্যটি বেশি মূল্যবান। তুমি রুপাকে সুন্দর বললে সোনা রাগ করবে, আবার সোনাকে সুন্দর বললে হীরা রাগ করবে। এর শেষ নেই।

ছেলেটি বলল, তাহলে আপনিই বলুন সুন্দর মানে কী?

সক্রেটিস হতাশ। ছেলেটির সাথে প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা জমল না। তিনি বললেন, তাহলে শোনো:

'কোনো একটি বস্তুর যে কাজ, বস্তুটি যদি ঐ কাজ যথার্থভাবে করতে পারে, তাহলেই বস্তুটি সুন্দর। যেমন: চোখের কাজ হলো দেখা। যে চোখ যত ভালো দেখতে পায়, সেই চোখ তত সুন্দর।'

ছেলেটি সক্রেটিসের চোখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটি হাসি দিল সক্রেটিসের চোখগুলো বিশাল বড় বড়, একেবারে গরুর চোখের কাছাকাছি। বন্ধুরা তার চোখ নিয়ে অনেক হাসাহাসি করে। তার নাকও মোটা, থেবড়ানো।

সক্রেটিস বললেন, আমার চোখ ইয়া বড় কিন্তু এই চোখ সুন্দর কারণ এই চোখ দিয়ে আমি অনেক বেশি দেখতে পাই। আমার নাক বোঁচা কিন্তু এই নাক সুন্দর কারণ এই নাক দিয়ে আমি বেশি ঘ্রাণ নিতে পারি।

ছেলেটি হা করে সক্রেটিসের নাক, চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সক্রেটিস বললেন, যা আমাদের কাজে লাগে, যা আমাদের প্রিয়, আর যা দেখে বা শুনে আমরা আনন্দিত হই, সেসব জিনিসই সুন্দর।

ছেলেটি ভাবছে, সক্রেটিস সুন্দরের যে সংজ্ঞা দিলেন তাতে পৃথিবীতে অসুন্দর কিছুই নেই। সে সাহস করে বলে ফেলল, তাহলে অসুন্দর কী?

সক্রেটিস বললেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে জ্ঞান আর সবচেয়ে অসুন্দর জিনিস হচ্ছে অজ্ঞানতা। জ্ঞানের আলোয় সবকিছু সুন্দর। অজ্ঞানতার অন্ধকারে সবকিছু অসুন্দর। জ্ঞান থাকে অন্তরে। তাই সৌন্দর্য বাইরের কোনো বিষয় নয়, সৌন্দর্য হলো অন্তরের উপলব্ধির বিষয়।

পাশ থেকে তাদের আলাপ খেয়াল করছিল মিস্টার এথেন্স এলসিবিয়াডিস। চ্যাম্পিয়ন হওয়া উদযাপনের মধ্যেও সে সক্রেটিসকে খেয়াল করছিল। সে চিৎকার করে বলল, কী শোনালে গুরু! সৌন্দর্য বাইরের বিষয় নয়, ভেতরের বিষয়। শরীরের সৌন্দর্য তো বাইরের জিনিস! তাহলে আমি শরীরের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ভুল করেছি।

এর পরে সে যেটি বলল সেটি একেবারে শব্দ বোমা। সে বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি এই মুকুট ফিরিয়ে দেব। যে দ্বিতীয় হয়েছে, আমি তাকে মিস্টার এথেন্স বলে ঘোষণা করছি।

সকলে স্তম্ভিত। এই ছেলে কী বলছে? সক্রেটিস সৌন্দর্য নিয়ে কী না কী বললেন, আর তাতেই এত বড় সম্মান ফিরিয়ে দেবে! পুরস্কার হিসেবে সে পেয়েছে একশো এম্ফোরা জলপাই তেল। এম্ফোরা মানে বিরাট বড় মাটির মটকি। একশো এম্ফোরা জলপাই তেলের অনেক দাম, দুখানা বিশাল জাহাজ কেনা যায় সেই দামে। এই বিশাল অর্থ ফিরিয়ে দেবে?

সকলকে অবাক করে দিয়ে সে সেটিই করল। হাজার হাজার মানুষ দেখছে তার দাসেরা একশ মটকি জলপাই তেল তার গাড়ি থেকে নামিয়ে অন্য গাড়িতে তুলে দিচ্ছে। প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক বললেন, এরকম ঘটনা এথেন্সে আর কোনোদিন ঘটেনি। এত বড় সম্মান আর এত টাকার তেল ফিরিয়ে দিচ্ছে? এলসিবিয়াডিসের কলিজা আছে। এই ছেলে সত্যিকার বীর। এই তো আমাদের একিলিস। একজন বলল, পদক ফিরিয়ে দিয়ে তুমি প্রমাণ করলে যে, তুমিই এথেন্সের চিরকালের সুন্দর মানুষ। তুমি সর্বকালের সেরা সুন্দর।

তবে কিছু দুষ্ট মানুষ বলল, 'সক্রেটিস তো ওর প্রেমিক, প্রেমিকের কথায় সবকিছু ত্যাগ করল।' যাই হোক দুষ্ট লোক সব জায়গাতেই থাকে, তারা ছাড়া বাকি সবাই তার প্রশংসার শুধু পঞ্চমুখ নয়, একেবারে সপ্তমুখ হয়ে গেল।

সবাই ঘাটে পথে সব জায়গায় এলসিবিয়াডিসের প্রশংসা করে, কিন্তু সে শুধু একজনেরই প্রশংসা করে, তিনি হলেন সক্রেটিস। সে যেখানে যায়, সবখানেই সক্রেটিসের প্রশংসা করে। সবখানে বড় গলায় বলে, আমি যা কিছু করি, সব সক্রেটিসের কথায় করি। কেউ যদি বড় হতে চাও, সক্রেটিসের পথ ধরো। এথেন্সে একজনই শিক্ষকই আছেন। তিনি হলেন সক্রেটিস।

সক্রেটিস সামনে থাকলে তাকে থামিয়ে দেন। কিন্তু সামনে না থাকলে, এলসিবিয়াডিস যা খুশি বলতে থাকে। প্রশংসার বন্যায় সক্রেটিসকে ভাসিয়ে দেয়। সে বলে, সক্রেটিসের কথা প্রথমে শুনলে মনে হবে অকাজের কথা, দরকারবিহীন কথা। মনে হবে ঠাট্টা করে খোঁচা মারছে। কিন্তু ভালো করে মনোযোগ দিলে বোঝা যায় কত সূক্ষ্ম সেই খোঁচা। তার সহজ কথার মধ্যে কত কিছু লুকিয়ে আছে!

যে সূক্ষ্ম খোঁচার কথা সে বলছে সেটি হলো আয়রনি (Irony), আয়রনির এমন ব্যবহার সক্রেটিসের আগে কেউ করতে পারেনি। সে সব সময় মানুষকে হাসাচ্ছে, হাসতে হাসতে এমন গভীর কথা বলছে যাতে জীবনের অর্থ বদলে যাচ্ছে। নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে মানুষকে।

***

এলসিবিয়াডিসের একটি মারাত্মক দোষ আছে। সুন্দর মানুষ খুব সহজেই যে দোষে দুষ্ট হয়, সেও সেই দোষে আক্রান্ত। সে অত্যধিক রকম স্ত্রী-ক্ষীণা মানুষ। মেয়েদের প্রতি ভীষণ দুর্বল। তার চরিত্র ভয়াবহ। তার নামে রগরগে কাহিনি মানুষের মুখে মুখে। সেসব কাহিনির অনেকগুলোই সত্য। এটি জানে তার মামি আসপাশিয়া। পেরিক্লিস মারা যাওয়ার পর এলসিবিয়াডিস এখন সংসারের কর্তা। তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সে সারা রাত

কোথায় কোথায় থাকে কেউ জানে না। আসপাশিয়া গভীর রাত পর্যন্ত বসে থেকে বুঝতে পারে এই ছেলে আর আসবে না।

তাকে সুপথে আনতে সক্রেটিস আর আসপাশিয়া বুদ্ধি করে তার বিয়ে দিয়ে দিল। উচ্চ ঘরের সুশীলা বউ এলো তার ঘরে। মেয়েটিকে তার স্বামীর চরিত্র নিয়ে মানুষ নানা কথা বলে। কিন্তু মেয়েটি বিশ্বাস করে না। কিন্তু দিনে দিনে বুঝতে পারল মানুষ ঠিকই বলে। অনেক দিন ধৈর্য ধরে অবশেষে স্ত্রী তার নামে ডিভোর্সের মামলা করল। এলসিবিয়াডিস গেল সক্রেটিসের কাছে। সক্রেটিস পরামর্শ দিলেন, 'স্ত্রীকে প্রেমে ভুলিয়ে ঘরে নিয়ে এসো।' এলসিবিয়াডিস সেটিই করল, কিন্তু অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। ডিভোর্স আদালতে সবার সামনে স্ত্রীকে চুমো দিয়ে বলল, 'বউ ভুল করেছি, মাফ করে দাও, আর করব না, বাড়ি চলো।' বিস্ময়ে হতবাক মেয়েটি স্বামীর সাথে ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু এলসিবিয়াডিস বদলাল না। সে তার একই রকম জীবন চালিয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যেই স্ত্রী ডিভোর্স নিয়ে এলসিবিয়াডিসকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেল।

আলোয়-কালোয় মিলিয়ে এক বর্ণিল জীবন এলসিবিয়াডিসের। সে জীবনকে নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করছে। পেরিক্লিসের অনেক সম্পদের মালিক সে। ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। সে উদ্ধত, কাউকে মানে না। সে সংসদে বক্তৃতা করতে উঠলে চারদিক জ্বলে ওঠে। অনেকেই বলে পেরিক্লিসের উত্তরসূরি পাওয়া গেল। কিন্তু একটি বড় পার্থক্য হলো পেরিক্লিস গণতন্ত্র ভালোবাসতেন। কিন্তু এই ছেলে সেসবের মধ্যে নেই। তার মনের মধ্যে একজন একনায়ক আছে। সে যা ভালো মনে করে তাই করবে।

এত কিছু হচ্ছে, তার মধ্যে যুদ্ধও হচ্ছে। এথেন্স আর স্পার্টার মধ্যে থেমে থেমে যুদ্ধ চলছে। পেরিক্লিস ছাড়া এথেন্স এখন দুর্বল। স্পার্টা ভেবেছিল দুর্বল এথেন্সকে তারা তুড়ি মেরে হারিয়ে দেবে। কিন্তু তা হয়নি। এথেন্স দুর্বল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তারা দ্বিগুণ সাহসে উঠে দাঁড়িয়েছে। পেরিক্লিসের স্বপ্ন তারা ধূলিসাৎ হতে দেবে না। এখন যুদ্ধে এক নম্বর হলো এলসিবিয়াডিস। সে সিংহের মতো সাহসী আর শিয়ালের মতো ধূর্ত। সে কাউকে পরোয়া করে না। তার যুদ্ধ কৌশল আর সাহস সবাই পছন্দ করছে। সে এখন এথেন্সের তরুণ নেতা।

নেতার মতোই তার ভাবসাব, সে কাউকে পাত্তা দেয় না, শুধু সক্রেটিসের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সক্রেটিস তাকে বুদ্ধি দেন। ভালো মানুষ করার পরামর্শ দেন। নেতা হওয়ার কৌশল শেখান। সক্রেটিস তার জীবন বাঁচিয়েছেন। এথেন্সে সক্রেটিসই একমাত্র মানুষ যিনি কথা আর কাজে এক। তিনি শুধু মুখেই ভালো ভালো কথা বলেন না, কাজেও একই রকম। তার মতো জীবন শুধু বইতে পাওয়া যায়, কাহিনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবে এরকম পাওয়া যায় না। এথেন্সের দেবতারাও সুসময়ে ভালো, আর অসময়ে খুব খারাপ। কিন্তু সক্রেটিস সুসময় আর অসময় সবটাতেই একই রকম। সে সারাদিন সক্রেটিসের সাথে আঠার মতো লেগে থাকে।

এলসিবিয়াডিস একদিনও সক্রেটিসের আড্ডা মিস করে না। সিম্পোজিয়ামে সে নিজে এসে সক্রেটিসকে নিয়ে যায়। তার ঘোড়া আছে। কিন্তু সক্রেটিস ঘোড়ার চড়ে না, তিনি হেঁটেই যাবেন। তাই এলসিবিয়াডিসও এখন হেঁটেই যায়।

তার কারণে সক্রেটিসের সুনাম দুর্নাম দুইই বাড়ছে। সক্রেটিস এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি শিক্ষক, এলসিবিয়াডিসকে গভীর মায়া করেন। বাচ্চা যতই দুষ্টামি করুক, মা তাকে মৃদু বকুনি দিয়ে একটু পরেই বুকে নেন; তেমনই এলসিবিয়াডিস যতই দুষ্ট হোক, সক্রেটিস তাকে আগলে রাখেন, আশ্রয় দেন। এথেন্সে সবাই জানে যে এলসিবিয়াডিসের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হলো সক্রেটিস আর সক্রেটিসের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হলো এলসিবিয়াডিস।

***

এলসিবিয়াডিস এথেন্সে নিত্য নতুন চমক দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় চমক দিচ্ছে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়। অলিম্পিকে স্পার্টাই চ্যাম্পিয়ন হয়। স্পার্টার সাথে এথেন্স কিছুতেই পারে না। এটি এলসিবিয়াডিসের সহ্য হয় না। তার অলিম্পিক পদক চাই। পদক পাওয়ার উপায়ও সে বের করে ফেলল। অলিম্পিকে ঘোড়ার রথের একটি খেলা আছে। টাকা থাকলেই এই খেলায় জেতা যায়। এলসিবিয়াডিসের কাছে টাকা কোনো সমস্যা নয়। সে অনেক টাকা দিয়ে পৃথিবীর সেরা ঘোড়া কিনল, নিয়োগ দিল পৃথিবীর সেরা প্রশিক্ষক। তার প্লান কাজে এলো। সে চ্যাম্পিয়ন হলো। এথেন্স পেল অলিম্পিক পদক। একবার দুইবার নয়, সে টানা সাত বছর ধরে প্রথম হলো।

এথেন্সের ইতিহাসে কেউ কোনোদিন সাতটি অলিম্পিক পদক পায়নি। সে নতুন যুগের বীর, সে নতুন একিলিস, নতুন হারকিউলিস। সে যেখানে হাত দেয় সেখানেই সোনা ফলে। সে ভাবছে অলিম্পিক জয় তো হলো, এখন স্পার্টার সাথে যুদ্ধটা জেতা দরকার। সে যুদ্ধ বিষয়ে একটি নতুন পরিকল্পনা করল। এথেন্স সিসিলি[১১৮] দ্বীপ আক্রমণ করবে। সিসিলি দখল করলে অনেক সম্পদ পাওয়া যাবে, সেই সম্পদ দিয়ে সেনা ভাড়া করে স্পার্টাকে হারাবে। সে সংসদে বলল, 'শুধু এই একটি উপায়েই আমরা স্পার্টাকে হারাতে পারি।' এই মুহূর্তে তার চেয়ে জনপ্রিয় মানুষ কেউ নেই। সে যা বলে সবাই তার সাথে হয় হয় করে। তার প্রস্তাব সংসদে পাস হলো। এথেন্স সিসিলি আক্রমণ করবে।

সবাই খুশি। সক্রেটিস খুশি নন। এই ছেলেটি সব সময় হিরো হতে চায়। শুধু শুধু ঝুঁকি নেয়। সক্রেটিস এত বড় ঝুঁকি নিতে তাকে নিষেধ করলেন। কিন্তু এলসিবিয়াডিস শুনবে না। সে হিরো হবে।

রাত পোহানোর আগে এলসিবিয়াডিস এথেন্সের বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে ভেসে চলল সিসিলি অভিমুখে। কিন্তু দিনের আলো ফুটতেই দেখা গেল ভয়াবহ অঘটন। এথেন্সের সবার বাড়ির সামনে দেবতা হার্মিসের মূর্তি থাকে, সেগুলো সব ভাঙা। ভয়াবহ অধর্মের কাজ। এত বড় দুঃসাহস কার? কয়েকজন সাক্ষী দিল, 'এই কাজ এলসিবিয়াডিসের। কাল রাতে তাকে বন্ধুদের নিয়ে রাস্তায় মদ খেতে দেখা গেছে। তারা মাতালামি করছে আর দেবতাদের গালি দিয়েছে। তারাই নিশ্চয়ই দেবতার মূর্তি ভেঙ্গেছে। এই ভয়ংকর কুকর্ম তার দলবলই করেছে।' তার নামে বিচার বসল। দ্রুত বিচার। তার অনুপস্থিতিতেই রায় হলো: মৃত্যুদণ্ড।

সে তখন সিসিলির পথে। তো আরেকটা জাহাজ পাঠাও, তাকে ধরে এনে হত্যা করো। এক মুহূর্তে সে সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ থেকে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ হয়ে গেল। শত্রুরা তার নামে যা খুশি বলতে শুরু করল। সারা এথেন্সে তার নামে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেল। জাহাজ গেল তাকে ধরে আনতে। তার বন্ধুরা গোপনে অন্য জাহাজে খবর পাঠাল, 'পালিয়ে যাও। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। এথেন্সে আর এসো না। পালাও।' এলসিবিয়াডিস জানতেও পারল না কারা তাকে ফাঁসাল। তার মনে হলো এক সকালে ঘুম ভেঙে দেখছে সে হঠাৎ হিরো থেকে জিরো হয়ে গেছে। সে পালিয়ে গেল। ছোট্ট নৌকা নিয়ে ভেসে পড়ল অজানা সাগরে। শুরু হলো তার অন্য এক জীবন।

এই ঘটনায় জাহাজের সৈনিকরা হতবাক, তারা আর সিসিলি আক্রমণ করতে চায় না। নতুন সেনাপতি নিকিয়াস এথেন্স সংসদে অনুরোধ পাঠাল, 'সিসিলি আক্রমণের সমস্ত পরিকল্পনা ছিল এলসিবিয়াডিসের, সে ওই এলাকা চিনত, আমরা কেউ ওই দ্বীপ চিনি না, তাকে ছাড়া আক্রমণে যাওয়া বোকামি হবে, যুদ্ধ বন্ধ থাকুক।' এই চিঠি পেয়ে এথেন্সে সংসদে গর্জে উঠল গণতন্ত্রের নেতারা, 'বলে কী এসব! এলসিবিয়াডিস ছাড়া কি এথেন্স যুদ্ধও করতে পারবে না? আমরা শয়তান এলসিবিয়াডিসকে শাস্তিও দেব, আর তাকে ছাড়া যুদ্ধও করব।' এথেন্স থেকে নিকিয়াস আদেশ পেল, যুদ্ধ হবেই, আর সেটি তোমাকেই করতে হবে সেনাপতি হিসেবে। একটি অনিচ্ছুক যুদ্ধ করতে তারা গেল সিসিলিতে। সেখানে এথেন্স বাহিনী শোচনীয়ভাবে হেরে গেল। নিকিয়াস মারা গেল সেখানেই। এই নিকিয়াসও ছিল সক্রেটিসের শিষ্য।

এই পরাজয়ের জন্য সবাই দায়ী করল এলসিবিয়াডিসকে। এথেন্সে এখন এলসিবিয়াডিস একটি গালির নাম। কোনো হটকারী যুবক দেখলেই লোকে বলে, তুই একটি এলসিবিয়াডিস 1

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সক্রেটিস ক্রিতোকে বললেন, এই কাজ সে করেনি। এথেন্সের নিয়ম সে জানে। দেবতার অপমান করা তার কাজ নয়। তাকে কেউ ফাঁসিয়েছে।

ক্রিতো বললেন, সমস্যা হলো, তার কাজের জন্য এখন সবাই দোষী করছে তোমাকে। সবাই বলছে, সক্রেটিসই এলসিবিয়াডিসকে কুশিক্ষা দিয়েছে।

সক্রেটিস শান্তভাবে বললেন, শিষ্য ভালো কিছু করলে যেমন গুরুর সুখ্যাতিতে মানুষের মুখে খই ফোটে, তেমনই শিষ্য মন্দ কিছু করলে মানুষের নিন্দাটাও গুরুকে সহ্য করতে হবে। মানুষের নিন্দা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি, ছেলেটা এখন কোথায় আছে?

ক্রিতো বললেন, চিন্তা নেই। সে পারস্যে আছে। সেখানে রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার চাকরিও পেয়ে গেছে। সে পারস্যের রাজার মিলিটারি উপদেষ্টা।

সক্রেটিস বললেন, এই কদিনের মধ্যেই সে আমাদের শত্রু পারস্য রাজার এমন বিশ্বাসী লোক হয়ে গেল যে একেবারে মিলিটারি উপদেষ্টা করে ফেলল!

ক্রিতো হেসে বললেন, চক্ষের নিমেষে মানুষকে মুগ্ধ করার গুণ সে তোমার কাছ থেকেই শিখেছে। তার মুখের কথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

কিন্তু না, এলসিবিয়াডিস কী করবে, সে নিজে ছাড়া কেউ জানে না। অল্প কদিনেই সে পারস্যের রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এথেন্সের আরেক শত্রু নগর স্পার্টায় হাজির হলো। স্পার্টার রাজা দেখল, 'এথেন্সের সেরা যোদ্ধা এখন আমার কাছে। ও এথেন্সের ঘরের খবর জানে। ওর বুদ্ধিতেই আমি এথেন্সকে হারিয়ে দেব।' রাজা এক মুহূর্তে তাকে সম্মানের সাথে নিজের উপদেষ্টা করে ফেলল। এথেন্সে খবর এলো এলসিবিয়াডিস স্পার্টার পক্ষে যোগ দিয়েছে। এথেন্সবাসী ছিঃ ছিঃ করতে লাগল, 'এ কী রকম বিশ্বাসঘাতকতা? এত বছর ধরে আমাদের সাথে স্পার্টার যুদ্ধ চলছে, আর আমাদের সবচেয়ে চৌকশ জেনারেল চলে গেল তাদের পক্ষে? ওর তো দেশপ্রেম বলতে কোনো জিনিসই নেই। সে আমাদের সব যুদ্ধকৌশল স্পার্টাকে বলে দেবে, আর আমাদের ওরা আমাদের কচুকাটা করবে। এথেন্সের জেতার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। এক এলসিবিয়াডিসই বুদ্ধি দিয়ে আমাদের হারিয়ে দিবে।' আরেক দল বলল, 'এলসিবিয়াডিস আসলে আমাদের শত্রুদের লোক, এতদিন এথেন্সে গোপনে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। সে অন্য দেশের গুপ্তচর।' আরেক দল বলল, 'এলসিবিয়াডিস খারাপ হলে তার বন্ধুরা কেমন? তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সক্রেটিস কেমন? তাদের বন্ধুচক্রের সবাই স্পার্টার লোক। তাদের এক নম্বর পাণ্ডা সক্রেটিস।'

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই স্পার্টায়ও এলসিবিয়াডিস ঝামেলায় পড়ল। এবারের ঘটনা হৃদয়ঘটিত। স্পার্টার রানির সাথে তার গোপন প্রেম হয়ে গেছে। এমন গভীর প্রেম যে রানি তার সাথে পালিয়ে যাবে। আর একবার হেলেন আর প্যারিসের ঘটনা ঘটবে স্পার্টার রাজমহলে। রাজা দেখলেন, মহা বিপদ উপস্থিত। তিনি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলেন। দুষ্ট সাপ এলসিবিয়াডিসকে হত্যার আদেশ দিলেন রাজা। কিন্তু চতুর এলসিবিয়াডিস ততক্ষণে স্পার্টা থেকে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এবার সে এথেন্সে ফিরে

আসবে। খবর দিল, 'আমি আসলে বুদ্ধি করে স্পার্টার গোপন খবর আনতে সেখানে গিয়েছিলাম। স্পার্টাকে হারানোর সব গোমর এখন আমি জানি। আমি আসছি এথেন্সে।' এখন তার সাথে অনেক টাকা। টাকা দিয়ে এথেন্সের নেতাদের কিনে ফেলল সে। তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ বাতিল করা হলো। বীরের মতো আবার এথেন্সে ফিরলো এলসিবিয়াডিস। এথেন্সে ফিরেই যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। আবার শত্রু স্পার্টার সাথে লড়বে সে। কয়েকটি ছোট যুদ্ধে জিতেও গেল। কিন্তু আবারও একটি বড় যুদ্ধে হেরে গেল স্পার্টার কাছে। এবারও সবাই তাকেই দায়ী করল। সবাই বলল, সে ইচ্ছে করে এথেন্সকে হারানোর জন্য এমন করেছে, সে একজন বিশ্বাসঘাতক। তার বিচার হবে। সে আবার পারস্যে পালিয়ে গেল। এবার আর পারস্যের রাজা তাকে দরবারে জায়গা দিল না। দূরে এক ছোট্ট দ্বীপে সরদার করে পাঠিয়ে দিল। সেই দ্বীপে প্রেম করার নিয়ম নেই। পারস্যের রাজা তাকে বলে দিয়েছিল, 'ঐ দ্বীপে যাই করো, কোনো সমস্যা নেই। শুধু ওখানের মেয়েদের দিকে নজর দিও না। ওরা একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে।' কিন্তু এলসিবিয়াডিস তো নিয়ম মানার লোক নয়। নতুন দ্বীপে গিয়েও সে ভাব করল সরদারের মেয়ের সাথে। এক রাতে সে প্রেমিকার কাছে গিয়েছে, আর লোকজন তাকে ঘেরাও করল। ন্যাংটা অবস্থায় সে পালানোর জন্য দৌড় দিল। কিন্তু একটি বর্শা এসে লাগল তার বুকে অনেকে বলে, স্পার্টা থেকে ভাড়াটে খুনি তাকে হত্যা করেছে। যখন সে মারা গেল, তার পরনে কিছুই নেই। ন্যাংটা অবস্থায় মৃত্যু হলো তার। শাস্তি হিসেবে সেভাবেই তার দেহ পাঠিয়ে দিল এথেন্সে। এথেন্সে এসে পৌঁছল এলসিবিয়াডিসের ন্যাংটা লাশ।

লাশ দেখে সবাই বলে, কেন ছেলেটার এমন হলো? জীবনে কি কোনো শিক্ষা পায়নি? উত্তর হলো, শিক্ষা পেয়েছে। সক্রেটিস শিক্ষা দিয়েছে। সক্রেটিসের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। এলসিবিয়াডিস সবার কাছে উচ্চ স্বরে বলে বেড়াত, সে সক্রেটিসের সবচেয়ে বড় ভক্ত। সক্রেটিসের কথায়ই সে ওঠে বসে। শিষ্য পাপ করলে, সেই দায় নিতেই হবে। এথেন্সের মানুষের কাছে এখন সক্রেটিসের একমাত্র পরিচয়, সে নষ্ট যুবক এলসিবিয়াডিসের গুরু।

এলসিবিয়াডিস মারা যাওয়ার পর সবচেয়ে বিপদে পড়েছে আসপাশিয়া পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর সে ছিল সংসারের পুরুষ। আসপাশিয়া সন্তানকে বড় করার কাজে মনোযোগ দিয়েছিল। এক রকম দিন কাটছিল। কিন্তু এলসিবিয়াডিস মারা যাওয়ার পর সত্যিকার বিপদ এলো। বড় বিপদ। আসপাশিয়া তো এথেন্সের নাগরিক নয়। সে একা ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারবে না। লোকজন উৎপাত শুরু করল। পেরিক্লিস নেই, তার ভরসাও নেই। সে একা বিধবা যার সহায় কেউ নেই। এমনকি আইনও নেই। যেহেতু সে এথেন্সের নাগরিক নয়, তার সাথে খারাপ কিছু হলে এথেন্সের আইনে বিচার হবে না।

প্রতিদিন নানান প্রস্তাব আসছে। অনেক পুরুষই ঘরে নিতে চায় বুড়ি আসপাশিয়াকে। কেউই বিয়ে করতে পারবে না। তাই নেওয়ার লোকের অভাব নেই। বিষয় একটিই— আসপাশিয়া একা থাকতে পারবে না। তাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হোক, অত্যাচারে হোক তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। অনেক দিন একলা থাকলেও আর পারল না। অবশেষে এক মহিষের খামারের মালিকের ঘরে চলে গেল আসপাশিয়া। ছেলে রইল পেরিক্লিসের বাড়িতে, ছেলে মোটামুটি বড় হয়ে গেছে। এখন নিজেই চলতে পারে।

যেভাবে একদিন এসেছিল এই ঘরে, সেভাবেই এক গাধার গাড়িতে করে পেরিক্লিসের বাড়ি ছেড়ে গেল। সে অনেক উচ্চ পর্যায়ের দার্শনিক। কিন্তু নারী পেরিক্লিস মারা যাওয়ার পর তার দার্শনিক পরিচয় মুছে গেছে, নারী হিসেবেই তাকে ছেড়ে যেতে যেতে হলো এই ঘর। এথেন্সের জীবন থেকে আসপাশিয়া মোটামুটি মুছে গেল।

***

১১৭. প্লেটোর Hippias Major ডায়ালগে সক্রেটিস তার সাথে আলোচনায় সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দেন।

১১৮. ভূমধ্যসাগরের বড় দ্বীপ সিসিলি, যেটি বর্তমানে ইতালির অন্তর্গত।

ব্ল্যাক পার্ল এলিট প্রেজেন্টস
একটি ব্রহ্মচারী ও শুভম প্রয়াস

৪৯

‘ভাগ্য প্রত্যেক মানুষকে কষ্টের ভাগ দিতে
ঠিক সময়ে খুঁজে নেয়।’
— ইউরিপিডিস

সক্রেটিস ও ইউরিপিডিস চিঠি পড়ছেন। তাদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন থেসালির রাজা। রাজার নাম আর্চিলস। তার রাজ্য এথেন্স থেকে প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার উত্তরে, মেসিডোনিয়ার পাশে। এই রাজা জ্ঞানের জন্য পাগল। তার বিশেষ জ্ঞানতৃষ্ণা আছে। তিনি প্রায়ই দেশ-বিদেশের জ্ঞানীদের ডাকেন। জ্ঞানীরা তার রাজসভা আলোকিত করেন। সেখানে কবিরা গিয়ে আনন্দে কবিতা লেখেন, নাট্যকারগণ মহাসুখে নাটক লেখেন, পণ্ডিতেরা ভালো ভালো কথা বলেন। তার সভায় গুণী লোকের কদর আছে। তিনি আশা করেন তার সভায় পৃথিবীর সব জ্ঞানী একবার হলেও আসুক। তাই তিনি সক্রেটিস ও ইউরিপিডিসকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন।

তিনি ইউরিপিডিসকে লিখেছেন—

জিউস ও এথিনা ভরসা

পরম পূজনীয় নাট্যকার,

আমি আপনার অতীব গুণমুগ্ধ। আপনি জানিয়া সাতিশয় প্রীত হইবেন যে, আমার রাজ্যে প্রায়শই আপনার নাটক অভিনীত হইয়া থাকে। আমার প্রজাগণ উক্ত নাটক অতিশয় আনন্দের সহিত আস্বাদন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় আপনি কিয়ৎকালের জন্য থেসালি নগরে আমার রাজভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলে আমি বিশেষ কৃতার্থ হইব। আমার রাজ্যে আসিয়া আপনি যদি একখানা নাটক রচনা করেন, আমরা নিজেদেরকে অত্যধিক ধন্য মনে করিব। যদি আপনার বিশেষ অসুবিধা না থাকে, আমার বিশেষ রাজবাহন প্রেরণ করিয়া আপনার থেসালি আগমনের ব্যবস্থা করিতে পারি। থেসালির জনগণ তাহাদের চর্মচক্ষে আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যধিক উদগ্রীব হইয়া আছে। আপনি যদি সম্মানী বা অন্য কিছু লইয়া কোনোরূপ ভাবনায় থাকেন, আমি নিশ্চয়তা দিয়া অবহিত করিতেছি যে, থেসালি আপনাকে নিরাশ করিবে না। আপনার ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। ধীরে-সুস্থে ভাবনা-চিন্তা করিয়া

সিদ্ধান্ত লইয়া আমাকে অবগত করিলেই হইবে। আমার বিশেষ দূত আগামী চন্দ্রের একাদশ দিবসে আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তৎকালে চূড়ান্ত কথা জানাইলেই চলিবে।

ইতি,
আপনার অতিশয় গুণমুগ্ধ
আর্চিলস, থেসালি নগর

সক্রেটিসের কাছে পাঠানো চিঠিতেও রাজা একই রকম কথা লিখেছেন। শুধু নাট্যকারের জায়গায় দার্শনিক।

চিঠিখানা দুবার পড়ে সক্রেটিস তাকালেন ইউরিপিডিসের দিকে। তার চোখে হাসি। রহস্যের হাসি। এই রহস্যে ইউরিপিডিস বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, আসলেই তুমি যাবে না? এমন প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে? ভেবে দেখো— সারা জীবন অভাবের মধ্যে কাটালে, এখন শেষ বয়সে সুযোগ এসেছে একটু সুখে দিন কাটানোর। রাজার অতিথি হয়ে থাকবে। চলো, আমরা দুজন মিলে যাই।

সক্রেটিস শান্ত চোখে ইউরিপিডিসের দিকে তাকালেন। নাট্যকার মিথ্যে বলেননি। রাজা আন্তরিকভাবেই নিমন্ত্রণ করেছেন। সেখানে মহাসুখে দিন কাটানো যাবে। কিন্তু 'সুখ' শব্দটি মনে হতেই সক্রেটিসের মাথা ভনভন করে উঠল। কোন সুখের কথা ভাবছেন তিনি? টাকা-পয়সা? এথেন্স থেকে দূরে গেলে টাকা-পয়সা কি তাকে সুখ দেবে? এথেন্স থেকে বাইরে যাওয়ার কথা মনে হলেই তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। এর আগেও অনেকেই তাকে নিতে চেয়েছে। কিন্তু সক্রেটিস যাননি।

সক্রেটিস ইউরিপিডিসের হাত ধরে বললেন, এই জীবনে শুধু যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে এথেন্স ছেড়ে কোথাও যাইনি। তো এই বুড়া বয়সে গিয়ে আর কী হবে! আমি এখানেই থাকি।

ইউরিপিডিস ভাবছেন, সক্রেটিস কি আসলে একজন বোকা মানুষ? কিছুদিনের জন্য এথেন্সের বাইরে যেতেও তিনি রাজি হচ্ছেন না! নাকি সক্রেটিস ভীরু? এথেন্সের পরিচিত জীবন থেকে বের হওয়ার সাহস তার নেই!

সক্রেটিস আবার বললেন, আমি এথেন্সকে ভীষণ ভালোবাসি। এই সারা এথেন্স আমার বাড়ি, এথেন্স ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না।

ইউরিপিডিস নিরাশ হয়েছেন। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। নাট্যকারকে কষ্ট দিয়ে সক্রেটিসেরও মন খারাপ। কিন্তু তিনি এথেন্স ছেড়ে যেতে পারবেন না। কোনো কিছুর লোভেই নয়।

সক্রেটিস বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকতে চান না। মন ভালো করার জন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন তিনি। সবচেয়ে ভালো উপায় হলো জেনথিপির সাথে রাগ-অনুরাগ খেলা। সক্রেটিস ঠিক করলেন, রাজার চিঠি নিয়ে জেনথিপিকে মজা করে একটু খোঁচা দেবেন।

খোঁচায় জ্বলে উঠবেন জেনথিপি। তখন সক্রেটিস অভিনয় করে বলবেন, আমি সব ছেড়ে এক্ষুনি থেসালি চলে যাব। জেনথিপি করুণ চোখে বলবেন, না না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। সক্রেটিসের হবে মিথ্যা-মিথ্যি রাগ, আর জেনথিপির হবে সত্যি সত্যি অনুরাগ। এই রাগ-অনুরাগের খেলায় মন ভালো হয়ে যাবে।

এই ভেবে তিনি জেনথিপিকে পিন দিয়ে বললেন, বুঝলে, এথেন্সের মানুষ তো আমাকে চিনল না, দূরের মানুষ ঠিকই চিনেছে। দেশ-বিদেশের রাজারা পর্যন্ত আমাকে চিনেছে। দেখ, বিরাট এক রাজা দাওয়াত করেছে। চিঠি পড়ে দেখো?

জেনথিপির মাথায় সারাদিন সংসারের হাজারো চিন্তা। তিনি বললেন, চিঠি-টিঠি পড়ার সময় আমার নেই। তিনি বিষয়টিকে পাত্তাই দিলেন না। সক্রেটিসের কাছে কত লোকে চিঠি লেখে, কত লোক দাওয়াত করে। ওসব চিঠিতে থাকে ভারী ভারী কথা, মোটা মোটা আলাপ। ওসব চিঠি পড়ে জেনথিপির লাভ নেই।

সক্রেটিস দেখলেন, বউ মজা বুঝছে না। ঘটনা জমছে না। তখন তিনি শব্দ করে চিঠিটা পড়ে বললেন, বিষয়টা বুঝেছ? দাওয়াত করেছেন একজন রাজা। সেই রাজা খুবই দিলদার লোক। একবার গেলে জীবনে আর টাকা- পয়সার চিন্তা থাকবে না। আমি যাই, কদিন রাজার কাছে আরাম-আয়েশ করে আসি।

জেনথিপি নিশ্চিত নন, থেসালি যাওয়া ভালো, নাকি না যাওয়া ভালো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজাকে কোনো টাকা দিতে হবে না?'

সক্রেটিস বললেন, 'টাকা দিতে তো হবেই না, উল্টা রাজাই আমাদেরকে টাকা দেবেন।'

এবার জেনথিপি লাফ দিয়ে বললেন, 'তাহলে এত ভাবাভাবির কী আছে! বসে বসে টাকা পেলে কেন যাব না? যাব, অবশ্যই যাব।'

জেনথিপি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি পারলে এখুনি রওয়ানা করেন। সক্রেটিসের বুঝলেন, তিনি ধরা খেয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন, বউয়ের সাথে একটু মজা করবেন, রাগ-অনুরাগের খেলা হবে। কিন্তু সেটি বুমেরাং হয়েছে। জেনথিপি থেসালি যাওয়ার জন্য গুছানো শুরু করে দিয়েছেন।

এখন সক্রেটিসকে না যাওয়ার জন্য বুদ্ধি করতে হবে। এত সময় যা বলেছেন, এখন সেটির উল্টা বলতে হবে। সক্রেটিস বললেন, থেসালির মেয়েরা নাকি দেখতে মন্দ নয়।

জেনথিপি বললেন, সেখানের মেয়েদের কথা উঠল কেন? আপনাকে তো দাওয়াত করেছেন রাজা। কোনো মেয়ে তো দাওয়াত করেনি।

সক্রেটিস বললেন, হ্যাঁ, সেই রাজা খুবই ভালো মানুষ। অতিথিদের অনেক খাতির-যত্ন করেন। অতিথিদের জন্য প্রতি রাতে আনন্দ ফূর্তির ব্যবস্থা আছে। আনন্দ-ফূর্তিতে মেয়েরাও থাকে। বোঝোই তো, রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার। অন্য রকম আমোদ-প্রমোদ।

সক্রেটিস বলছেন আর জেনথিপির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। জলপাই তেলের কুপি নিভু নিভু জ্বলছে। কুপির চেয়ে বেশি জ্বলছে জেনথিপির চোখ একটু পরেই সেই চোখ থেকে আগুন বের হবে।

সক্রেটিস আবার বললেন, সেই রাজদরবারে নাকি কয়েকজন কবি আছেন। তারা সেখানে গিয়ে আর ফিরেননি। সেখানেই বিয়ে করে ঘর-সংসার করছেন। রাজা ভালোই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাই হোক, আমি বুড়ো মানুষ, তিনকাল গিয়ে চারকাল এলো বলে। আমার আর বিয়ে-শাদি কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি গেলে কিছু টাকা-পয়সা আসবে। সংসার ভালো চলবে। আগামী পরশু শুভদিন। পরশুই যাত্রা করি।

জেনথিপি চিৎকার করে উঠলেন, খবরদার বলছি, চুলায় যাক তোমার টাকা-পয়সা। সেখানে তোমার যাওয়া হবে না। কাল থেকে তুমি ঘরে বন্দি।

সক্রেটিস বললেন, বন্দি? জেনথিপির কারাগারে?

'হ্যাঁ, জেনথিপির কারাগারেই বন্দি। থেসালির নাম একবার মুখে আনলে এক বছর হাজত বাস। মনে থাকে যেন।'

সক্রেটিস মনে মনে হাসতে হাসতে খাওয়া শেষ করলেন। খাওয়ার সময় এই আলাপের পরেই জেনথিপির মধ্যে একটু পরিবর্তন দেখা গেল। আজ তিনি একটু হেসে হেসে কথা বলছেন। কোন ফাঁকে একটু সাজুগুজু করে নিয়েছেন। স্বামীর আশেপাশে ঘুরঘুর করছেন। অকারণে হাসছেন। সক্রেটিস দেখলেন, বিষয়টা মন্দ নয়। এখন মাঝে মাঝে থেসালির আলাপ করতে হবে। শেষ কবে যে জেনথিপি এমন অকারণে হেসেছিলেন, সক্রেটিস মনে করতে পারছেন না।

ইউরিপিডিস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি থেসালি চলে যাবেন। তিনি রাজার আতিথ্য গ্রহণ করবেন। অনেক দিন থেকেই এথেন্স তার অসহ্য লাগছে। এখানের মানুষ তাকে অকারণে জ্বালায়। সারা জীবন জ্বালিয়েছে, এখন বুড়ো বয়সেও ছাড়ছে না। ব্যঙ্গবিদ্রূপের শেষ নেই। আর কত! তিনি ভাবছেন, আমি এদের জন্য লিখেই যাচ্ছি, আর এরা অপমান করেই যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে এখনও কৌতুক করছে। আমি থাকব না এখানে। রাজা আর্টিলস নাকি সজ্জন মানুষ। তিনি গুণীর কদর করেন। সেখানে মন ভালো থাকবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। ইউরিপিডিসের মনে হচ্ছে— আজই এথেন্স ছেড়ে চলে গেলে ভালো হয়। তিনি বাঁধা-ছাঁদা শুরু করলেন। তার জিনিসপত্রের বহর দেখে মনে হচ্ছে, তিনি আর কোনোদিন এথেন্সে ফিরতে চান না। অনেক বইপত্র নিয়ে তিনি থেসালি নগরে চলে গেলেন।

থেসালিতে অনেক শীত। আশি বছরের বৃদ্ধ ইউরিপিডিস ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে পড়লেন। কিন্তু থেসালিতে অন্তত একটি নাটক তাকে লিখতেই হবে। বুড়ো বয়সে অভিনয় করতে

অন্যরকম চরিত্র লাগবে, পাগলের চরিত্র হলে মন্দ হয় না। লম্বা চুলের পাগল হলে ভালো হয়।

ইউরিপিডিস ভাবছেন, তিনি পাগল চরিত্র করবেন। কিন্তু সারা জীবন তিনি নারীদের নিয়ে লিখেছেন। বুড়ো বয়সে আর অন্য কিছু করে কী হবে? তাহলে পাগল নয়, নাটক হোক পাগলি নিয়ে। আনন্দের দেবতা ডিওনিসাসকে নিয়ে লিখলেন কাহিনি। এই দেবতাকে থেসালি শহরের লোকেরা বলে বাক্কাই। তিনি নাটকের নাম দিলেন 'বাক্কাই'[১১৯]। কাহিনি এমন-

থিবসের রাজা (আনন্দের দেবতা) ডিওনিসাসকে দেবতা হিসেবে মানেন না, তার অনুষ্ঠান করতে দেন না। দেবতা তাদের চরম শাস্তি দিলেন। মেয়েরা সব উন্মাদ হয়ে গেল, রাজাকে হত্যা করল। ইউরিপিডিস অভিনয় করলেন পাগলি নারী রাজমাতার চরিত্রে। এই মা উন্মাদ হয়ে নিজের ছেলেকে হত্যা করে।

উত্তর গ্রিসে তীব্র শীত। এই শীত ইউরিপিডিসের সহ্য হলো না। প্রথম শীতেই মারা গেলেন তিনি[১২০]। সক্রেটিসের প্রিয় বন্ধু, প্রিয় নাট্যকার চলে গেলেন চিরতরে। এথেন্সের বিপ্লবী নাট্যকার, যিনি নাটক দিয়ে সমাজ বদলানোর স্বপ্ন দেখতেন, তিনি বিদায় নিলেন।

ইউরিপিডিস মারা গেছেন। এথেন্সে খবর এসেছে। লোকজন সারা জীবন তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। মরণেও সেটি বন্ধ হলো না। রাস্তাঘাটে লোকজন বলছে, সে কি নাট্যকার ছিল নাকি? সে মঞ্চে উঠে দার্শনিক আলাপ করত। ঐ ব্যাটা মারা গেছে, ঝামেলা গেছে। কবিরাও হাসি-ঠাট্টা করছে। এত বড় কবি যে, সে দেশের মাটিতে মরতেও পারল না। মনে হচ্ছে ইউরিপিডিসের মৃত্যুতে এথেন্সের শিক্ষিত সমাজ কোনো দুঃখ পায়নি।

কিন্তু হঠাৎ বাইরে বের হলেন সফোক্লিস। নব্বই বছরের বৃদ্ধ। পেপিরাস নিয়ে বের হলেন। দাসকে ডেকে বললেন, 'সবাইকে খবর দাও। আমি ইউরিপিডিসের জন্য গান গাইব। তার জন্য শোক র‍্যালি হবে। তাতে আমি গাইব। আয়োজন করো।'

মানুষ অবাক! সারা জীবন ইউরিপিডিসকে হারিয়ে মজা নিয়েছেন সফোক্লিস। রসিয়ে রসিয়ে তার কষ্ট উপভোগ করেছেন। জীবনভর একটি শত্রুতা ছিল দুজনের। এখন মরার পরে তাকে নিয়ে গান গাইবেন সফোক্লিস?

ইউরিপিডিসের জন্য শোক র‍্যালি বের হলো। তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সফোক্লিস। নব্বই বছরের বৃদ্ধ গান গাইছেন। গলা কাঁপছে। স্বর বের হতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর এখনও মিষ্টি। চিকন একটি সুন্দর সুর-

কবি চলে গেছে চিরতরে, কাঁদো, এথেন্স কাঁদো
কবি হারিয়ে গেছে বহু দূরে, বুক ভাসিয়ে কাঁদো।

সফোক্লিসের চোখে পানি। দরদর করে পড়ছে পানি। পানি থামছে না। সফোক্লিস সারা জীবন অভিনয় করেছেন। তিনি চাইলেই কাঁদতে পারেন। কিন্তু আজ এমনি এমনিই

চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছে। তার সাথে সবাই কাঁদছে। প্রতিটি তরুণ কাঁদছে—

কবি চলে গেছে চিরতরে,
কাঁদো রে ভাই, কাঁদো।

সফোক্লিস জোরে হাঁটতে পারেন না। তাই শবযাত্রা খুবই ধীরে ধীরে চলছে। সফোক্লিস নিজেও জানেন না, তিনি কেন এমন করে কাঁদছেন। তিনি সারাজীবন ইউরিপিডিসকে হারিয়েছেন। ইউরিপিডিস যত ভালোই নাটক লিখুক, তিনি প্রথম হতে পারতেন না। এথেন্সের বিচারকরা সব সময় সফোক্লিসকেই প্রথম করে দিত। প্রতি বছর বিজয়ীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরস্কার হাতে নিয়ে করুণার চোখে তিনি তাকাতেন ইউরিপিডিসের দিকে। তীব্র আনন্দে উপভোগ করতেন পরাজিত ইউরিপিডিসের বিষণ্ণ চেহারা। আর আজ? আজ ইউরিপিডিস চোখ বুজে আছে, মরণে তিনি প্রথম হয়ে গেছেন। মরণে সফোক্লিসকে হারিয়ে দিয়েছেন। এই মরণে যদি কেউ সত্যিকার কষ্ট পেয়ে থাকেন, তিনি হলেন সফোক্লিস। তার মনে হচ্ছে বেলা শেষ হয়ে আসছে। এথেন্সে যে মারাত্মক আনন্দ নিয়ে নাটক লিখে গেছেন সারা জীবন, সেই সোনালি দিন শেষ হয়ে আসছে। শেষের সূর্য অন্য আলো নিয়ে বিদায় নিচ্ছে। ইউরিপিডিস যে কত বড় নাট্যকার ছিলেন, সেটি সফোক্লিস বুঝতেন। এথেন্সের মানুষ বোঝেনি যে তিনি যুগের থেকে আগানো সাহিত্যিক ছিলেন।

সফোক্লিস ভাবছেন, পেরিক্লিসের মৃত্যুর সময় আমি খুব খারাপ আচরণ করেছি, সেটি ঠিক হয়নি। এথেন্সের জন্য তার মতো মানুষই দরকার ছিল। আমি সারা জীবন ইউরিপিডিসকে তাচ্ছিল্য করে যে অপরাধ করেছি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।

সক্রেটিসও হাঁটছেন প্রথম সারিতে। তার গানের গলা ভালো নয়। তিনি গাইছেন না। কাঁদছেনও না। মন খারাপ। কিন্তু চোখে পানি নেই। তার চারপাশে বেশ কয়েকটি তরুণ হাঁটছে। ফিদো, প্লেটো নিঃশব্দে হাঁটছে।

সক্রেটিস বারবার সফোক্লিসের দিকে তাকাচ্ছেন। এই লোক এমন করে কাঁদছেন কেন? তার দিনও কি শেষ হয়ে আসছে? তিনি মৃত্যুর সংগীত গাইছেন। এই গান কি ইউরিপিডিসের জন্য, নাকি নিজের মৃত্যুর বার্তা পেয়ে গেছেন সফোক্লিস। এত করুণ গান তিনি জীবনে শোনেন নি।

কেমন একটি গম্ভীর কান্নার আওয়াজ আসছে—

কবি চলে গেছে চির তরে,
কাঁদো রে ভাই, কাঁদো।

শোকযাত্রা থেকে ফিরে সফোক্লিস গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। ভাবছেন এথেন্স আর কতদিন টিকতে পারবে স্পার্টার সাথে। যুদ্ধ চলছে। নৌশক্তি শেষ হয়ে গেছে সিসিলির যুদ্ধে। কোনো নেতা নেই। এখন এথেন্সের পরাজয় শুধু সময়ের ব্যাপার। তবু তারা লড়ছে।

বৃদ্ধ সফোক্লিস চোখের সামনে দেখছেন এথেন্স শেষ হয়ে যাচ্ছে। যুবকদের মনে বল নেই। কারও কোনো সাহস নেই। তার মনে পড়ে— পারস্যকে হারানোর পরে এথেন্সের রাস্তায় বিশাল মিছিল। সেই মিছিলে গান গাইছিল তরুণ সফোক্লিস। সেদিন কী টগবগ করছিল তরুণরা। আর আজ? তরুণদের মনে কোনো সাহস নেই। সব মাজাভাঙ্গার মতো হাঁটে।

কী করা যায়! অস্ত্র হাতে নেওয়ার বয়স নেই। তবে কলম আছে। এখনও চাইলেই লিখতে পারেন। কয়েক বছর কিছু লিখেন নি। এবার লিখতে হবে। সামনে নাটক উৎসব। সারা জীবনই তিনি এই উৎসবে নাটক করেছেন। কয়েক বছর ক্ষান্ত দিয়েছেন। এবার আবার নামবেন। এবার এথেন্সের গৌরবের কথা বলতে হবে। নাটক এমন হবে যাতে তরুণদের মনে হয়, এথেন্সের জন্য চাইলেই কিছু করা যায়।

সফোক্লিস নাটকের প্লট ভাবছেন। কোন প্লটে লিখবেন। নাটক জনপ্রিয়ও হতে হবে। মানুষের মনে ধরতে হবে। তার যে নাটকটা মানুষের সবচেয়ে মনে ধরেছিল, সেটি হলো ‘রাজা ইদিপাস’। ইদিপাসের ট্র্যাজেডি মানুষকে কাঁদিয়েছে। নিজের মায়ের সাথে সন্তান ইদিপাসের বিয়ের কাহিনি খুব চলছিল। গ্রামে গঞ্জে এখনও মানুষ অভিনয় করে সেই নাটক। ‘রাজা ইদিপাস’ নাটকের বইটা অনেক কপি বিক্রি হয়েছে। তাহলে নতুন নাটকে রাজা ইদিপাসকে এথেন্সে নিয়ে এলে কেমন হয়! ইদিপাস শেষ বয়সে এথেন্সে এলো। এথেন্সের মানুষ তাকে আশ্রয় দিল। এই কাহিনি নিয়ে লিখলে কেমন হয়?

সফোক্লিস কলম নিলেন, একটানা লেখা শুরু করলেন। কাহিনি দাঁড়াল এরকম—

অন্ধ বৃদ্ধ ইদিপাস কোনো জায়গায় আশ্রয় পাচ্ছে না। সে অভিশপ্ত, নিজের বাবাকে খুন করেছে, নিজের মাকে বিয়ে করেছে, তাদের সন্তান হয়েছে। সে মারাত্মক রকমের অভিশপ্ত। তার মতো অভিশপ্তকে কেউ জায়গা দেবে না। ঘুরতে ঘুরতে সে এলো এথেন্সে। এথেন্স একটি মহৎ নগর। এখানের মানুষের মন অনেক বড়। সে এথেন্সে আশ্রয় পেল। এথেন্সের রাজা থিসিয়াস তাকে জায়গা দিলেন। ভরসা দিলেন। শেষ কয়টা দিন ইদিপাসের ভালো কাটল। ইদিপাস মারা গেল। এথেন্স তাকে কবর দেওয়ার জায়গাও দিল। অভিশপ্ত রাজার শেষ আশ্রয় হলো এথেন্স।

কাহিনি শেষ করে সফোক্লিস নাটকের নাম দিলেন ‘ইদিপাস এথেন্সে’। নামটা লিখে তার কেমন যেন মনে হলো। লোকে মনে করবে এথেন্সের ফুটানি দেখাতে ইচ্ছে করে এই নাটক। নাটকের নামে এথেন্স শব্দটা দেওয়া যাবে না। সফোক্লিস থাকেন এথেন্সের

উপশহরে। তার পাড়ার নাম কলোনাস। তিনি ভাবছেন তাহলে কাহিনিতে রাজা ইদিপাসের কবর হোক কলোনাসে। তো নাটকের নাম হোক 'ইদিপাস কলোনাসে'।

আর কদিন পরেই নাটক নিয়ে মঞ্চ উঠতে হবে। তার আর তর সইছে না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে সবাইকে ডেকে অভিনয় শুরু করে দেন। তার মনের মধ্যে গুনগুন করছে নতুন নতুন সংলাপ। এমন সময় খবর এলো, থিয়েটারে নয়, তাকে যেতে হবে আদালতে। তার নামে মামলা হয়েছে। মামলা করেছে তার নিজের ছেলে। অভিযোগ: তার নাকি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তিনি পাগল হয়ে গেছেন। তাকে যেন কোনো পাবলিক প্রোগ্রামে অংশ নিতে দেওয়া না হয়।

লেখক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি জীবনে অনেক শত্রুর সাথে লড়েছেন, কিন্তু কেউ তাকে আদালতে ডাকতে সাহস করেনি। সেটি করল তার নিজের ছেলে ইওফোন (Iofon)। তার ছেলেও লেখক, সেও নাটক করে। গভীর বেদনায় সাগর তীরে গেলেন, সাগরের স্থির পানিতে ছায়া পড়েছে তার বৃদ্ধমুখের। তিনি ভাবছেন, আমি কি প্রয়োজনের চেয়ে বেশিদিন বেঁচে আছি? আমার বেঁচে থাকা কি ওদের সহ্য হচ্ছে না? বৃদ্ধ পিতা কি সমস্যা করছেন ছেলেকে? তিনি নিজেই লিখেছিলেন, 'তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু তুমি নিজেই।' তার নিজের ছেলেই তাকে শত্রু ভাবছে।

তিনি আদালতে শুনানিতে গেলেন। তেমন কথা বললেন না, শুধু তার নতুন নাটক থেকে সংলাপ আবৃত্তি করতে লাগলেন। আদালতে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি বললেন ইদিপাসের সংলাপ,

'এই মহতী এথেন্স আমাকে আশ্রয় দিল। আমি এথেন্সের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করব। এক টুকরো পবিত্র মাটিতেই আমার কবর হবে। আমাকে কেউ জায়গা দেয়নি, সবাই অভিশপ্ত বলেছে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আশ্রয় দিয়েছে মহান নগরী এথেন্স। '

তার সুললিত সংলাপে আদালতের সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। এই নব্বই বছর বয়সেও তিনি যেভাবে মুখস্থ আবৃত্তি করছেন, সেটি তরুণদের পক্ষেও সম্ভব নয়। বিচারক নিশ্চিত যে তার মামলাকারী যুবক ছেলেও তার মতো করে পারবে না। বিচরকগণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সফোক্লিসের নাটক দেখছেন। লেখক শেষ করা মাত্র ওই কক্ষের সবাই দাঁড়িয়ে তাকে কুর্নিস জানাল। প্রধান বিচারক তার ছেলেকে বলল, তোমাকে ধন্যবাদ ইওফোন, তুমি বেকুবের মতো তোমার বাবাকে পাগল ঘোষণা করতে এখানে নিয়ে এসেছ বলেই আমরা পৃথিবীর সর্বকালের সেরা নাট্যকারের চমৎকার অভিনয় চোখের সামনে দেখতে পেলাম। এখন আমাদের উচিত তোমাকে বিশাল জরিমানা করা। কিন্তু তুমি সফোক্লিসের পুত্র, সেই বিবেচনায় তোমাকে মাফ করা হলো। পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার আশীর্বাদ নিয়ে নাও। চোখের জল মুছে সফোক্লিস ছেলেকে ক্ষমা করলেন। ছেলে বুঝল, তার পিতা কেন জীবনে কোনো প্রতিযোগিতায় হারেননি।

তার দুদিন পরে থিয়েটারের মঞ্চে সফোক্লিস আবার অভিনয় করলেন 'ইদিপাস কলোনাসে'। আবার প্রথম হলেন। পুরস্কার নিলেন।

কিন্তু মঞ্চ থেকে ফিরতে পারলেন না নাট্যকার। জীবনের শেষ নাটকের প্রথম পুরস্কার হাতে নিয়ে মঞ্চেই মারা গেলেন সফোক্লিস[১২১]। মধু ছড়াতে ছড়াতেই পৃথিবী ছেড়ে গেলেন এথেন্সের মধুকর। মৃত্যুতেও তিনি আরেকটি নতুন কাজ করে গেলেন। তিনি লিখে গেলেন, তার মৃত্যুতে যেন কোনো অনুষ্ঠান করান হয়, একেবারে অনাড়ম্বরে নিয়ে যাওয়া হয় সমাধিতে। তিনি সারা জীবন অনেক অনেক আড়ম্বরে ছিলেন, এবারে একাকী নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চান।

কয়েক মাসের মধ্যে চলে গেলেন এথেন্সের ট্র্যাজেডির প্রধান দুই মানুষ – সফোক্লিস আর ইউরিপিডিস। সক্রেটিস ফুল দিলেন সফোক্লিসের কফিনে।

ইউরিপিডিস ও সফোক্লিস মারা গেছেন। এরিস্টোফানিস তাদের নিয়ে নাটক লিখবে। নাটকের নাম 'ব্যাঙ'[১২২]।

এরিস্টোফানিস সারাজীবন ইউরিপিডিসকে ব্যঙ্গ করে নাটক লিখেছে, এখন মরণেও ছাড়বে না। সে প্লট বানাল —

মরার পরে নাট্যকার এস্কিলাস পাতালের সভাকবি হয়েছেন। এস্কিলাস পাতাল থেকে অন্য কোথাও যাবেন। তো পাতালের সভাকবি কে হবেন? এর মধ্যে ইউরিপিডিস মারা গেছেন, তিনি হতে পারেন। এই খবরে মানুষ দুঃখিত। ইউরিপিডিসের মতো নাট্যকার হবেন সভাকবি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কিন্তু খবর এলো সফোক্লিসও মারা গেছেন। তাহলে পাতালের সভাকবি অবশ্যই হবেন সফোক্লিস। ইউরিপিডিস নন।

এই কাহিনি দিয়ে কমেডি বানিয়ে ফেললেন এরিস্টোফানিস। মঞ্চে আনলেন। সক্রেটিস গেলেন নাটক দেখতে। তিনি শুনেছেন, ইউরিপিডিসকে নিয়ে নাটক। তাই তিনি দেখতে গেছেন। নাটক দেখে তিনি নাট্যকার এরিস্টোফানিসের উপর ছিঃ ছিঃ করতে লাগলেন। মরার পরেও ওরা ইউরিপিডিসকে ব্যঙ্গ করে লিখছে।

নাটকে দেখিয়ে দিয়েছে, সফোক্লিস পাতালে গিয়েও ইউরিপিডিসকে হারিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যাতে ভুলেও কোনোদিন ইউরিপিডিসকে বড় নাট্যকার না ভাবে, সেটি নিশ্চিত করে দিয়েছে এই নাটক

মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে সক্রেটিস সুসংবাদ পেলেন।

জেনথিপি দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এটিও ছেলে। এবার ছেলের নাম সক্রেটিসের বাবার নামে রাখা হলো 'সফ্রোনিকাস'।

***

১১৯. ইউরিপিডিসের শেষ নাটক। খ্রি. পূ. ৪০৬ অব্দে থেসালি নগরে অভিনীত হয়।

১২০. ইউরিপিডিস খ্রি. পূ. ৪০৬ অব্দে উত্তর গ্রিসের থেসালি নগরে মৃত্যুবরণ করেন।

১২১. ইউরিপিডিসের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই খ্রি. পূ: ৪০৬ অব্দে সফোক্লিস মৃত্যুবরণ করেন।

১২২. ইউরিপিডিস এবং সফোক্লিসের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই এরিস্টোফানিস খ্রি. পূ. ৪০৫ অব্দে ডিওনিসাস উৎসবে 'ব্যাঙ' বা Frogs কমেডি নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন।

৫০

‘একই ভুল দ্বিতীয় বার করা জ্ঞানের পরিচয় নয়।’
-মিনানডার

সক্রেটিস ভেবেছিলেন তিনি কোনো দিন নেতা হবেন না। তবু তাকে নেতা হতে হলো। ছোটখাটো নেতা নয়, তিনি একেবারে সংসদের প্রধান[১২৩] হয়ে গেলেন। তিনি নেতা হলেন এথেন্সের গণতন্ত্রের অদ্ভুত নিয়মের কারণে। এখানে প্রতিদিন লটারি করে একজন সংসদের নেতা হন। লটারির গুণে এক দিনের জন্য নেতা হয়ে গেলেন সক্রেটিস।

তিনি ভেবেছিলেন কোনো রকমে চামেচিকনে দিনটা পার করে দেবেন। কিন্তু সেটি হলো না। অনিচ্ছাকৃতভাবে নেতা হয়ে তিনি পড়লেন বিরাট ঝামেলায়। সংসদে মামলা এসেছে। মামলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। তার মানে তিনি একাধারে নেতা এবং বিচারক। দুটোই তার অপছন্দের কাজ। তিনি বিষণ্ণ বদনে মামলার বিবরণ শুনছেন। অদ্ভুত এক মামলা:

এথেন্সের নৌবাহিনী এক ভয়াবহ যুদ্ধে স্পার্টার সাথে জিতে ফেরার পথে ঝড়ের কারণে তাদের অনেকগুলো জাহাজ ডুবে গেছে। সাগরে ডুবে মারা গেছে কিছু সেনা। তীব্র ঝড়ের কারণে মৃত সৈনিকদের লাশ আনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু লাশ ফেলে আসা এখানে ভয়াবহ অপরাধ। সেই অপরাধে এথেন্সে ফেরা মাত্র গ্রেফতার করা হয়েছে ঐ যুদ্ধের তরুণ সেনাপতিদের। আটজন সেনাপতি ছিল। তাদের দুইজন পালিয়েছে, তারা বুঝতে পেরেছে যে ঘটনা খারাপ। বাকি ছয়জন এথেন্সে ফিরেই আটক হয়েছে। এদের একজন হলো আসপাশিয়ার পুত্র পেরিক্লিস নাম্বার টু। তাদেরকে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে সংসদে। আজকে সংসদের নেতা সক্রেটিস। তিনি বিচার করবেন যে সেনাপতিদের শাস্তি দেবেন নাকি ক্ষমা করে দেবেন। তুমুল আলোচনা চলছে। বিশাল বিতর্ক। লোকজন চিৎকার করে বলছে, ‘মৃত্যুদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড’। আঁৎকে উঠলেন সক্রেটিস। ঝড়ের কারণে লাশ আনতে পারেনি বলে এথেন্সের সেরা সেনাপতিদের মৃত্যুদণ্ড চাইছে মানুষ? চারিদিকে বিপুল গোলমাল, সবাই মৃত্যুদণ্ড চাইছে। তিনি ভাবছেন এথেন্সের মানুষ এত অবিবেচক হলো কী করে? এমনিতেই যুদ্ধে, প্লেগে এথেন্সে যুবক ছেলে কমে গেছে, এখন সেরা যোদ্ধাদের বিনাদোষে মেরে ফেলবে? মানুষ এত অসহিষ্ণু! এই তরুণদের সক্রেটিস ভালোবাসেন, তিনি তাদের সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখান। তিনি বললেন, ‘না, কিছুতেই নয়, আমি নেতা থাকতে এই তরুণ ছেলেদের বিনা দোষে মরতে দেব না।’ সক্রেটিসের বাধার কারণে সেদিন আর বিচার শেষ হলো না। পরদিন সক্রেটিস সংসদের নেতা নেই, বাধা

দেওয়ারও কেউ নেই। পরদিন বিচার করে সেনাপতিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। মেরে ফেলা হলো এথেন্সের শ্রেষ্ঠ তরুণ যোদ্ধাদের। চোখের পানি মুছতে মুছতে সক্রেটিস বললেন, 'এভাবে তরুণদের মেরে ফেললে যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজিত হতে বেশি দিন লাগবে না।'

তার দু বছরের মধ্যেই এক সন্ধ্যার আবছা আলোয় খবর এলো এথেন্স হেরে গেছে। পঁচিশ বছর ধরে যুদ্ধের পর জিতে গেল স্পার্টা। পেলোপোনেসিস যুদ্ধ শেষ হলো। এথেন্সের দেয়াল ভেঙে নগরে ঢুকল স্পার্টানদের নেতা লাইসেন্ডার[১২৪]। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর এখন তাদের হাতে। তারা চাইলে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে এথেন্স। কিন্তু এত চমৎকার নগর তারা ধ্বংস করল না। তারা মানুষ মারবে না। বাড়িঘর পোড়াবে না। সব আগের মতোই থাকবে। শুধু গণতন্ত্র থাকবে না। যত নষ্টের মূল হলো গণতন্ত্র। তাই আজ থেকেই গণতন্ত্র বাতিল। স্পার্টান নেতারা তাদের পছন্দের ত্রিশ জনের একটি কমিটি করে বলল, আজ থেকে এরাই এথেন্সের শাসক। আর কোনো ভোটাভুটি নেই, গণতন্ত্রের খেলনাপাতি সব বন্ধ। এথেন্স শহরের চারদিকের সুরক্ষা দেয়াল ভেঙে ফেলা হলো। বাতিল করা হলো এথেন্সের সেনাবাহিনী। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সৈনিকদের কৃষিকাজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এথেন্সের সব যুদ্ধ জাহাজ দূরের দ্বীপে জিনিসপত্র পরিবহনের কাজে লাগিয়ে দিল।

ত্রিশজন একনায়ক একসাথে এথেন্সের রাজা হয়ে গেল। কী তাদের দাপট! তারা এতদিন গণতন্ত্রীদের অনেক জ্বালা সহ্য করেছে, এবার তারা দেখিয়ে দেবে শাসন কাকে বলে! তারা শুরু করল ব্যাপক কর্মকাণ্ড। আজকে এই আদেশ, কালকে অন্যটা। তাদের নেতা হলো প্লেটোর মামা, নাম ক্রিটিয়াস। গণতন্ত্রের সর্বনাশ আর ক্রিটিয়াসের পৌষ মাস। সে গণতন্ত্রের সব নেতাদের নামে হুলিয়া জারি করল। বন্দি করল অনেককে, অনেকে পালিয়ে গেল। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। শুরু করল নিষ্ঠুর হত্যালীলা। যখন যাকে খুশি মেরে ফেলে, যাকে ইচ্ছা নির্বাসন দেয়। শুরু হলো এথেন্সের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম সময়। চামড়া ব্যবসায়ী গণতন্ত্রী নেতা এনিতাসের ঘর বাড়ি, কারখানা সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে নিল। ত্রিশজন একনায়কের মধ্যে প্লেটোর আরেক মামাও আছেন। তার নাম কারমিড। ক্রিটিয়াস ও কারমিড সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন। যখন তারা ক্ষমতায় আসেনি, তারা সক্রেটিসের আড্ডাখানায় যেত। আর সবার কছে বলত আমরা সক্রেটিসের শিষ্য।

ত্রিশ একনায়করা একটি বুদ্ধি করল। এথেন্সের সব নামি দামি মানুষকে কাজে লাগাবেন। মানী লোকেরা তাদের আদেশ মানতে শুরু করলে, সবাই বুঝবে তাদের অনেক ক্ষমতা। তাই সব নামি দামি লোকের তালিকা করো, কাজ দাও। সেই তালিকায় সক্রেটিসও আছেন।

ক্রিটিয়াস ডেকে পাঠাল সক্রেটিসকে। পত্রপাঠ যেন সক্রেটিস চলে আসেন। সক্রেটিসের প্রতি তার ভীষণ রাগ ছিল। কিছুদিন আগে সক্রেটিস তার চরিত্র নিয়ে ভীষণ বাজে কথা বলেছিলেন। সকলের সামনে তাকে শূকরের সাথে তুলনা করেছিলেন। এক সন্ধ্যায় একটি সিম্পোজিয়াম চলাকালে ক্রিটিয়াস নেশার ঘোরে ইউথিডিমাস নামের একটি সুদর্শন তরুণকে বারবার জড়িয়ে ধরছিলেন। সক্রেটিসের মোটেই ভালো লাগেনি এই ব্যবহার। তিনি সবার সামনে পিন দিয়ে বললেন, 'তুমি এমন করছো যেন একটি বাচ্চা শূকর পাথরের সাথে শরীর ঘষা দিচ্ছে[১২৫]। ক্রিটিয়াস হাসি দিয়ে থেমে গিয়েছিল। হাসি-ঠাট্টায় শেষ হয়েছিল ঘটনা। কিন্তু ক্রিটিয়াস এই অপমান ভোলেনি। সে প্রতিশোধের আশায় ছিল। এখন প্রতিশোধ নেবে। তাই সক্রেটিসকে ডাকল।

সে সক্রেটিসকে আদেশ করল, এক্ষুনি সালামিস দ্বীপে চলে যাও, সেখানে লিওন নামে এক ধনী লোককে আটক করে নিয়ে আসো। তার টাকা-সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে আনো। সক্রেটিস ও আরও চারজন, মোট পাঁচজনে মিলে গ্রেফতার করতে হবে। এখুনি সেনা নিয়ে বেরিয়ে যাও।

সক্রেটিস ভালো করে ক্রিটিয়াসের দিকে তাকালেন। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এ কি তার ছাত্র ক্রিটিয়াস? একজন নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করতে বলছে! সক্রেটিসের মতো বৃদ্ধকে এই কাজ করতে হবে? এই কাজ সক্রেটিস করতে পারেন না। তিনি বাড়ি চলে গেলেন। অন্য চারজন আদেশ পালন করল। শুধু সক্রেটিস অন্যায় আদেশ মানলেন না।

বাড়ি ফিরেই সক্রেটিস খবর পেলেন, জেনথিপি তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এটিও ছেলে। এথেন্সে এখন ছেলে শিশু দরকার। সরকার বুড়ো- বুড়িদের বাবা-মা হতে উৎসাহ দিচ্ছে। জেনথিপি তৃতীয় বারের মতো মা হলেন। ছেলের নাম রাখা হলো মেনেক্সানোস।

প্লেটো ভীষণ ক্ষুব্ধ। তার মামা এটি কী করছে? এটি কি কোনো শাসন! প্লেটোর রাজনীতি করার ইচ্ছাটাই চলে গেল। সে গণতন্ত্রকে তেমন পাত্তা দিত না। গণতন্ত্র হলো বাচালদের শাসন। বাচালরা বেশিরভাগ সময় মূর্খ হয়। প্লেটো ভাবত, গণতন্ত্রের বদলে একনায়করা ভালো শাসন করবে। তার মতে যোগ্য একনায়কই সেরা শাসক। কিন্তু নিজের মামা ক্রিটিয়াস যখন একনায়ক হলো, তখন প্লেটোর ভুল ভাঙল। একনায়ক যে কত খারাপ হতে পারে, সেটি নিজের চক্ষে দেখল। নিজের এত ভালো মামাটা এমন হয়ে গেল কেন? তার মানে স্বৈরাচারী একনায়ক ব্যবস্থাটা ভালো নয়। এটি ভালো মানুষকে খারাপ শাসক করে তোলে।

প্লেটো ভাবছে গণতন্ত্রও ভালো নয়, আবার একনায়করাও খারাপ। তাহলে দেশ চলবে কী করে? সে একটি সুন্দর নগরের স্বপ্ন দেখে। যে নগরে সবাই সুখে থাকবে। কোনো

দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা সব থাকবে। সে যখনই সময় পায়, সক্রেটিসের সাথে আলাপ করে, একটি সুন্দর নগর কীভাবে বানানো যায়! প্লেটো সেই নগরের নাম দিল কালিপলি বা সুন্দর নগর[১২৬]। আসলে এই সুন্দর নগর হলো একটি আদর্শ রাষ্ট্রের চিন্তা। তো কে হতে পারে আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ শাসক? গণতন্ত্র? একনায়ক?

প্লেটো এই ব্যাপারে সক্রেটিসের সাথে পরামর্শ করে। সক্রেটিস বলেন, 'দার্শনিক বা জ্ঞান-প্রেমিকরাই হলো সবচেয়ে ভালো মানুষ। দার্শনিক মানে যারা সত্যকে দর্শন করেছেন, সত্যকে নেড়েচেড়ে দেখেছেন। তাদের চেয়ে ভালো মানুষ আর নেই। তারা সাধারণত বিয়ে করেন না। বিয়ে করলেও তাদের মনে থাকে বৈরাগী স্বভাব। তারা নিঃস্বার্থ হয়। নিঃস্বার্থ দার্শনিকের শাসনই সবচেয়ে ভালো শাসন।'

কথাটা প্লেটোর পছন্দ হলো। দার্শনিকের শাসন দরকার। যার হাতে অস্ত্র থাকবে, সে শাসন করবে না। সে অন্যের আদেশ মানবে। তাহলেই অস্ত্রের ব্যবহার সুন্দর হবে। সেনাপতি শাসন করবে না। সেনাপতি দার্শনিক রাজার অধীনে থেকে কাজ করবে। তাহলেই আদর্শ রাষ্ট্র হবে।

প্লেটো ভাবছে দার্শনিকের শাসনে আদর্শ রাষ্ট্রে সবকিছুতে ন্যায় থাকবে। মানুষের ব্যক্তিজীবনে যেমন সবকিছুতে ন্যায় প্রয়োজন, তেমনই রাষ্ট্রের জন্যও দরকার ন্যায়। রাষ্ট্রকেও হতে হবে ন্যায়পরায়ণ। সেটি তখনই সম্ভব যদি ছোটবেলা থেকে তরুণদের দার্শনিক বানানো যায়। সেজন্য স্কুল দরকার। বড়দের জন্য স্কুল। সক্রেটিস যদি একটি স্কুল দিতেন, অনেক মানুষের উপকার হতো। তরুণরা শিখতে পারত। সক্রেটিস যে সুন্দর জীবনের কথা বলেন, যুবকেরা সেই সুন্দর জীবন পেত।

একদিন ভয়ে ভয়ে সক্রেটিসকে বলেই ফেলল, আপনি একটি স্কুলের মতো কিছু দিলে ছাত্রদের অনেক উপকার হতো।

হো হো করে হেসে উঠলেন সক্রেটিস। বললেন, আমার তো স্কুল আছে। সারা এথেন্সই তো আমার স্কুল। এথেন্সের প্রতিটি অলি-গলি আমার স্কুল। প্রতিটি জিমনেশিয়াম আমার স্কুল। সিমনের দোকান আমার স্কুল। এত বিশাল স্কুলের এত ছাত্র ফেলে আমি এক ভবনের একটি স্কুল বানালে তাতে ছাত্রদের ক্ষতি হবে।

প্লেটো বুঝল, সক্রেটিস সেই ধরনের মানুষ নন। তিনি মুক্ত। ধরাবাঁধা জীবন তার জন্য নয়।

ত্রিশ একনায়কের যন্ত্রণায় মানুষ ভীষণ ভীতিকর সময় কাটাচ্ছিল। ভাগ্য ভালো এই ভয়ের শাসন বেশিদিন রইল না। প্লেটোর মামা ক্রিটিয়াস বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারল না। মাত্র আট মাস পরেই গণতন্ত্রের পক্ষের লোকজন দখল করল এথেন্স। এই দখলে নেতৃত্ব দিল এনিতাস। ত্রিশ একনায়ক সবাই মারা গেল। আরেক দফা রক্তপাত হলো, আবার অনেক মৃত্যু হলো। এথেন্সে আবার গণতন্ত্র ফিরে এলো।

এখন নেতারা খুঁজছে— এথেন্সের এই খারাপ সময়ের জন্য দায়ী কে? ছেলেদের নষ্ট করছে কে? কে গণতন্ত্রকে বারবার হারিয়ে দিচ্ছে? কে দায়ী? কেন স্পার্টার সাথে হারল এথেন্স? এথেন্স হেরেছে, তার কারণ এলসিবিয়াডিস। তার জন্যই বড় হার হয়েছিল সিসিলিতে, পরিণামে স্পার্টার সাথে চূড়ান্তভাবে হেরে গেছে। এই দুষ্ট এলসিবিয়াডিস কে? সে সক্রেটিসের শিষ্য। এথেন্সের আরেক দুষ্ট লোক ক্রিটিয়াস। সে কয়েক মাস ক্ষমতায় থেকে গণতন্ত্রের নেতাদের কচুকাটা করেছে। তার মতো খারাপ লোক এথেন্সে গত কয়েকশ বছরে জন্মায়নি। সে কে? সেও সক্রেটিসের শিষ্য তার মানে সক্রেটিসের শিষ্যরাই এথেন্সের ধ্বংসের জন্য দায়ী। সকল নষ্টের গোঁড়া হলো সক্রেটিস। সেই আমাদের সোনার ছেলেদের নষ্ট করছে। সক্রেটিসকে শিক্ষা দিতে হবে। সক্রেটিসকে শিক্ষা দিতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হলো এনিতাস। এনিতাস এখন বড় নেতা। নতুন গণতন্ত্রের সে একজন নীতি-নির্ধারক। এনিতাস অনেকদিন ধরে সক্রেটিসকে শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। সে নিজের টাকায় 'মেঘ' নাটক অভিনয় করিয়েছে অনেক জায়গায়। সক্রেটিসকে মানুষের কাছে খারাপ করে তুলে ধরতে যা যা করা সম্ভব, সব করেছে সে। আবার 'মেঘ' নাটকটি দেখাতে হবে মানুষকে। সবাইকে বোঝাতে হবে যে আমাদের খারাপ সময়ের জন্য সক্রেটিসই দায়ী।

আজ সন্ধ্যায় এথেন্সে আবার 'মেঘ' নাটকটি অভিনীত হবে। আবার সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আর নাট্যকার এরিস্টোফানিস অভিনয় করবে না। সে বুঝতে পেরেছে যে সে ভুল লিখেছিল। কিন্তু তার কিচ্ছু করার নেই। নাটকের প্রযোজক হলো এনিতাস। এনিতাস নিজের টাকায় নাটকটি অভিনয় করায়। এথেন্সের বিভিন্ন পাড়ার থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করায়।

প্লেটো নাটকটি দেখল। নাটকে দেখানো হচ্ছে, সক্রেটিস তার চিন্তার দোকানে বসে একটি ছেলেকে খারাপ করছে। ছেলেটি সক্রেটিসের শিক্ষায় নষ্ট হয়ে গেল। বাবাকে পিটাল। দেবতা জিউসকে ভুলে মেঘকে দেবতা মেনে নিল। অবশেষে ছেলেটির বাবা সক্রেটিসকে ঘরে আটকে আগুন দিয়ে দিল। কোনমতে পালিয়ে বাঁচল সক্রেটিস।

এই নাটক দেখতে দেখতে থিয়েটারে বসেই কাঁদল প্লেটো। মঞ্চে এরকমভাবে কেউ সক্রেটিসকে দেখাতে পারে, সেটি তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এমন মিথ্যা কথা মানুষ লিখতে পারে? এটি কি কোনো মানুষের কাজ? এই নাটক লিখেছে এরিস্টোফানিস। খুবই প্রতিভাধর নাট্যকার। তার মতো লেখক যদি এমন মিথ্যা নাটক লেখে, তাহলে অন্যদের কী অবস্থা! তো নাটক মানেই মিথ্যা। কবিতা মানেই বানানো। নাটক, কবিতা সমাজের জন্য ক্ষতিকর সক্রেটিসের মতো দেবতাতুল্য মানুষকে নিয়ে যদি এমন নাটক লেখে, তাহলে সাহিত্যিকরা পারে না এমন কোনো জিনিস নেই।

থিয়েটার থেকে বের হয়ে প্লেটো বাড়ি ফিরে গেল না। সরাসরি সক্রেটিসের বাড়ি গেল। তার চোখ এখনও ছলছল করছে। সক্রেটিস আর জেনথিপি দুজনেই তাকে দেখে চমকে উঠলেন। এই সন্ধ্যায় প্লেটো তাদের বাড়িতে এসেছে? নিশ্চয়ই ঘটনা সাংঘাতিক। সে অনেক প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটি ছেলে। তার চোখে বিষাদ থাকে না। সেই ছেলে সন্ধ্যাবেলা কাঁদতে কাঁদতে সক্রেটিসের বাড়িতে এসেছে, মোটেই ভালো কথা নয়।

জেনথিপি এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করেন। তিনি জানেন, এই ছেলেটি সক্রেটিসকে সীমাহীন ভালোবাসে।

জেনথিপি প্লেটোকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চোখে পানি কেন?

প্লেটো বলল, থিয়েটার থেকে এলাম।

জেনথিপি কিছু বুঝতে পারছেন না। থিয়েটার থেকে এলে কান্না করার কী আছে? তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

সক্রেটিস বললেন, তার মানে হলো, আজ প্লেটো 'মেঘ' নাটকটি দেখেছে। এনিতাস আবার নাটকটি দেখাতে শুরু করেছে।

সক্রেটিসের মনে আছে, প্রথমবার নাটকটি দেখে তিনিও কেঁদেছিলেন। চেরোফোন হাউমাউ করে কেঁদেছিল। এখন প্লেটোর মতো একটি শান্ত ছেলেও কাঁদছে। প্লেটোর অবস্থা দেখে জেনথিপির চোখও ছলছল করে উঠল। তিনি কান্না গোপন করতে চাচ্ছেন। সক্রেটিস দেখলেন, এখানে থাকলে সম্মিলিত কান্না শুরু হয়ে যাবে। তার চেয়ে নাটক নিয়ে প্লেটোর মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে কিছু করা যাক।

সক্রেটিস বললেন, প্লেটো, চলো একজন নাট্যকারের কাছে যাই।

দুজনে বের হলো।

নাট্যকারের নাম ইওন[১২৭]। ইদানীং খুব ভালো অভিনয় করছে। সে মঞ্চে উঠেই কান্নাকাটি শুরু করে, এমন হৃদয় বিদারক কান্না করে যে থিয়েটারের সকল দর্শক হাউমাউ করে কাঁদে। তাকে সবাই এখন বলে কান্না বাহার। কেঁদে কেঁদে সে ইদানীং পুরস্কারও জিতছে। গতকাল এথেন্সের বাইরে এপিডাভরো শহর থেকে সেরা নাট্যকারের পুরস্কার নিয়ে এসেছে। সক্রেটিস তাকে বললেন, নাট্যকার, তুমি কি জানো, তোমার কান্না কেমন করে দর্শকদের কাঁদায়?

ইওন বলল, হ্যাঁ, জানি তো। আমি মঞ্চ থেকে দেখি, আমি কাঁদি, আমাকে দেখে দর্শকরাও কাঁদে। এতে মনে মনে আমার খুব আনন্দ হয়। আমি খুব কায়দা করে ওদের কাঁদাই। এই কাঁদানোর জন্যেই লোকে আমায় ডাকে। এই কাঁদিয়েই আমি পয়সা পাই। কান্না শেষে পয়সা হাতে নিয়ে আমি হাসি।

প্লেটো বলল, বাহ, নাট্যকার তুমি খুব সহজে সত্যিটা বলেছ। ধন্যবাদ। তোমার এই কান্নাবিলাস প্লেটোকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল।

তারা নাট্যকারকে ছেড়ে দিল। নিজেরা আলাপ শুরু করল। আলাপের বিষয় কবিতা, নাটক এসব দরকার আছে কিনা?

প্লেটো বলল, নাট্যকার ইওন খুব সৎ লেখক। সে সত্য কথাটা বলেছে। কবিতা, নাটক এমনই। এগুলো মানে শুধুই মিথ্যার অভিনয়।

সক্রেটিস বললেন, কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে আসলেই ঝামেলা। তারা মানুষকে উস্কে দিতে খোঁচা দেয়। দেখো, হোমারের মতো মহান কবি তার অডিসি কাব্যে কীরকম একটি বিশ্রী কাহিনি দিয়ে খোঁচা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি তার স্বামী কর্মকার দেবতা হেফাস্টাসকে ভালোবাসে না, সে ভালোবাসে যুদ্ধের দেবতা আরিসকে। তার স্বামী তাদেরকে ধরার জন্য অনেক দিন তক্কে তক্কে ছিল, শেষে একদিন প্রেমিক-প্রেমিকাকে লজ্জাকর অবস্থায় একসাথে ধরে অদ্ভুত এক লোহার শিকলে দুজনকে আটকে সব দেব-দেবীকে খবর দেয়। লজ্জাকর উলঙ্গ অবস্থায় দুজনকে আটকে থাকতে দেখে সব দেব-দেবী ঠাট্টামশকরা শুরু করল[১২৮]। এখন প্লেটো, তুমিই বলো এখানে হোমার কী বোঝাতে এই কাহিনি অডিসি বইতে দিলেন? এতে কি কোনো শিক্ষা আছে? স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ধরার জন্য স্বামীকে ফাঁদ পাতা শেখানোর জন্যই কি এরকম কাহিনি লিখলেন হোমার? হোমারের মতো মহান কবির যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্যরা কী লিখতে পারে সেটি ভেবে দেখো। এই ধরনের লেখার কোনো দরকার আছে?

অনেক রাত পর্যন্ত এসব নিয়ে আলাপ করল সক্রেটিস আর প্লেটো। প্লেটো মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, আমার আদর্শ রাষ্ট্রে আমি কোনো নাট্যকার রাখব না, কোনো কবি রাখব না। শুধু এমন কবিরা থাকবে যারা শিক্ষামূলক লেখা লিখবে। যারা মিথ্যা কথা লেখে, যারা যুবকদের জন্য ক্ষতিকর কথা লেখে, আদর্শ রাষ্ট্রে তাদের দরকার নেই। তাদের সব নির্বাসন দিয়ে দেওয়া হবে। মিথ্যাবাদী কবি, মিথ্যাবাদী নাট্যকার সবাইকে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা হবে। যারা সত্য কথা লিখবে, ভালো কথা লিখবে তারাই শুধু আদর্শ রাষ্ট্রে থাকবে।

প্লেটো ভাবছে একথা সক্রেটিসকে বলা যাবে না। সক্রেটিস রাজি হবে না। সক্রেটিস সবকিছুতে মধ্যপন্থি। তিনি কোনোকিছুতেই চরম সিদ্ধান্ত নেন না। কিছু করতে বাধ্য করেন না। কবি-সাহিত্যিকদের তাড়িয়ে দেওয়ার মতো এরকম কঠিন কথা সক্রেটিস মানবেন না। বাড়ি ফিরে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করল প্লেটো। প্লেটোর বয়স ছাব্বিশ। সে যত কবিতা আর নাটক লিখেছিল সব এনে উঠানে জড়ো করল। এই বয়স পর্যন্ত সে যা কিছু লিখেছিল সব কিছু একত্র করল। উঠানে পেপিরাসের বিশাল স্তূপ হয়ে গেল।

বাড়ির লোকেরা কিছুই বুঝতে পারছেন না। ছেলে কী করছে! কিছু মনে হয় হারিয়ে গেছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখা মনে হয় খুঁজছে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই পেপিরাসের স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দিল প্লেটো। সবাই হায় হায় করে উঠল। সন্ধ্যার আঁধার আলো করে জ্বলে উঠল প্লেটোর এত বছরের লেখা।

তার মা কাঁদছেন। ছেলে পাগল হয়ে গেল। বাবা বলেছিল, এই ছেলে একদিন হোমারকে ছাড়িয়ে যাবে, একদিন সফোক্লিসের চেয়ে বড় নাট্যকার হবে। আর সেই ছেলে তার সব লেখা পুড়িয়ে দিল!

সবাই আফসোস করছে। শুধু প্লেটো হাসছে। একটি শান্তির হাসি। সক্রেটিসের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই তার নতুন জীবন শুরু হয়েছে। সে আর কোনোদিন কবিতা লিখবে না। নাটক লিখবে না। কবিতায়, নাটকে মিথ্যা কথা লেখা হয়। সে আর এসব কিছুই লিখবে না। যদি কিছু লিখে, সেটি হলো সক্রেটিসের মুখের কথা, সক্রেটিসের দর্শন। সেগুলো সব সত্য, কোনো মিথ্যা কিছু আর সে লিখবে না।

রাতের আকাশ আলো করে জ্বলছে প্লেটোর লেখা সব কবিতা। পুড়ছে তার লেখা সব নাটক। এথেন্সের বাতাসে ভাসছে কবিতা পোড়ার গন্ধ।

আগুনের শিখা ছুঁয়ে প্লেটো মনে মনে দৃঢ়ভাবে বলছে, পৃথিবীতে আর কোনো কবি থাকবে না, কোনো কবিতা থাকবে না। কোনো নাটক থাকবে না, কোনো নাট্যকারও থাকবে না। আমি যদি কোনোদিন একটি আদর্শ নগর তৈরি করতে পারি, সেই নগরে কোনো কবি থাকবে না, কোনো নাট্যকার থাকবে না। যারা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা লেখে, আমার নগরে তাদের কোনো স্থান হবে না। আমি সেই নগর থেকে সকল মিথ্যাবাদী কবি-সাহিত্যিককে নির্বাসন দেব।

এই সন্ধ্যায় এথেন্সের নিকষ আঁধার ভাসিয়ে জ্বলছে অদ্ভুত এক আগুন। সেই আগুনে খড়কুটোর মতো পুড়ে যাচ্ছে একজন কবি, মোমের মতো গলে যাচ্ছে একজন নাট্যকার, ছাই হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা একজন সাহিত্যিক। আর সেই ছাইয়ের ভগ্নস্তূপ থেকে জন্ম নিচ্ছে একজন সুকঠিন দার্শনিক, তার নাম প্লেটো।

***

১২৩. সক্রেটিস খ্রি. পূ. ৪০৬ অব্দে এক দিনের জন্য এথেন্সের সংসদ (Boule) এর নেতা হন, সেদিনই ছয়জন তরুণ সেনাপতিকে বিচারের জন্য সংসদে আনা হয়।

১২৪. খ্রি. পূ. ৪০৪ অব্দে স্পার্টান সেনাপতি লাইসেন্ডার এথেন্সকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

১২৫. জেনোফোন তার Memoribilia গ্রন্থে ক্রিটিয়াসের সাথে সক্রেটিসের এই হাল্কা ঝগড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

১২৬. প্লেটোর সুবৃহৎ Republic গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্র বা নগরের কল্পনা করেছেন, যেটিকে গ্রিক ভাষায় kallipolis বলে। প্লেটোর মতে সব ভালোর এই নগরকে চালাতে একজন সর্বগুণান্বিত দার্শনিক শাসকের প্রয়োজন হবে।

১২৭. প্লেটোর Ion নামে ডায়ালগে এটি বিস্তারিত লিখেছেন।

১২৮. প্লেটো তার Republic বইতে হোমারের লেখা নিয়ে সক্রেটিসের মুখে এই সমালোচনা উল্লেখ করেছেন।

৫১

‘যারা উত্তম— তারা নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে কথা বলে,
যারা মধ্যম- তারা যা ঘটছে, সেই ঘটনা নিয়ে কথা বলে,
আর অধম- তারা শুধু অন্য মানুষকে নিয়ে কথা বলে, গুজব বানায়।’
—সক্রেটিস

ভয়ংকর রাগে ফুঁসছে এনিতাস।

সে সক্রেটিসকে শিক্ষা দিতে জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছে, কিন্তু তার নিজের ছেলেই হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘরের শত্রু বিভীষণ! সে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার ছেলে কী করে সক্রেটিসের ভক্ত হয়ে গেল! কোন জাদুবলে আদরের ছেলেটাকে পর্যন্ত বশ করে ফেলল ঐ ছেলেধরা সক্রেটিস।

এনিতাস অনেক কষ্টের পরে একটু সুখের মুখ দেখেছে। স্বৈরাচাররা তার সব সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল। এখন সবকিছু ফিরে পেয়েছে। অনেক নতুন নতুন সম্পত্তির মালিক হয়েছে। সে গণতন্ত্রের নেতা হয়ে গেছে। এখন তার সুখের সময়। চামড়ার ট্যানারির ব্যবসাও রমরমা। ট্যানারি চালায় তার ছেলে। ছেলেটি খুবই বুঝদার। বাবা-মাকে ভক্তি করে, গুরুজনে মান্য করে। এই বয়সেই বাবার সংসারটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। এমন হীরের টুকরা ছেলে এথেন্সে দেখাই যায় না। সেই ছেলে হঠাৎ করে সক্রেটিস হতে চাইছে! এনিতাসের জন্য একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত। ছেলেটাকে পর্যন্ত জাদুটোনা করে ফেলল!

সেদিন ভর দুপুরে ছেলে হঠাৎ বলল, বাবা, আমার আর এই কাজ ভালো লাগে না। আমি পড়াশুনা করব। জ্ঞানী হতে চাই।

এনিতাস বলল, পড়াশুনা করবি? খুবই ভালো কথা। তো একজন শিক্ষক দরকার। ভালো শিক্ষক তো এখন চোখেই পড়ে না। যে দু’এক আছে, তারা নাকি অনেক পয়সা নেয়। যাক, তুই পয়সা নিয়া ভাবিস না, একজন ভালো ওস্তাদ তালাশ করতে হবে।

ছেলে হেসে বলল, না বাবা, আমার ওস্তাদ পয়সা নেবে না।

‘পয়সা নেবে না? তো কী নেবে?’

‘কিছুই নেবে না।’

‘ধুর বলদ, এমন মানুষ পৃথিবীতে নাই।’

‘সত্যি বাবা, এই ওস্তাদ কোনো পয়সা নেয় না।’

‘তাই নাকি, কে এই বোকা ওস্তাদ?’

‘সক্রেটিস।’

ছেলের কথা শুনে এনিতাসের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে। আমার ছেলে ব্যবসা বাদ দিয়ে সক্রেটিসের কাছে পড়াশুনা করতে চায়! এ পৃথিবীতে এনিতাস যে মানুষটিকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, সে হলো সক্রেটিস। আর তার ছেলে তাকেই বেছে নিয়েছে শিক্ষক হিসেবে। সক্রেটিস তার নিজের ছেলেকেও সম্মোহিত করে ফেলেছে। কী সাংঘাতিক! এতদিন ছিল গণতন্ত্রের শত্রু। এখন তো পরিবারেরও শত্রু হয়ে গেল।

এনিতাস ছেলেকে বলল, সক্রেটিসের নামও যদি তোমার মুখে কোনোদিন শুনি, তাহলে তোমার চামড়া তুলে ফেলব। আমার চামড়ার কারবার। আমি তোমার আর সক্রেটিস দুইজনের চামড়া দিয়া ব্যবসা করব।

‘কেন বাবা? সক্রেটিস তো খুব ভালো মানুষ। উনি নৌকায় করে এলসাস নদীতে ভেসে ভেসে গল্প করেন। নদীর পানিতে পা ভিজিয়ে কী মিষ্টি করে কথা বলেন! প্রতিদিন আমাদের ট্যানারির পাশের নদী দিয়ে ছেলেদের নিয়ে ভেসে যান। এমন রসিক, এমন মজার মানুষ এথেন্সে আর কেউ নেই। আমি দেখি। মুগ্ধ হয়ে দেখি।’

এনিতাস বলল, তুই জানিস না, ও কোনো কাজ করে না। ওর সাথে যারা ঘোরে, সব বড়লোকের ছেলে। তাদের কাজ করার দরকার নেই। ও সেসব ছেলেদের কুবুদ্ধি দেয়। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছেলেদের তৈরি করে। ওর ছাত্র ছিল এলসিবিয়াডিস। ওর ছাত্র ছিল ত্রিশ একনায়কদের নেতা ক্রিটিয়াস, যে আমাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। রাস্তার ফকির বানিয়েছে। ও ঘরে ঘরে এলসিবিয়াডিস বানায়, ঘরে ঘরে ক্রিটিয়াস বানায়।

‘না, বাবা, উনি ভালো মানুষ। সুন্দর জীবনের কথা বলেন।’

ছেলেকে সজোরে একটি চড় দিল এনিতাস। বলল, তুই ওকে বেশি চিনিস? না আমি বেশি চিনি? আর কোনোদিন ওর নামও নিবি না। পড়াশোনার দরকার নেই। তুই মন দিয়ে চামড়ার ব্যবসা কর।

ছেলে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল ছেলেটি চূড়ান্ত মাতাল হয়ে গেছে[১২৯]। কারও কথা শোনে না। বাবাকে আর একটুও মানে না। ব্যবসার ধারে-কাছেও যায় না। সারা এথেন্সের সবচেয়ে খারাপ ছেলেদের একজন হয়ে গেল এনিতাসের ছেলে।

ছেলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যও এনিতাস দায়ী করল সক্রেটিসকে। সে কেঁদে কেঁদে বলে, সক্রেটিস আমার জীবনের নেমেসিস[১৩০]। সে আমার ছেলেকেও নষ্ট করেছে। আমি প্রতিশোধ নেব। কঠিন প্রতিশোধ। আজ থেকে আমি হলাম সক্রেটিসের জীবনের নেমেসিস। প্রতিজ্ঞা করছি তিন মাসের মধ্যে সক্রেটিসকে এথেন্স থেকে বিদায় করব। আর দেরি নয়। আমি এখনই মামলা করব। সে মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করল। গণতন্ত্রের নেতারা একমত যে সক্রেটিস একজন খারাপ মানুষ। তার বিচার করা উচিত।

কিন্তু কেউই নিশ্চিত নয় যে, বিচারে তার শাস্তি হবেই। তার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া সক্রেটিস খুবই জনপ্রিয়। তরুণ ছেলেরা তাকে ভালোবাসে। যেনতেনভাবে তাকে মামলায় ফাঁসানো যাবে না। তার জন্য ভীষণ প্যাচের জাল বিছাতে হবে। জালটা ঠিকমতো ফেলে তারপর মামলা করতে হবে।

তারা দল বেঁধে মানুষকে ডেকে ডেকে বলতে শুরু করল, সক্রেটিস আমাদের ছেলেদের এথিকস বা নৈতিকতার নামে বাজে জিনিস শেখাচ্ছে। বাবা-মাকে অপমান করতে শেখাচ্ছে। গুরুজনকে অপমান করতে শেখাচ্ছে। ও স্পার্টার চর। ও এথেন্সের ভালো ভালো ছেলেকে স্পার্টার চর বানাচ্ছে। আমাদের সোনার টুকরা বাচ্চাদের ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। দেবতাদের অপমান করতে বলছে। সক্রেটিসের মুখ বন্ধ করতে হবে। চিরতরে ওকে থামিয়ে দিতে হবে। এমন শাস্তি দিতে হবে যেন এথেন্সে আর কেউ কোনোদিন এই কাজ করতে সাহস না পায়।

ভয়ংকর গুজব শুরু হলো সক্রেটিসের নামে। মিডিয়া ট্রায়াল হিসেবে অনেক দিন ধরেই চলছে 'মেঘ' নাটক। ধীরে ধীরে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে সক্রেটিসের বিচার হওয়া দরকার। স্পার্টার কাছে হেরে যাওয়ার পর একনায়কদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ কিছু দিন হলো গণতন্ত্র ফিরে পেয়েছে। গত কয়েক বছর তাদের জীবনে অনেক কষ্ট গিয়েছে। সবার ঘরেই কেউ না কেউ মারা গেছে। এই দুর্ভোগের জন্য কাউকে দায়ী করতে পারলে মনের ঝাল মিটবে। মনের শান্তির জন্য একজন বলির পাঁঠা দরকার। আর সেটির জন্য এথেন্সের সবচেয়ে সহজ টার্গেট হলেন সক্রেটিস।

তারচেয়ে মজার কথা হলো, সক্রেটিসকে কোনোদিন কারও উপর প্রতিশোধ নেন না। তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দেয়। নিজে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যান, তবুও অন্যের ক্ষতি করেন না। হাসি মুখে বলেন জ্ঞান নেই বলে এমন করে, সঠিক ব্যাপারটা জানলে এমন করবে না। এই লোকের অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছাই নেই। তিনি ক্ষমা পুরুষ, সবাইকে ক্ষমা করে দেন। তিনি নীলকণ্ঠ, বিষ নিজে খেয়ে সবাইকে সুখী রাখেন। এরকম ক্ষমা কুমারকে আঘাত করলে কোনো সমস্যা নেই। এর নামে মামলা করলে কোনো সমস্যা নেই।

মামলা একা করলে হবে না। কয়েকজন মিলে করতে হবে। এনিতাস আগোরায় গিয়ে খুঁজে বের করল একজন কবিকে। কবির নাম মেলিতাস।

সে মেলিতাসকে ডেকে চুপি চুপি বলল, শোনো কবি, তোমাদের দিন শেষ। সক্রেটিস ঠিক করেছে, কবিদের নির্বাসন দিয়ে দেবে।

মেলিতাস বলল, 'মানে কী? সক্রেটিস কবিদের নির্বাসন দেবে কীভাবে? সে তো নেতা নয়।'

'নেতা নয়, কিন্তু বাচ্চা ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। যুবক ছেলেরা ক্ষেপে উঠছে। তুমি প্লেটোকে চেন?'

‘প্লেটোকে চেনে না, এমন কেউ এথেন্সে আছে?’

‘দেখো, প্লেটো ছেলেটা কত প্রতিভাবান। ছেলেটা কবি হতো, নাট্যকার হতো। কিন্তু সক্রেটিস তাকে এমন কানপড়া দিছে, সে আর কবিদের নামও শুনতে পারে না। সে বলে কবিদের নির্বাসন দেবে।’

‘তাই নাকি?’

‘তবে আর বলছি কী? তাই ওকে সরাতে হবে। ঝেঁটে ফেলতে হবে এথেন্স থেকে।

‘কীভাবে?’

‘মামলা করে।’

‘কে করবে মামলা?’

‘তুমি করবে।’

‘আমি?’

‘হ্যাঁ, তুমি। তোমার মতো বড় কবি কি এথেন্সে আর আছে? কবিদের বাঁচাতে হবে।’

‘আমি কি পারব? আমার ভয় লাগে। সক্রেটিসকে ছেলেরা অনেক পছন্দ করে। ওর সাথে কত ছেলেপেলে ঘোরে!’

‘ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি তো একলা মামলা করবে না। আমি আছি তোমার সাথে। শুধু আমি একলা নই, সাথে আরেকজনকে নেব। সে হলো আমাদের বন্ধু লাইকন।’

‘বিখ্যাত বক্তা লাইকন? সে রাজি হবে?’

‘অবশ্যই রাজি হবে। এই মামলায় সক্রেটিসকে সাজা দিতে পারলে তিনজনই বিখ্যাত হয়ে যাব। সবাই বলবে, ওরা তিনজন এথেন্সকে বাঁচিয়েছে। ওরাই সবচেয়ে দেশপ্রেমিক। আমরা বিরাট নেতা হয়ে যাব। লোকে বুঝবে আমাদের ক্ষমতা। আমরা কী করতে পারি, সেটি জেনে যাবে। আমরা ভোটে দাঁড়াব, ভোটে জিতব। তিনজনে মিলে আগামী সপ্তাহেই মামলা করব।’

মেলিতাস বলল, তো মামলায় অভিযোগ হলো: সক্রেটিস কবিদের নির্বাসন দিতে চায়, তাই তো?

রাগে দাঁত কড়মড় করে উঠল এনিতাস। মেলিতাস তো একটি বোকাস্য বোকা, মহা বোকা! কিচ্ছু বোঝে না।

এনিতাস বলল, আরে কবিদের কথা আমি তোমার কাছে বললাম। এটি সক্রেটিস কোনোদিন বলেনি। প্লেটো বন্ধুদের সাথে আলাপে বলেছে। এসব অভিযোগে মামলা দিলে সক্রেটিসের কিছুই হবে না।

‘তাহলে অভিযোগটা কী?’

‘এমন কিছু বলতে হবে যাতে সারা এথেন্সের মানুষ ওর বিরুদ্ধে যায়। বলতে হবে, ও দেবতা মানে না। ও দেবতাদের নামে নিন্দা করে।’

‘এটি তো মিথ্যা। আমি তো সক্রেটিসকে দেবতাদের নিন্দা করতে শুনিনি। এমন ডাহা মিথ্যা কথা দিয়ে আমি মামলা করব না। আমি কবি। কবিরা মিথ্যা বলে না।’

এনিতাস বলল, আমরাও মিথ্যা বলব না। তুমি তো ঘটনাই জানো না। সেজন্য এমন মিথ্যা ভাবছো। ঘটনা হলো ওরা গোপনে গোপনে সিম্পোজিয়াম করে। সেখানে দেব-দেবীর নামে গালাগালি করে। বলে, আমরা যারা দেবতা মানি, তারা নাকি সবাই বোকা। ওরা হলো জ্ঞানী।

মেলিতাস তাকিয়ে রইল। সে ঠিক বিশ্বাস করছে বলে মনে হচ্ছে না। এনিতাস বলল, তুমিই তো বলেছ, সক্রেটিস তোমাকে অপমান করেছে। মেলিতাস বলল, হুঁম, আমি এক সন্ধ্যায় লিকাবিথোস পাহড়ের উপর গল্প করছি। সক্রেটিস এলো, সাথে তার বন্ধু ক্রিতো। আমাকে কত মানুষের সামনে অপমান করে গেল। আমি নাকি আমার কবিতাই বুঝি না! সেই থেকে ছেলেরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।

এনিতাস বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তোমার মতো কবিকে নিয়ে বাচ্চা ছেলেরা হাসাহাসি করে? এর জন্য দায়ী কে?

‘সক্রেটিস।’

‘এই তো বুঝেছ। ও ছেলেদের নষ্ট করে ফেলছে। ও আমার নিজের ছেলেকেও নষ্ট করেছে। ওর জন্য আমার ছেলে মাতাল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওসব বাদ দাও। তুমি গত কয়েক বছরে এথেন্সের সবচেয়ে খারাপ কয়েকটা ছেলের নাম বলো।’

মেলিতাস চিন্তা করে বলল, সবচেয়ে খারাপ ছিল ক্রিটিয়াস। এরপর এলসিবিয়াডিস। এরপর ...

তাকে আর বলতে দিল না এনিতাস। বলল, এতেই যথেষ্ট। তুমি বুদ্ধিমান লোক। তুমি সবচেয়ে খারাপ দুজন মানুষের নাম বললে, ক্রিটিয়াস আর এলসিবিয়াডিস। তুমি এথেন্সের যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো, সবাই এই দুজনের নামই বলবে। এবার বলো— এদের নষ্ট করল কে? কে এদের শিক্ষক?

‘সক্রেটিস।’

‘তার মানে সক্রেটিস ছেলেদের নষ্ট করছে। আজ যারা গণতন্ত্রের বিরোধী, সবার গুরু হলেন সক্রেটিস। সে যদি থাকে, তাহলে ঘরে ঘরে জন্ম নেবে ক্রিটিয়াস। ঘরে ঘরে আসবে এলসিবিয়াডিস। তাই এটি বন্ধ করতে হবে। সক্রেটিসকে এথেন্স থেকে সরিয়ে দিতে হবে।’

মেলিতাস বলল, ঠিক আছে, এই মামলা আমি করব। সে যুবকদের নষ্ট কবিরা করছে। যুবক ছেলেরা আমার কবিতা নিয়ে হাসাহাসি করে, এটি সত্য। সত্য জিনিস নিয়ে মামলা করতে পারে।

এনিতাস বলল, এই তো বুঝেছ। তবে আমরা আদালতে কবিদের ব্যাপার বলব না। আদালতের মানুষ কি কবিতা পড়ে? একজন কবিকে নিয়ে হাসাহাসি করলে মানুষের কী

আসে যায়? মানুষকে বলতে হবে, এথেন্সের সব যুবককে নষ্ট করছে সক্রেটিস। মানুষ যেন বোঝে সক্রেটিস এথেন্সে থাকলে তাদের নিজেদের ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাবে।

'ঠিক আছে, মামলা হবে, তুমি ব্যবস্থা করো, আমি সাথে আছি।'

এনিতাস বলল, আর একটু আছে। শুধু এই একটি অভিযোগে শাস্তি কী হবে? বড়জোর জরিমানা। আর এই অভিযোগের জোরালো প্রমাণ নেই। আমরা বলব যে সক্রেটিস ছেলেদের নষ্ট করছে; আর অনেক ছেলে আদালতে দাঁড়িয়ে বলবে যে সক্রেটিস তাদের ভালো করছে। এতে শাস্তি হবে না। শাস্তির জন্য অন্য রকম অভিযোগ দরকার। কঠিন অভিযোগ। সেটি হলো— 'সক্রেটিস দেবতা মানে না'। এটি প্রমাণ করা যাবে। আমি প্রমাণ করে দেব যে, ও যাদের সাথে মেশে, তারা দেবতা বিদ্বেষী মানুষ। এই অভিযোগে কাজ হবে। নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড।

'মৃত্যুদণ্ড?'

'হুঁম, এছাড়া আর কী?

'এটি বেশি হয়ে যায়। সত্তর বছরের বুড়ো মানুষ সক্রেটিস। তাকে একেবারে জানে মেরে ফেলার দরকার কী?'

'তোমাদের কবিদের নিয়ে এই এক বিপদ। তোমরা বড় নরম। এথেন্সকে বাঁচাতে নরম হলে হবে না। শক্ত হতে হবে। আর কথা নয়। চলো- লাইকনের কাছে যাই। তার বাড়ি অনেক দূরে। তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

'লাইকন মামলা করতে রাজি হবে?'

'অবশ্যই হবে। তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে একনায়কেরা। সে ছেলে হত্যার প্রতিশোধ চায়। কঠিন প্রতিশোধ।'

'কিন্তু প্রতিশোধ নেবে সক্রেটিসকে দিয়ে? সক্রেটিস তো একনায়ক ছিলেন না।'

'সে নিজে একনায়ক নয়। কিন্তু একনায়কদের গুরু। প্রধান স্বৈরাচার ক্রিটিয়াসের শিক্ষক ছিল সক্রেটিস। এখন ক্রিটিয়াসকে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে সক্রেটিসকে। ওকে দিয়েই প্রতিশোধ নেবে লাইকন। তোমার কী মনে হয়, লাইকন রাজি হবে না?'

মেলিতাস বলল, মনে হয় রাজি হবে। ছেলের মৃত্যু কেউ ভুলতে পারে না। সেটির কোনো রকম প্রতিশোধের কথা শুনলে, যে কেউ রাজি হবে। লাইকনও রাজি হবে।

এনিতাস বলল, লাইকনের ছেলে মারা গেছে। আর আমার ছেলে জীবিত থেকেও মৃত। সে এখন ঘোর মাতাল। মায়ের সাথে সারাদিন ঝগড়া করে। আজকে এরে মারে, কালকে ওরে ধরে। এই সবকিছুর জন্য দায়ী সক্রেটিস। ওকে আমি শাস্তি দেবই দেব। মামলা করবই।

'কোন আদালতে মামলা করব? ফৌজদারি আদালতে?'

'না, ধর্মীয় আদালতে। সরাসরি প্রতিশোধ নিতে সেটিই আসল জায়গা। পেরিক্লিসের বন্ধুদের সেখানেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সক্রেটিসকেও শাস্তি দেব।'

***

১২৯. সক্রেটিসের শিষ্য হতে না দেওয়ায় এনিতাসের ছেলে মাতাল হয়ে যায় এবং এনিতাস এজন্য সক্রেটিসকেই দায়ী করে, বিষয়টি Xenophon তার 'Apology of Socrates to the Jury' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৩০. নেমেসিস (Nemesis), গ্রিক মিথোলজির প্রতিশোধের দেবী, যিনি ধ্বংসের কারণ।

৫২

'মিথ্যা কোনোদিন সময়ের পরীক্ষায় জিততে পারে না।'
— সফোক্লিস।

সক্রেটিস ধীর পায়ে হাঁটছেন।

তিনি এখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আগের মতো এত জোরে হাঁটতে পারেন না। আকাশ মেঘমুক্ত, ঝকঝকে পরিষ্কার। তার মনও পরিষ্কার। আগোরার পথে অনেক মানুষ। সক্রেটিস মানুষ দেখছেন আর হাঁটছেন। মানুষ দেখতে তার ভালো লাগে। এই জীবনে তার মানুষ দেখা শেষ হবে না। তিনি জিমনেশিয়ামে গিয়েছিলেন নতুন একটি ছেলের কাছে। ছেলেটির নাম থিটিটাস। খুবই জ্ঞানী ছেলে। সক্রেটিস তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন — 'জ্ঞান কাকে বলে?' এই আলোচনার কিছু যুক্তি তার মাথায় ঘুরঘুর করছে, যুক্তিতে মগ্ন হয়ে তিনি আগোরার ভেতর দিয়ে হাঁটছেন।

হঠাৎ শুনলেন, কে যেন পেছন থেকে ডাকছে। ঘুরতেই দেখেন, কবি মেলিতাস। অনেক দূর থেকে তাকে ডাকছে। সক্রেটিস দাঁড়ালেন। সক্রেটিসের মনে পড়ল— তিনি এই কবিকে অনেক দিন আগে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। এই কবি নিজের কবিতা নিজেই বোঝে না। ঘটনা মনে পড়ে তার হাসি পেল।

মেলিটাস খুব জোরে হাঁটছে। মনে হয় খুব জরুরি কিছু করতে যাচ্ছে। উত্তেজনায় কাঁপছে। তার সাথে দুজন নগর পুলিশ। তাদের কোনো উত্তেজনা নেই। তারা হেলেদুলে হাঁটছে। মেলিতাস জোরে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে তার পাশে পুলিশ নেই। পুলিশ না দেখে তার ভয় লাগছে। সে পুলিশদের জন্য দাঁড়াচ্ছে। পুলিশ সামনে এলে আবার চলতে শুরু করছে। পুলিশ দুজন বেশ মজা পাচ্ছে। তারা ইচ্ছে করেই যেন আরও আস্তে আস্তে হাঁটছে।

সক্রেটিসের সামনে এসে মেলিতাস কিছু বলতে পারছে না। অনেকক্ষণ কেটে যাচ্ছে। মেলিতাস কাঁপছে।

সক্রেটিস হাসি দিয়ে বললেন, কালিসপেরা, শুভ সকাল।

মেলিতাস শুভ সকালও বলতে পারছে না। কে যেন তার গলা আটকে ধরেছে। বেচারা কবি মানুষ। এনিতাসের কথায় মামলা করতে এসেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, এটি তার কাজ নয়।

সক্রেটিস স্মিত মুখে তাকিয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন। একজন মানুষ কিছু বলবে সেজন্য অপেক্ষা। মানুষের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতেও তার ক্লান্তি নেই। তিনি ভালো করে মেলিতাসকে[১৩১] দেখছেন। লম্বা চুল। নাকটা অনেক চোখা। খোঁচা খোঁচা

ছাগল! দাঁড়ি। কবি কবি ভাব আছে চেহারায়। সক্রেটিস ভাবছেন মানুষের মুখের উপর তার অন্তরের ছায়া দেখার নিশ্চয়ই একটি উপায় আছে। সেই উপায় সক্রেটিস জানেন না। তবে এটুকু বুঝতে পারছেন মেলিতাস ভয়ে আছে। আর পুলিশ নিয়ে যখন এসেছে, তখন কিছু একটা ঝামেলা আছে। সক্রেটিস হাসিমুখে অপেক্ষা করছেন, কখন মেলিতাস কিছু বলবে। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন না।

বিরক্ত হলো পুলিশ দুজন। একজন পুলিশ মেলিতাসের হাত থেকে পেপিরাস কাগজটি নিয়ে বলল, জনাব সক্রেটিস, এই ভদ্রলোকের নাম মেলিতাস। উনি আপনার নামে মামলা করেছেন। এটি হলো আইনি নোটিশ। আপনি এটি রেখে আমাদের খাতায় স্বাক্ষর করে দিন।

সক্রেটিস পেপিরাসটি হাতে নিয়ে বললেন, মামলা? আমার নামে? কী নিয়ে মামলা?

পুলিশ বলল, সেটি বলা আমাদের কাজ নয়। অনুমতি নেই। নোটিশে লেখা আছে। আপনি যদি খাতায় সই করে দেন, আমরা বিদায় নিতে পারি।

সক্রেটিস সই করে দিলেন।

পুলিশ বলল, আজ থেকে চার দিনের মধ্যে আগোরায় প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট-এর অফিসে গিয়ে একবার হাজিরা দিয়ে আসতে হবে। তারপর চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে বিচার হবে। বিচারের তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পুলিশ চলে যেতেই সক্রেটিস মেলিতাসকে বললেন, তুমি কিছু বলবে? মেলিতাস মাথা নাড়ল। তার কিছুই বলার নেই।

সক্রেটিস বললেন, জিমনেশিয়াম থেকে এলাম। সেখানে থিটিটাস নামের একটি ছেলের সাথে আলোচনা হলো। আলোচনার বিষয় ছিল— জ্ঞান কী? চমৎকার আলোচনা।

স্মিতহাসি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন সক্রেটিস। তার হাতে মামলার নোটিস।

মেলিতাস ভেবেছিল সক্রেটিস তার ওপর ক্ষেপে যাবেন। মিথ্যা মামলা বলে তার সাথে মারামারিও শুরু করতে পারেন। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। নোটিশটি একবার পড়েও দেখলেন না। তিনি জানেনও না যে এটি তার মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা। কী বিপদ যে আসতে চলেছে, সেটি ভাবছেনই না সক্রেটিস। আজ তিনি নতুন এক ছেলেকে পরীক্ষা করেছেন, সেটি নিয়েই তিনি মগ্ন আছেন। মামলা তার কাছে কোনো বিষয়ই নয়।

মেলিতাস ভাবছে, এই লোক আইনি নোটিশটি না পড়েই ফেলে দিতে পারে। এনিতাসকে বলতে হবে, একটি নোটিশ যেন সক্রেটিসের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। না হলে, আবার নোটিস নিয়ে মেলিতাসকে আসতে হবে। সক্রেটিসের সামনে আর পড়তে চায় না মেলিতাস।

মামলার বিষয়টি নিয়ে সক্রেটিস যতই হেলাফেলা করুক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা এথেন্সের মানুষ জেনে গেল, সক্রেটিসের নামে মামলা হয়েছে। গণতন্ত্রের বীর পুরুষেরা মামলা করেছে। এবার সক্রেটিসের খবর আছে।

খবর শুনে জেনথিপি পাগলের মতো করছেন।

তিনি জানেন, তার স্বামীর মতো নিরীহ মানুষ এথেন্সে আর নেই। সক্রেটিস যদি কারও প্রতি কোনো অন্যায় করে থাকেন, সেটি একমাত্র জেনথিপির প্রতি। আর কাউকে তিনি কোনোদিন কষ্ট দেননি। আর তার নামে আদালতে নালিশ করেছে? মানুষের মতো নিষ্ঠুর আর অবিবেচক প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই

মায়ের বিলাপ শুনছে সক্রেটিসের তিন ছেলে। কী করবে তারা বুঝতে পারছে না।

জেনথিপি বলে যাচ্ছেন, তোর বাপের মতো এমন ত্যাড়া মানুষ সারা এথেন্সে আর একটিও নাই। আমি জানি, সে আদালতেও ত্যাড়া ত্যাড়া কথা বলবে। আমি সারাটা জীবন ওর ত্যাড়া কথা সহ্য করেছি। আমি শুনতে বাধ্য। কিন্তু আদালত বাধ্য নয়। আদালত সহ্য করবে না। তোর বাবার কপালে অনেক দুঃখ আসতেছে।

জেনথিপি উচ্চ স্বরে কান্না শুরু করলেন।

বড় ছেলে বলল, মা, আমি ক্রিতো চাচার কাছে যাই।

জেনথিপি দেখল, ছেলের বুদ্ধি হয়েছে। সে বলল, চল, আমিও যাব।

মাথায় একটি চাদর জড়িয়ে জেনথিপি ছেলের সাথে বেরিয়ে পড়ল।

ক্রিতো ভেবেছিলেন, তিনি নিজেই যাবেন জেনথিপির কাছে। তার আগেই ছেলেদের নিয়ে জেনথিপি চলে এসেছেন। ক্রিতো লজ্জিত হলেন। তাদের সমাদর করে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন।

ক্রিতো বললেন, ভাবী, কোনো চিন্তা করবেন না। আদালতের চলন-বলন সব আমার মুখস্থ। কয়েকটা মামলাবাজের খায়েস হয়েছে। মামলা করেছে। এখন সক্রেটিসকে অভিযোগের জবাব দিতে হবে। সেই জবাবকে বলে জবানবন্দি। সক্রেটিসের জন্য একটি জবানবন্দি লিখতে হবে। আদালতে সেটিই পড়বে সক্রেটিস। তাহলেই খালাস।

‘কে লিখবে সেই জবানবন্দি?’

ক্রিতো বললেন, লেখালিখির জন্য প্লেটোর চেয়ে ভালো আর কেউ নেই। সক্রেটিসকে সে অত্যধিক মান্য করে। সে লিখলেই আমরা নিশ্চিন্ত

‘প্লেটো তো বাচ্চা ছেলে।’

‘বাচ্চা হলেও, সে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। একেবারে ঝুনা নারকেল। আমি প্লেটোকে খবর দিয়েছি। ও এসে পড়বে।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। প্লেটো এসেছে।

প্লেটো বলল, আমি তো জবানবন্দি লিখতেই পারি। কিন্তু এ যে আদালতের বিষয়। এসব লেখার জন্য কায়দা-কানুন আছে। আমি কি পারব?

ক্রিতো বললেন, সক্রেটিসের কথা তোমার মতো করে আর কেউ লিখতে পারবে না। নিয়ম-কানুন আমি দেখে দেব।

'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে— আমার লেখার কারণে যদি সক্রেটিস মুক্ত না হয়, তাহলে আমি নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না। তার চেয়ে এথেন্সের সবচেয়ে ভালো উকিলের কাছে যাওয়াই ভালো।'

'কার কথা বলছ?'

'লিসিয়াস'।

ক্রিতো একটু চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ, এই মুহূর্তে লিসিয়াসই এথেন্সের সেরা উকিল। কোনো মামলার জবানবন্দি লিসিয়াস লিখেছেন, আর সেই মামলা হেরেছে, এমন কোনোদিন হয়নি। চলো, তার কাছেই যাই।

জেনথিপি বললেন, কিন্তু উনি তো মনে হয় অনেক টাকা নেবেন, এত টাকা আমরা কোথায় পাব?

প্লেটো বলল, লিসিয়াস কোনো টাকাই নেবেন না। তিনি সক্রেটিসের বিরাট ভক্ত।

ক্রিতো চাকরকে হাঁক দিলেন, ঘোড়ার গাড়ি বের করো।

প্লেটো চট করে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো লিখে নিল।

জেনথিপিও সাথে যাবেন। তিনি বললেন, ওনার জন্য জবানবন্দি লিখবে। আমার কাছে কিছু জানতে চাইতে পারে।

প্লেটো আর ক্রিতো চোখে চোখে তাকাল। এই মেয়েটি যে কত বড় মুখরা, সেটি তাদের চেয়ে কেউ বেশি জানে না। সক্রেটিসকে উঠতে বসতে শাপ-শাপান্ত করেন। আর সক্রেটিসের বিপদে সেই মুখরা মেয়েটিই সমস্ত বুক আগলে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সক্রেটিসের সংসার দেখে প্লেটো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে জীবনে বিয়ে করবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে জেনথিপির দিকে ভালো করে তাকিয়ে ভাবল, বউ জিনিসটা মনে হয় অত খারাপ কিছু নয়!

দুটি ঘোড়ার গাড়িতে করে যাচ্ছেন তারা। জেনথিপির কোলে একটি শিশু। শিশুটির বয়স মাত্র তিন বছর। জেনথিপি শুধু মামলার কথাই ভাবছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যারা মামলা করেছে, তারা কি লোক খুব খারাপ?

ক্রিতো বললেন, মামলা তো করেছে তিনজন। তাদের মধ্যে মেলিতাস হলো কবি, আর লাইকন হলো বক্তা। এরা তেমন খারাপ নয়। এরা মামলাবাজ নয়। মামলাবাজ হলো এনিতাস। সে ভয়ংকর লোক। সক্রেটিসকে আগেও হুমকি দিয়েছে। অনেক বছর আগে যখন হেরোডোটাস এথেন্সে এসে এথেন্সের কাহিনি বলল, তখন এথেন্স সরকার হেরোডোটাসকে দশ টেলেন্ট সোনা পুরস্কার দিয়েছিল। সেই পুরস্কারের প্রস্তাব করেছিল এই এনিতাস। তখন পেরিক্লিসের যুগ। এথেন্সে তখন ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধির ছড়াছড়ি।

যাই হোক এনিতাসের কথা বলছিলাম। তার একটি চামড়ার ট্যানারি আছে। সে যুদ্ধে ভালো। কয়েকটা যুদ্ধে এথেন্সের সেনাপতিও ছিল।

জেনথিপি বললেন, তাহলেও তো সে অনেক বড় নেতা। মানুষ তো তার কথাই শুনবে।

প্লেটো বলল, না না, অত বড় নেতা নয়। মোটামুটি নেতা। তবে লোক খারাপ। তার নামে দেশদ্রোহের মামলা হয়েছিল। সে তো মামলাবাজ। আদালত খুব ভালো বোঝে। ঘুষ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

একথা শুনে জেনথিপি কান্না শুরু করলেন। এই মানুষের থেকে সক্রেটিসের বেঁচে যাওয়া খুব কষ্টের হবে।

প্লেটো বলল, ওরা মিথ্যা মামলা দিয়েছে, মিথ্যা কোনোদিন জিততে পারবে না। ক্রিতো বললেন, হ্যাঁ, আমরা ভয় পাই না। প্রথমত, সক্রেটিস কোনো অন্যায় করেননি। দ্বিতীয়ত, আমরা এখন যাচ্ছি সবচেয়ে বড় উকিল লিসিয়াসের কাছে।

লিসিয়াস অত্যন্ত আনন্দের সাথে জবানবন্দি লিখেছে। কোনো টাকা নেয়নি। টাকা সাধলে সে বলেছে, সক্রেটিসের কাছে তার অনেক ঋণ। সে যে সক্রেটিসের জন্য কিছু লিখতে পারল, এটি তার পরম সৌভাগ্য। এজন্য টাকা সাধিয়া লজ্জা দিবেন না।

কিন্তু ঝামেলা হলো অন্যের লেখা জবানবন্দি সক্রেটিস পড়বেন না। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তাকে যেন কোনো অনুরোধ করা না হয়।

জেনথিপি সকাল থেকে কাঁদছেন। কত কষ্ট করে জবানবন্দি লিখিয়েছেন। আর সক্রেটিস সেটি পড়বেন না? সক্রেটিসের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই। জেনথিপি উচ্চ স্বরে কাঁদছেন।

প্লেটো জানে, সক্রেটিস যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তখন আর অনুরোধ করে লাভ নেই। সক্রেটিস নিজে থেকেই আদালতে বলবেন, অন্য কারও লেখা নেবেন না।

তবু ভয়ে ভয়ে প্লেটো বলল, এটি শুধু লিসিয়াস একা লিখেনি। আমি, ক্রিতো আর জেনথিপি বলেছি, লিসিয়াস সেগুলো গুছিয়ে লিখেছে। তাই আমি রেখে যাচ্ছি। সময় পেলে একটু দেখবেন।

ক্রিতোর মনে হচ্ছে সক্রেটিস কেমন যেন উদভ্রান্ত। মামলা নিয়ে কোনো হেল-দোল নেই। তিনি কি ইচ্ছা করে মরতে চাচ্ছেন?

সক্রেটিস ভাবছেন, তাকে অন্যের লেখা জবানবন্দি পড়তে হবে কেন? তার সমগ্র জীবনটাই তো আসলে একটি জবানবন্দি। তিনি জীবনে কোনোদিন চেনা পথে হাঁটেন নি, নতুন পথ খুঁজেছেন, পথ তৈরি করেছেন। সেজন্য সারাজীবনই তিনি তার কাজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কখনো মা-বাবার কাছে, কখনো বন্ধুদের কাছে, কখনো বউয়ের কাছে, আর সারাক্ষণ দিয়েছেন নিজের কাছে। সেজন্য তার জীবনই একটি জবানবন্দি। তিনি প্রতিদিন

জবানবন্দি দিয়েছেন। তো এই আদালতের জবানবন্দির জন্য তার আর নতুন কিছুর দরকার নেই। তিনি সারা জীবন যে জবানবন্দি দিয়েছেন, সেটিই দেবেন। তার জীবন বাইরের মানুষের কাছে যেরকম, আদালতেও সেই একই রকম। তার নতুন কোনো জবানবন্দির দরকার নেই।

***

১৩১. প্লেটোর Euthyphro এবং Theaetetus ডায়ালগে মেলিতাসের মামলার উল্লেখ করেছেন।

৫৩

‘পৃথিবীর যেকোনো নগরে কারও ভালো করার
চেয়ে খারাপ করা অনেক সহজ।’
—প্লেটো

এথেন্সের ধর্মীয় আদালত।

আজ খুব সকালেই এই আদালত প্রাঙ্গণ একেবারে লোকারণ্য। বিপুল উৎসাহে মানুষ আসছে। থিয়েটার দেখতে যেভাবে দলে দলে মানুষ আসে, সেভাবেই লাইন ধরে লোক আসছে। মানুষের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে তারা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে নাকি আদালতে বিচার দেখতে যাচ্ছে। এই আদালতের সাথে থিয়েটারের পার্থক্য হলো থিয়েটারের ট্র্যাজেডি শেষ হলে মৃত অভিনেতা মুখোশ খুলে হাসতে হাসতে বাড়ি যায়, আর এই আদালতের ট্র্যাজেডির হিরো কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুর দেশে যায়। দর্শকদের জন্য আদালতের ট্র্যাজেডি আরও বেশি উত্তেজনার, আরও বেশি থ্রিলিং। একজনের জীবন-মরণের থিয়েটার দেখতে আদালত এখন লোকারণ্য।

এই আদালতে আজ সক্রেটিসের বিচার হবে।

বিচারকের সংখ্যা পাঁচশত। এরা কেউ পেশাদার বিচারক নন। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ দার্শনিক, কেউ কবি, কেউ কামার, কুমার, মুচি বা অন্যকিছু। এখানে বিচারক বাছাই করা হয় লটারিতে। যার ভাগ্যে আছে, সেই বিচারক হবে। আইন জানুক আর না জানুক, কোনো সমস্যা নেই।

লটারি হলো। এথেন্সে দশটি গোত্র। প্রতি গোত্র আলাদা লটারিতে পাঁচজন করে পঞ্চাশ জন বিচারক বাছাই করা হলো। এরা সবাই এক দিনের বিচারক। পরদিন আবার নতুন লটারি হবে। নতুন লোক বিচারকগিরি করবে। একদিন বিচার করার জন্য প্রত্যেক বিচারক সম্মানী হিসেবে তিন ওবল করে অর্থ পাবেন। এই নিয়ম পেরিক্লিস করে গিয়েছিলেন যাতে সবাই আদালতে এসে বিচারে অংশ নেন।

আদালত ভবনটি খুবই সুন্দর। পেরিক্লিস যেসব সুন্দর সুন্দর ভবন বানিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে একটি এই আদালত ভবন। শ্বেত পাথরের ভবনটির নাম রাজ-ভবন বা রয়্যাল স্টোয়া। এখানে ধর্মীয় আদালত বসে। সক্রেটিসের মামলার সাথে দেবদেবীর ব্যাপার আছে। তাই তার বিচার হবে ধর্মীয় আদালতে। এটি আগোরার উত্তর-পূর্ব কোনায়। বিশাল ভবন। সামনে অনেক বড় বারান্দা।

ভবনটির সামনে অনেক উঁচু বেদির উপর বিচারের দেবী থেমিসের মূর্তি। বিচারের দেবীর চোখ বাঁধা। মানে বিচার অন্ধ ও নিরপেক্ষ। আদালতে ঢোকার দরজার সামনে

ঝকঝকে সাদা পাথরের উপর খোদাই করা সলোনের আইন। চমৎকার এই আদালত ভবনে এখন হাজার হাজার মানুষ। তিল ধারণের জায়গাও নেই। এক্ষুনি বিচার শুরু হবে।

বিচারকগণ যেখানে ইচ্ছা বসতে পারবে না। লটারিতে নাম উঠলে প্রত্যেক বিচারক একটি মাটির পাত্র হতে একটি পাথর নেবে। পাথরে একটি বর্ণ লেখা আছে— আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি। এগুলো আসন নম্বর। যার যার আসন নম্বরে বসতে হবে। যাতে নিজের পছন্দের লোকের পাশে বসে জোট বেঁধে পক্ষপাত করতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা।

লটারিতে বাছাই হওয়া বিচারকেরা সারি করে গ্যালারির মতো আসনে বসেছেন। এখন তারা মহাক্ষমতাবান। তাদের হাতে সক্রেটিসের জীবন।

মামলার বাদী তিনজন। তারা বাম দিকে বসেছেন।

একমাত্র আসামি সত্তর বছরের সক্রেটিস। তিনি ডান দিকে বসেছেন। তার মুখে হাসি। ঠিক হাসি নয়। কৌতুক বলা যায়। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন এটি আদালত নয়, মজার অনুষ্ঠান। তিনি এখানে মজা করে জ্ঞানের কথা বলতে পারবেন। তিনি দেরি না করে সকাল সকালই এসে পড়েছেন। তার পরনে চিরাচরিত পোশাক। খালি পা, শরীরের উপর থেকে ঝুলছে একটি উত্তরীয়। তিনি এর আগে কোনোদিন আদালতে আসেননি, তাই সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। তার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে। একটু পরেই ঝাঁপিয়ে অভিনয় করতে হবে। তিনি ভাবছেন এখানে ইউরিপিডিস থাকলে ভালো অভিনয় করতে পারতেন। ইউরিপিডিসের কথা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি মারা গেছেন সাত বছর হয়ে গেল। বেলা বয়ে যাচ্ছে। যাদের নিয়ে দিন কাটিয়েছেন, তাদের অনেকেই চলে গেছেন চিরতরে। চেরোফোন, সিমন, ইউরিপিডিস সবাই মারা গেছেন। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে শুধু ক্রিতো বেঁচে আছেন। এই শেষ বয়সে আদালতে এসে তিনি চোখ দুটো পিটপিট করে চারিদিকে দেখছেন। তার খুব বেশি টেনশান হচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে জেনথিপির কান্নাভেজা মুখটা মনে পড়ছে। সেই মুখ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তিনি জেনথিপিকে ভুলে থাকতে চাইছেন।

জেনথিপি আদালতে আসতে পারেননি। নারীদের জন্য আদালতে আসাও নিষেধ। দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে ঘরে বসে তিনি স্বামীর জন্য প্রার্থনা করছেন। কাল সারা রাতও প্রার্থনা করেছেন। এক ফোঁটাও ঘুম আসেনি। তার চোখের পাতা ফুলে গেছে। তিনি আজও সারাদিন দেবীকে ডাকবেন। আজ সকাল থেকে জেনথিপির ঘরের পেছনে দুটি পাখি ডাকছে। অন্য দিনও মনে হয় ডাকে, কিন্তু আজকের ডাকটা যেন অন্যরকম। যেন পাখিগুলো বুঝতে পেরেছে আজ কিছু হতে চলেছে। জেনথিপি পাখিগুলোর ডাক শুনছেন আর আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন, মাঝে মাঝেই কেমন একটি বোবা কান্না উথলে উথলে আসছে। আজ তিনি শব্দ করে কাঁদছেন না। তিনি ঘরে আছেন, কিন্তু তার মন রয়েছে আদালতে।

আদালতে এখন কয়েক হাজার দর্শক। তারা কেউ গ্যালারিতে, কেউ মেঝেতে, যে যেভাবে পারে বসে গেছে। অনেকেই ভেতরে জায়গা না পেয়ে বাইরে বিশাল বারান্দায় বসে গেছে। ক্রিতো, প্লেটো, ফিদো একসাথে বসেছে। তাদের সাথে আছে সক্রেটিসের বড় ছেলে লেমপ্রোক্লিস এবং ক্রিতোর ছেলে ক্রিতোবুলাস।

প্রধান বিচারক আসন গ্রহণ করলেন। বিচার একটি ধর্মীয় কাজ। এর গুরুত্ব অনেক। সেজন্য শপথ নিতে হবে। শপথ শুধু মুখে নিলে হবে না। বিচারের দেবী থেমিসের উদ্দেশ্যে একটি পশু বলি দেওয়া হলো। পশুর রক্ত একটি পাত্রে রাখা হলো। সেই রক্তে আঙুল ডুবালেন প্রধান বিচারক। এর মানে হলো— আমি দেবতার কাছে রক্তমাখা শপথ করছি— আমি নিরপেক্ষ বিচার করব। যদি অন্যায় করি আমার পরিবারের ওপর অভিশাপ নেমে আসবে।

প্রধান বিচারক রক্তমাখা দুহাত তুলে সকলকে দেখালেন। সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। সব ঠিক আছে। অন্য সব বিচারক মুখে শপথ নিল- 'গণতন্ত্রের জন্য আমরা একত্রে ন্যায় করব।' এখন বিচার শুরু করা যায়।

এটি এক বেলার আদালত। যা করার আজকে দিনের মধ্যেই করতে হবে। সময় কম। সেজন্য বাদী আর বিবাদী দুপক্ষের জন্যই সময় নির্ধারণ করা আছে। সময় মাপার জন্য আছে জলঘড়ি। একটি কলসি পানি দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া হয়। কলসিটির নিচে একটি ফুটো। ফুটো দিয়ে পানি পড়তে থাকে। যতক্ষণ পানি পড়বে, ততক্ষণই সময়। কলসি খালি হয়ে গেলে সময় শেষ। বাদী অল্প কথা বলবে। তার জন্য ছোট জলঘড়ি। আর আসামি বেশি কথা বলবে। তার জন্য বড় জলঘড়ি[১৩২]।

বিচারক অভিযোগ পড়ে শুনালেন। অভিযোগ তিনটি—

এক. সক্রেটিস এথেন্সের যুবকদের কুপথে নিয়ে যাচ্ছেন।

দুই. সক্রেটিস দেবতাদের মানেন না।

তিন. সক্রেটিস নতুন নতুন দেবতা সৃষ্টি করেন।

প্রস্তাবিত শাস্তি: মৃত্যুদণ্ড

প্রধান বিচারক বললেন, বাদীরা তাদের আর্জি জানাতে পারেন।

ছোট জলঘড়ি চালু হলো। বাদীদের পক্ষে সামনে এলো এনিতাস। তার কণ্ঠ ভালো। জোর আছে। সে সংসদে বক্তৃতা করে। সংসদের ঢঙেই শুরু করল:

মাননীয় আদালত, ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ। নাম সক্রেটিস। বুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু নষ্টামি কমেনি। তিনি এথেন্সের জন্য এক দুষ্ট ফোঁড়া। ভয়াবহ ফোঁড়া। এই ফোঁড়া কেটে দূর করতে হবে। ইনি থাকলে আজ আমার ছেলে খারাপ হয়েছে, কাল আপনার ছেলে খারাপ হবে, পরশু সবার ছেলে খারাপ হবে। আপনারা এথেন্সকে বাঁচাতে চান? এই দুষ্ট ফোঁড়া দূর করেন। তার জন্য একটিই উপায়— মৃত্যুদণ্ড।

এনিতাস অনেক লোক নিয়ে এসেছে। তার পক্ষের লোকেরা হইচই করছে। তারা হৈ হৈ করে উঠল, মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড।

সক্রেটিসের ঠোঁটে তার চিরকালের ট্রেডমার্ক হাসিটুকু লেগে আছে। এনিতাসের ভয়ংকর মিথ্যায়ও সেই হাসি নিভেনি।

এনিতাস বলছে:

সক্রেটিস মানুষকে কুশিক্ষা দেয়। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে। সে ভালো ছেলেদের নষ্ট করে। এলসিবিয়াডিসের কথা মনে আছে? ক্রিটিয়াসের কথা মনে আছে? তারা এথেন্সকে ধ্বংস করেছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। তারা আসলে কে? তারা ছিল সক্রেটিসের ছাত্র। সক্রেটিসই তাদের দুষ্ট বুদ্ধি দিয়েছে, তাদের নষ্ট করেছে। তাই সে ছেলেদের জন্য ক্ষতিকর। সেদিন এক কবি বলছিল, 'আমাকে একজন সক্রেটিস দাও— আমি এথেন্সের ঘরে ঘরে দুষ্ট এলসিবিয়াডিস এনে দেব।' সক্রেটিস খারাপের চেয়ে খারাপ, মহাখারাপ, সে খারাপ বানানোর কারখানা। সে সব সময় যুবকদের কুশিক্ষা দেয়। গোপনে গোপনে খারাপ মন্ত্রণা দেয়। তার সাথে কিছুদিন মিশলেই ছেলেরা আর বাবা-মাকে মানে না, মুরুব্বিদের মানে না, কাউকে মানে না। তার কাছে প্রতিদিন আমাদের সোনার ছেলেরা নষ্ট হচ্ছে। এথেন্সে যুবক কমে গেছে। যুদ্ধে, প্লেগে আমাদের ছেলেরা মরে গেছে। আমরা মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য ছেলে পাচ্ছি না। সেজন্য একটি যুবককে নষ্ট করা মানে, এথেন্সের এক টুকরা কলিজা কেটে ফেলা। আমরা চাই এথেন্সে যেন এমন কেউ না থাকে, যে আমাদের সোনার ছেলেদের নষ্ট করতে পারে। সে এথেন্সের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, সে দেশদ্রোহী। তাকে সরিয়ে দিন। এক্ষুনি এথেন্স থেকে সরিয়ে দিন।

দর্শকরা চিৎকার করে উঠল, সরিয়ে দিন। সরিয়ে দিন।

প্লেটো চিৎকার করে উঠল, মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। ফিদো কান্না শুরু করে দিয়েছে। সে চোখ মুছতে মুছতে বলছে— মিথ্যা, মিথ্যা। তাকে কাঁদতে দেখে সক্রেটিসের ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল। সক্রেটিস দাঁড়িয়ে দেখলেন, তার ছেলে কাঁদছে। বাবার অপমানে কাঁদছে। ঘর ভর্তি লোকের সামনে বাবাকে এভাবে অপমান করছে, ছেলেটি সইতে পারছে না। ছেলের কান্নায় তিনি নরম হয়ে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে তার চোখেও পানি চলে আসবে। তিনি মনে করলেন হোমারের সেই লাইনগুলো। ঘোর বিপদে অডিসিয়াস বলেছিল— 'হৃদয় আমার, ধৈর্য ধরো, তুমি অতীতে এর চেয়ে অনেক কঠিন সময় পার হয়ে এসেছো।'

এনিতাস আবার বলছে—

মাননীয় আদালত, এবার সক্রেটিসের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের কথা বলছি। সে ধর্ম মানে না। সে আসলে একটি শয়তান। আমাদের দেবতা মানে না। দেবতাদের নিয়ে উল্টা-পাল্টা কথা বলে। আমাদের এখানে অনেক মানুষ আছে, যাদের সামনে সে পবিত্র ধর্ম

নিয়ে মশকরা করেছে। দেবতাদের নিয়ে যা না, তা বলেছে। সে আমাদের দেবতা মানে না। নতুন দেবতা আমদানি করতে চায়। কত বড় আস্পর্ধা— ধর্মের নামে খারাপ কথা বলে?

মাননীয় আদালত, এথেন্সের আইনে এটি অন্যায়। মহাঅন্যায়। ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে শাস্তি পেতে হয়। ভয়াবহ শাস্তি। একে এমন শাস্তি দিন, যাতে আর কেউ ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করতে সাহস না পায়। দেবতাদের অপমান করতে না পারে। এমন শাস্তি চাই যেন সে আর কোনোদিন আমাদের সন্তানদের কুপথে নিতে না পারে। যে মুখ দিয়ে সে দেবতাদের অপমান করে, যে মুখে আমাদের সন্তানদের খারাপ বুদ্ধি দেয়, সেই মুখে কুলুপ দিতে হবে। চিরকালের মতো কুলুপ। আর তার জন্য একটিই উপায়। সেটি হলো— মৃত্যুদণ্ড।

দর্শকরা হৈ হৈ করে উঠল, মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড।

এনিতাস জলঘড়ির দিকে তাকাল। সময় প্রায় শেষ। কথা শেষ করতে হবে। তার গলায় যতটুকু আবেগ আছে, সবটুকু ঢেলে দিল। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলল—

বিজ্ঞ বিচারকগণ, আপনারা আমাদের রক্ষাকারী। আপনারা এমন ব্যবস্থা করবেন যেন এথেন্সে ধর্মবিরোধী কেউ না থাকে, আমাদের শিশুদের জন্য ক্ষতিকর কেউ না থাকে। আজ আপনারা চাইলে আমাদের যুবককে বাঁচাতে পারেন, না চাইলে এই দুষ্ট সক্রেটিসকে বাঁচাতে পারেন। আজ আপনাদের হাতেই এথেন্সের ভবিষ্যৎ। এথেন্সকে বাঁচাতে চাইলে একে মৃত্যুদণ্ড দিন। আপনারা আমাদের মাতৃভূমিকে বাঁচান, আমাদের প্রিয় এথেন্সকে বাঁচান।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কথা শেষ করল এনিতাস। খুব বেদনার পরিবেশ। সবাই ভাবছে, এথেন্স তো একেবারে শেষ হয়ে গেছে। সক্রেটিস বিদায় হলেই এথেন্স বাঁচবে।

এনিতাস জোরে জোরে কাঁদছে। তার সাথে কাঁদছে অনেক মানুষ। সবাই একসাথে বলছে, 'এথেন্সকে বাঁচান। সক্রেটিসের হাত থেকে আমাদের সন্তানদের এথেন্সকে বাঁচান।' একটু পরেই কান্না থেমে গেল। সারা ঘরে শুরু হলো চিৎকার, 'মৃত্যুদণ্ড দিন, মৃত্যুদণ্ড।'

ক্রিতো বুঝতে পারছেন, ঘটনা খারাপ। এনিতাসের অভিনয় মানুষকে ছুঁয়ে গেছে। আদালতের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে আর ন্যায়বিচার নয়, অভিনয়ের জয় হবে।

ক্রিতোর ভীষণ হতাশ লাগছে। প্লেটো ভাবছে, সক্রেটিস কী করবেন? তিনি কি এই পরিবেশ ঘোরাতে পারবেন? সক্রেটিস কোনোদিন আবেগ মিশিয়ে কথা বলেন না। তিনি যুক্তির কথা বলেন। এই ঘরে যা হচ্ছে, যুক্তি দিয়ে সেটি মোকাবিলা সম্ভব নয়। সক্রেটিস কথা বলেন ছোট ছোট খোঁচা দিয়ে। এখানে সেই খোঁচা খাটবে না। প্লেটো ভয় পাচ্ছে। মানুষ এমন করে মিথ্যা বলতে পারে? একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে হত্যা করতে এরা এমন মিথ্যা গল্প ফেঁদেছে! এমন কেঁদে কেটে অভিনয় করছে! প্লেটো কাঁদছে। ক্রিতোও নিঃশব্দে কাঁদছেন। ফিদো কাঁদছে চিৎকার করে।

হাসছেন শুধু সক্রেটিস। যেন তিনি জানতেন, এমন করেই বলা হবে তার নামে। বিচারক ঘোষণা করলেন, আসামি সক্রেটিস, আপনি আপনার জবানবন্দি দিতে পারেন।

সক্রেটিস ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিচারকদের দিকে তাকালেন। দর্শকদের দিকে তাকালেন। তার মনে হচ্ছে অনেক দিন আগে 'মেঘ' নাটকের থিয়েটারে মানুষ যেমন চিৎকার করছিল, আজ আদালতে সেই একইভাবে চিৎকার করছে। এটি আদালত নয়। এটি থিয়েটার। এখানেও নাটক হচ্ছে। সেদিন থিয়েটারে নাটক করছিল এরিস্টোফানিস। আজ নাটক করছে এনিতাস। তার মনে পড়ল— সেদিন থিয়েটারে যারা 'মেঘ' নাটকের দর্শক ছিল, আজ তারাই বিচারক। এই বিচারকদের সবাই সেই নাটক দেখেছে। এই মুহূর্তে সবার মাথায় সেই নাটকে দেখানো সক্রেটিস চলে এসেছে।

আসামির জলঘড়ি চালু হলো। সক্রেটিস জলঘড়ির দিকে তাকালেন। পানির ফোঁটা পড়ছে টিপ টিপ করে। এই ফোঁটা শেষ হওয়ার আগেই এমন কিছু বলতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে, সক্রেটিস ধর্ম-বিদ্বেষী নন।

সক্রেটিস শুরু করলেন তার জবানবন্দি[১৩৩]:

প্রিয় এথেন্সের ভাইয়েরা, এতক্ষণ যা শুনলাম, তাতে আমি যে কে, সেটিই ভুলে গেছি। আমি যে এত কিছু করতে পারি, সেটি এখানে না এলে আমি জানতামই না।

আমার নামে তিনটি অভিযোগ। আসলে এগুলো কোনো অভিযোগ না। আসল অভিযোগ অনেক দিনের। এখানে তিনজন মামলা করেছে। আসলে তিনজন নয়, আমার নামে মনে মনে মামলা করে এমন মানুষ অনেক। তারা কীভাবে আমার কথা জেনেছে? তারা একটি নাটক দেখেছে। হাসির নাটক। আমার বয়োকনিষ্ঠ বন্ধু এরিস্টোফানিস লিখেছিল সেই নাটক। নাটকের নাম 'ক্লাউডস' বা মেঘ। সেই নাটকের প্রধান চরিত্রের নাম সক্রেটিস। সেই সক্রেটিস মেঘের উপর ঘুরে বেড়ায়, তার একটি চিন্তার দোকান আছে। সে চিন্তা করে দুষ্ট বুদ্ধি বানায়, আর যুবক ছেলেরা তার কাছে এলে সে তাদের কুবুদ্ধি দেয়। সে ছেলেদেরকে বাবা-মায়ের অবাধ্য বানায়। সে সত্যকে মিথ্যা করে, আর মিথ্যাকে সত্য।

সেই নাটক দেখে এরা সক্রেটিসকে জেনেছে। আসল সক্রেটিসকে তারা কোনোদিন দেখেনি। তারা ঐ নাটকের সক্রেটিসকেই সত্যিকার সক্রেটিস বলে জানে। আমাকে তারা চেনে না। তারাই আমার নামে মামলা করেছে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, ঐ নাটক লেখার সময় এরিস্টোফানিস আমাকে চিনতই না। না জেনে অন্যের মুখে শুনে ভুল লিখেছে, মানুষ তাই বিশ্বাস করেছে।

এই পর্যন্ত সক্রেটিস যা বলেছেন, তাতে প্লেটো খুশি। তিনি ঠিক পথেই আগাচ্ছেন। শুধু বলার ভঙ্গিটা ঠিক হচ্ছে না। সক্রেটিস একটি শব্দও আসামির মতো করে বলছেন

না। তিনি বলছেন শিক্ষকের মতো করে। যেন একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ শিক্ষক উপদেশ দিচ্ছেন একদল ছাত্রকে।

প্লেটো বারবার বিচারকদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বিচারকদের মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না। প্লেটো পেপিরাসে নোট নিচ্ছে। সক্রেটিস যা বলছেন— প্লেটো লিখে রাখছে।

সক্রেটিস বলছেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ— আমি বাচ্চাদের ক্ষতি করি। তো এনিতাস, তুমি তো ভালো জানো। তুমি বলো, বাচ্চাদের উপকার করে কারা?

এনিতাস একটু ভ্যাবাচেকা খেলেও সামলে নিয়ে বলল, আইন।

'আইন তো একটি ধারণা। মানুষের কথা বলো। বলো কোন কোন মানুষ এথেন্সের বাচ্চাদের উপকার করে।'

'এই বিচারকগণ।'

'একজন বিচারক, নাকি সব বিচারক?'

'সব বিচারক।'

'শুধু বিচারকগণ, নাকি অন্যরাও উপকারী?'

'সব সংসদ সদস্য, সব সরকারি লোক, সব ধর্মীয় নেতা, সব পুরোহিত- এরা সবাই বাচ্চাদের জন্য উপকারী।'

'তাহলে এথেন্সের সবাই বাচ্চাদের জন্য উপকারী, শুধু আমিই ক্ষতিকর।'

'হ্যাঁ, শুধু আপনিই ক্ষতিকর। আর সবাই উপকারী।'

'তাহলে তো এথেন্সের বাচ্চারা খুব ভাগ্যবান। তাদের লক্ষ লক্ষ উপকারী মানুষ আছে, ক্ষতিকর লোক শুধু একজন। বিচারক বন্ধুরা, আপনাদের বাচ্চাদের কপাল খুবই ভালো।'

আদালতের সবাই হেসে উঠল।

এনিতাস বলল, এতে কিন্তু প্রমাণিত হয়নি যে সক্রেটিস বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর নন। তিনি অবশ্যই ক্ষতিকর। আর সেই ক্ষতিকর সক্রেটিসকে অবশ্যই দূর করতে হবে। বিদায় করতে হবে চিরতরে।

সক্রেটিস বললেন, উনি বললেন, আমি বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু সত্য হচ্ছে আমি বাচ্চাদের জন্য উপকারী। আমি তাদের প্রশ্ন করতে শিখাই। আমি তাদের জাগিয়ে রাখি। আপনারা সবাই এক রকম পোকা দেখেছেন, যে পোকা[১৩৪] ঘোড়াকে জাগিয়ে রাখে। ঘুমাতে দেয় না। আমিও ওরকম একটি পোকা, যে এথেন্সকে জাগিয়ে রাখে। আমি প্রশ্ন করি। আমি তরুণদের প্রশ্ন করতে শিখাই। এই প্রশ্নই এথেন্সকে ঠিক পথে রেখেছে।

এনিতাসের লোকেরা চিৎকার করছে, ভুয়া, চুপ করো, চুপ করো। তারা সক্রেটিসকে বলতে দিতে চাচ্ছে না। জলঘড়ির সময় শেষ হলেই রায়। তাই সময় নষ্ট করতে পারলেই লাভ। চিৎকার চেঁচামেচির পর পরিবেশ একটু শান্ত হলে সক্রেটিস আবার বলতে শুরু করলেন—

‘আমি মানুষকে বলি, প্রশ্ন কর। তোমরা সবাই প্রশ্ন কর। পরীক্ষা কর। জীবনকে পরীক্ষা কর। বিনা প্রশ্নে কিচ্ছু মেনে নিও না। যে জীবন পরীক্ষিত, শুধু সে জীবনই বেঁচে থাকার উপযুক্ত। অপরীক্ষিত জীবন বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়। আমি মানুষের উপকার করছি। এথেন্সের উপকার করছি। সেজন্য আমার পুরস্কার পাওয়া উচিত। কোনো শাস্তি নয়।’

এবার প্লেটো অবাক। সক্রেটিস হঠাৎ এমনভাবে কথা বলছেন যেন এটি আদালত নয়। এটি সিমনের দোকান। এটি একটি দর্শনের ক্লাস। আর সক্রেটিস একগাদা ছাত্রের সামনে জ্ঞানমাখা কথা বলছেন।

ক্রিতো প্লেটোকে বললেন, সক্রেটিস কী করছে? ইচ্ছা করেই মৃত্যু বেছে নিচ্ছে? ও কি জ্ঞানের জন্য শহিদ হতে চাচ্ছে?

প্লেটো হতবাক। কিছু বলতে পারছে না।

সক্রেটিস বলছেন, ‘বিচারক বন্ধুরা, আমার নামে আরেকটি অভিযোগ, আমি নাকি ধর্ম মানি না। আমি নাকি নতুন দেবতা আমদানি করি। এটিও মিথ্যা, আমি আসলে ধর্মের জন্যই মানুষকে প্রশ্ন করি। আমার বন্ধু চেরোফোনকে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সে দুবছর আগে মারা গেছে। তার ভাই আজ এই আদালতে উপস্থিত আছেন। সেই চেরোফোন একবার একটি কাণ্ড করেছিল। সে ডেলফিতে গিয়ে ওরাকলকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী কেউ আছে কিনা।’ ওরাকল উত্তর দিয়েছিল, ‘না, সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী কেউ নেই।’ আমি কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কারণ আমি জানি যে, আমি তেমন কিছুই জানি না। আমি সবচেয়ে জ্ঞানী কী করে হবো?

তখন ভাবলাম, দেবতারা তো মিথ্যা বলেন না। নিশ্চয়ই কিছু ভুল হচ্ছে। আমি সবচেয়ে জ্ঞানী নয়। আমি পরীক্ষা করতে নামলাম। দেবতার কথা আমাকে পরখ করে দেখতে হবে। প্রথমে গেলাম দার্শনিকদের কাছে। তাদের সাথে কথা বলে আমি অবাক হলাম। তারা নিজেদের বিরাট জ্ঞানী দাবি করে, পর্বতের মতো বড় বড় কথা বলে, কিন্তু তারা তেমন কিছুই জানে না। এরপর গেলাম কবিদের কাছে। কবিরা তাদের নিজের কবিতা নিজেরাই সবচেয়ে কম বোঝে। তারপর গেলাম রাজনীতিকদের কাছে। তারা তো আরেক কাঠি সরেস। তারা সাধারণ মানুষদের চেয়েও রাজনীতি কম জানে। আমি বুঝলাম, আমি জ্ঞানী, কারণ আমি জানি যে আমি আসলে কিছুই জানি না। অন্যরা অজ্ঞান, কারণ তারা যে কিছুই জানে না— সেটিও তারা জানে না। তাই আমি তাদের চেয়ে জ্ঞানী।

বিচারকেরা অবাক। এই বুড়ো কী করছেন। এটি আদালত। তিনি একজন আসামি। আদালতে আসামীরা কাকুতি-মিনতি করে যুক্তি দেয়। মাফ চায়। প্রাণ ভিক্ষা চায়। বলে যে, ‘আমি এথেন্সের জন্য এত এত ভালো কাজ করেছি, এখন মাফ করে দাও। আর হবে না। ভুল করলে না বুঝে করেছি।’ আর বুড়ো সক্রেটিস সেসব কিছুই করছেন না, উল্টা

আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। ইনি তো আসলেই বেকুব। ইনি কি জানেন না যে, তার জীবন আমাদের উপর নির্ভর করছে?

আরেক দল বিচারক ভাবছেন, বুড়োটা আসলে অত খারাপ নয়। তিনি ঠিকই বলছেন। এনাকে শুধু শুধু হেনস্থা করা হচ্ছে।

জবানবন্দি শেষ। এখন ভোট দিচ্ছেন বিচারকরা। দুই রকম পাথর দিয়ে ভোট। এক রকম পাথরে ছিদ্র আছে, আরেক রকমে ছিদ্র নেই। ছিদ্রওয়ালা পাথর হলো হ্যাঁ ভোট, মানে মৃত্যুদণ্ড। আর ছিদ্রহীন পাথর হলো না ভোট, মানে নির্দোষ।

বিচারকরা আনন্দের সাথে ভোট দিচ্ছে। যেন এক উৎসব। ভোট উৎসব শেষের দিকে। ভোট গণনায় বেশি সময় লাগল না। মোট পাঁচশত ভোট। ফলাফল—

মৃত্যুদণ্ড-২৮০ ভোট
খালাস-২২০ ভোট

ষাট ভোটের ব্যবধানে সক্রেটিসের জন্য রায় হলো— মৃত্যুদণ্ড।

এনিতাস হই হই করে উঠল। তারা খেলায় জিতেছে। প্লেটো কাঁদছে, ফিদো হাউমাউ করছে, ক্রিতো বাকরুদ্ধ।

এটিই চূড়ান্ত রায় নয়। আর একটি চান্স আছে। এখন আসামিকে সুযোগ দেওয়া হবে। মৃত্যুদণ্ড না নিয়ে তিনি অন্য একটি বিকল্প শাস্তি চাইতে পারেন।

সক্রেটিস আবার উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারকগণ ভাবছেন, এবার সক্রেটিস নরম হবেন, এবার মরণের ভয় একেবারে সামনে এসে গেছে, এবার তিনি ক্ষমা চাইবেন। প্রাণভিক্ষার আবেদন করবেন।

কিন্তু না, সক্রেটিস ধীরে ধীরে বললেন, আপনারা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এখন এর বদলে অন্য কিছু চাইতে হবে। বিকল্প কী চাইব? আমি আবারও বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি। আমি এথেন্সের জন্য যা করেছি, তার জন্য শাস্তি নয়, আমার পুরস্কার পাওয়া উচিত। তাই বিকল্প শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নয়, আমাকে অলিম্পিকের বীরদের মতো প্রিটারিয়ামে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

সারা ঘরের মানুষ বলে উঠল, কত বড় আস্পর্ধা! প্রিটারিয়ামে থাকতে চায়!

প্রিটারিয়াম হলো এথেন্সের বীরদের থাকার জায়গা। যারা অলিম্পিকে জয়ী হয়, তাদের সারা জীবনের দায়িত্ব সরকার নেয়। তারা প্রিটারিয়ামে থাকে। খুবই সম্মানের জায়গা।

বিচারকরা এবার চরম বিরক্ত। এত বড় আস্পর্ধা। বিচার নিয়ে ফাজলামি? একজন দাগি আসামি যার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়ে গেছে, সে কিনা বলছে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাখা হোক। বীরের মতো প্রিটারিয়ামে জায়গা দেওয়া হোক। এত বড় সাহস! সক্রেটিস

এথেন্সের সম্মান নিয়ে মশকরা করছেন। আর কোনো কথা শোনা হবে না। অনেক হয়েছে। এবার দ্বিতীয় ভোট

দ্বিতীয় ভোটের ফলাফল:

মৃত্যুদণ্ড-৩৪০ ভোট
খালাস-১৬০ ভোট

সক্রেটিসের বিকল্প শাস্তির প্রস্তাব শুনে আরও ৬০ জন বিচারক মন বদলে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

দর্শক সারি থেকে ক্রিতো বললেন, এই শাস্তির বদলে অর্থদণ্ড করা হোক। আইনে আছে, জরিমানা দিয়ে শাস্তি মওকুফ করা যায়।

বিচারক সক্রেটিসকে বললেন, ঠিক আছে, জরিমানা কত দিবেন?

সক্রেটিস বললেন, আমার তো টাকা-পয়সা নেই। জরিমানা কোত্থেকে দেব?

বিচারক বললেন, সময় নষ্ট না করে জরিমানার অংক বলুন।

সক্রেটিস বললেন, এক মিনা।

এক মিনা খুবই সামান্য পরিমাণ অর্থ। বিচারকগণ হতভম্ব। এই লোক আবার তাদের অপমান করছেন। বিচার নিয়ে মশকরা করছেন। এক মিনা কোনো জরিমানা হয় না। ক্রিতো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সক্রেটিস সব মাটি করে দিলেন। তাকে বাঁচানোর আর কোনো আশা নেই।

প্লেটো শেষ চেষ্টা করতে চায়। সে চিৎকার করে বলল, জরিমানা ত্রিশ মিনা দেওয়া হবে। আমরা দেব।

প্লেটোর দিকে তাকিয়ে সক্রেটিস বললেন, ঠিক আছে, ত্রিশ মিনা। বিচারকরা সেই কথা আমলেই নিল না। বিচার শেষ।

প্রধান বিচারক চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করলেন, সক্রেটিসের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

সক্রেটিস স্মিত হাসি দিয়ে শান্ত মুখে বললেন, আমি যাচ্ছি মরণের দিকে, তোমরা যাচ্ছ জীবনের দিকে; কোনটি ভালো, সেটি শুধু ঈশ্বর জানেন।

এনিতাস চিৎকার করছে। সে জিতে গেছে। সক্রেটিসের লোকেরা সব কাঁদছে। সক্রেটিসের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল। মাকে খবর দিতে হবে।

আদালত থেকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হবে সক্রেটিসকে। পায়ে শিকল পরানো হলো। তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। জেলখানা বেশি দূরে নয়। আগোরার ভেতরেই। দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। পাঁচ-ছয় মিনিটের হাঁটাপথ। সবাই মিলে হইহই করতে করতে সক্রেটিসকে নিয়ে যাচ্ছে জেলখানায়। চুপচাপ হাসিমুখে জেলের দিকে হাঁটছেন সক্রেটিস। পথেই দেখা গেল, জেনথিপি দৌড়ে আসছেন। ক্রিতো তার ছেলে ক্রিতোবুলাসকে

পাঠালেন, জেনথিপি যেন এখানে না আসেন। তুমি তাকে নিয়ে সরাসরি জেলখানার গেইটে চলে যাও। সেখানে দেখা করার ব্যবস্থা হবে।

কীভাবে সক্রেটিসের মৃত্যু হবে, সেটি ঠিক হবে জেলখানায়।

***

১৩২. জলঘড়ি (Water Clock): সেই সময় গ্রিসে সময় মাপা হতো জলঘড়ি দিয়ে, গ্রিক ভাষায় এর নাম Klepsydra.

১৩৩. প্লেটো তার 'এপোলজি' (Apology) গ্রন্থে আদালতে সক্রেটিসের জবানবন্দি বিস্তারিত লিখেছেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী, প্লেটো নিজে সেদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রেটিসের কথার নোট নিয়েছেন। সক্রেটিসের আরেকটি জবানবন্দি লিখেছেন তার আরেক শিষ্য জেনোফোন। কিন্তু তিনি নিজে আদালতে ছিলেন না, তিনি তখন এথেন্স থেকে নির্বাসিত, স্পার্টায় ছিলেন। জেনোফোন জবানবন্দি লিখেছেন প্লেটো ও অন্যদের থেকে শুনে। আমি এই জবানবন্দির মূল উৎস হিসেবে প্লেটোর 'এপোলজি'কেই নিয়েছি।

১৩৪. প্লেটোর 'এপোলজি (Apology) গ্রন্থে সক্রেটিস যে পোকাটির কথা বলেছেন, ইংরেজিতে সেটিকে বলে Gadfly, গ্রিক ভাষায় নাম Myops (মিওপস)। এই পোকাটি ঘোড়া, গরু এসব প্রাণীদের ক্রমাগত হুল ফুটায়, বিরক্ত করে, ঘুমাতে দেয় না। সক্রেটিসও এই পোকার মতো এথেন্সের মানুষদের হুল ফুটিয়েছেন, যাতে তারা সত্য পথে থাকে, ঘুমিয়ে না পড়ে।

৫৪

‘পাতালে প্রেতাত্মাদের রাজা হওয়ার চেয়ে,
পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র মানুষটির দাস হয়ে হলেও
আমি পৃথিবীতেই থাকতে চাই।’
অডিসিয়াসের উদ্দেশ্যে একিলিস // হোমার

সক্রেটিস জেলে বন্দি।

তার হাতে পায়ে শিকল দেওয়া হয়েছে। একটি বেঞ্চের উপর বসে আছেন তিনি। সারা দিনের বিচারের পর ভীষণ ক্লান্ত। ভীষণ ক্ষুধার্ত। ক্ষুধা খুব জঘন্য জিনিস। মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও দূরে যায় না। তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখনও ঝামেলা শেষ হয়নি। এখন ঝামেলা হলো, সক্রেটিসকেই ঠিক করতে হবে তিনি কীভাবে পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান।

জেলার সাহেব বললেন, সক্রেটিস, মৃত্যুর উপায় ঠিক করার অধিকার শুধুই আপনার। আপনিই বলুন কীভাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে চান?

সক্রেটিস ভাবছেন তার কীভাবে মারা যাওয়া উচিত। বেশি ভাবতে ইচ্ছা করছে না। তিনি বললেন, আপনাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই হোক।

জেলার বললেন, আদালতে বিচারকদের ইচ্ছায় সবকিছু হয়। এটি আদালত নয়, জেলখানা। এখানে আমরা আসামির ইচ্ছাকে মূল্য দিই। আপনি বলুন কীভাবে মৃত্যুবরণ করলে আপনি খুশি হবেন?

এবার সক্রেটিসের হাসি পেল। জেলার আসামির ইচ্ছাকে মূল্য দিচ্ছেন। তিনি বললেন, আমার কী কী উপায়ে মৃত্যুর সুযোগ আছে?

জেলার সাহেব বললেন, শিরশ্ছেদ আছে, ফাঁস দেওয়া আছে, মাথার পেছন থেকে আঘাত করে ...

তাকে ধমক দিয়ে ক্রিতো বললেন, আর বলতে হবে না। উনি হেমলক পান করবেন।

হাসি দিলেন জেলার সাহেব। বললেন, আপনি তো অনেক কিছু জানেন। রক্তহীন, অল্প ব্যথার মৃত্যুর জন্য হেমলকের চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না। আগে আসামিদের ভীষণ বীভৎসভাবে মারা হতো। কিন্তু এখন আমরা অনেক সভ্য। রক্তপাতহীনভাবে মরার অধিকারও আছে। তবে হেমলক কিন্তু বেশ দামি বিষ। দামটা কিন্তু সক্রেটিসকেই দিতে হবে।

সক্রেটিস হেমলকের দাম জিজ্ঞেস করার আগেই ক্রিতো জেলারকে বললেন, ঠিক আছে, সক্রেটিসই দাম দেবেন।

জেলার বললেন, বেশ, সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাটভাবে হেমলক পানের উত্তম ব্যবস্থা আমি করব। আমিও চাই আপনি ব্যথামুক্তভাবেই মৃত্যুবরণ করুন। আমি মৃত্যুবরণ বলছি। আমি বিশ্বাস করি আপনি মৃত্যুকে বরণ করেই নিচ্ছেন।

লোকটির কথায় সক্রেটিস অবাক হচ্ছেন। জেলখানার প্রধান তাকে সম্মান করছেন। জেলার আবার বললেন, আমি ত্রিশ বছর ধরে এথেন্সের জেলার। মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার পরে আসামিদের প্রথম যে কান্না, সেটি আমি খুব ভালো জানি। এই প্রথম কাউকে দেখলাম, যার চোখে আসলেই মৃত্যুভয় নেই। আপনি সত্যিই অন্যরকম। জেলখানায় দাগি আসামিরা আসে। সেই জেলখানায় আপনি এসেছেন। আমার মনে হচ্ছে, আপনার ছোঁয়ায় এথেন্সের জেলখানাটা পবিত্র হলো। এখানে যাতে আপনি ভালো থাকতে পারেন, আমি সেই ব্যবস্থা করব।

সক্রেটিস বললেন, আমাকে কি এখানে অনেকদিন থাকতে হবে?

'কিছুদিন তো হবেই। তবে ঠিক কত দিন আপনি জেলে থাকবেন, সেটি জানেন শুধু দেবতা এপোলো। এথেন্সের জাহাজ এপোলোর মন্দিরে গিয়ে আটকা পড়েছে। সেই জাহাজ ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে কারও মৃত্যুদণ্ড হয় না।'

জেলার বিদায় নিলেন।

সক্রেটিস হাসতে হাসতে বললেন, ক্রিতো, জীবনে কয়েক দিন বোনাস সময় পেলাম। খুবই মজা! আমি বাঁচতে চাইলাম; ওরা বলল, বাঁচা যাবে না। এখন মরতে চাচ্ছি; ওরা বলছে, মরা যাবে না।

ক্রিতোর বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে। তিনি বললেন, জেনথিপি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তাকে নিয়ে আসি।

জেনথিপি এসেই কান্না শুরু করলেন। তার দিকে একবার তাকিয়েই সক্রেটিসের বুক ফেটে যাচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললেন। কিছুতেই স্ত্রীর দিকে তাকানো যাবে না। তাকালেই তিনিও কেঁদে ফেলবেন। স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে হবে। বকা দিয়ে হলেও পাঠিয়ে দিতে হবে। আদালতের কক্ষ থেকেই তার জন্য মানুষ কাঁদছে। বন্ধুরা কাঁদছে, শিষ্যরা কাঁদছে। কিন্তু সেই কান্নায় সক্রেটিস ভেঙে পড়েননি। তাহলে জেনথিপির কান্না সইতে পারছেন না কেন? যে মেয়েটিকে সারা জীবনে এক মুহূর্তও সুখ দিলেন না, সেই মেয়েটির চোখের পানিতে এত দুঃখ থাকতে পারে, তিনি ভাবতেই পারেননি। সক্রেটিস মুখ শক্ত করে আছেন, কিন্তু বড় বড় নিশ্বাস লুকাতে পারছেন না। যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হবে চোখের জলের।

তিনি ক্রিতোকে বারবার ইশারা করছেন, জেনথিপিকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু ক্রিতো চুপ করে আছেন। নির্দোষ স্বামীর মৃত্যুদণ্ডে বুক ভাসিয়ে কাঁদছেন এক স্ত্রী, তাকে সরিয়ে নিতে যে শক্তি লাগে, সেটি ক্রিতোর নেই। ক্রিতোও কাঁদছেন।

কান্নার বেশি সময় পেলেন না তারা। সব ব্যবস্থা করতে রাত হয়ে গেছে। সক্রেটিসকে একা কারাগারে রেখে সবাইকেই চলে যেতে হবে।

সক্রেটিস কিছুদিন সময় পেলেন। সাধারণত রায় দেওয়ার পরের দিন মৃত্যু ঘটানো হয়। কিন্তু এথেন্সে এখন 'পবিত্র সময়' চলছে। এই পবিত্র সময়ে কোনো অপবিত্র কাজ করার নিয়ম নেই। এই সময় যুদ্ধ করা যায় না। কাউকে হত্যা করাও হয় না। কোনো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় না। পবিত্র সময় শেষ হলেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। এই কদিন তিনি জেলখানায় থাকবেন।

এই পবিত্র সময়ের কাহিনি খুবই পুরনো আর প্যাচের। এর সাথে গ্রিক মিথোলজির বিখ্যাত গোলকধাঁধা বা ল্যাবিরিন্থ এর গল্প জড়িত। লম্বা সেই কাহিনিটি[১৩৫] মোটামুটি এরকম:

কয়েকশ বছর আগে গ্রিসের ক্রীত দ্বীপে একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। সেখানের রাজা মিনোসের সুন্দরী রানি একটি আরও সুন্দর ষাঁড়কে ভালোবেসে ফেলে। এই অদ্ভুত ভালোবাসার সন্তানও হয় এক অদ্ভুত জীব। আধা-মানুষ, আধা-ষাঁড়। শরীরের নিচের দিক মানুষের আর উপরের দিক ষাঁড়। রাজা মিনোসের বংশের এই উদ্ভট প্রাণীর নাম দেওয়া হয় মিনোটর। এই মিনোটর দুটি কাজ খুব ভালো পারে। সে ধরে ধরে মানুষ খেত, আর ভয়াবহ যুদ্ধ করত। কেউ তাকে হারাতে পারত না। তাকে নিয়ে যুদ্ধে বের হলো ক্রীত দ্বীপের রাজা। একের পর এক নগরকে হারিয়ে দিল। এক সময় এথেন্সকেও জয় করল। তখন ঠিক হয়, তারা এথেন্সকে ধ্বংস করবে না, কিন্তু প্রতি বছর এথেন্স থেকে সাতজন তরুণ, সাতজন তরুণী মিনোটরের খাদ্য হিসেবে পাঠাতে হবে। এই শর্ত অনেক বছর মেনে চলছিল এথেন্স। প্রতি বছর মিনোটরের খাদ্য পাঠাত তারা। অবশেষে এথেন্সের রাজা জনাব এজিয়ানের ছেলে থিসিয়াস ঠিক করে যে, এভাবে মরার জন্য আর মানুষ পাঠাবে না এথেন্স। সে নিজে যাবে মিনোটরের সাথে যুদ্ধ করতে। থিসিয়াস যাওয়ার আগে দেবতার কাছে মানত করল, যদি জিততে পারে, তাহলে প্রতি বছর এথেন্স থেকে ডিলোস দ্বীপে দেবতা এপোলোর কাছে এক জাহাজ উপহার পাঠাবে। থিসিয়াস যাওয়ার সময় বাবাকে বলে গেল, এখন জাহাজে কালো পতাকা উড়ালাম, যদি জিততে পারি, তাহলে ফেরার সময় সাদা পতাকা উড়াব। তুমি দূর থেকে পতাকা দেখেই বুঝতে পারবে, আমি বেঁচে আছি, নাকি মরে গেছি।

মিনোটর থাকত একটি গোলকধাঁধার ভেতর যেটির নাম ল্যাবিরিন্থ। এই ল্যাবিরিন্থ এমন প্যাঁচানো যে, কেউ একবার ঢুকলে আর এর থেকে বের হওয়ার রাস্তা পেত না। আর সেই সুযোগে মিনোটর তাকে মেরে ফেলত। থিসিয়াস গেল সেই ল্যাবিরিন্থে। গিয়েই বুঝল, ঘটনা খারাপ। কারও সাহায্য ছাড়া এই ল্যাবিরিন্থ রহস্য সমাধান অসম্ভব। সে বুদ্ধি করে প্রেমের ফাঁদে জড়াল ক্রীত দ্বীপের রাজকন্যাকে। রাজকন্যার বুদ্ধিতে থিসিয়াস একটি

সুতা নিয়ে একপ্রান্ত বাঁধল নিজের শরীরের সাথে, আরেক প্রান্ত বাঁধল গোলকধাঁধার দরজায়। এতে গোলকধাঁধার যেখানেই যাক, সে সুতা ধরে দরজায় ফিরে আসতে পারল। পথ হারাল না। এক সময় সুযোগ মতো মিনোটরকে মেরে ফেলল। দৈত্যের হাত থেকে এথেন্স মুক্ত হলো। ফিরে আসার সময় থিসিয়াস বেশি আনন্দে জাহাজের কালো পতাকা নামাতে ভুলে গেল। তার বাবা রাজা এজিয়ান দূর থেকে জাহাজে কালো পতাকা দেখে ভাবলেন, ছেলে মারা গেছে। রাজা সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেলেন। সেই থেকে রাজা এজিয়ানের নামে সেই সাগরের নাম রাখা হলো এজিয়ান সাগর। তো থিসিয়াস ফিরে এসে এথেন্সের রাজা হলো।

তার প্রতিজ্ঞা মতো এক জাহাজ উপহার প্রতি বছর এথেন্সে থেকে ডিলোস দ্বীপে যায় দেবতা এপোলোর জন্য। প্রতি বছর গ্রীষ্মের সময় এক জাহাজ উপহার পাঠায়। জাহাজ ছাড়ার দিন থেকে এথেন্সে ফিরে আসা পর্যন্ত এথেন্সে 'পবিত্র সময়'। এই সময় এথেন্স যুদ্ধ করে না। কাউকে হত্যা করে না। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয় না।

এই বছর সেই জাহাজ মাত্র গতকাল এথেন্স থেকে ছেড়েছে। যেকোনো দিন ফিরে আসতে পারে। যেদিন ফিরবে, তার পরদিনই সক্রেটিসকে হেমলক পান করতে হবে। সেজন্য এই মুহূর্তে কেউ জানে না ঠিক কোন্ দিন সক্রেটিসের মৃত্যু হবে।

এই কয়দিন সক্রেটিস কারাগারে থাকবেন। তার পায়ে শিকল পরানো হয়েছে।

***

সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডের খবর শুনে তরুণরা দলে দলে আসছে। এথেন্স থেকে, এথেন্সের বাইরের নানান নগর থেকে প্রতিদিন লোক আসছে। সক্রেটিসের শিয়রে মৃত্যু বসে আছে। কয়দিনের মধ্যেই জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। নিভে যাওয়ার আগে সমস্ত শক্তি দিয়ে জ্বলে উঠেছে সেই প্রদীপ। হ্যাঁ, সক্রেটিস জ্বলছেন। তার আত্মা টগবগ করে ফুটছে। তিনি সারাদিন কথা বলছেন।

জেলখানার নিচু গদিটার মাঝখানে জুবুথুবু হয়ে বসেছেন বৃদ্ধ সক্রেটিস। হাসিমুখে কথা বলছেন। তাকে ঘিরে অনেকগুলো তরুণ। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ হাঁটুগেড়ে একমনে কথা শুনছে। এই তরুণরা এসেছে গ্রিসের দূর দূর প্রান্ত থেকে। এদের কেউ কেউ সারাদিন এখানে বসে থাকে। একদল যায়, একদল আসে।

সারাদিনই সক্রেটিস তাদের সাথে আলাপ করছেন। রাজনীতি, বিজ্ঞান, জীবন, প্রেম কিচ্ছু বাকি নেই— সবকিছু নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন সক্রেটিস। আর তরুণরা গোগ্রাসে গিলছে।

মৃত্যুর পূর্বে মানুষ যা বলে, তা গভীর বিশ্বাস থেকেই বলে। তাতে ভড়ং থাকে না। তাই এই মুহূর্তে সক্রেটিস যা বলছেন, তা একেবারে জীবন্ত বাণী I প্রতিটি কথা যেন

লাফাচ্ছে। লাফানো কথাগুলো কার আগে কে ধরবে, তা নিয়ে তরুণরা ব্যস্ত।

সক্রেটিসের বিচার সবচেয়ে আঘাত করেছে প্লেটোকে। সে বাড়িঘর এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিদিন এখানে আসে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কারাগারেই থাকে। এখন কারাগারই প্লেটোর ঘর। প্লেটো বেশি কথা বলে না। সে সবাইকে দেখে।

প্লেটো ভাবে, এটি কি জেলখানা? ডাক দাও এথেন্সের গুণী-মানী লোকদের। কেউ বলবে না এটি জেলখানা। এই মুহূর্তে এটি একটি স্কুল। দর্শনের স্কুল, জ্ঞানের স্কুল। এমনই একটি স্কুলের স্বপ্ন প্লেটো দেখতেন, যেখানে সক্রেটিস তাদেরকে শেখাবেন। কিন্তু সক্রেটিস জীবনে কোনোদিন কোনো পেশাদারী কাজ করেননি। তিনি কোনো স্কুল বানাননি। কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যুর আগে তার জেলখানাটাই হয়ে গেছে এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল।

এই স্কুলের বিশেষত্ব হলো শিক্ষককে কোনো পয়সা দিতে হয় না। পয়সা দিতে হয় দারোয়ানকে। ঘুষ না পেলে দারোয়ান কাউকে ঢুকতে দেয় না। ক্রিতো ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সব ক'জন দারোয়ানকে ঠিক করে রেখেছেন, কেউ সক্রেটিসের সাথে দেখা করতে এলে, যেন দেখা করতে দেওয়া হয়। খরচ সব ক্রিতোর।

জেলে বসে সক্রেটিস তরুণদের সাথে মজা করছেন। তিনি বললেন, ওরা আমাকে শাস্তি দিল। হেমলক খেয়ে মরতে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আনো তোমার হেমলক। এক টানে খেয়ে ফেলি। কাহিনি খতম। তখন বলল, না না, এখনও কাহিনি খতম নয়। আপনি কিছু বাড়তি সময় পেয়েছেন। জাহাজ ডিলোস দ্বীপ থেকে না ফেরা পর্যন্ত আপনার সময় আছে। আমি ভাবলাম, এ আরেক সমস্যা! এখন এই বাড়তি সময় নিয়ে আমি কী করব? জেলে বসে একলা একলা ঘাস চিবাবো? কিন্তু ঘটনা দেখো— তোমরা আমাকে এমন করে ঘিরে ধরেছ, বাড়তি সময় তো দূরের কথা, নাওয়া-খাওয়ার সময়ই নাই

প্লেটো বলল, আমাদের সৌভাগ্য, আমরা আপনাকে কদিন পাচ্ছি। সেই কদিনে নানান নগর থেকে ছেলেরা আসছে। তারা সব দার্শনিক। আপনার কথা সারা পৃথিবীতে নিয়ে যাবে। মৌমাছির মতো আসছে। আপনার মুখের মধু চায়।

ক্রিতো বললেন, হ্যাঁ, মধু। আমরা জীবনভর সক্রেটিসের কাছ থেকে মধু নিলাম। আর বিনিময়ে তাকে দিলাম হেমলক বিষ।

সকল তরুণ আহা করে উঠল। পরিবেশ আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

সক্রেটিস বললেন, ক্রিতো, তুমি কিন্তু ভীষণ ঝামেলাবাজ। ছেলেপেলেগুলোকে নিয়ে মজা করছি, আর তুমি সুযোগ পেলেই দুঃখের প্যাঁচালি শুরু করো। তুমি একটি দুঃখজীবী প্রাণী ।

ক্রিতো বললেন, হ্যাঁ, বুড়ো হলে সবাই দুঃখজীবী হয়ে যায়। সবাই তো সক্রেটিস না। সক্রেটিস হলো চিরতরুণ। সে দুঃখজীবী না, সে চিরকাল সুখজীবী। শোন সুখজীবী, আমি

যাচ্ছি, বিকেলে আসব। আমার ছেলে ক্রিতোবুলাস এখানে রইল। কিছু লাগলে ওকে বললেই হবে।

সক্রেটিস বললেন, সেটিই ভালো। তুমি বাড়ি গিয়ে দুঃখ-দুঃখ মুখে একটি গোসল দাও। ক্রিতোবুলাস থাকুক। সে তরুণ, সে এখনও সুখজীবী। তার মুখে তাকালে আমি সেই তরুণ ক্রিতোকে দেখতে পাই।

ক্রিতোবুলাস মুচকি করে একটু হাসলেন।

সক্রেটিস বললেন, ক্রিতোবুলাস, নতুন কোনো খবর আছে?

ক্রিতোবুলাস বলল, জেনোফোন নামের এক লোকের খবর আছে। তিনি বাবার কাছে আপনার কথা জানতে লোক পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি প্লেটোর বন্ধু। প্লেটোর কাছেও তার লোক গেছে।

প্লেটো বলল, জেনোফোন বই লিখবে। সক্রেটিসকে নিয়ে বই।

সক্রেটিস বললেন, তাই নাকি! এই জেনোফোন ছেলেটা বড় অদ্ভুত। সে আমার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরত। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করত না। কোনো কথা বলত না। তার হাতে সব সময় থাকত লম্বা একটি পেপিরাস টুকরা। ঝোলার মধ্যে দোয়াত। আমি যার সাথে যা বলতাম, সে খসখস করে লিখে ফেলত। আমি বলতাম, 'জেনোফোন, এই যে লিখছো, এগুলো দিয়ে কি হবে?' জেনোফোন উত্তর করত, 'আমার স্মৃতিশক্তি কিঞ্চিত দুর্বল। তাই আমি লিখে রাখি। পরে মনে করে দেখি, সক্রেটিস আসলে কী বলেছিলেন। এগুলো আমাকে পথ দেখায়। এগুলো আমার কাজে লাগে।'

প্লেটো বলল, কাজে লাগছে। জেনোফোন বই লিখতে শুরু করেছে। সক্রেটিসের বিচারের বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমার কাছে লোক পাঠিয়েছে। সে ডায়লগ লিখবে।

সক্রেটিস বললেন, কিন্তু সে এখন কোথায়?

ক্রিতোবুলাস বলল, তিনি এখন স্পার্টায় থাকেন।

প্লেটো বলল, সে স্পার্টার রাজার উপদেষ্টা। এথেন্সে যতদিন গণতন্ত্র আছে, ততদিন সে ফিরতে পারবে না। ফিরলে জীবন যাবে। তাই সে স্পার্টাতেই বসতি নিয়েছে।

সক্রেটিস বললেন, জেনোফোন যে লেখালেখি করে জানতাম না তো।

প্লেটো বলল, তার লেখার হাত খুবই ভালো। স্পার্টায় গিয়ে লেখা শুরু করেছে। ঘোড়া পালনের ওপর চমৎকার একটি বই লিখেছে।

সক্রেটিস বললেন, বাহ, তার উন্নতি দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। ক্রিতোবুলাস বলল, জেনোফোন নাকি একটি অদ্ভুত বই লিখবেন। এমন বই আগে কেউ লিখেননি

'কী বই?'

'ঘর-গৃহস্থালী, ধন-সম্পদ, কৃষি নিয়ে। বইয়ের নাম দিয়েছে ঐকোনোমিকাস (Oeconomicus)[১৩৬]। ঐকো (Oeco) মানে ঘর-গৃহস্থালি, আর নোমো (nomo) মানে

ব্যবস্থাপনা বা নিয়মকানুন। গৃহস্থালি ঠিক ভাবে চালানো নিয়ে জেনোফোন এই বই লিখছে। মজার কথা কথা হলো, এই বই নাকি শুরু হবে এভাবে:

'আপনি আর আমি দুজন কথা বলছি।'
'মানে কী? তুমি আর আমি কথা বলছি?'

প্লেটো বলল, মানে হলো, জেনোফোনের ঐকোনোমিকাস বইয়ে দুটি চরিত্র হলো সক্রেটিস আর ক্রিতোবুলাস। বইয়ের শুরুতে সক্রেটিসকে ক্রিতোবুলাস জিজ্ঞেস করে, কীভাবে গৃহস্থালি চালাতে হয়? তার উত্তরে সক্রেটিস তাকে বোঝাচ্ছেন— সম্পদ কী জিনিস, সম্পদ সংসারের জন্য কত দরকারি, কীভাবে সংসার চালানো উচিত এসব।

সক্রেটিস বললেন, তাই নাকি? আমরা গ্রিকরা তো সম্পদ, গৃহস্থালি এসব নিয়ে লিখি না। আমরা শুধু জ্ঞান খুঁজি। এটি একটি নতুন কাজ। এই বইয়ের মাধ্যমে শুধু সক্রেটিসই না, আমাদের ক্রিতোবুলাসও অমর হয়ে গেল।

ক্রিতোবুলাস লজ্জামাখা হাসি দিল।

প্লেটো বলল, জেনোফোন 'সক্রেটিসের স্মৃতিকথা' লিখবে। আপনার বিচারের সময় সে এথেন্সে ছিল না। আমাদের কাছে লোক পাঠিয়েছে। বিচারের বিস্তারিত জানার জন্য।

সক্রেটিস বললেন, জেনোফোন ভালো লিখবে। কিন্তু তুমি লিখলে, আরও ভালো হবে। সারা পৃথিবীতে তোমার মতো লেখার হাত আর কারও নেই। তুমি লেখালেখি ছেড়ে দিও না।

প্লেটো গম্ভীর। কিছু বলছে না।

ক্রিতোবুলাস বলল, সক্রেটিসকে নিয়ে সবাই বই লিখতে শুরু করেছে। জেনোফোন লিখছে, ফিদো লিখছে। আমার বাবা ক্রিতো, এন্টিস্থিনিস, ইউক্লিড আরও অনেকে। যে সক্রেটিসকে দেখেছে, সেই নাকি বই লিখবে।

সক্রেটিস বললেন, এরা সবাই আমার অন্তরের প্রিয় মানুষ। আমি খুব খুশি। এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তবে আমি বলব, প্লেটোর মতো আমায় কেউ বোঝেনি। যদি প্লেটো লিখে সেটিই পূর্ণাঙ্গ হবে।

প্লেটো জানে, সক্রেটিসকে যদি কেউ বুঝে থাকে, সেটি প্লেটো। সে কলম হাতে নিলেই লেখা আসে। ঝরঝর বৃষ্টির মতো লেখা। কিন্তু অনেকদিন থেকে সে কিছুই লিখছে না। যেদিন সে তার সব কবিতা, নাটক পুড়িয়ে দিয়েছে, তার পর থেকে আর কিছুই লেখেনি। তবে অনেক নোট নিয়েছে। সক্রেটিসের অনেক কিছু খসড়া লিখে রেখেছে। এখনও লিখছে।

লোকে যতটুকু লিখে বই বের করে, প্লেটোর খসড়াই তার থেকে বড়। যে কাজে প্লেটো হাত দেয়, সে কাজ অন্য কেউ করলে লাভ হবে না। যদি প্লেটো সত্যি সক্রেটিসকে

নিয়ে লিখতে শুরু করে, তাহলে আর কেউ দর্শনশাস্ত্রে পাত্তাই পাবে না। প্লেটো অমিত প্রতিভাধর কবি। তার লেখা মানুষ পড়তে বাধ্য হয়। এত মিষ্টি হাত সবার হয় না।

তবে সমস্যা হলো, এই মুহূর্তে তার মন খুবই বিক্ষিপ্ত। সক্রেটিসের প্রতি অবিচার তার সবকিছু থামিয়ে দিয়েছে। তার মনে হয়— কার জন্য লিখব? যে এথেন্সের মানুষ সক্রেটিসের মতো মানুষকে খুন করছে, তাদের জন্য লিখে কী হবে! তবু চোখ বুজলেই প্লেটোর মনে নানান ভাবনা আসে। কল্পনায় সুন্দর সুন্দর সংলাপ আসে।

প্লেটো সক্রেটিসের দিকে তাকাল। একটু আগে সক্রেটিস কি তাকে লেখার আদেশ দিলেন? সক্রেটিসকে নিয়ে লেখা শুরু করা উচিত?

***

১৩৫. ক্রিত দ্বীপের রাজা মিনোস আর মিনোটরের কাহিনি যে সময়ের, সেই সময়েই এই দ্বীপে শুরু হয় ইউরোপের সর্বপ্রথম সভ্যতা। রাজা মিনোসের নাম থেকে সভ্যতাটির নাম মিনোয়ান সভ্যতা (Minoan civilization)। সময় খ্রি. পূ. ৩০০০ থেকে ১৪৫০ অব্দ, ব্রোঞ্জ যুগ। এই সভ্যতা মিশর থেকে ক্রিত দ্বীপে, সেখান থেকে গ্রিসের মূল ভূ-খণ্ড হয়ে ইউরোপে যায়। গ্রিক মিথোলজির বিখ্যাত গোলকধাঁধা বা Labyrinth এই সভ্যতার সময়ের। ক্রীত দ্বীপে মাটি খুঁড়ে নসোস (Knossos Palace) রাজপ্রাসাদে সেই ল্যাবিরিন্থটি পাওয়া গেছে। এথেন্সের হিরো থিসিয়াস ল্যাবিরিন্থের রহস্য ভেঙে মিনোটরকে হত্যা করে। তাই এটি ক্রিত দ্বীপের উন্নত সভ্যতাকে হারিয়ে এথেন্সের উত্থানের গল্প। এথেন্সবাসী এই গল্প নিয়ে গর্ব করত এবেং গল্প অনুযায়ী 'পবিত্র সময়' মেনে চলত। এই সময় রক্তপাত হতো না। সক্রেটিসের বিচার এই সময়ে হওয়ায় তিনি জেলখানায় বেঁচে ছিলেন আরও ২৯ দিন। এই ২৯ দিনেই সক্রেটিস তার দর্শনের একটি বড় অংশ প্লেটো ও অন্য শিষ্যদের কাছে বলেন। প্লেটোর রচনার সবচেয়ে বিখ্যাত অংশের পটভূমি এই ২৯ দিন।

১৩৬. জেনোফোনের (Xenophon) এর ঘর-গৃহস্থালি বিষয়ক গ্রিক বইয়ের নাম Oeconomicus, এই ঐকোনোমিকাস শব্দটি থেকেই ইকনোমিকস বা অর্থনীতি শব্দটি এসেছে।

৫৫

‘মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত, কাউকে সুখী বলা যায় না,
ততদিন শুধু সৌভাগ্যবান বলা যায়।’
—সলোন

লেখালেখি সক্রেটিসের বড়ই অপছন্দ।

তিনি সারা জীবনে কিছুই লিখেননি। কবিদের তিনি ভীষণ অপছন্দ করেন। কবিরা সব মিথ্যার রাজা। তারা অকারণে মিথ্যা বলে। মজার মজার মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এরিস্টোফানিসের মতো প্রতিভাবান ছেলে না জেনেই সক্রেটিসের নামে ভুলভাল নাটক লিখে তার জীবনে ভয়াবহ বিপদ নিয়ে এসেছে। মানুষ ওই নাটকের সক্রেটিসকেই মনে রেখেছে। কবিদের মজা মাখানো মিথ্যা কথাই মানুষ বিশ্বাস করে। গুজব সৃষ্টিতে কবিরা ওস্তাদ।

সক্রেটিস সত্যের পূজারি। মিথ্যা তার সহ্য হয় না। সেজন্য সক্রেটিস কবিদের দু’চক্ষে দেখতে পারেন না।

কিন্তু জীবনের একেবারে শেষ সময়ে সক্রেটিসের নিজেরই কবিতা লিখতে ইচ্ছা করছে। অদ্ভুত রকমের ইচ্ছা। তার মাথায় কবিতা ঘুরছে। তিনি ভাবছেন, এ তো মহা ঝামেলা হলো। সবাই জানে আমি কবিতা বিদ্বেষী মানুষ। সেই আমি কিনা কবিতা লিখব।

কারাগারে সারাদিন তার সামনে লোক থাকে। জ্ঞানের আলাপে অন্য চিন্তা মাথায় আসতে পারে না। কিন্তু সন্ধ্যার পরে আর কাউকে কারাগারে থাকতে দেয় না। সন্ধ্যাটা একাই কাটে সক্রেটিসের। তখন তার মাথায় কবিতা আসে। শব্দগুলো পোকার মতো গুনগুন করে। কথাগুলো সব ইসপের গল্পের মতো।

ইসপ[১৩৭] খুব সুন্দর সুন্দর গল্প লিখেছেন। তার গল্প বাচ্চাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। শুধু বাচ্চা নয়, চাইলে বাচ্চার বাবা-মায়েরাও শিখতে পারে। পশুপাখি নিয়ে কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প লিখেছে ইসপ। বড় ভালো লাগে। ইসপ এথেন্সের লোক না। কিন্তু গ্রিক। তার গল্প সারা গ্রিসের মানুষই জানে।

ইসপের গল্পগুলো ছন্দে ছন্দে সক্রেটিসের মাথায় পোকার মতো ঘুরছে। লিখতে না পারলে এই পোকা যাবে না। লিখতে পেপিরাস দরকার। জেলের দারোয়ান কি পেপিরাস দিবে? সক্রেটিস একটি সুযোগ নিলেন।

দারোয়ান তাকে পছন্দ করে। একবার বলতেই কাজ হলো। হাসিমুখে পেপিরাস আর কলম এনে দিল।

সক্রেটিস শুরু করলেন। ইসপের গল্পকে ছন্দে বসিয়ে লিখবেন কবিতা। সক্রেটিসের নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি কবিতা লিখছেন। ছোটবেলায় সক্রেটিস মাঝে মাঝেই কেমন যেন একটি শব্দ শুনতেন। কে যেন তাকে ডেকে একটি নাকি সুরে কী যেন বলতেন। বলতেন, তুই সংগীত কর, কবিতা লিখ, কাব্য কর। এই জীবনে সংগীত, কবিতা কোনোটাই সক্রেটিস করেননি। এখন এই শেষ সময়ে সত্যিই কবিতা লিখলেন। তিনি কবিতার দিকে তাকালেন। ইসপের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প— খরগোশ আর কচ্ছপের দৌড় নিয়ে লিখেছেন—

আলস্য দোষে খরগোশ দিবা নিদ্রা দেয়
সেই ফাঁকে কচ্ছপ দেখ দৌড় জিতে নেয়
সময় থাকতে হও সাবধান, না হইলে শেষে
খরগোশ হয়েও হারতে হবে কচ্ছপের কাছে।

সক্রেটিস ভাবছেন— এই কবিতা নিয়ে কী করা যায়! প্লেটোকে দেখানো যায়। লেখালেখির জন্য সবচেয়ে বড় বিচারক হলেন প্লেটো। তার মতো মেধা পৃথিবীতে বিরল। তাকে দেখালে সে যুতসই একখান মন্তব্য দেবে। এক-আধটু ঠিক-ঠাকও করে দিতে পারবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্লেটো এখন কবিদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সে মনে করে সক্রেটিসের বিপদের দায় পুরাটাই এরিস্টোফানিসের। সে ঐ নাটকটা না লিখলে মানুষ সক্রেটিসকে এতটা ভুল বুঝত না। বিনাদোষে সক্রেটিসের মৃত্যুও হতো না। কবিদের প্রতি এখন প্লেটোর রাগ এমন পর্যায়ে গেছে যে, সে উঠতে বসতে বলে, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি সব কবিকে নির্বাসন দিতাম। একটি আদর্শ রাষ্ট্রে কবিদের কোনো দরকার নেই।

এই অবস্থায় প্লেটোকে কবিতা দেখানো যাবে না। সক্রেটিস ভাবছেন, আমি কবিতা লিখেছি শুনলেই ছেলেটা দুঃখ পাবে। ওকে দুঃখ দেওয়া ঠিক হবে না। প্লেটোর মতো এমন শিষ্য আমার আছে ভাবলেই আনন্দ হয়।

তাহলে কাকে শুনানো যায়? জেনথিপি? পৃথিবীর সব কবির কবিতার প্রথম পাঠক অবশ্যই তাদের বউ অথবা প্রেমিকা।

পরদিন দুপুরে জেনথিপি এলেন খাবার নিয়ে। দুপুরের খাবারটা তিনি স্বামীকে নিজ হাত খাওয়ান। সক্রেটিসের জেলখানায় সারাদিন মানুষ আর মানুষ। বেচারি জেনথিপি দুদণ্ড স্বামীকে একলা পান না। তাই ক্রিতো ঠিক করে দিয়েছেন— ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সক্রেটিসের জ্ঞানের ক্লাস এক ঘণ্টা বিরতি। সেই সময়টা শুধু জেনথিপি আর সক্রেটিসের। তাদের সন্তানেরা থাকতে পারে। অন্য কেউ থাকতে পারবে না।

জেনথিপিকে কবিতা শুনালেন সক্রেটিস। বললেন, এই জিনিস আর কেউ জানে না। শুধু তুমিই জানো যে আমি কবিতা লিখি।

জেনথিপি হো হো করে হাসছেন।

সক্রেটিস রাগ করলেন। কবিতা এমন খারাপ হয়েছে যে, হাহা হিহি করে হাসতে হবে?

জেনথিপি বললেন, সারা জীবন শুনে এসেছি আমার স্বামী বিরাট জ্ঞানী, তার জ্ঞানের কথা দুনিয়ার বেবাক মানুষ জানে, শুধু আমিই জানি না। আর এখন বের হলো, আমার স্বামী একজন বিরাট কবি, একথা দুনিয়ার কেউ জানে না, শুধু আমি একলা জানি।

এবার সক্রেটিসও হাসলেন। সারা জীবনে আসলেই জেনথিপিকে সুখ দিতে কোনো চেষ্টা করেননি। মেয়েরা যে এত সহজে খুশি হয়, এই হিসাব তার জানা ছিল না। তার জীবনে মেয়েদের অধ্যায়টা কেমন খালিই রয়ে গেল। যে কটা দিন আছে, আরও কিছু কবিতা লিখে জেনথিপিকে দিয়ে যেতে হবে। এগুলো হবে এই মেয়েটির সম্পদ।

এমন খুশির দিন জেনথিপির জীবনে আর আসেনি। তার স্বামী তার জন্য কবিতা লিখেছেন। এথেন্সে এমন ভাগ্যবতী নারী আর কে আছে? তিনি খুশি। মহাখুশি। কিন্তু জেনথিপি হাসলেন না। শুরু করলেন কান্না। ভয়াবহ কান্না।

সক্রেটিস জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদো?

জেনথিপি বললেন, সব কান্নার কারণ হয় না। আর এত কারণ দিয়ে কী করবেন? আপনি তো কোনোকালেই আমাকে বোঝেননি। এখন মরণকালে আর বুঝে কী হবে?

সক্রেটিস বললেন, কথা সত্য। এখন আর বুঝে কোনো লাভ নাই।

জেনথিপি আবার বললেন, এখন আমার কথার উত্তর দেন। এত কিছু থাকতে আপনি ইসপের গল্প নিয়ে কবিতা লিখলেন কেন? আপনি জ্ঞানী মানুষ। সারা জীবন দর্শন চর্চা করেছেন। এখন হঠাৎ ইসপের কচ্ছপ- খরগোশ, ইঁদুর-সিংহ, কাক-শিয়াল এসব নিয়ে শুরু করলেন কেন? কী পেলেন ইসপের মধ্যে?

সক্রেটিস বললেন, ঘটনা হলো, ইসপ এখন আমার কাছে আলাদা ব্যক্তি। তুমি তো ইসপের কাহিনি জানো।

'জানি তো। তিনি রাজ্যের সব পশু-পক্ষী নিয়ে গল্প লিখেছেন। বাচ্চাদের জন্য উপদেশের গল্প। ছোটবেলায় মা বলতেন।'

'আরে এটি তো সবাই জানে। আমি বলছি ইসপের নিজের জীবনের কাহিনির কথা। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সেটি জানো?'

'না। কীভাবে মারা গেছেন ইসপ?'

'তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ড।'

'তাই নাকি?'

‘ডেলফি শহরের মানুষ তাকে মিথ্যা চোর সাজিয়েছিল। লুকিয়ে তার ঝোলায় একটি সোনার বাটি ভরে দিয়েছিল। তারপর ধরে বলে সে নাকি এপোলোর মন্দিরের সোনার বাটি চুরি করেছে। সেই অপরাধে বিচার হয়। বিচারে পাহাড়ের উপর থেকে ছুড়ে ফেলে মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হয়। ‘

‘ঘটনা তো একেবারে আপনার বিচারের মতো।’

ধীরে ধীরে সক্রেটিস বললেন, রাত হলেই ইসপের কথা মনে পড়ে। মাঝে মধ্যে স্বপ্নেও তাকে দেখি। মনে হয় আমি বুঝি সেই ইসপ ছিলাম। তার আত্মাই সক্রেটিস হয়ে জন্ম নিয়েছে।

জেনথিপি বললেন, এবার দুয়ে দুয়ে চার মিলছে। আপনি সেজন্যই ইসপের গল্প নিয়ে কবিতা লিখছেন?

‘আমার সাথে ইসপের আরও মিল আছে। আমার চেহারা তো কদাকার। ইসপের চেহারা ছিল ভয়াবহ রকম বদখত। তাকে দেখলে নাকি লোকের ভয় লাগত।

‘আপনার মুখে এতদিন তো ইসপের কথা শুনিনি।’

‘ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। সেদিন প্লেটো ইসপের বিস্তারিত কাহিনি বলল। আমি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিলাম। তবে ঘটনা আরও আছে। ইসপের মৃত্যুর পর ডেলফিতে বিশাল দুর্ভিক্ষ হয়। হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। যারা ইসপের মিথ্যা বিচার করেছিল, সবাই কঠিন সাজা পায়। লোকে বলে, ইসপের শাপ লেগেছে।’

জেনথিপি বললেন, হবেই তো। বিনা দোষে ভালো মানুষদের মেরে ফেলবে। দেবতা কি বসে থাকবেন? আপনার সাথে এথেন্সের লোকেরা যা করল, এথেন্সেরও শাপ লাগবে। ঐ এনিতাস, মেলিতাস ওদের বিনাশ হবে। এই ভর দুপুরে আমি শাপ দিচ্ছি।

‘ছিঃ ছিঃ। জেনথিপির মুখ চেপে ধরলেন সক্রেটিস। আমি সারা জীবনে কোনো মানুষের খারাপ চাইনি। ওদের জ্ঞান নেই বলেই এই কাজ করছে। তুমি আর কোনোদিন কোনো শাপ মুখেও আনবে না।’

‘কেন, আমার সংসার যারা ছারখার করল তাদের সংসারও ছারখার হবে।’

সক্রেটিস দেখলেন, জেনথিপি তার আগের সেই মুখরা অবস্থায় ফিরে গেছেন। কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছেন। এখন দেখা যাবে শাপ কাকে বলে! সক্রেটিস তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, তুমি এক্ষুনি বাড়ি যাও। জেলখানার বড় সাহেব আসার সময় হয়েছে।

জেনথিপি বুঝলেন, তার চিৎকার, শাপ-শাপান্ত বন্ধ করতে সক্রেটিস তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। একটি অনুরোধ— দেবতা এপোলোকে নিয়ে দু’একটি কবিতা লিখেন। এপোলোর ইশারাতেই জাহাজটা আটকে আছে। সেজন্য আপনি এখনও বেঁচে আছেন। তাকে নিয়ে লেখেন।

সক্রেটিস বললেন, অবশ্যই লিখব। কাল তোমাকে সেই কবিতা দেখাব।

সন্ধ্যায় সক্রেটিস আবার বসলেন কবিতা লিখতে। ইসপের গল্পর নিয়ে দুটি কবিতা আর দেবতা এপোলোকে নিয়ে একটি গীতি কবিতা লিখলেন। এবার ঘুমাতে হবে। একটি গাঢ় নিদ্রা দরকার।

কিন্তু নিদ্রা গাঢ় হলো না। একটি সমস্যা হয়েছে। কয়েকদিন ধরে তিনি কেবল স্বপ্ন দেখেন। দুচোখ এক হলেই হুরহুর করে চলে আসে স্বপ্ন। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। আগাগোড়া নেই। ইসপকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখেন। দেখেন ইসপ পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে। পড়তে পড়তে ডেলফির মানুষদের কী যেন বলছে।

আজ অন্য একটি স্বপ্ন দেখলেন। সেটি আরও উদ্ভট। স্বপ্নে দেখলেন— সক্রেটিস একটি ছোট্ট শিশু হয়ে গেছেন। শিশুটি মাত্র জন্ম নিয়েছে। জন্ম নিয়েই সে প্লেটোর হাত ধরে হাঁটছে।

সক্রেটিস ভাবেন, কেন এসব স্বপ্ন দেখছেন? তিনি কি মরতে চান না? নাকি আবার ফিরে আসতে চান? তাই কি এসব উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন?

স্বপ্ন নিয়ে গভীর চিন্তায় পড়লেন তিনি। তেমন কাউকে বলেন না। নিজে নিজে চিন্তা করেন। মৃত্যুর পর আসলে কী হয়? আত্মা কোথায় যায়? আত্মা কি আবার ফিরে আসতে পারে?

***

১৩৭. ইসপ (Aesop): শিক্ষামূলক শিশুতোষ গল্পের বিশ্ববিখ্যাত লেখক। তিনি উত্তর গ্রিসের থ্রেস অঞ্চলে জন্মেছিলেন। তার জীবনকাল আনুমানিক ৬২০-৫৬৪ খ্রি.পূ.। সক্রেটিসের সময়ে তার গল্প গ্রিসে জনপ্রিয় ছিল।

৫৬

‘যে অকপটে নির্মম সত্য বলে দেয়,
সে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়।’
—প্লেটো

সূর্য উঠি উঠি করছে।

বাইরে একটু একটু দিনের আলো ফুটেছে। কিন্তু কারাগারের ছোট্ট ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সক্রেটিস ভোরের ঘুম ঘুমাচ্ছেন। আজ তার কারাবাসের এক মাস পূর্ণ হলো। সারা জীবন তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছেন। কিন্তু গত এক মাসে সেই অভ্যাস বদলে গেছে। এখানে ভোরের আলো আসে না। তাই ঘুমও ভাঙে না। প্রায়ই অন্য কেউ এসে ঘুম ভাঙায়।

সক্রেটিস ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু ঘুম গাঢ় নয়। তার চোখের পাতা কাঁপছে দ্রুত কাঁপছে।

সক্রেটিস স্বপ্ন দেখছেন— অপূর্ব এক নারী। শুভ্র একটি ওড়না জড়ানো। নারীটি ফিসফিস করে বলছে, সক্রেটিস, তুমি এসো। আমি অপেক্ষা করছি। এসো সক্রেটিস, আজ থেকে তিন দিনের দিন তুমি এই সুন্দর জায়গাটায় চলে এসো। এসো, এসো ...

আর কিছু শুনতে পাচ্ছেন না সক্রেটিস। তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। তিনি বুঝতে চাইছেন কণ্ঠটা কার। অমন করে কে ডাকছে! তিনি জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখছেন, মেয়েটির কণ্ঠ আবার শুনতে ইচ্ছে করছে। সে কণ্ঠে ভয় আছে, আহ্বান আছে, মনে হয় একটু প্রেমও আছে।

স্বপ্নের শব্দগুলো পরিচিত। এরকম শব্দ তিনি শুনেছেন। মনে পড়ল— হোমারের ইলিয়াডের কাহিনিতে বীর একিলিসকে তার মা থেটিস বলেছিলেন, ‘আজ থেকে তিন দিনের দিন তুমি চলে এসো’। সেটি ছিল একিলিসের জন্য মৃত্যুবার্তা। তার তিন দিন পরে ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিসের তীর তার পায়ে আঘাত করে। একিলিসের মৃত্যু হয়।

তাহলে এই কণ্ঠ কি থেটিস এর? তিনি কি ডাক শুনলেন? তার কি দিন ঘনিয়ে এসেছে? আজ থেকে তিন দিনের মাথায় চলে যেতে বলছে?

ধরফর করে উঠলেন সক্রেটিস। চোখ মেলে দেখলেন, তার সামনে শুভ্রবসনা নারী থেটিস না, বসে আছেন এক বুড়ো লোক। বুড়োটা হলেন তার আশৈশব বন্ধু ক্রিতো।

চোখ ঘষতে ঘষতে বললেন, দেখো, কারাগারে কতই শান্তি। গভীর ঘুম দিচ্ছি। সকালে উঠতেও পারি না। কখন এসেছ?

ক্রিতো বললেন, অনেকক্ষণ।

‘বেলা অনেক হয়ে গেছে?’

‘না, না, বেলা হয়নি। বাইরে মাত্র আলো ফুটতে শুরু করেছে।’

‘তাহলে তুমি কীভাবে ঢুকলে? এত সকালে তোমাকে ঢুকতে দিল?’

‘ঢুকতে মাত্র কয়েক ড্রাকমা খরচ হয়েছে।’

‘ঘুষ দিয়ে আমাকে দেখতে এসেছ ক্রিতো? গত এক মাস এরকমই করছো নাকি?’

‘ওসব নিয়ে তুমি ভাবছ কেন? আমাদের দরকারে আমরা আসি। যেভাবে পারি, সেভাবেই আসি।’

আড়মোড়া দিয়ে উঠে বসলেন সক্রেটিস। বললেন, এত আগে এসেছ, আমাকে জাগালে না কেন?

‘নিদ্রামগ্ন মানুষকে জাগানো ঠিক নয়। দেবতারা বেজার হন।’

‘না জাগিয়ে ভালোই করেছ। আমি একটি স্বপ্ন দেখছিলাম। ‘হ্যাঁ, তোমার চোখের পাতা কাঁপছিল।’

‘স্বপ্নে দেখলাম— বীর একিলিসের মা থেটিস আমাকে ডাকছেন। যেভাবে হোমারের ইলিয়াদে একিলিসকে ডাক দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে ডাকছেন। ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। আমার মনে হয় যাওয়ার দিন চলে এসেছে। এবার আমার কারাবাস শেষ হবে।’

হঠাৎ সক্রেটিসের মনে হলো আজ এত সকালে ক্রিতো কেন এসেছে? একেবারে সূর্য ওঠার আগে! নিশ্চয়ই কারণ আছে। সেই সাথে অমন স্বপ্ন! একেবারে স্পষ্ট। তাকে ডাকছে। মনে হচ্ছে এখনও ডাক শুনতে পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই ঘটনা আছে।

তিনি বললেন, ক্রিতো, জাহাজ কি ফিরে এসেছে?

‘এখনও না। তবে আজই ভিড়বে। গতকাল সন্ধ্যায় সোনিওতে এসেছে। যেভাবে বাতাস বইছে, তাতে আজ বিকেল নাগাদ সোনিও থেকে এথেন্সে চলে আসবে।’

‘বাহ, খুব ভালো খবর। অপেক্ষার দিন তাহলে ফুরাচ্ছে। তবে আমার মনে হয় আজ আসবে না। কাল আসবে।’

‘আমার আগে কেউ তোমাকে খবর দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, স্বপ্নে খবর পেলাম। বললেন, তিন দিনের মাথায় আমার সাথে দেখা হবে। সেই হিসেবে, জাহাজ আসবে কালকে। আর আমার মৃত্যু হবে পরশু। তার আগে হবে নয়।’

ক্রিতো একটু থেমে চারদিকে তাকালেন। সক্রেটিস খাটে বসেছিল। ক্রিতো চুপ করে মেঝেতে তার পায়ের কাছে বসলেন। খুব নিচু গলায় সক্রেটিসের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, শোন, আমি যা বলি মন দিয়ে শোন।

‘বলো।’

‘আমার কাছে যে খবর আছে, তাতে জাহাজ আজই আসবে।’

‘না, জাহাজ কাল আসবে। পরশুর আগে আমার মরণ নেই।’

‘ঠিক আছে, মানলাম। জাহাজ যেদিনই আসুক, আমাদের হাতে সময় নেই।’

‘কী বলছ? আমার হাতে পাক্কা তিনটা দিন আছে।’

‘সক্রেটিস, যা করার এই সময়েই করতে হবে।’

‘কী করতে হবে?’

‘তোমাকে মরলে চলবে না।’

‘মানে কী?’

‘মানে তুমি এখান থেকে চলে যাবে।’

‘আমাকে পালাতে বলছো?’

‘আস্তে বলো। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আজ রাতেই যা করার করতে হবে।’

‘ক্রিতো, কী বলছ তুমি!’

‘হ্যাঁ, সেজন্যই আমি এত সকালে এসেছি। আর একটু পরেই তোমার কাছে লোক আসতে থাকবে। তোমার কারাগার হয়ে যাবে দর্শনের স্কুল। তখন আর এসব কথা বলা যাবে না। তুমি তৈরি হও।’

‘ক্রিতো, তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি কী বলছ?’

‘আমি সব বুঝতে পারছি। আমরা আলাপ করেই এই ব্যবস্থা করেছি। প্লেটো আর ফিদোর সাথে কথা বলেই করেছি। শুধু ওরাই নয়, সবাই চায় তোমাকে বাঁচাতে। এথেন্সের বাইরে থেকেও লোক এসেছে তোমাকে বাঁচাতে।

‘কে কে এসেছে?’

‘থিবস থেকে এসেছে সিমিয়াস আর সিবিস। তারা টাকা নিয়ে এসেছে। আরও অনেকে খবর দিয়েছে, যা লাগে তারা দেবে। টাকা কোনো সমস্যা নয়।’

‘সমস্যা তাহলে কী?’

‘কোনো সমস্যা নাই। সব পাকা হয়ে গেছে। এখন আমি যেভাবে বলি, তুমি শুধু আজ রাতে সেরকম করবে।’

‘কত টাকায় রফা করেছ?’

‘সেটি দিয়ে তুমি কি করবে? টাকার অংক বেশি নয়।’

‘বলোই না। সক্রেটিসের জীবনে দাম কত শুনতে ইচ্ছে করছে।’

‘ত্যাড়ামি বাদ দাও। সারা জীবন ত্যাড়ামি করেছ। এটি তোমার জীবনের দাম না। এটি কারারক্ষীর সততার দাম। আমি একাই সব দিয়ে দিতে চেয়েছি। কিন্তু প্লেটো আর ফিদো রাজি নয়, তারাও টাকা দেবে। তোমাকে রক্ষার কৃতিত্ব আমাকে একলা দিতে তারা রাজি নয়।’

‘বুঝলাম। তোমরা বিরাট কাজ করেছ। এবার আমি যা বলি, শোন।

‘শুনাশুনি শেষ। সব চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তুমি আজ রাতে থেসালি চলে যাবে। সেখানে আমার বাড়ি কেনা আছে। ভাবী আর ছেলেমেয়েরা তোমার আগেই সেখানে পৌঁছে যাবে।’

‘জেনথিপিও রাজি হয়ে গেছে? এত বুদ্ধি সে কোথায় পেল? সারা জীবন তো সে ছিল বোকাস্য বোকা।’

‘স্বামীর জীবন বাঁচাতে যদি বোকাস্য বোকা হতে হয়, তাহলে জেনথিপির মতো বোকা মহিলাই ভালো। শোন, কাজের কথায় আসি। আজ রাতের পরিকল্পনা শোন।’

‘উঠে দাঁড়ালেন সক্রেটিস। বললেন, একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসি।’

ক্রিতো বুঝলেন, সক্রেটিস তার পরিকল্পনা শুনবেন না। তিনি কথা ঘুরাতে উঠে গেলেন। ক্রিতোর খুব অসহায় লাগল। তিনি কারাগারের দেয়ালে তাকিয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে মুখ মুছতে মুছতে খাটে এসে বসলেন সক্রেটিস। ক্রিতোর হাত ধরে বললেন, তোমার মতো বন্ধু আছে বলেই, জীবন এত মূল্যবান। কিন্তু বল তো, আমি পালিয়ে কোথায় যাব?

‘থেসালি।’

‘সেখানে আমার পরিচয় কী হবে?’

‘তোমাকে সারা পৃথিবীর মানুষ একজন জ্ঞানী মানুষ হিসেবে জানে।’

‘হুঁম, কিন্তু থেসালিতে পালিয়ে গেলে সেখানে আমি হব একজন জেল-

পালানো আসামি। একজন ফেরারি।’

‘একদিন সবাই সত্য জানবে। সবাই এথেন্সের মানুষের মতো বেকুব নয়।’

‘তুমি আমাকে পলাতকের মতো বেঁচে থাকতে বলছো? সারাজীবন বলে এসেছি শুধু বেঁচে থাকা কোনো কাজের কথা নয়, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটাই আসল কথা।’

‘তোমার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর কথা ভাবো। তুমি থাকলে ওরা মানুষ হবে। পিতার স্নেহ পাবে।’

সক্রেটিসের মুখ থমথমে হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল তিনটি মুখ। তিনজনের মধ্যে ছোট দুই সন্তান এখনও খুবই ছোট। ছোটটি তো দুধের বাচ্চা। তার চোখ পানিতে ভরে উঠছে। চেষ্টা করেও পানি থামাতে পারছেন না। কান্না লুকাতে হাঁটতে শুরু করলেন সক্রেটিস। হঠাৎ ক্রিতোর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ভাই, ছেলেগুলোকে দেখে রেখো।

‘মানে?’

‘মানে, আমি কোনো দিনই পালাতে পারব না।’

‘কেন?’

‘জীবন অনেক সাধের জিনিস। পরিবারও অনেক দামি। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের চেয়ে বেশি নয়। আমি সারাজীবন সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছি। তোমাদেরকে সব সময় ন্যায় পথে থাকতে বলেছি। তাই না?’

‘হুঁম।’

‘তাহলে আজ বিপদে পড়ে সেই পথ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত নয়। সেটি অন্যায় হবে। আমি কোনো অবস্থায়ই অন্যায় করব না।’

‘না, তুমি অন্যায় করবে না। শুধু তোমার উপর যে অন্যায় হয়েছে, তুমি সেটির প্রতিকার করবে। এই নগর তোমার সাথে অন্যায় করেছে। সেই অন্যায়কে থামাতে তুমি পালিয়ে যাবে।’

‘না, ক্রিতো। কেউ অন্যায় করলেও, বিনিময়ে তার প্রতি অন্যায় করা যায় না। অন্যায়ের বদলে অন্যায় কোনো সমাধান নয়। খারাপের বদলে খারাপ কাজ করা যায় না। ১৩৮’

ক্রিতো উত্তর করতে চান না। যুক্তিতে সক্রেটিস সারা জীবনে কারও কাছে হারেননি। তার সাথে তর্ক করে জেতার আশা ক্রিতোর নেই। ক্রিতো যুক্তি দিতে আসেননি। তিনি এসেছেন বন্ধুকে বাঁচাতে। এথেন্সের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষকে বাঁচাতে। তিনি আবেগ দিয়ে সক্রেটিসকে রাজি করাতে এসেছেন।

কিন্তু সক্রেটিসের কাছে আবেগের কোনো দাম নেই। তিনি আবেগ বোঝেন না। বোঝেন শুধু যুক্তি। বোঝেন প্রশ্ন আর পাল্টা প্রশ্ন। মরার আগেও সক্রেটিস তার প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলা ছাড়ছেন না। কিন্তু এই প্রশ্নখেলায় এখন জড়াতে চান না ক্রিতো। তিনি জানেন, তিনি পারবেন না।

তিনি এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, নিজের জীবনের জন্য না হোক, আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্য তুমি পালাও।

‘তোমার লজ্জা?’

‘হ্যাঁ। সবাই বলাবলি করছে টাকা দিলেই কারাগার থেকে পালানো যায়। ক্রিতো টাকা দিলেই সক্রেটিস বেঁচে যাবে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে তুমি নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুকে বেছে নিয়েছ। সবাই বলবে- ক্রিতো টাকা দেয়নি, তাই সক্রেটিস মরেছে। আমাকে শরমে ফেলো না।’

‘মানুষ তো কত কিছুই ভাবে। সাধারণ মানুষ নিয়ে এত ভাবলে হবে না।’

‘সাধারণ মানুষদের বাদ দেওয়া যাবে না। তোমার বিচার করেছে সাধারণ মানুষ। এখন তোমাকে মেরে ফেলছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ কাজ করতে পারে। তারা বিপদেও ফেলতে পারে।’

‘হ্যাঁ, কিছু সাধারণ মানুষ আমার ওপর অন্যায় করেছে। কিন্তু তার প্রতিদানে যদি আমি পালিয়ে যাই, সেটিও অন্যায় হবে। নিজে অন্যায় করার চেয়ে অন্যায় সহ্য করা ভালো।’

ক্রিতো চুপ করে লক্ষ করল সক্রেটিস কী সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন! ‘অন্যায়ের বদলে অন্যায় কোনো সমাধান নয়’। ‘নিজে অন্যায় করার চেয়ে অন্যায় সহ্য করা ভালো।

কী সুন্দর কথা! অন্য সময় হলে ক্রিতো কথাগুলো উপভোগ করতেন। কিন্তু এখন পারছেন না।

একটু থেমে ক্রিতো শক্ত গলায় বলল, এখন তুমি সেটিই করছ, যা তোমার শত্রুরা চাইছে। যখন নিজেকে রক্ষা করার উপায় আছে, তখন তুমি সেটি করছ না।

সক্রেটিস কিছু বললেন না।

ক্রিতো আবার বললেন, তুমি বলছো, তুমি পালাচ্ছ না। এটি মিথ্যা কথা তুমি আসলে পালাচ্ছ। তুমি জেল থেকে পালাচ্ছ না, কিন্তু জীবন থেকে পালাচ্ছ। তুমি সহজটা বেছে নিয়েছ। কিন্তু জীবন থেকে পালানোও লজ্জার। তুমি লজ্জা পাচ্ছ না, সক্রেটিস?

সক্রেটিস চুপ।

ক্রিতো প্রায় চিৎকার করে বললেন, তুমি সারা জীবন ত্যাড়ামি করেছ প্রথম যেদিন মামলা হলো, আমরা লিসিয়াসকে দিয়ে জবানবন্দি লেখালাম। তুমি আমার কথা শুনলে না। ত্যাড়ামি করে সেটি পড়লে না। আদালতে শুনানির দিনও আমাদের কথা রাখলে না। জিদ ধরে বললে, জরিমানা মাত্র এক মিনা। আজ শেষ সুযোগ। আজ রাতে আমার কথা শোন। এই রাত হোক সুবর্ণ রাত। এই রাত সক্রেটিসের জীবন রক্ষার রাত। চলো, জীবন বাঁচাই।

সক্রেটিস বললেন, ক্রিতো, যেদিন মামলার কথা শুনলাম, যেদিন আদালতে কথা বললাম, আর আজ; এই তিনটি দিনে তিনটি সময় বদলেছে। সত্য বদলায়নি। তাই সক্রেটিসও বদলায়নি। সত্যের জন্য সক্রেটিস সেদিন ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, আজও আছে। ক্রিতো, তুমি কোন সক্রেটিসকে ভালোবাসো? যে সক্রেটিস সত্যের জন্য সবকিছু করে, সেই সক্রেটিসকে। আজ আমাকে বাঁচাতে থিবস থেকে ওরা টাকা নিয়ে ছুটে এসেছে। কোন সক্রেটিসকে বাঁচাতে চায় ওরা? সেই সক্রেটিস, যে সারাজীবন সত্য থেকে নড়েনি। যদি গরমকালের সক্রেটিস আর শীতকালের সক্রেটিস আলাদা হতো, তাহলে ওরা বাঁচাতে আসত না। ক্রিতো, এভাবেই আমায় মরতে দাও। আমাকে পাল্টাতে বোলো না।

ক্রিতো উত্তর করতে পারছেন না।

অনেক ক্ষণ দুজনেই চুপ। হঠাৎ ক্রিতো কেঁদে ফেললেন, আমাদের ছেড়ে যেও না, বন্ধু। ছেড়ে যেও না।

সক্রেটিস বললেন, ক্রিতো, আমি যদি পালিয়ে যাই, তাহলে ঐ বিচারক যারা আমায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তারা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। বলবে সক্রেটিস সত্যিই অপরাধী। তাই পালিয়ে গেছে।

ক্রিতো কোনো কথা বলতে পারছেন না। তার চোখে পানি।

সক্রেটিস দেখলেন ক্রিতো ফাঁপরে পড়ে গেছে। সে একটু হাল্কা করতে হাসতে হাসতে বললেন, আর একটি মজার বিষয় আছে। মজাটা হলো এই শহরের আইনের

সাথে আমার একটি গোপন প্রেমচুক্তি আছে। আইন হলো আমার গোপন প্রেমিকা। আমি যেদিন ঠিক করলাম আমি সত্য পথে চলব, সেদিন থেকেই আমি নিজে আইন মানি। সবাইকে আইন মানতে বলি। এখন পালিয়ে গেলে, যদি কোনোদিন রাস্তায় আইন ব্যাটার সাথে দেখা হয়, সে জিজ্ঞেস করবে, কিরে সক্রেটিস, তুই তো কথা রাখিসনি। সেদিন বড় শরমিন্দা হব।

ক্রিতো বুঝলেন, সক্রেটিস মজা করছে। কিন্তু তিনি মজা করতে পারছেন না। তিনি এখনও গম্ভীর।

তাকে হাল্কা করতে সক্রেটিস আবার বললেন, ধরো আমি তোমার কথায় থেসালি পালিয়ে গেলাম। সেখানে পিচ্চি ছেলেরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'তা সক্রেটিস কাক্কু, আপনি তো জব্বর খেল দেখালেন। এথেন্সের জেল থেকে পালালেন। কেমনে ঘটালেন ঘটনাটা? কাহিনিখান একটু শুনাবেন?' তখন আমি বিশাল সাসপেন্স নিয়ে বলব, 'শোন বাবারা, ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। একটি শিয়ালের চামড়া আমাকে দিল ক্রিতো। দারোয়ান তো আগেই পয়সা খেয়েছে। আমি ফাঁকা দরজা দিয়ে শিয়ালের মতো বের হলাম। চার হাত-পায়ে জঙ্গলে ঢুকলাম। তারপর ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ এক দৌড়ে থেসালি।' এই কথা শুনে তারা হাততালি দিয়ে বলবে, 'সক্রেটিস কাক্কু তো বুড়ো হাড্ডিতে জব্বর খেল দেখালেন।'

এবার ক্রিতো হেসে উঠলেন।

সক্রেটিস বললেন, বলো ক্রিতো, বুড়া হাড্ডিতে জব্বর খেল্ দেখানোর জন্য আমার পালানো উচিত?

ক্রিতো চুপ করে আছেন। এই প্রশ্নের উত্তর হয় না।

সক্রেটিস শান্তভাবে বললেন, ক্রিতো, আমার বয়স সত্তর। আমাকে মরতে দাও। আমি মরে গিয়ে জ্ঞানকে স্বাধীনতা দেব। জ্ঞানের জন্য মরতে পারে, এমন ভাগ্য কয়জনের হয় বলো? আমায় ডেকো না। ফেরাতে পারবে না। শুধু কষ্ট বাড়বে।

ক্রিতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। তার চোখে জল।

সক্রেটিস তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ক্রিতো, আমি সারা জীবন ভালো কিছুর জন্য কাজ করেছি। সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছি। নিজের বিচারে যা সত্য বলে জেনেছি, ন্যায় বলে বুঝেছি তাই করেছি। কারও কথায়ই তার নড়চড় হবে না, জীবন বাঁচাতেও নয়। কারণ আমি বিশ্বাস করি, সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না, জীবনের জন্যও নয়।

ক্রিতো বুঝলেন ত্যাড়া সক্রেটিস সারা জীবন কথা রাখেননি। এবারও তিনি কথা রাখবেন না। সক্রেটিস কিছুতেই পালাবেন না।

ক্রিতো জেলখানা থেকে বের হলেন। আকাশের দিকে তাকালেন।

সামনে মানুষ আর মানুষ। আগোরার পথে পিঁপড়ার মতো হাঁটছে মানুষ সবাই ছুটছে। কেন ছুটছে? বাঁচার জন্য ছুটছে। সবাই বাঁচতে চায়। যেভাবেই হোক সবাই বেঁচে থাকতে চায়।

শুধু সক্রেটিসই আলাদা। তিনি যেনতেনভাবে বাঁচতে চান না। অসম্মানের বাঁচা তিনি বাঁচতে চান না। পালিয়ে যাওয়ার সব উপায় আছে, তবুও তিনি পালাচ্ছেন না।

ক্রিতো জীবনে অনেক মানুষের সুন্দর সুন্দর কথা শুনেছেন। মুখে অনেকেই ভালো ভালো কথা বলেন। কিন্তু মুখের কথাকে মেনে চলার জন্য জীবন দিতে পারেন, এরকম মানুষ পৃথিবীতে আছেন?

ক্রিতো ভাবছেন, একটি মানুষ কত বড় হলে, এমন করে মৃত্যুকে ডাকতে পারেন। সক্রেটিস আসলেই তার সময়ের সবচেয়ে মহৎ মানুষ।

সকলেই বদলায়, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বদলায়। কিন্তু সক্রেটিস বদলান না। নীতি ও সত্যের জন্য তিনি কোনোদিনই বদলাবেন না।

সক্রেটিস সারা জীবন একটি জিনিস খুঁজেছেন, সেটি হলো 'সুন্দর জীবন'। এতদিনে ক্রিতোর মনে হলো এটিই বুঝি সক্রেটিসের সেই সুন্দর জীবন।

সারা দুনিয়া মিথ্যার পিছনে ছোটে। মিথ্যার অট্টালিকায় ভরে উঠে নগরের পর নগর। তবু দু'একজন মানুষ সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। সেটিই তাদের সুন্দর জীবনের রহস্য। কেননা তারা পৃথিবীতে আসেন এক মুঠো আলো ছড়াতে। সেই আলো আকাশ-প্রদীপ হয়ে জ্বলতে থাকে। রয়ে যায় পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত।

কেউ তাদের সাথে খারাপ কিছু করলেও, তারা বিনিময়ে খারাপ করেন না। অন্যায়ের বদলে অন্যায় করেন না। ক্ষমা ও প্রেমমাখা একটি সুন্দর জীবন যাপন করতে করতে একদিন নীরবে পৃথিবী থেকে চলে যান।

***

১৩৮. জেল থেকে সক্রেটিসের পালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ নিয়ে ক্রিতোর সাথে তার আলাপ নিয়ে প্লেটো ক্রিতো (Crito) নামে একটি বই লিখেছেন, যে বইটি সক্রেটিসের দর্শনের জন্য একটি অমূল্য দলিল।

৫৭

‘সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ রাগ করলে,
সেই রাগ হয় ভয়ংকরতম।’
— ইউরিপিডিস

জেলখানার ছোট্ট ঘরে মাত্র রাত নেমেছে।

এক কোণে জ্বলছে জলপাই তেলের প্রদীপ। নিভু নিভু আলো। সেই ডুবন্ত আলোয় একজোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদের জীবনের শেষ হিসাব-নিকাশ করছেন। দুজনেই জানেন এই রাতই তাদের একসাথে কাটানো শেষ রাত। তারা নিঃশব্দে নিভু নিভু প্রদীপের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে।

তারা জানেন, দিন কেটে আবার রাত হবে। সেই রাতেও এমন করেই ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকবে। শুধু দুজনে পাশাপাশি বসে আর সেই ডাক শুনবেন না। বৃদ্ধ আগামীকাল পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন।

আগামীকালই সক্রেটিসকে হেমলক খেতে হবে। পবিত্র জাহাজ আজ এথেন্সে ফিরে এসেছে। আজ রাত সক্রেটিসের জীবনের শেষ রাত। শেষ রাতটি জেনথিপি সক্রেটিসের সাথে কাটাচ্ছেন। জেলখানায় আছেন জেনথিপি। ক্রিতো সব ব্যবস্থা করেছেন। জেনথিপি কোলের ছেলেটিকে নিয়ে এসেছেন। ছেলেটি মেঝেতে একটি মাদুরের উপর ঘুমাচ্ছে।

সক্রেটিস আর জেনথিপি নিঃশব্দে বসে আছেন। দুজনের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সক্রেটিস বললেন, বউ, সারা জীবন তুমি চিৎকার করে কথা বলেছ। তুমি চুপ থাকলে আমার অসহ্য লাগে। কথা বলো। চুপ থেকো না।

জেনথিপি কিছুই বললেন না। তিনি কাঁদতে লাগলেন।

এই মেয়েটি সারা জীবন কেঁদেছে আর সেই কান্নায় সক্রেটিস শুধু বিরক্তই হয়েছেন। কিন্তু আজ বিরক্ত হচ্ছেন না। এই কান্নাকে তার খুবই আপন লাগছে, ভীষণ মধুর লাগছে। মনে হচ্ছে শুধু এই কান্নাটা দেখার জন্যই বেঁচে থাকা যায়। জীবনের প্রতি ভীষণ মায়া হতে লাগল সক্রেটিসের। তিনি জেনথিপির মাথায় হাত রাখলেন।

ধীরে ধীরে বললেন, জানো জেনথিপি, আমি কিন্তু মরব না। আমি বেঁচে থাকব।

‘অ্যা, জাহাজ আসেনি? কাল হেমলক খেতে হবে না?’

‘সেটি না, কালই হেমলক খেতে হবে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকব। বেঁচে থাকব লেখার মধ্যে।

‘কার লেখায়?’

‘প্লেটোর লেখায়। প্লেটো আমাকে নিয়ে লিখবে। আমি তার চোখে আগুন দেখতে পেলাম। লেখার আগুন। আর একজন আছে। তার নাম জেনোফোন। সে নাকি লেখা শুরু করে দিয়েছে। জেনোফোন লিখছে এই খবর শুনেই প্লেটো জ্বলে উঠেছে। মনে হয় প্লেটোও লেখা শুরু করে দিয়েছে। ওর লেখার হাত এত মিষ্টি, একবার শুরু করলে শেষ না করে আর ওঠা যায় না। সেজন্য আমি বেঁচে থাকব। প্লেটোর কলমের মধ্যে বেঁচে থাকব।’

জেনথিপি বললেন, তাতে আমার কী লাভ? আমি কি কাল রাতে আপনাকে ছুঁতে পারব?

‘ছুঁতে পারবে না। তবে তোমারও কিঞ্চিত লাভ আছে। তুমিও সেই লেখায় থাকবে। আমাকে নিয়ে লিখলে, তুমি তো সেই লেখায় থাকবেই। জেনথিপিকে বাদ দিয়ে সক্রেটিসকে নিয়ে লেখা যাবে না।’

‘আমাকে নিয়ে কী লিখবে? লিখবে সক্রেটিসের একজন দজ্জাল বউ ছিল যে সারাজীবন শুধু সক্রেটিসকে জ্বালিয়েছে। হাড় ভাজাভাজা করে ফেলেছে। এটি ছাড়া আর কিছু লিখতে পারবে?

হেসে উঠলেন সক্রেটিস। বললেন, তোমার চিৎকার আর চেঁচামেচি আমার জন্য ভালো হয়েছে। অতি উত্তম হয়েছে। বাড়িতে থাকলে তুমি রাগ করো, সেজন্য আমি বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকতাম না। বনে-বাদাড়ে বসে চিন্তা করতাম। এতে নতুন নতুন জিনিস মাথায় আসত। তুমি রাগ করে আমার উপকারই করেছো। তার মানে জ্ঞানের জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী। না ভুল বললাম, তোমার রাগের কাছে ঋণী।

এতক্ষণে হাসলেন জেনথিপি। বললেন, কই, আমার কবিতা কই? এপোলোকে নিয়ে লেখার কথা ছিল। নতুন কী লিখেছেন?

গভীর রাতে প্রদীপের আলোতে দুজনে কবিতা নিয়ে বসেছেন। সক্রেটিস পড়ছেন আর জেনথিপি শুনছেন।

জেনথিপি খাবার বের করলেন। আজ তিনি সক্রেটিসের প্রিয় সবকিছু এনেছেন। ক্রিতোও খাওয়ার রেখে গেছেন। সক্রেটিস তেমন কিচ্ছু খাচ্ছেন না। জেনথিপি একটি দুটো আঙুর সক্রেটিসের মুখে তুলে দিচ্ছেন। কবিতা চলছে।

কিছুক্ষণ পরে দুজন মিলে প্রার্থনা করলেন। মৃত্যুর আগে দেব-দেবীকে একটু খুশি করা দরকার। এথেন্সের দেবী এথিনা আর এপোলোর কাছে প্রার্থনা করলেন। জেনথিপি আজ রাত জাগবেন। সক্রেটিস ঘুমালেও তিনি জেগে থাকবেন। তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম রাত তারা জেগে কাটাতে পারেননি। আজ শেষ রাত জেগে থাকবেন।

জেনথিপির মনে পড়ে বিয়ের সেই রাতে জেনথিপির খুব ঘুম পেয়েছিল। সেই রাতে কোনো কথাই হয়নি। দ্বিতীয় রাতে সক্রেটিস ঘরে ঢুকেই বললেন, আসো, আমরা শপথ করি সত্য ও ন্যায় মিশিয়ে আমরা একসাথে জীবন কাটাব। জেনথিপি বলেছিল, শুধু সত্য

আর ন্যায় দিয়েই হবে? ভালোবাসা লাগবে না? সক্রেটিস বললেন, আমাদের ভালোবাসাও শুধু সত্য আর ন্যায়ের জন্য। শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল জেনথিপির। এ কেমন মানুষ! একবার হাত ধরল না, মিষ্টি করে কিছু বলল না। জ্ঞানের আলাপ শুরু করল! সত্য আর ন্যায়! সত্য আর ন্যায় দিয়ে কী জীবন চলে? এগুলো কি খাওয়া যাবে, না রান্না করা যাবে? সেই রাতেই জ্ঞানের কথা অসহ্য লেগেছিল। রাগ করে তখুনি ঘুমিয়ে পড়েছিল জেনথিপি। সেই যে শুরু হলো, জীবনে আর রাগ কমেনি জেনথিপির।

আজকের শেষ রাতটা জাগবেন জেনথিপি।

সক্রেটিস বললেন, কাল তোমার অনেক কাজ। আমার দেহ পোড়াতে হবে। পোড়ানো শেষে হাড়-গোর কবর দিতে হবে। বিস্তর হাঙ্গামার ব্যাপার। একটু ঘুমাবে?

'ঘুম? যেদিন আপনার নামে মামলা করল, সেদিন থেকেই আমার রাতের ঘুম শেষ। একবারে কাল থেকে ঘুমাব।'

'তাহলে ছেলেমেয়েদের কথা বলো। সংসার চলবে কী করে?'

'এতদিন যেমন চলছে, সেভাবেই চলবে। এসব নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। ঘর, সংসার, টাকা-পয়সা নিয়ে জীবনভর আপনার সাথে ঝগড়া করেছি। কোনোদিন আপনার কথা শুনতে চাইনি। আজ আমি আপনার কথা শুনব। সারা রাত শুনব।'

'আমার কথা? আমার তো কোনো কথা নেই। আমি সারা জীবন যে কথা বলছি, সেগুলো সবই মানুষের জন্য কথা। নিজের কোনো কথা বলিনি।'

'আজ আপনার নিজের জীবনের কথা বলেন। যা কাউকে বলেননি, সেটি বলেন।'

'আমার জীবন? সক্রেটিসের জীবন? এটি আমার কাছেও নতুন বিষয়। এই বিষয়ে আমি কাউকে কোনোদিন কিছু বলিনি।'

'আজ আমাকে বলেন।'

সক্রেটিস একটু থামলেন। বললেন, আমার সত্তর বছরের জীবন। সংক্ষেপে বললেও রাত শেষ হয়ে যাবে।

'বিয়ের রাতে আমি ঘুমিয়ে গেছিলাম। আজ এই শেষ রাতটা জেগে কাটুক।'

সক্রেটিস বললেন, তাহলে মনে করো আমরা এই জেলের ঘরে নেই। মনে করো আমরা এজিয়ান সাগরের পারে সাদা বালিতে পা ছড়িয়ে শুয়ে আসি। আকাশে টলটলে পূর্ণিমা। সাগরের ঢেউ আমাদের দুজনের পায়ে সুরসুরি দিচ্ছে। আমরা দুজনে তাকিয়ে আছি সাগরে দিকে। সাগর হেসে হেসে কথা বলছে চাঁদের সাথে।

জেনথিপি এতটা ভাবতে পারছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তিনি সক্রেটিসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

সক্রেটিস শুরু করলেন তার জীবন কথা:

আমি জন্মেছিলাম গ্রীষ্মকালে। ভরা পূর্ণিমার রাতে। আকাশভরা জ্যোৎস্না। মা খুব খুশি। তার বুকে জ্যোৎস্নার আনন্দ। মা বললেন, আমার ঘরে জ্যোৎস্না আসছে। কিন্তু আর

কেউ খুশি হলো না। আমাকে দেখে আর সবাই বলে, ছেলের চেহারা তো দেখি ভয়াবহ, একেবারে বদখৎ। এই রকম বদখৎ ছেলে আমাদের বংশে আগে হয়নি। আরেকজন বলে পুরা এথেন্সেই এমন কদাকার ছেলে নেই। আমি বড় হতে থাকলাম একা একা। বাবা দরিদ্র মানুষ, সারাদিন রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন। আমার মা একজন ধাত্রী। এথেন্সে আর কোনো মহিলা এই কাজ করে না। সেজন্য প্রতিদিনই মায়ের কাজ থাকত। আমাদের বাড়িতে কোনো দাস-দাসী নেই। আমি বাড়িতে সারাদিন একা একা থাকি।

স্কুল শুরু করলাম। স্কুলেও আমার সাথে কেউ মিশে না। আমি নাকি কুৎসিত। স্কুলেও আমি হয়ে গেলাম একেবারে একা। একা একা কোনায় বসে থাকি। সারাদিন একা একা ভাবি। ভাবতাম, স্কুলের ছেলেরা অন্যদের সাথে এত ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু আমার সাথে মেশে না। আমি তো কোনো দোষ করিনি। তাহলে দোষটা কার? কী করলে এই সমস্যা দূর হবে? সারাদিন এই চিন্তা করি। এমন দিন গেছে, যে আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা বসে ছিলাম।

সেই অল্প বয়সেই বুঝে গেলাম, মানুষকে যা শেখানো হয়, মানুষ তাই করে। এই ছেলেগুলো শিখেছে, কুৎসিত মানুষকে অবজ্ঞা করা যায়। তাই ওরা আমার সাথে এমন ব্যবহার করছে। ওদের যদি শেখানো যায় যে, কুৎসিত হওয়া দোষের কিছু নয়, তাহলে ওরা এমন করবে না।

আমি বুঝলাম মানুষ স্কুলে গিয়ে যেমন হিসাব-নিকাশ শেখে, তেমনই জীবনকে সুন্দর করার জন্যও শিক্ষা দরকার। কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে সেটিও শেখা দরকার। সুন্দর জীবন একটি সাধনার ব্যাপার। এটি এমনি এমনি হয় না।

এটি বোঝার পর আমি শুরু করলাম, কীভাবে সুন্দর জীবন যাপন করা যায়, সেটি বের করার উপায়। শুরু হলো আমার গবেষণা। গবেষণার বিষয় মানুষ আর মানুষের জীবন। আমি কদাকার বলে মানুষ আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি তাদের নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। তখন এথেন্সে নানা ধরনের জ্ঞান ছিল। একদল মানুষ গবেষণা করত রাজনীতি নিয়ে। কীভাবে সুন্দর করে নগর চালানো যায়। আরেক দল প্রকৃতি নিয়ে ভাবত। চন্দ্র-সূর্য, জোয়ার-ভাটা এসব নিয়ে। মানুষের জীবন নিয়ে ভাবনা তেমন হয়নি। আমি ঠিক করলাম, আমি মানুষ নিয়ে কাজ শুরু করব। জীবন সুন্দর করার উপায় বের করব। সেই যে শুরু করলাম, আজ এই সত্তর বছর সেই একই কাজ করে চলছি।

ছোট্টবেলায় হঠাৎ একদিন মনে হলো আমি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারি। কথার পিঠে আচ্ছা রকম প্যাঁচ দিতে পারি। প্যাচের ওপর প্যাঁচ দিয়ে কথা বলতে আমার মতো আর কেউ পারে না। একা একা চিন্তা করতে করতে আমার মাথায় অনেক ভাবনা তৈরি হয়েছিল। অনেক যুক্তি জমা হয়েছিল মনের মধ্যে। আমি তখন প্রতিটি কথায়ই যুক্তি দিতে

পারি। তো আমি দেখলাম যুক্তি আর কথার প্যাঁচ— এই দুটি মারাত্মক অস্ত্র আমার আছে। এই অস্ত্র নিয়ে আমি ছেলেদের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। তবু ছেলেরা আমারে পাত্তা দেয় না, আমার কথা শোনে না। তখন খেয়াল করলাম, খালি যুক্তিতে মানুষ মজা পায় না। যুক্তির সাথে দরকার একটু রসিকতা। একটু হাসি-ঠাট্টা থাকলে, সেই কথা সবাই শোনে। আমি রসিকতার অভ্যাস শুরু করলাম। কিছু দিনেই দেখলাম আমি স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে। সবাই আমার কথা শুনতে ঘুরঘুর করে। আমি যুক্তিবাদী, আমি কথার পিঠে কথা বলতে পারি, আমি রসিক। সারা এথেন্সের ছেলেরা আমার ভক্ত। আমাকে সবাই ভালোবাসে।

আমার স্কুলের সমস্যা দূর হলো। আমি আর একা নয়। আমার পিছে স্কুলের সব ছেলে। তখন মোজমাস্তি করে দিন কাটালে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি সেটি করলাম না। মানুষ নিয়ে আমার গবেষণা বন্ধ করলাম না। সুন্দর জীবনের উপায় বের করতে আমি চিন্তা করেই চললাম। সেই চিন্তার মধ্যে একটি অদ্ভুত ব্যাপার শুরু হলো। কোনো কিছু নিয়ে গভীর চিন্তা শুরু করলে, আমি হঠাৎ হঠাৎ ধ্যানে চলে যেতাম। আমার বাইরের চেতনা থাকত না। অবচেতনে কিছু একটি শুনতে শুরু করলাম। কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে চাইলেই আমি অবচেতনে চলে যেতে পারতাম। তখন বিষয়টি বুঝিনি আমি মনে করতাম, আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে কে যেন আমাকে সংকেত দিচ্ছে। পরে বুঝেছি, ঐটা আমার অবচেতন মনের সংকেত। এভাবে আমি দিনে দিনে হয়ে উঠলাম একজন ক্ষুদে চিন্তাবিদ।

চিন্তাবাজির সেই সময় এথেন্সে এলেন দার্শনিক জেনো। এই দার্শনিক খুব দুষ্টু। তিনি মানুষের সাথে প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলেন। একটা কিছু নিয়ে প্রশ্ন শুরু করেন। কেউ উত্তর দেয়। সেই উত্তর থেকে দ্বিতীয় প্রশ্ন। এভাবে চলতে থাকে। চলতে চলতে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলা আমি বন্ধুদের সাথে শুরু করলাম। তারা এটি খুব পছন্দ করল। নতুন মজা।

এই প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলা আর চিন্তার অভ্যাস একই সাথে আমার পরম উপকার আর ভীষণ ক্ষতি, দুটোই করল। চিন্তা করে আমি নতুন নতুন ভাবনা পাই, আর সেগুলো ছেলেদের কাছে বলি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বলে তাদের সমস্যা দূর করে দিই। তাদের কাছে আমি হয়ে গেলাম বিশাল জ্ঞানী— একজন জ্ঞানবীর আর তাদের বাবাদের কাছে আমি ইঁচড়েপাকা শয়তান। তবে এর থেকে বড় আরেকটা ক্ষতি হলো, আমি চিন্তা আর প্রশ্ন খেলায় এমন ব্যস্ত যে, ঘরের কাজে আর আমার মন নেই। সংসারে মন নেই। একটি বৈরাগী বৈরাগী ভাব। খালি উড়ু উড়ু মন। সারাদিন খালি পায়ে ঘুরি আর মানুষ দেখি, মানুষের সাথে কথা বলি।

আমার ছোট্ট মনে একটি ভয় ঢুকে গিয়েছিল। একলা হওয়ার ভয়। আমি সারা জীবনে আর কোনোদিন একলা হইনি। মানুষ ছাড়া আমি থাকতে পারি না।

সেই সময় আমার সঙ্গী হলো চেরোফোন আর ক্রিতো। এই দুই বন্ধু আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ বানিয়ে দিল। ডেলফিতে গেল। ডেলফির ওরাকলও বলল, আমার চেয়ে জ্ঞানী মানুষ আর কেউ নেই। আমিও মানুষের পরীক্ষা নিতে শুরু করলাম। কে কত জ্ঞানী সেই পরীক্ষা। দেখলাম আসলেই মানুষ তেমন কিছুই জানে না। এভাবে জ্ঞানের তালাশ করতেই আমার জীবন কাটল।

ভেবেছিলাম কোনোদিন বিবাহ করব না। সারা জীবন জ্ঞানের সন্ধান করব। তা আর পারলাম কই? বাবা মারা যাওয়ার পর বুড়ো বয়সে বিবাহ করলাম। ক্রিতো ব্যবস্থা করল। বিয়ে করলাম তোমাকে। বিয়ে তো করলাম, কিন্তু সংসারী কি হতে পারলাম? হলাম গৃহী-সন্ন্যাসী।

এই হলো আমার বিয়ের আগের জীবন। আর বিয়ের পরের জীবন তো তুমি জানই। সেটি আর বলার কিছুই নেই।

জেনথিপি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন।

তিনি বললেন, তার মধ্যেও যা জানি না, সেটি বলেন।

সক্রেটিস বললেন, যেটি জানো না, সেরকম কিছু বলতে হবে? সেরকম একটি ঘটনা আছে। বিরাট ঘটনা।

'বলেন।'

'ঘটনা হলো, আমার কিন্তু একটি দ্বিতীয় বিয়ে করার কথা হয়েছিল।'

সক্রেটিস বলছেন আর জেনথিপির দিকে তাকাচ্ছেন। ভাবছেন এই বুঝি জেনথিপি রেগে গেল! কিন্তু আশ্চর্য, জেনথিপি রাগছেন না।

জেনথিপি মিষ্টি করে বললেন, সেই মেয়ের নাম মিরতো

সক্রেটিস অবাক। জেনথিপি জানেন? সক্রেটিসের মুখে কথা আটকে গেছে।

জেনথিপি বললেন, আমি জানি, কিছু লোক বুড়ো বয়সে আপনার বিবাহ ঠিক করেছিল। আপনি তাদের সাথে মেয়েকে দেখতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে আর বিবাহ করেননি

সক্রেটিস বললেন, বিবাহ না করার অজানা কারণ তুমি জানো না?

জেনথিপি বললেন, আপনার মুখে শুনতে চাই।

সক্রেটিস ভাবছেন, জেনথিপিকে তো তিনি কিছুই বোঝেননি। এরকম কথা জেনেও জেনথিপি ঝগড়া করেননি, একবার তাকে বলেনওনি, এটি তো তার চরিত্রের সাথে মিলে না।

সক্রেটিস বললেন, তাহলে ঘটনা শোনো, তুমি জানো এথেন্সে একবার আইন হলো, বেশি বেশি সন্তান নিতে হবে। মানুষ বাড়াতে হবে। কিন্তু সন্তান হবে কী করে, মেয়েদের বিয়ে হয় না। মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। যুদ্ধে, প্লেগে ছেলেরা মারা গেছে। মেয়েরা রয়ে গেছে। তখন সরকার সিদ্ধান্ত নিল, ছেলেদের বেশি বেশি বিয়ে করতে হবে। সেই সময়

আমার বয়স প্রায় তেষট্টি। তোমার দ্বিতীয় ছেলে হলো। সরকারি লোকজন এসে বলল, বুড়ো তুমি তো এখনও জোয়ান আছ, তুমি একটি বিয়ে করে ফেল। উচ্চঘরের মেয়ে। মেয়ের বাবা এথেন্সের গণতন্ত্রের নেতা ছিলেন। আমি দেখলাম, এই লোকগুলো নাছোড়বান্দা। তাই মেয়েটিকে দেখতে গেলাম। গিয়ে তাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললাম। সরকারি লোকেদের বললাম, মাফ করো। আমি একটি বিয়েই সামলাতে পারি না। আর একটি করলে জানে-প্রাণে মারা যাব। আমি বিয়ে করলাম না। কিন্তু লোকে ছড়িয়ে দিল যে, সক্রেটিস দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন।

জেনথিপি জানেন যে সক্রেটিস দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। নিজেই সরে এসেছিলেন। তবু সক্রেটিসের মুখ থেকে শুনে ভালো লাগল। তার মনে অনেক দিনের একটি চিনচিনে ব্যথা ছিল। সেটি চলে গেল। মরণের আগের রাতে স্বামী না বুঝেই অনেক গভীর একটি ব্যথা কমিয়ে দিয়ে গেল।

জেনথিপি ভাবছেন, শুধু শুধু অভিমান করে কষ্টটা মনে পুষে রেখেছিলাম। আগে জিজ্ঞেস করলে, আগেই মিটে যেত। তিনি ভেবে দেখছেন, তিনি আসলে সারা জীবন সবকিছুতেই সক্রেটিসের সাথে অভিমান করে গেছেন। তাই দাম্পত্যের অনেক কিছুই উপভোগ করতে পারেননি। আজ শেষ রাতে তার অনেক কিছু মনে পড়তে লাগল। স্বামীর সাথে কত খারাপ ব্যবহার করেছেন। অকারণে রাগ করেছেন। গালি দিয়েছেন। এক-একটি ঘটনা মনে পড়ছে, আর কান্না পাচ্ছে। জেনথিপি কাঁদছেন। সারা জীবনের রাগের জন্য কাঁদছেন।

সক্রেটিস অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারছেন না। সারা জীবনের অপরাধ এক রাতের কান্নায় ভাসিয়ে দিতে চাইছেন জেনথিপি। কিন্তু সেটির কোনো দরকার নেই। তার ওপর সক্রেটিসের কোনো রাগ নেই। বরং সক্রেটিস ভাবছেন— সারা জীবন এই মেয়েটিকেই শুধু কষ্ট দিয়েছেন। দুনিয়ার সব মানুষের জন্য সুন্দর জীবন খুঁজেছেন। শুধু জেনথিপিকে দিয়েছেন একটি অসুন্দর জীবন। সক্রেটিসেরও কান্না পাচ্ছে।

দুজন দুজনের দুঃখে কাঁদছেন। রাত বয়ে চলছে। একটি ঝিরঝির বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খুব কাছেই একটি কুকুর ডাকছে। মনে হচ্ছে কুকুরটিও কাঁদছে। কুকুরের মতো প্রাণীদেরও কি বিরহ আছে? সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে একলা ফেলে চলে যাওয়ার বেদনা আছে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। জেনথিপি বারবার বাইরে তাকাচ্ছেন। তার ভয়— কখন যেন আকাশ ফরসা হয়ে যায়! রাতটি শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ সক্রেটিস বললেন, তুমি কখনো হেমলক গাছ দেখেছো?

জেনথিপি হেমলক গাছ দেখেননি।

সক্রেটিস বললেন, এই জেলখানার দারোয়ানের খুব আগ্রহ সে আমাকে হেমলক গাছ দেখাবে। আজ রাতেই আনার কথা। তুমি আছ বলে ঢোকার সাহস পায়নি। দাঁড়াও ডাক

দিই।

জেনথিপি বললেন, এত রাতে ঘুমিয়ে লোকটা ঘুম আছে নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস বললেন, ও রাতের দারোয়ান। ওর কাজই রাতে জেগে থাকা। আমি প্রতি রাতে ওর সাথে কথা বলি।

কিছুক্ষণ পরেই দারোয়ান এলো। তার হাতে একটি হেমলক গাছের ডাল। সে হাতে দস্তানা পরেছে। এই গাছ মারাত্মক বিষ। গাছের কোনো অংশে হাত লাগালেও বিপদ।

দ্বাররক্ষী বলল, আমি এই গাছ নিয়ে আসছি সেই সন্ধ্যায়। আপনাকে একা পাইনি।

সক্রেটিস আর জেনথিপি দেখছেন হেমলকের গাছের ডাল।

দ্বাররক্ষী খুব উৎসাহ নিয়ে দেখাচ্ছে। সে এই গাছের একজন বিশেষজ্ঞ।

সে বলল, এই যে দেখেন, চিকন ডাঁটার মতো একটি কাণ্ড। কাণ্ডের দুপাশে সমান পাতা। পাতাগুলো উজ্জ্বল সবুজ। গাজরের পাতার মতো। শুধু কাণ্ডের নিচের দিকে একটু বেগুনি ছিটছিট আছে। একটু লালচে ফোঁটা ফোঁটা দাগও আছে।

সক্রেটিস বললেন, বিষ হয় কোনখানে?

দ্বাররক্ষী বলল, সারা গাছই বিষ। যেখানে যত রস হয়, সব বিষ। পাতায় বিষ, ডাঁটে বিষ, ফুলেও বিষ। হেমলক ফুল হয় সাদা সাদা। ফুলগুলো কুট্টি কুট্টি ছাতির মতো। ফুলে রস হয়। তবে সেই রসের বিষ তত ভালো নয়। সবচেয়ে ভালো বিষ হয় ফলের রসে। হেমলক ফল ছোট্ট ছোট্ট বাদামি রঙের। গ্রীষ্মের শেষে ফল ধরে।

সক্রেটিস বললেন, পুরো গাছটি দেখতে কেমন?

দ্বাররক্ষী বলল, গাছটি বেশি লম্বা হয় না। বেশি হলে মানুষের সমান উঁচু হতে পারে। আপনি তো বেশি লম্বা নন। হেমলক গাছ আপনার চেয়ে অল্প একটু লম্বা হতে পারে।

সক্রেটিস হাসতে হাসতে বললেন, এটি একটি কথার মতো কথা বলেছ। হেমলক গাছ লম্বায় সক্রেটিসের চেয়ে বড়। সক্রেটিসের উচ্চতা হেমলকের চেয়ে কম।

সক্রেটিসের ইঙ্গিত দ্বাররক্ষী বুঝতে পারল না। সে মহাউৎসাহে হেমলকের বিবরণ দিচ্ছে। এই গাছ কোথায় হয়, কীভাবে চাষ করা লাগে, সবকিছুর বিবরণ দিচ্ছে। তার বিবরণে মনে হচ্ছে, আগামীকাল সকালে উঠেই সক্রেটিস হেমলক গাছ চাষ করবেন।

সক্রেটিস মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। হেমলকের সাথে তার নাম যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। হেমলক গাছটি সম্পর্কে জানা দরকার।

জেনথিপি বললেন, এই গাছে যে বিষ হয়, তা বোঝার কোনো উপায় নেই। অন্যান্য সাধারণ গাছের মতোই। বাগানে দেখলে তো চিনতাম না যে, এটি বিষ গাছ।

দ্বাররক্ষী বলল, হ, একেবারে মানুষের মতোই। কোনটা অমৃত-মানুষ আর কোনটা বিষ-মানুষ সেটি বোঝা যায় না।

সক্রেটিস তার ব্যাখ্যায় খুব খুশি হলেন। কথাটা দার্শনিকের মতো।

দ্বাররক্ষী চলে গেলেও সক্রেটিস অনেকক্ষণ ধরে হেমলক নিয়ে কথা বলছেন। এলোমেলো কথা। জেনথিপি তাকালেন সক্রেটিসের দিকে। সক্রেটিস হেমলকে মগ্ন হয়ে আছেন। এই গাছের রসে কাল তার মৃত্যু হবে।

সক্রেটিস মজা করে বারবার বলছেন, হেমলক গাছ লম্বায় সক্রেটিসের চেয়ে বড়। এই গাছে সাদা ফুল হয়। সবচেয়ে ভালো বিষ হয় হেমলক ফল থেকে।

জেনথিপির মনে হচ্ছে সক্রেটিসের ঘুম দরকার। তিনি জোর করে সক্রেটিসকে ঘুম পাড়াতে চাইছেন। তার মনে পড়ছে বিয়ের রাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাদের প্রথম রাতে জেগেছিলেন সক্রেটিস। আজ শেষ রাত। সক্রেটিস ঘুমাক। জেগে থাকবেন জেনথিপি।

৫৮

‘মানুষ যখন আলোকে ভয় পায়,
তার চেয়ে ট্রাজেডি আর কিছু হতে পারে না।’
—সক্রেটিস

আকাশের পুব-কোণটা একটু লালচে হয়েছে মাত্র।

এখনও ভোরের আলো ফোটেনি। জেলগেট মোটামুটি লোকারণ্য। বেশিরভাগই তরুণ। জেলখানার দরজায় অনেকেই ছুটে এসেছে কাক-ডাকার আগেই। শনশন বাতাস বইছে। একটু ঠাণ্ডাও আছে। একটি কাক ডাকছে। চারদিকে থমথমে একটি ভাব। সবার মুখ বিষণ্ন। আজ সক্রেটিসের জীবনের শেষ দিন[১৩৯]।

এখনও জেলখানার দরজা খোলেনি। তরুণরা অপেক্ষা করছে। জেলের দরজা খুললেই সক্রেটিসের একেবারে মুখের সামনে গিয়ে বসবে। শেষ দিনে কোনো কথা মিস করা যাবে না।

দারোয়ান দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে সবাই ঢুকে পড়ল। ঢুকেই থতমত খেলো। ভেতরে যে জেনথিপি আছেন, তারা জানত না। সক্রেটিসের স্ত্রীকে তারা চেনে না। শুধু নাম শুনেছে। কোনোদিন চোখে দেখেনি। কী করতে হবে বুঝতে পারছে না।

সক্রেটিস আর জেনথিপি বিছানায় বসে আছেন। এখনও বিছানায় পাশাপাশি দুটি বালিশ। দাম্পত্যের শেষ চিহ্ন। সক্রেটিসের মুখে হাসি। জেনথিপির মুখ শুকনো। ছোট ছেলেটি মেঝেতে ঘুমাচ্ছে। সে জানে না আজ তার বাবার জীবনের শেষ দিন। জেলখানায় ঢুকে তরুণদের মনে হচ্ছে তারা সক্রেটিসের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে।

সক্রেটিস হাসিমুখে বললেন, এসো, বন্ধুরা। শেষ দিনের প্রথম সূর্যকে বরণ করি।

সবাই সূর্য খোঁজ করতে শুরু করল। এই ঘর থেকে সূর্য দেখা যায় না। কোনো জাগলা নেই। তবু সবাই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সূর্যকে বরণ করতে হবে। সক্রেটিস নিজের মুখে বলেছেন। মরণের দিন তার কথা রাখতেই হবে। সবাই প্রাণপণে সূর্যকে দেখতে চেষ্টা করছে। কেউই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু এমন ভাব করছে, যেন সবাই দেখতে পাচ্ছে। যেন আজকে আকাশে কয়েকটা সূর্য উঠেছে।

সক্রেটিস বললেন, জেলের ঘর থেকে তো সূর্য দেখা যাবে না। আমি মনের সূর্যকে বরণ করতে বলেছি।

সকলে বুঝল সক্রেটিস বদলায়নি। মরণের দিনটিও তিনি হাসি-ঠাট্টা দিয়ে দিন শুরু করবেন। তিনি দুঃখকে প্রশ্রয় দেন না। জীবনের শেষ দিনেও না। তার ঠাট্টায় তরুণদের ভ্যাবাচ্যাকা ভাব কেটে গেল।

কিন্তু জেনথিপি হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে পারছেন না। মন খুব খারাপ। সকাল থেকেই তিনি এই ঘরে কেমন একটি গন্ধ পাচ্ছেন। এটিই মনে হয় মৃত্যু গন্ধ। মরণের আগে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। তিনি ভেবেছিলেন, সময় হলে সক্রেটিসকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কোনো গন্ধ পাচ্ছেন কিনা। সেই সময় আর হলো না। আলো না ফুটতেই রাজ্যের ছেলেপেলে ঘরে ঢুকে গেছে। তারা এখন জ্ঞানের কথা বলবে। এটি এখন দর্শনের স্কুল। শেষ দিনের স্কুল তারা কামাই করবে না। সক্রেটিস তাদের নিয়ে মেতে উঠেছেন।

হঠাৎ বুক ফেটে কান্না পেল জেনথিপির। মৃত্যু গন্ধটা তাকে উতলা করে তুলেছে। জেনথিপি কোনোকিছুই ধীরে-সুস্থে করতে পারেন না। তিনি চিৎকার করে কান্না শুরু করলেন।

জেনথিপির কান্না সবাইকে ছুঁতে শুরু করেছে। সবাই মনে হয় মৃত্যু গন্ধটা পাচ্ছে। সবার মুখে গম্ভীর হয়ে গেল। সক্রেটিস দেখলেন, সর্বনাশ, কখন যেন জেনথিপির সাথে সবাই কান্না শুরু করে! কান্নার কোরাস হয়ে যাবে। সেটি হতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু কী বলা যায়? সক্রেটিস অনেক যুক্তি জানেন। কিন্তু যে মেয়ের স্বামী একটু পরে মারা যাবে, তাকে কান্না থামাতে বলার মতো যুক্তি সক্রেটিসের জানা নেই।

জেনথিপির দিকে এগিয়ে গেল ক্রিতোর ছেলে ক্রিতোবুলাস। ক্রিতো এখনও আসেননি। ছেলে ক্রিতোবুলাস সকালের খাবার নিয়ে এসেছে। এই ছেলেটি জেনথিপিকে মায়ের মতো দেখে। জেনথিপিরও তার কাছে লজ্জা নেই। ক্রিতোবুলাস জেনথিপিকে একটি রুমাল দিল

জেনথিপি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছেন, ও সক্রেটিস, বন্ধুদের সাথে এই আপনার শেষ কথা। এই শেষ দেখা। আর কোনোদিন তর্ক করতে পারবেন না। আর কোনোদিন একসাথে আগোরায় বসবেন না। আড্ডা দেবেন না। এথেন্স যেমন আছে, তেমনই থাকবে। ঐ আগোরা থাকবে, আড্ডা থাকবে। শুধু সক্রেটিস থাকবেন না।

তরুণরা হায় হায় করছে। এক্ষুনি কান্নার কোরাস শুরু হবে।

সক্রেটিস তাড়াতাড়ি বললেন, তুমি এখন বাড়ি যাও। বিকেলে আবার এসো। এখানে অনেক মানুষ, আরও ছেলেরা আসবে। সবাই কান্নাকাটি করলে জেলখানার দারোয়ান ঝামেলা করবে। তুমি যাও।

ক্রিতোবুলাস জেনথিপিকে বলল, চলেন, আমি আর সক্রোনিকাস আপনাকে বাসায় দিয়ে আসি।

জেনথিপি বেরিয়ে গেলেন। তার মনে হচ্ছে— মরণ গন্ধটা তার সাথে সাথেই যাচ্ছে। গন্ধটা নাকে যেতেই তিনি কেঁপে উঠছেন। কেঁপে কেঁপে কাঁদছেন। তার সাথে কোলের ছেলেটাও কাঁদছে।

সক্রেটিস সবাইকে নিয়ে বসলেন। তাকে ঘিরে চারদিকে অনেক তরুণ। তার ডান দিকে একটি নিচু টুলের উপর বসে আছে ফিদো। তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন সক্রেটিস। খুবই সুন্দর চেহারা ছেলেটির। নাক, চোখ সব টানাটানা। তার চুলের বড় বাহার। লম্বা রেশমি চুল কাঁধের দুদিকে ঝুলে থাকে। ছেলেটিকে সক্রেটিস খুব পছন্দ করেন। এই ফিদোকে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি ফিদোর লম্বা চুল টেনে সব সময় রসিকতা করেন। আজও হাত বাড়িয়েই ফিদোর সুন্দর পশমি চুল ধরলেন সক্রেটিস। বললেন, চুলের এই কাটিং-এর নাম কী?

ফিদো বলল, এই কাটিং-এর নাম স্পার্টান জিউস।

'আরে বাবা! তুমি এথেন্সের শত্রু স্পার্টানদের কাটিং করেছ? তবু ওরা তোমার নামে মামলা দিল না। মামলা দিল আমার নামে? দেখো আমার চুল একেবারে সোজা। পুরাপুরি এথেন্স-কাটিং। এক গাছা চুলেও স্পার্টা-কাটিং নেই। তাও আমার নামেই মামলা দিল। তোমাকে কিছুই বলল না। তোমার চেহারা ভালো তো!'

ফিদো বলল, ঘটনা হলো— আমার চুল শুধু স্পার্টান কাটিং নয়, স্পার্টান জিউস কাটিং। চুলের আগায় দেবতা জিউস আছেন। জিউসের নামে মামলা করতে কেউ সাহস পাবে না।

সবাই হেসে উঠল।

সক্রেটিস বললেন, জিউস বুড়ো হয়ে গেছে। বুড়ো জিউসের কাটিং-এর এখন আর চল নাই। তোমার বাবরি চুল কেটে ফেলো।

'আমি সত্যিই কাল চুল কেটে ফেলব। সক্রেটিস মারা যাবে। আমি তো কিচ্ছু করতে পারব না। তাই শোকের চিহ্ন বোঝাতে চুল কেটে ফেলব।

সক্রেটিস বললেন, না না, ফিদো। আমি ঠাট্টা করছিলাম। পাগলামি কোরো না। চুল-টুল কেটে কোনো লাভ নেই। সক্রেটিসের প্রতি শোক জানাতে চাইলে তার মতো করে চলতে হবে। সত্য ও ন্যায় পথে থাকতে হবে। আচ্ছা, আমাদের আরেক চুলওয়ালা প্লেটো কেমন আছে? তারও তো স্পার্টান কাটিং।

ফিদো বলল, প্লেটো খুবই অসুস্থ। একেবারে শয্যাশায়ী। বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। সে খুব কাঁদছিল।

'কাঁদছিল? আহা, এত বড় ছেলে কাঁদছে! অসুখ খুব শক্ত মনে হয়। খুব ব্যথা-বেদনা আছে।

'না না, প্লেটো নিজের ব্যথায় কাঁদেনি। আপনার শেষ দিনে আসতে পারছে না। সেজন্য প্লেটো কাঁদছিল।'

'আহা বেচারা।'

'আমি তাকে ভালো করে বলে এসেছি। কীভাবে সক্রেটিস মারা যাবে— সেটি আমি তাকে বলব। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে বলব।'

‘ও, তুমি তাহলে ধারাভাষ্যকার। সক্রেটিসের মৃত্যুদৃশ্যের ধারাভাষ্যকার কী সৌভাগ্য আমার! কীভাবে মারা যাচ্ছি, সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। ফিদো, তুমি তো ছবি আঁকতে পার। এর চেয়ে কয়েকটা ছবি এঁকে দেখিয়ে দিও প্লেটোকে। ধরো, একটি ছবি আঁকলে— আমি হেমলক মুখে দিয়েছি, আর জিহ্বাটা পুরো এক হাত বের হয়ে গেছে। পারবে না আঁকতে?’

ফিদো বলল, এরকম রসিকতা করলে, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব।

‘না না, তুমি আর কেঁদো না বাপু। ঐ দেখো একজন কেঁদে পুরো জেলখানা ভাসিয়ে দিচ্ছে।’

ফিদো দেখল, এক কোনায় একটি ছেলে কাঁদছে। ফিদো ছেলেটিকে চেনে। তার নাম এপোলোদোরাস।

সক্রেটিস বললেন, ওকে থামতে বলো। ওর চোখের পানিতে তো বন্যা হয়ে যাবে। এথেন্স এখন গরিব হয়ে গেছে। বন্যার পানি নিষ্কাসনের টাকা নেই। শেষে নিজের চোখের জলের বন্যায় নিজেই ভেসে যাবে।

সক্রেটিসের রসিকতায় এপোলোদোরাস আর জোরে কাঁদতে লাগল। মনে হচ্ছে চোখের পানিতে বন্যা করেই ছাড়বে। সক্রেটিসের মামলার যেদিন রায় হলো, সেদিন আদালতেও এপোলোদোরাস কেঁদে ভাসিয়েছিল।

ক্রিতোর সাথে ঘরে ঢুকল সিমিয়াস আরও সিবিজ। তাদের বাড়ি থিবস নগরে। তারা সক্রেটিসের বিরাট ভক্ত। শুধু সক্রেটিসকে দেখার জন্যই এতদূর থেকে এসেছে।

সক্রেটিস বললেন, এসো, তোমরা দেখো, দুইজন ধনী লোক এসেছে। এরা টাকার জোরে এথেন্সের আসামিদের ছাড়িয়ে নিতে চায়।

সিবিজ বলল, আসামি যদি সক্রেটিস হয়, তাহলে শুধু টাকা নয়, জীবন দিয়ে হলেও ছাড়িয়ে নিতে চাই।

ক্রিতো বললেন, ধন আর জ্ঞান একসাথে আছে, এমন লোক পৃথিবীতে খুব কম। এই দুজন একসাথে ধনী আর জ্ঞানী। এরা থিবস নগরের অহংকার।

সক্রেটিস বললেন, থিবসের নাম উঠলেই ‘রাজা ইদিপাস’ নাটকটার কথা মনে পড়ে। সফোক্লিস লিখেছিলেন। বড় সুন্দর করে লিখেছেন। তার চেয়েও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। সেই নাটক দেখে সবাই কেঁদেছে।

সিমিয়াস বলল, হ্যাঁ, আমাদের ওখানেও ‘রাজা ইদিপাস’ অভিনীত হয়েছে। সেখানেও অনেক জনপ্রিয় হয়েছে। ওখানে এখনও সফোক্লিসের অনেক সম্মান। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, সফোক্লিস মারা গেছেন, তাও লোকে মুখে মুখে তার নাম বলে।

সিবিজ বলল, কত বছর হলো সফোক্লিস মারা গেছেন?

ক্রিতো বললেন, এই গ্রীষ্মে সাত বছরে পড়ল।

ফিদো বলল, সবাই মারা যাচ্ছে। সব মহান মানুষ চলে যাচ্ছেন। আজ চলে যাবেন পৃথিবীর সবচেয়ে মহান মানুষ।

আবার পরিবেশ দুঃখ দুঃখ হয়ে গেল। সক্রেটিস বললেন, এত চিন্তা করছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব।

'ফিরে আসব মানে?'

'মানে, আমার আত্মা ফিরে আসবে। মরার পর আসবে।'

সিবিজ বলল, এরকম কথা আপনার মুখে আগে শুনিনি।

সক্রেটিস বললেন, এসো তাহলে মৃত্যুর পরে কী হবে— সেটি নিয়ে আলাপ করি।

শুরু হলো আলাপ। অনেকক্ষণ ধরে চলল যুক্তি, পাল্টা যুক্তি।

সক্রেটিস বলছেন, তিনি ফিরে আসবেন। দেহ আর আত্মা দুটো ভিন্ন জিনিস। মৃত্যুর সাথে সাথে দেহ নষ্ট হয়ে যায়। আত্মা নষ্ট হয় না, আত্মা অমর। আত্মা অন্য দেহ হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। দেহ মরণশীল, আত্মা মরণশীল নয়। মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার মরণশীল অংশ মারা যায়, মানে দেহ শেষ হয়। কিন্তু অমরণশীল অংশ মানে আত্মার কিছু হয় না। আত্মা আবার ফিরে আসে। অন্য রূপে আসে। সেজন্য আমি আবার ফিরে আসব[১৪০]।

আলাপ চলছে, মাঝখানে একটু লাঞ্চ বিরতি। বিরতির পর আবার চলছে। সিমিয়াস আর সিবিসই আজ সক্রেটিসের সাথে কথা বলছে। অন্যদের সুযোগই দিচ্ছে না। বিষয় একটিই— মৃত্যুর পর কী ঘটনা ঘটে। আত্মা কি ফিরে আসে?

সক্রেটিস এই ব্যাপারে আজ একেবারে নিঃসন্দেহ। আত্মা ফিরে আসে। নতুন করে নতুন দেহে এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। অন্য সময় আলোচনায় সক্রেটিস শেষ কথা বলেন না। তিনি শুধু প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন থেকেই সমাধান বের হয়। আজ তিনি নিজেই শেষ কথা বলে দিচ্ছেন।

চলছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। হঠাৎ সিবিস বলল, আপনি তো সারা জীবন প্রশ্ন করলেন, এত প্রশ্ন করে লাভ কী হলো?

সক্রেটিস মিষ্টি স্বরে বললেন, এই প্রশ্নের পর প্রশ্নকে ওরা বলে 'সক্রেটিক মেথড'। এই মেথডে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সত্য বের হয়ে আসে, তাতে আমাদের সবার লাভ। তবে আমার অন্য একটি লাভ আছে। প্রশ্ন করে করে যখন সত্যটা বুঝতে পারি, তখন আমি শুদ্ধ হই, আমার ভেতরের অশুভ বস্তু বের হয়ে যায়, আমি নতুন করে জেগে উঠি, পরিশুদ্ধ হই।

কে বলবে— এই মানুষটা একটু পরে বিষ পান করবে। বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নীল হয়ে যাবে। তার কোনো রকম চিন্তা হচ্ছে বলে মনে হয় না।

কাল রাতে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। জেনিথিপিকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছিলেন, বিষে কি সারা শরীর নীল হয়ে যায়? জেনথিপি বলেছিলেন, এই বিষে বেশি নীল হয় না।

তবে ভয়ে নাকি অনেকেই খেতে পারে না। খাওয়ার সময় বমি করে দেয়। হেমলক নাকি খুবই বিস্বাদ।

বিষের স্বাদ কেমন? এর উত্তর কি কেউ জানে? বিষ খেয়ে বেঁচে আছে এমন কেউ ছাড়া এর উত্তর দিতে পারবে না। এটি নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। কাল রাতে ভয় করছিল। আজ আর কোনো ভয় করছে না।

ভয় না করার কারণ সক্রেটিস জানেন। তরুণরা সামনে থাকলে তিনি অন্য রকম। তরুণদের সামনের সক্রেটিসই আসল সক্রেটিস। তখন তার রক্ত টগবগ করে ওঠে। ফুঁ দিয়ে সবকিছু উড়িয়ে দিতে পারেন।

বেলা পড়ে এসেছে। সময় শেষ হয়ে এলো।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে সক্রেটিস বললেন, ট্র্যাজেডি নাটকের শেষ দৃশ্যে নায়করা বলে, 'ভাইয়েরা, নিয়তির ডাক এসে গেছে'। আমি কি সে রকম কিছু বলব?

সবাই চুপ।

সক্রেটিস বললেন, আমি গোসল করব। দেহ-মন পবিত্র হবে। পবিত্র শরীরে বিষ খাব। মৃত্যুর পর আর গোসল করানো লাগবে না। মহিলাদেরকে একটি মৃতদেহ গোসল করানোর কষ্ট দিতে চাই না।

ক্রিতো বললেন, আমাদের জন্য আর কোনো আদেশ আছে?

সক্রেটিস বললেন, নতুন কিছু নয়। যা সব সময় বলি, নিজেকে জানো। নিজেকে জানতে পারলেই সুন্দর জীবন হবে।

ক্রিতো বললেন, কথা দিলাম— আমরা সবাই চেষ্টা করব। এখন বলো— তোমার দেহ কীভাবে সৎকার হবে?

'তোমাদের যা খুশি। কবর দিতে পার। দাহও করতে পার। তখন তো আমি আর সক্রেটিস থাকব না। হয়ে যাব লাশ। তুমি আগুনে জ্বালো আর কবরে শোয়াও, লাশ লাফ দিয়ে বলবে না যে— ঐ ক্রিতো, তুমি সক্রেটিসকে এটি করেছ কেন? তাই যা ভালো মনে কর নিশ্চিন্তে করো।'

জেনথিপিকে নিয়ে আসার জন্য ক্রিতোকে বললেন সক্রেটিস। তারপর গোসলখানায় ঢুকে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনথিপি চলে এলেন। সাথে তাদের তিন ছেলে এবং পাড়ার মেয়েরা। সক্রেটিস ছেলেদের জড়িয়ে ধরলেন। তাদের মাথায় হাত রাখলেন।

জেনথিপিকে কী বলবেন বুঝতে পারছেন না সক্রেটিস।

সময় বেশি নেই। ঠিক সূর্যাস্তের পরেই বিষ খেতে হবে। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। কিছু না বলেই অনেক কিছু বলছেন দুজনে।

জেনিথিপি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোনো গন্ধ পাচ্ছেন?

সক্রেটিস বললেন, গন্ধ? জেলের কুঠুরি অপরিষ্কার। গন্ধ তো হবেই।

'না না, অন্য রকম গন্ধ। একটি মরণ মরণ গন্ধ।'

'মরণ মরণ গন্ধ? তুমি ভুল-ভাল দেখছ। ভুল গন্ধ পাচ্ছ। বেশি চিন্তা কোরো না। শোনো, হেমলকের গন্ধ হলো ইঁদুরের মতো গন্ধ। মরণ গন্ধ বলতে কোনো জিনিস নেই।'

এই কথাটা বলার কিছুক্ষণ পরেই সক্রেটিস কেমন একটা গন্ধ পেতে শুরু করলেন। রাগ হলো জেনথিপির উপর। কী সব গন্ধের কথা বলে তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে! এসব মন থেকে দূরে রাখতে তিনি ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। ক্রিতোকে ডেকে ছেলেদের নিয়ে তার পরিকল্পনার কথা আরম্ভ করলেন।

জেনথিপি কাঁদছেন। কখনো আস্তে, কখনো জোরে।

সক্রেটিস ভাবছেন তিনি মারা যাওয়ার পর জেনথিপি যে চিৎকার করে কাঁদবে, তাতে মানুষের কাছে সম্মান যাবে। তার চেয়ে জেনথিপি মেয়েদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যাক।

কথাটা ভয়ে ভয়ে বলতেই জেনথিপি রাজি হয়ে গেলেন। তিনি নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। তার চোখে কোনো পানি নেই। নেই কোনো অভিমান আর কিছুক্ষণ পরে তার স্বামী চিরতরে চলে যাবেন। স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি সামনে থাকবেন না। তার তেত্রিশ বছরের সংসার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনটি নাবালক সন্তান নিয়ে কীভাবে চলবে, তাও জানেন না। তবু জেনথিপি নীরবে বের হয়ে যাচ্ছেন। কারাগারের ছোট্ট কুঠুরিরে রয়ে যাচ্ছে তার সংসারের শেষ চিহ্ন। সেই চিহ্ন পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছেন জেনথিপি। জেলখানার বাইরে এখন অনেক লোক। সবাই সক্রেটিসের মৃত্যুর খবর নিতে এসেছে। তাদের সামনে দিয়ে নীরবে হেঁটে যাচ্ছেন জেনথিপি।

সক্রেটিসের মৃত্যুর সময় জেনথিপির না থাকলেও চলবে। সক্রেটিস সারা জীবন মানুষের জন্য ভেবেছেন। মানুষের জীবন সুন্দর করতে চেয়েছেন। তাই তার জীবনের শেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকুক হাজারো মানুষ। সেখানে জেনথিপির কোনো প্রয়োজন নেই। জেনথিপি একবার পেছন ফিরে তাকালেন। যদি একবার সক্রেটিসকে দেখা যায়! না, এখান থেকে জেলখানার ছোট্ট কুঠুরির ভেতরে সক্রেটিসকে দেখা যায় না। এবার বুক ফেটে কান্না এলো জেনথিপির এই জীবনে স্বামীকে আর জীবিত দেখতে পাবেন না। স্বামীর সাথে তার হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে গেছে। তিনি চারদিকে তাকালেন। জেলখানার বাইরে শত শত মানুষ। তাদের সবার মুখে একটিই শব্দ— সক্রেটিস। অনেকেই কান্না শুরু করে দিয়েছে। তাদের অশ্রুভরা মুখের দিকে তাকিয়ে জেনথিপির মনে হলো— যে মানুষটির জন্য এত লোক কাঁদছে, তিনি নিশ্চয়ই এই মানুষদের কিছু না কিছু দিয়েছেন। তাহলে সক্রেটিসের সুন্দর জীবনের সাধনা সার্থক হয়েছে। তার জন্য সবাই কাঁদছে। এখানে সবাইকে দেখিয়ে জেনথিপির কান্নার দরকার নেই। জেনথিপি ভেতরে ভেতরে কাঁদছেন। সেই কান্না তার একান্ত কান্না। সেই কান্না কেউ দেখবে না। জেনথিপি আকাশের দিকে তাকালেন। দিন প্রায় শেষ।

হেমলক পানের সময় হয়ে এসেছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জেলখানার বিষ- জল্লাদ হেমলক নিয়ে হাজির। তার হাত কাঁপছে। তার থেকে হেমলকের পেয়ালাটি নিলেন সক্রেটিস। তার হাত একটুও কাঁপছে না।

এক্ষুনি গিলে ফেলতে হবে।

সারা ঘর স্তব্ধ। একেবারে নীরব। মনে হচ্ছে জেলের ছোট্ট কুঠুরির বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ নিশ্বাসও নিচ্ছে না। মনে হচ্ছে এথেন্সের দেবতারাও চুপ হয়ে গেছেন। দেবতাদের নাম করে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। ধর্মের নামে প্রাণ নেওয়া হচ্ছে এমন এক মানুষের যিনি সারা জীবন মানুষকে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, ন্যায় পথে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

সক্রেটিস হেমলক ভরা পেয়ালার দিকে তাকালেন। তরল হেমলকের উপর তার মুখের ছবি ভেসে উঠেছে। সেই মুখে তাকাতেই মনে হলো হেমলকের উপর ভেসে উঠেছে তার সারা জীবন। তিনি দেখছেন— একলা পাহাড়ের ঢালে বসে মানুষের জন্য চিন্তা করছেন সক্রেটিস, এথেন্সের পথে পথে খালি পায়ে তরুণদের বোঝাচ্ছেন, সুন্দর জীবনের উপায় বলছেন। হেমলক পাত্রে একের পর এক দৃশ্য ভেসে উঠছে। মামলার ছবি, ক্রিতো, জেনথিপি, তার সন্তানদের মুখ সব ভেসে উঠছে। বিষ আয়না হয়ে উঠেছে। বিষ যেন কথা বলছে।

না না, এই দৃশ্য কিছুতেই দেখা যাবে না। কিছুতেই দুর্বল হওয়া যাবে না। সত্য ও ন্যায়ের জন্য সারা জীবন কাজ করেছি। হাসি মুখেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। তিনি হেমলক বিষ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। তারপর পাত্রটি মুখে কাছের নিতেই একটি তীব্র গন্ধ পেলেন। বিষের গন্ধ? নাকি এটিই মৃত্যুর গন্ধ? তিনি আর কিছু ভাববেন না। বিষের বাটি ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। তারপর দম বন্ধ করে এক চুমুকে শেষ করে দিলেন। তার মুখ একটু বাঁকাল না। কোনো শব্দ করলেন না। বিষের বাটি খালি করে দিলেন।

সবাই হায় হায় করে উঠল। সবাই কেঁদে ফেলল। এপোলোদোরাস চিৎকার করে কাঁদছে। তার সাথে সবাই যোগ দিয়েছে। ক্রিতোও শব্দ করে কাঁদছেন। ফিদো চোখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। এতক্ষণে কান্নার কোরাস শুরু হয়েছে। এই কান্না কি মধুর? সবাই তার জন্য কাঁদছে। প্রিয়জনের কান্না দেখতে দেখতে মরতে পারা অবশ্যই ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু কান্না তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। হয়তো তিনিও কেঁদে ফেলবেন। সেটি হতে দেওয়া যাবে না।

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, কী করছ তোমরা? এমন কিছু করবে বলেই আমি জেনথিপিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমরাও অমন শুরু করলে? শান্ত হও, শক্ত হও।

কান্নার রোল একটু কমলো।

সক্রেটিস বিষ-জল্লাদকে বললেন, এবার আমায় কী করতে হবে?

জল্লাদ বলল, জোরে জোরে হাঁটতে হবে। যখন পা ভারী হয়ে আসবে তখন বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে।

জল্লাদের কথা মতো সক্রেটিস হাঁটতে শুরু করলেন। এক পেট বিষ নিয়ে কারাগারের ছোট্ট ঘরে হাঁটছেন সক্রেটিস। প্রতি পদক্ষেপের সাথে পেটের বিষ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। রক্তের শিরা-উপশিরা দিয়ে বিষ যাচ্ছে। বিষের যাওয়া তিনি টের পাচ্ছেন। তার বুক জ্বলছে। হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলছেন না। শান্তভাবে হাঁটছেন। অনেক কষ্টে মুখ চেপে রেখেছেন। এই বুঝি আর্তনাদ করে উঠবেন। মনে হচ্ছে, আর চলতে পারছেন না। পা দুটো ভারী হয়ে আসছে। শরীর অবশ অবশ লাগছে।

সক্রেটিস বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

জল্লাদ তার পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, টের পাচ্ছেন?

সক্রেটিস বললেন, না।

জল্লাদ চাপ দিতে দিতে পায়ের উপরের দিকে উঠতে লাগল। সক্রেটিস টের পাচ্ছেন না। তার পা অবশ হয়ে গেছে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

জল্লাদ বলল, বিষ হৃদপিণ্ডে পৌঁছে গেছে। আর দেরি নেই। সময় শেষ হয়ে এলো।

সক্রেটিসের বুক এখন তীব্রভাবে জ্বলছে। মনে হচ্ছে বুকের ভেতর কে যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে। তিনি শ্বাস নিতে পারছেন না। জোরে জোরে বাতাস টানছেন। এখন শুধু বুক ওঠানামা করছে। কোমর পর্যন্ত অবশ হয়ে গেছে। তিনি দাঁত চেপে আছেন। হঠাৎ মনে হচ্ছে আর পারছেন না, আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন।

সবাই সজোরে কেঁদে উঠল। এই বুঝি শেষ। সকলের দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ কাপড় সরিয়ে মুখ বের করলেন সক্রেটিস। স্পষ্ট স্বরে বললেন, ক্রিতো, সুস্থতার দেবতা এসক্লিপিয়াস আমাদের কাছে একটি মুরগি পাবে। তাকে দিয়ে দিও, ভুলো না কিন্তু।

এথেন্সের ধর্মভীরু মানুষেরা মৃত্যুর পরে আত্মার মুক্তির জন্য সুস্থতার দেবতাকে মুরগি উপহার দেয়। দেবতা খুশি হয়ে আত্মাকে মুক্ত করে দেন।

ক্রিতো ভাবছেন— সক্রেটিস দেবতাকে মুরগি উপহার দিতে বলছেন? এথেন্সের মানুষ বিচার করে প্রমাণ করেছে যে, সক্রেটিস দেবতা মানেন না, তিনি নাস্তিক। অথচ মৃত্যুর পূর্বে সক্রেটিস পুরোপুরি ধার্মিকের মতো বলছেন, আমি মরলে মনে করে দেবতাকে একটি মুরগি দিও। এর মানে কী? সক্রেটিস কী বোঝাতে চাইছেন যে, তিনি দেবতাদের অপমান করেন নি? তিনি নাস্তিক নন? নাকি তিনি সারা জীবন যেমন সবকিছু নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনই এটিও তার ব্যঙ্গ? মরার আগেও কি তিনি এথেন্সের বিচার আর ধর্মের নামে অধর্মকে ব্যঙ্গ করে গেলেন?

এর উত্তর ক্রিতো জানেন না। সক্রেটিস ছাড়া আর কেউ জানেন না। অন্য সময় হলে ক্রিতো অবশ্যই সক্রেটিসকে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু যে মানুষটি হেমলক পান করে বিষের জ্বালায় মুখ ঢেকে ছটফট করছেন, তাকে এসব প্রশ্ন করা যায় না।

ক্রিতো বললেন, অবশ্যই দেবতাকে মুরগি দেওয়া হবে, ভুল হবে না। আর কিছু বলবে, সক্রেটিস?

সক্রেটিসের কোনো সাড়া নেই। মুখটা কাপড়ে ঢাকা। সময়ের জলঘড়ি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়ছে সময়। সবাই তাকিয়ে আছে পলকহীন।

হঠাৎ তীব্রভাবে নড়ে উঠল সক্রেটিসের বিছানা। হাত, পা উপরের দিকে উঠে আসছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি তিনি বিছানা থেকে পড়ে যাবেন। মুখ তখনও ঢাকা। তারপর হঠাৎই সব নীরব। সব স্তব্ধ।

বিষ-জল্লাদ কাঁপা কাঁপা হাতে সক্রেটিসের মুখ থেকে কাপড় সরালেন। সক্রেটিসের চক্ষু পাথরের মতো স্থির। মুখ হা করে আছেন।

ক্রিতো সক্রেটিসের চোখ আর মুখ বন্ধ করে দিলেন। বিদায় নিলেন পৃথিবীর মহত্তম মানুষ। বিদায় নিলেন পৃথিবীর প্রথম শহিদ; যিনি পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় আর বাকস্বাধীনতাকে প্রথম স্পর্শ করেছিলেন।

সারা ঘরে কান্নার রোল। সক্রেটিসের সব বন্ধু একসাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আকাশ স্তব্ধ হয়ে গেছে। জেলখানার ভেতর প্রতিটি মানুষ কাঁদছে। বিষ-জল্লাদ বিলাপ করছে। জেলার সাহেব মাথা নিচু করে আছেন। তার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা পানি। জেলখানার বাইরে শত শত মানুষ— সবার চোখে পানি। এথেন্সের গণতন্ত্রের অশ্রু ঝরছে, সংসদের প্রতিটি পাথর কাঁদছে। বিচারকক্ষ, জলঘড়ি সব নিশ্চুপ হয়ে আছে। যেসব বিচারক সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, আজ তারাই সবচেয়ে বেশি কাঁদছেন।

ক্রিতো তাকিয়ে আছেন সক্রেটিসের মুখখানার দিকে। এই মুখ সারা জীবন সত্য আর সুন্দরের কথা বলে গেছেন, ভালোবাসার কথা বলে গেছেন। কিন্তু একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেননি। মরার পর সক্রেটিসের দেহ মাটি দেওয়া হবে, নাকি পোড়ানো হবে— সেই সিদ্ধান্ত সক্রেটিস ক্রিতোকে বলেননি। এটি ক্রিতোর উপর দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই বিশাল সিদ্ধান্ত ক্রিতো কীভাবে নেবেন? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানুষ একজনই আছেন, তিনি হলেন জেনথিপি।

কিন্তু কোথায় জেনথিপি? মৃত্যুর আগে সক্রেটিস তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সবাই ভেবেছিল জেনথিপি চিৎকার করে কাঁদবেন। কিন্তু জেনথিপি কাঁদেননি। বাড়ি ফিরে তিনি শুভ্র কাপড় পরে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন উঠানের জলপাই গাছের নিচে। এখন চলছেন কেরামিকাসের পথে। কেরামিকাসে এথেন্সের সমাধি। সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে সক্রেটিসের দেহ। পোড়ানো নাকি কবর? সেই সিদ্ধান্ত শুধুই জেনথিপির। সক্রেটিসের জীবনের কোনো সিদ্ধান্তই জেনথিপি নেননি। এই শেষ সিদ্ধান্তটি তিনিই নিবেন।

সক্রেটিসের দেহ চলেছে সমাধির পথে। আঁধারের ঘোমটা মাথায় দিয়ে জেনথিপিও হাঁটছেন সমাধির দিকে। তিনি কাঁদছেন না। শুধু তার পায়ে পায়ে কাঁদছে কতগুলো শুকনো জলপাই পাতা। সন্ধ্যার আঁধার ছাপিয়ে একটি পাখি নিদারুণ করুণ সুরে ডাকছে। পাখির কণ্ঠে দুনিয়ার সমস্ত বিরহ ঝরে ঝরে পড়ছে। এজিয়ান সাগরের উষ্ণ বাতাস ভিজে উঠেছে। মহাকালের গহ্বর থেকে ভেসে আসছে অচেনা একটি মরণ-মরণ গন্ধ।

একটি অবিনশ্বর মৃত্যুর জ্যোতি নিয়ে অদ্ভুত আঁধার নামছে পৃথিবীতে। সেই আঁধারের গা বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়ছে মৃত্যু। মহাবিশ্বের মহত্ত্বম কান্নায় ভিজে যাচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত আলো। মরণ সাগরের উপর দিয়ে অনাগত কালের পথ-সন্ধানী মানুষের জন্য নিমন্ত্রণ নিয়ে আসছে একটি পাখি— পাখিটির ঠোঁটে এক পেয়ালা হেমলক।

***

১৩৯. সক্রেটিসের মৃত্যুদৃশ্য নিয়ে প্লেটোর বিখ্যাত বই ফিদো (Phaedo).

১৪০. আত্মা সম্পর্কে সক্রেটিসের এই মত প্লেটো তার Phaedo (ফিদো) গ্রন্থে বিস্তারিত দিয়েছেন।

***

~== সমাপ্ত ==~

পরিবেশনায়

একটি
বইঘর.নেট ও
ব্ল্যাক পার্ল এলিট
নিবেদন
একটি
শুভম ও ব্রহ্মচারী
প্রয়াস

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. The Last Days of Socrates, Plato, Penguin Books
(Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Translated by Christofher Rowe, Penguin Books)

২. Early Socratic Dialogues, Plato, Penguin Books
(Ion, Translated and introduced by Trevor J. Saunders.
Laches, Translated and introduced by Iain Lane.
Lysis, Charmides, Translated by Donald Watt.
Hippias Major, Hippias Minor, Euthydemus, Translated by Robin Waterfiel.)

৩. সক্রেটিসের জবানবন্দি, প্লেটো, অনুবাদ-আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, পাঠক সমাবেশ

৪. ক্রিতো, প্লেটো, অনুবাদ-আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, পাঠক সমাবেশ

৫. ফিদো, প্লেটো, অনুবাদ-আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, পাঠক সমাবেশ

৬. The Republic, Plato, Translated by Desmond Lee, Penguin Books

৭. রিপাবলিক, প্লেটো, অনুবাদ-আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, পাঠক সমাবেশ

৮. Lives of the Eminent Philosophers: by Diogenes Laertius, Edited by James Miller, Oxford University Press

৯. Socrates-A Man for Our Times, Paul Johnson, Penguin Books

১০. Xenophon, Conversations of Socrates, Translated by Hugh Tredennick and Robin Waterfield, Penguin Books

১১. A History of Western Philosophy, Bertrand Russell, Publised Simon & Schuster

১২. সক্রেটিস, হাসান আজিজুল হক, অনুষ্টুপ

১৩. প্রাচীন গ্রিসের ইতিবৃত্ত, ড. অলোককুমার চক্রবর্তী, প্রোগ্রেসিড বুক ফোরাম

১৪. The Hemlock Cup: Socrates, Athens and the Search for the Good Life, Bettany Hughes, Jonathan Cape, London

১৫. Histories, Herodotus, Translated by George Rawlinson Wordsworth Classics of world literature.

১৬. Thucydides, History of the Peloponnesian War, Translated by C.F. Smith, Harvard University Press

১৭. The Man who Invented History, Justin Marozzi, Publisers John Murray
১৮. The Bloomsbury Companion To Socrates, John Bussanich & Nicholas D. Smith, Bloomsbury Companions.
১৯. রাজা ইদিপস, এন্টিগনি এবং ইদিপাস কলোনাসে, The Theban Plays, সফোক্লিস, পেঙ্গুইন বুকস
২০. Media and Other Plays, Euripides, Penguin Books
২১. Words of Wisdom from Ancient Greece, Translated by Alexander Zaphiriou, Aiora Publication.
২২. The Complete Plays, Aristophanes, Penguin Books
২৩. ইউরোপীয় নাটক ইতিহাস ও গল্প কথা, অমিতাভ চৌধুরী, এন. ই. পাবলিশার্স
২৪. লাইসিস, প্লেটো, অনুবাদ-আমিনুল ইসলাম ভুইয়া,
২৫. বিশ্ব সাহিত্যে গ্রিক পৌরাণিক গল্প, বদরে আলম খান, পলল প্রকাশী
২৬. দি স্টোরি অফ ফিলোজফি, প্রথম খণ্ড, উইল ডুরান্ট, দীপায়ন
২৭. গ্রিক নাটক সংগ্রহ, শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং
২৮. ইউরিপিদেস: ট্রয়ের মেয়েরা, দেবেশ রায়, এবং মুশায়েরা
২৯. Ancient Athens on Five Drachmas a Day, Philip Matyszak, Thames & Hudson
৩০. Prometheus Bound, Translated by Deborah H. Roberts, Hackett Publishing Company, Inc.
৩১. Plato At The Goodleplex, Why Philosophy Won't Go Away, Rebecca Newberger Godkstein, Atlantic Books.
৩২. Plato The Man and His Work, A.E Taylor, Dover Publications, Inc. . The Story of Philosophy, Bryan Magee, DK
৩৩. Euripides, Andromache Hecuba Trojan Women, Translated by Diane Arnson Svarlien Introduction, Hackett Publishing Company, Inc.
৩৪. A Companion to Aristotle, Georgios Anagnostopoulos, Wiley-Blackwell
৩৫. Homer, The Odyssey, Translated By Emily Wilson, W.W Norton & Company, Inc.
৩৬. The Odyssey, Homer with illustrations after John Flaxmax, Translated by Alexndrs pope

৩৭. Stephanides Brothes, Greek Mythology, Heracles, Retold By Menelaos Stephanides, Translation, Bruce Walter, Sigma
৩৮. A History of Ancient Greece in Fifty Lives (David Stuttard) Thames & Hudson.
৩৯. 8.500 Years of Civilization Greece, Between Legend and History, Haitalis
৪১. In Search of the Greeks, Second Edition, James Renshaw, Bloomsbury Publishing Plc.
৪২. The Greeks, National Geographic, Diane Harris Cline, National Geographic.
৪৩. The Rise of Athens, Anthony Everitt, Random House.
৪৪. Ancient Greece, Great Men, Papadogeorgos Georgios, Michael Toubis Publicaton S.A.
৪৫. Homer The Essential Iliad, Translated By Stanley Lombardo, Hackett
৪৬. Electra and Other Plays, Sophocles, Translated by David Raeburn, Penguin Books
৪৭. The Electra Plays, Aeschylus, Euripides, Sophocles, Translated by Peter Meinneck, Cecelia Eaton Luschnig and Paul Woodruff, Hackett Publishing Company
৪৮. Aphorisms, Hippocrates, Translated by W.H.S Jones, Aiora
৪৯. The Golden Verses, Pzthagoras, David Connolly, Aiora
৫০. Geek Mythology The Iliad The Trojan War, Translation by Bruce Walter, Sigma
৫১. The Ancient Greeks, Ten ways they Shaped the Modern world, Edith Hall, Vintage.
৫২. Oresteia, Aeschylus, (Translated by Peter Meineck) Hackett Publishing Company, Inc.
৫৩. The Bacchae and Other Plays, Ion the women of thoy Helen the Bacchae, Translated by Philip Vellacott, Penguin Books
৫৪. Four Tragedies, Sophocles, Ajax Women of Trachis Electra Philoctetes, Translated by Peter Meineck and Paul Woodruff, Hackett Publishing Company, Inc.

৫৫. Selected Dialogues of Plato, the Benjamin fowett Translation The Modern Library.
৫৬. The Three Theban Plays, Sophoicles, Traslated by Robert Fagles, Penguin Books
৫৭. A Traveller's History of Greece, Tim Boatswain & Colin Nicolson, Armchair Traveller.
৫৮. Aristotle, His Life and School Carlo Natali, Edited by D.S Hutchinson, Princeton University Press.
৫৯. The Parthenon Enigma, Joan Breton Connelly, Head Zeus.
৬০. The Parthenon and its Impact in Modern Times, Panagotis Tournikiotis, Milissa Publishing.
৬১. Ithaca and Homer, The Truth, Christos I. Tzakos, Translated by Geoffrey Cox
৬২. The Rise and Fall of Athens, Nine Greek lives by Plutarch, Translated by Ian Scott-Kilvert, Penguin Books
৬৩. Introducing Plato, Dave Robinson & Judz Groves by Clays Ltd.
৬৪. The Odyssey Stephanides Brothers Greek Mythology, Yannis Stephanides, Translation by Bruce Walter, Sigma
৬৫. Why Socrates Died, Dispelling the Myths Robin Waterfield, Faber and Faber.
৬৬. Mystery Greece, George Katselis, Iguana Jones, Hartini poli
৬৭. Books and Ideas the Library of Plato and the Academy, Translated by Nikos Koutras, Oak knoll Press.
৬৮. Works and Days, Theogony and The shield of Heracles, Hesiod, Translated by Hugh G Evelyn- White, Dover Publications. Inc

লেখক পরিচিতি

সুজন দেবনাথের প্রথম উপন্যাস 'হেমলকের নিমন্ত্রণ'। তিনি একজন কূটনীতিক। বর্তমানে এথেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সেলর। তিন বছর গ্রিসে থাকার সময় তিনি গ্রিসের ক্লাসিক্যাল সময় নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি গভীর আগ্রহে খুঁজে দেখেছেন সেই সময়টি যখন জন্ম হয়েছিল গণতন্ত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎশাস্ত্র, দর্শন, স্থাপত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সবকিছু। তার সেই গবেষণা এবং অনুভব থেকে সক্রেটিস, প্লেটো, হেরোডটাস, পেরিক্লিস,

সফোক্লিসদের নিয়ে এই উপন্যাস ‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের সময়কে একুশ শতকের মলাটে বাংলাভাষীদের জন্য নিয়ে এসেছেন তিনি।

সেই সক্রেটিসের সময় থেকেই যারাই জ্ঞানের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন, তারাই কোনো না কোনোভাবে ভয়াবহ বিপদে পড়েছেন। তাদের জন্য অজান্তেই প্রস্তুত হয়েছে এক পেয়ালা হেমলক। যারা অজানাকে জানতে চেয়েছেন, তারাই হেমলকের নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। তবু পথ ছাড়েননি পৃথিবীর জ্ঞান পিপাসুরা। হেমলক প্রেমীরাই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বাংলাভাষী সব হেমলকপ্রেমীর জন্য সুজন দেবনাথের প্রথম উপন্যাস ‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’।

সুজন দেবনাথ ১৯৮২ সালে বাংলাদেশের শরীয়তপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অধ্যয়ন করেছেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নটরডেম কলেজে। তিনি অব্যয় অনিন্দ্য নামে লেখালেখি শুরু করেন। এই নামে ২০১৫ সালে তার দুটি বই প্রকাশিত হয়। একটি কাব্যগ্রন্থ ‘মন খারাপের উঠোন’ এবং একটি গল্পগ্রন্থ ‘কীর্তিনাশা’। তার রচনা ও পরিচালনায় ২০১৮ সালে গ্রিসে নির্মিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম ইংরেজি গান ‘মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে’।